প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

উৎসর্গ

পিতৃদেব শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মৈত্র।

শ্রীচরণকমলেষু

বাংলা নাটকের বিবর্তন

ভূমিকা

এ গ্রন্থ বাংলা নাটকের ইতিহাস নয়; সে-কাজ পূর্বেই যোগ্যতর ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। 'নাটক' কী করে নাটক হয়ে উঠল, এবং তার এত বিচিত্র রূপই বা কী করে ফুটে উঠল, সেই আন্তরিক ইতিহাস আমার বর্ণনীয় বিষয়। ফলে আমাকে মঞ্চ-ইতিহাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছে। আমি নাটক-আলোচনায় স্বতন্ত্র কোন পরিভাষা ব্যবহার করিনি; সাহিত্য-আলোচনায় 'জাতীয়তাবাদী' যাঁরা হতে চান, তাঁরা হোন, আপত্তি নেই। আমার পন্থা বিশ্বসাহিত্য-অনুগত। তাই ট্রাজেডি আমার কাছে ট্রাজেডিই, কমেডি নিছক কমেডি।

'ভাবানুবাদ'-ও তাই অনুবাদ নয়। ড্রাইডেনের ভূত কাঁধ থেকে নামাতে চেয়েছি; অবশ্য আমি নানা বিষয়ে ড্রাইডেনের মতামতের গুরুত্ব স্বীকার করি। এ গ্রন্থে তার প্রমাণও আছে।

আজ থেকে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনায় আমি উদ্বুদ্ধ হই। বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম-ইতিবৃত্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। পণ্ডিতদের সেই ক্ষোভ অপনোদনে আমি অগ্রসর হয়েছি। শ্রমের অপর নাম নিশ্চয়ই মেধা নয়। কাজেই কতটা সফল হয়েছি, তা বলা আত্মধিক্কৃতির পর্যায়ে পড়বে।

আমার বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের অঙ্গনে উঁকিঝুঁকি দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার সাহস জুগিয়েছেন ডক্টর সুকুমার সেন! তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড' আমার পথের নিশানা। ডক্টর সেনের গবেষণা আমার মত সামান্য সাহিত্যসেবীর কাছে আলো-বাতাসের মত প্রাণধারণের পক্ষে অপরিহার্য। তাই কৃতজ্ঞতা জানাবার কিছু নেই!

এই গ্রন্থে প্রবীণ ও নবীন সমালোচনা সমান মর্যাদা পেয়েছে। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক নই। তবু তথ্যসংগ্রহের জন্য পশ্চিম বঙ্গের নানা গ্রন্থাগারে যাতায়াত করেছি। এই সব গ্রন্থাগারের কর্মিদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার কথা আজ বারবার মনে পড়ছে। সকলের নামও জানি না, তবু উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের শ্রীতরুণ মিত্রের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা থাকল।

এ ছাড়া এই গ্রন্থ রচনাকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যবিভাগের অধ্যক্ষ বন্ধুবর ডক্‌টর শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, ডক্‌টর প্রভাতকুমার গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীমান জ্ঞানেশ মৈত্র, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঘোষ এম.এ., বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নাট্যশাস্ত্রী ডক্‌টর সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীমান বিশ্বজীবন মজুমদার ও শ্রীমতী পারমিতা মৈত্র নানা বই সংগ্রহ করে দিয়ে প্রভূত সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন সময়ে ডক্‌টর চট্টোপাধ্যায় ও ডক্‌টর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে নানা পরামর্শ গ্রহণ করেছি। এঁরা সকলেই আমার প্রীতিভাজন ; ধন্যবাদ দিয়ে আজ সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাই না।

আমার গ্রন্থে ছাপার ভুল থাকবেই। এ গ্রন্থেও আছে। দুইটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি। ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখেছি, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র বসুর গৃহে বিদ্যাসুন্দর নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় দুই বৎসর পূর্বেই হয়েছিল বলে মনে হয়। ৫০৩ পৃষ্ঠায় লিখেছি প্রথমে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, পরে শরৎ-সরোজিনী মঞ্চস্থ হয়। ব্যাপারটি উল্টো ; প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে শরৎ-সরোজিনী, পরে ১৪ই অগাস্ট গ্রেট ন্যাশনালে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী মঞ্চস্থ হয়।

ছাপাখানার দৌরাত্ম্য বলে একটি কথা আছে। লেখকের দৌরাত্ম্য তার থেকে কম নয়। অন্তত মুদ্রণভারতীর কর্মিরা তার একটি উদাহরণ পেয়েছেন।

'ক্যালকাটা বুক হাউসে'র কর্ণধার শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাকে প্রীতির বন্ধনে আরও দৃঢ়ভাবে বাঁধলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। এই গ্রন্থরচনায় যিনি সর্বাধিক সাহায্য করেছেন, তাঁর নামটিই বাদ পড়ে গেল। বাদ-ই থাক। কারণ নাটকে ত নেপথ্যের একটি ভূমিকা থাকে।

ইতি—

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

সূচীপত্র

বাংলা সাহিত্য একদা কাব্য-কেন্দ্রিক ছিল, বাংলা কাব্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরানো, এ তথ্য সুধীজনস্বীকৃত।

কাব্যের মতই অভিজাত সাহিত্য-শাখা হোল উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাস বড়ো অর্বাচীন। তার জন্ম ঘটেছে মাত্র শতবর্ষ পূর্বে। তৃতীয় সাহিত্য-শাখা হোল নাটক, নাটকের ইতিহাসও অনেকের কাছে অর্বাচীন বলে বিবেচিত।

এর ফলে বাংলা নাট্য-ইতিহাসে দুইটি তারিখ অসাধারণ গুরুত্ব অর্জন করেছে—

১. ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর।

২. ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর।

প্রথম তারিখটিতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকের বঙ্গীয় ইতিহাসের এই দিনটি থেকে হোল সূচনা। দ্বিতীয় তারিখটিতে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদঘাটন হোল, বাংলা নাটক অভিনেয়তা অর্জন করল পেশাদারী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। আর নাটক যেহেতু ফলিত সাহিত্য এবং অভিনীত নাটকই একমাত্র নাটক, অতএব এই তারিখটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার পক্ষে হেতু রয়েছে। দুইটি তারিখই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলা নাটকের প্রকাশ ও নাটকের অভিনয় এক সাম্প্রতিক ব্যাপার নয়।

সকল ইতিহাসেরই পূর্ব-ইতিহাস থাকে। নাটকের পূর্বেও 'নাটক' ছিল সব দেশের সাহিত্যে এ কথা স্বীকৃত। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য বীজাবস্থায় বেদে উপস্থিত ছিল, পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। গ্রীক নাটক Dithyramb-এর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, একথা কেউ বলেননি। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংবাদ উদ্ধার করা যায়।

নাটক কোন দেশেই এক ও অনন্য মূর্তি নিয়ে হাজির হয়নি। দেশভেদে নাটকের রূপ যেমন বিভিন্ন, যুগভেদেও নাটক ভিন্নরূপা। প্রায় জৈবিক জগতের মতই নাটক বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়েই নাটকত্ব অর্জন করেছে। এই

সিঁড়ি-ডিঙানোর ইতিহাস বাতিল করে নাটকের যথার্থ ইতিহাস লিখিত হতে পারে না, অন্তত লিখিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

বাংলা নাটক ও যুগসত্য

বাংলা নাটক কাব্য বা উপন্যাসের মত সমৃদ্ধ নয়—এই রকম একটা বক্তব্য স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আকারে প্রায়ই উত্থাপিত হয়। সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শাখা যুগবিশেষে প্রাধান্য লাভ করে থাকে, সব শাখাই সব যুগে প্রধানত্ব অর্জন করতে পারে না। সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের বাহন। কাব্যে যা বলা হয়, ছোটগল্পে তা বলা উচিত নয়। সাহিত্যের বিষয়ধর্ম সাহিত্যের রূপ নির্বাচন করে। এক এক যুগ এক এক বিষয় লালন করে এবং তাকে ধারণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। নানা শাখার সাহিত্য একযুগে লিখিত হতে পারে, কিন্তু সব কয়টি শাখা সমান ভাবে ফুলে ফলে ভরে ওঠে না, সমান ঐশ্বর্যশালী হয় না।

বাংলা নাটক যে আধুনিক যুগে এত ঐশ্বর্যশালী হয়নি, তার জন্য নাটক রচয়িতারা দায়ী নন। দায়ী সে যুগের জীবন ধর্ম। যে বাতাস পালে লাগায় কাব্যের তরণী নিরুদ্দিষ্ট সৌন্দর্যলোকের পানে ছুটে চলেছে, এবং যার ফলে পাঠকের আকুল জিজ্ঞাসা

> বলো কোন পার ভিড়িবে তোমার
> সোনার তরী।

সে হাওয়া নাটকের পালে কোথায়? এমন কি উপন্যাসেও সে হাওয়া লাগেনি। লেখকদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা অক্ষমতার উপর এটা নির্ভর করেনি, সাহিত্যের শাখাবিশেষের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত না। যুগবিশেষের বাণী কোন এক বিশেষ আধারেই তার প্রকাশ যোগ্যতা খুঁজে পায়। সাহিত্যে বিষয় এবং বিষয়-আধার এইভাবে দ্বৈতবাদের অবসান ঘটিয়ে সমন্বিত রূপ ধারণ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, দেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ ছিল না, একথাও সত্য। কিন্তু বৃটিশ শাসনে কিঞ্চিৎ সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগেচ্ছু এক নব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তার ভাবলোকে একটা আলোড়ন অনুভব করল, সে আলোড়ন যতটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ততটা সমাজকেন্দ্রিক নয়।

নাটক একা পড়ার সাহিত্য নয়, নির্জনে শোনার সাহিত্য নয়। নাটক দশজনে বসে দেখার ও শোনার শিল্প ; নাটকে তাই প্রথমে অভিনয়, পরে পাঠ। অর্থাৎ প্রথমে তাকে নাটকই হতে হবে, পরে নাট্যসাহিত্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীজীবনে রাজনৈতিক-সামাজিক জিজ্ঞাসা নানা দল ও সভা সমিতির মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি, উচ্চ সরকারী চাকুরীতে দেশীয়দের নিয়োগ এসব প্রশ্ন ভিত্তি করে গঠিত হোত রাজনৈতিক দল। এদের জন্ম বিলম্বে ঘটেছে। প্রথমে এসেছে সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন। সতীদাহ প্রথা রদ করতে হবে, একেশ্বরবাদের প্রসার চাই, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত করতে হবে, অত্যধিক মদ্যপান নিষিদ্ধ করতে হবে, নারীশিক্ষার প্রচলন করতে হবে– এই সব দাবী নিয়ে সামাজিক আন্দোলন হয়েছে। বঙ্গভাষার প্রসার চাই, সংস্কৃত শিক্ষায় নবীন রীতির প্রবর্তন করতে হবে, কুৎসিত আমোদপ্রমোদরীতির বিলোপ সাধন করতে হবে– এইসব ইচ্ছাকে অবলম্বন করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছে। দেশের নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত সমাজ এইসব দাবীদাওয়া নিয়ে নানা প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়েছে।

এই যুগের নাটক এইসব জিজ্ঞাসায় উদ্দীপিত। নাটক দশজনের শোনার সাহিত্য বলে তার মধ্যে দশজনের কথা বড়ো হয়ে দেখা দিল। সমাজের 'সংস্কার' আন্দোলন হোল নাটকের প্রধান বিষয়, প্রথমে সমাজ 'সংস্কার', পরে রাজনীতিক 'সংস্কার'। রাজনীতিক 'সংস্কারে'র কথা উচ্চারিত হতেই দমন নীতির খড়্গ নেমে এল। তার পরের অধ্যায় অলীক অবাস্তবতার অধ্যায়। নাটক তখন যুগনিষ্ঠ হয়েছে, তখন প্রধানত সে হয়েছে প্রচারবাদী, শিল্পনিষ্ঠ নয়। তাই সে যুগদীর্ণ হয়েছে, যুগোত্তীর্ণ নয়।

কবিতা সভা-নির্ভর সাহিত্য ছিল না, ফলে কবিতা ব্যক্তির বক্ষোপুট আশ্রয় করে নিজেকে বিশিষ্ট করে আবিষ্কার করল। এবং কবিতার মধ্যে বাঙ্গালীর যুগ-চেতনার প্রধান বক্তব্য উৎসারিত হোল। কবিতা তাই সভায় দাঁড়িয়ে সভাসদ হোল না ; শিল্প হতে পারল। নাটক যে ব্যর্থ হোল, নাটক তার জন্য দায়ী নয়, দায়ী যুগের বিশেস জীবন-ধর্ম।

এলিজাবেথীয় যুগে কবিতার পরিমাণও কম নয়, কিন্তু নাটক হোল তার প্রধান সাহিত্য-ফসল। তার কারণ ঐ যুগের জীবনের সমস্ত শক্তি কবিতা ধারণ করতে পারেনি, অন্তত তার আধার হবার মত যোগ্যতা কাব্যের ছিল না। ফলে সনেট-লিখিয়ে সেক্সপীয়রই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। জীবনের উল্লাস

ও বিষাদ পরাজয়ে ও জয়ে সমভাবে দীপ্যমান যখন, তখনই নাটক প্রধান আঙ্গিক হয়ে দাঁড়াল।

জীবন যখন দশভুজা, তখন তা নাটকের উপজীব্য। সংসারের জন্য চাই দ্বিভুজা—

বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমাব
সোনার তবী।

এ প্রশ্ন একার প্রশ্ন, এবং একজনেরই কানে একান্ত নিবেদিত হওয়ার যোগ্য।

আজি সেই চির-দিবসেব প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমাব পায়ের কাছে।

নাটক 'আমাতে আব তোমাতে' শেষ হতে পাবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে নানা সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছে, কিন্তু তাব সাহিত্যিক সার্থকতা খুঁজে পাওয়া গেছে ব্যক্তি-ভাবনাব বিচিত্র বিলসনে।

নাটকে শ্রোতা বা দর্শক শুধু একজন নয়, দশজন, নাটকের বসেব নিষ্পত্তিতেও এই দশ জনাব "পরশ চাই"।

"সবার পরশে পবিত্র করা" সেই তীর্থ-নীরেই পবিশুদ্ধ করতে হবে নাট্যদেবীর পূজার মঞ্চ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙ্গালীব অন্তর্জীবনে যে ভাবপুঞ্জ সংহত হয়েছে, তার মধ্যে নাটক তৈরীব উপাদান এইভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। তবু নাটক বচিত হয়েছে। যেমন ভিক্টোবীয যুগ উপন্যাসেব যুগ, কিন্তু ইংলণ্ডে তখনও দুইজন প্রধান কবি উপস্থিত ছিলেন—টেনিসন ও ব্রাউনিং। টেনিসন কবিতার মধ্যে উপন্যাস নিহিত কবেছেন। তাঁর দীর্ঘ কবিতা উপন্যাসের আঙ্গিক অনেকখানি আত্মসাত করেছে। ব্রাউনিং-এব কবিতায় মেরিডিথের উপন্যাসেব মাধুর্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকব নয়—সেই একই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সেই গল্প ছেড়ে তাব গভীরে প্রস্থান-প্রয়াস।

ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় সাহিত্য হোল উপন্যাস—স্কট, ডিকেন্স ও থ্যাকারে হলেন সে যুগেব মুখ্য সাহিত্যিক। ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে কাব্যগত 'সংস্কার' প্রবলরূপে বর্তমান ছিল বলে প্রকাশ্যে এটা স্বীকার করতে তাঁরা চাননি। কিন্তু উপন্যাস তখনকার শিল্পবিকাশমুখর সমাজে ব্যাপকতর জন-সংবর্ধনা লাভ করেছিল। খেটে-খাওয়া চাকুরীজীবী মানুষের ভুরিভোজন হোল উপন্যাসে, সংবাদপত্রে যেমন তার প্রাতঃরাশ।

বাংলাদেশেও সাহিত্যের ইতিহাস একই রকম রহস্য সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিম-আবির্ভাবে সাহিত্যের অঙ্গনে বড়ো স্থান পেয়েছে উপন্যাস, কিন্তু মুখ্য ভূমিকার অধিকারী হয়নি।

সম্প্রতি জনৈক বিদেশী গবেষক উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা নাটকের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। সে তালিকার ব্যাপক আকার দেখে আমরা মনে করতে পারি, হয়ত নাটকই আমাদের উনিশ শতকীয় মনের নিকট প্রতিবেশী। এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য হোল, এগুলির এক বড়ো অংশ অভিনীত হয়নি, কাজেই নাটকীয় যোগ্যতা এদের প্রমাণিত নয়। নাটকের আকারে লিখিত হলেই কোন রচনা নাটক হয় না, মঞ্চস্থ নাটকই আত্মস্থ নাটক। দ্বিতীয় বক্তব্য হোল এই নাটকগুলি কোন প্রকার নাট্যসংস্কার মেনে চলেনি— না লোকনাট্য কলা, না আধুনিক বা ভদ্র নাট্যকলা। এগুলির অধিকাংশই নাটকের আকারে লেখা সাময়িক পত্রের বাদপ্রতিবাদ। তাই এই অতি ব্যাপক নাট্য-তালিকার অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমরা উনিশ শতকের সাহিত্যে নাটকের মুখ্য অধিকার মেনে নিতে পারছি না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের শেষ পরিণতি দেখা গেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বক্তব্য বহন করে নরওয়েতে ইবসেন নাটক রচনা করলেন এবং সে নাটক যুগবাণীর মুখ্য বাহন হোল। কাজেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হতে পারে না, বা নাটক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অবলম্বন করে যুগবাণীর মুখ্য বাহন হতে পারে না,—এ বিশ্লেষণ তথ্যসিদ্ধ নয়। কোন কোন দেশে বিশেষ সাহিত্য-শাখা বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের যোগ্য বাহন হয়ে ওঠে। বাংলা দেশে গীতি-কবিতা সেই দায়িত্ব পালন করেছে।

বাংলা গীতিকবিতা অকস্মাৎ এই দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়নি; এই যোগ্যতা তাকে হাজার বছর ধরে অর্জন করতে হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকে যে শাস্ত্র অনুশাসন মেনে চলতে হয়নি, তা নয়, মাঝে মাঝে তাকে যে সমাজ-সত্যের অনুগত হতে হয়নি, তাও নয়, কিন্তু সে সুযোগ পেলেই সমাজ-ধ্বজা মাটিতে ফেলে স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, আপন ইচ্ছাকে সফল করতে চেয়েছে। চর্যাপদের গান নিয়ম-মানার গান নয়, নিয়মভাঙ্গার গান।

> "নগর বাহিরে রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
> ছোই ছোই জাইসো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।"

—এই পদে জাতিবিচারের মুখে কালি দিয়ে হৃদয়ের আহ্বান বড়ো হোল। বৈষ্ণব মহাজনদের গান ষড়গোস্বামীর সকল অনুশাসনের প্রতিধ্বনি নয়। "বৈষ্ণবপদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে"—দীনেশবাবুর এই উক্তির তাৎপর্য এইখানে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলেন—

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলে কেহ্নে নয়নযুগলে"

কোন পুরাণ তার জন্য নির্দেশ পাঠায়নি। গোবিন্দদাস যখন লেখেন—

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।

তখন সেই চরণের অভিঘাতে শাস্ত্রবাক্য খান্ খান্ হয়ে গেছে। জ্ঞানদাসের এ রাধাকে কোন পুরাণে খুঁজে পাওয়া যাবে না:

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার।
গুরু-গরবিত মাঝে বহি সখী-সঙ্গে
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥

এ রাধা জ্ঞানদাসের একান্ত রাধা, 'পার্সোনাল' রাধা। মধ্যযুগেও এইভাবে গীতিকাব্য স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, 'হেরেটিক' হয়েছে। অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ—এই তিমির-শাসিত যুগেও কিন্তু গীতিকবিতার ক্ষেত্রেই কিছু হৃদয়ের ফুলকি ঠিকরে বেরিয়েছে। নিধুবাবুর এই গান

যারে তারে মন বলে গো (নয়ন আমার)
নিবারণ করি যদি অগ্নি ভাসে জলে গো।
মন নয় মনেরি মত
নয়নেরি অনুগত
বুঝায়ে রাখিব কত নানা পথে চলে গো।

উনিশ শতকের কবিসঙ্গীতের প্রচলিত বাকচাতুরী এখানে অগ্রাহ্য হয়েছে। অনুপ্রাসে এর ঐশ্বর্যের শেষ হিসাব হয় না, এর হিসাব শুধু হৃদয়ের যমকে যমকে আস্বাদিত হতে পারে।

গীতিকবিতা এইভাবে হাজার বছর ধরে নিজেকে পরিশীলিত করেছে, যোগ্য করেছে নিজেকে ব্যক্তিহৃদয়ের বিহ্বলিত মুখরতাকে ভাষায়-ছন্দে-চরণে-স্তবকে বেঁধে রাখবার বাসনায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এইভাবে গীতিকবিতা মুখ্য ভূমিকার অধিকারী হোল। বাঙ্গালী মানসের বিশিষ্টতম বক্তব্য তার মধ্যেই বিকশিত হয়ে আছে। গত এক শত বৎসরের বাঙ্গালী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গীতিকবিতার আকারেই সমর্পিত হয়েছে। উপন্যাস তার ব্যাপক পরিধি সত্ত্বেও সে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, নাটক তার সংখ্যা-গুরুত্ব সত্ত্বেও পিছনের সারিতে স্থান পাচ্ছে।

সমস্যাটি যোগ্যতর লেখক বা শিল্পীর সমস্যা নয়, সমস্যাটি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল সমস্যা। এবং তা বিশেষ যুগ ও বিশেষ সমাজ-পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাঙ্গালী জীবনে কোন মৌলিক পরিবর্তন ব্যতীত সাহিত্যের রূপ-বিশেষের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব হতে পারে না।

বাংলা নাটকের ঐতিহ্য

বাংলা সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপ যেদিন ফুটে ওঠে, নাটকের প্রসঙ্গও সেদিন উচ্চারিত হয়েছে। ওরা সমবয়সী, একই অঙ্গনের খেলুড়ি। বাংলা দেশের সংস্কৃতিব নানা উপাদান আজ সংগৃহীত হচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের উদ্যোগে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে বাংলা দেশের সংস্কৃতি-কেন্দ্রের নানা সংবাদ সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত হচ্ছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা মিউজিয়াম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এ ব্যাপারে উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মহাস্থানগড়, বানগড়, পাহাড়পুর, চন্দ্রকেতুর গড়, পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে বাঙ্গালী সংস্কৃতির একটি পুরাতন মানচিত্র তৈরি করা আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে লিখিত সাহিত্য।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য নিদর্শন চর্যাগীতিকাসমূহ। এই চর্যাগীতিকাতে নাটকের প্রসঙ্গ রয়েছে। সে নাটক আধুনিক নাটকের মত সংলাপসর্বস্ব অভিনেয় পালা কিনা, তা বলা দুষ্কর। কিন্তু শব্দটি নাটকই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং নাটকের বিষয়বস্তু, নাটকের রচনাকৌশল ও প্রয়োগ-কলা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। এইভাবে বাংলা সংস্কৃতির উদ্ভবমুহূর্তেই নাটকের দর্শন মিলছে।

নাটক এইভাবে জীবনের নির্দিষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ করতে দেখা দিল, এবং জীবনের অঙ্গুলি হেলনেই তার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—এই হোল আদি যুগের 'নাটকে'র চৌহদ্দি। তারপর তুর্কীর বিজয় ও চৈতন্য-আবির্ভাব থেকে মধ্যযুগের সূচনা।

নাটক এ যুগেও দেখা দিয়েছে। অভিনয় হয়েছে উৎসব-অনুষ্ঠানে, ব্রত-পার্বণে। ধর্ম আব নাটক পবম্পবেব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

ভাষা-নাটক আর সংস্কৃত নাটক— দুইটিব জন্য ভিন্ন খাত দেখা যায়। বাঙ্গালীর প্রমোদকলা এই দুই ভিন্ন খাত বেয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ভাষাব ক্ষেত্রে যে প্রমোদপ্রসঙ্গকে 'নাটগীতি' বলা হয়েছে, তার প্রকৃত স্বরূপটি কি, এই প্রশ্ন আলোচিত হবার যোগ্য।

সংস্কৃত নাটক শাস্ত্র মিলিয়ে বচিত নাটক, সেই সংস্কৃত নাটক-পড়া বাঙ্গালী কবি ও পাঠক কি কবে মধ্যযুগেব এক বিশেষ জাতীয় প্রমোদকলাকে 'নাটগীতি' নামে আখ্যায়িত করল? একে অমনোযোগিতাব ফল বলা ঠিক নয়। বাংলা দেশেব বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই একে 'নাটগীতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। নাটক অর্থে আমবা সংলাপসম্বল অভিনেয় কথাবস্তু বুঝে থাকি। এই বোধ আমাদেব সাম্প্রতিক সংস্কাব। '**Drama**' শব্দটি অনেক ব্যাপক। বাংলা ভাষায় এই ব্যাপক অর্থটি সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল, এটা তারই প্রমাণ।

মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতি-জগতে পাঁচালী ও ঝুমুর উভয়ই বর্তমান ছিল। এবং দুইটিই সমকালবর্তী। কেউ কাবও থেকে উদ্ভূত হয়নি, যদিও প্রভাবিত হয়েছে।

মধ্যযুগে নাটক সাঙ্গীতিকতার কবলে বন্দী ছিল। শুধু বাংলা দেশে নয়, অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যেও এই ছিল সাধারণ সত্য। ঝুমুরসঙ্গীতের পালা কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গীত হওয়া সত্ত্বেও নাটক হয়ে উঠছে—যেমন হয়ে উঠেছে গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। অচিরেই আর ছদ্মবেশে নয়, নাটক স্ববেশেই হাজির হচ্ছে।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সাবা মধ্যযুগকে নাট্যসাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলেছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের এই আক্ষেপ সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

মধ্যযুগেও বাংলার স্বতন্ত্র নাট্যধারার অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। সংস্কৃত নাট্যরীতির পাল্টা বাংলায় এক প্রাদেশিক নাট্যরীতির অস্তিত্ব ছিল।

এমনকি বাংলা দেশে এক স্বতন্ত্র নাট্যশাস্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। ইংরেজ-বিজয়ের পর এদেশের জনসাধারণের আত্মবিস্মৃতি কাটতে সময় লেগেছিল। সাংস্কৃতিক আত্মবিস্মৃতি ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের পর অপসৃত হতে থাকে, এবং রাজনৈতিক আত্মবিস্মৃতি কাটে আরও বিলম্বে।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নয়, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারত-বিদ্যার চর্চা দেখা দিল। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে আমাদের শুধু কৌতূহল নয়, সম্ভ্রমবোধ দেখা দিল। একই প্রকার সম্ভ্রমবোধ দেখা দিয়েছিল ইংরিজি নাটক প্রসঙ্গে তথা য়ুরোপীয় নাট্যকলা প্রসঙ্গে। রামগতি ন্যায়রত্ন আধুনিক নাট্য জগতে দুই জাতের নাটক শুধু প্রত্যক্ষ করেছিলেন - 'ইংরেজ-ধ্বনী' ও 'সংস্কৃত-ধ্বনী' (প্রথম হিন্দু থিয়েটার ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজারের অংশ-বিশেষ আর উত্তর চরিতের অংশবিশেষ যে অভিনয় করেছিল, তা দৈবাৎ ঘটনা নয়। বাংলা দেশের নিজস্ব নাটক তখন নাটক নামে স্বীকৃতি পায়নি। জাপানের 'নৌ নাটক' নাটক নামে অভিহিত হচ্ছে। জাভার 'নাটক' নাটক পদবাচ্য হোল, আর বাংলা দেশের নাটক নাট্যশ্রেণী থেকে খারিজ হয়ে গেল।) !

আধুনিক যুগ তার নতুন পরিবর্তিত রস-পিপাসা নিয়ে নতুন নাটক চেয়েছে, তাই নতুন নাটক লেখা হোল। একে একান্ত অনুকরণজাত বলে উড়িয়ে দিলে এর সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে না। আধুনিক জীবনের মধ্যে তার অঙ্গীকার ছিল। নাটক জীবনের জটিল দ্বন্দ্বের সরব শিল্পিত রূপায়ণ।

নাটকের মঞ্চ হোল এ যুগে পৃথক্, এল সুসজ্জিত মঞ্চের যুগ— শ্রোতা ও অভিনেতার মধ্যে গভীর পার্থক্য। শুধু বহিরঙ্গ নয়, অন্তরঙ্গেও নাটকের অর্থ কৃত্রিম মঞ্চের দ্বারা শাসিত হোল এই যুগে।

মানব জীবনে একটি নির্দিষ্ট কালখণ্ডই সর্বাতিশয় নয়, তা যতই আলোক উদ্ভাসিত হোক না।

নাটক মঞ্চস্থ হলেই স্বয়ম্ভর হয়ে ওঠে। মঞ্চ স্বভাবজ হতে পারে, কৃত্রিম হতে পারে। তাই মঞ্চের চরিত্র থেকে নাটকের শেষ বিচার হয় না।

মন্দিরের অভ্যন্তরে যে নাটক অভিনীত, তার মঞ্চ এক জাতীয়। আবার গৃহের আঙ্গিনায় যে মঞ্চ, তার এক জাত। জয়দেবের মঞ্চ আর চৈতন্যদেবের মঞ্চ এক শ্রেণীর নয়। 'নামগৃহে' বা তুলসীতলায় যে মঞ্চ, সে মঞ্চও পৃথক্, শংকরদেবের মঞ্চ স্বতন্ত্র জাতীয়। বারোয়ারীতলায় বা হাটে যে মঞ্চ, সেই কি কম স্বতন্ত্র। গোবিন্দদাস অধিকারীর মঞ্চ শংকরদেবের মঞ্চ নয়।

বাংলা দেশে নাটকের মতই মঞ্চেরও একটি বিশিষ্ট ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস হাত ধরাধরির ইতিহাস।

লেবেডফের মঞ্চই প্রথম মঞ্চ নয়, সে হোল প্রথম সাজানো মঞ্চ। কৃত্রিম মঞ্চই প্রকৃষ্ট মঞ্চ, এটা এক যুগের কুসংস্কার। শিল্পে কৃত্রিমতা অপরিহার্য, কিন্তু শিল্পী বারবার এই কৃত্রিমতার দায়ভাগ পরিহার করতে বদ্ধপরিকর হন। সে চেষ্টা কোন কালে ষোলো আনা সফল হয় না ; কিন্তু সে চেষ্টায় শিল্পের রঙ ফেরে, তার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। স্ট্যানিস্লাভস্কী ও ব্রেশ্‌টের প্রয়োগ-রীতির এইখানেই সার্থকতা।

বাংলা নাটক ও বাংলা মঞ্চ

বাংলা নাটক ও বাংলা মঞ্চ সম্বন্ধে দুইটি 'সংস্কার' প্রধান। সংস্কার পুরানা ভাববৈভবকে ধরে রাখে ঠিকই ; কিন্তু সে আবার নতুনের অভ্যুত্থানে বাধা দেয়। নতুন নতুন বলেই প্রাণবন্ত, উচ্ছল ও কলহাস্যমুখর। এই ভুবনে নতুন আছে বলেই জীবনের লীলা প্রকটিত।

সংস্কার হোল বাঁধ, তাকে প্লাবন রোধে ব্যবহার করা হয়।

নাটক ও মঞ্চের ক্ষেত্রে আধুনিক রূপই একমাত্র রূপ নয়—নাটগীতি ঝুমুর ও যাত্রা নাটকের বিরোধী নয়,—নাটকেরই নানারূপ। নাটকের ইতিহাসে এগুলির স্থান থাকবে। এরা বহুকাল ধরে বাঙ্গলার জনগণের নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করেছে।

অভিনয় শুধু প্রমোদকলা নয়, অভিনয় মানুষের জীবনের প্রস্তুতি। অভিনয় হোল একপ্রকার অনুকরণ—"**Imitation is instinctive in man from his infancy ; and no pleasure is more universal than what is given by imitation.**" নাটক আর একটু বেশি। এ এক প্রকার স্বপ্ন দেখা, যে স্বপ্ন তাকে দেখতে হয় আপন ব্যক্তিত্বের বিকাশে। অভিনয়ও একপ্রকার '**Make-believe**'। সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ, সুসজ্জিত দৃশ্যপট, জাঁকজমকপূর্ণ সাজসজ্জা, নানা রঙের আলোর খেলা আর লিখিত সংলাপ না হলে নাটক হয় না, এটা আমাদের মাত্র দু' হাজার বছরের সংস্কার। নাটকের ইতিহাস আরও অনেক প্রাচীন। অতীতে মানুষ শুধু শিকার করে ক্ষান্ত হয়নি, কুটীরে ফিরে পরিজনদের কাছে সেই পশু শিকারের অভিনয় করে তাকে দেখাতে হয়েছে। এই 'অভিনয়' শুধু নৃতত্ত্ববিদদের কৌতুহলের বিষয়বস্তু হয়ে কেন থাকবে?

নাটকের ইতিহাসও তার খোঁজ করুক। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্য কি নাটকের পূর্বরূপ নয়?

নাট্য-ঔৎসুক্য

বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অপেক্ষাকৃত কম। বাংলা সাহিত্যের নানা দিক সম্পর্কে কত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু নাটকের ওপর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাল্পতা বিস্ময়কর।

এমনকি বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিচয় সংবলিত গ্রন্থেও নাটক প্রসঙ্গ অবহেলিত। আমরা অভিনয় দেখি না, তা নয়। অভিনয় আমরা দেখি, প্রেক্ষাগৃহও আমাদের অনেক। এ ছাড়া গ্রামে মফঃস্বল-শহরে অভিনয় সংঘটিত হয় অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে--এগুলির হিসাব দেওয়া কষ্টকর। কাজেই নাটক সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল বিলক্ষণ আছে, কিন্তু নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে তত সচেতন নই।

সার্থক সাহিত্য সার্থক সমালোচনার জনক। হোমার ও ইস্কাইলাস, ইউরিপিদিস ও সোফোক্লিসের আদর্শ দেখে এ্যারিস্টটল সূত্র রচনা করেছিলেন। ভরত ভামহ আনন্দবর্ধন ও বিশ্বনাথ কবিরাজ সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাহিত্য পাঠান্তে কাব্যমীমাংসায় অবতীর্ণ হন। বাংলা গীতিকাব্য ও উপন্যাসের মহিমময় প্রকাশের যুগে সমালোচকেরা নাট্য আলোচনায় উৎসাহী হবেন, এটা আশা করা যায় না। বাংলা সমালোচককুল সমসাময়িক গীতিকাব্য ও উপন্যাসের বৈভব দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন--তাই বাংলা সমালোচনা এ-যুগের কাব্য-উপন্যাস পাঠজনিত বিস্ময়ের ঘোরে আচ্ছন্ন। নাটক অভিনীত হচ্ছে প্রচুর, লেখা হচ্ছে তার থেকেও প্রচুর। কিন্তু নাটকের সংখ্যার সঙ্গে উৎকর্ষের কোন যোগ থাকছে না।

মানুষ অনুকরণ না করে যেমন দাঁড়াতে পারে না, অভিনয় না করেও তেমনি তিষ্ঠুতে পারে না। নাটক সব যুগেই রচিত হতে পারে, সমৃদ্ধি যুগ-বিশেষের আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল। এ কথাটি সাংঘাতিক পুরানা হয়ে গেছে যে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ড সেক্সপীয়রের প্রতিভা বিকাশে আনুকূল্য করেছিল।

বাংলা দেশে এই আনুকূল্য প্রবাহিত হোল অন্যখাতে। গীতিকবিতার সংকীর্ণ শরীরে আত্মকেন্দ্রিকতার চরম স্ফূর্তি সম্ভব; আর নাটক তার স্বভাব-ধর্মের জন্য জন্ম-মুহূর্ত থেকে এক যৌথ শিল্প। যিনি দড়ি টানেন, তাঁরও একটা ভূমিকা আছে। যিনি জুড়ি বাজান, তিনিও অপরিহার্য।

নাটক ব্যাপকতর দর্শক সমাজের কাছে রস নিবেদন করে। অরসিকের কাছে রস নিবেদন করব না বলে কাব্যের লেখকের মত সে উন্নতনাসা আভিজাত্যগর্বী প্রমোদকলা নয়; তাই তার ওপর মধ্যবিত্তের শাসন নিরঙ্কুশ হোল না। (উনিশ শতকের 'জাগরণ' তাকে সমৃদ্ধ করেনি একথা যেমন সত্য, ১৮৭২ সন থেকে লেখক ও দর্শকের মধ্যে একটা বৈপরীত্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় নাটকের সৃষ্টির ধর্ম হোল বিব্রত ও বিঘ্নিত, এ কথাও তদপেক্ষা কম সত্য নয়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই বৈপরীত্যের হবে অবসান।) 'শারদোৎসব' প্রকাশে দর্শক ও লেখকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হবে। বাংলা নাটক সেদিন বাংলার জাতীয় ও লোককলার ধর্ম নতুন করে বরণ করল। মার্লো-সেক্সপীয়র ড্রাইডেন-বেন জনসন-পড়া বাঙ্গালী যুবক ছিল পরপদানত। তাই বহুদিন তার নাট্যচিন্তা বিঘ্নশূন্য হতে পারেনি। সেদিন বাঙ্গালী জীবনে বর্তমানের অবারিত আতিথ্য কোথায়? সাধে কি আর সে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে পদচারণা করেছে? সেখানেও রসদ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তার উন্মেষী মনকে পাঞ্জাব ও রাজপুতানার ধূসর ভূখণ্ডে ছুটাতে বাধ্য হয়েছে। অস্বাভাবিক পরিবেশ তাকে এইভাবে দেশ ও কালকে অস্বীকার করতে শিখিয়েছে। তাই নাটকের বড়ো অংশ নিজদেশে পরবাসী, স্বকালে পরকালিক। এমন উৎকট উৎকেন্দ্রিকতা বাংলা সাহিত্যের আর কোন অংগনে দেখা যায় না।

কোন যুগ তার হৃদয়ের সবটুকু উদ্ঘাটিত না করে স্থির থাকতে পারে না। কখনও নাটক, কখনও কাব্য, কখনও উপন্যাস বা সাহিত্যের অন্য কোন আরশিতে সে-উদ্ঘাটন সম্পন্ন হয়।

('বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দী অন্য কোথাও বা অন্য কিছুতে আপনাকে উদ্ঘাটিত করেছে, নাটকে নয়, নাটকে নয়।') *

নাট্য-সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পুরানা গ্রন্থে নাটক প্রসঙ্গের উল্লেখ ছিঁটেফোঁটা মাত্র।

প্রাচীন ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু[২] ও মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়[৩] বঙ্গীয় নাট্যকারদের বিষয়ে দুই এক ছত্র লিখেছেন; নাটকের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য রাখেননি। নাটকের কোন ইতিহাস তাঁরা স্বীকার করেননি, নাটকের তৎকালীন উপস্থিতিটুকু তাঁরা কেবল মেনে

নিয়েছেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় ঢাকা কলেজ ভবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন, এই বক্তৃতায় তিনি বলেন, "বঙ্গভাষায় পূর্বে কোন দৃশ্যকাব্য দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গভাষায় বহুকাল হইতে বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া আসিতেছে বটে কিন্তু সে সকল যাত্রা কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে এবং তত্তাবৎ নাটকের নিয়মে অভিনীত নহে।"[৪] যাত্রা ও নাটকের মধ্যে কোন সম্পর্ক সরকার মহাশয় স্বীকার করতে চান না এবং এগুলির কোন লিখিত আকার ছিল, তাঁও তিনি স্বীকার করেন না।

বাংলা নাটক ইংরেজ-পরবর্তী প্রমোদকলা, এই হোল তাঁর অভিমত। সরকার মহাশয়ের তিনটি মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিবেচনার যোগ্য। দুইটি অভিমত যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। একটি মত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে যাত্রার পালাও লিখিত আকারে পাওয়া যায়। কিছু কিছু হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া গেছে। তবে 'পালা' যাঁর নামে চলছে, সবটাই তাঁর লেখা কিনা, এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। আর সে প্রশ্ন প্রাচীন বাংলার কোন পুঁথি সাহিত্য সম্বন্ধে উত্থাপিত না হয়! এমন কি মুদ্রিত আকারে যাত্রার যে সব পালা পাওয়া যায়—যেমন গোবিন্দ অধিকারীর পালাসমূহ বা গোপাল উড়ের পালা—তার সবটুকু তাঁদের রচনা নয়। গোপাল উড়ের পালার কোন ছত্রই গোপাল উড়ের লিখিত নয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। এক বিশেষ যুগে কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাদের হাতে বাংলা ভাষার পুষ্টি ঘটেছিল এই কথা বলে কার্যত তিনি নাটক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যের ইতি টেনেছেন। তিনি রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন মাত্র। অবশ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পূর্ণ-ইতিহাস গ্রন্থ হতে পারে না, তাই মুষ্টিভিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন আধুনিক-পূর্ব বাংলা নাটকের কোন খোঁজ দেননি; সমসাময়িক যুগে সংস্কৃত-ধরনী ও ইংরেজ-ধরনী—এই দুই জাতীয় নাটক দেখা যাচ্ছে, এই খবরটুকুই তিনি দিলেন, তার বাড়তি কিছু নয়।[৫] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ অবয়ব তখনও গড়ে ওঠেনি—চলছে সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব রচনা। ধারাবাহিকতা এখানে নেই, আছে লেখক বিশেষের আলোচনা। কৈলাসচন্দ্র ঘোষের গ্রন্থের উদ্দেশ্যই ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তিনি অনেকটা

কোমতে (Comte) ও বাক্‌লের (Buckle) মত অনুসরণ করে বাংলা সাহিত্যের সামাজিক পটভূমি স্পষ্ট করে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু নাটক কেন, অনেক বিষয়েই তিনি নীরব।[৬] রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ইংরেজি গ্রন্থে নাট্যকারদের প্রসঙ্গে বলেছেন, কিন্তু নাটকের প্রসঙ্গে নয়। দীনবন্ধু ও মধুসূদন প্রশংসিত হয়েছেন।[৭] এ বিষয়ে প্রকৃত সচেতনতার পরিচয় দিলেন মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বিবিধার্থ সংগ্রহের নানা প্রবন্ধে তিনি নাটক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। নবনাট্য আন্দোলনেব সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, অংশ গ্রহণ করেছিলেন বেলগাছিয়া নাট্যাভিনয়ে। নবীন নাটকের তিনি উৎসাহী সমর্থক, তা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন না যে বাংলা নাটকের আধুনিক-পূর্ব কোন ইতিহাস আছে। যাত্রা ও নাটকের মধ্যকার পার্থক্য বিষয়ে তিনি অবহিত, যাত্রাকে তিনি আধুনিক অর্থে নাটক বলতে নারাজ। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের মধ্যে কোন তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেননি। তাঁর রচনায় নবীন নাটকের আবিভাবে নবীন বাঙ্গালীর অকৃত্রিম আনন্দবোধ ছড়িয়ে আছে।

"গত চাবি বৎসরাবধি কলিকাতা নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্প্রদায় বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন, এবং অভিনয়েব নির্মল বসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সবস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয় প্রতি গ্রামে ইহাব অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে— ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎছেদ ও নির্মল ব্যবহাবেব প্রাদুভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়; এবং তদর্থে আমবা দেশহিতৈসীদিগকে একান্ত চিত্তে অনুরোধ করিতেছি।"[৮] রাজেন্দ্রলাল মিত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর বিবিধ প্রমোদ-উপকরণের বিকৃত রূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাব ঐতিহাসিক যথার্থতা নিয়ে কোন তর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু রুচি বিকৃতির দায়ে কোন প্রমোদকলার জাতিচ্যুতি করা যুক্তি-সিদ্ধ নয়। যাত্রা প্রকৃত নাটক নয়, প্রকৃত নাটক হোল আধুনিক নাটক— মিত্র মহাশয় একথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। এখানে 'প্রকৃত' শব্দটির অর্থান্তর ঘটেছে বলে মনে হয়—এখানে 'প্রকৃত' অর্থে যা বিকৃত নয়। অর্থাৎ যা বিশুদ্ধ। এমন কি, আধুনিক নাট্য-ঐতিহাসিকেরাও মনে করেন যে, বাংলা নাটকের উৎপত্তি কাল হোল ঊনবিংশ শতাব্দী। অর্থাৎ ইংরিজি নাটকের আদর্শ থেকে এদেশে নাটক রচনা শুরু হোল।

ডক্টর সুশীলকুমার দে বলছেন, "বাঙ্গালা নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি।***

ইংরেজী নাটক ও অভিনয়ের প্রভাবে ও আদর্শে, নূতন বাঙ্গালা নাটক ও অভিনয়ের আরম্ভ হইল।[৯] ডক্টর দে তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত ইংরিজি গ্রন্থে বাংলা নাটকের উৎপত্তি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, যাত্রা ও নাটক স্বতন্ত্রধর্মী সাহিত্যবস্তু; তাই তিনি 'কলিরাজার যাত্রা' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ হোল "a Jatra of a modern type and not a drama".[১০] 'ড্রামা' শব্দটি তাঁর হাতেও সঙ্কীর্ণ অর্থ পেল। তিনি মনে করতেন যে, যাত্রার অনেক বৈশিষ্ট্য শেষ পর্যন্তও মরে যায়নি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচনায় যাত্রার বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে টিকে আছে। তাঁর মতে "Bengal simply adopted the mid-Victorian stage with all its accessories of painted scenery, costume and make-up, but fortunately with a genuine love of the drama and of amateur acting as an art"[১১] যাত্রার গোত্রান্তর ঘটিয়ে নাটকের উদ্ভব হয়েছে, একথা তিনি-বলেননি। তাঁর মতে দুইটি পরস্পর-বিরোধী নাট্য-রীতি। বরং তিনি সংস্কৃত আদর্শ ও ইংরিজি আদর্শের মধ্যে কোন বিরোধ দেখতে পাননি। তাঁর মতে "There never was a real conflict between Sanskrit and English models; and side by side, Kalidasa and Shakespeare found a place of honour. But in the true spirit of Renaissance, materials were exploited from all possible sources".[১২] ইংরিজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নাট্যরুচি সম্পর্কে অধ্যাপক দে-র মূল্যায়ন সত্যের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি।

বাংলা নাটক বিষয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দিয়েছেন ডক্টর প্রভু গুহ-ঠাকুরতা, তিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলা নাটকের উদ্ভব প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে যাত্রা পাঁচালী, কবি, কথকতা, টপ্পা, কীর্তন, হাফ আখড়াই—প্রায় সর্বপ্রকার প্রমোদকলার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন "No doubt, the story of a modern Bengali play is perfectly indigenous, atmosphere is thoroughly typical of Bengal, and the language also is vernacular, but the theatre as an institution, with its appendages and appurtenaces is an importation from the West".[১৩] যাত্রার প্রসঙ্গে তিনি ডক্টর নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত উদ্ধৃত করেছেন, আরও অজস্র বিদেশী গবেষকদের মতামত। কিন্তু যাত্রা যে

ধর্ম প্রভাবিত মধ্যযুগীয় নাট্যপ্রকরণ এবং অন্য কিছু নয়, একথা তিনি পরিষ্কার করে বলতে চাননি। অলৌকিকতা, পৌরাণিক আখ্যান-আনুগত্য, সঙ্গীতবাহুল্য —এসবই যে সর্বদেশের প্রাগ্-রেণেসাঁসীয় সাহিত্যসৃষ্টির চারিত্রবৈশিষ্ট্য, সে কথা তিনি স্মরণ করেননি।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত ডক্টর দে ও ডক্টর গুহঠাকুরতার মতের অনুরূপ। মনে রাখা দরকার যে ডক্টর সেন বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস লিখতে বসছেন। স্বভাবতই তাঁর আলোচনায় প্রাক্-আধুনিক নাট্যকলা বিস্তৃত স্থান পাবার কথা নয়। ডক্টর সেন বলেছেন "বিলাতি স্টেজ-অভিনয় দেখিয়াই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। নাটক বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি তাহা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। তখন ছিল যাত্রা। তাহার সহিত নাটকের খানিকটা মিল আছে নিশ্চয়ই, অমিলও আছে অনেকটা। বাংলা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে হয় নাই, তবে যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।"[১৪] যাত্রাও যে একপ্রকার নাটক, ডক্টর সেন তা বললেন না। তবে যাত্রার মূল্য তিনি স্বীকার করেন। যাত্রা ও নাটগীতির বিস্তৃত বিবরণ একমাত্র তাঁর গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে নাটক ছিল না, অথচ নাট্যশাস্ত্র ছিল একথা স্বীকার করা কষ্টকর। সংস্কৃত নাটক ছিল, কিন্তু বাংলা নাট্যাভিনয়ও ত ছিল। এই নাট্যাভিনয় কি জাতীয় রচনা অবলম্বন করে সম্পন্ন হোত, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একই সুরে কথা বলেছেন: "বাংলা সাহিত্যে সত্যিকার নাটক আসিল ইহার পূর্ব-প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতি রূপে নহে, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুকরণ ও বিলাতী রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জার আকর্ষণে। বস্তুত বাংলার সমাজ পটভূমিকায় আগে আসিয়াছে রঙ্গমঞ্চ, পরে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অভিনয়যোগ্য নাটকের সন্ধান হয়। এইভাবে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়িয়া আধুনিক নাটক বিপরীতমুখী হইয়া বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে।"

বাংলা নাটক তার পূর্ব-প্রবণতার স্বাভাবিক পরিণতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, এই হোল ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত। এই প্রকার মূল্যায়ন সর্ব দেশের বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক পর্ব সম্বন্ধে উপস্থাপিত করা যায়,

যদি সেই সব দেশের, তুলনায় বিদেশী প্রভাব মুহ্যমান হয়। সম্প্রতি বাংলা নাটক সম্পর্কে স্বতন্ত্র দুখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বিরচিত "বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস"—একখানি বৃহৎগ্রন্থ। নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত প্রশ্নসমূহ যে তিনি আলোচনা করবেন, এটা প্রত্যাশিত। কিন্তু নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে কোন রকম সংযোগ নেই, এমন বহু প্রশ্নও তিনি আলোচনা করেছেন। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস নাট্যকারদের ইতিহাস নয়, নাটকেরই ইতিহাস—একথা দ্বিতীয়বার বলতে হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আমরা বারংবার বলব।

ডক্টর ভট্টাচার্য বলছেন: "প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের দেশে এবিষয়ে দুইটি ধারাই প্রচলিত—একটি সংস্কৃত নাটকের ধারা, আর একটি দেশীয় যাত্রার ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব্য ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিল, তখন নিজের দেশের বিশিষ্ট এই দুইটি নাট্যধারার প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বিশেষত দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক দুই-ই সমানভাবে বাংলায় অনূদিত হইতে থাকে এবং সেই যুগের বাংলা নাটকে আঙ্গিকের দিক দিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটক উভয়ই সমান প্রভাব বিস্তার করে।"[১৬]

ইংরেজ-পূর্ব বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কৃত নাটকের ধারা ও দেশীয় যাত্রার ধারা যুগপৎ উপস্থিত ছিল, এ তথ্য মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে তা এক বিশেষ কালখণ্ড পর্যন্ত। পঞ্চদশ শতকের পর থেকে সংস্কৃত নাটকের ধারা শুকিয়ে গিয়েছিল, অন্তত তার অভিনয়যোগ্যতা নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষ দুই দশকে ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য ও তাঁর পুত্র অমর মাণিক্য তিনখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেছিলেন—নাটক তিনখানিই ধ্রুপদী রীতিতে লেখা। সেই সঙ্গে রয়েছে দুখানি প্রহসন—যার রসবিচার করলে 'হসন' শব্দটিই প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্তিলাভ করে। ভুলুয়ার সংস্কৃত নাট্যচর্চার কোন পরবর্তী ইতিহাস নেই, এবং থাকতে পারে না। এ শুধু মৃত ভাষার চর্চা নয়, মৃত আঙ্গিকের চর্চা।

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ সুসংবদ্ধ নাট্যইতিহাস লিখেছেন; কিন্তু নাটকের অগ্রগতির বিবরণ তাঁর গ্রন্থে যথাযোগ্য স্থান পায়নি।

সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় 'নাটক' শব্দটির অর্থ সংকোচন ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতক-পূর্ববর্তী বাংলার কোন নাট্য-প্রয়াস স্থান পায়নি।

সমালোচকদের এইটিই বদ্ধমূল ধারণা যে বাংলা নাটক যতখানি ইউরোপীয় আদর্শ অনুসরণ করেছে, ততখানিই সত্যিকার নাটক হয়েছে।

· ধারণাগুলি যতই দৃঢ়বদ্ধ হোক, এগুলির মূল ধরে নাড়া না দিয়ে উপায় নেই। আমাদের উদ্যোগ হবে সেই পথে।

পাদটীকা

১. Poetics—Aristotle.

১ক. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু। সং. বং. ১৯৩৫।

২. বঙ্গভাষার ইতিহাস—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সং. বং. ১৯২৮।

৩. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—গঙ্গাচরণ সরকার। ১২৮৬ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৩

৪. হরপ্রসাদ রচনাবলী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিলকুমার কাঞ্জিলাল। ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোম্পানী, ১৯৫৬, পৃ. ১৮৩—১৮৭।

৫. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। ১৯২৯ সং. বং. পৃ. ২৩৯

৬. বাঙ্গালা সাহিত্য—কৈলাসচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গাব্দ ১২৯১

৭. Literature of Bengal—Ar cy Dea. (Rameshchunder Dutt)—১৮৯৫ পৃ. ১৯০-১৯১

৮. বিবিধার্থ সংগ্রহ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৭০০ শকাব্দ

৯. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৮—রামনারায়ণ তর্করত্ন ও তাঁহার নাটক—সুশীলকুমার দে।

১০. 19th Century Bengali Literature—S. K. De. Page—641

১১. ঐ — Page—644

১২. ঐ — Page—645

১৩. Bengali Drama-Foreword—P. Guhathakurata. London. 1930

১৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—সুকুমার সেন। পৃ. ২২

১৫. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—২য় খণ্ড—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী। পৃ. ৩১-৩২।

১৬. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য এ. মুখার্জি এণ্ড কোং পৃ. ৩-৪।

নাটক-পূর্ব নাটক

কোন দেশে নাটক অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়নি; নাটক গড়ে উঠেছে। আর পাঁচটি শিল্পকলার মত নাটকেরও তাই একটি ইতিহাস আছে। ক্রমবিকাশের একটি কাহিনী আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাভাষায় কোন নাটক ছিল কি না, এবিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। অথচ উনিশ শতকের পূর্বে বাঙ্গালী জাতি ছিল, বাঙ্গালা ভাষা ও তার সাহিত্য ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি!

নাটক জীবনের মৌল চাহিদার সঙ্গে যুক্ত, মানুষ জীবিত আছে, অথচ নাটক নেই, এমন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। মানুষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নাটক তৈরি করে তুলেছে। জীবনের নানা স্তরে নাটকের নানা মূর্তি দেখা যায়। নাট্যকার ও অভিনেতা এগুলি রচনা করেন না, শুধু আবিষ্কার করেন।

(কখনও হয়ত লিখিত নাটকের খোঁজ পাওয়া যায় না, তার অর্থ এই নয় যে, নাট্যাভিনয় হয়নি। ইউরোপে মধ্যযুগে এমন ঘটনা ঘটেছে, যখন অভিনয় হয়েছে, কিন্তু নাটক ছিল না। "The earliest records of acting in the Middle Ages are not concerned with plays but with individual players, jesters, clowns, tumblers and minstrels"[১])

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে এই সংবাদটি স্মরণে রাখা দরকার।

এ খবর সর্বজনবিদিত যে, নাটক সৃষ্টির উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম ও তার অনুষ্ঠান। গ্রীক নাটকের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বজনজ্ঞাত; আমাদের দেশে নাটকের ক্ষেত্রে এটি এখনও আলোচনার বস্তু!

(ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন মিটিয়েও নাটকে যিনি দ্বিতীয় চরিত্রটি প্রথম আমদানী করলেন, নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি নমস্য। পাশ্চাত্ত্যে এই নমস্য ব্যক্তি হলেন ইসকাইলাস। সোফোক্লিস আর এক ধাপ এগুলেন।* তিনি নিয়ে এলেন একই দৃশ্যে তৃতীয় চরিত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকেও এইভাবে নাটক নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠল।)

বাংলা নাটকের আদি ভিত্তি সৌরোৎসব, এই হোল মন্মথমোহন বসুর মত। এই মত আমরা গ্রহণ করতে বলছি না। এ বিষয়ে তাঁর মত গ্রীক ইতিহাসের অনুরূপ :

"সুবিধার জন্য প্রথমে একজন অভিনেতার স্থানে দুইজন অভিনেতার প্রবর্তন হয় এবং পরে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমিকার সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা-ক্রমে বাড়িয়া যায়।

এইরূপে অভিনেতা বৃদ্ধির সহিত পালাগান ক্রমশঃ যাত্রাগানে পরিণত হইয়াছিল এবং গেয় কাব্য নাটকের রূপ ধারণ করিয়াছিল।"[২]

পাঁচালীর সঙ্গে নাটকের যোগ কতটুকু, এবিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু বাংলা নাটকে অভিনেতার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এ খবর সত্য।

প্রথম যুগের নাটকে কখনো কখনো বহু চরিত্র দেখা গেলেও আসলে মুখ্য ভূমিকা থাকত একজনের। আবার আমরা গ্রীক নাট্যসাহিত্য থেকে সাদৃশ্য দেখাতে পারি : 'With the slightest changes, the entire action might have been carried through with the utilisation of one performer only'[৩] বাংলা নাটকের আদিম যুগে দেখতে পাই অনুরূপভাবে কৃষ্ণ ও রাধিকা উপস্থিত আছেন, কিন্তু মুখ্য ভূমিকা দূতীর।

কেবল গম্ভীর নাটকের ক্ষেত্রে লোক-উৎসব বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নয়, কমেডির ক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় ঘটনার গুরুত্ব রয়েছে। কমেডি সম্বন্ধে জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন : "Its foundation was the Attic Comus, a popular ritual wherein a group of revellers organised processions and sang songs of doubtful propriety in honour of Dionysus."[৪]

একই বক্তব্য অপর এক ঐতিহাসিক পরিবেশন করেছেন, "Scholars and anthropologists now tend to agree that both forms of drama are arts of pre-historic ritual of the year-Daemon or Vegetation spirit, Comedy representing his triumph or marriage, Tragedy his defeat and death—with perhaps a suggestion of rebirth afterwards."[৫ক]

বাংলা দেশেও জন্মাষ্টমীর মিছিলে, গম্ভীরা গানে, টুসু গানে, ভাদু গানে দেব-বন্দনার আড়ালে এবং ঋতু-উৎসবের ছায়াতলে সমসাময়িক সামাজিক

প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আমাদের নানাবিধ সঙ পরবর্তীকালে প্রহসনের উদ্ভবে সহায়তা করেছে।

ভারতীয় নাটক ও তার রূপান্তর

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই তখন নাটক ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। তাই ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র হোল পঞ্চম বেদ।

ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি প্রশ্নে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে তিনটি মত প্রচারিত আছে :

১ ভারতীয় নাটক ঋতু-উৎসবের সঙ্গে যুক্ত। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন, কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধের পালার পিছনে রয়েছে ঋতুর প্রসঙ্গ। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক কীথের মতে "**it deals with the popular representation of the struggle between winter and summer The primitive ritual, which represents the killing of the winter demon has remained the source**"[৫] ঋতু-উৎসব হোল কৃষি-ভিত্তিক সমাজের উৎসব। ভূমি-কর্ষণ ও শস্য-উৎপাদনের বিবিধ সমস্যা ও তার সমাধানের ওপর ভিত্তি করে ঋতু-উৎসব গড়ে ওঠে। অধ্যাপক কীথের ভাষ্য গ্রহণ করলে এই রকম একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, ভারতীয় নাটক কৃষি-জীবনের প্রয়োজন চরিতার্থ করতে গিয়ে বিকাশলাভ করেছে।

২ দ্বিতীয় মতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে মহাভাষ্যের বক্তব্য থেকে। এ বিষয়ে ম্যাকডোনেল ও রিজওয়ের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক উইলিয়াম রিজওয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ভারতীয় নাটক "**has originated from the conception of the worship of the dead**"[৬]

অধ্যাপক স্টেন কনো জানাচ্ছেন যে, মহাভাষ্যের বক্তব্যের অর্থ ওঁদের দুজনের কেউ-ই সঠিক ধরতে পারেননি। ওঁদের অভিমত তাই ভেবে চিন্তে গ্রহণ করতে হবে।

৩. তৃতীয় মতটি আজকাল বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এই মতটি হোল এই : ঋক্ বেদের সূক্তগুলির অভ্যন্তরে নাটকের বীজ লুকিয়ে রয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর প্রথমে এই মত প্রচার করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের পণ্ডিত অধ্যাপক লেভি এটি সমর্থন করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর পরে আর একটু এগিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ভারতীয় নাটকের প্রাথমিক রূপ বেদেই রয়েছে।

অধ্যাপক পিশেল এই মন্তব্যে সায় দিলেন; এবং এই মন্তব্যের সঙ্গে তিনি আরও একটু নতুন বিষয় জুড়ে দিলেন, ভারতীয় নাটকে গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার যে যুগপৎ দেখা যায়, তা ঐ প্রাচীন সাহিত্য-রীতি থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ভারতীয় নাটকে গদ্য ও পদ্যের সহাবস্থান সত্যই খুব লক্ষণীয় ব্যাপার।

অধ্যাপক হার্টেল এই কথা শোনার পর আর ইতস্তত করলেন না; তিনি সোজাসুজি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ভারতীয় নাটক ঋক্‌বেদ থেকে উপজাত হয়েছে। অধ্যাপক স্টেন কনো হার্টেলের বক্তব্যের সারাংশ তাঁর গ্রন্থে এইভাবে সংকলিত করেছেন: **"The songs of the dialoguic nature are dialogues, arranged dramatically, and consequently there are dramatic elements, with which a work like the Gitagovinda can be set in comparison."**[৭]

বেদের 'সুপর্ণাধ্যায়' অংশে ভারতীয় জাদু নাটকের (Mystery Play) একটি আদিম নমুনা সন্ধান পেয়েছেন বলে অধ্যাপক হার্টেল দাবি করেছেন। তিনি ঋক্ বেদের কোন কোন অংশকে 'অঙ্কের বিধানে' সাজাবার চেষ্টা করেছেন। ঋক্‌বেদের কোন কোন আখ্যানকে তিনি এক একটি অখণ্ড নাটক বলে মন্তব্য করেছেন। এবং তিনি আরও বলেছেন, এই ধরনের নাটকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে যাত্রায়। অর্থাৎ প্রচলিত লোক-প্রমোদকলায়।

বলা বাহুল্য তৃতীয় মতটির পিছনে একটি সচেতন ঐতিহাসিক বোধ কাজ করছে। নাটকের ইতিহাস এখানে বিবর্তন-পথে পদচারণা করছে এবং শেষোক্ত মতটির সঙ্গেও আমাদের সহানুভূতি রইল।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত নাটক অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়নি। কোথায় বৈদিক সাহিত্য, আর কোথায় শাস্ত্রীয় সংস্কৃত নাটক! নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘ বিসর্পিত পথ। পূর্ব উল্লিখিত 'সুপর্ণাধ্যায়' ও যাত্রার পালাগুলি এই পথে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে।

সংস্কৃত নাটককেও একদিন ধর্মীয় সংযোগ ছিন্ন করতে হয়েছে, ধর্ম-নিরপেক্ষ নাট্যকলায় রূপান্তরিত হতে হয়েছে।

মন্দির-সংলগ্ন নাটমণ্ডপ ও যজ্ঞ-সমীপবর্তী নাট্যমঞ্চের অবসান হয়েছে, প্রাসাদ-সংলগ্ন নাট্যশালার উদ্ভব ঘটেছে। নাটকের ধর্ম-নিরপেক্ষ রূপের নজির পৌরাণিক যুগে মিলছে। রামায়ণে ধর্ম-যুক্ত নাটকের প্রসঙ্গ আছে; ধর্ম-নিরপেক্ষ নাটক প্রসঙ্গও আছে। "তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে

সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত, সভামধ্যে নানা কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণা বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ হাস্যরসপ্রধান নাটক পাঠ আরম্ভ করিলেন।"[৮] মহাভারতেও নাট্যশালার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিক যুগে কামসূত্রে নাট্যকলা ও নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রেও ধর্ম-নিরপেক্ষ নাট্যকলার প্রসঙ্গ গোপন নেই।

তবে ধর্ম-নিরপেক্ষ নাটকের পাশাপাশি ধর্ম-প্রভাবিত নাটক বহুকাল সহাবস্থান করেছে। ভারতের সামাজিক ইতিহাসের এ এক বিস্ময়কর বিশিষ্টতা।

বাংলাদেশের সংস্কৃত নাটক

বাংলাদেশে নাট্য-রসাস্বাদন দুই ভিন্ন খাতে চলত—এক হোল সংস্কৃত বা সর্বভারতীয় খাত। এটি প্রধানত ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং সামন্তপতি পৃষ্ঠপোষিত। দুই হোল দেশীয় বা প্রাদেশিক খাত। এটি সাধারণত ধর্ম-প্রভাবিত এবং লৌকিক আশ্রয়ে পুষ্ট।

বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে বাংলাদেশ ছিল ধিক্কৃত, ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।৩) বলা হয়েছে।

ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায মায়ং স্তানীমানি বযাংসি।
বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি॥

বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, যদি কেউ পুণ্ড্র, বঙ্গ এবং কলিঙ্গদের দেশে গমন করে, তবে তাকে দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হবে।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের বহুকাল বর্বর বলে মনে করা হোত। বাংলাদেশে কবিতা ও সংস্কৃত নাটক কিন্তু বর্বর নয়, যথেষ্ট পরিশীলিত (sophisticated) এবং তার ইতিহাস অবহেলার বস্তু নয়। সংস্কৃত নাটক ছিল শাস্ত্রীয় নাটক।

প্রখ্যাত লেখক ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন "বাঙ্গালা দেশে নাট্য-রচনার প্রাচুর্য ছিল।"[৯] নাট্যশাস্ত্রী সাগর নন্দী 'নাটক-লক্ষণ-রত্ন-কোষ' গ্রন্থে বহু বাঙ্গালী নাট্যকারের নাম উল্লেখ করেছেন।

কয়েকখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা হিসাবে বাঙ্গালী নাট্যকারের নাম উচ্চারিত হয়।

'বেণীসংহার' লিখেছেন ভট্টনারায়ণ, 'অনর্ঘ-রাঘব' লিখেছেন মুরারি মিশ্র। এঁরা উভয়েই ছিলেন বাঙ্গালী, এমন কথা অবাঙ্গালী ঐতিহাসিকদের কণ্ঠেও শোনা গেছে। 'মুদ্রারাক্ষসে'র নাট্যকার বিশাখ দত্ত, 'চণ্ড কৌশিকে'র নাট্যকার ক্ষেমীশ্বর বাঙ্গালী ছিলেন বলে কোন কোন গবেষক দাবী করেছেন।[১০] এ ছাড়া 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নামক রূপক নাটকের রচয়িতা কৃষ্ণ মিশ্র বাঙ্গালী ছিলেন বলে বহুকাল যাবৎ দাবী করা হচ্ছে।

চন্দ্রগোমীন, মদন প্রভৃতি বাঙ্গালী নাট্যকার রচিত একাধিক সংস্কৃত নাটকের সন্ধান মিলেছে। এগুলির অধিকাংশই পৌরাণিক নাটক। এগুলিতে পৌরাণিক আখ্যায়িকা ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ নেই। এগুলি রাজসভার আশীর্বাদপুষ্ট ধর্ম-নিরপেক্ষ প্রমোদকলা।

তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে সংস্কৃত নাট্যকলা কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। রাজশক্তির বিলাসবহুল জীবনের প্রভাবে নাটক ও নাট্যমঞ্চ আড়ম্বরপূর্ণ কৃত্রিম প্রমোদ-কলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজসভার আনুকূল্য লোপ পেলে সংস্কৃত নাটকের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কষ্টকর হোল। এই সময় থেকে সংস্কৃত নাট্যচর্চার গতি বিঘ্নিত হয়েছিল।

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "তাই দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১১৯৩ খৃঃ হইতে প্রায় ছয় শত বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় নাট্যকলার ইতিহাস এক রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[১১]

সম্ভবত শাস্ত্রীয় বা প্রথা-অনুগত সংস্কৃত নাটকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে ডাঃ দাশগুপ্ত এই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

সংস্কৃত নাট্যধারার অবনতি ঘটে এইসময়। তবে ভাষা-নাটকের চর্চা অব্যাহত ছিল। বরং এই যুগে প্রাদেশিক সাহিত্যের উদ্ভব ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও বাংলাদেশে নাটকের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা (তত্ত্বে ও দৃষ্টান্তে) হাজির হয়।

শাস্ত্রীয় নাটক ছিল প্রধানত বহির্বাদী (Objective) সাহিত্য, আর সংস্কৃতে রচিত প্রাদেশিক নাটক হোল অন্তর্বাদী (Subjective) সাহিত্য। কেউ কেউ এই কারণে এই নাট্যসৃষ্টিকে রোম্যানটিক বলে অভিহিত করেছিলেন। এই একটি কারণে পাঁচালীর সঙ্গে এই নাটকের যোগসূত্র আবিষ্কারের জন্য সবাই উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আরও একটি পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো। শাস্ত্রীয় সংস্কৃত নাটক ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিছক প্রমোদকলা রূপে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় অর্বাচীন নাট্যসাহিত্য ধর্মের সঙ্গে হারান সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করল। পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে লিখিত হলেই কোন নাটক ধর্ম-প্রভাবিত হয় না। দেখতে হবে তার দৃষ্টিভঙ্গী।

তুর্কী বিজয়ে ক্ষণকালের জন্য হিন্দু-সমাজে বিমূঢ়তা দেখা দিয়েছিল। ফলে সে আত্মসংকোচন-নীতি গ্রহণ করে। নানা আচারের জালে জাতি আপনাকে ক্লিষ্ট করে তোলে। তবে এই বিচ্ছিন্নতার নীতি বেশি দিন স্থায়ী হোল না। রাজ-কার্যের তাগিদে এবং আরও অনেক তাগিদে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের কাছাকাছি এল। আত্মসংকোচন-নীতির অবসান ঘোষিত হোল, এল আত্মসম্প্রসারণের যুগ। আচার-সর্বস্বতার পরিবর্তে হৃদয়ের নির্মল ভক্তিই মুক্তির সোপান রচনা করবে, এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে জন্মাল। ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে এসে এই পরিবর্তন সূচিত হয়, এই রকম একটা মত কেউ কেউ প্রকাশ করেছিলেন।

ভক্তিবাদের উন্মেষে বাংলা দেশে নাট্যরচনার জগতে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়। সে অধ্যায়ে প্রচলিত অর্থে 'নাটক' বাংলায় একটিও পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু অপ্রাপ্য বলেই ইতিহাসে তার স্থান অস্বীকৃত হতে পারে না।

"In the Dark Ages from the sixth to the tenth century, the theatre disappears as far as any record in documents is concerned, though it remained in a submerged way. If a stage disappears, the actor survives and survives without a stage and without a drama."[১২]

বাংলা দেশে ঠিক এই জাতীয় ঘটনা ঘটেনি, নাটক পাওয়া গেছে। এখন প্রচলিত ইতিহাসে একে নাটক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, এই হোল সমস্যা।

বাংলা নাটকের আদি প্রসঙ্গ

বাংলা সাহিত্যের আদিম নিদর্শনেই 'নাটক' শব্দের উল্লেখ আছে। চর্যাগীতিকার ১৭ সংখ্যক পদের শেষ চরণ দুইটি এইরূপ :

নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

এই চরণ দুটি পাঠ করে অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, দ্বাদশ শতকে 'বুদ্ধ নাটক' অভিনীত হোত। সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দান্তী চাকি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুণ-তান্তি-ধনি বিলসই রুণা ॥
আলিকালি বেণি সারি মুণিআ
গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।
জবে করহা করহ কালে চাপিউ
বত্তিশ-তান্তি-ধনি সঅল বিআপিউ ॥
নাচন্তি বাজিল গাঅন্তি দেবী।
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই ॥

[সূর্য-লাউ, শশী লাগিল তন্ত্রী, অনাহত দান্তী, অবধূতী হইল চাকি। ওলো সই, হেরুকের বীণা বাজিতেছে, শূন্যতন্ত্রীর ধ্বনি মূর্ছিত হইতেছে ক্ষীণস্বরে। অ-বর্গ ও ক-বর্গ দুই শোনা যাইতেছে সারিকা (বা স্বরসপ্তক) গজবরের সমরস সন্ধি গোটা হইল। যখন হাতে করভ ফল চাপা হইল তখন বত্রিশ তন্ত্রীব ধ্বনি সকল ব্যাপিল। বাজিল (হেবজ্র) নাচিতেছেন ; দেবী গাহিতেছেন, বুদ্ধনাটক বিসম হইতেছে।]

সমগ্র পদ নৃত্যগীতের একটি শব্দচিত্র। ১০ সংখ্যক পদে পাওয়া যাচ্ছে :

তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরনা চাংগেড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নডপেড়া ॥

[তন্ত্রী ও চাঙ্গাড়ি বিক্রয় করে থাকে ডোম্বী, তোমার জন্য আমি নটপেটিকা পরিত্যাগ করলাম।]

এই 'নটপেটিকা' হোল অভিনেতার পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার তোরঙ্গ। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে "এইরূপ নৃত্যগানের ভিতর দিয়া এই সব গায়ক-গায়িকা কোনও বিশেষ ঘটনাকে নাট্যরূপ দান করিতেন।"[১২ক]

বাদ্যযন্ত্র হেরুক বীণার উল্লেখ আছে। তাল মানের উল্লেখ রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হচ্ছে। এ কিন্তু সংস্কৃত ছন্নিক নয়। এ হোল বাংলা নাটকের আদিম রূপ ; নাটক নৃত্য-শব্দের সঙ্গে তখন যুগল বন্ধনে আবদ্ধ। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যবহৃত 'নাটক' শব্দটির এই অর্থ-ঔদার্য আমাদের মনে রাখতে হবে। কারণ আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েও আমরা একই অর্থ প্রত্যক্ষ করব। নেপালের

নাটকে নটনাথের চরণে প্রণতি জানান হয়নি, নৃত্যেশ্বরের চরণে প্রণতি পৌঁছেছে।

চর্যাপদগুলি নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপালের নাট্য-ইতিহাসে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

'বুদ্ধনাটক' চর্যাপদগুলির মত নিশ্চয়ই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আত্ম-প্রকাশ করেছিল। মৃতভাষায় লিখিত নাটক উঁচুতলার সৌখীন দর্শকদের তৃপ্তি সাধন করতে পারে, কিন্তু সমাজের নীচুস্তরের পক্ষে মাতৃভাষা ব্যতীত নাট্যরসাস্বাদন সম্ভব নয়। চর্যাগীতিকায় সমাজের নীচুতলার লোকের প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে। সঙ্গীত অপেক্ষা নাটক ব্যাপকতর ইন্দ্রিয়-নির্ভর প্রমোদকলা; তাই অধিকতর প্রত্যক্ষ (Concrete)। জীবিত ভাষা ব্যতীত এই প্রত্যক্ষতা রক্ষা করা সহজ নয়।

গীতগোবিন্দ ও বাংলা নাটক

সমালোচকেরা বলেছেন গীতগোবিন্দ নাটগীতির আঙ্গিকে লেখা। "জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গাহিতেন। আর পদ্মাবতী তাল অনুরূপ নাচিতেন, এই জনশ্রুতি অর্বাচীন নয়।"[১২] ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কোচবিহারের কবি রামসরস্বতীর 'জয়দেব' শীর্ষক কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে এই বিবরণ :

জয়দেবে মাধবক স্তুতিয়া বর্ণাবে,
পদ্মাবতী আগন্তু নাচত ভঙ্গিভাবে।
কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগ্‌দতি,
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।[১৩]

১৭ সংখ্যক চর্যার কথাবস্তুর সঙ্গে জয়দেব-পদ্মাবতী-প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে একটি কথা স্পষ্ট হবে যে, নাটক তখন ছিল নৃত্য ও গীতের ওপর নির্ভরশীল; আর সমস্ত অভিনয় কাজটি ছিল দুই-ব্যক্তির যুগ্ম ক্রিয়াকর্ম। তখনও কথা অধিক প্রশ্রয় পায়নি, নৃত্য ও গীত আধিপত্য করছে।

অভিনয়ের আঙ্গিক যাই হোক, জয়দেব-লিখিত গীতগোবিন্দ নাটক হিসাবে খুবই পরিণত রচনা।

গীতগোবিন্দ 'নাটগীতি'র আকারে লেখা, একথা প্রথমে বলেন ল্যাসেন অধ্যাপক লেভিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। শ্রেয়াডর আর একটু অগ্রসর হয়ে বলছেন, গীতগোবিন্দ একখানি "সুমার্জিত যাত্রা"।

যাত্রা অপেক্ষাকৃত উন্নত নাট্যকলা। নাটগীতি অপেক্ষা যাত্রার মধ্যে নাট্যকলার কিঞ্চিৎ পরিণত রূপ ফুটে উঠেছে। দৃশ্যসংস্থান ও অঙ্কবিভাগ দেখা যায়, কুশীলবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। যাত্রায় নৃত্যগীতের প্রাধান্য লোপ পায়নি, কিন্তু সংলাপ থাকা এখানে আবশ্যকীয়। তাই যাত্রা কেবল নাট-গীতি নয়। জে. এল. ক্লীন গীতগোবিন্দকে একপ্রকার "Divine idyll" এবং "a mystery play of the Hindus" বলেছেন। অধ্যাপক ক্লীনের মতটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

গীতগোবিন্দে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গীতিগুলি একমাত্র নাট্যবস্তু নয়। এখানে কিছু সন্দর্ভ আছে। গীতিগুলি অভিনয়কালে পৃথক্ পৃথক্ কুশীলব নৃত্যসহ গাইত, আর সন্দর্ভগুলি সূত্রধার বা অধিকারী স্তোত্রের মতন আবৃত্তি করতেন—সে আবৃত্তিতে সুরের স্পর্শ থাকত। চর্যাপদের মতই জয়দেব অভিনীত নাটকের মঞ্চ ছিল দেবমন্দির। গ্রীক নাট্যকলার মত ভারতীয় নাটমণ্ডপ দেবমন্দিরের সম্মুখভাগেই প্রতিষ্ঠিত হোত। ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থে এর পক্ষে সাক্ষ্য আছে।

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত এই কাব্য যেন দ্বাদশ অংকে বিভক্ত এক নাটক। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা এই কাব্যকে নাট্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে কোন অন্যায় করেননি। পরবর্তী যুগের ভক্তিবাদী নাট্য আন্দোলনের জন্য জয়দেব একটা আদর্শ উপস্থিত করে গেলেন। তিনি লোক-নাট্যকলাকে পরিশুদ্ধ করে ভদ্রসমাজের উপভোগ্য করে গেলেন।

ওড়িষ্যা, আসাম ও মিথিলায় জয়দেব-অনুসৃত পথেই নাট্য-আন্দোলন প্রবাহিত হবে। জয়দেব যে বিষয় বেছে নিয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর নাটকের কথাবস্তু, জয়দেব যে ভাবে নাটক লিখেছেন, অর্থাৎ তাঁর নাট্যরচনারীতি ভক্তি-আন্দোলনের নাটকরচয়িতাদের অনুকরণযোগ্য হবে। ঐসব নাটকেও জয়দেবের মত স্তোত্র দিয়ে সূচনা, সেই সন্দর্ভ শ্লোক ও গীত পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শুধু বাঁধুনি ও বিষয় নয়, গীতগোবিন্দের রস-নিষ্পত্তিও পরবর্তী যুগের আদরণীয়। গীতগোবিন্দের নায়ক-নায়িকা 'ধীর ললিত গুণ'-সম্পন্ন; এখানে প্রধান আবেদন মধুর রস।

রাধাকৃষ্ণ নায়ক-নায়িকা, তাঁদের লীলা হোল নাটকের কথাবস্তু। তৃতীয় চরিত্র হোল সখীর, তিনি লীলার সহায়িকা। এই তৃতীয় চরিত্রের প্রবর্তনায় নাটকের নাট্যীয় রস জমাট বেঁধেছে।

গীতগোবিন্দে গীতের সংখ্যা ২৪ ; তিনটি গান ছাড়া সব গানই হয় সখীর, নয় কৃষ্ণের, নয় রাধার। সখীর গানই বেশি ; তিনি গেয়েছেন ১৩টি গীত ; রাধার ৮, আর কৃষ্ণের ৩। প্রথমটি স্তোত্র ; আর দুইটি সম্ভবত পালার সূত্রধর গেয়েছেন। তৃতীয় গান থেকেই পালা শুরু হয়েছে। শ্রীমতীর অন্তরে ঈর্ষাভাব উদ্রিক্ত করার জন্য কৃষ্ণকে অন্য গোপিনীদের সঙ্গে কেলিরত দেখান হয়েছে ; আর অনৈকা সখী শ্রীমতীর কাছে শ্রীহরির এই বিলাসলীলা বর্ণনা করছেন। এই সর্গের সবকয়টি গীতই সখীর কণ্ঠে ভর করেছে। দ্বিতীয় সর্গে প্রধান চরিত্র হলেন শ্রীমতী। তাই তাঁরই কণ্ঠে সব কয়টি গীত বসান হয়েছে। তৃতীয় সর্গে কৃষ্ণের আধিপত্য ; সেখানে তাঁর কণ্ঠেই সব কয়টি গান। পালা এই ছাঁদে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্রই কাহিনীর খেই ধরিয়ে দিচ্ছেন স্বয়ং গ্রন্থকার অর্থাৎ সূত্রধার ! 'অংকীয়া নাটে' সূত্রধারের ভূমিকা একেবারে এই জাতীয়।

মণিপুর থেকে কলকাতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে 'কৃষ্ণনাটক'-এর দল আসে, তারাও জয়দেবের পদ আবৃত্তি করে। প্রায় একই আঙ্গিকে লেখা হোল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। পার্থক্য যেটুকু, তা হোল ব্যক্তি-ভেদে তারতম্য। "প্রাচীন যাত্রা নাট ও পাঁচালীর মাঝামাঝি রূপ পাই চণ্ডীদাসের এই কাব্যে"। পাঁচালী হোল মঙ্গলগীতি ; গীতগোবিন্দও মঙ্গলগীতি। পাঁচালীর মধ্যে নাট্যরস আছে। কিন্তু পাঁচালী থেকে যাত্রা উদ্ভূত হয়নি , নাটগীতি একটি স্বতন্ত্র কলা, এবং স্বতন্ত্র সাহিত্যও হয়ে উঠেছে—তার প্রমাণ পাচ্ছি এইখানে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

"পৌরাণিক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাঁচালী হয় সম্পূর্ণ বর্ণনামূলক বা **narrative,** নয় বর্ণনামালা সূত্রে গ্রথিত পদাবলীর সমষ্টি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণনা অংশ একেবারে নাই বলিলেই হয়। অনেকগুলি পদে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে নাট্যরস জমিয়াছে প্রচুরভাবে। সাগর নন্দী যে "ত্রিভিঃ পাত্রৈঃ প্রয়োক্তব্যা চ"—বীথী নামক নাট্যরচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়।"[১৪]

পাঁচালী নাটগীতি জাতীয় রচনা নয়।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে দশ রূপকের অন্যতম রূপে বীথীঃ স্থান পেয়েছে।

সাগর নন্দীর গ্রন্থ 'নাটক-লক্ষণ-রত্ন-কোষ' দশম শতক থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে রচিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খুব একান পূর্ববর্তী নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

লোক-সাহিত্যের আঙ্গিক অনুসরণ করেছে, কোন ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন মেনে নেয়নি।

ডক্টর সেন পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে 'নাটগীতি' না বলে গীতিনাট্য বলেছেন। . শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন, "এটি একটি পাঞ্চালিকা নাট্য অর্থাৎ পুতুল নাচের গ্রন্থ।"[১৫]

"গানগুলির মাথায় রাগ তাল ছাড়াও অন্য কিছু কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের নয়, পুতুল নাচের সংগে গীত-অভিনয়-রীতির। পুতুল নাচ-গানের মধ্যে শ্লোকগুলি কাহিনীর ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে।"[১৬]

প্রখ্যাত বৈষ্ণবসাহিত্যবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "ইহা ঝুমুর গানের পুঁথি। পালাগুলি ঝুমুরের পালা হিসাবে সাজানো। ঝুমুর বলিতে প্রাচীনকালে—

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীক মধুরা মৃদু।

একৈব ঝুমরীর্লোক বর্ণাদিনিয়মোজঝ্‌তি। (সঙ্গীত দামোদর)

শৃঙ্গার রসপ্রধান, মাধ্বীকের ন্যায় মন্থর ও মৃদু, বর্ণাদির বাঁধা ধরা নিয়মহীন গানকে বুঝাইত। ঝুমুরে দুই দলের ভিতর পরস্পরের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়। এ সম্বন্ধ দুই দলে দুইজন তিনজন অথবা চারিজনের মধ্যেও হইতে পারে। পরে এই সম্বন্ধ অনুসারে প্রশ্ন, উত্তর, শ্লেষ, গালাগালি, বঙ্গ রহস্য ইত্যাদি লইয়া গান চলিয়া থাকে। কৃষ্ণকীর্তন ইহার উদাহরণ।"[১৭]

পণ্ডিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নির্ণয়ে ঝুমুর গীতিপ্রসংগের অবতারণা করে একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রাঢ় অঞ্চলে প্রাপ্ত কাব্য, ঝুমুরসঙ্গীত রাঢ় ও সাঁওতাল পরগণার জনপ্রিয় লোককলা। ওঝা মহাশয়ের ঝুমুরসঙ্গীতের উদাহরণগুলি সাঁওতাল পরগণা থেকেই সংগৃহীত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্য সমগ্র আদিবাসী অঞ্চলে ঝুমুরসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দাবী করেছেন। এই ঝুমুরসঙ্গীত থেকে যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে বাংলা নাটকের উৎপত্তির পিছনে ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেকখানি হ্রাস পেয়ে যায়।

গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের অভিমত পূর্বেই সংকলিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রসঙ্গে পণ্ডিত মুখোপাধ্যায়ের অভিমত উপস্থিত হওয়ায় আলোচনা একটি লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে অনেকটা বিঘ্নশূন্য হয়েছে।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আগাগোড়া পদের সমষ্টি, কেবল মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের দ্বারা কাহিনীর খেই গাঁথা হইয়াছে।"[১১] ডক্টর সেনের এই বিশ্লেষণে মোটামুটি সাধারণ সত্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু তিনি যখন বলেন, "জয়দেবের গীতগোবিন্দের এবং শঙ্করদেবের নাট্যযাত্রার গাঁথুনিও কতটা এই রকম," তখন তিনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের উপর আলোক সম্পাত করেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন 'নাটগীতির' উল্লেখ্য গ্রন্থ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অখণ্ড নাটক নয়। আরও বিশদভাবে বলা যায়, একটি মাত্র পালা নয়। জন্মখণ্ড ঠিক নাটকের আকার পায়নি, অনেকটা পাঁচালীব গায়েনের মুখনিঃসৃত পালা-কাহিনীর আদল পেয়েছে। অম্বুল খণ্ড নাটক ও আখ্যানকাব্যের মাঝামাঝি রূপ পেয়েছে। দান ও নৌকা খণ্ড থেকে পুরোপুরি নাট্যরীতি অবলম্বিত হয়েছে, দান খণ্ডে সখী বা বড়ায়ির ভূমিকা মুখ্য। বংশী খণ্ডে রাধা প্রধানা হয়েছেন, তবু সখীব ভূমিকা পরিহার্য নয়। এমন কি, বিরহ পালাতে রাধা যেখানে সর্বপ্রধানা, সেখানেও বড়ায়ি পরিত্যজ্য হতে পারে না।

এক দিকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নাটকীয়তা গীতগোবিন্দ থেকেও বেশি। সে হোল রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ হেতু। শুধু উত্তরপ্রত্যুত্তরে এই কাব্যের নাটকীয়তা নির্ভর কবেনি, বা সখী চরিত্রেব প্রবর্তনায় নাট্যরস ঘনীভূত হয়নি। এই প্রথম চরিত্রের নাটকীয় বিকাশ দেখা গেল। নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে রাধিকা যতটা বিকশিত হয়ে উঠেছেন, ততটা নায়িকা হয়ে উঠেছেন। নাটকে অংকে অংকে চরিত্র বিকশিত হয়। এই কাব্যে এক একটি খণ্ড বা পালার মধ্য দিয়ে রাধা বিকশিত হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত এই নাটকের ঘটনা সংস্কৃত নাটকের মত অতটা নেপথ্য-নির্ভর নয়। সব কিছু দর্শকের চোখের সম্মুখেই ঘটেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অখণ্ড নাটক নয়, এটি অনেকগুলি পালা বা নাটকের সমষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে কলাকৌশল অবলম্বিত হয়েছে, পরবর্তী যুগে ঝুমুর-সঙ্গীত রচয়িতা পীতাম্বর দাস, 'অংকীয়া নাটে'র লেখক শংকরদেব, মাধবদেব, কালীয়দমন যাত্রার বাঁধনদার গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতির রচনায় তার অনুসরণ দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, কৃষ্ণ-প্রসঙ্গের মধ্যে নাটকীয়তা আছে বলেই লৌকিক নাট্যরীতিতে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গের একাধিপত্য। কথাটা বিবেচনা করা দরকার।

গীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চৈতন্যপূর্ব দুইখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। গীত-গোবিন্দকে ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেছেন "The first and most important literary record of the Pre-Chaitanya Vaisnavism in Bengal." শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যকেও অনেকে প্রাক্-চৈতন্য রচনা বলেছেন। আবার এই দুইখানি কাব্যের মধ্যে বাংলা নাটকের প্রাথমিক রূপের সন্ধান মিলছে। তবে কি কৃষ্ণলীলা মূলত নাট্যগুণসম্পন্ন ?

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আর আর গোপিনীদের নিয়েই সঙ্গীতের সূচনা। এই 'সঙ্গীত' একটু ব্যাপক অর্থসম্পন্ন শব্দ, এতে গান, যন্ত্র-সঙ্গীত এবং নৃত্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুধু গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নয়, রাধাকৃষ্ণলীলা সমগ্র মধ্য যুগের নাট্যসাহিত্যের মুখ্য কথাবস্তু হয়ে পড়েছিল। এই হেতু কোন কোন গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিষ্ণু-কৃষ্ণ পূজা থেকেই ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি ঘটেছে। অধ্যাপক স্টেন কনো বলেছেন কৃষ্ণ-কাহিনীই যেন যাত্রা নাটকের একমাত্র বিষয়বস্তু।

কৃষ্ণ কাহিনী শুধু বাংলা দেশে নয়, মধ্যযুগে সারা ভারতবর্ষে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মধ্যযুগে শক্তি-সাহিত্য ও রাম-সাহিত্যও তো কম জনপ্রিয় ছিল না। তবু সে-সাহিত্য নিতান্ত মঙ্গল গান বা পাঁচালীর মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে কেন থাকল, নাটক হয়ে উঠল না, এ প্রশ্ন বিশ্লেষিত হবার অপেক্ষা রাখে।

পাদটীকা

১. A Short History of English Literature—B. Ifor Evans. Penguin Edition. London. 1960. P. 16-17.

২. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ৪৯।

৩. British Drama—Allardyce Nicoll. 5th Edition. 1960. P-35

৪. World Drama—A. Nicoll. George Harrapp & Co. Ltd.

৪ক. Aeschylus—Gilbert Murray. London. 1960. P.-4

৫. The Vedic Akhyana and the Indian Drama—J. R. A. S. 1911. P. 929.

৬. A History of Sanskrit Drama—Sten Konow. Translated by S. L. Ghosal. 1969. P-59.

৭. ঐ—পৃ. ৫৯।

৮. বাল্মীকি রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড—পৃ. ২৫৭। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত। শকাব্দ ১৮০৪।

৯. বা. সা. ই. ১ম খণ্ড—সু. সে. পৃ. ২১।

১০. সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ১২০.

১১. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ১৯৪৭. পৃ. ২১০।

১২. A Short History of English Drama—B. Ifor Evans. Penguin Edition London. 1948. P.16.

১২ ক বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতিকা—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ১৩৭১. পৃ. ১২০.

১৩ বা. সা. ই. ১ম খণ্ড—সু. সে. পৃ ২৯.

১৪. ঐ পৃ. ৪৪.

১৫. বিচিত্র সাহিত্য—সু. সে. ১ম খণ্ড পৃ. ২৫—৩২।

১৬. বা. স. ই ১ম খণ্ড—পূর্বার্ধ—১৯৭০—পৃ. ১৪৮

১৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৬ রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১৮. বা. সা. ই ১ম খণ্ড—সু. সে. পৃ ১১৯

১৯. Vaishnava Faith and Movement—S. K. De. Firma K. L. Mukherjee. P-30.

২০. A History of Sanskrit Drama—Sten Konow. P. 59-60.

ভক্তি-আন্দোলন ও প্রাদেশিক নাটক

শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। বাংলাদেশে ভক্তি-আন্দোলন কিন্তু ঐ দিন থেকে শুরু হয়নি। চৈতন্য-পূর্ব বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের আন্তর রূপ বিশ্লেষণ করা কষ্টকর, তবে তার রসের দিক স্নিগ্ধতম ভাষায় মুদ্রিত হয়ে আছে জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দ কাব্যে—"the first and most important literary record of the Pre-Caitanya Vaishnavism."[১]

ভক্তিবাদ চতুর্দশ শতক থেকে সারা ভারতে প্রসার লাভ করতে থাকে। এ আন্দোলন প্রদেশে প্রদেশে স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিল—এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটে। সর্বভারতীয় ধর্মচেতনা ও শাস্ত্র-অনুশাসনের স্থলে প্রদেশের বিশিষ্ট ধর্মচেতনা ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দেখা দিতে থাকে। ভক্তি-আন্দোলন তাই এক জাতীয় বিদ্রোহাত্মক মনোভাব থেকে জন্মেছে।

"Like the Protestant Reformation in Europe in the sixteenth century, there was a religious, social and literary revival. This religious revival was not Brahminical in its orthodoxy, it was heterodox in its spirit of protest against forms and ceremonies and class distinctions based on birth, and ethical in its preference of a pure heart, and of the law of love.. The religious revival was the work also of the people, of the masses, and not of the classes. As its heads were the saints, prophets, poets and philosophers, who sprang chiefly from the lower order of the society—tailors, carpenters, potters, gardeners, shop-keepers, barbers, and even mahars (scavengers) more often than from Brahmins"[২].

সারা ভারতবর্ষে উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্বে-পশ্চিমে—নানা সন্তের আবির্ভাব ঘটে; তাঁদের অনেকেই পৌরাণিক দেবতার মহিমা প্রচার করেন, কিন্তু নতুন

ব্যাখ্যা নিয়ে। পশ্চিম ভারতে গুরু নানক, দক্ষিণ ভারতে বল্লভাচার্য, উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, পূর্ব ভারতে শংকরদেব, মাধবদেব—সকলেই ভক্তির পথে আপন আপন বক্তব্য পরিবেশন করেন।

ভক্তি-আন্দোলনের নানা রূপ

বাঙ্গালা দেশ সারা ভারতের এই 'সংস্কার' আন্দোলনের অংশ হিসাবেই চিহ্নিত। জনৈক ঐতিহাসিক বাঙ্গালীর ধর্মীয় ইতিহাসে এক প্রকার অনন্যতার সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"Bengal has evinced in the history of her religious progress, a spirit of constant revolt against orthodoxy. Whenever an institution basing itself on the dogmas of the monastic pedants, has spent its portals against the immutable truths of nature and tried to blindfold men by learning and logic, the heterodox elements in the country have revolted against its theology and asserted themselves to break the fetters of social autocracy by proclaiming the true relation in which man stands to God and to his fellowmen. It was this spirit which had at one time made Bengal a staunch votary of the Buddhistic creed, it was for this reason that the Tirthankars have found it a suitable soil for the promulgation of their doctrine."[৩]

এই মত আজ আর ঐতিহাসিকেরা প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে করেন না। ঠিক এতটা বাঙ্গালী অনন্যতার কথা না বললেও ডক্টর স্থকুমার সেনের মন্তব্যে অন্য প্রদেশে বঙ্গ-সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতির কথা একটু বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে।

"পূর্বে বাঙ্গালী যে-সকল প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এখন বাঙ্গালী সেই-সকল প্রদেশবাসীকে তাহার নিজের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির অংশীদার করিয়া সমধিক মর্যাদা লাভ করিল।"[৪]

ডক্টর সেনের বিশ্লেষণে আরও একটি বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত স্থান পেয়েছে।

"শ্রীচৈতন্য বাঙ্গলা দেশে যে ভক্তি-ধর্মের প্রবর্তন করিলেন তাহা অন্যান্য প্রদেশের অগ্রগামী হইলেও বিবিক্ত ও আকস্মিক ঘটনা মাত্র নয়। ভারতবর্ষের

অন্যত্রও ইহার আভাস দেখা দিয়াছিল। কবীর শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক, তাঁহার উপর গৌড়ীয় ভক্তিধর্মের প্রভাবের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কিন্তু গুজরাট ও কামরূপ প্রভৃতি প্রান্তীয় অঞ্চলে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে যে ভক্তিধর্মের উদ্দীপনা তথা সাহিত্যসৃষ্টির উৎসারণা দেখা দিল তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌণ প্রভাব মানিতেই হয়। বল্লভাচার্যের উপর শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ প্রভাব ও তাঁহার শিষ্য সুরদাস প্রভৃতি ব্রজভাষার কবিদের উপর বৃন্দাবনবাসী গৌড়ীয় মোহান্তদের প্রভাবও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[৫]

বিপিনচন্দ্র পাল বংলার বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে যে কথা বলেছিলেন, সকল প্রদেশের ভক্তি-আন্দোলন সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়।

"The Bengal school of Vaishnavism has also developed its own philosophy through its interpretation of the Upanishads, the Brahma Sutras and the Geeta (P. 2)."

"The Bhakti cult in Bengal is one of the distinct features of the genius and character of the Bengalee people. " (P. 34)

"Read and interpreted through the actual realisation of Sri Chaitanya Mahaprabhu these Vaishnava lyrics will be found to furnish strong evidence of what may be called the individuality of the Bengalee people." (P. 84)

[*Bengal Vaishnavism* Bipin Chandra Pal, Calcutta—1962]

ঠিক একই কথা অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে ডাঃ বিরিঞ্চিকুমাব বড়ুয়া তাঁর অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন। অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্ম ছিল গৃহীর ধর্ম—সেখানেই তার প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য। "Sankaradeva... advocated neither a religion of extreme asceticism nor complete renunciation of family life. He upheld the golden mean between the two. He believed that renunciation should be internal, not external. The Saint himself had a full family life and took a second wife after the death of the first one, on his return from pilgrimage."[৫ক]। ভাগবতের দশম স্কন্ধ ছিল তাঁদের অবলম্বন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে কেউ কেউ মাধ্বী মতের অনুসরণকারী বলেছেন। ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই মত প্রথম উচ্চারিত

হয়। কিন্তু এই মতটি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃতি পায়নি। তাঁরা প্রধানত তিনটি যুক্তি খাড়া করেছেন।

১. রাস পঞ্চাধ্যায় মাধ্ব মতে অচল হলেও মহাপ্রভুর তা প্রাণস্বরূপ।

২. মাধ্ব মতের সাধনায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার। মহাপ্রভুর মতে ঈশ্বর সাধনায় সবারই সম-অধিকার। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ করেছিলেন—

আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান। —চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদ।

৩. মাধ্ব মতে ভক্তির সঙ্গে আচরণ যুক্ত থাকা চাই।

মহাপ্রভুর মতে শুদ্ধা ভক্তি যথেষ্ট।

বিষ্ণুস্বামী, মাধ্ব, নিম্বার্ক—সকল ধর্মনেতার কাছ থেকেই মহাপ্রভু ঋণ গ্রহণ করেছেন। "তবু মহাপ্রভুর মত তাঁরই নিজস্ব। বাংলা দেশের প্রাচীন বৈষ্ণব ভাবের উপরই তাঁর প্রতিষ্ঠা।"[৬]

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের এই উক্তি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য কি না, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যে গৌড়ের বিশিষ্টতা নিয়ে ফুটে উঠেছে, এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই কারণে চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মকে দেশ বিদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব দীর্ঘকাল পুরীতে অবস্থান করেছেন, রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেব ও মন্ত্রী রায় রামানন্দ তাঁর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন, এ খবরও ইতিহাসঅনুমোদিত। তবু ওড়িশী বৈষ্ণব ধর্মের একটি পৃথক্ চরিত্র আছে। "বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব উড়িষ্যায় যথেষ্ট পড়িয়াছে। পূর্ব হইতেই উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্মে প্রবণতা ছিল, মহাপ্রভু দীর্ঘকাল পুরীতে বাস করিয়া তাহাকে ভিন্ন একটা রূপ দিলেন, ফলে উড়িষ্যার বৈষ্ণব ধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম দুই স্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান উপজীব্য উক্ত মহাগ্রন্থের দশম স্কন্ধ। একটিতে ভক্তির প্রাবল্য, অন্যটি জ্ঞানের। একটির প্রাণশক্তি রাধা, অন্যটির বৃন্দা।"[৬ক]

আসামের ভক্তি-আন্দোলনের নেতা হলেন শংকরদেব। অসমীয়া সাহিত্যের জনৈক ঐতিহাসিক শংকরদেবের ওড়িষ্যা ও মিথিলা ভ্রমণের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে বলেছেন যে ঐ দুই দেশের প্রভাব শংকরদেবের মানস-ক্ষেত্রে গভীরভাবে

পড়েছিল।[৭] তারপর মহাপ্রভু যখন শ্রীহট্ট পরিভ্রমণে যান, তখন তাঁর সঙ্গে শংকরদেবের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, এই রকম প্রসিদ্ধি আছে। দৈত্যারি-পণ্ডিতের সাক্ষ্য স্মরণীয়। কিন্তু অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মের কোন ইতিহাস-গ্রন্থে চৈতন্যপ্রভুর প্রভাব স্বীকৃত হয়নি।[৭ক]

অসমীয়া বৈষ্ণব ধর্মও ভাগবত-অনুগত; কিন্তু শংকরদেব রামায়ণকথাও অসমীয়া ভাষায় পরিবেশন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মত অসমীয়া বৈষ্ণবগণ ভাগবতের দশম স্কন্ধকেই কেবল প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করলেন না। ভক্তি-আন্দোলন প্রদেশ ভেদে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করেছে, এ ধরনের অতি সরল সিদ্ধান্তে অবতরণ করা হয়ত যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু গৌড়ীয় বা ওড়িশী বা মহারাষ্ট্রী ভক্তি-আন্দোলন যে একশ্রেণীর নয়, এ বিষয়ে আজ আর মতদ্বৈধ নেই।

ভক্তি-আন্দোলন ও সাহিত্য

সারা ভারতে ভক্তি-আন্দোলনের প্রধান বাহন হোল পদাবলী সাহিত্য। ভক্তি-আন্দোলন নাটকের মাধ্যমেও আত্মপ্রকাশের পথ করে নেয়। পদাবলী ও নাট্যসাহিত্যের মধ্যে বিভেদের রেখা তখনও এত প্রকট হয়নি; ভক্তি-নাটক গীতিকাব্যধর্মী। মিথিলায়, ওড়িষ্যায়, আসামে ও বাংলাদেশে বৈষ্ণব মহাজনেরা নাটকের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য প্রচার করতে থাকেন। এই নাট্যসাহিত্য ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন সম্পূর্ণ মেনে চলেনি। কথাবস্তু নির্বাচনে, চরিত্র রূপায়ণে এবং নাটকের গাঁথুনিতে তাঁরা একটি স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করেন। ভক্তিবাদই এগুলিকে ধ্রুপদী নাটক থেকে ভিন্ন করেছে।

ভক্তি-প্রভাবিত নাট্যসাহিত্যের একটি বড় অংশ ভাষায় লিখিত হয়েছিল। ভক্তি-নাটকের বিশিষ্ট রূপ মিথিলায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই নাটকের সংলাপ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত, কিন্তু গীত-অংশ মৈথিলীতে রচিত। এ নাটকগুলিকে 'কীর্তনীয়ানাটক' বলা হয়।

আসামে কীর্তনীয়ানাটক আত্মপ্রকাশ করে অন্য নামে; সেখানে এই নাটকগুলিকে বলা হয় 'অংকীয়া নাট'। এই নাটকগুলির নান্দী ও প্ররোচনা অংশ শুধু সংস্কৃত ভাষায় রচিত, গানগুলি ব্রজবুলিতে রচিত।

ওড়িষ্যায় সংস্কৃতে একটি নাটক পাওয়া যাচ্ছে—এই নাটকের গানগুলি জয়দেবের অনুসরণে রচিত।

বাংলাদেশে ভক্তি-আন্দোলনে নাটকের চরিত্র বদলে যায়। ভক্তি-প্রভাবিত নাট্যসাহিত্যের একটি বড় অংশ সংস্কৃত ভাষার মধ্যে বদ্ধ রয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এ নাটকগুলি সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেনি। কথাবস্তু নির্বাচনে ও নাটক-গ্রন্থনায় স্বতন্ত্র বোধ দেখা দিয়েছে। ভাষা-নাটকও একই সময় উদ্ভব লাভ করেছিল, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

কীর্তনীয়া-নাটক

মিথিলায় দুই শ্রেণীর নাটক দেখা যায়—শাস্ত্র-অনুমোদিত নাটক, শাস্ত্র-অননুমোদিত নাটক। শাস্ত্র-অননুমোদিত নাটকেই মিথিলাব বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। মিথিলার এই স্বতন্ত্র নাটকের ধারা চতুর্দশ শতক থেকে দেখা দিতে থাকে—এগুলিকে মিথিলার পণ্ডিতেরা 'কীর্তনীয়া নাটক' নামে অভিহিত করেছেন।

মিথিলার এই বিশেষ জাতীয় নাটক ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে আদর্শ হিসাবে প্রতিভাত হয়। মিথিলা-প্রভাবিত নেপাল রাজদরবারের আশ্রয়ে যে নাটক-সাহিত্য গড়ে ওঠে, তাঁর আদর্শ হোল এই মৈথিলী নাটক।

আসামের 'অংকীয়ানাটে'র উদ্ভবের পিছনেও এই বিশেষ শ্রেণীর মৈথিলী নাটকের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে।

এই নাটকগুলি কোন কোনটি সংস্কৃত বা প্রাকৃত সংলাপ ব্যবহার করেছে ও গীতে প্রাদেশিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, কোন কোনটি শুধু নান্দী বা প্ররোচনায় সংস্কৃত ব্যবহার করেছে; সংলাপ ও গীতে প্রাদেশিক ভাষা বা বৈষ্ণবদের 'সরকারী' ভাষা ব্রজবুলির সাহায্য নিয়েছে।

সংস্কৃত নাটক থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে মিথিলার 'কীর্তনীয়ানাটক'ই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। মিথিলার এই বিশেষ নাট্য-রীতির প্রবর্তক হলেন স্বয়ং বাক্‌পতিরাজ বিদ্যাপতি। গবেষকদের মতে তাঁর 'গোরক্ষ-বিজয় নাটক' প্রথম কীর্তনীয়ানাটক।

'গোরক্ষ-বিজয়' বৈষ্ণব কথাবস্তু নিয়ে রচিত নয়, তবু এই নাটকই হোল প্রথম কীর্তনীয়ানাটক। কারণ এই নাটকেই কীর্তনীয়া নাটকেব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম দেখা মিলেছে। গোরক্ষ-বিজয় সংস্কৃতে রচিত নাটক; কিন্তু সংগীত-গুলি মৈথিলী-আশ্রিত। পদাবলীতে বিদ্যাপতি যেমন অ-বৈষ্ণব ভাববস্তুর প্রশ্রয় ঘটিয়েছেন, এখানেও তেমন উদারতা দেখা যায়। অথচ এই নাট্য রীতিই

বৈষ্ণব ধর্মমত প্রসারে সহায়তা করেছিল। বিদ্যাপতির সমসাময়িক উমাপতি উপাধ্যায় কীর্তনীয়া নাটকের প্রাণধর্মটি প্রথম আবিষ্কার করেন। কবি উমাপতি উপাধ্যায়ের পোষ্টা হলেন মিথিলার রাজা হরিহরদেব। পণ্ডিতাগ্রগণ্য গ্রীয়ার্সনের মতে এই হরিহরদেব হলেন মিথিলার রাজা হরিসিংহদেব। আর একজন গবেষক বলেন, হরিহরদেব "রাজা হরিসিংহদেবকা দুসরা নাম থা।"[৯] কবির আবির্ভাব কাল হোল চতুর্দশ শতক। এই হরিসিংহদেব পরে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

উমাপতি উপাধ্যায় রাজদরবারের বহু সম্মানিত ব্যক্তি; তাঁর উপাধি ছিল "মহামহোপাধ্যায় কবিপণ্ডিতমুখ্য।" কীর্তনীয়া নাটক দেববন্দনামূলক নাটক; দেবতার লীলা প্রকটিত করাই এই নাটক রচনার উদ্দেশ্য—"their main aim was to present dramatic performance in praise of God". এই সব নাটকে কীর্তন পোষকতা পেল; তাই এগুলির নাম কীর্তনীয়া নাটক। অনেকে বলেন কীর্তনীয়া নাটক লোকনাট্যের পরিবর্তিত রূপ; ডাঃ বাসুদেব শরণ অগ্রবালের মতে, "ইস মে জনতা কী রুচি প্রধান থী।"[৯]

এই জাতীয় নাটকে গীতের মত নৃত্যেরও ছিল মুখ্য ভূমিকা। জনৈক প্রবীণ গবেষকের মতে ভোজপুরী বিদেশিয়া নাচের অনুরূপ ছিল এই নাটকের নৃত্যকলা।[১১] বাঙ্গালা দেশের যাত্রা ও গম্ভীরা, মহারাষ্ট্রের ললিতা, মথুরার বাজ ও রামলীলা, গুজরাটের ভবাইএর সঙ্গে কীর্তনীয়ানাটকের সাদৃশ্য আছে বলে উক্ত গবেষক অনুমান করেছেন।

যে সব লোককলার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলিই হোল নাটক-পূর্ব নাট্যানুষ্ঠান। কিন্তু কীর্তনীয়ানাটক নাটক হয়ে উঠেছে আদিমতার অবসান ঘটিয়ে। মিথিলার এই বিশেষ জাতীয় নাটকের সঙ্গে বাংলার বৈষ্ণব যুগের নাট্যসাহিত্যের প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়:

১. মিথিলার নতুন নাটকে কেবল বৃন্দাবনলীলা স্থান পায়নি।

২. মিথিলার নাটকে হরি কিংবা হর যে কোন দেবতা নায়ক হতে পারতেন।

৩. সূচনায় হরি-হর এমনকি মহিষমর্দিনী বা অন্য কোন শাক্ত দেবীর বন্দনা-সঙ্গীতও স্থান পেতে পারে।

কীর্তনীয়া-নাটক গীতিধর্মী নাটক। এই নাটকে কুশীলবের সংখ্যা কম হোত। নায়ক, নায়িকা, সখী, 'বিপট' (বিদূষক), নারদ এই নিয়েই পাত্র-পাত্রীর তালিকা সম্পূর্ণ।

বিদ্যাপতি ও উমাপতি উপাধ্যায় প্রভৃত সম্মানিত নাট্যকার; অন্যান্য খ্যাতিমান নাট্যকার হলেন রামদাস ঝা, রমাপতি উপাধ্যায়, গোবিন্দ, লালকবি, নন্দীপতি প্রভৃতি।

১. রামদাস ঝা—আনন্দ বিজয়।
২. গোবিন্দ—নলচরিত নাটক।
৩. রমাপতি উপাধ্যায়—রুক্মিণীহরণ,
৪. লালকবি—গৌরী স্বয়ম্বর;
৫. নন্দীপতি--শ্রীকৃষ্ণকেলিমালা।

বিভিন্ন নাট্যকারের লিখিত গ্রন্থের তালিকা থেকেই স্পষ্ট হবে যে কীর্তনীয়া নাটকের বিষয় বৈচিত্র্য কতখানি! হর এবং হরি প্রায় তুল্য সম্মান পেয়েছেন। এমন কি এঁদের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও অন্য পৌরাণিক বিষয় নিয়ে কীর্তনীয়া নাটক রচিত হয়েছে। 'গোরক্ষ-বিজয়' রচনা থেকে যে নাট্যধারার সূচনা হয়েছে, সেই ধারায় 'নলচরিত' নাটকের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত নয়। কীর্তনীয়া নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিস্থানীয় গ্রন্থ হোল উমাপতি উপাধ্যায় রচিত 'পারিজাতহরণ নাটক'। নানা পণ্ডিত এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গ্রীয়ার্সন ও পণ্ডিত চৈতনাথ ঝা সম্পাদিত দুইটি সংস্করণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই নাটকের আখ্যান-অংশ হরিবংশ ও মহাভারত থেকে গৃহীত। পারিজাত হোল পঞ্চ দেবতরুর অন্যতম। সমুদ্রমন্থনে এর উৎপত্তি। একে চতুর্দশ রত্নের অন্যতম বলা হয়। ইন্দ্র এই তরু রোপণ করেছিলেন নন্দনকাননে। সত্যভামার প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ এই তরু দ্বারকায় তুলে আনেন; এর জন্য তাঁকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল।

পৌরাণিক এই কাহিনীটি অবলম্বনে উমাপতি এক চমৎকার নাটক তৈরি করেছেন।

প্রথমে মঙ্গলাচরণ; মঙ্গলাচরণ-সঙ্গীতে মহিষাসুর-মর্দিনী ও মধুকৈটভ-মর্দিনীর স্তুতি আছে। ছয় পংক্তিবিশিষ্ট মঙ্গলাচরণের পর নান্দীশ্লোক। প্রথমে চার পংক্তি, তারপর 'অপিচ' বলে আরও চার পংক্তি সংস্কৃত শ্লোক আছে।

আট পংক্তি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তির মধ্যে নান্দী শেষ হয়ে গেল। সূত্রধার নটীকে আহ্বান করলেন। সূত্রধার ও নটীর কথাবার্তা থেকে নাটকের নাম, নাট্যকারের নাম, নাট্যকারের আশ্রয়দাতার নাম জানা গেল। নটী "নটরাগে" একটি গান গাইবার পর নেপথ্যে কর্ণপাত করে বললেন, কিসের যেন শব্দ হচ্ছে! সূত্রধার জানালেন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীসহ আসছেন। শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চে প্রবেশের পূর্বে নেপথ্য থেকে একটি শ্রীকৃষ্ণস্তুতিমূলক গান পরিবেশন করা হল। মালতী রাগে এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রবেশিকা গীত হোল। ইতিমধ্যে নটী ও সূত্রধর প্রস্থান করলেন। এই পর্যন্ত শাস্ত্রীয় আঙ্গিক মোটামুটি অনুসরণ করা হোল। পরিবর্তনটুকু পরে দেখতে পাবো।

শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেই স্বগত-উক্তি করলেন। এই উক্তি একটি সংস্কৃত শ্লোক। এই শ্লোকে ভূভার হরণের জন্য ও অধর্ম থেকে পরিত্রাণের জন্যই তাঁর জন্ম, এই কথা বললেন।

প্রকাশ্যে তিনি রুক্মিণীকে বসন্তের শোভা নিরীক্ষণ করতে বললেন। গদ্যে এই কথা বলার পর বসন্তরাগে একটি গীত হোল। কথাগুলি সংস্কৃতে হচ্ছে—গানগুলি চলছে মৈথিলীতে। এই সময় নারদ প্রবেশ করলেন, তাঁর প্রবেশের পূর্বেও নেপথ্য থেকে একটি 'প্রবেশিকা' হোল। সেটি 'বরাড়ী রাগে' গীত হোল। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে দেখতে পেয়ে নারদ সহর্ষে বললেন, যোগিরা যে চরণ দর্শনে অসমর্থ, আমি তা দেখতে পেলাম। আমি আজ কৃতকৃতার্থ। এর পর সখী আসবেন; তিনি অবশ্য প্রাকৃতে কথাবার্তা বলবেন; দৌবারিক আসবেন; পরে সত্যভামা আসবেন। শেষের দুজন সংস্কৃতে কথা বললেন।

পারিজাত ফুলের গন্ধ সত্যভামার নাসারন্ধ্রে ঢুকলে তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়বেন। মূর্ছা ভাঙ্গার পরে তিনি সঙ্গীতের সহায়তায় বলবেন,

মাধব করহ হমর সমাধানে।
দেহ মোহি পারিজাত তরু আনে॥

সুভদ্রা এলেন, ধনঞ্জয় এলেন। পারিজাত তরুর জন্য দরবার হোল। কিন্তু ইন্দ্র বিনাযুদ্ধে পারিজাত তরু দেবেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত তরু হরণের জন্য নিষ্ক্রান্ত হলেন; কিছুক্ষণ পরে নারদ এসে শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধের একটি বর্ণনা দিলেন বসন্ত রাগে। ঐরাবতের সওয়ার হয়ে পুত্র জয়ন্তকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র ধনুক হাতে যুদ্ধ করতে এলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ দেখবার জন্য দেবতারা পর্যন্ত হাজিরা দিলেন; অন্যপর কা কথা স্বয়ং

গিরীশ-গৌরী এসে হাজির হলেন এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করতে। নারদ একটি সুন্দর যুদ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন। এবং এই বর্ণনা ভাষা ও ছন্দের লালিত্যে মৈথিলী সাহিত্যের একটি সম্পদ্। মৈথিলী কোমল ভাষা; কিন্তু সেই কোমল ভাষা এখানে ওজোগুণ সৃষ্টিতে সামান্য সার্থকতা দেখায়নি। বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য় অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে, সেটি অবশ্য অবহট্টে রচিত। নারদের যুদ্ধবর্ণনা শেষ হতে না হতেই গরুড়ের পিঠে চড়ে বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত তরু নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। সত্যভামা পারিজাত তরুর বন্দনা করে 'রাজবিজয় রাগে' গাইলেন—জয় জয় পারিজাত তরু।

নারদ সুভদ্রা ধনঞ্জয়কে নিয়ে একটু রহস্যালাপ করলেন। নারদ সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কিছু 'বার্তালাপে'র পর সকলে মিলে 'ললিত রাগে' গান ধরলেন—(ততঃ সর্বে গায়ন্তি)—

জলধর সময় করথু জল দানে।
ভরলি রহথু ধরণী ধন ধানে॥
ধরম প্রজা পরিপালথু রাজা।
চারু বরষ করথু নিঅ কাজা॥
ইত্যাদি

এই শান্তিবচন বা ভরতবাক্য এক অর্থে আশ্রয়দাতার স্তুতিও বটে। তারপর আরও একটি সংস্কৃত শ্লোক, এবং নাটক শেষ। নাটকে সর্বশুদ্ধ কুড়িটি গান আছে। গ্রীয়ার্সন এই গানগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এই নাটকেব প্রধান গুণ হচ্ছে এর সঙ্গীতময়তা এবং ঘটনা বিন্যাসের অকৃত্রিম সারল্য। চিরাচরিতভাবে নারদকে রঙ্গরস সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীপ্রেম ও শক্তিমত্তা প্রদর্শনই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। নাটকের কাহিনী কোন অবান্তর মন্তব্যে বা ঘটনায় বিন্দুমাত্র দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়নি।

কাজেই বিষয়বস্তুতে না হলেও বিষয় পরিবেশন-রীতিতে এ-নাটক একটি নতুন নাট্যাদর্শ স্থাপন করেছে।

কীর্তনীয়া নাটকের ভিত্তি হোল লোকনাট্য, গবেষকদের এই মন্তব্য অস্বীকার করা যায় না। মিথিলায় লীলাজাতীয় নাটক পূর্ব-প্রচলিত ছিল। বংশীলীলা, রাসলীলা নৃত্যের মধ্য দিয়ে অভিনীত হোত। সঙ্গীত তার সঙ্গে সহযোগিতা করত।[১১]

'লীলা' লোকনাট্যের উদাহরণ চোখের সম্মুখে রেখে, আর গীতগোবিন্দের রীতিকে আত্মস্থ করে কীর্তনীয়া নাটকের সৃষ্টি। জয়দেব-প্রবর্তিত রীতির প্রভাব এখানে দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু বিষয়ে এই নাটক সম্পূর্ণ গীতগোবিন্দ অনুসারী হতে পারেনি। গীতগোবিন্দে পুরোপুরি বৃন্দাবনলীলা রূপায়িত। কীর্তনীয়ানাটক রচনাকারীদের মধ্যে অনেকে বৃন্দাবনলীলা অবলম্বন করেছেন, সকলে নন্। আসামের অংকীয়া নাটের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁদের যতটা মিল, ওড়িষ্যা ও গৌড় দেশের সঙ্গে ততটা নয়।

ওড়িষ্যার ভক্তিনাটক

ওড়িষ্যায় ভক্তি-মূলক সাহিত্য পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে উঠতে থাকে। শ্রী জে. বি. মোহান্তীর মতে লীলা, যাত্রা ও চম্পু—এই তিন প্রকার নাট্যরীতি ওড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। এই তিন নাট্যকলাকেই তিনি আধুনিক নাটকের পূর্বতন রূপ বলে মন্তব্য করেছেন।[১২] কৈফিয়ত স্বরূপ তিনি যা বলেছেন, তা তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—"With the limitation, that there was no stage for the performance of each of such items, and each of them was mostly in songs, the attempt of the dramatic performance was latent in the minds of their creators."[১৩] শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে স্থানে স্থানে কথোপকথন ও নাটকীয় ভঙ্গী দৃশ্যগোচর হলেও "পূর্ণাবয়ব নাটক আদৌ দেখা যাএ নাহিঁ।"[১৪]

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের অভিমত অনেকটা শ্রীমোহান্তির মতের অনুরূপ। "পৌরাণিক কথাবস্তু আশ্রয় করিয়া 'লীলা' এবং হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া 'সুয়াঙ্গ'—এই দুইটি মিশাইয়া হইত যাত্রা। সে যাত্রায় অবশ্য সুয়াঙ্গের প্রাধান্য থাকিত। কারণ মানুষ বেশির ভাগ হাসিতেই চাহে। আবার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য চিরকাল মানুষের চিত্তবিনোদন করিয়া আসিয়াছে। 'গোটি পুঅ নাট'—একজনের নাচ, কন্যাবেশে বালক নাচিতেছে, গাহিতেছে একটি চৌপদী কখনও বা একজনের জায়গায় দুইজনের নাচ। কেলা-কেলুনী নাট, ধোপা-ধোবানী নাট, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া নৃত্য করিত, মুখে থাকিত পৌরাণিক ও ভঞ্জকবির কবিতার দুই একটা টুকরা।"[১৫] অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের এই মতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে,

তিনি নানা যুগের নাট্যপ্রয়াসকে একত্রে দলা পাকিয়ে দিয়েছেন। "গোটি পুঅ নাট"—নিঃসন্দেহে প্রথম যুগে নাটকের নিদর্শন, যখন নাটক ও নৃত্যের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। 'নাটক'শব্দটির অর্থ নাটকও বটে, নৃত্যও বটে। তারই পরবর্তী যুগে এসেছে সুয়াঙ্গ। সুয়াঙ্গ সম্পূর্ণরূপে লোকনাট্য ; প্রধানত 'Pantomime' থেকে সুয়াঙ্গের উৎপত্তি। 'সুয়াঙ্গ' ভাঁড়ামি ও পরানুকরণজাত (caricature)। লীলা হোল মধ্যযুগীয় নাট্যসৃষ্টি, যখন দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য বা পৌরাণিক কাহিনী পরিবেশনের জন্য গীতিনৃত্যবহুল নাটকের আশ্রয় গ্রহণ করা হোত। এ নাটক প্রকৃত পক্ষে বাংলা নাটগীতিব অনুরূপ। নৃত্য ছিল "integral part of Oriya drama ।"[১৫ক]

ওড়িষ্যায় ওড়িশী ভাষায় মধ্যযুগের কোন লিখিত নাটক পাওয়া যায় না। পাথরের ওপর হৃদয়-আবেগ চিরস্থায়ী করে রাখতে তাঁরা যত অভ্যস্ত, যত উৎসাহী, সম্ভবত তালপত্রে তত উৎসাহী নন। অথচ 'লীলা' নাটক ওড়িষ্যার ভক্তি-আন্দোলন প্রসারে সহায়তা করেছিল। হতে পারে সেগুলি ছিল তাৎক্ষণিক নাটক, পূর্বাহ্নে লিখিত কোন নাটক নয়। ভক্তি-আন্দোলন ওড়িষ্যায় যখন প্রবল আকার ধারণ করছে, তখনকার লেখা একটি সংস্কৃত নাটক পাওয়া গেছে। এই নাটকটি বিশ্লেষণ করলে ওড়িষ্যায় ভক্তি-নাটকের চরিত্র বোঝা যাবে। আমরা রায় রামানন্দ রচিত 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র কথা বলছি।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ দামোদর সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায়, শুনি পরমানন্দ ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড, ৫ অধ্যায়)

'জগন্নাথবল্লভনাটক' শুধু ওড়িষ্যায় নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছেও অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর অমর গ্রন্থের মধ্যলীলায় একাধিকবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'জগন্নাথবল্লভনাটক' থেকে। শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে এই গ্রন্থ থেকে দুইটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। 'শ্রীমদ্‌ভাগবত', রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', 'উজ্জ্বল নীলমণি', 'পদ্যাবলী', কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' প্রভৃতির মতই এই

গ্রন্থ বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের কাছে অতিশয় আদরণীয় ছিল। কবি লোচন-দাস এই নাটকের এক বিশেষ অনুবাদ রচনা করেছিলেন। ঠিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। একই ধরনের প্রয়াস যদুনন্দন দাসের 'বিদগ্ধমাধব,' 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদী' ও প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব পুরীর গম্ভীরা মন্দিরের নিভৃতকক্ষে বসে এই নাটকের রসাস্বাদন করতেন।

এই নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথমে তিনটি স্তোত্র, এর মধ্যে কোন চৈতন্য-বন্দনা নেই। তিনটি স্তোত্র উচ্চারিত হবার পরে 'নট রাগেন গীয়তে' বলে একটি গীত হোল। তারপর নান্দ্যন্তে সূত্রধার নটীকে আহ্বান করলেন; সূত্রধার ও নটীর কাছ থেকে নাটকের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

প্রথম অঙ্কে রাধার পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাব মন বুঝবার চেষ্টা, এবং তাঁর অনুরাগের গভীরতা পবিমাপ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে ভাবপ্রকাশ, অর্থাৎ শ্রীরাধিকার মনোভাব বোঝা গেল। চতুর্থ অঙ্কে শ্রীরাধিকা চললেন অভিসারে, পঞ্চম অঙ্কে অভিসারের শেষে হোল সম্ভোগ।

তবে নাট্যকার সম্ভোগ মঞ্চে দেখাননি; মদনিকা নাম্নী এক সখী লতাকুঞ্জের আড়াল থেকে বিগত রজনীর রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ কবেছিলেন। তাঁরই মুখ দিয়ে সম্ভোগ বর্ণিত হয়েছে। ধ্রুপদী নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসন ছিল কোন কোন বিষয় মঞ্চে উপস্থিত করা যাবে না। ভক্তি-নাট্যকারগণও এই অনুশাসন মেনে চলেছেন। সম্ভোগ শেষে রাধা অসংবৃত অবস্থায় মঞ্চে প্রবেশ করেছেন "তা কধং উচ্চারিদ সরীরা গম্মিস্‌সং" —তবে ঐটুকুই। ওর বেশি আর কোন ইঙ্গিত নেই।

এ নাটকে ঠিক বিদূষক নেই, আছেন নর্মসুহৃদ। স্টেন কনো বলেছিলেন, "It is also characteristic that the Vidusaka in the classical period appears in those very dramas, which borrow their materials not from the main plot of the old epics or have freely invented them according to the pattern of life."

তিনি আরও বলেছেন······in the Rama dramas, the figure of the Vidusaka has not been naturalised."[১৬]

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসুহৃদ মধুমঙ্গল এখানে নর্মসুহৃদ হিসাবে কিছুটা হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। এই নাটকে সূত্রধার গদ্য ও পদ্যে কথা বলেছেন। বিদূষক ব্যতীত পুরুষ-চরিত্র সংস্কৃতে কথা বলেছে। নটী প্রাকৃতে কথা বলেছে। গানগুলি জয়দেবের অনুসরণে লেখা। কোন্ গান কোন্ সুরে গেয়, তার নির্দেশ আছে।

এই নাটকে বৃন্দাবন লীলা-মাধুরী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব নাট্যসাহিত্যেব সঙ্গে তাব ছোটখাট পার্থক্য আছে। ভক্তিবাদ প্রবল ভাবে প্রকাশ পেলেও নাটকের শেষে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মধুর লীলার প্রকাশনার পর ঐশ্বর্য লীলার প্রকাশ দেখালেন। ফলে এই নাটকের দ্যোতনা গৌড়ীয় প্রেমধর্ম থেকে একটু পৃথক্ হয়ে গেছে।

রূপ গোস্বামী যে বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হোলে শুধু ললিতগুণসম্পন্ন হলেই চলবে, এখানে তার সামান্য ব্যত্যয় দেখতে পাই। অবশ্য রূপ গোস্বামীব 'নাটক চন্দ্রিকা' নামক সন্দর্ভগ্রন্থ ও 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত-মাধব' নামক নাটকদ্বয় লিখিত হবার পূর্বেই রায় রামানন্দের নাটক লিখিত হয়েছিল।

ভক্তি-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রচনা হল 'জগন্নাথবল্লভনাটক'।

মনে বাখা উচিত প্রখ্যাত 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ কবিরাজ ওডিষ্যাব অধিবাসী ছিলেন। তিনি চতুর্দশ শতকে আবির্ভূত হন। বায় বামানন্দ এখানে বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুজ্ঞা আদৌ মেনে চলেননি। অবশ্য এব জন্য তাঁকে সদর্পে বলতে হয়নি, **"I shall not bow down to Viswanatha of Sahitya Darpana."** নাটকের শুরুতে দেখতে পাই তিনটি সংস্কৃত শ্লোক, প্রত্যেকটি শ্লোক চারটি চরণে সম্পূর্ণ। "নান্দ্যান্তে অলমতি বিস্তরেণ" বলার পর সূত্রধার নটীকে আহ্বান করবেন। নট সূত্রধারের কথাবার্তার পর নাটক শুরু হয়ে যাবে।

এইভাবে শ্লোক, গদ্যপদ্য সংলাপ ও গীতের সহায়তায় নাটক অগ্রসর হয়ে চলেছে। শ্লোকের সার্থকতা হোল নাটকের ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করায়। এই পদ্ধতি পূর্বেও ব্যবহৃত হয়েছে, পরেও ব্যবহৃত হবে।

'জগন্নাথবল্লভনাটক' পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের সম্মুখে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। এবং নাট্যকার রামানন্দ স্বয়ং ছিলেন সেই অভিনয়ের শিক্ষক ও প্রযোজক।

দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে নিপুণ সেই বয়সে কিশোরী।
তাহা দোঁহা লঞা যায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্তনে॥

*　　　　*　　　　*　　　　*

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতার গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী সাত্ত্বিক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখেনেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥
ভাব প্রকট লাস্য রায় যে শিক্ষায়।
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়॥

—চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ড, ৫ম।

এই অভিনয় এক বিশেষ ছাঁদের 'অভিনয়', যার সঙ্গে চৈতন্যউদ্ভাবিত অভিনয়-কলার সাদৃশ্য আছে। "নিজ নাটক গীতের গান শিক্ষায় নর্তনে" এবং "তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল"—এই দুইটি পংক্তি মনোযোগ সহকারে পঠনীয়। আর এই অভিনয় প্রদর্শিত হয়েছিল জগন্নাথ বিগ্রহের সম্মুখে। কাজেই সেদিনকার রঙ্গমঞ্চ হোল দেবমন্দির।

নাট্যসাহিত্যের আদিপর্বে নৃত্য আর অভিনয় সমার্থক ছিল। নাটগীতি আসলে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে অভিনয়। চর্যার 'বুদ্ধ নাটক' থেকেই এই বিশিষ্ট রীতির সূত্রপাত, পদ্মাবতী-চরণ-চারণচক্রবর্তী জয়দেবে তারই মধ্যবর্তী রূপ, আর মিথিলা, ওড়িষ্যা, গৌড়দেশ ও আসামের নাট্য-সাহিত্যে সেই একই আঙ্গিক সমৃদ্ধতর রূপ পেয়েছে।

'জগন্নাথবল্লভনাটক' তার গীতিবাহুল্যের জন্য নয়, তার রস-নিষ্পত্তির জন্যই প্রশংসার্হ। আলোচ্য নাটকটি রূপ গোস্বামীর পূর্ববর্তী নাটক। মিথিলার প্রভাব কতটা ওড়িষ্যায় পড়েছিল, সে প্রশ্ন আজও মীমাংসিত হয়নি। কিন্তু একথা ঠিক ওড়িষ্যার এই ভক্তিবাদী নাটক সর্বভারতীয় নবীন নাটক রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। চৈতন্যপরিকর রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব' "ললিতমাধবে'র নাট্য-গ্রন্থনায় 'জগন্নাথবল্লভনাটক' থেকে বহু ইশারা গ্রহণ করেছেন। 'জগন্নাথবল্লভনাটক' সংস্কৃতে রচিত নাটক; কিন্তু তার মধ্যে ভাষা-নাটকের বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান।

অংকীয়া নাটক

আসামে ভক্তি-আন্দোলনের প্রধান প্রচারক হলেন শ্রীশংকরদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব। শ্রীশংকরদেব ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক, উভয়ের মধ্যে একবার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

শংকরদেব মিথিলা ও ওড়িষ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। অসমীয়া সাহিত্যের জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, **Sankardeva might have seized the idea of writing dramas during his extensive travels in Behar and Orissa having seen enactment of Vidyapati's dramas, the Assamese poet being much junior in age of his Maithili contemporary."**[১৭] শংকরদেবের নাটকে আসাম-বহির্ভূত নাট্যকলার প্রভাবের পরিমাণ লঘু করা উচিত নয়। তবে আসামের লোক-নাট্যকলার প্রভাবও স্বীকার করতে হবে। নাটক সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে; নাটক নানাভাবে নানা জাতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আসামের দেবমন্দিরে এক জাতীয় নৃত্য প্রচলিত ছিল। অংকীয়া নাটের উদ্ভবে তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক সম্প্রতি স্বীকার করেছেন। 'সাহিত্য একাডেমী' থেকে প্রকাশিত অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ডাঃ বড়ুয়া বলছেন যে, আসামের ওজা-পলি (Oja-Pali) নৃত্য-অনুষ্ঠান অংকীয়া নাট উদ্ভবে সহায়তা করেছিল। ডঃ বড়ুয়া প্রাক্-বৈষ্ণব নৃত্যকলার নানা শাখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে পুরাণ-পাঠ, ওজা-পলি নৃত্য ও ভারতের অন্যান্য অংশে প্রচলিত নাটগীতি 'অংকীয়া নাটে'র বিকাশে মিলিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[১৭ক]

ঐতিহাসিকের অভিমত যে, বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা তাঁদের ধর্মমত প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাকাব্য ও ভাগবতপুরাণের কাহিনী অভিনয় করে দেখাতে চেয়েছিলেন। সম্ভবত তাঁরা মূক অভিনয় প্রবর্তন করেছিলেন।[১৮] আসামের দেওধানী-নাচ, পুতুল-নাচ, ওজা-পলি নাচ—এ সবই তখন নাট্য-অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়েছিল।

'অংকীয়া নাট' সংকলনগ্রন্থে মোট পনেরখানি নাটক স্থান পেয়েছে—শংকরদেব লিখিত ছয়খানি, মাধবদেব লিখিত আটখানি আর গোপালদেব লিখিত একখানি। শংকরদেব রচিত নাটকগুলির নাম :—

১. কালিদমন।

২. রামবিজয় বা সীতা স্বয়ম্বর।

৩. কেলি গোপাল।

৪. পত্নী প্রসাদ।

৫. পারিজাত হরণ।

৬. রুক্মিণী হরণ।

মাধবদেব লিখিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক। তাঁর লেখা নাটকসমূহের মধ্যে 'ভোজন ব্যবহার', 'অর্জুন ভঞ্জন', 'পিম্পরা গুছুয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপালদেবের একখানি মাত্র নাটক স্থান পেয়েছে; নাটকখানি সুলিখিত।

এই 'অংকীয়া নাটে'ই যাত্রা শব্দের প্রথম ব্যবহার দেখা গেল—যেমন 'কালিদমন' নাটকের সূচনায় সূত্রধার বলেছে "কালিদমন লীলাযাত্রা পরম কৌতুকে করব।" 'অর্জুনভঞ্জন' নাটকের শেষে বলা হয়েছে—"ইতি অর্জুন ভঞ্জননামযাত্রা সম্পূর্ণম্।" গোপালদেবের একটি মাত্র নাটক—তার নাম 'জন্মযাত্রা'। শেষোক্ত 'যাত্রা' অবশ্য উৎসব অর্থে ব্যবহৃত।

'অঙ্কীয়া নাট'গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অনেকগুলি 'নাটে'ই উপস্থাপিত কুশীলবেরা বিশেষ কিছু কথা বলেনি; কথা যা বলবার, সূত্রধারই বলেছেন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের জনৈক ঐতিহাসিক যখন বলেন,

"From a blending of the recitation of the epic legends, illustrated through shadow images and the art of old mimes the Indian drama has come into existence."—প্রাদেশিক নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা-কালে এই মন্তব্যের সার্থকতা খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না।

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে এই প্রকার আবৃত্তি ও মূকাভিনয়ের কথা মনে রাখতে হবে।

শংকরদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গ যখন ভক্তিধর্ম প্রচার শুরু করেন, তখন আসামে তান্ত্রিক ধর্মের ছিল প্রভূত প্রতিপত্তি। আসামের সারা ভূখণ্ড জুড়ে তান্ত্রিক আচার ব্যবহার খুবই অনুসৃত হোত। এই তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য পাঁচালী কথকতা কীর্তন অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত ও সক্রিয় পন্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

এই নাটকগুলিতে গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে। আর মাঝে মাঝে আছে গীত। এ ছাড়া আছে শ্লোক।

সংলাপগুলি গদ্যে লেখা—এর ভাষা হোল পূর্ব হিন্দী মিশ্রিত। মৈথিলী ভাষা সে-যুগের ভক্তিধর্মের সাহিত্যিক ভাষারূপে পরিগণিত হয়েছিল। গানগুলি মৈথিলী পদ মাত্র।

শ্লোকগুলি সংস্কৃত লেখা, এবং প্রত্যেকটি শ্লোক এক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন সমাধা করেছে।

এই নাটকগুলির সংলাপে গদ্যপদ্য ভেদ আছে; আবার পদ্যে যা বলা হয়েছে, গদ্যে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সূত্রধারের ভূমিকা খুব কৌতূহলব্যঞ্জক; সূত্রধার সাধারণত গদ্য ব্যবহার করেছেন। সূত্রধারেব কাজ হোল অবস্থা ব্যাখ্যা করা; দুটি ঘটনার মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকে, তা পূরণ করা; দর্শক যাতে ঘটনার গতি অনুধাবন করতে পারেন, এ ব্যাপারে সহায়তা করা। নাটক শুরু হয়েছে দুইটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক সূত্রধাবের মুখ থেকেই শোনা যাবে; এক একটি শ্লোক স্বতন্ত্র দৃশ্যেব বা পটপরিবর্তনের ভূমিকা হিসাবে কাজ কবেছে।

গোপালদেব এই রীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তিনি সংস্কৃতেব বদলে মৈথিলী শ্লোক প্রয়োগ করেছেন, এবং সেগুলি আবৃত্তি কবেছেন সূত্রধার। গোপালদেব ভাষা-নাটকের রূপ আবও পরিবর্তিত করে দিলেন।

এই 'অংকীয়া নাট' কিভাবে অভিনীত হোত? ডক্টব বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া বলছেন, 'অংকীয়া নাটে'র সম্পূর্ণ কাহিনীটিই নাচেব আকারে অভিব্যক্তি লাভ করত। সূত্রধাব মঞ্চে সর্বক্ষণ উপস্থিত থেকে নাটকের কুশীলবদেব পবিচয় সাধন করিয়ে দিতেন, ঘটনার ফাঁকসমূহ ভ'রে দিতেন।

অভিনেতার নাচের পর নাচ করে চলতেন, অবশ্য বাদ্যের তালে তালে। "Thus it may be said that the Assamese dramatic performance is mostly a play of the limbs, rhythm forming as an essential part."[২০]

নাচের সঙ্গে পাল্লা দিত গীত ও বাদ্য; নাটক শুরু হবার আগে একবাব খোল বা মৃদঙ্গ বাদ্য হোত। অন্যবিধ বাদ্যযন্ত্রও থাকত, কিন্তু খোলই মুখ্য ভূমিকা নিত। নাটকের শেষে আবার ঐকতান বাদ্য হোত। শুধু সূচনায় বা উপসংহারে নয়, দৃশ্যান্তর বোঝাবার জন্য ঐকতান বাদন হোত।

শ্রীচৈতন্য-প্রযোজিত নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োগরীতির সঙ্গে এই অভিনয়-কলার প্রভূত সাদৃশ্য আছে।

এই নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হোত কোথায়? গ্রাম্য 'নামঘরে' 'অংকীয়া নাট' অভিনীত হোত। মঞ্চইতিহাসে একটু পরিবর্তন সূচিত হোল।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্মপ্রচার, ভক্তিবাদ প্রচারই ছিল এই নাট্যানুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অভিনয় অনুষ্ঠিত হোত বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে, যথা জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা, রাসপূর্ণিমা। যাত্রার অপর অর্থ হোল উৎসব। 'অংকীয়া নাট' যাত্রা নামে কেন যে অভিহিত হয়েছে, এর থেকে তা অনুমান করা যায়।

শ্রীশংকরদেবই প্রথম 'কালীয়দমন'-কাহিনী যাত্রার বিষয়ভুক্ত করেন। শ্রীশংকরদেবের 'কালিদমন যাত্রা' অংকীয়া নাটের একটা বিশিষ্ট পালা। শ্রীশংকরদেব 'গীতগোবিন্দে'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের দ্বিতীয় গীতে 'কালিয় বিষধরগঞ্জন' বলে কৃষ্ণকে বন্দনা করা হয়েছে। ভাগবতের এই বিশেষ আখ্যয়িকা জয়দেবের সমর্থন পেয়ে শংকরদেবের নিকটে এসে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" দিয়ে কালিদমন পালা শুরু হোল। প্রথমে সংস্কৃতে চারিচরণের একটি শ্লোক, 'অপিচ' বলে অনুরূপ আর একটি শ্লোক গীত হোল।

সূত্রধার তখন বললেন—উহি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণক পরণাম কয়কেঁহো সভাসদ লোকক সম্বোধি বোল। আবার দুইচরণের একটি সংস্কৃত শ্লোক। এই সময় সূত্রধার নাট-কাহিনীর একটা আভাস দিলেন—আহে সভাসদ লোক, যে পরম পুরুষোত্তম সনাতন নারায়ণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উহি সভামধ্যে কালিদমনলীলা যাত্রা পরম কৌতুকে করব; তাহে সাবধানে দেখহ শুনহ। নিরন্তর হরি বোল।

তাপপর একটি 'ভটিমা' অর্থাৎ প্রশস্তি।

সূত্রধার। আহে সভাসদ লোক, যে জগতক পরমগুরু পরম পুরুষ পুরুষোত্তম সনাতন ব্রহ্মা মহেশ সেবিত চরণ পঙ্কজ নারায়ণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ উহি সভামধ্যে কালিদমন নাম লীলাযাত্রা কৌতুক করব, তাহে দেখহ শুনহ। নিরন্তর হরি বোল হরি। (আকাশক কর্ণ দিয়া)

সখী। আহে সঙ্গী, কোন বাত্ত শুনিয়ে।

সূত্র। সখি, মৃদঙ্গ বংশীধ্বনি শুনি, আঃ মিলল মিলল।

এখানে একটি সংস্কৃত শ্লোক।

সূত্রধার। আহে সামাজিক লোক, হাম্ যে কহল সোহি ঈশ্বর শ্রীগোপাল বৎসপাল সহিতে এথা প্রবেশিক হব, যৈচে লীলা কৌতুক করব, তাহে দেখহ শুনহ, নিরন্তরে হরি বোল হরি।

গীত রাগ সিন্ধুরা একতালী

ধ্রুং। আরত এ কানু সুরভি চরাই।
রঞ্জিত ধেণু বেনু বেণু বজাই॥

পদ। শিরে শিখণ্ডক গণ্ড কুণ্ডল তোলাবে।
উরে হেমহার হিব মঞ্জিব জুবারে॥
বালক বেটি খেলি খেলাইতে যায়।
কহতু শঙ্কর গতি গোবিন্দ গায়॥

সূত্র। ঐচন্ লীলাকেলি কৌতুকে নৃত্য করিতে গোপাল সহিতে শিশু সবঁ কালিহ্রদক সমীপ পাবল। সে বিষময় পানী না জানি পরম পিয়াসে পীড়িত হুয়া সবাহি হ্রদব জল উদর ভরি পান করল। তত্তকালে দোর্কোর বিষজ্বালা পানীয়ে চেতনা হরল। শবীর কম্পি কম্পি প্রাণ চাবি বৎস, বৎসপাল সব কালিন্দীতীরে পারল।

খবব পেয়ে উৎকণ্ঠিত বলোভদ্র ও জননী যশোদা এলেন। কিন্তু যা কিছু কথাবার্তা সূত্রধাবই বলছেন। শ্লোক, গদ্য সংলাপ, গীত—সবই চলছে। যশোদা ও বলোভদ্র একবাব মাত্র কথা বললেন, নইলে তাঁবাও নীরব দর্শক। এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ কালিনাগের মাথায় নৃত্য কর্তে শুরু করলেন। এতে কালিনাগ মৃতপ্রায় হলে তাব স্ত্রীগণ কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা একবার মাত্র কথা বলেছেন —সে উক্তিতেও কৃষ্ণেব স্তুতি। কালিনাগেরও একটিমাত্র সংলাপ আছে। কালিনাগের মস্তকে যিনি আবোহণ কবেছেন, তিনিও কেবল নৃত্যই করেছেন - সেই বিরামহীন নৃত্যেব ফাঁকে দুইবার দুইটি মাত্র সংলাপ শোনা গেছে।

সমগ্র নাট-কাহিনী সূত্রধারেব জবানীতে প্রকাশ পেয়েছে। নাটকের কুশীলবগণ কার্যতঃ **'Pantomime'**-ধরনের অভিনয় করবে। নাটকের যবনিকা নেমে আসবে সূত্রধার কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র ঘোষণাব মধ্য দিয়ে।

পাসণ্ড দণ্ডন মণ্ডন ভকতক
হবিরস রসিক সুবশে।
কালি দমন ওহি বরনাটক
শংকর হরিগুণ গানে।

কালিদমন প্রকৃত পক্ষে নৃত্যনাট্য ; একে মূকাভিনয় ও নাট্যাভিনয়ের মধ্যবর্তী স্তরের রচনা বলা যেতে পারে।

'অংকীয়ানাট'-এর সব কয়টি পালা বৃন্দাবন-লীলা নিয়ে রচিত নয়। এখানে রামায়ণকাহিনীও অবলম্বনীয় হয়েছে।

'রামবিজয় নাটক' বা 'সীতা স্বয়ম্বরনাট' অনেকাংশে নাট-আকার প্রাপ্ত। 'কালিদমন' অপেক্ষা উন্নততর রচনা।

'রামবিজয় নাট' এর কথাবস্তু হোল হরধনুর্ভঙ্গ ও পরশুরামের দর্প হরণ। এই নাটকে সংলাপের পরিমাণ বেশি। পূর্বোক্ত নাটকের মত এখানেও দৃশ্যান্তর বুঝান হয়েছে সূত্রধারের উক্তির দ্বারা, যথা—

সূত্রধার—তদন্তর মিথিলাপুর পাই ঋষি সোদর সহিতে শ্রীরামচন্দ্র রাজসভা প্রবেশ করল জনক রাজা উঠি কহো রামলক্ষ্মণ সহিত বিশ্বামিত্র এক আসনে বৈসাই ঋষিত প্রণামি স্তুতি বোলল। অথবা

সূত্রধার—আহে সামাজিক লোক, সখী মদন মঞ্জরী কনকাবতী চন্দ্রমুখী শশিপ্রভা এসব সহিতে সে জনকনন্দিনী সীতা রামক চরণ চিন্তি প্রবেশ করে আওত। তা দেখহ শুনহ নিরন্তর হরি বোল হরি।

রাম কর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ, অযোধ্যা থেকে সে-সংবাদ পেয়ে দশরথের আগমন ; দশরথ পুত্রাদির বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। এরপর তাঁদের স্বদেশে ফেরার পালা। পথে পরশুরাম রুদ্রমূর্তিতে এসে দাঁড়ালেন ; তাঁব কোপের কারণ, রাম কেন হরধনু ভেঙ্গেছে! পিতা দশবথ নবপরিণীতা সীতা সবাই প্রমাদ গণলেন।

প্রথমে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে লড়াই হোল পরশুরামের। পরশুরামের সঙ্গে বিশ্বামিত্র পারবেন কেন? পরশুরাম বিষ্ণুর অংশে 'অজয়বীর্য'। লক্ষ্মণ অগ্রসর হতে চাইলে রাম নিষেধ করলেন। বললেন, তুমি বালক, তুমি অপেক্ষা করো। আমি ওঁর যুদ্ধসাধ মেটাচ্ছি।

রাম ধনুকে টংকার দিতেই পরশুরামের হৃদ্‌কম্প শুরু হোল। তিনি বললেন, হে প্রভো শ্রীরাম, তোঁহো পরম ঈশ্বর। হামু তোহারি অংশ। ইহা না জানি দর্প কয়লো হামাক দোষ মরব গোসাঞি।

ভার্গবের কাতরতা দেখে লক্ষ্মণ হাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

রাম বললেন, হে ভৃগুপতি রাম। হামার পরম অমোঘ বাণ তোহারি বধ নিমিত্ত উদ্যম ভেল। ইহাক সম্বরণ করিতে না পারি। (ওহি বলি

বাণ আকর্ণ পূরল) রামচন্দ্র পরশুরামের স্বর্গ-পথ ছেদন করে দিলেন, প্রাণে মারলেন না। পরশুরাম হৃতদর্প হয়ে গভীর তপোবনে প্রস্থান করলেন।

দশরথ সদলবলে অযোধ্যা প্রবেশ করলেন। কৌশল্যা পুত্র ও পুত্রবধূদের করলেন আশীর্বাদ—সে-আশীর্বাদ নৃত্যসহ অভিব্যক্তি লাভ করল। এরপর মুক্তিমঙ্গল 'ভটিমা' দিয়ে নাটক শেষ হোল।

বস্তুত 'রামবিজয় নাটে' সংলাপ-অংশ মূকাভিনয় থেকে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ শংকরদেবের হাতেই 'নাট'-সাহিত্য নাট্য-সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। গোপালদেবের হাতে যেমন নাটক অধিকতর ভাষা-নাটক হয়ে উঠল। তাঁর 'রুক্মিণী হরণ' ও 'পারিজাত হরণ নাটক 'রামবিজয় নাটে'র মতই সংলাপপ্রধান নাট।

শংকরদেব মিথিলা ও ওড়িষ্যা পরিভ্রমণ করে ওই নাট্যাদর্শ সংগ্রহ করে এনেছিলেন। মিথিলা ও ওডিষ্যার আঙ্গিক তিনি গ্রহণ করেছেন, এবং তা নাটকভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশের বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে এই নাট্যরীতির এক যোগসূত্র তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বদেশীয় রীতিনীতিগুলি তিনি বর্জন করেন কি, ক্ষুণ্ণও করেননি। আসামের বিহু-উৎসব, কামরূপ অঞ্চলের 'ভটিমা' সঙ্গীত প্রভৃতি লোক প্রমোদকলার আঙ্গিক সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। কাজেই তাঁর এই নাটগীতির ভাষায় কৃত্রিমতা থাকলেও, অর্থাৎ মাতৃভাষার পরিবর্তে পূর্ব-হিন্দী মৈথিলীর ব্যবহার থাকলেও এই 'নাট্য'সাহিত্য আসামেরই বিশেষ সাহিত্য।

মাধবদেবের নাট্য-সাহিত্য এই শেষোক্ত পথেই চলেছে—তাঁর 'পিম্পরা গুছুয়া' নাটকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি মূকাভিনয় অপেক্ষা সংলাপের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পূর্বতন নাটকের মত এই নাটকেও সংস্কৃত শ্লোক আছে, গীত আছে। কিন্তু সূত্রধার নেই প্রথমে। নাটক শুরু হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণ ও জনৈক গোপীর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে; এই গোপী শ্রীকৃষ্ণের ননী চুরি ধরে ফেলেছে। সূত্রধার এখানে এসেছেন নাটকের খেইগুলি ধরিয়ে দেবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণও গোপীর কথাবার্তার পর সূত্রধার বলছেন, হে সামাজিক! শ্রীকৃষ্ণ বচন বাণী শুনি গোপী উত্তর নাহি পারল। পরম লজ্জিত হুই পুন শ্রীকৃষ্ণকে যে বোলল তা শুনহ।

গোপী সব বিবরণ মা যশোদাকে জানিয়ে দিল। যশোদা এলেন। যশোদা আর কৃষ্ণের মাঝখানে আবার এসেছে সঙ্গী। সে সখা; কাজেই কৃষ্ণের

দোষ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। শ্রীকৃষ্ণ জননীকে কখনও শাসাচ্ছেন, কখনও বা তাঁর ওপর মান করছেন, এইভাবে বাৎসল্যের রসের বুঁদ সৃষ্টি হচ্ছে। সংলাপ চলছে কখনও পদ্যে, কখনও গদ্যে; সবশেষে সূত্রধারের মুখ থেকে ভরতবাক্য শোনা গেল।

মাধবদেবের 'অর্জুন-ভঞ্জন' পালাতেও একই আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে। মাধবদেবের নাট্যবিষয়বস্তু একটু বিচিত্র; এবং রসসৃষ্টিতেও অধিকতর বৈচিত্র্য আছে। শুধু মধুর রস নয়, বাৎসল্য রসসৃষ্টিতেও তাঁর চমৎকার নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অংকীয়া নাটের বিষয়-বৈচিত্র্যের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি রামলীলাও স্থান পেয়েছে। শুধু ভাগবত নয়, রামায়ণ নয়, মহাভারতও স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনখণ্ড ও দ্বারকাখণ্ড উভয়েরই স্থান হয়েছে।

অংকীয়া নাট অভিনেয় নাটক—সে যুগের অভিনয় ভিন্ন নাটক রচনার রীতি প্রচলিত ছিল না। নাটের অভিনয় স্থল ছিল 'নামঘর'। বাংলাদেশের বারোয়ারী তলার মত। ঐতিহাসিক বলছেন, **"The Nāmghara is the common property of the villages where they meet each evening to listen to the recitations of the sacred scriptures of the Pāthaka and to join the evening prayer. It plays a significant part in the cultural life of the Assamese people."**

'অঙ্কীয়া নাট' অভিনীত হোত মঞ্চ রচনা করে। এমন কি এই মঞ্চে দৃশ্যপটও ব্যবহৃত হোত। জীবনীকার বলেছেন, স্বয়ং শংকরদেব তাঁর 'নাট যাত্রা'র অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট অংকন করেছিলেন।

প্রাদেশিক সাহিত্যে 'অংকীয়া নাটে'ই প্রথম মূকাভিনয় থেকে পুরাপুরি নাট্যাভিনয়ে উত্তরণ ঘটল। অংকীয়া নাটে সূত্রধারের একটি বড় ভূমিকা। নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সূত্রধার ও পূর্বরঙ্গ অবতারিত হয়েছে। কিন্তু সূত্রধার যে সদাসর্বদা মঞ্চে উপস্থিত থাকছেন, তার তো কোন নজির পূর্বে ছিল না। সূত্রধার একাধারে নাট্য-প্রয়োজক ও নাট্য-বিশ্লেষক। ঘটনার অংশ-গুলিকে তিনি জোড়া দিয়ে দিয়ে চলেন। তিনি ভালো নর্তক, ভালো গায়ক, ভালো কথক এবং ভালো বাদকও বটে।

সংলাপ ও গীত অসমীয়া নাটে তুল্যমূল্য পেয়েছে; কিন্তু মুখ্যভূমিকা তখনও নৃত্যের। ঐকতান বাদনের নাটকীয় প্রয়োজন ছিল; দৃশ্য-সূচনা, দৃশ্যান্তর ও

দৃশ্যশেষ মৃদঙ্গ বাদনের মারফত বোঝান হোত। অংকীয়া নাটে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে পূর্ব-হিন্দী বা কৃত্রিম ব্রজবুলি স্থান পেলেও এ নাট্যসাহিত্য প্রাদেশিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ব্রজবুলি বৈষ্ণব সমাজের 'সরকারী' ভাষা—প্রদেশভেদে তার রূপ কিছু পরিবর্তিত হয়। এ ভাষাকে ভিন্‌দেশী ভাষা ব'লে দূরে ঠেলে রাখা সঙ্গত নয়।

'অংকীয়া নাটে' ঘটনার জটিলতা অপেক্ষা ঘটনাব গীতিময়তা প্রধান হয়েছে। ভক্তিভাবের বিকাশ সাধনই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অংকীয়া নাটে ঘটনার ধারাবাহিকতা আছে। চরিত্রচিত্রণ প্রাধান্য পেলেও এক ছত্রে চরিত্র মোটামুটি স্থন্দর ফুটেছে যেমন 'রামবিজয় নাট'-এ পরশুরামচরিত্র।

'যাত্রা' শব্দের প্রথম উল্লেখ পাচ্ছি এই নাটসাহিত্যে। এবং এই শব্দের 'উৎসব' ও 'অভিনয়' এই দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা এখানে সম্পূর্ণপ্রায়। একটি ব্যঞ্জনা অপরটিকে উৎখাত করেনি।

অংকীয়া নাট 'যাত্রা' নামে অভিহিত হলেও দৃশ্যপটের ব্যবহার ছিল। এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্তুত অংকীয়া নাটের 'ভাবনা' শুধু আসামের কেন সকল প্রাদেশিক সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

গৌড়ীয় নাটক ঃ কৃষ্ণলীলা-আশ্রিত

গঙ্গাচরণ সরকার ১২৮৬ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮-৭৯) ঢাকা কলেজ ভবনে 'বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গভাষা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "বঙ্গভাষায় পূর্বে কোন দৃশ্যকাব্য দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গভাষায় বহুকাল যাবৎ বহুবিধ যাত্রা অভিনীত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সে সকল যাত্রা কোন রচিত নাটকের অভিনয় নহে, তত্তাবৎ নাটকের নিয়মে অভিনীত নহে।"

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই উক্তির মূল্য প্রণিধান করা যায়।

অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মত বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশেও ভক্তি-আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা আছে।

বাংলা দেশেও ভক্তি-আন্দোলন প্রচলিত আচারবাদী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে দেখা দেয়। এখানেও শাস্ত্র ও আচার অপেক্ষা মানব-হৃদয়ের নির্দেশ অধিকতর শ্রেয় অনুভূত হোল। "বিধিধর্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" (চৈ.চ. মধ্য. ২২শ)। তাদের শ্রেয় হোল রাগানুরাগাভক্তি—আর "শাস্ত্র যুক্তি নাহি

মানে রাগানুরাগার প্রকৃতি।" (চৈ. চ. মধ্য ২২) এবং এই কারণেই "তর্কের গোচরে নহে নামের মহত্ত্ব।" অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানে democratisation বেশি হোল। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত বৈষ্ণব দাসউপাধি গ্রহণ করলেন; আর শূদ্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু হলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি ও নাট্যকারগণ মহাপ্রভুর রস-চেতনা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত হোল তাঁদের সাহিত্যিক রচনার প্রধান উৎস। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাই প্রাধান্য পেয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যজগতের প্রধান পুরুষ হলেন রূপ গোস্বামী। তিনিই গৌড়ীয় রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী, আবার তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব রস সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক; তবে তাঁর আশ্রিত ভাষা হোল সংস্কৃত।

বাংলাদেশে বৈষ্ণব ভবরস দীর্ঘকাল ধরে ঘনীভূত হচ্ছিল। চৈতন্য-আবির্ভাব-পূর্ব যুগেও এখানকার সাহিত্য বৈষ্ণব ভাববস্তুর আভাস সুস্পষ্ট ছিল। ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে হরিচরণে অঞ্জলি দিয়ে কাব্য শুরু হয়েছে। 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে' ও কবি ক্ষেমেন্দ্ররচিত 'দশাবতার চরিতে' বৈষ্ণবীয় ভাব-ব্যঞ্জনা উপস্থিত। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ, সদুক্তি কর্ণামৃত, রূপ গোস্বামী সম্পাদিত পদ্যাবলীতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক প্রচুর পদ দেখা যায়। ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে নানা কাব্য ও নাটক লিখিত হতে থাকে। চৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবে সেই ভাবজগৎ যেন নতুন তাৎপর্য লাভ করল।

রূপ গোস্বামীর সাহিত্য-কৃতি বিশ্লেষণ করলেই এই তাৎপর্যের স্বরূপ কিছুটা ধরা পড়বে। রূপ গোস্বামী গৌড়ের নবাব সরকারের চাকুরীকালে বৈষ্ণব কাহিনীসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—সেগুলি ছিল দূতকাব্য—হংস দূত. উদ্ধব সন্দেশ। ভিতরে ভিতরে একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই চলছিল; কিন্তু চৈতন্য-সান্নিধ্যে আসার পর এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর রূপ গোস্বামীর সাহিত্যের প্রকৃতিই গেল বদলে।

বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃতে নাটক রচনার ঐতিহ্য আমরা পূর্বেই বিবৃত করেছি। কিন্তু চৈতন্য-পরবর্তী বাংলায় লিখিত সংস্কৃত নাটক বাঙ্গালীরই নাটক এগুলি ভারতীয় নাটকের অনুকৃতি নয়।

রূপ গোস্বামী লিখিত 'দানকেলিকৌমুদী' একটি একাঙ্ক নাটক: সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের ভাষায় একে ভাণিকা শ্রেণীর 'উপরূপক' বলা যায়।

একদা রাধার পথ অবরোধ করে দাঁড়ালেন নন্দের দুলাল; বললেন এ বন তাঁর অধিকারভুক্ত। অতএব শুল্ক দিতে হবে। তখন পৌর্ণমাসী নাম্নী দূতী শ্রীমতী রাধাকেই শুল্ক স্বরূপ দান করার প্রস্তাব করলেন। এদিকে শ্রীমতী তাঁকে কৃষ্ণহস্তে সমর্পণ না করার জন্য অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন। রাধার উক্তি দ্ব্যর্থ বোধক—

ভ্রাম্যত্যেষ গিরেঃ কুরঙ্গকুহরে কৃষ্ণোভুজঙ্গাশ্রেণীঃ
স্পৃষ্টো যেন জনঃ প্রয়াতি বিষমাং কামর্পাসাধ্যাংদশাম্।
না ভদ্রং ন চ ভদ্রমাকলয়িতং শক্তাস্মিদৃষ্টিচ্ছটা
মাত্রেণাস্য হতাহমিচ্ছসি কুতঃ প্রক্ষেপ্তুমত্রাপিসাম্।

শ্লেষাত্মক এই পদটিতে রাধার বাক্‌চাতুর্য প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকখানিতে প্রচলিত নাট্যবিধি মোটামুটি অনুসরণ করা হয়েছে, এবং ভাষার ক্ষেত্রেও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলিত কলাকৌশল (conceits) ব্যবহার করা হয়েছে। তবে বিষয়বস্তুতে একটা পরিবর্তন এসেছে; সম্পূর্ণভাবে বৃন্দাবনলীলা-নির্ভর হোল এই নাটক।

দানকেলিকৌমুদী নাটকে চৈতন্যবন্দনা নেই, দুইটি নান্দী শ্লোক চারি পংক্তিবিশিষ্ট।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার ও নটের কথাবার্তা। এখানে নটী নেই। আর এই নটকেই 'নাট্যাচার্য' বলা হয়েছে। মঙ্গলাচরণ আছে এবং তা আবার 'ইত্যঞ্জলিং কৃত্বা'। কুশীলব আসার পূর্বেই তারা মঞ্চ ত্যাগ করবে।

নাটকে কোন গান নেই; শুধু গদ্য সংলাপ আর শ্লোক। কুশীলবের মধ্যে কৃষ্ণ, রাধা, পৌর্ণমাসী, সুবল অর্জুন ও মধুমঙ্গল। মধুমঙ্গলই বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। লীলা বর্ণনাই নাটকের উদ্দেশ্য। নাট্যকারও তাই বলেছেন—

"প্রকটিত ললিতালঙ্কৃত গান্ধর্বেয়ং মহাবিদ্যা"

এইভাবে শুধু মধুর রসে উদ্ভাসিত করে পরম সুন্দর বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক 'বিদগ্ধ মাধব' থেকেই নাট্যরীতির পরিবর্তন ঘটে। গোস্বামী মহাশয় ব্রজলীলা ও পুরলীলা একত্রে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। পরে স্বয়ং সত্যভামা দেবীর নির্দেশে[২১] ও মহাপ্রভুর উপদেশে[২২] ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক্ দুইটি নাটকে প্রকাশ করেন।

'বিদগ্ধ মাধবে'র বিষয়বস্তু 'জগন্নাথবল্লভ নাটকের' অনুরূপ। এই সপ্তাঙ্ক নাটকে পূর্বরাগ থেকে সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্ভোগ পর্যন্ত বাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা নাট্যায়িত হযেছে।

বায় বামানন্দ এবং মহাপ্রভুব সম্মুখে স্বযং নাট্যকাব এই নাটক পাঠ কবেছিলেন।

এত শুনি বায কহে প্রভুব চবণে।
ৰূপেব কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতেব পরে।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তেব সাব॥
প্রেম-পবিপর্শী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্ত-কর্ণেব হয আনন্দ ঘূর্ণন॥

(চৈতন্য চবিতামৃত। অন্ত্য—১ম)

এই জাতীয় বচনাব পিছনে মহাপ্রভুর প্রভাব বিদ্যমান ছিল, একথা রায বামানন্দ ঘোষণা করেছেন—

তোমা শক্তি বিনা জীবে নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিযা কহাও হেন অনুমানি॥

(ঐ, অন্ত্য—১ম)

'বিদগ্ধমাধব' নাটক সপ্তাঙ্কেব নাটক, নাযক পুবাণোক্ত পুরুষ। এই নাযক চবিত্রে অলংকাব শাস্ত্রঅনুযাযী ধীবোদাত্ত গুণ পাওযা যাবে না, পাওযা যাবে ললিত গুণ। 'গীতগোবিন্দে' ধীবোদাত্ত দিযে যাত্রা শুরু করে জযদেব 'ধীব ললিতে' এসে উপনীত হযেছেন। 'জগন্নাথবল্লভনাটকে' বায বামানন্দ ধীব ললিতে যাত্রা আরম্ভ কবে নাটকেব শেষে একটু ধীবোদাত্তের চুমকি পবিবেশন করেছেন। আর উমাপতি উপাধ্যাযেব 'পাবিজাতে হবণ' নাটকে ধীবোদাত্ত ও ললিত গুণ একত্রে চলেছে। কিন্তু 'বিদগ্ধ মাধব' স্বরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধীরললিত গুণেই নাযককে ভূষিত কবেছে। অন্যান্য ভক্তি নাট্যকার থেকে "বিদগ্ধ মাধবে'ব নাট্যকাব কৃষ্ণকথাবস্তুতে এইভাবে একটি মৌলিব পবিবতন সাধিত করলেন। এ তো গেল বসের কথা।

'বিদগ্ধ মাধবে' ৰূপ গোস্বামীর নাট্যরচনাবীতিও অনুধাবনযোগ্য। প্রথমে দুইটি শ্লোক, একটিতে চৈতন্যবন্দনা, তারপর সূত্রধাব ও পারিপার্শ্বিকের কথোপকথন। সূত্রধাবকে 'নাট্টাচার্য' বলা হচ্ছে, সূত্রধার হচ্ছেন 'নতকসামন্ত-

সার্বভোম।' নট-নটী কেউ নেই। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু, নাট্যকারের নাম ও নাটকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। সংলাপ ও গীত পর্য্যায়ক্রমে চলেছে। ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত। পরবর্তী যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম বাগভঙ্গির ছাপও যথেষ্ট আছে। এ-নাটকে হাস্যরস আদৌ নেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব এখানে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে তা আর দেখা যায়নি। এখানে কৃষ্ণ যেটুকু শক্তিমত্তা, তথা ঐশ্বর্য রসেব প্রমাণ দিয়েছেন, সেটুকুও তাঁর 'অভিনয়'। কৃষ্ণ তখন গৌরীর ভূমিকা অভিনয় করছিলেন।

অনেকটা একই প্রকার আঙ্গিকে 'ললিত মাধব' রচিত। 'ললিত মাধব'-এ নান্দীতে চৈতন্যবন্দনা আছে। প্রথমে দুই পংক্তির একটি শ্লোক, তারপর চারি পংক্তির একটি শ্লোক। সূত্রধাব ও নটীব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে নাট্য-বিষয় পরিষ্কার হোল। এখানে পারিপার্শ্বিক ও নটেব বদলে একেবাবে নটীকেই মঞ্চে আনা হয়েছে।

নটী বলেছেন, রঙ্গমঙ্গলসংবিহাণেণ সম্পদং অণহিনিইট্‌ঠমণী সমহি।

সূত্রধর ও নটী প্রস্থান করলে নাটক শুরু হয়েছে। এই নাটকে সংস্কৃত ধ্রুপদী নাটকের রীতিনীতি মান্য করা হয়েছে। তাই অঙ্কমুখ বিষ্কম্ভক ব্যবহার করা হয়েছে। ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে বিষ্কম্ভক ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের কুশীলব সেই পবিচিত নরনারী, তবে সখীর সংখ্যা অনেক বেশি। নাটকের অবয়বও যথেষ্ট বড়ো, একাদশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। মধুমঙ্গল এখানেও বিদূষক বা বয়স্যের ভূমিকা নিয়েছেন।

এই দু খানি নাটক সম্বন্ধে ডঃ দে বলেছেন ? "They do not fall entirely on the literary side, but as specimens of dramatic writing they reveal little sense of what a drama really is. "[২১ক] ডঃ দে 'drama' বলতে যে জাতের নাটক বুঝেছেন, ভক্তিনাটক সে জাতের নাটক নয়। চৈতন্যঅভিনীত নাটকের সঙ্গে কাহিনীগত, ভাবগত ও অঙ্গিকগত সাদৃশ্য এই তিনটি নাটকেরই কেবল দেখতে পাই। পারি-পার্শ্বিকের ব্যবহার পরবর্তী নাটকে চলবে; সূত্রধারের সঙ্গে আর নটনটী থাকছে না।

ঐ নাটকত্রয়ে কোন গীত নেই; সম্ভবত নাট্যশাস্ত্রের বিধান মানার জন্য গান পরিত্যক্ত হয়েছে।

বৃন্দাবন-লীলার তাৎপর্য সমসাময়িক কাব্যের মধ্য দিয়েও দানা বাঁধছিল। জীব গোস্বামীর 'শব্দকল্পদ্রুম' বৃন্দাবন-লীলা বিষয়ক কাব্য; কিন্তু কাব্য না বলে সন্দর্ভ-গ্রন্থ বলাই যুক্তিসঙ্গত—কারণ তত্ত্বকথাই মুখ্য।

জীব গোস্বামীর 'মাধব মহোৎসব' সত্যই একখানি কাব্য—কৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতী রাধিকাকে বৃন্দাবনেশ্বরী রূপে অভিষেক এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়। জীব গোস্বামীর প্রধান গ্রন্থ হোল 'গোপাল চম্পু'—৭০টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। কাব্যের পূর্বার্ধে বৃন্দাবনলীলা ও দ্বিতীয়ার্ধে দ্বারকালীলা স্থান পেয়েছে। 'বিগগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' একত্রে দেখা দিল। জীব গোস্বামী 'গোপাল বিরুদাবলী' নামে আরও একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, তারও প্রতিপাদ্য বিষয় বৃন্দাবনলীলা।

এ ছাড়া কবিকর্ণপুর, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই বৃন্দাবনলীলার অবলম্বনে কাব্যাদি রচনা করেছেন। এইভাবে বাংলা দেশে দ্বারকালীলা কিছু কিছু বর্ণিত হলেও বৃন্দাবনলীলাই কাব্য-নাটকেব মুখ্য কথাবস্তু। একটি বিষয় লক্ষ্য করবার যে, কোথাও কালীয়দমন কাহিনী অভিনন্দন পায়নি। এখন কি বাংলা দেশের স্থাপত্য-শিল্পেও কালীয়দমন কাহিনীর কোন স্থান ছিল না। শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রের পোড়ামাটির মূর্তিগুলির বিবরণে সাতটি কৃষ্ণবিষয়ক নিদর্শন উল্লেখ করেছেন।[২২] সেই সাতটি নিদর্শন হোল এই ঃ

১। দেবকী নবজাত কৃষ্ণকে বসুদেবের হস্তে সমর্পণ করছেন।

২। বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দালয়ে চলেছেন।

৩। কৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্ধন ধারণ।

৪। কৃষ্ণ কর্তৃক দুইটি অর্জুন বৃক্ষ উৎপাটন।

৫। কৃষ্ণ কর্তৃক কেশিদৈত্য নিধন ; বলরাম ও কৃষ্ণের চানূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে লড়াই।

৭। রাধাকৃষ্ণের মিলন।

৮। কংসের মৃত দেহকে টেনে নিয়ে চলেছেন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ।

পাহাড়পুরে কালীয়দমন কাহিনীর কোন স্থান হয়নি ; অথচ মনসামূর্তির প্রবেশাধিকার ঘটেছে। পাহাড়পুর পাল-যুগের স্থাপত্য নিদর্শন। সম্ভবত শেষ অংকের।

সেন যুগে ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে যে সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে— তাতে অনন্ত শয়নের প্রসঙ্গই বেশি। কালীয়দমনের দেখা এ যুগেও মিলছে না। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কালীয়দমন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে।

গৌড়ীয় নাটক : চৈতন্যলীলা-আশ্রিত

নাটকে রাধাকৃষ্ণলীলা চৈতন্য-ভাবনায় প্রবুদ্ধ হয়েই এতটা স্থান অধিকার করেছে। আবার সেই চৈতন্যদেবের অমিয় জীবনকথা শুধু কাব্যের নয়, নাটকেরও বিষয়বস্তু হোল।

বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক ও ঐতিহাসিক নাটকের রচনা-রীতির মধ্যে পার্থক্যসূচক কোন সীমারেখা বজায় রাখা হয় কিনা, এটা একটি পুরাতন বহুআলোচিত প্রশ্ন। জনৈক 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র' চৈতন্যজীবনী অবলম্বনে প্রথম নাটক রচনার গৌরব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাটক আজ লুপ্ত, লুপ্ত হবার হেতু আছে। এ নাটক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পরিপন্থী ছিল, তাই পরিত্যক্ত হয়। নাট্যকারকে যোগ্য বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞের নিকট শিক্ষা লাভ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।[২৩] চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এই নাটকের নান্দীর শ্লোকটি উদ্ধৃত হয়েছে।[২৪]

চৈতন্যদেবের বিশ্বস্ত শিষ্য শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ সেন চৈতন্যদেবের তিরোভাবের কয়েক বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ওড়িষ্যার নৃপতি গজপতি প্রতাপ রুদ্র-এর আদেশে তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা করেছিলেন। চৈতন্য-জীবনী অবলম্বনে এটিই একমাত্র নাটক। সমগ্র নাটকটি সংস্কৃতে রচিত, এমন কি সংগীতগুলিও মৈথিলী আশ্রয় করেনি।

নান্দী পাঠের পর সূত্রধার নাটক রচনার উপলক্ষ্য ও হেতু বর্ণনা করবেন। সূত্রধারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন পারিপার্শ্বিক। মঞ্চে কলি প্রবেশ করলে সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক প্রস্থান করবেন। কলি ও অধর্মের কথোপকথনে নাটকের বক্তব্য ধরা পড়বে। এই দুইটি হল রূপক ও অপ্রাকৃত চরিত্র, এই দুই অ-প্রাকৃত চরিত্র প্রস্থান করলে চৈতন্যদেব, অদ্বৈতপ্রভু, শুক্লাম্বর, শ্রীবাস প্রভৃতি নাটকের মূল চরিত্রগুলি প্রবেশ করবে। ডঃ দে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে'রও কোন নাট্যমূল্য স্বীকার করেননি, "it is not a real drama, but a narrative in the dramatic form"[২৪ক] অথচ সিলভা লেভি একে

"original" ও "powerful drama বলেছেন"।[২৪খ] ডঃ দে ভক্তিনাটকের স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করেন নি।

নাটকের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনা পাশাপাশি চলেছে, একে অপরের ঘাড়ে চড়েনি। কলি, অধর্ম, মৈত্রী, প্রেমভক্তি, বিরাগ, ভক্তিদেবী প্রভৃতি রূপক চরিত্র এই নাটকে স্থান পেয়েছে। আবার নারদ কৃষ্ণের মত পৌবাণিক অলৌকিক চরিত্রও এখানে প্রবেশলাভ করেছে। রূপক চরিত্র দেখে কেউ কেউ মনে করেছেন যে, কৃষ্ণ মিশ্র লিখিত প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র প্রভাব পড়েছে। নামকরণ ও রূপক চরিত্র থেকে এই রূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়।

এই নাটকের মধ্যে আব একখানি নাটক আছে—যেমন দেখতে পাই শ্রীহর্ষের 'প্রিয়দর্শিকা' নাটকে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে চৈতন্যদেবেব অভিনয়-কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যদেব যে নাটকটি অভিনয় করেছিলেন, পুরো সেই 'দানলীলা নাটক' এই নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। নারদ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতী রাধিকাব উপস্থিতি আদৌ বিস্ময়কর বস্তু নয়।

জনৈক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, "উক্ত চরিত্রগুলি ছাড়া নারদ কৃষ্ণ রাধা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র নাটকটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "[২৫] ব্যাপারটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন, পৌরাণিক চরিত্রসমূহকে লৌকিক চরিত্রের মাঝখানে হাজির করা হয়নি। নাটকে রূপক চরিত্র আছে, অপ্রাকৃত ও পৌরাণিক চরিত্র আছে, কিন্তু কোন সময়ই এদেব গুলিয়ে ফেলা হয়নি। রূপক চরিত্র মঞ্চে যতক্ষণ থেকেছে, ততক্ষণ কোন লৌকিক চরিত্র মঞ্চে পদার্পণ করেনি। তেমনি পৌরাণিক চরিত্র দ্বিতীয় নাটক ব্যতীত অন্যত্র দেখা দেয়নি। ১ম অঙ্কে, ২য় অঙ্কে, ৩য় অঙ্কে—সর্বত্রই এই নীতি মেনে চলা হয়েছে।

কবিকর্ণপুর চৈতন্যজীবনীমূলক নাটক লিখতে বসে ঐ কাহিনীর ঐতিহাসিকতা ও প্রত্যক্ষতা কখনও বিস্মৃত হননি। নাটকের অপ্রাকৃত অংশ নাটকের প্রাকৃত অংশের সূচীমুখের কাজ করেছে। দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকে পুরুষ চরিত্র সর্বদাই সংস্কৃতে কথা বলেছে, স্ত্রীচরিত্র অধিকাংশই প্রাকৃতে; যেখানে সংস্কৃতে কথা বলেছে, সেখানে বিষয়ের গুরুত্বের উপর ভাষা ব্যবহার নির্ভর করেছে।

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে যে, চৈতন্যদেব কি কোন লিখিত নাটক অভিনয় করেছিলেন? সম্ভবত চৈতন্যদেবের অভিনীত নাটক লিখিত নাটক নয়,

'extempore' নাটক; অভিনয়স্থলে পাত্রপাত্রীদের মুখেমুখে এই নাটক রচনা করে তুলতে কোন কষ্ট হয়নি, যেহেতু নাটকের কথাবস্তু হোল 'প্রখ্যাত' কথাবস্তু। 'দানলীলা' লিখিত নাটক হলে কোন না কোন জীবনীগ্রন্থে তার উল্লেখ থাকত। লিখিত নাটক না হলেও সেটি যে একখানি পুরো নাটক ছিল, কবিকর্ণপুরের সাক্ষ্যের পর আজ আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কারণ চৈতন্যদেব বলেছিলেন, "আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠছে এই নাটকের ভাষা কি ছিল? যেহেতু মুখেমুখে রচিত নাটক, এই জন্য এর ভাষা ছিল বাংলা। 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক সংস্কৃতে লিখিত নাটক বলে ঐ পালার ওখানে ভাষান্তরণ ঘটেছে। এই নাট্যাভিনয়ের দর্শকদের বোধগম্যতার স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখলে নাটকের ভাষা বাংলা ব্যতীত অন্য কিছু কল্পনা করা যায় না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পুরনারীরাও উপস্থিত ছিলেন। ধ্রুপদী সংস্কৃত নাটকও চলিত ও কথ্য ভাষাকে অস্বীকার করতে পারে নি, এই কারণে প্রাকৃত ভাষাকে নানা অজুহাতে জায়গা করে দিতে হয়েছে। তৃতীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়ের' বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। এই নাটকখানি কি রূপগোস্বামীর 'দানকেলি কৌমুদী' নাটকের ভাষান্তরণ? এ বিষয়ে একটি কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৃন্দাবনলীলার একই বিষয় নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এজন্য কোনদিন কারও মৌলিকতার দাবী ক্ষুণ্ণ হয়নি। তাছাড়া চৈতন্যদেব অভিনয় করেছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে। আর রূপগোস্বামী ঐ নাটক রচনা করেছিলেন চৈতন্যদেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর। সুতরাং চৈতন্য-অভিনীত নাটক কোনক্রমেই রূপগোস্বামী রচিত নাটক হতে পারে না। এই নাটকখানির মধ্যেও ভাষানাটকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করেছে।

নাটকের সূচনা হচ্ছে নেপথ্যে মৃদঙ্গধ্বনি দিয়ে। নান্দীও নেপথ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথমে চারি পংক্তি বিশিষ্ট একটি শ্লোক, 'অপিচ' বলে আবার চারি পংক্তির একটি শ্লোক। হরিদাস সূত্রধারের ভূমিকা নিয়েছেন—"তত প্রবিশতি গৃহীত সূত্রধার ভূমিকো হরিদাসঃ।" হরিদাস কুসুমদ্বারা অঞ্জলি পরিপূর্ণ করে স্তব করল।

মৈথিলী নাটক থেকে এখানে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্য মৈত্রী ও প্রেমভক্তিরও চোখে পড়েছিল।

মৈত্রী। দেবী ণ কৃখুং অঅং সখী অমগ্‌গো।

প্রেম। শ্রূয়তাং। শাস্ত্রীয়ঃ খুলু মার্গঃ পৃথগনুরাগস্য মার্গোহ ন্যঃ

প্রথমোহর্হতি সনিয়মতামনিয়মতামন্তিমো ভজতে॥

এটা বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে যে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী ও অনুরাগের প্রণালী উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা আছে; কারণ শাস্ত্রোক্ত প্রণালী বিবিধ নিয়মের অপেক্ষা করে, কিন্তু অনুরাগপথে নিয়মের কোন আবশ্যকতা নাই।

এই নাটকের সূত্রধার আছে, পারিপার্শ্বিক আছে, এঁদের কথাবার্তার ফলে নাটকের কথাবস্তুর আঁচ পাওয়া গেল—

গৃহীত্বা জরতীভাবং যা দেব্যা যোগমায়য়া

সংপাদ্যতে দানলীলা সৈব রাধামুকুন্দয়োঃ।

প্রকৃত নাটকের সূচনা হোল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি দিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর সখা শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি এলেন, বিদূষক এলেন। এই বিদূষকের সঙ্গে 'জগন্নাথবল্লভ নাটকে'র মধুমঙ্গলের বেশ মিল আছে। নারদ এতক্ষণ অবধি মঞ্চে ছিলেন; গোপিনীরা আসতেই চলে গেলেন, বললেন, আকাশ মার্গে দাঁড়িয়ে তিনি এই লীলা প্রত্যক্ষ করবেন। শ্রীরাধা ও তাঁর সখিগণ জরতীর সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। ফুল তুলছেন আর নৃত্য করছেন। পুরাতন নাটকের কলাকৌশলের ব্যবহার আছে—শ্রীরাধাকে ভ্রমর বিরক্ত করছে, শ্রীমতীর মুখগন্ধে অন্ধ হয়ে বেচারী এই প্রকার আচরণ করছে।

নাটকে গান নেই, গদ্যসংলাপ আর শ্লোক পর্যায়ক্রমে চলেছে। এই নাটকে দৃশ্য ও মঞ্চসজ্জা আছে।

নাটকটি মৈথিলী নাটকের অনুকরণ নয়, বরং সংস্কৃত ধ্রুপদী নাটকের সঙ্গেই এর আন্তরিক মিল, দৃশ্যবিন্যাস, ভাষা ও অলংকার প্রয়োগে প্রথা-আনুগত্য দেখা যায়। শুধু নায়ক-নায়িকার চরিত্র রূপায়ণে ও কথাবস্তুতে পরিবর্তন এসেছে।

ভক্তিনাটক প্রদেশভেদে কিছু স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করেছে; 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের নবম অঙ্কে কবিকর্ণপুর জানিয়েছিলেন:

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা,

লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।

কৃপামৃতানাভিষিষেচ দেব—

স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ।

রূপ-সনাতন বৃন্দাবন-লীলার শ্রেষ্ঠত্ব বঙ্গীয় কাব্যকাননে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান। প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পরে বাংলা কাব্যের এই কোমলতাময় সুর নব্য রুচির লেখকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছিল। (দ্রষ্টব্য— 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধ)

এই ভাবজগৎ সমৃদ্ধতর হোল কাব্য, নাটক, সিদ্ধান্ত-গ্রন্থ, এবং নতুন নাট্য-শাস্ত্র রচনার ফলে।

ভক্তি নাট্যশাস্ত্র

পদ্যাবলীতে রূপ লিখেছিলেন,

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা।
বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

তারই সূত্র ধ'রে 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'নাটক চন্দ্রিকা' বিরচিত হোল। 'নাটক চন্দ্রিকা' বৈষ্ণব ভক্তি-নাট্যসাহিত্যের শাস্ত্রগ্রন্থ।

প্রথমেই বিশ্বনাথ কবিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোল—

বীক্ষ্য ভরতমুনিশাস্ত্রং রসপূর্বসুধাকরঞ্চ রমণীয়ং।
লক্ষণমতিসংক্ষেপাদ্বিলিখ্যতে নাটক স্যেদং॥১॥
নাতীব সঙ্গতত্বাৎ ভরতমুনের্মতবিরোধাচ্চ।
সাহিত্যদর্পণীয়া ন গৃহীতা প্রক্রিয়া প্রায়ঃ॥২॥

মনে রাখা দরকার যে সে যুগে ভরত লোকশ্রুতি মাত্র, আর কবিরাজের ছিল প্রত্যক্ষ প্রভাব। তাই প্রচলিত নাটক ও নাট্যশাস্ত্রের বিরোধিতা করতে হলে 'সাহিত্যদর্পণ'কারের বিরোধিতা অপরিহার্য।

'নাটক চন্দ্রিকায়' ভক্তি-নাটকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হোল—

দিব্যেন দিব্যাদিব্যেন তথাহদিব্যেন বা যুতং।
ধীরেণাঢ্যমুদাত্তেন কৃষ্ণশ্চেল্ললিতেন চ॥ ৩॥
শৃঙ্গার বীরান্যতরমুখ্যং রম্যেহতিবৃত্তযুক।
প্রস্তাবনান্তসম্বদ্ধং সন্ধিসন্ধ্যঙ্গ সঙ্গতং॥ ৪॥

নায়কের নানা গুণ থাকা প্রয়োজন; ধীরোদাত্ত প্রভৃতি গুণ অবশ্য বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'নাটক চন্দ্রিকার' মতে শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হলে ললিত গুণসম্পন্ন হলেই চলবে। নায়ক দিব্য নয়, অদিব্য নয়, দিব্যাদিব্য।

'চন্দ্রিকা'-কার অন্যান্য নায়কের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের একটি তুলনামূলক বিচার করলেন।

স্বয়ং প্রকটিতৈশ্বর্যো দিব্যঃ কৃষ্ণাদিরীরিতঃ।
দিব্যোহপি নরচেষ্টাৎ দিব্যাদিব্যো রঘূদ্বহঃ ॥ ৭ ॥
অদিব্যো ধর্মপুত্রাদিরেষু কৃষ্ণো গুণাধিকঃ।
নায়কানাং গুণাঃ সর্ব যত্র সর্ববিধা স্মৃতায় ॥ ৮ ॥
ললিতোদাত্তয়োরত্র ব্যক্ত্যা শোভাভরোহধিকঃ।
তেনৈষ নায়কো যুক্তঃ শৃঙ্গারোত্তর নাটকে ॥ ৯ ॥

পূর্বে নিষেধ ছিল পরোঢ়া ও উপপতি নায়ক হতে পারবে না। রূপগোস্বামী জানালেন, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ক্ষেত্রে এ বিধান খাটবে না।

নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া।
তদ্গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ ॥
আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং।
কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ ॥ ১১ ॥

মুখ্যশৃঙ্গার রসে পরপত্নীকে এতকাল স্বীকার করা চলত না ; 'নাটকচন্দ্রিকা'য় বলা হোল, এ নিষেধ গোপাঙ্গনাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। রসব্যাপারে আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদের অবতারিত করেছেন।

এইভাবে নাট্য-বিষয়, নায়ক ও নায়িকা চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তত্ত্বে উপস্থিত হোল। সঙ্গে সঙ্গে রসবিচারেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হোল।

রূপগোস্বামী চারিটি বৃত্তি স্বীকার করেছেন—সাত্বতী, কৈশিকী, আরভটী ও ভারতী। এর মধ্যে কৈশিকী বৃত্তি ভক্তি-সাহিত্যের অবলম্বনীয় বৃত্তি বলে নির্দেশিত হয়েছে। বিভিন্ন বৃত্তি থেকে বিভিন্ন রসের উৎপত্তি। কৈশিকী বৃত্তি থেকে শৃঙ্গার ও হাস্যরসের উদ্ভব হতে পারে। গোস্বামী মহাশয় কৈশিকী বৃত্তির স্বরূপ এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

নৃত্যগীতবিলাসাদি মৃদুশৃঙ্গারচেষ্টিতৈঃ।
সমন্বিতাভবেদ্বৃত্তিঃ কৈশিকী শ্লক্ষ্মভূষণা ॥

কৈশিকী বৃত্তিতে নৃত্য, গীত ও বিলাসাদি থাকবে ; মৃদুমাত্র শৃঙ্গার চেষ্টা থাকবে ; এবং শ্লক্ষ্ম অর্থাৎ নায়িকাদের মনোরম বেশভূষা থাকবে।

নাটকের কথাবস্তু, নাটকের কুশীলব, নাটকের উপজীব্য রস—সবই 'নাটক-চন্দ্রিকা'য় স্বতন্ত্র জিজ্ঞাসায় আলোচিত হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক জিজ্ঞাসার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নব্য নাট্যশাস্ত্র ব্যাখ্যাত হয়েছে। তার্কিক বা নৈয়ায়িকের সৃষ্ট নয় এই শাস্ত্র।

চৈতন্যযুগে বাংলা দেশের লিখিত নাটক সবগুলিই সংস্কৃত ভাষা-আশ্রিত। আর এই নব্য নাট্য-সাহিত্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসাও সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ।

এই বিশিষ্ট নাট্যচিন্তা পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে প্রভুত্ব করলেও সাবেকী নাট্য-আদর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু নাটক লেখা হয়নি, তা নয়।

ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য রচিত 'বিখ্যাতবিজয়' ও 'কুবলয়াশ্বচরিত', এবং লক্ষ্মণ মাণিক্য-পুত্র অমর মাণিক্য রচিত 'বৈকুণ্ঠবিজয়' নাটক প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেছে। এই তিনটি নাটকের কথাবস্তু প্রখ্যাত, নায়কগণ ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন; নাট্য-বিধিতে পঞ্চসন্ধি রক্ষিত হয়েছে। রৌদ্র রস ও আদি রসও আছে প্রচুর, কিন্তু সবই শাস্ত্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা দেশের আগামী দুইশত বৎসরের ইতিহাসে এই ধ্রুপদীধর্মী নাট্যসাহিত্যের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। এবং নাট্য-রচনার এই ধারা অচির কালেই শুকিয়ে যাবে। তবে অভিনয়ধারা সামন্ত অধিপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় অব্যাহত থাকবে।

ভক্তিনাটকই বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ণয় করে। ভাষা-নাটকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ভক্তি নাট্যসাহিত্যের দ্বারা নির্ণীত।

ভক্তি নাট্যসাহিত্যের গঠনরীতি ভাষানাটক অনুকরণ করেছে।

বহির্ঘটনা অপেক্ষা আন্তর ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহ বাদবিসম্বাদ অপেক্ষা প্রেম-বিরহ-মিলন, মান-অভিমান মুখ্য হয়েছে। নায়ককে বীর না হলেও চলবে, প্রীতি প্রেমপূর্ণ ললিতগুণসম্পন্ন হলেই চলবে, এ নির্দেশ ভাষানাটকের প্রাঙ্গণে প্রতিধ্বনি তুলবে। সঙ্গীত শ্লোক ও গদ্য-সংলাপের মধ্যে কোন রূপ পার্থক্য না রাখার নীতি ভাষানাটকেও দেখা যাবে।

মিথিলার কীর্তনীয়া নাটক, ওড়িষ্যার জগন্নাথবল্লভ-নাটক, আসামের অংকীয়া নাট—সবই একই সূত্রে গাঁথা। আর সে মালার শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছেন জয়দেব।

চৈতন্যদেব ও ভাষানাটক

চৈতন্যদেব অভিনয়-কলাকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভক্তিধর্মের তাৎপর্য সুষ্ঠুভাবে সর্ব সমক্ষে প্রতিপাদিত হবে।

গায়ন্ নটন্ অভিনয়ন্ বিরুদন্ অমন্দম্।
আনন্দসিন্ধুষু নিমজ্জয়তি ত্রিলোকীম্॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১ম অঙ্ক)

অভিনয়ের দ্বারা অন্তরের বেদনা উদঘোষিত করে ত্রৈলোক্যকে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করতে চেয়েছেন মহাপ্রভু।

চৈতন্যদেবের অভিনয়-লীলা প্রসঙ্গ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্য মঙ্গল', 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' মহাপ্রভুর তিরোভাবের ঊনচল্লিশ বৎসর পরে রচিত হয়।

মহাপ্রভুর লীলা বিষয়ে গ্রন্থকর্তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল।

কবিকর্ণপুর বলেছেন, মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি প্রভৃতি লীলার মাধুর্য অশেষ; কিন্তু তার থেকেও আকর্ষণীয় হোল তাঁর এইসব নৃত্য-গীতি-অভিনয়াদির লৌকিকী লীলা। সুন্দর একটি উপমা প্রয়োগ করে নাট্যকার তাঁর এই উক্তিটির চারুত্ব বাড়িয়েছেন—গঙ্গা যখন মহেশশিরে, তখন তিনি পরমপবিত্রা, নির্মলা, কিন্তু তিনি যখন ভূতলে অবতীর্ণা হলেন, তখনই তিনি আনন্দরসের বন্যা বইয়ে দেন; এবং আমরা তখনই তাঁর নাগাল পাই।

অলৌকিকীতোহপি চ লৌকিকীয়ং
লীলা হরেঃ কাচন লোভনীয়া।
মহেশশীর্ষাদপি ভূমিমধ্যং
গতৈব গঙ্গা মুদমাতনোতি॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক)

চৈতন্য ভাগবতে চৈতন্যদেবের মুখ দিয়ে বলা হোল:

'প্রকৃতিস্বরূপ নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার॥

এই কথা শুনে অনেকেই ফাঁপরে পড়েন; স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সর্বাদ্য ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য।
আজি নৃত্য দরশনে নাহি মোর কার্য॥
আমি যে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে মোর ওই কথা॥

(চৈতন্যভাগবত, মধ্যলীলা, ১৮শ)

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে এই জিজ্ঞাসার সদুত্তর আছে:

অন্তঃ প্রসাদয়তি শোধয়তীন্দ্রিয়ানি
মোক্ষঞ্চ তুচ্ছয়তি কিং পুনরর্থকামৌ।

সন্তঃ কৃতার্থয়তি সন্নিহিতৈব জীবান্
আনন্দসিন্ধুবিবরেষু নিমজ্জয়ন্তী ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২ অঙ্ক)

অর্থ বা কামের ত কথাই নেই, এই নাট্যাভিনয় মোক্ষকেও তুচ্ছ করে দেয়।

এই উক্তিতে অতিশয়তা থাকতে পারে, কিন্তু এই উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যাবে যে, ভক্তি-আন্দোলন নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়কলার উপর কেন এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এই অভিনয়ের স্থান, কথাবস্তু, কুশীলবের প্রকৃতি, এমন কি শ্রোতাদের পরিচয় পর্যন্ত সংকলিত হয়েছে।

অভিনয় বাইরে বা সাধারণ বারোয়ারী স্থানে হয়নি; হয়েছে রসজ্ঞের গৃহে। আচার্যরত্ন অর্থাৎ চন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে এই অভিনয়লীলা সুসম্পন্ন হয়; অভিনয়ের কথাবস্তু ছিল বৃন্দাবন-লীলার দানখণ্ড পালা।

নাটকে কার কোন ভূমিকা, তাও বিবৃত হয়েছে।

১. শ্রীকৃষ্ণ—অদ্বৈতাচার্য
২. শ্রীরাধিকা—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব।
৩. সূত্রধার— হরিদাস।
৪. পারিপার্শ্বিক—মুকুন্দ
৫. দূতী যোগমায়া—নিত্যানন্দ।
৬ নারদ—শ্রীবাস।
৭. স্নাতক—শুক্লাম্বর।

শ্রীবাসের তিন সহোদর গায়ক, নেপথ্য রচনার ভার পড়ল বাসুদেব আচার্যের স্কন্ধে। নেপথ্যকারক অর্থে 'dresser' বলা হয়েছে; অনুবাদক প্রেমদাস বলছেন—"বাসুদেবাচার্য হৈল বেশ সম্পাদক।"

বাসুদেবাচার্যের 'make-up' খুব প্রশংসিত হয়েছিল; অনুবাদক লিখেছেন—

রাধাবেশে গৌরচন্দ্র আসি প্রবেশিলা ॥
বিশ্বম্ভর বলি কেহ চিনিতে না পারে।
আকৃতি প্রকৃতি রাধা সভে মনে করে ॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী—প্রেমদাস—পৃ. ৩৬)

শ্রীবাস ও তাঁর সহোদরগণের বধূগণ, আচার্যরত্ন, মুরারি প্রভৃতির স্ত্রী অভিনয়-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের এই বিবরণের সঙ্গে চৈতন্য ভাগবতের বিবরণের কোন বড়ো রকমের গরমিল নেই। এখানে হরিদাসকে কোটালের ভূমিকায় পাচ্ছি; সম্ভবত কোটাল ও সূত্রধারের ভূমিকা একপ্রকার ছিল। শ্রীবাস এখানেও নারদ, নিত্যানন্দ বড়াই, মহাপ্রভু হলেন শ্রীরাধা; আর অদ্বৈতাচার্যের কোন ভূমিকা নেই।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অভিনীত পালাটি সমগ্র উৎকলিত হয়েছে; ঐ নাটক ছিল একাঙ্কবিশিষ্ট ভাণিকা। চৈতন্যভাগবতে এ বিষয়ে নতুন কোন তথ্য নেই; সেখানেও বলা হয়েছে, এই অভিনয়ের নাট্যবস্তু অঙ্কে বিভক্ত ছিল।

একদিন প্রভু বসিলেন সবাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥

এই কথারই প্রতিধ্বনি রয়েছে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে :

মৈত্রী। কধেহি তং ণচচং কিং অঙ্করূঅং
কিম্বা পহিল্লঅং॥

প্রেমভক্তি। অঙ্করূপমেব॥ (৩য় অঙ্ক)

চৈতন্যদেব অঙ্কে বিভক্ত নাটগীতিই অভিনয় করেছিলেন। 'পারিজাতহরণ', 'জগন্নাথবল্লভ', 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিত মাধব', 'অংকীয়া নাটে'র মতই তা ছিল অঙ্কে বিভক্ত।

এই অভিনয়ের প্রয়োগকলা সম্বন্ধেও বিস্তৃত তথ্য আছে। প্রথমে সাজসজ্জার প্রসঙ্গ তোলা গেল :—

শঙ্খ কাঁচুলী পাট শাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার॥

(চৈতন্য ভাগবত)

মোটামুটি একটি মঞ্চও তৈরি করা হয়েছিল, এবং একজন মঞ্চাধ্যক্ষও ছিলেন।

যেইক্ষণে কগিয়ার চাঁদোয়া টানিয়া।
কাচ সাজ করিলেন সুচ্ছন্দ করিয়া॥

নাটকের আরম্ভে ছিল কীর্তন; চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে মৃদঙ্গধ্বনির কথাও অধিকন্তু বলা হয়েছে।

কীর্তনের মহারম্ভ করিল মুকুন্দ।
রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥

'পারিজাতহরণ', 'জগন্নাথবল্লভ', 'অংকীয়া নাটে' যেমন শ্লোক দিয়ে সূচনা হয়েছে এখানেও তাই।

কীর্তনের পর সূত্রধারের অর্থাৎ কোটালের প্রবেশ। হরিদাস এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

হরিদাস আসরে দাঁড়িয়ে কি বললেন ?

আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥

সূত্রধার ও নটী নাটকের বক্তব্য বিষয় উপস্থাপিত করে থাকে, এখানেও আমরা তাই পেলাম।

এইভাবে চৈতন্য-অভিনীত নাটকের (হোক্ না তা অ-লিখিত, কিন্তু রচিত ত বটে!) কিছু কিছু সংলাপ বৃন্দাবন ঠাকুরের অনুগ্রহে আমরা লাভ করেছি।

হরিদাস সেজেছেন কোতোয়াল। কি তাঁর বেশ ?

প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস ॥
মহা পাগ শিরে শোভে ধটি পরিধানে।
অঙ্গদ বলয় পরে নূপুর চরণে ॥

যখন কোতায়াল, তখন তাঁর হাতে একখানা লাঠি থাকা বাঞ্ছনীয়।

হাতে নড়ি চারিদিক ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায় ॥

দর্শকদের সঙ্গে, শ্রোতাদের সঙ্গে অভিনেতাদের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই অভিনয়ে তদুপরি শুধু অন্তরঙ্গদেরই ছিল প্রবেশাধিকার।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বলা হয়েছে :

অন্তঃপরং কেষোমাপি তত্র প্রবেশঃ।

আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধির ওপর দ্বাররক্ষকের দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল। আধুনিক ভাষায় যাকে **'Intimate Theatre'** বলে, চৈতন্য-রঙ্গালয় ছিল তা-ই।

শ্রোতার সঙ্গে সংলাপ বিনিময়ও ঘটেছে—

হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে।
কে তুমি এথায় কেন সবাই জিজ্ঞাসে।

হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল॥

কোতায়াল সূত্রধার আর পারিপার্শ্বিকের ভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। কারণ অন্যান্য নাটকে সামাজিক লোকদের সম্বোধন করে তাঁরাই যা কিছু বলতেন। কোতায়ালের পর মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন নারদ। এবং নারদ অবতীর্ণ হতেই মূল নাটকের অভিনয় শুরু হোল।

ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোটা সর্বগায়।
বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায়॥

শ্রোতার সঙ্গে নারদেব বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাই।

শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥
কে তুমি আইলা হেথা কোন বা কারণ।
শ্রীবাস বলেন শুন কহিবে বচন॥
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন।

সকল ভাষা-নাটকের হাস্য রসের জোগানদার নারদ; উমাপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাতহরণ' থেকেই তাঁর এই সকৌতুক ভূমিকা দর্শকদের পরিচিত।

নারদের কথাবার্তার পর নাটকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনীত হতে শুরু করে। এখান থেকে নাটকের আর কোন সংলাপ চোখে পড়ে না। সম্ভবত নাটকের অবশিষ্টাংশে নৃত্যই প্রধান হয়ে পড়েছে। অঙ্কের বন্ধনে বন্ধনে সে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। গীতের সহযোগিতা লাভ করে সেই নৃত্য পরিপূর্ণ হয়েছে।

রমা বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥

রীতিটা হোল বাংলাদেশের বহু ব্যবহৃত রীতি, ইতিহাসবিদিত রীতি। 'বুদ্ধ নাটক' এইভাবে অভিনীত হয়েছে; জয়দেবের 'মঙ্গল গীতি' এইভাবে 'নাটগীতে' রূপান্তরিত হয়েছে; অংকীয়া নাটকের 'কালিদমন যাত্রা' এইভাবেই নাটক হয়ে উঠেছে। প্রণালীটি এক, বিষয় শুধু ভিন্ন, এবং দল বা গোষ্ঠীভেদে উপকরণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য।

চৈতন্যদেবের অভিনয়লীলার প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতেও স্থান পেয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের রুক্মিণী চরিত্রে অবতীর্ণ হবার সংবাদ আছে, নাটক প্রসঙ্গে কোন খবর নেই।

তবে আচার্যের ঘরে কৈলা কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হৈলা॥

(চৈ. চ, আদিলীলা)

চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর অন্যান্য অভিনয়লীলার খবরও দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণজন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসবে।
গোপ বেশে হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্ত সব॥
দধিদুগ্ধভার সবে নিজস্কন্ধে করি।
মহোৎসব স্থানে স্থানে আইলা বলি হরি॥
কানাই—খুঁটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি।
জগন্নাথ মাহিতী হইয়াছেন ব্রজেশ্বরী॥

এখানে অভিনয়কালে শ্রোতাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ—

অদ্বৈত কহে সত্য কহি না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ।
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা।

একে প্রচলিত অর্থে নাট্যাভিনয় বলা মুশকিল, অভিনয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ হোল 'Pantomime। শুধু কৃষ্ণলীলা নয়, রাম-লীলার অভিনয়ও মহাপ্রভু বাদ দেন নি।

বিজয়া দশমী লংকা বিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত গণে॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥

(চৈ চ. মধ্যলীলা ১৫)

বলরামের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন মহাপ্রভু, এ সংবাদ চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত হয়েছে।

অভিনয় অনেক চরিত্রেই করেছেন, নাট্যবিষয়ও 'অঙ্কের বন্ধনে' অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরা সাজান ছিল, কিন্তু লিখিত নাটকের প্রসঙ্গ একস্থানেও উল্লিখিত

হয়নি। লোচনদাস ঠাকুর চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহের অভিনয়ের বিবরণ একই রকম দিয়েছেন। মহাপ্রভুর ভাবোন্মত্ততার তিনি এক রসঘন ছবি উপহার দিয়েছেন ঃ—

এখন কহিব শুন সাবধানে সবজন,
গোপিকা-আবেশ-বশ-প্রভু।
হৃদয়ে কাচুলি ধরে শঙ্খ-কঙ্কণ-করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু॥
পট্ট সে বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাজাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে, উপমা দিবাব কাহে
গোপীবেশে ঠাকুব আপনি॥

(চৈতন্য মঙ্গল, পৃ. ১২৬)

চরণে নূপুব পরে ভাবাবেশে মহাপ্রভু নৃত্য কবছেন, আর বাহবা দিয়ে হরিদাস বলছেন ঃ

হরিগুণ সংকীর্তন কব ভাই অনুক্ষণ,
ইহা বলি অট্ট অট্ট হাসে। (পৃ. ১২৫)

কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য চলছে ; নৃত্য হচ্ছে গীতের 'illustration'। যেমন ছিল 'বুদ্ধনাটকে', যেমন থাকত 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্তী' জয়দেবের ক্ষেত্রে। নরহরি চক্রবর্তী লিখিত 'ভক্তি রত্নাকরে' এই অভিনয়ের উল্লেখ আছে।

পরস্পর নৃত্য মহাকৌতুক বাঢ়য়।
পরম আশ্চর্য সে অঙ্গের অভিনয়॥

(৫ম তরঙ্গ, পৃ. ৪০২)

নরহরি কুশীলবদের কোন সংলাপের সংবাদ দেন নি। তবে এই নৃত্য-ভিত্তিক অভিনয়ের খুঁটিনাটি বিবরণ তিনিই দিয়েছেন।

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার।
নৃত্যজ্ঞ গণেতে তাহা করিল বিস্তার॥
আর যে যে নাট্যক্রিয়া প্রচারিল ইথে।
সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে॥
ওহে শ্রীনিবাস রাসে রাজেন্দ্রতনয়।
ব্রহ্মাদি দুর্জ্ঞেয় যাহা তাহা প্রকাশয়॥

অঙ্গ অভিনয়ের উপমা নাই দিতে।
নানাভাব প্রকাশয়ে অশেষ ভঙ্গিতে ॥

(৫ম তরঙ্গ, ৪৬১)

এ অভিনয় প্রধানত 'সংলাপের অভিনয়' নয়, এ অভিনয় 'অঙ্গ অভিনয়ের"। নানাভাব প্রকাশ পেয়েছে 'অশেষ ভঙ্গিতে'।

নৃত্য ও নাটক—পরস্পরের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও। শব্দ দুইটি পৃথক অবয়ব নিয়েছে সেদিন, কিন্তু অর্থ-নৈকট্য তখনও ঘোচাতে পারে নি। নৃত্যকুশলতা ও নটনিপুণতা একই শব্দ থেকে দুই অর্থ ফুটেছে, একই বাদ্য থেকে দুই বাজনা।

নাচত গৌর, নিখিল নটপণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গি, মদনমদ হরঙ্গ।

(চৈ. মঙ্গল ৮৮৩)

নৃত্যপারঙ্গমতার ফলে তিনি নটশ্রেষ্ঠ আখ্যায় ভূষিত হননি, নটনিপুণতার ফলেই ঐ সম্মান তাঁর জুটেছে। এই অভিনয় প্রধানত মূকাভিনয়, নাটক-পূর্ব নাটকের অভিনয়।

লিখিত নাটক নেই, অথচ নাটক আছে। গ্রন্থ-অনুগত নাটক নেই, অথচ অঙ্কের বন্ধন আছে। বাংলা নাটকের জন্ম-মুহূর্তে এমনই পরস্পরবিরোধী (বা পরস্পর সম্বন্ধবিহীন) সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। তবু সে অভিনয় সার্থক নাট্যাভিনয়ের সমস্ত গৌরব অধিকার করেছে, হয়ত কিছু অতিরিক্ত।

সামাজিকানাং হি রসো নটানাং
নৈবেতি পন্থাঃ কৃতিষু প্রসিদ্ধঃ।
হস্তোভয়ত্বে রসবিত্ত্বমেষা-
মলৌকিকে বস্তুনি কো বিরোধঃ ॥

. (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ৩য় অঙ্ক)

রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভালো করেই জানেন যে অভিনয়কালে সাধারণত সামাজিকেরা অর্থাৎ দর্শকেরা অভিনয় রসের দ্বারা আবিষ্ট হন। নটদের আবিষ্ট হবার তো কথা নয়। কিন্তু এই সব অলৌকিক অভিনয় লীলায় ঐরূপ কোন প্রভেদই টিকতে পারত না। কাজেই সামাজিক ও নট দুই ভাবেরই ভাবুক হয়ে এখানে অভিনেতারা ভাবামৃত রসে অভিভূত হয়ে পড়তেন।

বাংলা নাটকের উৎস-অন্বেষণের একটা পর্ব এখানে শেষ হচ্ছে। বাঙ্গলা নাটক এই যুগে দেখা দিয়েছে, তবে লিখিত আকারে নয়, মৌখিক। কিন্তু সেটা নাটক, এ-বিষয়ে অন্যথা নেই। এই অ-লিখিত নাটক কতকগুলি রীতি অনুসরণ করেছে, সে রীতিগুলি ভক্তি নাট্য-সাহিত্যের সহজাত বৈশিষ্ট্য; এবং পরবর্তী কালের লিখিত নাট্যসাহিত্য এই রীতিগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

বরং এই অ-লিখিত নাটকের রীতিগুলিই প্রামাণ্য বলে পরিগণিত হবে। এই অ-লিখিত নাটকের গঠনবিন্যাস লিখিত নাটকে বহুকাল ব্যবহৃত হবে।

বাঙ্গালা দেশের ভক্তি আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে; তাই একে বলা হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। বাংলা দেশের ভক্তিনাটক একটি স্বতন্ত্র নাট্যধারা; এই নাট্যধারার সঙ্গে অন্য প্রদেশের নাট্যসাহিত্যের সাদৃশ্য থাকলেও একটা বিশিষ্টতা এর আছে।

ভক্তি-নাট্য-সাহিত্যের এই বিশেষ গাঁথুনিই ঐ ভক্তি-রসাত্মক নাট্যাভিনয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট ছিল। এই কারণে বৈষ্ণবচূড়ামণি রূপগোস্বামী 'নাটক চন্দ্রিকা' লিখে এই নিতান্ত বহুজন (মহাজন ?) ব্যবহৃত লোকনাট্যকলাকে একটা শাস্ত্রীয় অনুমোদন দিয়ে গেলেন। 'নাটক-চন্দ্রিকা' ভরতমুনি প্রবর্তিত নাট্যচিন্তার বিকল্প পথে অগ্রসর হয়েছে।

বাংলা নাটকের অ-লিখিত পালার এখানেই হোল অবসান; লিখিত পালার মঞ্চ রচিত হবে অন্য ভূ-খণ্ডে,—নেপালে।

বাংলা নাটকের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ঘটে নেপালে। সেই হোল নাট্য-সাহিত্যের স্বীকৃত ইতিহাস। আলংকারিক ভাষায় বলা যায়, বাংলা নাটকের শৈশব অতিবাহিত হবে বসুদেবের গৃহে নয়, নন্দের আলয়ে; স্বদেশে নয়, বিদেশ-বিভুঁই-এ।

পাদটীকা

১। The Early History of Vaishnava Faith and Movement—S. K. De, Calcutta. 1942—P. 6

১ক। Shivaji and His Time—J. N. Sarkar. S. C. Sarkar & Co. Calcutta. P. 13.

২। History of Bengali Language and Literature—D. C. Sen. P. 409

৩। বা-সা-ই—১ম খণ্ড—সু. সে, পৃ. ১৫৭

৪। ঐ, পৃ. ১৫৮।

৫। ওড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন,। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ। পৃ. ২৯

৫ক। Assamese Literature—B K. Barua. Sahitya Akademi, New Delhi. P. 20-21.

৬। বাংলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন। পৃ. ৫৬।

৭। শ্রীশংকব দেব আরু শ্রীমাধব দেব—লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া। ১৯১৪ পৃ. ৪০—৪১

৮। A History of Maithili Literature—J. K. Misra. Allahabad. Vol I—Page. 255.

৯। উমাপতি কা পারিজাতহরণ—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পীযূষ, ডাঃ বাসুদেব শরণ অগ্রবালের ভূমিকা। পাটলী প্রকাশন। পাটনা।

১০। A History of Maithili Literature—J. K. Mishra P. 289.

১১। Folk Literature in Mithila—J. K. Mishra P. 51.

১২। Oriya Literature—J. B Mohanti, P. 136.

১৩। ঐ—P. 137.

১৪। Oria Nātyakalā—Girijasankar Rai, P.—20

১৫। ওড়িয়া সাহিত্য—প্রিয়রঞ্জন সেন বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ—পৃ. ৫৯।

১৫ক। History of Oriya Literature—Mayadhara Mansinha. Sahitya Akademi. 1962 P. 21.

১৬। Indian Drama—Sten Konow. Indian Edition. Calcutta. 1969 Page. 24.

১৭। Asamiya Sāhityar Chaneki—Edited by—Hemchandra Goswami, Calcutta University—1929. Introduction by—S. K. Bhuyan. Page. XLVI—XLVII

১৭ক। History of Assamese Literature—B. K. Barua. Sahitya Akademi. New Delhi. 1964

১৮। Ankiā-Nāt—Edited by—Dr. B. K. Barua. পৃ. ১—২।

১৯। Indian Drama—Sten Konow. P. 74

২০। Ankiā Nāt—Edited by Dr. B. K. Barua. Introduction.

২১। রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি॥
আমার নাটক কৃষ্ণ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ॥
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞি করিল বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার॥
ব্রজপুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা॥
(চৈতন্য চরিতামৃত—অন্ত্যলীলা ১ম পরিচ্ছেদ)

২১ক। The Early History of Vaishnava Faith & Movement --S. K. De. General Printers & Publishers Ltd. Calcutta 1942. P. 439.

২২। আরম্ভিয়াছিলা এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া॥
বিদগ্ধ মাধব আর ললিত মাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব॥ (ঐ—অন্ত্য। ৫)

২২ক। পাহাড়পুর—কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২২খ। Varendra Research Society—Catalogue.

২৩। চৈ. চ—অন্ত্য ১ম

২৪। চৈ. চ—অন্ত্য ১ম

২৪ক। The Early History of Vaishnava Faith and Movement—S. K. De. P. 438.

২৪খ। Chaitanya and His Age—D. C. Sen. foreward by Prof—Sylvian Levy. P. XII

২৫। সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান—ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—পৃ. ১২৬।

দরবারী নাটক ও নাটকের অধোগতি

বাংলাদেশে ভক্তিবাদ রাজসভার আনুকূল্য লাভ করেনি; কিন্তু নাটক করেছে। তবে সে নাটক রাজসভার উৎসাহে লিখিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে, সে নাটক ছিল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং শাস্ত্রসম্মত।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নাটক প্রসঙ্গ অনুচ্চারিত নয়। আলাওলের 'পদ্মাবতী', ভারতচন্দ্রের কাব্য 'অন্নদামঙ্গল'-এ নাটক প্রসঙ্গ রয়েছে।

বাংলাদেশে সামন্ত অধিপতিরা বৈষ্ণব বিদ্বেষী ছিলেন; ভক্তিরত্নাকব ও নিত্যানন্দবিলাস ও প্রেমবিলাসে এ খবব আছে।

কৃষ্ণনগর-রাজসভা

কৃষ্ণনগব-বাজসভা বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়েছে, কৃষ্ণনগর-রাজসভাব কবি ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দব ব্যতীত একখানি ভাষানাটকও লিখেছেন।

এ-নাটক বৈষ্ণব-প্রভাবিত ভক্তিনাটকেব আঙ্গিকে রচিত নয়। এ নাটক রচিত হয়েছে শাস্ত্রীয় আদর্শে।

ভারতচন্দ্রের নাটক মিশ্রভাষায় রচিত—এ যুগে 'অঙ্গদরায়বার' প্রভৃতি পালায় যে প্রকার মিশ্রভাষার ব্যবহাব ছিল, তার থেকেও মিশ্র ছিল এই নাটকের ভাষা। এ নাটকে সংস্কৃত, হিন্দী ও বাংলা একত্রে স্থান পেয়েছে। কৌশলটি কি কীর্তনীয়া নাটকেব? ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দব কাব্যে ভাটমুখে একপ্রকার মিশ্রভাষা শোনা গেছে। কিন্তু 'চণ্ডী নাটকে'র ভাষা আরও জটিল।

সমগ্র নাটকটি চার পৃষ্ঠার বেশি পাওয়া যায়নি।[২] সম্ভবত এটি মঞ্চ নির্দেশলিপি। মুখে-মুখে বাকিটুকু অভিনেতারা বসিয়ে নিতেন।

নাটকের শুরুতে নটী ও সূত্রধার প্রবেশ করলেন, সূত্রধার নটীর প্রতি সংস্কৃত শ্লোক বর্ষণ করলেন। নটী তার উত্তরে বাংলায় বাক্যস্ফূর্তি করলেন, অবশ্য ত্রিপদী ছন্দে। সূত্রধার তখন সংস্কৃতভাষায় গদ্য বাক্য বিন্যাস করলেন। তারপরে শুরু হোল পালা।

চণ্ডী ও মহিষাসুর মঞ্চে প্রবেশ করলেন, দুজনেই বেশ কুপিত। এই সময়ে একটি সংস্কৃত সংলাপ আছে—কে বক্তা, তা বলা হয়নি। তবে যুদ্ধ-

বর্ণনামূলক উক্তি দেখে মনে হয় যে এটি সূত্রধারের কণ্ঠে ভর করবে। এই সংলাপ শেষ হলে মহিষাসুর মুখ খুললেন, দৈত্যমহাশয় সাংঘাতিক রেগে এসেছেন। সাধারণ বাংলায় কথা বললে কুপিত মেজাজের সিকি অংশ হয়ত ধরা পড়ত না, তাই ভাট-ভাষা অবলম্বন করলেন। প্রথম সংলাপে তিনি ঘোষণা করলেন যে, ইন্দ্রকে সবার আগে তিনি বন্দী করবেন। সাধু সংকল্প অবশ্যই। তারপরে প্রজাবর্গের প্রতি মহিষাসুর এক মূল্যবান উপদেশ-বাণী বর্ষণ করলেন—উপবাস, যাগ-যজ্ঞ করা অর্থহীন। মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পথ হোল সুখাদ্য সুপানীয় গ্রহণে ও অন্যান্য ভোগানন্দে।

শোন রে গোয়ার লোক ছোড় দে উপবাস যোগ
মানহু আনন্দ ভোগ ভৈষরাজ যোগমে।
আগমে লাগাও ঘিউ কাহে কৈ জ্বালাও জীউ
পাক রোজ শ্যার পিউ ভোগ এহি লোগমে।
আপকো লাগাও ভোগ কামকো জাগাও
ছোড় দেও যোগ গো মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান ক্যা বেগাম অর্থ আবজান
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান আর সর্ব রোগমে॥

খুবই সঙ্গত কারণে দেবী ভগবতী এই বাক্যে ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রুদ্ধ হলে তিনি বাংলায় কথা বলতে পারলেন না। তিনি ব্রজবুলিতে (অর্ধ দেবভাষা ?) তাঁর বক্তব্য দাখিল করলেন।

নাটক এখানেই শেষে। অর্ধ-সমাপ্ত, না পরিসমাপ্ত—এ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আমাদের ধারণা এটি পুরো নাটক নয়, এটি নাটকের মঞ্চ-নির্দেশ-লিপি। কারণ যিনি এর লেখক, মধ্যযুগের বাংলাভাষার তিনি অদ্বিতীয় শিল্পী। এ রচনার কোথাও ভারতচন্দ্রের কলমের কোন চিহ্ন নেই।

মহিষাসুর নিধনে নাটক শেষে হতে পারত। কিন্তু নাটক ততদূর অগ্রসর হয়নি। অর্ধ-সমাপ্ত হলেও নাটকের চরিত্র গোপন থাকেনি।

১। এ নাটক সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতি অনুসারে রচিত।

২। এ নাটক ভাবার ক্ষেত্রে এক অভিনব রীতি অনুসরণ করেছে—মিথিলার কীর্তনীয়া নাটক বা আসামের অংকীয়া নাটের সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

৩। এ নাটক রাজসভার নাটক, কৃত্রিম মঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাটক।

নেপাল-রাজসভা

'চণ্ডীনাটক' বাংলার স্বাভাবিক নাটক নয়; তাই এ নাটকের কোন অনুসরণ দেখা যায় না। সম্ভবত অন্যান্য রাজদরবারে অনুরূপ নাটক রচিত ও অভিনীত হোত, ; বাংলায় বোধ করি এটিই একমাত্র উদাহরণ।

দরবারী নাটকের প্রভূত উদাহরণ পাচ্ছি নেপালে। নেপালে প্রাপ্ত সবগুলি নাটকই বাংলা নাটক নয়। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে "বাঙ্গালা নাটক" না বলে এগুলিকে "ভাষানাটক" বলা সমীচীন।[২] মিথিলার রাজা হরিসিংহদেব ১৩২৩ কিংবা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে নেপালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কন্যার সঙ্গে নেপালের পুরাতণ রাজবংশের জয়স্থিতি মল্লের বিবাহ হয়। জয়স্থিতি মল্ল সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে মৈথিলী পণ্ডিত, কবি ও নাট্যকারদের নেপালে আগমন ঘটে। প্রথমে সংস্কৃত নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হোত; পরে কথিত ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। নেপালের প্রধান রাজবংশ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শিক্ষার ভাষা ছিল মৈথিলী। শিক্ষাগুরুদের অনেকেই ছিলেন মৈথিলী। পরে অবশ্য কেউ কেউ বাংলা দেশ থেকেও গিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ আছে।[৩]

পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে নেপালের রাজা যক্ষমল্লদেবের মৃত্যু হলে তাঁর রাজ্য পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর নেপালের রাজধানী হোল কাঠমাণ্ডু, দক্ষিণ নেপালের রাজধানী ভাতগাঁও এবং পরে ললিতাপুরে আরও একটি রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। এই তিন রাজধানীতেই নাট্যচর্চা পুরো দমে চলতে থাকে। প্রথমে কীর্তনীয়া নাটকের আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়। ষোড়শ শতকে ভাতগাঁও-এর রাজা ত্রৈলোক্য মল্লদেবের রাজত্বকালে লিখিত কৃষ্ণলীলা নাটকের ভাষা হোল সংস্কৃত, কিন্তু গানগুলি মৈথিলী ও বাংলায় লিখিত। অবশ্য এ বাংলা হিন্দী-প্রভাবিত বাংলা; সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশের কোন গীতি এই ভাষায় রচিত হতে পারত না।

এই ত্রৈলোক্য মল্লদেবের পুত্র জগজ্জ্যোতি মল্লদেব 'হরগৌরীবিবাহনাটক' রচনা করেন। তাঁর পুত্র জগৎপ্রকাশ মল্লদেব 'মানয়সন্ধিনীনাটক', 'মদনচরিত নাটক' রচনা করেন। এগুলি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়ে থাকবে।

এঁর পুত্র জিতামিত্রমল্লই সর্বপ্রধান নাট্যকার; তাঁর রচিত নাটকের নাম হোল—'মদালসাহরণ নাটক', 'গোপীচন্দ্র নাটক' ও 'অশ্বমেধ নাটক'। জিতামিত্র মল্লদেবের পুত্র হলেন ভূপতীন্দ্র মল্লদেব—তাঁর রচিত নাটক 'রুক্মিণী

পরিণয়'। তাঁরই পুত্র হলেন রণজিৎ মল্লদেব তিনি 'রামচরিত্র নাটক', ও 'মাধবকামকন্দলানাটক' রচনা করেন। রণজিৎ মল্লদেবই নেপালের শেষ মল্ল রাজা। কারণ ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুর্খারা নেপাল জয় করে।[৪] এছাড়া কাশীনাথ নামক জনৈক নাট্যকার 'বিদ্যাবিলাপ' নামক একখানি নাটক লিখেছিলেন।

এ নাটকগুলি রাজারাই লিখেছেন, না তাঁরা ছিলেন নিছক উৎসাহদাতা, তা নির্ণয় করা দুরূহ। নাটকগুলি কোন্ ভাষায় লিখিত, এবিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ আছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'রামচরিত্র নাটক'খানিকে বাংলা ভাষায় লিখিত একমাত্র নাটক বলে স্বীকার করেন।[৫] ডক্টর জয়কান্ত মিশ্র এইসব নাটক মিথিলার কীর্তনীয়া নাটকের অনুরূপ বলে মনে করেন; তাঁর দৃঢ় ধারণা এগুলি মৈথিলী ভাষায় লিখিত।[৬] ডক্টর সুকুমার সেন নেপালে লিখিত সবগুলি নাটক বাংলা নাটক বলে দাবী করেননি, তাঁর মতে গোপীচন্দ্র নাটকের গদ্যাংশের ভাষা বাংলা।[৭] ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী এগুলিকে পুরাপুরি বাংলা নাটক বলতে রাজি নন; তাঁর মতে এগুলি ভাষা-নাটক। তিনি বলেছেন, নেপালে প্রথমে সংস্কৃত নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হোত; পরে কথিত ভাষায় সাহিত্য-চর্চা শুরু হয়।[৮]

এ নাটকগুলি আসলে কীর্তনীয়া নাটকের আদর্শে প্রথমে রচিত হয়। কীর্তনীয়া নাটক সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হলেও তার গানগুলি লেখা হোত প্রাদেশিক ভাষায় অর্থাৎ মৈথিলীতে। নেপালে মিথিলার প্রভাব প্রথম যেদিন সূচিত হয়, সেদিন এই আঙ্গিকেই নাটক রচনা শুরু হয়। পরে বাঙ্গালীদের প্রভাব বাড়তে থাকলে এবং নেওয়ারী ভাষাভাষীদের মধ্যে আত্ম-সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে এই দুইটি ভাষা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মর্যাদা পেল। কখনও পৃথক্‌ভাবে স্বতন্ত্র নাটক বাংলা বা নেওয়ারীতে রচিত হোল, কখনও একই নাটকে বাংলা মৈথিলী ও নেওয়ারী স্থান পেল। ভাষার ক্ষেত্রে নেপালে এক অদ্ভুত সহাবস্থান চলল, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকের রচনায়।

কোন কোন নাটকে গানগুলি লেখা হোল মৈথিলীতে, গদ্য-অংশ বাংলায়, আর অভিনয়-নির্দেশ নেওয়ারীতে। দেখা যাচ্ছে যে, কীর্তনীয়া নাটক ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে প্রাদেশিক নাটকে পরিণত হচ্ছে।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটকগুলি সংকলিত করেছেন, তার সবগুলিই নাটক নয়। "এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা; কিন্তু আমরা

যাহাকে নাটক বলি, এ সেরূপ নাটক নয়। একটি দুটি পাত্র প্রবেশ করিতেছে, আর এক একটি গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে"।[৯] বিদ্যাবিলাপ ও গোপীচন্দ্র নাটকে কাহিনীর ধারাবাহিকতা আছে; কিন্তু এইপ্রকার ধারাবাহিকতা রামচরিত্র নাটকে নেই। রামচরিত্র নাটক থেকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ধারা সূচিত হয়।

বিদ্যাবিলাপ নাটক সপ্ত অংকে বিভক্ত; নাটকের মেয়াদ সাত দিন পর্যন্ত। এক এক দিবসে এক এক অঙ্ক সমাপ্ত।

'শ্রীও নৃত্যনাথায় নমঃ' বলে নাটক শুরু। প্রথমে চারি পংক্তিবিশিষ্ট এক সংস্কৃত শ্লোক। তারপরে সূত্রধার ও নটী প্রবেশ করে মৈথিলী ভাষায় শিব-বন্দনা করেন। শিববন্দনা শেষ হতে না হতেই রাজবন্দনা। রাজবন্দনা, দেশবন্দনার পর সূত্রধার ও নটীর প্রস্থান। তখন গুণসাগরাদির প্রবেশ। এই অঙ্কে চণ্ডিকা, বীরসিংহ প্রভৃতি প্রবেশ করবেন এবং নিস্সার করবেন।

দ্বিতীয় দিবস বা দ্বিতীয় অংক থেকে সুগন্ধিমালিনী বিদ্যা প্রভৃতির সাক্ষাৎ মিলবে। এইভাবে সপ্তদিবস পালাটি চলবে, নাটক সপ্তমাংক।

সমস্ত নাটকে প্রত্যেকেই আপন আপন বক্তব্য উপস্থিত করছে, এমন কি পরিচয় পর্যন্ত নিজেকেই দিতে হচ্ছে। এবং 'আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল'-র মত প্রস্থান করছে। কেউ কারো কাছে জবাবের প্রত্যাশী নয়। এইভাবে নাটক হবার প্রথম সর্তই এখানে অস্বীকৃত হচ্ছে।

রামচরিত্র নাটক আরও বিচিত্র। এখানে জনক, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সীতা, মাণ্ডবী, ঊর্মিলা, শ্রুতকীর্তি প্রভৃতি চরিত্র ত আছেই, তার সঙ্গে রাবণ, সুগ্রীব, কালনেমি, অংগদ, মন্দোদরী, দুর্বাসা, উর্বশী পর্যন্ত। এছাড়া আরও চমৎকার ব্যাপার ঘটেছে, যখন মহম্মদ সাহাদি, শিবনাথ যোগী, প্রেমসুন্দরাদি বৌদ্ধ, রামদাস ধোবি এই নাটকের কুশীলব শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।

পাত্রপাত্রীরা বিদ্যাবিলাপ নাটকে নিজেরাই নিজের পরিচয় দিয়েছিল; রামচরিত্র নাটকে তার ব্যতিক্রম। এখানে নটী ও সূত্রধার বাতিল হয়েছেন। এর একটি গূঢ় কারণ আছে। বিষ্ণু প্রবেশ করলে এই গীতটি পরিবেশিত হয়েছে।

পিতামহ ইন্দ্র আদি যতো দিগপতি।
সকলে মিলিয়া করে (লে) বিষ্ণুর প্রণতি॥
নটন-ভবন সবে, দিলেন প্রবেশ।
পরিধান সুবসন সুললিত বেশ॥

এই উক্তিটি কার? নিঃসন্দেহে সূত্রধারের। এইভাবে সূত্রধারকে অন্য কোন নাটকে ব্যবহার করা হয়নি। দশরথ যখন প্রবেশ করলেন, তখন পাচ্ছি—

রংগভূমি, দশরথ দিলেন প্রবেশ।
প্রবল নৃপতি মা (ত) নে জাহার নিদেশ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী আদি নারীগণ সংগে।
সুমন্ত্র সচিব ধীর, পরম সুরংগে॥
শ্রীরণজিৎ মল্ল দিলেন নিদেশ।
বর্ণন করিতে আজি নৃপের প্রবেশ।

এ উক্তিটি নিশ্চয়ই দশরথের মুখ থেকে বহির্গত হয়নি; এ উক্তিটির জন্যও অধিকারী বা সূত্রধারেরই ডাক পড়বে। অথচ লোমপাদ যখন প্রবেশ করছেন, তখন পাই—

লোমপাদ নৃপ আমি নটন-ভবনে।
দিলাম প্রবেশ অবে, সহ পরিজনে.॥
ললিতাঙ্গী প্রিয়া মোব, শান্তা নাম কন্যা।
কনক মংজরি সখি গুণগণধন্যা॥
বর্ণন করিলেন বণজিৎভূপ।
নৃপতি মুকুটমণি মনসরূপ॥

এ উক্তি নিশ্চয়ই লোমপাদের কণ্ঠে স্থান পাবে, অন্য কারও নয়। মোটেব উপর সমগ্র নাটকে কোন সাধারণ সূত্র অনুসরণ করা হয়নি।

নাট্যকারেরও কোন ঘটনা ঘটাবার জন্য বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আপন পরিচয় দিয়ে কিছু কীর্তি বর্ণনা করলেই কুশীলবেরা কর্তব্য শেষ হোল মনে করছেন। গল্পের কোন অগ্রগতি নেই, এমনকি পূর্বাপর সংগতিও বিঘ্নিত। যেমন ১ম খণ্ডে শ্রুতকীর্তির শৃংগার দেখতে পাচ্ছি; রামউক্তি পাচ্ছি সীতার উদ্দেশে—আর যাই হোক সে উক্তি পূর্বরাগের উক্তি নয়।

সুনোহে খংজন-নয়নী,
অবে বড়িরসদান দানদেব মোরে॥
জলজ মুকুল সম, কুচের বিলাস।
দেখিতে মন অভিলাসে॥

তারপর তৃতীয় খণ্ডে পাচ্ছি দশরথের আনন্দ পৈসার—

সকলে মিলিয়া চলো অযোধ্যানগর এখনে।
আনিলাম ঋষ্যশৃংগ যাগ করাইবো।
জাগ করিয়া সন্তান পাইবো।

রাম না হতে রামায়ণ শুনেছিলাম; কিন্তু সন্তান জন্মাবার পূর্বে তার পূর্বরাগ—খুব স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ ত সম্পূর্ণই উল্টা পুরাণ।

এ ছাড়াও এ নাটকের সর্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার হলো মহম্মদ সাহাদির আবির্ভাব। শিবনাথ যোগী, প্রেমসুন্দর বৌদ্ধ, ও রামদাস ধোবিকে না হয় কালুয়া-ভুলুয়ার নেপালী সংস্করণ বলে ধরে নিলাম; কিন্তু মহম্মদ সাহাদির কি? তিনি কথাও বলেছেন ফারসী ভাষায়।

সমগ্র নাটকখানিই রামায়ণের সঙ, নাটক নয়। যেমন মনোমোহন বসুর রচিত 'নলদময়ন্তী সঙ'। এই কারণে প্রচলিত নাট্যবিধি পালন করা হয়নি, নটী সুত্রধার তাই বাতিল হয়েছে।

নেপালী নাটক প্রথম যুগে কীর্তনীয়া নাটককে অনুসরণ করে যথার্থ নাটক সৃষ্টি করেছে, পরে রাজসভার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যচর্চার অধোগতি দেখা যায়। ডক্টর প্রভু গুহঠাকুরতা বলেছেন—'The model which they imitate is, of course, the old Sanskrit drama.'[২০] প্রথম যুগের নেপালী নাটক মৈথিলী নাটকের অনুসরণ। পরে তার পথ পরিবর্তিত হয়েছে। ভক্তিনাটকের আদর্শ পরিত্যক্ত হওয়ার অর্থ সংস্কৃত নাটকের ধ্রুপদী আদর্শ গ্রহণ করা নয়।

এখানে নাটকের আদর্শই পরিত্যক্ত হয়েছে, রাজসভার অধোগতি নাটকের অধোগতি ডেকে এনেছে। নাটক হয়ে উঠেছে 'সঙ'। একই প্রকার অবনতি আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতচন্দ্রের চণ্ডী নাটকে; ঠিক একই জাতীয় বিকৃতি আমরা লক্ষ্য করব কলকাতার বিত্তবান ব্যক্তিদের আশ্রয়ে। সেখানে নাটক, যাত্রা আর সঙ একার্থবোধক হয়ে উঠবে। ভারতচন্দ্রের যুগে রাজসভা-পালিত মঞ্চ ছিল। আর নেপালের রাজারাও সুসজ্জিত মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন। নাটকের পাত্রপাত্রীদের জবানীতে পাচ্ছি এই শব্দগুলি—রংগভূমি, নটন-ভবন, আর পরিধানে সুবসন এবং বেশ সুললিত। বোঝা গেল সুসজ্জিত নাট্যশালায় সুসজ্জিত বেশে লিখিত পালা নিয়ে রাজার হুকুমে নটনটীরা অভিনয়ে নামতেন।

ভাষা নিয়ে ভারতচন্দ্র এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন—এই প্রকার মিশ্রভাষা সাহিত্যে আর কোথাও মেলে না। ধাঁধার ভাষা বা হেঁয়ালির ভাষা না হলেও কিছুটা প্রহেলিকাধর্মী ত বটেই।

এ সব সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের নাটক নাটক থেকে গেছে; কিন্তু নেপালের সব নাটক নাটক নয়। কোন কোনটি নিছক সঙ জাতীয় রচনা। এমন কি পুতুল নাচের নেপথ্যসঙ্গীতও হতে পারে। পুতুল নাচে অনেক সময় কালগত ও ঘটনাগত সংলগ্নতা থাকে না; এখানেও একইপ্রকার রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

পুতুলের সঙ্গে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্কতা ও অপরিণত মনস্কতার সংস্পর্শ আছে। এখানেও সেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'রামচরিত্র নাটক' পর্যালোচনা করলে এই রকম ধারণা হতে বাধ্য। এই নাটকে ঘটনার কোন পারম্পর্য নেই। তুলনায় শংকরদেবের 'রামবিজয় নাট' দেখুন। সে নাটক আরও পূর্ববর্তী রচনা, কিন্তু সেখানে ঘটনার পারম্পর্য আছে। 'রামচরিত্র' তাই '**Puppet show**'-এর নেপথ্য-সঙ্গীত বলে অনুমিত হয়। আর '**Puppet show**'-এর সঙ্গে নাটকের সম্বন্ধ কি একেবারে উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার? সংস্কৃত নাটকের উদ্ভবে অনেক বিদেশী পণ্ডিত '**Puppet show**'-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তার পিছনে তাঁদের হাতে দুইটি তথ্য ছিল—তথ্য দুইটি শব্দ-নির্ভর।

১। সূত্রধার (যিনি সুতো ধারণ করেন)।
২। স্থাপক (যিনি পুতুলগুলি স্থাপন করে থাকেন)।

তাই পণ্ডিতেরা বলেছিলেন পুতুলনাচ থেকেই ভারতে নাটক্ এসেছে।

সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর গ্রন্থের সংশোধিত সংস্করণে জয়দেবের গীতগোবিন্দে '**Puppet show**'-পুতুল নাচের নির্দেশিকার সন্ধান পেয়েছেন। ডক্টর সেনের এই আবিষ্কার গ্রহণযোগ্য কিনা, এ তর্কে আমরা প্রবেশ করতে চাই না। কিন্তু পুতুলনাচ অবলম্বনে যে এক জাতীয় নাটক রচিত হতে পারে, এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

"মনে হয় জয়দেবের গীতিনাট্য রাধাকৃষ্ণ এই দুই ভূমিকা পুতুলের দ্বারা প্রদর্শিত হইত, গান দোহারে গাহিত, আর সখীরা ভূমিকা অধিকারী বা প্রধান গায়েন গ্রহণ করিত।"[১১]

"গানগুলির মাথায় রাগতাল ছাড়াও অন্য কিছু নির্দেশ আছে। এ নির্দেশ ঠিক অভিনয়ের নয়, পুতুলনাচের সঙ্গে গীত-অভিনয় রীতির। পুতুল নাচ-

গানের মধ্যে শ্লোকগুলি কাহিনীর ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে।"[১২] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য সম্বন্ধে ডক্টর সেন অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

আমাদের আলোচিত নাটকগুলির পাণ্ডুলিপিতে মঞ্চনির্দেশ স্পষ্ট দেওয়া আছে, তাতে পুতুলের কোন উল্লেখ নেই। গীতগোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে পুতুলের উল্লেখ নেই। এতৎসত্ত্বেও ঐ দুইটি সম্বন্ধে পুতুলনাচের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হলে আপত্তি যদি না ওঠে, তবে এক্ষেত্রেই বা কেন উঠবে? এগুলিকে অনায়াসে মঞ্চের মূকাভিনয়ের নেপথ্য-সঙ্গীত বলা যায়।

মূকাভিনয় এদেশে অপ্রচলিত নয়—পুরুলিয়ার 'ছৌ-নৃত্য' এক প্রকার মূকাভিনয়। আজও পুরুলিয়ায় রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ কাহিনী অবলম্বনে এক একটি পালা রচিত হয় বা অভিনীত হয়। পিছনে থাকে সঙ্গীতের পটভূমিকা। 'ছৌ' নৃত্যে লাস্যভাব অপেক্ষা তাণ্ডব ভাবই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, নেপালের এই নাটকে তাণ্ডব ভাবই প্রধান, মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি আছে, সঙ আছে। রাজসভার রুচির মান এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্যের পালাগুলি লিখিত আকারে আমাদের হস্তগত হলে সেগুলিকে প্রচলিত অর্থের নাটক সাব্যস্ত করে আমরা বিভ্রান্ত হতাম। নেপালের নাটক তার বঙ্গত্ব নিয়ে নয়, নাটকত্ব নিয়েও তাই প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

'বিদ্যাবিলাপ' পালার মাথায় আছে "শ্রী৩ নৃত্যনাথায় নমঃ"; আর রামচরিত্র পালায় দ্বিতীয় অঙ্কে শোভা পাচ্ছে 'শ্রীশ্রীশ্রীনৃতেশ্বরায় নমঃ'।[১৩] পুতুল নাচে নর্তক ত পুতুল; নৃত্যেশ্বরে বন্দনা সেখানে খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'সঙ' জাতীয় রচনা হওয়াও স্বাভাবিক। নাটক আর সঙ সমার্থক ছিল। জয়দেব থেকে বাংলায় নাটক ও অভিনয়ের যে ধারার সূচনা, নেপালে এসে সে ধারাটি দিক-পরিবর্তন করেনি। একই খাতে বহমান ছিল। শুধু রাজসভার রুচির নিম্নগামিতায় 'নাটক' পর্যবসিত হতে চলল সঙে।

তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক এখনও নৃত্যপ্রধান। হয়ত আরও শতবর্ষ কাল তাকে নৃত্যেশ্বরের চরণে প্রণতি জানাতে হবে। তারপর 'নৃত্য' ও 'নাটক' হবে পৃথক্ অর্থবোধক দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ।

পাদটীকা

১. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৬—নেপালে ভাষা-নাটক—প্রবোধচন্দ্র বাগচী।

৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৬—নেপালে ভাষা-নাটক—প্রবোধচন্দ্র বাগচী। পৃ—১৭২।

৪. History of Nepal—P. 14.

৫. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৬—নেপালে বাঙ্গালা নাটক—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬. A History of Maithili Literature—Vol I—Dr. Joykanta Misra. Allahabad. 1949—P. 155.

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড—সুকুমার সেন ; পৃ—৩৯৯। ১ম সংস্করণ।

৮. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—ঐ—পৃ-১৭২।

৯. নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা—৯। ১৩২২ সাল।

১০. The Bengali Drama—P. Guha-Thakurta. London. 1930. P. 32.

১১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ—সুকুমার সেন, পৃ-৪৪.

১২. ঐ—পৃঃ ১৪৮।

১৩. নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২৪ সাল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

প্রাক্-আধুনিক প্রমোদকলা ও নাট্য-পরিণতি

মধ্যযুগের প্রমোদকলা

মধ্যযুগে ভক্তি প্রভাবিত নাটক ব্যতীত অন্যবিধ প্রমোদকলাব অস্তিত্ব ছিল।

কৃত্তিবাস থেকে শুরু কবে ঘনশ্যাম চক্রবর্তী ও ভাবতচন্দ্র রায় গুণাকর—এই তিনশত বৎসবের সাহিত্যইতিহাসে আমবা নানা জাতীয় নৃত্যগীতেব উল্লেখ পাই। শাক্ত-সাহিত্য, বাম-পাঁচালী ও ভারত পাঁচালীব নানা উদাহবণ সংগ্রহ করা কষ্টকব নয়।

কৃত্তিবাসের বামায়ণে সে-যুগেব প্রমোদকলাব একটি বিববণ পাই। শিবদুর্গাব বিবাহ উপলক্ষে হিমালযের গৃহে আমোদপ্রমোদের যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল, তা প্রকাবান্তরে বিবাহ-উৎসব-মুখব বাঙ্গালীর পারিবাবিক ছবি।

নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে।
কেহো পঢএ কেহ পঢএ মঙ্গলে॥
নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালযেব ঘবে।
পবম আনন্দে লোক আপনা পাসবে॥

(বামায়ণ—পরিষৎ সংস্কবণ)

চৈতন্য পূর্ব ও চৈতন্য-সমসাময়িক যুগেব আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে ভাগবতে একাধিক বিজ্ঞপ্তি আছে।

ধর্মকর্ম লোক, সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীব গীত কবে জাগবণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জন।
পুত্তলি কবযে কেহো দিযা বহুধন॥

*   *

সকল সংসাব মত্ত ব্যবহার বসে।
কৃষ্ণ পূজা বিষ্ণুভক্তি কাবো নাহি বাসে॥
বাসুলী পূজযে কেহো নানা উপহাবে।
মত্ত মাংস দিয়া কেহো যজ্ঞপূজা করে॥

নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
(আদি লীলা, ২য় অধ্যায়)

ধর্মকর্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরী।
তাও সে পূজেন কেহো মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহাই শুনিতে সর্বলোক আনন্দিত॥
(অন্ত্যলীলা, চতুর্থ অধ্যায়)

এতো গেল ষোড়শ শতকের কথা।

সপ্তদশ শতকে আলাওল-রচিত পদ্মাবতী কাব্যে পাচ্ছি

বোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব আলিম বলি আদর করেন্ত॥
বহু মহান্তর পুত্র মহা মহা নর।
নাটগীত সঙ্গত শিখান্ত বহুতর।
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি।
গীত নাট যন্ত্র তন্ত্র রঙ্গ ঢঙ্গ করি।

ভবিতব্য থাকে যেই, অবশ্য হইবে সেই,
বুদ্ধিবলে নাহিক এড়ান।
অজ্ঞান ভাবয় দুঃখ, জন্মিতে ররিবো সুখ,
সদনন্দ সাহস প্রমাণ॥
এতেক ভাবিয়া চিত্তে, রত্নসেন আনন্দিতে,
রাজদ্বারে রচি নৃত্যশালা।
হরষিতে সর্বজন, নাচয় নর্তকীগণ,
পঞ্চশব্দ করি এক মেলা॥
ছয় রাগ হাঙকারিয়া, ছত্রিশ রাগিণী লৈয়া,
মধুস্বরে কৈল আলাপন।

দক্ষিণান্ত অঙ্গ গেলা, নানা কাছে নানা ভালা,
স্ববীণ হস্তক সুলক্ষণ ॥
কহিতে নৃত্যের কথা বহুল বাড়য় পোথা,
না কহিলে শান্ত নহে মনে।

* * *

হস্তকের থাদ্য আর যত অভিনয়।
সে সব কহিতে পোথা অধিক বাঢ়য় ॥

(পদ্মাবতী-আলাওল, সিদ্দিকী সংস্করণ—১৩৩৮, পৃ—২২২)

অষ্টাদশ শতকে ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত ধর্মমঙ্গল কাব্যে অনুপ্রাসের কলরোলের মধ্যে রয়েছে ছোট্ট একটি সংবাদ :—

পুলকে প্রণাম ঘাটে, পদ্য বাদ্য গীত নাটে,
যাগ-যজ্ঞে জাগিল যামিনী।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে নাট্যশালার বর্ণনা পাই—

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিলা সায়।
মহাবেগে আট ভাই আটদিকে ধায় ॥
নাট্যশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশজন ॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর ॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাগুরিতে ॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসের সাক্ষ্য থেকে ষোড়শ শতকের প্রমোদকলার দুইটি রীতির উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে—এক হোল নাটগীত; দুই হোল মঙ্গল অর্থাৎ পাঁচালী। নাটগীত ও পাঁচালী দুইটি স্বতন্ত্র প্রমোদকলা, একথা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হোল। পাঁচালী বা মঙ্গল নানা জাতের ছিল, একথাও কবি বলেছেন এবং পাঁচালী যে পাঠ্য ছিল, তাও বোঝা যায়; কারণ বেদপাঠের সঙ্গে একই ভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাঁচালী যে নৃত্যঅভিনয় নয়, এই স্বীকৃতি আমাদের পরে কাজে লাগবে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারছি যে, চৈতন্য-পূর্ব-যুগে বা চৈতন্য-আবির্ভাব কালে মঙ্গলচণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল; আরও নানাবিধ নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল; কিন্তু তার মধ্যে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ছিল না। তবে এই

সময়ে ষষ্ঠী, বাসুলী ও বিষহরীর পূজা প্রচলিত হয়েছিল, এবং মহাদন্তের সঙ্গেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হোত। তখন তাদের মহাত্মা কীর্তন করে কোন নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হোত বলে কবি জানাননি। অনুষ্ঠিত হোত যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত। অর্থাৎ সে-যুগে অতিদূর অতীতের কীর্তিমান কোন নৃপতির গৌরব-কাহিনী অবলম্বনে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হোত, ষষ্ঠী বাসুলী ও বিষহরি তখনও নৃত্যগীতেব বিষয়ভুক্ত হননি। নারী-দেবতার মধ্যে কেবল মাত্র মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি প্রণতি জানিয়ে মঙ্গলগান বা পাঁচালী বচিত হযেছিল।

আলাওল-রচিত পদ্মাবতী কাব্যে নাটগীতের উল্লেখ পাওযা যাচ্ছে—এই নাটগীত উত্তব ভাবতীয প্রথাসিদ্ধ নাটগীত হওয়াই সম্ভব, কারণ আলাওল ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। আব পদ্মাবতী জাযসীর কাব্যের ভাষান্তরণ। ভারতচন্দ্রে নাট্যশালাব উল্লেখ বযেছে, সাজসজ্জার উপকরণ উল্লিখিত হযেছে। কিন্তু এ নাট্যশালা ধ্রুপদী নাট্যশালা, বাজসভাব নাট্যশালা। সম্ভবত এ নাট্যশালায ভাষা-নাটক অভিনীত হোত না, হোত সংস্কৃত নাটক বা কোন মিশ্রভাষায বচিত নাটক– যে কাবণে তা লুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসে তাব কোন মূল্য থাকেনি। পাঁচালী ও নাটগীত —এই দুইটিই তাহলে দাঁড়াচ্ছে মুখ্য প্রমোদকলা।

মধ্যযুগের অবসান-মুহূর্তে আবও নানা নতুন প্রমোদবীতিব উদ্ভব ঘটে। যাত্রা ও নাটকের সঙ্গে ঐগুলির সম্পর্ক বিচাবসাপেক্ষ।

পাঁচালী ও যাত্রা

প্রথমে পাঁচালীর প্রসঙ্গেই আসা যাক। ষোড়শ শতক থেকে শুরু কবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পাঁচালী বা 'মঙ্গল'গান ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রমোদকলা। অনেকেই এই পাঁচালী বা মঙ্গলগান থেকে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে, এই রূপ মন্তব্য করেছেন।

পাঁচালী শুধু শাক্ত, শৈব বা রামকাহিনী সংবলিত সাহিত্য ছিল না। চৈতন্যজীবনীও পাঁচালীর আকারে রচিত হয়েছিল। এবং পাঁচালীব মতই সুর করে পড়া হোত –অন্তত কৃত্তিবাসেব সাক্ষ্য থেকে তাই মনে হয়। পরবর্তী যুগে এই পাঁচালী গানে নৃত্য ও যন্ত্রের সহায়তা নেওয়া হয়। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেছেন: "মঙ্গলগীতি বা পালাগানের মধ্যে এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরেব ভিতর দিয়াই নাট্যাভিনয়ের অঙ্কুব দেখা দিয়াছিল।.... এই

সকল প্রাচীন মঙ্গলগীতির মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভাব থাকুক, নাটকত্বের অভাব ছিল না।"[১] তাঁর মতে পাঁচালী গানের ক্রমিক পরিণতির ফলে যাত্রা গানের উদ্ভব ঘটে। এবং কি করে এই উদ্ভব ঘটে, তিনি তারও একটা বিবরণ দিয়েছেন: "সুবিধার জন্য প্রথমে একজন অভিনেতার স্থানে দুইজন অভিনেতার প্রবর্তন হয় এবং পরে বিভিন্ন প্রকৃতির ভূমিকার সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত অভিনেতার সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া যায়।

এইরূপে অভিনেতা বৃদ্ধির সহিত পালাগান ক্রমশ যাত্রাগানে পরিণত হইয়াছিল এবং গেয়-কাব্য-নাটকের রূপ ধারণ করিয়াছিল।"[২]

জর্জ টমসন তাঁর এক গ্রন্থে দেখিয়েছেন কীভাবে 'dithyramb' থেকে নাটকের উৎপত্তি ঘটল, কীভাবে ইসকাইলাস সর্বপ্রথম দ্বিতীয় ভূমিকার প্রবর্তন করলেন; পরে সোফোক্লিস তৃতীয় ভূমিকা সৃষ্টি করে নাটকের প্রকৃতি আরও বদলিয়ে দিলেন। "In Aeschylus the interchange is never completely reciprocal. In the Agamemnon Cassendra is pressed during the dialogue between Agamemnon and Clytemnestra but says nothing at all, similarly in the prologue of the Prometheus Bound the horo remains silent until Might and Hephaestus have gone. In these two cases the silent character is introduced for the sake of the sequel."[৩] এখানে 'for the sake of sequel'—ঘটনার পারম্পর্যের জন্য স্বয়ং লেখককে আর ব্যবহার করতে হয়নি, ব্যবহার করা হয়েছে নাটকেরই চরিত্র-বিশেষকে। আর পাঁচালী শেষ পর্যন্তও পাঁচালীকারকে ত্যাগ করতে পারেনি।

পাঁচালীর সর্বশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন যিনি এবং যিনি স্বয়ং এই জাতীয় গীতি রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

"নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ পাঁচালি বস্তুটা কি, একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফ-আখড়াই ও দাঁড়া-কবির ন্যায় পাঁচালীতে দুই দলে সঙ্গীত সংগ্রাম হইত, কিন্তু উহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন একদল পূর্বপক্ষ রূপে আসরী গান গাইলে অপর দল উত্তরপক্ষ রূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালিতে তৎপরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানেরই লড়াই হইত—যে দল

অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাইতে পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিময়ী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত।

পাঁচালীর প্রণালী এইরূপ :—হাফ-আখড়াইয়ের ন্যায় তানপুরা, বেহালা ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্যযন্ত্র—ইদানীং ঐকতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ-আখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত—সে বাদ্যের নাম 'সাজ-বাজানো'। সাজ-বাজনার পর ঠাকুর-ঠাকরুণ বিষয় বা 'শ্যামা বিষয়'। প্রথমেই শ্যামা বিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাইবার পর কাটানদার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন অর্থাৎ ঐ কার্যের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত কখনো বা সহজ গলায় ; কখনো বা এক প্রকার স্বরের সাহচর্যে, কখনো বা বাদ্যে; কখনো বা গদ্যের ছুটকথায় উচ্চ স্বরে ছড়া বিন্যাস করিতেন—কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমাঞ্চ হইত। ফলতঃ সুকবির রচনা ও সুকাটানদার কর্তৃক যোজনা হইলে নানারূপ উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান। কোন কোন দলে এই গান এমন মিলশুদ্ধ ও তান-লয় বিশুদ্ধভাবে গাওয়া হইত যে, শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া অজ্ঞাতসারে 'আহা আহা' না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোঁড়াদল যোগ্যাযোগ্য সকল অবস্থাতেই বাহবার চীৎকারে আসর ফাটাইয়া দিত ; তাহাতে কখনো বা জ্বালাতন করিত, কখনো বা হাসাইত।

শ্যামা বিষয় প্রায় এক ছড়াতেই সমাপ্ত হইত, কিন্তু অনেক দলে দুই তিনটা ছড়া, সুতরাং তিন চারিটিও গাওয়া হইত। সে যাহা হউক, ঐ দল শ্যামা বিষয় গাইয়া আপনাদের যন্ত্রাদি সহিত উঠিয়া যাইতেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদল আবার নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামা শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্বার পূর্বদল আসিয়া সাজ বাজাইয়া সখী সংবাদের মহড়া গানটি গাইয়া ছড়া কাটাইতেন। প্রথম ছড়ার পর গান ; আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান ; আবার তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান—এই রূপে কয়েকটি ছড়া ও কয়েকটি গানের পর তাহাদের প্রস্থান ও অপর দলের প্রবেশ এবং ঐরূপে ছড়া গান গাইয়া সখী-সংবাদ মিটিয়া যাইত। পরে বিরহের বেলাতেও ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইত। একটি কথা বলিতে অবশিষ্ট ;—যখন যে দল যে প্রসঙ্গ বিন্যাসহেতু আসরে নামিতেন, তখন তাঁহারা যে কয়টি ছড়া ও গান করিতেন, ছড়ার সমুদায়তেই সেই একই বিষয়ে আনুপূর্বিক বর্ণনা থাকিত—বিভিন্ন ছড়ার যে বিভিন্ন বিষয়, তাহা নয়।

অর্থাৎ এক দল সখী-সম্বাদের সময় প্রথম ছড়ায় মাথুর, দ্বিতীয় ছড়ায় মান, তৃতীয় ছড়ায় দান গাইবেন, তাহা হইবার যো নাই—সব ছড়াতেই সেই একই প্রসঙ্গ বিবৃত করিতেন।" ৪

পাঁচালী যে নাটকের উদ্ভব ঘটায়নি, তা এই বিবরণী থেকেও অনুমান করা যায়। মনোমোহন বসু পাঁচালীর সর্বশেষ পরিবর্তন বর্ণনা করেছেন—এই স্তরে পাঁচালী কবিসঙ্গীতের দ্বারা অশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছে। অবশ্য প্রভাবিত হয়েও তার স্বতন্ত্র রূপ বজায় রেখেছে। পাঁচালীর বিষয়ের মধ্যেও এই পরিবর্তন দেখা যায়—মাথুর-মান-দান তখনকার প্রধান বিষয়। এই বিষয়-বস্তু কবিসঙ্গীতেরও প্রধান বিষয়বস্তু।

প্রতিযোগিতার কথা রয়েছে, হার-জিতের কথা রয়েছে। এই প্রতি-যোগিতাব মনোভাবই কবির লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

এখানে পাঁচালী গানের সঙ্গে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর কথা আছে; নিঃসন্দেহে এই অঙ্গভঙ্গী গায়কী পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না। এটা অভিনয়রীতির অংশ। কিন্তু এই অভিনয় একক অভিনয়। যাত্রার দ্বারা প্রভাবিত, তবে যাত্রাকে প্রভাবিত কবছে না। যাত্রায় একক অভিনয়ের স্তর বহুকাল পূর্বেই অবসিত হয়ে গেছে।

পাঁচালী গানে সঙ প্রচলিত; দাশু রায়কেও সঙ দিতে হোত। তার অর্থ, অন্য কেউ সেজেগুজে মঞ্চে বা আসরে অবতীর্ণ হতেন না। দাশু রায়ই তাঁর গানে 'রস প্রসঙ্গ' বিতরণ করতেন। অবস্থা অনুসারে শ্রোতৃবর্গেব মুখ চেয়ে তিনি এই রঙ্গরসের অবতারণা করতেন।

অপরে করিতে রাগ, ঘুচাইতে সে বিরাগ,
পরে কিছু অপব প্রসঙ্গ।
প্রেমচন্দ্র প্রেমমণি, প্রেম-বিচ্ছেদের বাণী
রসিক-রঞ্জন সে রঙ্গ।

পাঁচালী বা মঙ্গল গান প্রথমে শুধুই পাঠ হোত; কৃত্তিবাসের রামায়ণে ছিল "কেহো বেদ পঢ়এ কেহো পঢ়এ মঙ্গলে"; পরে মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যানে প্রথম সঙ্গীতের স্পর্শ লাগল। চৈতন্যআবির্ভাব যুগে ষষ্ঠী, বাসুলী ও বিষহরির পূজা প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু মঙ্গলগীতির কোন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত এই যুগে অন্য দেবীর মাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ লিখিত হয়নি। কবিতায় একথা তাহলে কবি উল্লেখ করতেন—যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে "বাসুলী শিরে বন্দী গাইল

চণ্ডীদাস।" তখনও বাস্থলী বা বিষহরির মাহাত্ম্যসূচক গান রচিত হয়নি, যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত তখনও সানন্দে গীত হচ্ছে।

ভাগবত, রাম-পাঁচালী ও ভারত-পাঁচালীব শুধু পাঠ হোত; তারপর ধীরে ধীরে সেখানেও সঙ্গীত এসে আধিপত্য বিস্তার কবল। ভোলানাথ চক্রবর্তী-লিখিত "সেই একদিন আর এই একদিন" নামক প্রস্তাব থেকে জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার কথকতার উদ্ভব কীভাবে হোল, তাব এক সুন্দর বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। আমবাও সেই উদ্ধৃতিটি এখানে পবিবেশন করছি:

"একদা বাঁকুড়া জেলাব অন্তর্গত সোনামুখীনিবাসী গদাধর শিরোমণি মহাশয় একস্থানে শ্রীমদ্-ভাগবৎ পাঠ কব্রিতেছিলেন। প্রাতে যথারীতি পাঠ হইত। বৈকালে শিবোমণি মহাশয় বেদীতে বসিয়া ভাগবতের কোন কোন স্থান ব্যাখ্যা কবিতেন। তিনি উত্তম ব্যাখ্যাকার ছিলেন। অন্য অন্য স্থানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে বিস্তব লোক উপস্থিত হইত। কিন্তু ঐ স্থানে অধিক শ্রোতা আসিতেছে না দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন নিকটে একস্থানে বামায়ণ গান হইতেছে। সেইখানেই সকল লোক যাইতেছে। শিবোমণি মহাশয় বলিলেন, আচ্ছা সকলকে বলিবে, কল্য হইতে আমার নিকট ভাগবৎ গান শুনিতে পাইবে। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, তেমনি গায়ক ও কবি ছিলেন। বাত্রিতে পরদিনের ব্যাখ্যেয় অংশকে তাঁহার স্বকপোলউদ্ভাসিত কথকতাব রীতিতে পবিণত কবিয়া বাখিলেন। পরদিন বৈকালে নূতন বীতিতে কথকতা আবম্ভ কবিলেন, চারিদিক হইতে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাব স্বব-সংযোগ, বাক্যবিন্যাস, ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত পদাবলী শুনিয়া লোকে বিস্মিত ও মোহিত হইল। এইরূপে শিবোমণি মহাশয় প্রতিদিন ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, বামনভিক্ষা প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ সকল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাই কথকতার প্রথম সৃষ্টি।"[৬]

কথকতা কবে উদ্ভাবিত হোল, সে বিবরণ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীভাবে হোল, সে-বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ। মনোমোহন বসু-ব্যাখ্যাত পাঁচালী আর কৃত্তিবাসের পাঁচালীর মধ্যবর্তী রূপ পাচ্ছি ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বিবরণে। গানের ক্ষেত্রে যখন এই পরিবর্তনটি সাধিত হচ্ছে, তখন অভিনয়ের পালা নাটগীতির স্তর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। পাঁচালীর পরিবর্তন ও নাটগীতির পরিবর্তন একই সময়ের ঘটনা, চৈতন্যদেবের 'কাচ কাচিয়া'র পর

নাটগীতি উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এর কিছু পূর্বে যাত্রার আবির্ভাব ঘটাও অসম্ভব নয়।

পাঁচালীর মধ্যে যাত্রার ধর্ম লুকিয়ে থাকে; সমস্ত আখ্যানমূলক কাব্যেই নাটকীয়তা থাকে। এ্যারিস্টটল তো 'এপিক' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, পাত্রপাত্রীদের জন্য মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে মহাকবি নিজে বিদায় গ্রহণ করেন। তবু ট্রাজেডির উৎস তিনি এপিকের অভ্যন্তরে অনুসন্ধান করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে-লোক 'এপিক' শুনতে চায়, সেই লোকই নাটক্ বা অভিনয় দেখতে চায়। একইপ্রকার আদিম কৌতূহল ও উপভোগ-স্থান থেকে উভয় শিল্পকলার জন্ম। বাংলাদেশেও পাঁচালী ও নাটগীতি একই সঙ্গে চলেছে, সমান্তরালভাবে চলেছে। উভয়ের বিকাশ ঘটেছে উভয়ের স্বতন্ত্র চরিত্র অনুসারে। পাঁচালী থেকে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে, এই সিদ্ধান্তে নামতে গিয়ে শ্রীমন্মথমোহন বসু বলেছেন, পাঁচালী গানে ক্রমশঃ একাধিক গায়েনের আমন্ত্রণ করা হয়। "এইরূপে অভিনেতার বৃদ্ধির সহিত পালাগান ক্রমশ যাত্রাগানে পরিণত হইয়াছিল।" এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। পাঁচালী গানে পাছ্ দোহার থাকত, অর্থাৎ কবির ধ্রুবসঙ্গীত পুনঃপুনঃ গাইবার জন্য গায়কদল থাকত, কিন্তু মূল গায়েন কবি নিজেই। এ সম্পর্কে আমরা আধুনিক পাঁচালী গানের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁধনদার ও গায়ক দাশরথী রায়ের (১২১২-১২৬৪) গায়কী রীতির পরিচয় তুলে ধরছি:

"দাশু রায়ের পাঁচালী গাহিবার প্রণালীও অতি সুন্দর ছিল। চারি পাঁচ সহস্র লোক দাশু রায়কে বেষ্টন করিয়া পাঁচালী শুনিবার জন্য সোৎসুক চিত্তে অবস্থিত; মধ্যস্থলে গায়ক দাশু রায় দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করিয়া উচ্চারণ করিতেন—তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃগণের দিকে চাহিয়া দুইবার। ইহাতে সর্বদিগ্‌বর্তী শ্রোতৃগণ পাঁচালী উত্তমরূপে শুনিতে পাইতেন, বুঝিতে পারিতেন—অনেকের মুখস্থও হইয়া যাইত।"[৭] তখন জনরুচির প্রতি গায়কের নজর রাখতে হোত; তাই দাশু রায় অবস্থানুসারে স্বরচিত পালার পরিবর্তন সাধন করতেন—"শ্রোতৃমণ্ডলীর ভদ্রত্ব-ইতরত্ব বুঝিয়া" শব্দের পর্যন্ত পরিবর্তন সাধন করতেন।[৮]

কিন্তু যা-ই করুন তিনি নাটকের অভিনয় করতেন না, যাত্রারও উদ্ভব ঘটাতেন না।

পাঁচালী একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যশ্রেণী (a separate genre); আম্রবৃক্ষে কাঁঠাল জন্মাতে পারে না।

দাশু রায় রচিত পাঁচালী বিশ্লেষণ করলে আমাদের বক্তব্য আরও পরিষ্কার হবে।

দাশরথী রায়

দাশু রায়ের সব পালা কথোপকথনমূলক নয়; যেমন 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী'। এই পালায় শুধুই গান। পাঁচালীকার একমাত্র গায়ক বা কথক। কোন কোন পালায় বর্ণনা আছে, কথোপকথন সমপরিমাণ আছে—যেমন 'শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা'।

'কলঙ্কভঞ্জন' পালায় সেই একই রীতি। সে-যুগে কবিসঙ্গীত, যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, ঝুমুর—সর্বত্রই কলঙ্কভঞ্জনের প্রবল সমাদর। বিভিন্ন পালায় এই এক বিষয়বস্তু কি ধরনের ব্যবহার পেয়েছে, তা আলোচনার যোগ্য। সে-যুগের রুচির সঙ্গে এই বিষয়বস্তুর খুবই আত্মীয়তা জন্মেছিল।

দাশু রায়ের পালা আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে—

একদিন বৃন্দাবনে, শ্যামকে পেয়ে সঙ্গোপনে,
কাতরে কহেন ব্রজেশ্বরী,

অনেক সমজাতীয় দৃষ্টান্ত দাখিল করে শ্রীমতী জানালেন,

'কৃষ্ণ ভজে কলঙ্কিনী রাধা।'

এই সূচনা নাটকের সূচনা নয়, মঙ্গলকাব্যের সূচনা। শুধু সূচনা নয়, পালার সর্বত্রই গল্পের রসি কথক বা পাঁচালীকারের করে ধৃত।

শুনি রাধার অভিমান, করিয়ে অতি সম্মান,
বিদ্যমান কহেন মাধব।

শ্রীকৃষ্ণ অনেক খোসামুদে কথা বললেন,

তুমি হে ব্রহ্মরূপিণী, গোলোক ত্যজে গোপিনী,
ভ্রান্তে কি তোমারে পারে চিনতে?

এর পর শ্রীমতীর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ কপট মূর্ছাগত হলেন।

এখানে আবার কথকঠাকুর হাজির—

মুদিত করি দু নয়ন, ভূতলে করি শয়ন,
গোপাল হইলেন মূর্ছাগত।

তারপর এইভাবে পালা এগিয়ে চলল—

অচেতন দেখি গোপালে, করাঘাত করি কপালে,
ডাকে রাধা হয়ে উন্মাদিনী,
রোহিণী দিদি কোথায়, রহিলি গো! দেখ সে আয়,
সঙ্কটে পড়েছে নীলমণি।

শ্রীকৃষ্ণের মূর্ছাপ্রাপ্তি শুনে গোকুলের রমণীরা নন্দের গৃহে গিয়ে জটলা করতে লাগলেন।

যত রমণী বৃন্দাবনে, সবে গেল নন্দ ভবনে,
এক মাগী ঘরেতে না রহিল।

নন্দ গৃহে ছিলেন না।

হেথা যেখানে ছিলেন নন্দ, মূর্ছাগত শ্রীগোবিন্দ,
পরম্পরায় শুনে কর্ণমূলে।

* * * *

প্রবেশ হইতে ধামে, পথে দেখি বলরামে,
কি জিজ্ঞাসেন ভাসি চক্ষু জলে।
ওরে বাছা বলভদ্র! নীলমণির কি বল ভদ্র,
আর কি বল হবে রে গোকুলে।

নন্দ সব দেখে শুনে ভারতীয় গৃহে যেমনটি হয়ে থাকে, তাই করলেন। স্ত্রীর প্রতি কোপ প্রকাশ করলেন। তখনই নন্দালয় অভিমুখে নারদ যাত্রা করলেন।

গোকুলে কপট মূর্ছাগত হন চিন্তামণি।
জানিয়া নারদযোগী উদ্যোগী অমনি॥
অতিকষ্টে ঢেঁকিপৃষ্ঠে করি আরোহণ।
দেখিতে আনন্দে যান নন্দের ভবন॥

* * *

নারদ যবে, পরোৎপরে, চিন্তিয়া হৃদয়ে।
যান প্রেম ভরে, দেখিবারে, গোপালে গোপালয়ে।

তখনই নারদের মুখে দাশরথীর সেই অতিপরিচিত গানটি শোনা যাবে—

হৃদি বৃন্দাবনে বাস, যদি কর কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী।

এর পর শ্রীমতীর সহিত পূর্বনির্ধারিত চক্রান্ত অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বৈদ্য-বেশে নন্দালয়ে উপস্থিত হলেন। 'কপট' মূর্ছা সারাবার ঔষধ বাতলালেন অভিনব—ফুটা কলসী করে যথার্থ সতী ব্রজরমণীকে জল আনতে হবে, আর সেই জলস্পর্শে মূর্ছা দূর হবে। জটিলা কুটিলার বড় অহঙ্কার ছিল সতী রমণী হিসাবে। তাঁরা পরাস্ত হয়ে পড়লেন। তখন ডাক পড়ল শ্রীমতী রাধিকার। ছিদ্র ঘট নিয়ে জল আনতে যাবার প্রাক্‌কালে তিনি কেশবের নাম স্মরণ করলেন। এবং বিজয়িনী হলেন সেই পরকীয়া প্রেমের নায়িকা—

কলসীতে জল পুরে, রাই যান নন্দের পুরে,
চরণে রত্ন নূপুরে, কিবা মধুর ধ্বনি।

সেই জলস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের কপট মূর্ছা ভঙ্গ হোল। মূর্ছা ভাঙ্গার পর—

ডাকিছেন জননী বলে, যশোদা আসি প্রাণ বিকলে,
লয়ে কোলে নীলকমলে, কাঁদে বদন হেরি।

রাণী যশোদা কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন, রাধিকাকে এক বিরাট 'সার্টিফিকেট' দিলেন—

তো হতে সুখ জন্মায় অতি, হয়ে থাকো জন্মায়োতি,
তুমি মা সাবিত্রী সতী, এই বৃন্দাবনে।

সে-যুগের রসবোধের এবং পাপপুণ্যবোধের অঙ্গে সুড়সুড়ি দিয়ে পালা শেষ হোল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-পালা পাঁচালী বা মঙ্গলগানের পালাই থেকেছে, নাটগীত বা যাত্রার পালা হয়ে ওঠেনি।

দাশরথী রচিত 'মানভঞ্জন' পালা খুবই পরিচিত। এই পালা সর্বাধিক উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক। গায়েন বা পাঁচালীকারের জবানীতে বেশি কিছু নেই। কিন্তু তবু এটি যাত্রা বা নাটগীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। যাত্রার পূর্বরূপ এর ভিতর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মানভঞ্জন পালা শুরু হচ্ছে শ্রীমতীর বিরহবিলাপ দিয়ে, সখীরা সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

বাসর সুসজ্জা করে, না হেরি বাঁশরীধরে,
চিত্ত না ধৈরজ ধরে, ভাসে চক্ষুজলে।

পাঁচালীকারের বয়ান আব রাধার বয়ান কোন কোন ক্ষেত্রে মিশে আছে। যেমন শ্রীমতীর প্রথম গানটি। তবে দ্বিতীয় গানটি পৃথক্‌। শ্রীমতীর বিলাপ বেশ কিছুক্ষণ চলল।

তা শুনে বৃন্দে কিঙ্করী, কহিছে বিনয় করি,
আইমা, ছিছি! কেমন ঔদাস্য!

রাধা আবার গান ধরলেন—

আসার আশা আর কেন গো বৃন্দে!
গোবিন্দে বিনে বেদনা, প্রসন্নহীনা বদনা,
রাইকে দেখে বলে বৃন্দে দূতী।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেছেন। চন্দ্রাবলী গান ধরলেন—

দাসীর কুঞ্জে থাক এ শর্বরী!

উৎসাহভরে তিনি আরও দুইটি গান গেয়ে ফেললেন। এদিকে রাধা অন্য কুঞ্জে দারুণ চটে রয়েছেন, কালোরূপেই তাঁর এখন বিরাগ। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কুঞ্জে এলেন, সে বিবরণ আমরা পাচ্ছি স্বয়ং পাঁচালীকারেব জবানীতে।

হেথায় রহস্য কথা শুনহ বিশেষ।
রাধানাথ রাধাব কুঞ্জে চলিছে প্রত্যুষে ॥

রাধার কুঞ্জে এসে বৃন্দা দূতীব সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হোল, অবশ্য সবই গানে। মুরলীধারী ধারণ করলেন রাধিকার পদযুগল, তবু ক্ষমা হোল না। তারপর নানারকম কাণ্ডকারখানা! শ্রীকৃষ্ণ যোগিবেশ ধারণ করে অবশেষে মার্জনা অর্জন করলেন। তখন মিলন হোল। পাঁচালীকার সেই বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতার মত আমাদের কাছে দাখিল করছেন

কি শোভারে কুঞ্জে রাই-শ্রীগোবিন্দ।
নবঘন—পাশে যেন উদয় হোলো রাকাচন্দ।
ব্রজেশ্বরী রাই-কিশোরী হরির হরি নিরানন্দ।
বিতরিছেন বংশীধরে সমাদরে প্রেমানন্দ ॥

পাঁচালীকারের এই বক্তব্যকে নাটকের ভরতবাক্যও বলা যেতে পারত, কিন্তু এটা নাটক নয়, পাঁচালীই।

পাঁচালীর মধ্যে এখানে যাত্রা, কবিসঙ্গীত ও ঝুমুরের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে। কথোপকথন (সঙ্গীতের আশ্রয়ে) বেশি স্থান পেয়েছে; দৃশ্য পরিবর্তনও আছে; নাটকের মত 'অঙ্কের বিধান' করাও সম্ভব। কিন্তু তবু দাশু রায় গল্পের সূত্র নিজের হাতেই রেখেছেন, পালার কুশীলবদের হাতে ছেড়ে দেননি। একই ব্যক্তি তাঁর কুশীলব উত্তর-প্রত্যুত্তরই করেছে—ঘটনার চালক হতে চায়নি। দাশুরায় রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী

অবলম্বনে পালা বাঁধছেন ; পূর্বে রামায়ণের পাঁচালী, ভাগবতের পাঁচালী বিভিন্ন ব্যক্তি গাইতেন। দাশু রায় তেমন রীতি অনুসরণ করেননি। সে-যুগে ধর্মকলহ শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

অপর উদাহরণ

জয়নারায়ণ ঘোষাল লিখিত 'করুণানিধানবিলাস' কাব্যে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধের পাঁচালীর একটি নমুনা আছে।[৭] কেউ কেউ তাকে পাঁচালী-যাত্রার উদাহরণ বলে অনুমান করেছেন। বিষয়টি মনোযোগের অপেক্ষা রাখে। আমরা সম্পূর্ণ পাঁচালীটি উদ্ধৃত করছি :—

॥ গীত পাঁচালী ॥

॥ তাল খেমটা ॥

এবার আর কেমন কর্যা বলিবে তোরে রাধা কলঙ্কিনী ॥ ধুয়া ॥

জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত
তাহা মুই কবো কত
অবিরত বলিতে লজ্জা পায়
পরশ্চে সতীর গুণ হইল বিদিত
নারীর চরিত্র যত
অভিভূত শুনিয়া সবাই
ঘরে ঘরে করে কানাকানি।

॥ দোসরা গীত ॥

॥ নারদ বাসুদেবের উক্তি ॥

॥ রাগিণী ঝুমুর ॥

॥ তাল খেমটা ॥

এই কলঙ্ক ভঞ্জনের কথা শুনি নারদ মুনি ॥ ধুয়া ॥
বাসুদেব সঙ্গে কর্যা আসিল আপনি ॥ পর ধুয়া ॥
অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান
দেখা হইলে মোর কথা কবা তুমি এই করি যোড় পানি ॥
বাসু কহে কেমন কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে
জাতিকুল কহ তার থাকে কার ঘরে
জনমিয়া দেখি নাই তারে বল কেমন কর্যা চিনি ॥

মুনি কহে নীলকান্ত জিনি রূপ তার
আভীর জাতি মধ্যে আছেন এবার
বৃন্দাবনে বাস তাব নন্দ ঘরে যাব মাতা নন্দবাণী ॥
বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয়।
মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তখনি।
বৃন্দাবন পথ ভুলি যায় দিল্লী পানে
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান অন্ধজনে
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেবিল সে নীলমণি।
॥ বাসুদেবেব গীত আরম্ভ ॥
॥ বাগিণী সুহিনি ॥
॥ তাল পশতো ॥
রূপ দেখিয়া অবাক হইল মাবদেব বাসু ॥ ধুয়া ॥
চবণতলে দেখ কত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পব ধুয়া ॥
ঘুঙুব বাজে নূপুব বাজে অভয় দিছে আশু
চবণ-কমল হেবি হইল উল্লাস।
কবিতে স্তুতি, নাহিক জানি আমি অতি পশু
তোমাব তত্ত্ব লৈতে মুনি পাঠাইলা বাসু।
পিতামহেব তাত তুমি এবে হইলা শিশু
না দেখি বিমল পদ মুনিবব ত্রাসু ॥
আজ্ঞা হৈল মুনিববে আনে গিয়া বাসু
অজ্ঞান পাপীব পাপে মাব জ্ঞান ইষু ॥
॥ গীতমুনি উক্তি ॥
॥ বাগ ভৈবব ॥
॥ তাল চলতা ॥
কখন সে হরি পদ দেখিবে এ দীন ॥ ধুয়া ॥
পাইয়া চবণসুধা
শান্ত হবে আশা ক্ষুধা
নয়ন চকোর আছে হইয়া রবে লীন ॥

হরিপদ মহাতরি
হেরিলে যাইব তারি
পার হব ভববারি আমি দীনহীন ॥
সে পদ সুচারুভানু
পাপ নাশে মম তনু
জপিব তাহার মন্ত্র ত্যজি—পরাধীন ॥
সে পদ নির্মল জল
তাহে রব অবিকল
প্রাণ সম দুই দল হব তাহে—মীন ॥
সে পদ অচল তলে
সন্ধি মম সুচঞ্চলে
তনুতরি নাহি টলে হইব প্রবীণ ॥
দেখিয়া চরণখানি
ধরে পদ দিয়া পাণি
পূর্ণ ব্রহ্ম জান্যা মুনি বাজাইল বীণ ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে
মুখে বলে হরে হরে
তারপর নতশিরে করে প্রদক্ষিণ ॥
নারদের নিবেদন
শুন প্রভু নারায়ণ
তোমার অধীন হন সদা গুণ তিন ॥ গীত সাঙ্গ ॥

বড় হরফিত পংক্তিগুলিব উপর দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে যে, পাঁচালিরই নমুনা এটি, পাঁচালি-যাত্রার নয়। গীতের সূচনাঅংশ এবং উপসংহারঅংশ সম্পূর্ণত অধিকারীর বা পাঁচালীকারের জবানীতে পরিবেশিত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঘোষাল মহাশয়ের দৃষ্টান্ত নিছক পাঁচালীর দৃষ্টান্ত। তবে অষ্টাদশ শতকের কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিশেষ বাগ্ভঙ্গির ছাপ থাকায় এই পাঁচালীতে উত্তর-প্রত্যুত্তর জমেছে ভালই। দাশু রায়ের পাঁচালীর গায়ক যদি দাশু রায় একাই হন, তবে এ পাঁচালীর গায়ক ও বাঁধনদার একই ব্যক্তি ছিলেন, একাধিক ব্যক্তি নন। দাশু রায় পরবর্তী যুগের পাঁচালীকার; কোন নূতন রীতির উদ্ভব হলে তিনি সেটি অনুসরণ করতেন বা আত্মসাৎ করতেন পুরানো রীতির প্রত্যাবর্তন ঘটাতেন না।

ঢপ্ কীর্তন ও যাত্রা

অষ্টাদশ শতকের কীর্তন গানের মধ্যেও দারুন পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পদাবলী কীর্তন নানা পালায় বিভক্ত হোল। এই পালাগুলির পিছনে থাকত একটি করে সূক্ষ্ম রসভাবনা। বিভিন্ন পালা বিভিন্ন রসের ভিত্তিতে তৈরি হোত। নানা পদকর্তার নানা পদ এক রস-ভিত্তিক বলে একটি পালায় আশ্রয়-লাভ করত। নানা যুগের পদ একটি পালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি ভাব ফুটিয়ে তুলত। পদকীর্তন ও নামকীর্তন—এই দুই শাখা নানা রীতিতে এগিয়ে চলতে থাকে।

লীলাকীর্তন বা পদকীর্তনের সঙ্গে যাত্রার পার্থক্য মৌলিক পার্থক্য। "লীলাকীর্তনের আসরে নন্দ, যশোমতী, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীদাম, সুবল, রাধা, ললিতা কেউ সশরীরে উপস্থিত থাকেন না, থাকেন শুধু মূল গায়েন, তাঁর দোহার ইত্যাদি। পদকর্তাদের রচিত পদ রসপর্যায় অনুসারে সাজিয়ে গেঁথে তোলা হয় এক একখানি পালা। গৌরচন্দ্রিকার পর মূল পালার পদ ধরেন মূল গায়েন। নীলকণ্ঠের কৃষ্ণযাত্রার পালা প্রায় গান সর্বস্ব, বলা যেতে পারে গীতনাট্য। ...ওতে গদ্যে রচিত কথা (বক্তৃতাও) ছিল, তার কিছু অংশ সুরে গাঁথা, কিন্তু অংশ শুধু অর্থাৎ স্বাভাবিক কথা।...তাব পালা লীলাকীর্তনের মতন শুধু গেয় নয়, অভিনেয়। পাত্র-পাত্রীরা সশরীবে উপস্থিত হতেন, আপন আপন ভূমিকা অভিনয় করতেন। সম্ভব ক্ষেত্রে একটু আধটু দৃশ্যের ব্যবস্থা করা হোত।"[১০] লীলাকীর্তনের কেবল পরিবর্তিত রূপ হোল ঢপ্ কীর্তন। পাঁচালী গান এই ঢপ্ কীর্তনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। পদকীর্তনের গায়ক আখর দিতেন, আখর কীর্তনের বিশিষ্ট পদেবই অলংকরণ। কিন্তু ঢপ্ কীর্তনে নানা গদ্য সংলাপ স্থান পেত—এগুলি আখব নয়, অলংকরণ নয়। এই গদ্য অংশগুলিতে নতুন বিষয়ের অবতারণা করা হোত।

মধুসূদন কিন্নর

ঢপ্ কীর্তনের প্রধান বাঁধনদার হলেন মধুসূদন কিন্নর (১২২০—১২৭৫) ওরফে মধু কান। তিনি ছিলেন যশোহর জেলা উলুশিয়া গ্রামের অধিবাসী। মধুসূদন কলকাতার কবিওয়ালাদেব দ্বারা তত প্রভাবিত হননি, অন্তত ভাব বা রসের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা আত্মরক্ষা করে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সে-যুগের সঙ্গীত রচনার যে সব প্রচলিত ঠাট ছিল, তা তিনিও ব্যবহার করেছেন—সেই অনুপ্রাসের আধিক্য এবং কলকাতাই বুলির সমাবেশ।

ঢপ্‌কীর্তনের এক একটি পালায় পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা অনেক ; যেমন 'অক্রূর সংবাদে'—অক্রূর, রাজা, নারদ, পদাতিক, শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা, রাধা, ললিতা।

ঢপ্‌কীর্তনে কথা ও গান তুল্য মূল্য পেয়েছে ; গীত তান ও সুর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তান হোল শুধু পয়ারের পংক্তি। এগুলি সুর করে আবৃত্তি করা হোত। কোথাও কোথাও তানের পাশে স্পষ্ট ভাষায় 'পয়ার' উল্লিখিত আছে।[১১] 'গীত' পর্যায়ের অংশে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখতে পাই। ঢপ্‌কীর্তন আসলে পদকীর্তনের আঙ্গিক অবলম্বনে রচিত ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কথকতার চাল, এর মধ্যে নাট্যীয় পোষকতা আদৌ নেই।

গদ্যাংশ বলছেন অধিকারী, অর্থাৎ একটি গীত থেকে আর একটি গীতে যাবার পথে গল্পের খেই ধরছেন তিনি ; আর গানগুলি গাইছেন কীর্তনীয়াবে দল।

'কলঙ্কভঞ্জন' সে যুগের প্রিয় গীত-বিষয় ; কবিগানে, যাত্রায়, ঢপে, সর্বত্রই 'কলঙ্কভঞ্জন'-এর বিষয়বস্তু সমাদর পেয়েছে। রাধিকা ফুটা কলসীতে জল এনে আপনার সতীত্বের মহিমা প্রদর্শন করলেন, এই কাহিনী ঢপ্‌কীর্তনে গীতের ওপর নির্ভর করে ষোলো আনা রচিত নয়। অনেক খানিই অধিকারী বা গোস্বামী মহাশয়ের কথকতার ওপর বরাত দেওয়া হয়েছে। গোস্বামী মহাশয় অবশ্য পুরুষ ও নারী উভয়ের ভাষণ একই কণ্ঠে পরিবেশন করেন, তবে তাতে যে কণ্ঠভেদজ্ঞাপক অনুকৃতি থাকত না, তা নয়।

"তখন রাধা পরিপূর্ণ কুম্ভ লয়ে গমন করিতেছেন, চতুর্দিকে ব্রজাঙ্গনারা কেহ হরিধ্বনি, কেহ জয়ধ্বনি, কেহ বা জয়রাধা শ্রীরাধা বলে আনন্দ করিতেছেন।

বিপক্ষ যাহারা তাহারা বলিতেছে দেখ দেখ সেই কুম্ভটি কিনা? না? তখন তাহারা এসে দেখলেন যে কুম্ভের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল বেঁধে আছে।

তখন জল লয়ে গেলেন প্যারী বৈদ্য বিদ্যমানে। বৈদ্য বলেন রাই তোমায় প্রণাম চরণে। আপনি লইলেন। বৈদ্য কুম্ভ কক্ষ হইতে জল পাড়ি ফেলে দিলেন কৃষ্ণের চক্ষেতে। উঠিল মুরুলীধারি ব্যাধি দূরে গেল। যশোদা নিকটে বৈদ্য বিদায় মাগিল।

শ্রীকৃষ্ণ তখন উঠে সর্বত্রে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন দেখে।"[১২]

এই অংশ কথিকার অংশ, নাটকের অংশ নয়। সেই যে কৃত্তিবাস বলেছিলেন "পড়এ মঙ্গলে", এখানে সেই "পড়এ" অশেষ পরিবর্তিত হয়েও 'বলহ'-এর উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। আসলে ঢপ্‌কীর্তন পাঁচালীরই রকমফের। এর মধ্যে অভিনেয়তা কিছু নেই, কথকতা আছে। এখানে সাজ-সজ্জা বা

'কাচ কাচিয়া' নেই, নেই কোন ভূমিকা গ্রহণ-প্রয়াস। একথা কে বলেছে যে, গ্রন্থ দেখে কথা বললে তা হয় পাঠ? আর গ্রন্থ না দেখে কথা বললেই তা হবে নাট? বস্তুত 'নাট' পৃথক্ প্রমোদকলা; 'পাঠে'র বিপরীত, এবং সমান্তরালবর্তী।

আর্যা-তর্জা ও যাত্রা

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় আর্যাতর্জা ও 'বোলান' খুব জনপ্রিয় ছিল; এগুলি প্রশ্নোত্তরমূলক গীত। ঠিক গীত নয়, ঢোল কাঁসির সহযোগে ছড়া কাটাকাটি। এগুলির মধ্যে নাটকের কোন বীজ নেই; এগুলি প্রাচীন প্রহেলিকা-সাহিত্যের নবীন সংস্করণ। তর্কবিতর্ক প্রতি যুগেই বিভিন্ন বিষয়ে উত্থাপিত হয়; ছড়া কাটাকাটি করে হারজিতের খেলা মানুষের আদিম ব্যসন; কখনও ধর্মীয় গূঢ় রহস্যের ছেদনে, কখনও বা নিতান্তই রঙ্গতামাসার ব্যাসকূট ছেদনে।

প্রহেলিকা অথর্ব বেদ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারত বৌদ্ধ সাহিত্য ও প্রাকৃত অপভ্রংশ, এবং বাংলাদেশের চর্যাগীতিকা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, নাথসাহিত্য, কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, এবং বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। কখনও এই প্রহেলিকার মীমাংসা হয়, কখনও মীমাংসা হয় না, কখনও বা "সদ্গুরুর" উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সামাজিক উৎসবে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সর্বত্রই উত্তর-প্রত্যুত্তর একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তা নাটক নয়, নাটকে উত্তর-প্রত্যুত্তর কাহিনীর সূত্র ধরে এগিয়ে যায়, এবং প্রায়শঃ পাত্রপাত্রী জীবন-ধর্মের একটি দিক্ উদ্ঘাটিত করে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে হিন্দুসমাজের ধর্মীয় তর্ক অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছিল; তিক্ততা হ্রাস পেয়েছিল। তবে ধর্মীয় বিভেদ নিয়ে রহস্য করার প্রবৃত্তি লোপ পায়নি, সেটা ছিল ঐ যুগ-জীবনের একটা সরসতার দিক।

জয়নারায়ণের কাব্য "করুণানিধানবিলাসে" চড়ক সন্ন্যাসীর বিষয়ে একটি 'তরজা' উৎকলিত হয়েছে।

॥ তরজাপথ বন্ধন ॥

সন্ন্যাসিনী— কোথা হইতে জন্ম তোর কোথায় বসত।
কোনখানে যাবে তুমি কিবা তব মত॥

ইহার জবাব— গোলোকে বসতি ছাড়ি ব্রজভূমে আসি।
স্বামীর লাগিয়া মোরা হইয়াছি সন্ন্যাসী॥

হর লাগি তপ করি এই মনোব্রত।
পথ কেন বন্ধ কর ছাড়হ ত্বরিত॥

ইহার জবাব— না জানি গোলোক কোথা কেবা তব পতি।
কুলটা করিয়া সৎপথে করে গতি॥
কর শিরে ধুনা জালে আলেয়ার মত।
না জান্যা ছাড়িতে নারি আর কব কত॥

ইহার জবাব— সঙ্গে সঙ্গে চলে সবে যথা মোরা যাই।
সাধু সঙ্গে চল যদি পলাইবে গোঁসাঞি॥[১৩]

এই তরজা প্রকৃতপক্ষে "ব্রাহ্মণ-রোম্যান ক্যাথলিক-সংবাদ"এর পদ্য-সংস্করণ। একে নাট্য শাখাভুক্ত করা চলে না। বাংলা দেশ নব্যন্যায়ের দেশ; কূট-কচালি এদেশে নানা শাস্ত্রজিজ্ঞাসা নিয়ে অবিরত হোত। সেগুলি যদি নাটক হয়, তবে নবদ্বীপের টোলগুলি সবই ছিল এক একটি নাটমঞ্চ।

কবিসঙ্গীত ও যাত্রা

ডক্টর প্রভু গুহঠাকুরতা একটি মন্তব্য করেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল:

"Originally Kabi-songs formed a part of the Yatra. Later they were made into a separate class of songs sung by professional ministrels, called Kabiwalas.[১৪] ডক্টর গুহঠাকুরতা সম্ভবত কবিসঙ্গীত ও পুরাতন যাত্রার বিষয়-বস্তুর ভাবগত ঐক্য এবং রচনারীতির অবয়বগত সাদৃশ্য দেখে এই প্রকার বিভ্রাট বাধিয়েছেন। ডঃ গুহঠাকুরতার এই বিশ্লেষণ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বিশ্লেষণের অনুরূপ।

"The Kabi-songs had originally constituted part of the old Yatras or popular plays. The simple episodes in Yatras, especially those of the nature of light opera, were in course of time wrought into a separate class of songs, which were sung by those distinct bodies of professional bards called Kabiwalas, whose domain was thus completely severed form that of the Yatra parties."[১৪ক]

কবিসঙ্গীত কোন কালেই যাত্রার অংশ ছিল না; যাত্রা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এবং যাত্রার উদ্ভব ঘটে ভক্তিআন্দোলন-জারিত রাঢ়ে; বীরভূম বাঁকুড়া

ও বর্ধমান জেলার অঞ্চল বিশেষেই যাত্রাপালার অধিকাংশ রচয়িতার জন্ম হয়। আর কবিসঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গীতকলা। কবিসঙ্গীতের মধ্যে অভিনয়-কলার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। কবিসঙ্গীত দুই প্রকার—আখড়াই ও হাফ-আখড়াই। আখড়াই গানে কোন উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। হাফ-আখড়াই গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল। কবি-সঙ্গীতের সঙ্গে যিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই মনোমোহন বসুর সাক্ষ্য সংগ্রহ করা গেছে! আখড়াইয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর ছিল না। "যাহার ভাল সুর, ভাল গাহনা, ভাল বাজনা, তাহারই নিশান লাভ ঘটিত।" প্রত্যেক দলের একটি ভবানী-বিষয়ক, একটি প্রভাতী ও একটি খেউড থাকত। আর থাকত মাঝেমাঝে সাজ-বাদ্য। হাফ-আখড়াইয়ে একদল গান শেষ করলে আর একদল গান শুরু করতেন।[১৫]

কবিসঙ্গীত আর যাত্রা পৃথক্ প্রমোদকলা; আর যাত্রা হোল বহু পূর্ববর্তী রচনা।

'করুণানিধানবিলাসে' প্রাচীনতম কবিগানের যে দৃষ্টান্ত উৎকলিত হয়েছে, সেই নিদর্শনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেটি নাটক-জাতীয় রচনা নয়। তবে যাত্রার অনেক বাঁধনদার কবি গান লিখেছেন, যেমন প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী শ্রীদাম দাস শোভাবাজারের রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের উৎসাহে কবিসঙ্গীতেও অংশ গ্রহণ করেছেন। আবার প্রখ্যাত কবিসঙ্গীত রচয়িতারাও যাত্রার পালা তৈরি করেছেন—যেমন রাম বসু নলদময়ন্তীর পালা রচনা করে দিয়েছিলেন। গোপাল উড়ের যাত্রার সমস্ত পালাইত বিভিন্ন কবিসঙ্গীতের রস-ভিত্তিক সংকলন। তখন যাত্রা ও কবিসঙ্গীত পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিল—আত্ম-তাগিদে নয়, পোস্টার তাগিদে। ভক্তিরসের প্রাবল্যে নয়, চাঁদির জুতোর প্রহারে।

গম্ভীরা ও নাট্যকলা

রাঢ়ে ঝুমুর সঙ্গীত নামে এক প্রকার নাট্যগুণসম্পন্ন সঙ্গীতরীতি প্রচলিত আছে, আর উত্তর বঙ্গে প্রচলিত আছে গম্ভীরা। মালদহে এখনও গম্ভীরাই প্রধান নাট্যরস পরিবেশন করে।

আসলে গম্ভীরা অনেকটা 'সঙ' জাতীয় নাটক। উনিশ শতকে 'সঙ' অর্থে সর্বদা হাস্যরস বোঝাত না। 'নলদময়ন্তীর সঙ' হাস্যরসাশ্রিত নয়। গম্ভীরাও এই অর্থে 'সঙ'। গল্পের চাপ তত নেই; পুরো নাটক নয়, কিছু নাটকীয় রস আছে। শিব-দুর্গার জবানীতে বহু ক্ষেত্রে সমসাময়িক বা চলতি ঘটনার

উপর নৃত্যগীতের টীকা। "সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বর্ষবিবরণীর পর্য্যালোচনা।"[১৬] অনেকটা রাঢ়ের ভাদু গান ও পুরুলিয়ার টুসু গানের মত। মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার কেউ বন্ধ করতে পারে না। ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, ব্রত-পার্বণের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়।

গম্ভীরা গানে শিব-দুর্গা, নন্দী-ভৃঙ্গীব রূপসজ্জা আছে। অনেক সময় মুখোস পরে নাচ হয়, আবার মুখোশ না পরেও নৃত্যগীত হয়—এ ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা নেই। যাত্রার মত খোলা আসরে অভিনয় চলে; শুধু একটি মাঙ্গলিক ঘট স্থাপন করতে হয়। যে গ্রামে শিবমন্দির আছে, সেখানে ঐ মন্দিরের সম্মুখস্থ আটচালা বা মুক্ত প্রাঙ্গণে গম্ভীবা অনুষ্ঠিত হয়। "রাত্রিতে পূজাস্থানে ভক্তগণ ছদ্মবেশ ধারণ কবিয়া ও মুখোশ পরিয়া সারা রাত্রিব্যাপী নৃত্যগীত ও ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন কবে।"

গম্ভীরা সম্পূর্ণত লোক-সংস্কৃতির অংশ। শ্রোতা ও দর্শকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। চারদিন বা তার অধিক দিন ধবে গম্ভীবা গান চলে। সঙ আর নাচ এক সঙ্গে। চতুর্থ দিনে পালা শেষ হলে ঐ আসবেই 'আলকাপ' শুরু হয়। গম্ভীরা হোল অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবসমৃদ্ধ; আলকাপ লঘু ভাবাত্মক।

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার অত্যধিক উৎসাহভবে লিখেছেন, "To a cartain extent, the literature of the Gabhira-cycles may be compared with the Mystery and Miracle plays in old English and No-plays of Japan."[১৭]

হরিদাস পালিত মহাশয়ও এ বিষয়ে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েছেন। গম্ভীরার মধ্যে নাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির কিছু জের আছে, এই হোল পণ্ডিতমহলের অনুমান। শৈব বিশ্বাসের মধ্যে প্রাচীন ধর্মমতগুলিব আত্মগোপন করে থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়।

গম্ভীরা নাট্য-রসাশ্রিত; তার মধ্যে নাটক হয়ে-ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু গম্ভীরা শেষ পর্যন্ত কৌম আনুগত্যের (Tribal affiliation) ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমতের মত কোন বড় ভাব-আন্দোলন এই নাট্যীয় রীতিকে ব্যবহার করেনি; সেই কারণে এই রীতির আর কোন অগ্রগতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়নি; তার মধ্য থেকে যাত্রার তুল্য কোন উন্নততর নাট্যকলা বেরিয়ে আসতে পারেনি। গম্ভীরা তাই লোক-সংস্কৃতির একটি হৃদয়গ্রাহী অথচ অপরিণত উদাহরণ হয়ে টিকে থাকল।

নাথসাহিত্য

শুধু গম্ভীরা নয়, নাথসাহিত্যের কোন কোন শাখার মধ্যে নাটকের বীজ নিহিত ছিল। নাথসাহিত্যের আখ্যানবস্তু নিয়েই ত প্রথম 'কীর্তনীয়া নাটকে'র রচনা।

নাটগীতির প্রচলন থাকলে যে সে নাটগীতি একদা যথার্থ নাটকের কলেবর ধারণ করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। নাথসাহিত্যের নাটগীতি যেন সেই অপূর্ণতার উদাহরণ।

গুরু আত্মসম্বিত হারিয়ে ফেলেছেন, তখন গোরক্ষনাথ নাটুয়ার বেশ ধারণ করে বাহির দুয়ারে দাঁড়ালেন। ঘা দিলেন তাঁর মাদলে—গুড়ু গুড়ু গুড়ু ধ্বনি উঠল। সে ধ্বনিতে গুরুর লুপ্ত সম্বিত ফিরে এল। যদিও শিষ্যকে তিনি চিনতে পারলেন না, তবু ডেকে আনলেন তাকে এবং জিজ্ঞাসা করলেন—

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে
তোমার মঙ্গলে কেনে গুরু গুরু বোলে।

এই 'কেনে'-র জবাব সহজ ভাষায় দেওয়া যাবে না, তাঁকে দিতে হোল আভাসে আর ইঙ্গিতে। তাই নাচে-গানে, এক কথায় নাটগীতির মারফৎ, তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলেন।

হাতে তালে কহে কথা যতি গোরখাই
মাদলের সনে কথা গুরুবে বুঝাই।
ডিমিকি-ডিমিকি করি মাদলে দিল হাত
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
নাচন্তে যে গোর্খনাথ ঘাঘরের বোলে
কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরাএ বোলে।
নাচন্তে যে গোর্খনাথ মাদলে ত হাত
শিষ্যপুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ।

এ তো একেবারে জয়দেব-অনুসারী নাটগীতিরই উদাহরণ! 'নাট' ও 'নাটুয়া' শব্দদ্বয়ও লক্ষণীয়।

শুধু জয়দেব-অনুসারী নাটগীতি নয়, তর্কাতর্কি আর্যা-তর্জা-জাতীয় কূট-কচালিও নাথযোগীদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। এগুলি ধর্মীয় তত্ত্বব্যাখ্যার প্রয়োজনে হেঁয়ালি জাতীয় লেখা। নাথ নাটগীতির মধ্যে যে নাট্যীয় সম্ভাবনা ছিল, তার সার্থক পরিপূর্তি বাংলা দেশে হয়নি। তার কারণ চৈতন্য-প্রবর্তিত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলনের মত কোন প্রবল আলোড়নে এই নাটগীতি একটা ভাবগত সমুন্নতি লাভ করতে পারেনি। বড় ভাববস্তু ব্যতীত বিষয়ের গোত্রান্তর ঘটে না।

গোরক্ষবিজয় কাহিনী অন্যত্র নাট্যীয় মর্যাদা অর্জন করেছিল; সেখানে প্রধান ভাব-আন্দোলন কেবল বৈষ্ণব খাতে প্রবাহিত হয়নি। শৈব-বৈষ্ণব নানা খাতই সমান মূল্য পেয়েছিল। জাতীয় প্রেরণার প্রধান অংশ একটি খাতে প্রবাহিত না হয়ে ছড়িয়ে-চারিয়ে পড়েছিল; তাই 'গোরক্ষ-বিজয়'-এর পাশাপাশি 'পারিজাত হরণ' নাটক স্থান পেয়েছে।

নেপালে গোর্খনাথের কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখিত হয়েছিল। নেপালে নাটগীতির ঐতিহ্য ছিল, পরে মৈথিলী নাট্যবিদ্‌দের প্রভাবে সেই নাটগীতির বহতা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী থেকে নাটকের নদী জন্মলাভ করে।

ঝুমুর সঙ্গীত

অপর পক্ষে রাঢ়ের কৃষ্ণনাটগীতি ও ঝুমুর-অধ্যুষিত ভূখণ্ড থেকেই বাংলা নাটক উদ্ভূত হোল। কবি জয়দেবের জন্মভূমি কেঁদুলির অধিবাসী শিশুরাম অধিকারী ঝুমুর সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; উপরন্তু ছিলেন কীর্তন-গায়ক। ঝুমুর পালাকে কীর্তনের ভাবরসে নিষিক্ত করে তিনি আধুনিক কৃষ্ণযাত্রা সৃষ্টি করলেন। "কীর্তন, মঙ্গলগান ও ঝুমুর মিশিয়ে নাটকের অনুসরণে বর্তমান কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টি।"[১৮] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তিকে একটু সংশোধিত করা প্রয়োজন। কৃষ্ণযাত্রা ও ঝুমুরের মধ্যকার সম্পর্ক তিনি সঠিক ভাবেই অনুধাবন করেছেন; কীর্তন ও মঙ্গলগানের ভাবঐশ্বর্য কৃষ্ণযাত্রার উপর প্রভাবশীল হয়েছে, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই।

কিন্তু নাটকের আদর্শটি কোথা থেকে এল?

চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক ছিল বৈষ্ণবজগতে অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও জনপ্রিয় সাহিত্য। যাত্রার বাঁধনদার ঐ সব সূত্র থেকেই নাটকের আদর্শ সংগ্রহ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঝুমুর গানের আদর্শ।

"ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্য ভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের সীমা পর্যন্ত যে আদিবাসী বসতিসীমা (aboriginal belt) অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তাহার সর্বত্র যে আদিবাসী সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাহা সাধারণভাবে ঝুমুর নামে পরিচিত।"[১৯] সাঁওতাল বা উপজাতিদের মধ্যে যে জাতীয় ঝুমুর

প্রচলিত আছে, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। সাঁওতালী ঝুমুরে নৃত্যই প্রবল, কথা বা গান গৌণ। মানভুমের ঝুমুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। আবার বীরভুমের ঝুমুর দীর্ঘতর।[২০] রাঢ় অঞ্চলের বর্তমান প্রচলিত ঝুমুর সঙ্গীতে চারিটি অঙ্গ লক্ষ্য করা যায়—(১) সখী সংবাদ বা ব্রজলীলা, (২) আগম বা ভবানীবিষয়ক গান; (৩) লহর বা শ্লেষাঙ্গ; (৪) খেউড় বা আদি রসাত্মক উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক গীতাদি।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই প্রকার ঝুমুরগান কবি সঙ্গীতের কৃত্রিমতা (sophistication) আত্মসাৎ করে অনেকটা অ-লৌকিক বা নাগরী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ঝুমুর সঙ্গীত সাধারণত নানা পালায় বিভক্ত হয়ে থাকে। এই পালাগুলি কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন পর্ব নিয়ে রচিত। এক একটি পালায় লীলার এক একটি পর্ব প্রকটিত হয়। এবং সঙ্গীতের সাহচর্যে এই প্রকটন কাজ সম্পন্ন হয়। ঝুমুর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল জবাব দেওয়ার প্রবণতা। কথা শেষ হলে ফাঁকে ফাঁকে নাচ চলত, আর এই নাচের সময় ধুয়াটি বারবার গীত হোত। দেওঘরের ভবপ্রীতানন্দ ওঝা যে ঝুমুর সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিতেও ধুয়া আছে। তবে এই ধুয়ার নাম ছিল 'রঙ'। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা সাঁওতাল পরগণার ঝুমুর গান সংগ্রহ করেছেন। ঐ সংগ্রহ থেকে বিরহপালাটির পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

শ্রীমতীর আক্ষেপসূচক গীতি দিয়ে পালা সুরু হোল; শ্রীমতী গাইলেন—

হায়রে মধুযামিনি, দংশে যেন ভুজঙ্গিনী গো।

দ্বিতীয় গানটিতে তাঁর আক্ষেপের হেতু বোঝা গেল—

ঐ মধুযামিনি যায়, না আইল শ্যাম রায়।

ওদিকে চন্দ্রাবতীও শ্রীকৃষ্ণের জন্য বাসরসজ্জা করে বসে আছেন; তিনি গাইলেন—

রাধারে ভেটিতে হরি, আসিছেন ত্বরা করি।

তাঁর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ আসছেন না, অথচ রাত্রি কাবার হয়ে যাচ্ছে। পরপর দুইটি গান গাইলেন তিনি—

১. মাধব না আইলরে, সখি রজনী পোহাইল।

২. জেগে রৈলাম সারা নিশি, না আইল কালশশি।

চন্দ্রাবতীর কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে প্রভাতে শ্রীমতীর কুঞ্জে গিয়ে উপনীত হলেন বংশীধারী। যথেষ্ট প্রবোধ দিয়ে বললেন—

হেরি তব ম্লানমুখ, বিদরে আমার বুক।

এতটুকু তোষামোদে শ্রীমতী ভুললেন না ; অভিযোগের সুরে বললেন—

রাত্রি অবসানে কোন প্রয়োজনে,
কুঞ্জে এলে কোন লাজে।

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান প্রচুর ; রাধাকে বোঝালেন—

রাধা কৃষ্ণ-আধা, লোকে বেদে গাঁথা,
তবে কেন ভিন্ন কর ভাবনা।

তবু শ্রীমতীর কঠিন মন দ্রবীভূত হোল না , তখন মলিন বদনে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জ ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ ত্যাগেব সঙ্গে সঙ্গেই রাধিকার জ্ঞানোদয় হোল।

ওহো কি করিনু দূতী, খেদাইয়া প্রাণপতি,
মণিহীনা ভুজঙ্গিনী বাঁচে না।

তারপর রঙ অর্থাৎ ধুয়া—

সেই কান্তের বিনা
নিতান্ত একান্ত প্রাণ আর বাঁচে না।

এখানেই পালা শেষ হোল , একমাত্র ধুয়া ছাড়া আর সব গীতিই স্পষ্টত কোন না কোন পাত্রপাত্রীব মুখে বসান হয়েছে। ধুয়া বা 'রঙ' গীতিটিও শ্রীমতী ও সখিরা সমস্বরে গাইতে পারেন , এর জন্য অধিকারী বা নাট্য-বহির্ভূত ব্যক্তির আমন্ত্রণ জানাবার কোন প্রয়োজন নেই।

পীতাম্বর দাসের 'ঝুমুর-সঙ্গীতের' বিভিন্ন পালা একই আঙ্গিকে রচিত ; পার্থক্য এইটুকু যে, এগুলি যেহেতু রাঢ় দেশে রচিত, এগুলিতে গৌরচন্দ্রিকা আছে। এছাড়া প্রতি পালার সূচনায় একটি ভূমিকা আছে, অবশ্য সঙ্গীতে ; আর পালার অবসানে আর একটি গীত আছে।

পীতাম্বর দাস অষ্টাদশ শতকের কবি ; তাঁর রচিত পদাবলীর উল্লেখ দেখতে পাই ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে।

পীতাম্বর দাস চারিটি পালা রচনা করেছেন, দানলীলা, গোষ্ঠলীলা, সুবল-সংবাদ ও কলঙ্কভঞ্জন। কলঙ্কভঞ্জন সেকালে সর্ব প্রকার কাব্যশাখায় সমাদর লাভ করেছে। সে-যুগের জনরুচির (Social ethos) সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণলীলার এই প্রসঙ্গটির খুব বশংবদতা ছিল। কিন্তু পীতাম্বর দাস কলকাতা বা কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কবি নন, তাই তাঁর ঝুমুর-সঙ্গীতে গোষ্ঠলীলা ও সুবলসংবাদের মত আদিরস-বহির্ভূত বিষয় মর্যাদা পেয়েছে।

'অংকীয়া নাটে' বাৎসল্য রস, সখ্য রস অবহেলিত হয়নি। সেখানে মাধব দেবের 'পিম্পরা গুছুয়া' বা শঙ্কর দেবের 'কেলি গোপালে'র মত পালা রচিত হয়েছে। এখানেও তেমন দেখতে পাই।

পীতাম্বর দাসের 'গোষ্ঠলীলা' পালাটির পরিচয় দেওয়া যাক। পালার সূচনায় দেখতে পাই যশোদা ও আয়ান কথাবার্তা বলছেন। এমন সময়ে নন্দালয়ে রাখালগণ এলেন এবং তাঁরা গোচারণে যাবার জন্য সখা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকতে লাগলেন—

জীবন কানাই আয় রে গোচারণে।

জননী যশোদা অসম্মতি জানালেন ; তিনি বললেন—

গোষ্ঠে বিদায় দিব না গোপালে !

সুবল তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে অনুবোধ জানালেন—

জননী গো বিনয় করি তোরে

যশোদা তবু বলেন—

আজ পাঠাব না গোচারণে।

সুবল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

নন্দরাণী, চিন্তা কর কেনে ?

তখন স্বয়ং নন্দগোপাল মাব কাছে অনুরোধ জানালেন—

ওমা আমায় দে গো বিদায় গোচারণে যাই।

যশোদার এখন আর উপায় কি ? অনুমতি দিতে হোল, শুধু সুবলকে বললেন—

দেখিস সুবল, রাখবি যতনেতে।

রাখালদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করলেন। কাব্যসংহারে একটি গীত রয়েছে—

গোষ্ঠে গমন করেন বংশীধারী
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে বাজিছে বাঁশরী ;

এই গীতটি অনেকটা ভরতবাক্যের মত। অংকীয়া নাটেও একই আঙ্গিক অনুসৃত হোত। উদাহরণ স্বরূপ 'কালি দমনে'র উপসংহার অংশটি উদ্ধৃত করা যায়—

পাসগুদগুন মগুন ভকতক
হরিরস রসিক সুবশে।

কালিদমন ওহি বরনাটক
শংকর হরিগুণ গানে।

এখানে অবশ্য পালার রচয়িতার আত্মঘোষণা অনুপস্থিত, ভণিতা নেই। তাছাড়া ঝুমুর পালার বাঁধনদার আর একটু ভিন্ন স্বর নিয়েছেন, যদিও রীতি অভিন্ন। সখ্য ও বাৎসল্য রসের পালার উপসংহার-গীত উচ্চারিত হচ্ছে মধুর রসের সংকেত দিয়ে।

বৈষ্ণব ভাব-সম্পদের সুস্থ দিক এখানে অক্ষুণ্ণ আছে। এই সুস্থ ভাব-সামগ্রী নিয়েই রাঢ়ের কৃষ্ণযাত্রার উৎপত্তি ঘটে।

পীতাম্বর দাস যে-যুগে ঝুমুর-সঙ্গীত বচনা করছেন, সেই যুগেই কেঁদুলিতে শিশুরাম অধিকারীব জন্ম হয়েছে। প্রথম জীবনে শিশুরাম অধিকারী কীর্তন ও আঞ্চলিক গীতসমূহের পাঠ সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন।

শুধু শিশুরাম নন, অংকীয়া নাটের নাট্যকাবগণও ঝুমুবেব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন। মাধবদেব বচিত একটি পালার নামই হোল 'রসঝুমুব'।[২৩]

পাদটীকা

১. বাংলা নাটকেব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—২য় সংস্করণ—পৃ. ৪১-৪৭।

২. ঐ—পৃ—৪৯।

৩. Aeschylus and Athens—George Thompson. Page—176.

৪. মনোমোহন গীতাবলী—মনোমোহন বসু—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৭. পৃ ১৬১—১৬৩

৫. দাশরথী রায়—পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বঙ্গবাসী সংস্করণ। ১৩০৮ সাল। ১ম খণ্ড। ভূমিকা—৯।

৬. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু। পৃ ৬৩-৬৪।

৭. দাশরথী রায়—পাঁচালী—ভূমিকা—পৃ-৮।

৮. ঐ , পৃ-৯।

৯. করুণানিধান বিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল—১৮১৪ খৃঃ কলিকাতা। পৃ—৩৪০-৩৪১।

১০. বর্ধমান সম্মিলনী—সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা—১৩১৪-১৩৬৪. শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

১১. চপ্‌কীর্তন—মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত। মহিমচন্দ্র বিশ্বাস কর্তৃক সম্পাদিত। ১৯০৭ কলিকাতা—পৃ-৭।

১২. ঐ—কলঙ্কভঞ্জন। ২য় খণ্ড।

১৩. করুণানিধানবিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল।

১৪. The Bengali Drama—P. Guha-Thakurata London—1930. P. 24.

১৪ক. History of Bengali Language and Literature—D. C. Sen. P. 679.

১৫. মনোমোহন গীতাবলী—হাফ-আখড়াইয়ের ইতিহাস—মনোমোহন বসু।

১৬. বাংলার লোকসাহিত্য—৩য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য—ক্যালকাটা বুক হাউস। পৃ-২৪৪।

১৭. The Folk Elements in the Hindu Culture—Benoy K. Sarkar. P. 20 ও হরিদাস পালিত—আদ্যের গম্ভীরা।

১৮. নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫৯।

১৯. বাংলার লোকসাহিত্য—৩য় খণ্ড—আশুতোষ ভট্টাচার্য—পৃ-১৩৫

২০. বাংলার লোকসঙ্গীত—চিত্তরঞ্জন দেব।

২১. ঝুমুর-মঞ্জরী—ভবপ্রীতানন্দ ওঝা।
দেওঘর। ১৩১৬। ১ম সংস্করণ।

২২. ঝুমুর সঙ্গীত—পীতাম্বর দাস। অধরচন্দ্র চক্রবর্তী প্রকাশিত।

২৩. Ankiā Nāt—B. K.Barua (1940)
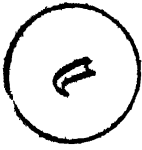
প্রাচীনে-নবীনে সংঘাত

আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি, ভক্তি-আন্দোলনে নাটক এক বিশেষ স্তরে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু তখনও নাটকের সঙ্গে নৃত্যের সম্বন্ধ শিথিল হয়নি। চৈতন্যদেব বলেছিলেন—

"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে।"

'অংকীয়া নাটে'ও তাই পাচ্ছি—

"সীতাবিবাহ-বিহারনৃত্য পরম কৌতুকে করব।"

—শ্রীরামবিজয় নাট

"আহে সামাজিক লোক সে জনকনন্দিনী সীতা
সখীসরসহিতে নৃত্য করিয়ে।" —ঐ।

"ঐচন লীলা কেলি কৌতুকে নৃত্য করিতে গোপাল সহিতে
শিশুসব কালীহ্রদক সমীপ পারল।" —কালিদমন নাট।

নেপালে প্রাপ্ত 'নাটকে' পাচ্ছি :

শ্রীশ্রীজয়ধর্মমল্লদেবস্য রঘুকুলোচিতব্রতবন্ধমহোৎসব প্রসঙ্গপ্রমুদিতেন জন-সমূহেন নৃত্যমানসভির্নবরাঘবানন্দনাটকং প্রবর্তনে তৎপ্রত্যূহপ্রশমনায তত্রাবতরতু ভগবান্ বিনায়কঃ" —অভিনবরাঘবানন্দনাটক।

এটি না হয় সংস্কৃত নাটক, ভাষা-নাটকে পাচ্ছি—

শ্রী৩ নৃত্যনাথায় নমঃ। (বিদ্যাবিলাপনাট)

শ্রীশ্রীশ্রীনৃত্যেশ্বরায় নমঃ। (রামবিজয় নাট)

নটনাথ তখনও উপাস্য নন, তাই প্রণতি পৌঁছাল নৃত্যেশ্বরের চরণে। বা নৃত্যেশ্বরের অন্তরালে তখনও নটনাথ আত্মগোপন করে আছেন।

'যাত্রা' শব্দটিও বৈষ্ণব ভাবআন্দোলনের অবদান। 'অংকীয়া নাটে'র একাধিক পালা যাত্রা নামে অভিহিত। যেমন 'কালিদমন নাট' পালায় প্রস্তাবনায়, সূত্রধার বলছেন :

—"উহি সভামধ্যে কালিদমন নাম লীলা যাত্রা পরম কৌতুকে করব।"

'অর্জুনভঞ্জন' নামক পালা শেষ হবার মুহূর্তে নাট্যকার মাধবদেব লিখেছেন—

"ইতি অর্জুন-ভঞ্জন নাম যাত্রা সম্পূর্ণম্।"

'নাট' শব্দটি তখনও যেমন নৃত্যের অর্থ-সান্নিধ্য ত্যাগ করতে পারেনি, 'যাত্রা' শব্দটিও তেমন দ্বিবিধ অর্থ-আলিঙ্গনে দ্বিধান্বিত।

'যাত্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তিতে উৎসব শব্দের আনুকূল্য আছে বলে পণ্ডিতেরা একমত। ভবভূতির 'উত্তর-চরিত' নাটকে সূত্রধারের মুখে এই উক্তিটি পাওয়া যাচ্ছে—"অদ্য খলু ভাগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াম্ আর্যমিত্রানুবিজ্ঞপিয়ামি।"

এখানে যাত্রা শব্দের অর্থ উৎসব সন্দেহ নেই। অংকীয়া নাটে এই বিশেষ অর্থে যাত্রা শব্দের প্রয়োগ আছে। গোপালদেব রচিত একটি পালার নাম হোল 'জন্মযাত্রা নাট।'

'যাত্রা' শব্দের দ্বিবিধ প্রয়োগই অংকীয়া নাটে দেখা যাচ্ছে। শব্দটি তখনও সম্পূর্ণ যোগরূঢ় হয়নি। অংকীয়া নাট উৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ হোত।

"The Ankia Nats were written more with a religious motive, staged in the village Namghar, the prayer hall on solemn occasions such as Janmāstami, Doljātra, Rās purnimā.[২]

'যাত্রা'য় অভিনীত নাটগীত হোল 'যাত্রা'। যাত্রা শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে 'বিশ্বকোষ' থেকে আজ পর্যন্ত বহু আলোচনা হয়ে গেছে। আশা করি অংকীয়া নাটের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য এই আলোচনার যবনিকা টেনে দেবে।

পরে 'যাত্রা' উৎসবেও দেখা দেবে, অনুৎসবেও অনুপস্থিত থাকবে না। 'নামঘর' ছেড়ে তাকে বারোয়ারী তলায় দেখা যাবে, দেখা যাবে হাটে বা গঞ্জে। যাত্রা তাই তখন শুধুই অভিনয়, ধর্মচর্চার অংশ নয়।

ভক্তিনাটকের স্বাতন্ত্র্য

পূর্বেই বলেছি, ভক্তি-আন্দোলন প্রাচীন নাটগীতির গোত্রান্তর ঘটিয়েছে। প্রাচীন লোক সাহিত্যের উত্তর প্রত্যুত্তরমূলক নাটগীতি নাটকের রূপ গ্রহণ করল। লৌকিক কাঠামোর অভ্যন্তরে দার্শনিক প্রত্যয় প্রবেশ করে তার মেজাজ পরিবর্তিত করে দিল। পূর্বতন চটুলতা ও রুতিভাব সংশোধিত হয়ে গেল। ভাব-গভীরতার চাপে তার চলনে-বলনে একটি অপার্থিব অর্থময়তা এলো। যাত্রা ভক্তিনাটকের ক্রম পরিণতি।

বহু পর্যালোচক ভক্তি-প্রভাবিত নাটকের এই বিশেষ রূপটির মর্ম অনুধাবন করতে পারেননি। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, "The works constitute a

departure."[২]; তবু এই নাটক সমূহের নাট্যীয় যোগ্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে বৈষ্ণব নাট্যকারেরা নাটক লিখেছেন, "more for the theological, than really, for the dramatic effect".[৩] অন্যত্র বলেছেন "they reveal a little sense of what a drama really is"

বস্তুত এ সমালোচনা উনবিংশ শতাব্দীর প্রচলিত বাঙ্গালী নাট্যরসবোধের বিশিষ্ট নিদর্শন।

ঘটনার অপ্রতুলতায়, নাট্যীয় সংঘাতের অনুপস্থিতিতে ও চরিত্রচিত্রনে জটিলতার অভাবে এই নাটকগুলির নাট্য-মূল্য হ্রাস হয় নি।

নাটকে চরিত্র-চিত্রনেব ওপর অতি-গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছিল ইউরোপে রোম্যানটিক যুগ থেকে। বোম্যানটিক পূর্ব-যুগে নাটকে 'প্লট' ছিল প্রধান।

আবার এ 'প্লট' নিতান্ত ঘটনাপুঞ্জ নয়। প্লট-সম্পর্কিত ধারণাও যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। একদা নিয়তি-তাড়িত রাজশক্তির বিবরণ-বিশেষ না হলে নাটকের প্লট হোত না; আর একদিন অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত শক্তিমান ব্যক্তির আর্তনাদ তুলে ধরাই একমাত্র কাজ ছিল প্লট-বিন্যাসের। আবার সে-দিনেরও অবসান হোল। নিয়তি নেই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই,—অন্তত মনোযোগের প্রধান কেন্দ্র নয়—সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই নাট্যবস্তুর প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল।

প্রভেদটা নিতান্ত যুগভেদে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে দেশভেদেও।

স্পেন ও ইতালীতে নাটক খুবই সমৃদ্ধ; সেখানে কিন্তু হৈ-হুল্লোড়, ঘন ঘন ছদ্মবেশ ধারণ, এবং প্রতিপক্ষকে নানা ভাবে নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরিশেষে দোস্তীভাব ও শান্তিবচন—এ সব না থাকলে নাটকের প্লট হোত না। ফ্রান্সে দর্শক ও শ্রোতার দিকে চোখ বেখে ঘটনার ওপর দার্শনিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হলে তবেই প্লট জমত ভালো। ভলটেয়ার লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে 'জুলিয়াস সিজারের' অভিনয় দেখে ঐ দ্বীপবাসীর রসজ্ঞানের বহরে মর্মাহত হয়েছিলেন। এহেন অবস্থায় বৈষ্ণব নাট্যসাহিত্যেব রস-উপলব্ধিতে দ্বিধা থাকলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

এ্যারিস্টটল বলেছিলেন "The plot is the first principle"[৫]. ভরতমুনি এই 'প্লট' বা কথাবস্তুর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, কথাবস্তুর রকমফের থেকে দশ রূপকের বিভিন্নতা। এই প্লট বা কথাবস্তু বৈষ্ণবদেব হাতে পড়ে 'ধীর ললিত' গুণান্বিত হয়ে উঠল।

বৈষ্ণব নাট্যকারদের লেখা সংস্কৃত নাটকের বিশিষ্ট রূপ যে ডক্টর দে স্বীকার করেননি, তাই নয়; তিনি এগুলির নাটকত্বই স্বীকার করেন নি। যাত্রা-বিশ্লেষণে তিনি প্রায় একইরকম যুক্তির অবতারণা করেছেন। যাত্রায় কোন সংঘাত নেই, তাই এখানে কোন বিশ্লেষণ নেই, নেই চরিত্রের বিকাশ।[৬] যাত্রার অতি সঙ্গীত-নির্ভরতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে এরই ফলে যাত্রার নাটকত্ব বিনষ্ট হয়েছে।[৭] যে-দৃষ্টিকোণ থেকে ডক্টর দে যাত্রার সমালোচনা করেছেন, তা আজ গ্রাহ্য হবে না। কারণ যাত্রা ভিন্নধর্মী নাট্যকলা।

অষ্টাদশ শতক ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা

অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী-সমাজে পরিবর্তনের একটি হাওয়া বইতে থাকে। ইংরেজ পলাশীযুদ্ধে জয়ী হয়ে লুণ্ঠনের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিল।

"All branches of the interior Indian commerce, are, without exception, entirely monopolies of the most cruel and ruinous nature, and so fatally corrupted, from every species of abuse as to be in the last stages towards annihilation. Civil justice is eradicated, and millions are thereby left entirely at the mercy of a few men, who divide the spoils of the public among themselves, while under such despotism, supported by military violence, the whole interior country, where neither the laws of England reach nor the laws of those countries are permitted to have their course is no better than in a state of nature."[১৯]

একদিকে যেমন শাসকশক্তির অর্থলোভ তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল, দেশীয়দের ধনলিপ্সারও কোন সীমা ছিল না। আর তার বিপরীত চিত্র দেখতে পাই সাধারণ মানুষের জীবনে। তাদের দুঃখকষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।

"Although moral of them are very poor, yet there are some of the banyans, or merchants who are extremely wealthy and who yet spare no pains whenever they can earn even half a rupee. Prostitution is not thought a disgrace; there are

everywhere licensed places."[২০] এই যুগে এক দিকে বিদেশীদের অবাধ লুণ্ঠন ও অন্যদিকে দেশীয়দের তার উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের উদগ্র অভিযান সমানভাবে চলতে থাকে।

কলকাতার হঠাৎ-বাবুদের 'ধর্ম' সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ল, কিন্তু পাপবোধ চলে গেল। ন্যায়-অন্যায়, নীতি-সুনীতির প্রশ্ন সমাধিস্থ হোল।

দীনেশ বাবু অষ্টাদশ শতকের ভাব-জগৎ সম্বন্ধে যে মূল্যায়ন করেছিলেন, তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। "This is an age when craft and ingenuity find favour instead of open-hearted sincerity ; when moral courage, character, manliness and strength of conviction fell into disfavour and worldly manners of all sorts pass for high qualities and are praised as indicating wisdom."[২১]

* * *

এই শতকের ন্যায়বোধ যতই শিথিল হোক না কেন, এই শতকে আবার ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা দেখা দেয়। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' দেখতে পাই :

কেহ কহে রাধা শ্যাম, কেহ কহে সীতারাম,
কেহ কহে শংকর ভবানী।
ভূতলে ভকত ধন্য, যাহার ভজন জন্য,
এক মূর্তি অনন্তরূপিণী।

(বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৯২৩, পৃ—৭)

হরি হর হৈমবতী তিনে নাহি ভেদ।
তিন ব্রত সবার কর্তব্য বলে বেদ॥
শিবরাত্রি বিনা সব সেবা ফল নাশে।
মহাষ্টমী বিনা মনোভীষ্ট হবে কিসে॥
একাদশী অন্নখেলে অধঃপাত হয়।
অতএ সবার কর্ত্তব্য ব্রতত্রয়॥

(ঐ—পৃ-২০০)

ইতিপূর্বে দ্বিজ মাধব লিখেছিলেন.

মূর্খ অধম জন, অশেষ অচেতন,
গৌরী গোবিন্দ ভাবে ভেদ।

(মঙ্গলচণ্ডীর গীত-সুধীভূষণ ভট্টাচার্য, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৫)

শুধু হরি-হর-হৈমবতীর পূজার সমপ্রয়োজনীয়তা উল্লিখিত হোল না ; সংস্কার সম্বন্ধেও একই প্রকার মূল্য আরোপ করা হোল।

বলরাম কবিশেখর রচিত 'কালিকা মঙ্গলে' পাচ্ছি—

কলির প্রধান মাত্র হবে হরিনাম।

(চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৭)।

ভারতচন্দ্রের কালিকা-স্তুতি-প্রধান বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিভিন্ন গীতে যে কানু ছাড়া প্রসঙ্গ নেই, তা কি আকস্মিক ? কৃষ্ণপ্রীতি ও কালিকাস্তুতি তখন একই আসরে মিলিতভাবে প্রকাশে বাধা পেত না। নেপালে 'বিদ্যাবিলাপ' নাটকে সুন্দর শ্মশানে এসে কালিকাস্তুতি না করে নারায়ণস্তুতি করল। এতে আমরা আশ্চর্য হই না।

লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তকপৃষ্ঠচারিন্
দেবারিমর্দন জনার্দন বিশ্ববন্দ্য।
সামন্থ পাহি শরণাগতদীনবন্ধো,
দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ॥

(বিদ্যাবিলাপ—পৃঃ ৩০)

আশ্চর্য হই না, কারণ এই বন্দনা আকস্মিক নয়, কালানুগত।

অথচ 'প্রেমবিলাস' ও 'নরোত্তম বিলাসে' দেবীপূজক কেউ বৈষ্ণবদ্বেষী হলে স্বয়ং চণ্ডী "হাতে খড়্গ লৈয়া" তার মুণ্ড কাটতে চেয়েছেন।

রামপ্রসাদনামধারী কোন কোন কবি শ্যাম ও শ্যামাব অভেদ কল্পনা করেছেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কথা পূর্বেও কথিত হয়েছে, বর্তমানে তা সাধারণ সত্য হোল।

বর্তমান যুগের মনোভাব দাশরথী রায়ের পাঁচালীতে চমৎকার ধরা পড়েছে। তিনি শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিষয়ক পালায় এই কলহের মীমাংসা দেখিয়েছেন—

উভয়ের মন ! তোরে মন্ত্রনা আমি বলি।
অভেদ শিব রামায়, যা রাধা সা কালী॥১৪
শুনি বাক্য তর বাক্য করয়ে প্রামাণ্য।
একে পঞ্চ, পঞ্চে এক, না ভাবিও ভিন্ন॥১৫
... ...
কালীকৃষ্ণ অভেদ আত্মা হৈল জ্ঞানোদয়।
উভয়ে হৈল অতি আনন্দ হৃদয়॥

এযুগ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যুগ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্দিষ্ট দেবতার মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল। কোন কোন অঞ্চলে সাহিত্যে-সঙ্গীতে এক একটি দেব-বন্দনা প্রাধান্য পেল। রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাব-পরিমণ্ডলের প্রভাব গভীরতর অনুভূত হওয়ায় সেখানেই সর্বপ্রথম দেখা দিল কৃষ্ণযাত্রা। পরে ঐ আঙ্গিকে রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা দেখা দিতে শুরু করে। কৃষ্ণযাত্রা বীরভূমে আত্মপ্রকাশ করে; রামযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা ও চণ্ডীযাত্রা বর্ধমানে দেখা দেয়। বর্ধমানে রাম-পাঁচালী ও চণ্ডী পাঁচালী ও চৈতন্য-জীবনী বহুকাল ধরে ভক্তের পরম প্রিয় 'পাঠ'-সাহিত্য ছিল। কৃষ্ণযাত্রার প্রভাবে ঐ সমস্ত পালা নাট্যআঙ্গিকে রূপান্তরিত হয়।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সামঞ্জস্যবোধ থেকে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব হোল। মধ্যযুগে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে নানা ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি প্রবল ছিল; মঙ্গলকাব্যে তাদের পারস্পরিক কলহের বিবরণ আছে। এমন কি, পরমত সম্বন্ধে চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থেও অতিশয় অসহিষ্ণুতার পরিচয় আছে। অপর পক্ষে, সে যুগে কীর্তনরত বৈষ্ণবের খোল ভেঙ্গে দিত শাক্ত-অনুগামীরা। এমন কি, শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত করত। এহেন যুগে চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ ব্যতীত অভিনয়-লীলার প্রকৃষ্ট মঞ্চ আর কোথায়? পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবদের নানা আখড়া বাংলাদেশের পশ্চিম গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল; এই আখড়ায় কৃষ্ণকথা-সম্বলিত নাটগীতি প্রচলিত হোল। তার পরের যুগই হোল ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যুগ। বৈষ্ণব ভক্তিবাদ ও সহজমত হিন্দুধর্মীদের অপরাপর শাখার ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। "চণ্ডী ক্রমে যখন ভক্তিতে ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।"[২২] শুধু চণ্ডী কেন, অন্যান্য দেবদেবীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন সূচিত হোল। আর গীতে শুধু নয়, নাটকেও সে উৎসারণ লক্ষ্যগোচর হোল।

এইভাবে কৃষ্ণযাত্রা সর্বসাধারণের সম্মুখে এসে হাজিরা দিল; নিতান্ত গোষ্ঠী-অন্তর্ভুক্ত ভক্তিবাদী নাট্যকলা সর্বসাধারণের প্রমোদকলায় পরিণত হোল। অষ্টাদশ শতকের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ব্যতীত এই উত্তরণ সম্ভব ছিল কি?

... ...

এই উত্তরণের পিছনে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যেমন সহায়তা ছিল, ধর্মীয় নিরপেক্ষতারও তেমনি একটা সহায়তা ছিল।

অষ্টাদশ শতকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি লোপ পেল; সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ধর্মবোধও নিদ্রাগত হোল। কিছু পরে লেখা হলেও এই পদ্যভাষণে সত্য আছে—

সন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী জপা, পুড়িয়ে খেয়ে সে সব দফা,
নিধুর টপ্পা গেয়ে বেড়ায় পথে ॥
(দাশরথী রায়ের পাঁচালী—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ;
১৩০৮। পৃঃ ২৩৭)

বাংলায় যাত্রার উদ্ভব

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে যাত্রা ব্যাপক আকারে দেখা দিতে থাকে। তবে সে-যুগে ভক্তের গৃহাঙ্গন বা আখড়ার আঙ্গিনা ত্যাগ করে যাত্রা বারোয়ারীতলায় আশ্রয় পেয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। জনৈক প্রাবন্ধিকের মতে বৈষ্ণব কুলতিলক চন্দ্রশেখর দাস বাঙ্গালা দেশে যাত্রার স্রষ্টা। তিনি ছিলেন অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য, জাতিতে কায়স্থ। তাঁর রচিত প্রথম পালার নাম 'হরিবিলাস'। এঁর যাত্রা 'শেখরী যাত্রা' নামে প্রসিদ্ধ।[৮]

প্রাবন্ধিকের এই বক্তব্যের পিছনে কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে, বিবেচনার বিষয়।

উক্ত প্রাবন্ধিকের মতে চন্দ্রশেখর দাসের শিষ্য হলেন জগদানন্দ দাস। দাস মহাশয় 'হরিবিলাসে' রাই সাজতেন। জগদানন্দের পরবর্তী হলেন সাত জন যাত্রাওয়ালা। এঁদের তিরোভাবের পর কিরণ দাস, চন্দ্রোদয় মজুমদার, মোহন সরকার, অনপরাধ ঘোষাল, উদ্ধব সামন্ত, হৃষিকেশ গোস্বামী, জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিহর বটব্যালের নাম পাওয়া যায়। উক্ত লেখকের মতে বটব্যালের এক 'বালক'ই পরবর্তীকালের গোবিন্দ দাস অধিকারী।[৯]

উক্ত প্রাবন্ধিক যাত্রার একটি ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত উপস্থিত করেছেন ঠিকই। কিন্তু এ ইতিহাস তথ্য-ভিত্তিক নয়। কারণ গোবিন্দ দাস অধিকারী সম্বন্ধে তাঁর সমসাময়িক যুগের সাক্ষ্য ভিন্ন কথা বলেছে।

যাত্রা সম্পর্কিত প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত লিখেছেন বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদক ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থেকে যাত্রার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল, একথা বলেছেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত 'করুণানিধান বিলাসে' সে যুগের বিবিধ প্রমোদ-কলার যে বিবরণ আছে, তার মধ্যে যাত্রার উল্লেখ আছে; এমন কি যাত্রার নানাবিধ শাখার প্রসঙ্গও অনুচ্চারিত নেই।

কালিয়দমন রাস চণ্ডী যাত্রা ধীর।
রচিল চৈতন্যযাত্রা রসে পরিপূর।[১০]

"বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার বিংশত বৎসর পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা এক ব্যক্তি কেঁদেলী গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্বে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশ স্বরূপ এক প্রকার যাত্রা তদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায় লোপ হইয়াছিল। শিশুরাম হইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পরে শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।"[১১]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাত্রা-নাটক প্রসঙ্গে যে জঘন্য অপভ্রংশের কথা বলেছেন, তা মোটামুটি সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রেও কি দেখা যায়নি?

যাত্রার নাটক ইতিপূর্বেই ভক্তিরসে পরিশুদ্ধ হয়েছিল। শিশুরাম অধিকারীর কৃতিত্ব 'জঘন্য নাটকের' পবিশুদ্ধী করণে নয়। শিশুরামের প্রকৃত কৃতিত্ব যাত্রাকে আখড়ার নাট্যকলা থেকে সাধারণ প্রমোদকলায় রূপান্তর সাধন। কোন কোন ঐতিহাসিক শিশুরাম অধিকারীকে ভারতচন্দ্র ও রাম-প্রসাদের সমসাময়িক বলেছেন।[১২]

আর শ্রীদাম-সুবলকে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত পলাশী যুদ্ধের পূর্ববর্তী বলে মন্তব্য করেছেন।[১৩]

কিন্তু শ্রীদাম সুবল যে উনিশ শতকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ সাময়িক পত্রিকার দুইটি সংবাদে পাওয়া যায়। সংবাদ দুইটি নিম্নরূপ:

১. "১২১১ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে (কলিকাতায়) দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হইল। তাহার এক পক্ষে বাগ্‌বাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদয় ভদ্রসন্তান আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরেঘাটা নিবাসী নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতি হইলেন। ...নিধুবাবু বাগ্‌বাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন এবং মল্লিকবাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থ প্রবৃত্ত হইলেন।"[১৪]

২. "ওলাওঠা রোগ এতদ্দেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে ঐ রোগে অনেক লোক মরিতেছে। কালিয়-দমন যাত্রাকারি শ্রীদাম ও সুবল

দুই যাত্রা দুর্গোৎসবে শ্রীরামপুরে যাত্রা করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে নবমী পূজার দিন দুই প্রহর সময়ে শ্রীদাম ঐ রোগে মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব রাত্রিতে ঐ সম্প্রদায়ের এক বালক মরিয়াছিল।"[১৫]

এই সংবাদ দুইটি থেকে শ্রীদাম ও সুবলের জীবিতকাল নির্ধারিত করা যায়। বিশ্বকোষের মতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যেই যাত্রার উদ্ভব ঘটেছিল।[১৬] আমাদের মতে ষোড়শ শতকেই যাত্রার উদ্ভব হয়েছিল, অষ্টাদশ শতকে যাত্রা সাধারণ প্রমোদকলায় রূপান্তরিত হয়েছিল। রাঢ়ের ভক্তি-প্লাবিত অঞ্চলে জন্মলাভ করে কলকাতায় যাত্রা যে আসর জাঁকাতে পেরেছিল, ধর্মীয় নিরপেক্ষতাই তার কারণ।

যাত্রার পরিবর্তন

কেঁদুলির শিশুরামের কৃষ্ণযাত্রা ভাগরথীর তীরে এসে কি পরিবর্তিত হয়েছিল?

শ্রীদাম সম্বন্ধে একটি সংবাদে জানা যায় যে তিনি মল্লিকবাবুর পক্ষে গীত ও সুর প্রস্তুত করতেন। সংবাদ প্রভাকরের এই উক্তি 'গীতরত্ন' তৃতীয় সংস্করণে সমর্থিত হয়েছে। "১২১০ অব্দে যখন মহামান্য রাজকৃষ্ণ বাহাদুর 'আখড়াই' আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস, রাম ঠাকুর ও নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্বদাই—'আখড়াই' সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহারা তাবতেই এ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল। কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।"[১৭]

এই শ্রীদাম দাস কৃষ্ণযাত্রা গাহনা করতেন। বলা বাহুল্য আখড়াই সঙ্গীতের বাঁধনদার আর যাত্রার পালার বাঁধনদার এক ব্যক্তি হলে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য প্রত্যাশা করা যায় না।

যাত্রা কলকাতায় এসে তার ভক্তিরস ফিকা করে নিল রঙ্গরসের মিশ্রণে। এবং বহু স্থলে ভক্তিরস আদিরসের কবলে পড়ে এক বিকৃত প্রমোদকলায় পরিণত হোল। কৃষ্ণ-কাহিনীর বিশেষ বিশেষ বিষয় কেবল গুরুত্ব অর্জন করল।

"আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানতঃ যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, তাহা অতি অযোগ্য। কলংক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদিগের গানের প্রধান বিষয়।"[১৮]

শুধু কবিসঙ্গীতে নয়, পাঁচালীতে নয়, ঢপ্‌-কীর্তনে নয়, 'যাত্রায়ও এই দুটি প্রসঙ্গ অত্যধিক মর্যাদা পেয়েছে।

বিষয় দুটির মধ্যে ইন্দ্রিয়পরতার যেটুকু' উসকানি ছিল, তার পূর্ণ ব্যবহার করা হোল। শব্দ অলংকার ও ছন্দের স্পর্ধিত চটুলতায় এই বক্তব্য এক নবীন অতিশয়তায় গায়েন হোল। তার সঙ্গে সঙ্গত করল সমসাময়িক অশালীন মজলিশী রুচি। যে নাটক আখড়ার ভক্ত-পরিমণ্ডলে অশ্রু আকর্ষণ করত, তা কলকাতায় এসে 'প্যালা' সংগ্রহে তৎপর হোল। শুধু গায়কী পদ্ধতি নয়, বিষয়বিন্যাসরীতির মধ্যেও বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৮২২ সনের সমাচার দর্পণে তাই মন্তব্য প্রকাশিত হোল:

"স্ত্রীলোকের অকর্তব্য এই দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্য পুরুষ অবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী ও ব্যভিচারিণীব সংসর্গ। এই সকল কর্ম স্ত্রীলোকের ধর্মনাশের কারণ হয়।"[১৯]

ঐ সনেই প্রকাশিত রামমোহন রায় লিখিত "চারি প্রশ্নের উত্তর" নামক পুস্তিকায় একই মনোভাবেব সাক্ষাৎ মিলবে:

"দুর্জয় মানভঙ্গ যাত্রা ও সুবলসংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান কেবল চিত্ত মালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়।"[২০]

রামমোহন রায় যাত্রার যে সমস্ত কথাবস্তুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, তার সব কয়টিই গোবিন্দ অধিকাবীব রচনাব মধ্য স্থান পেলেও ১৮২২ সালে গোবিন্দ অধিকারী যাত্রা-জগতে অবতীর্ণ হননি, কারণ বিবিধার্থ সংগ্রহের প্রবন্ধে (১৮৫৯) তাঁর নাম উল্লিখিত হয়নি। সম্ভবত তখনও তিনি কীর্তন গায়ক।

শ্রীদাম-সুবলের খ্যাতি ১৮২০ সালে সর্বাধিক। রামমোহন-কথিত পালাগুলি তবে কার রচনা?

শ্রীদাম-সুবলের কোন রচনা আজ আর পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যায় সেগুলি ঝাঁঝালো আদিরস-নির্ভর; এবং অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষের অলংকারে বিভূষিত। কারণ শ্রীদাম ছিলেন আখড়াই গানের বাঁধনদার। আখড়াই গানের আর একজন বাঁধনদার 'নল-দময়ন্তীর পালা' লিখেছিলেন। একই জাতের কবির রচনা বলে ঐ পালার গানগুলি পর্যালোচনা করলে শ্রীদামের পালার কাব্যসৌন্দর্য অনুমান করা যায়।

গোবিন্দ দাস অধিকারী

গোবিন্দ অধিকারী ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই তাঁর খ্যাতি অতিশয় বিস্তৃতি পায়।

একজন প্রাবন্ধিক বলেছেন যে, গোবিন্দ ছিলেন হরিহর বটব্যালের 'বালক'। এই মতের কোন সমর্থন মেলে না।[২১]

শ্রীদামের শিষ্য পরমানন্দের ছোকরা ছিলেন গোবিন্দ, একথাও কেউ কেউ বলেছেন। (সাহিত্যের কথা—পৃ. ২২২)। এক্ষেত্রে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অপেক্ষা ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের অভিমত অধিকতর গ্রাহ্য মনে করি। হরিমোহনের এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। গোবিন্দ হাওড়ায় যে পল্লীতে বসবাস করতেন, বদন অধিকারীও হাওড়ায় সেই পল্লীতেই একদা বসবাস করতেন। উভয়েই শালিখার অধিবাসী।

গোবিন্দ অধিকারী-রচিত যাত্রার পালায় ভক্তিরসের আনাগোনা বেশি, প্রমোদ রসের নয়। এক্ষেত্রে শ্রীদাম অপেক্ষা অন্য কোন বাঁধনদারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটা সম্ভব। কে তাঁর গুরু, এ প্রশ্ন অমীমাংসিত।

এ-ছাড়া তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে তাঁর মানসিকতার একটা দিক আলোকিত হয়ে পড়ে। ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, গোবিন্দ অধিকারী ১২০৫ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলায় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকট জাঙ্গীপাড়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্য বয়সে তিনি কীর্তনগান শিক্ষা করেন। হাওড়া জেলার আমতা থানার ধুবখালি গ্রামের গোলোকচন্দ্র অধিকারীর কাছে তিনি শিক্ষানবিশী করেন। গোলোকচন্দ্র ঐ অঞ্চলের সুপরিচিত কীর্তন গায়ক ছিলেন। গোবিন্দ প্রথম জীবনে ঐ দলে দোহারকী করতেন; পরে তিনি নিজে একটি দল গঠন করেন। কিন্তু কীর্তন গেয়ে তিনি আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারলেন না। হরিমোহনের মতে তিনি এই কীর্তনের দলকেই যাত্রাদলে রূপান্তরিত করেন।[২২] তাঁর প্রথম পালা হোল 'কালিয়দমন।'[২৩]

কালিয়দমন যাত্রার তিনিই স্রষ্টা, এ দাবী টেকে না। কিন্তু 'বাঙালীর গানে'র সম্পাদক ঐই দাবী করেছেন। শ্রীদাম সম্বন্ধে সমাচার দর্পণ থেকে যে সংবাদটি উৎকলিত হয়েছে, সেখানে শ্রীদামকে 'কালিয়দমন যাত্রাকারি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। শ্রীদাম যে এই বিশেষ ধরনের যাত্রার উদ্ভাবক, তা

বলা হয়নি। তিনি ঐ রীতির যাত্রা অভিনয় করতেন মাত্র; অনুগত অনুবর্তনকারী। শ্রীদাম-সুবল যে কালিয়দমন যাত্রার উদ্ভাবক নন, তার প্রমাণ করুণানিধানবিলাস। সেখানে 'কলিয়দমন যাত্রা'র উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থে সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দশকের প্রমোদকলার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত কেঁদুলীনিবাসী শিশুরামই কালিয়দমন যাত্রার স্রষ্টা।

যাত্রার বাঁধনদার অধিকাংশ ছিলেন রাঢ় দেশের লোক; সমাচার চন্দ্রিকা (৭ই জানুয়ারী ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ) লিখছেন, "কালিয়দমন, রাম যাত্রা, চণ্ডী যাত্রা রাঢ় দেশীয় ক্ষুদ্রলোকেব সন্তানেরা করিয়া থাকে।" লোকগুলি 'ক্ষুদ্র' ব'লে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সংবাদটি বড।

দাশরথী রায় ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মেছিলেন। আর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। উভয়েই ছিলেন সমসাময়িক। দাশুরায়েব প্রভাব গোবিন্দ অধিকারীর উপর পডেছিল, একথা বলা যায়। উভয়ে একই প্রবণতায় ভারতীর আরাধনা করেছেন। গোবিন্দ অধিকারীর পালা-সঙ্গীতে পাঁচালীকারদেরই রচনা-রীতি অবলম্বিত হয়েছে, কবি-সঙ্গীতের নয়। সম্ভবত প্রথম জীবনে কীর্তনের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এবং দোহারকী করায় এই রীতি তাঁর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রচনায় একটা শুচিতা ছিল, শুভ্রতা ছিল।

পালার বিষয়গুলি নির্বাচনে তিনি যুগের বিকৃত শাসন অংশত মেনে চলেছেন, যুগের শাসন তাঁর কণ্ঠকে সম্পূর্ণত পরিচালিত করেনি। তাঁর পালার গাঁথুনিতে চৈতন্য-প্রবর্তিত রীতিই অবলম্বিত হয়েছে, ভাষায় এসেছে ভক্তি-সাহিত্যের অশ্রুময়তা, এবং কখনও কখনও অনুপ্রাসেব খঞ্জনীধ্বনি।

গোবিন্দ অধিকারীর "মানভঞ্জন যাত্রা" শীর্ষক গ্রন্থে পাঁচটি পালার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

১। মানভঞ্জন যাত্রার পালা
২। সুবলসংবাদ যাত্রার পালা
৩। মাথুর পালা
৪। অথ জন্মাষ্টমীর রাধাই পালা
৫। কলঙ্কভঞ্জন পালা

উক্ত সংকলন-গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে :

> উক্ত মহাত্মার রচিত কালিয়দমন যাত্রার পালাগুলি এ পর্যন্ত কখনও মুদ্রিত হয় নাই। আমি এই অভাব মোচন করিবার অভিপ্রায়ে তদীয় ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বৈরাগ্য মহাশয়কে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। উক্ত বৈরাগ্য মহাশয়ও আমার কথায় সম্মত হইয়া স্বীয় উদারতা গুণে আমাকে ৺গোবিন্দ অধিকারীর স্বহস্ত লিখিত একখানি খাতা প্রদান করেন।"[২৪]

সংকলিত পালাগুলি যে গোবিন্দ অধিকারীর পালা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য মুদ্রণের পূর্বে এগুলি রাখাল কবিরত্ন নামীয় জনৈক পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধিত করে নেওয়া হয়।

গোবিন্দ অধিককাবীব সকল পালাকে 'কালিয়দমন যাত্রার পালা' বলা হয়েছে।

এগুলিকে 'কালিয়দমন' কেন বলা হয়? পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, কালিয়দমন দিনে গোপীদের মনে পূর্ববাগেব সূচনা হয। এই কারণে কৃষ্ণযাত্রাব পালার নামই হোল কালিয়দমন যাত্রা।[২৫]

কেউ কেউ বলেছেন "কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালিয়দমন পালা জনপ্রিয হওয়ায়, সুতরাং প্রাযশঃ অভিনীত হওয়াব কৃষ্ণযাত্রা কালিয়দমন যাত্রা বা কালদমনে যাত্রা নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।" "প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন।"[২৬]

এই প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য :

> **"This form of literature was extemporised and was meant to contribute to the transient pleasure of its audience, and much of it was of ephemeral type No attempt was ever made to preserve them in print, and much of this literature is now lost."[২৭]**

বর্তমানে বহু পালা লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু পঁচিশ-পঞ্চাশ বৎসরে তার অনেক অংশই যে গায়েন পরম্পরায় প্রচলিত ছিল, তা বোধ হয় অস্বীকার কবা যায় না।

গোবিন্দ অধিকারীর সংগৃহীত পালাগুলির মধ্যে 'কালিয়দমন' শীর্ষক কোন পালাই দেখা যাচ্ছে না। তবে 'কালিয়দমন' নামে কি কোন বিশেষ পালা বজে ছিল না? ওটা কি এক সাধারণ (common) নাম?

কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে কালিয়দমন পালার একটি অভিনয়-বিবরণ পাওয়া যায় :

> মধ্যস্থলে এক অজগর কালীয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেই ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আব মধ্যে মধ্যে "নয়ন ঢোলাইয়া" নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য পীড়নে কালীয়েব প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে। চারিপার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্ধাঙ্গ তুলিযা যোড করে কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে- কখন তাহা কথায কখন বা গীতে। নিকটে এক মাচাব উপর মৃদঙ্গ করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া যাত্রাওয়ালাবা দোযার্কি করিতেছে।"২৮

এ বর্ণনা তবে কি বাস্তব নাট্যাভিনয়েব বর্ণনা নয? প্রাবন্ধিকের মানস-সন্দর্শনের বর্ণনা? কালিয়দমন নাম কেন হোল, তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কি এই কাল্পনিক অভিনয়লীলা বর্ণনা?

> 'কালিয়দমন যাত্রায় সাধাবণত লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছিল, সে নাম লোকের অভ্যাস পাইযাছিল, সুতবাং লোকে কৃষ্ণযাত্রাকে সেই নামে অভিহিত করিল। তাহাব পর যখন কালিয়দমন ছাড়িয়া কৃষ্ণযাত্রার জন্য অন্য পালা আবন্ত হইল, লোকে তখনও সেই কালিয়-দমন নাম ব্যবহার কবিতে লাগিল। কালিয়দমন কৃষ্ণযাত্রা, সুতরাং তাহারা বুঝিল কৃষ্ণযাত্রা মাত্রেই কালিয়দমন। দান হোক, মান হোক, মাথুব হোক, যে পালাই হোক, লোক সকল পালাকেই কালিয়দমন বলিতে লাগিল।"২৯

সম্ভবত কালিয়দমন বিষযক কোন পালা বঙ্গদর্শনেব লেখক দেখেননি। নামকরণের পক্ষে যুক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি একটি কাল্পনিক চিত্র খাড়া করেছেন মাত্র। তবে তিনি মনে করেন :

> "অন্য সময়ে এই যাত্রা হইতে নাটক উৎপন্ন হইত, কিন্তু তখন শাক্ত বৈষ্ণব বড দলাদলি. সুতরাং নাটকের রস কেহ লক্ষ্য করে নাই শক্তিযাত্রার স্থলে কৃষ্ণযাত্রা হইল, লোকে এইমাত্র বুঝিয়াছিল।"৩০

কালিয়দমন পালার যথার্থ নাট্যরস আছে, এই তাঁর অনুমান। কিন্তু শাক্ত-বৈষ্ণব দলাদলির ফলে এই নাট্যরসের সার্থক পরিস্ফুটন সম্ভব হয়নি।

কালিয়দমন পালা বহু পূর্ব থেকেই অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। বাঙ্গালাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কোন কালিয়দমন পালা অভিনীত হয়েছিল, এমন বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে না।

কৃষ্ণযাত্রার অধিকাংশ পালায় গোপিনীদের প্রেমানুরাগের নানা বিলসন রয়েছে। এই প্রেম-ভাব যে ঘটনা উপলক্ষ্যে স্ফুরিত হোল, তার গুরুত্ব কিছুটা স্বীকৃতি পাবে, এটা স্বাভাবিক।

সম্ভবত গোবিন্দ দাস অধিকারী রচিত কোন কালিয়দমন পালা ছিল না; তাঁর অধিকারী জীবন শুরু হবার পূর্বেই কৃষ্ণযাত্রা কালিয়দমন যাত্রা হয়ে পড়েছে।

মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর— এই তিনটি সে যুগের প্রধান কথাবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সখীবাই ছিলেন ঐই সব পালার মুখ্য গায়িকা, সখীদের সঙ্গে থাকতেন দূতী। কী কীর্তন,—পদকীর্তন (তার আধুনিক সংস্করণ ঢপ্ কীর্তন), কী পাঁচালী, কী কবিসঙ্গীত সর্বত্রই সখী আর দূতীর দাপট। কবিসঙ্গীতে সখী-সংবাদ একটা পৃথক অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই পরিবেশে গোবিন্দদাস অধিকারী মানভঞ্জন', 'কলঙ্কভঞ্জন' পালা ব্যতীত 'সুবল-সংবাদ' এবং 'জন্মাষ্টমী' পালা রচনা করেছেন, নিঃসন্দেহে এটা তাঁর পক্ষে প্রশংসাজনক। 'জন্মাষ্টমী' পালা বা 'সুবল-সংবাদ' পালার ভাব-অনুষঙ্গ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বিকৃত ভাবনার পংকে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়নি, এটা লক্ষ্য করবার মত। গোপাল উড়ের যুগে গোবিন্দ দাস অধিকারী কৃষ্ণযাত্রার শহরে শেষ শালীন কবি। গোবিন্দ দাস অনেকটা 'অংকীয়া নাটে'র মত বা অন্যান্য ভাষানাটকের মত বন্দনা দিয়ে নাটক শুরু করতেন। বলা বাহুল্য সে বন্দনা কৃষ্ণবন্দনা। তারপর গৌরচন্দ্রিকা। তারপর গানের পর গান। সেই গানে প্রচুর পরিমাণে থাকত গীতগোবিন্দের ছিটা। 'মানভঞ্জন' পালায় জয়দেব হাজির:

যত পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপয়ানং।

গানের পর গান চলছে, মাঝে মাঝে ছড়ার চুমকি, সেই ছড়াও পদাবলী-ভাঙ্গা। দেখলে মনে হবে এগুলিও গান। কিন্তু বাঁধনদার পার্থক্য করে দেখিয়েছেন, গানে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে, তালের উল্লেখ আছে; ছড়াতে এসব কিছু নেই।

শ্রীমতী রাধা অপেক্ষা করে আছেন, কৃষ্ণ আজ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে এসেছেন। রাধার আকুতি একটা ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে—

শুনইতে কানু মুরলি রব মাধুরী,
এচন নিবারণ তাও।
হেরইতে রূপ নয়নে যুগ ঝাপোনু
তৈখলে রাখ নিলয়।

এগুলি পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত কোন পদের প্রতিধ্বনি। কিন্তু তার পরবর্তী চরণ দুইটি বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত, অবশ্য তৎকালীন বাংলায়।

কবেছিলাম গো বারণ, শুনলি না বারণ, যেমন বারণ,
উন্মত্ত বাবণ, মানে না বারণ।

এদিকে রাত শেষ হয়ে আসছে। নায়ক চন্দ্রাবলীব কাছে বিদায় চাইছেন—

আর নিশি নাই বিদায দেও হে চন্দ্রাবলী।
কাতর হইয়ে তোমায় বিনয কবে বলি॥
অরুণ উদয় হলো, শশী অস্তাচলে গেল।
কুমুদী তেজিযে দেখ কমলে যায় অলি॥

বাধা ও কৃষ্ণ এই প্রকার কথাবার্তা বলেছেন—গানেই বাক্যস্ফূর্তি বেশী হচ্ছে। তারপর একটি পযাব-ছড়া দেখতে পাচ্ছি—

বৃন্দে বলে প্রাণনাথ যোগী যদি হবে।
যোগীর সাজ রসবাজ বল কোথায় পাবে॥
কৃষ্ণ কহে বিন্দে সখি তার চিন্তে নাই।
শেবি আরাধিযে সাজ লব তার ঠাঁই॥
এইরূপে বিশ্বরূপ কবিলে গমন।
সুবলে সুবোল শ্যাম বলয়ে তখন॥
অনেক সঙ্কটে প্রাণ বাঁচালে সুবল।
এখন কি উপায়ে রাধা পাই তাহাব উপায় বল॥

পয়ার-অংশ অধিকারীব মুখে বসান হোত। শুকসাবীর দ্বন্দ্ব, চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ্ব—সবই অধিকারীব কণ্ঠ আশ্রয় করে শ্রোতার কাছে হাজির হোত। এক্ষেত্রে ভক্তি-আন্দোলন-প্রভাবিত অন্যান্য নাট্যপ্রথার সঙ্গে গোবিন্দ দাস অধিকারীর পালার আন্তরিক মিল আছে, বিশেষ করে অংকীয়া নাটের সঙ্গে বেশি মিল। এই পালায় জুড়ি প্রথা ছিল না, এই কারণে ধুয়ার উল্লেখ নেই। বজ্রনাগান

গাইবার দায়িত্ব দোহারদের ওপর বর্তেছিল; পয়ার বা ছড়া অধিকারী বলতেন—সুর দিয়ে বলতেন, রাগ-রাগিণী দিয়ে নয়। সংলাপ এখানে তার বিশুদ্ধতা পায়নি, সংলাপ সঙ্গীতের হাত ধরে হাটছে।

'মাথুর পালা'র গঠন-ভঙ্গীও অনুরূপ। প্রথমে রাধিকার লিখিত পত্র এসে পৌঁছাল; তারপর সুরু হোল কৃষ্ণের যমকবহুল খেদ:

আমি চিনি না কলমের খত।
শিখায়েছ নাকে খত॥
লিখায়েছ দাসখত।
দিয়েছি তাও ঢেরা সই॥

যমক রাইকিশোরীর গানে, সখীদের গানেও।

হরি তুমি কত ধনের ধনি।
তুমি কিসের ধনি॥
ব্রজেতে আছে যে ধনি।
তার কাছে তুমি কি ধনি॥

সমগ্র পালা গানের মালায় গাঁথা। ঝুমুরসঙ্গীতের সঙ্গে মূলত কোন প্রভেদ নেই, একমাত্র পয়ার বা ছড়ার অংশ ব্যতীত। পয়ারে বা ছড়ার অংশে গল্পের খেই ধরা থাকত।

শিশুরাম যে নাট্য-রীতি তৈরি করেছিলেন, তাতে ঝুমুরসঙ্গীতের প্রভাব থাকা অনিবার্য ছিল। কীর্তনগান থেকে গোবিন্দ অধিকারী যাত্রায় এসেছেন, কিন্তু তবুও তাঁকে শিশুরামের পথেই পদচারণা করতে হয়েছে। তাঁর যাত্রার পালার গাঁথুনীতে কলকাতার কিছু রীতি এবং প্রাচীন নাটগীতির কিছু রীতি মিশিয়ে নিতে হয়েছে।

গোবিন্দ অধিকারী যাত্রাপালার দাশরথী রায়। দাশরথী রায় গোবিন্দ অধিকারীর পালায় নানাভাবে উপস্থিত আছেন; বিষয়-নির্বাচনে আছেন, কথকতারীতির সাহায্য গ্রহণে আছেন, অনুপ্রাসবাহুল্যে আছেন, এমন কি গানের সুর-নির্বাচনে পর্যন্ত আছেন।

তিনি নানা সুর প্রয়োগ করেছেন—কীর্তনাঙ্গ সুরই প্রধান, চপ্‌ কীর্তনের সুরও ব্যবহার করেছেন, নানা লোকসঙ্গীতের সুর ব্যবহার করেছেন, যেমন 'আয়লো নবীন বিদেশিনীর' সুর, 'ভাঙ্গলো হাটে'র সুর; এমনকি সরিমিঞার টপ্পার সুর ব্যবহারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। তিনি দাশরথী রায়ের

সুর ব্যবহার করেছেন। পালার নানা বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপস্থিতি যতটা স্পষ্ট, সুরের ক্ষেত্রেও ততটা। বরং এক্ষেত্রে যেন একটু বেশি তেজের সঙ্গেই ঊনবিংশ শতাব্দী হাজির হয়েছে।

নাটক হোল ফলিত কলা, ঘরে বসে পড়বার সাহিত্য নয়, শ্রাব্য ও দৃশ্য কাব্য হোল নাটক। তাই তাকে জনরুচির পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে।

গোবিন্দ দাস অধিকারী ঊনংবিশ শতাব্দীর পচনশীল জনরুচির প্রতি সম্ভ্রম দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি স্বাতন্ত্র্যও বক্ষা করেছেন। জন্মাষ্টমী ও সুবল-সংবাদ রচনা করে সম্পূর্ণ রকমে যুগের চরণে আত্মসমর্পণ করেননি। সখ্য ও বাৎসল রস তাঁর পালায় স্থান পেয়েছে—বৈষ্ণব ভাব-পরিমণ্ডল খণ্ডিত হয়ে তাঁকে ছলনা করেনি।

অধিকারীতেই ভক্তিরসাশ্রিত কৃষ্ণযাত্রাব একটি পর্ব শেষ হবে। কলকাতা-কেন্দ্রিক দেশীয নাট্যকলা এর পব অন্য খাতে দেখা দেবে। ভক্তিরসাশ্রিত নাট্যকলাব স্থান আর কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নয়। পুবাতন যাত্রা-রীতির প্রতিদ্বন্দ্বী এক নতুন যাত্রাবীতির উদ্ভব ঘটবে। তা হোল সখেব যাত্রা। এই সখের যাত্রা কবিসঙ্গীত, আখডাই ও হাফ-আখডাই গানের মেজাজেব সঙ্গে অধিকতব সামঞ্জস্যপূর্ণ, একে যথার্থ কলকাতাব প্রমোদকলা বলা চলে। গোবিন্দ দাস অধিকাবীর যাত্রা কলকাতায় হোল বহিবাগত। গ্রাম-ভিত্তিক সমাজের নাটগীতি কলকাতার নাগরিকতার সংস্পর্শে পড়ে নাগরালি শিখে ধর্মভ্রষ্ট হোল। সখের যাত্রা হোল সেই ভ্রষ্ট প্রমোদকলা।

গীতগোবিন্দ থেকে নাটগীতিব যে ধাবাব সূচনা, গোবিন্দ দাস অধিকারীতে এসে তাব অবসান। গীতগোবিন্দে বন্দনা দিয়ে শুরু, তারপব বাধাকৃষ্ণ আব সখীর গান দিয়ে নাটক পরিপূবিত। গান অবশ্য নিঃসঙ্গ ছিল না, নৃত্যেব সাহচর্যে অভিনয় সম্পূর্ণ হোত। সখীর গানেব সংখ্যার আধিক্য দেখে বোঝা যায় সখীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য।

গোবিন্দ দাস অধিকারীও এই আঙ্গিকই ব্যবহার করেছেন। তাঁর পালায় সখীর ভূমিকা ছিল প্রধান। তিনি নিজেই এই ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

রুচির বিকৃতি ও যাত্রা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কলকাতা নিছক ভক্তিরসাত্মক পালা উপভোগ করার মত মানসিক অবস্থায় ছিল না। তাই জনরুচির তাগিদে

গোবিন্দ অধিকারী রচিত বা অভিনীত পালাগুলির অঙ্গে যুগ-চিহ্ন ফুটে উঠেছিল ; বিষয়-নির্বাচনে, সুর-নির্বাচনে ও শব্দ ও অলংকার-যোজনায়।

কলকাতা তখন লাম্পট্য শিক্ষার শিক্ষাগার হয়ে উঠছে। তাই যাত্রার এই পুরাতন সুর শহর কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। কৃষ্ণকমল গোস্বামী নদীয়ার অধিবাসী, কিন্তু পূর্ববঙ্গে গিয়েই তাঁর প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হোল।

কলকাতায় তখন শুরু হয়েছে সখের যাত্রাব সৌখীনতা, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী নাট্যসাহিত্যেব ও নাট্য-অভিনয়েব প্রভাবে এক নতুন নাট্যধারার জন্ম হচ্ছে।

কলকাতায় তখন ধর্মবুদ্ধি শুধুই প্রমোদবুদ্ধি। ধর্মীয় দ্বন্দ্ব উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে দেখা দিতে শুরু করে, প্রথমে খৃষ্টান পাদরীদের সঙ্গে পাঞ্জা কসা। পরে সংঘর্ষের আসর বদলে গেল। একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে পৌত্তলিকদের সংঘর্ষ শুরু হোল, উন্নতিকামীদের সঙ্গে রক্ষণশীলদের। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিশুরামদের যাত্রা শিশুদেরই কেবল প্রীতির কারণ হতে পারে—বয়সে শিশু ও মানসিকতায়। এই প্রমোদকলা যুগ-প্রয়োজন সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি—কারণ তাব মুখ ভবিষ্যতেব দিকে নয়. ছিল অতীতের দিকে।

"যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকাব হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ ও কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিভের মত, ব্যবহারে কেবল 'ওয়েদর ককে'র কাজ করে। দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ঘোটকেব অভিনয় দেখতেন, পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু আজকাল আমরা বারোয়ারিতলায়, নয় বাড়িতে, বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনে'র তানে পরিতুষ্ট হচ্চি; ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল নাচ, পাঁচালী ও পচাখেউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি; যাত্রাওয়ালাদের 'ছকুবাবু' ও সুন্দরের সং নাবাতে হুকুম দিচ্চি। মল্লযুদ্ধের তামাসা "হ্যাথ বুলবুল ফাইট" ও "ম্যাড়ার লড়াইয়ে" পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেছেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি।"[৩১]

কলকাতা শহরের এই রুচিবিকৃতি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। "কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগল; তাই দেখে হিন্দুধর্ম,—কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাঁফ-আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লে, শহরের যুবকদল গোখুরী, ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন, টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দী পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতার কায়েত-বামুনের মুরুব্বী ও শহরের প্রধান হয়ে উঠলো।"৩২

হুতোম তাঁর যুগের চিত্র যথাযথ দিয়েছেন, কারণ এটা তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইতিহাসের বিবরণ যথেষ্ট ঐতিহাসিক নয়। কৃষ্ণচন্দ্র, মানসিংহ—এঁরা কেউই সুরুচির ধারক ছিলেন না, আর নাটকও তখন সুস্থ ও সুকুমার ছিল না। তবে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা নতুন ধরনের সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শুধু বিদেশী বণিকের নয়, বিদেশী ধর্মগুরু ও প্রচারকদের কর্মস্থল কলকাতা।

কলকাতায় পুরাতন মূল্যোবোধ ও নতুন মূল্যবোধ পাশাপাশি বহুকাল বসবাস করে, এদেশ জয় করলেও ইংরেজরা এদেশের অর্থনীতিক ও সামাজিক মৌলিক পরিবর্তনে বাধা দিয়েছে। তাদের শোষণের ফলে পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে পড়ছে, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠতে কেউ সাহায্য করেনি। জনৈক পুরাতন সমাজ-বিজ্ঞানীর ভাষায়

> England has broken down the whole framework of Indian society, without any symptoms of reconstruction yet appearing. This loss of his old world with no gain of a new one, imports a particular kind of melancholy to the present misery of the Hindus and separates Hindoostan, ruled by Britain from all its ancient traditions and from the whole of its past history.৩৩

তবু নতুন একটা সমাজ গড়ে উঠছে। প্রথম যুগে এই নবীন সমাজ ছিল খুবই উন্নাসিক। আর পুরাতনের পূজারীরা ক্রমশ অবক্ষয়ের গহ্বরে প্রবেশ করতে লাগল।

এই যুগে ধর্মের নামে ধর্মের বিকৃতি একটি সাধারণ সত্য হয়ে পড়েছিল।

"নাসিকাতে সবিন্দু তিলক যাহার সেবাতে প্রায় অর্ধদণ্ড ব্যয় হয় ও ভূরি কাল হস্তে মালা যাহাতে যবনাদির স্পর্শাস্পর্শ বিচার নাই এবং লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত বিনয় পরোক্ষে আপন জ্ঞাতিবর্গ পর্যন্তরও নিন্দা এবং সর্বদা এইভাব দেখান যেন এইক্ষণে পূজা সাঙ্গ করিয়া উত্থান করিলাম ও বাহ্যেতে কেবল দয়া ও অহিংসা এই সকল শব্দ সর্বদা মুখে নির্গত হয় কিন্তু গৃহমধ্যে মৎস্যমুণ্ড ভিন্ন আহার হয় না।"[৩৪]

হুতোম এদেরই বলেছেন বকধার্মিক, সেই বকধার্মিকের স্বরূপ এইভাবে বর্ণিত:

"বকধার্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুরনাদুর—ভুঁড়িটি বিলাতী কুমড়োর মতো মাথা-কামান চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা। গলায় মালা ও ঢাকের মত গুটিকতক সোনার মাদুলী, হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁফে কলফ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রাম জামা ও জরির বাঁকাতাজ, গত বৎসর আশী পেরিয়েছেন—আজ ত্রিভঙ্গ। কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্ত গোচের ভদ্রলোকের মেয়ে ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন! ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।"[৩৫] এ চিত্র বড় পরিচিত চিত্র, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিও অতিশয় পরিচিত।

লালবিহারী দে খৃষ্টীয় মতাবলম্বী এবং ধর্মযাজক ছিলেন। কিন্তু তাঁর পদ্য-সমালোচনায় বাস্তব অবস্থা বর্ণিত হয়নি, এমন কথা বলা যায় না।

নিয়মিত দুর্গোৎসব করে যেই জন।
সর্বদা করায় যদি ব্রাহ্মণ ভোজন॥
যে জন যদ্যপি সদা করে সুরাপান।
আর প্রতি রাত্রি যদি যবনান্ন খান॥
গোমাংস শূকর মাংস করিতে ভোজন।
ইংরেজের হোটেলেতে করেন গমন॥
যবনী রমণী যদি করেন রমণ।
তথাপি তাহার জাতি মারে কোনজন॥[৩৬]

পুরানাপন্থীরা পুরানো আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করে নিয়েছে তাদের রুচি ও রসবোধ অনুযায়ী। নববাবুদের বিলাসলীলায় বর্ণনা

নানাস্থানেই আছে—তার পুনরুক্তি করে লাভ নেই। তাস-পাশা-বড়ে টিপে, আখড়াই, হাফ-আখড়াই শুনে, বুলবুলির লড়াই দেখে আর ঘুড়ি উড়িয়ে, গাঁজা-চরস-মদ-আফিঙ-ভাঙ নেশাদি ক'রে, দাঁতে মিশি, চুলে কলপ ও চোখে সুরমা দিয়ে, কাস্তে পেড়ে ধুতি ও বুটিদার পাঞ্জাবী পরে এই হঠাৎ-বাবু-সমাজ বৃটিশ ছত্রছায়ায় অতি আরামে জীবন অতিবাহিত করছিল। যাত্রা গান তাদের খপ্পরে পড়ে তার চরিত্র হনন করল।

"লেখাপড়া শেখা বা তার উৎসাহ দেওয়া পদ্ধতি পদ্মলোচনের বংশে ছিল না, শুদ্ধ নামটা সই করতে পাল্লেই বিষয় রক্ষা হবে, এই তাঁদের বংশ পরম্পরায় স্থির বিশ্বাস ছিল। সরস্বতী ও সাহিত্য ঐ বংশের সম্পর্ক রাখতেন না।"

"যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ ও করবার প্রচলিত হয়।"

কলকাতা শহরে এখন চলছে, বেদেনীর নাচ, ছকুবাবু ও সুন্দবেব সঙ, আর 'মদন আগুনের' তান।

বস্তুত এগুলি নতুন আমদানী কিছু নয়, সমাজের নিম্নস্তরে শ্লীল অশ্লীল পাশাপাশি অবস্থান করত। লোক সংস্কৃতির সবটুকুই নির্মল ও পবিত্র নয়। তবে বিশেষ যুগ ও বিশেষ সমাজব্যবস্থা এগুলির প্রশ্রয়দাতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সমাজপতিদের উৎসাহেই সংস্কৃতির অধোগতি শুরু হয়, এটা সাধারণ ঘটনা।

"পূর্বেকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত স-কার ব-কারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদেব পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতিকুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন।"[৩৭]

বিবিধার্থ সংগ্রহেব সম্পাদক ও কৃষ্ণচন্দ্রের রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করেননি:

"লাম্পট্যদোষে তাঁহার সমুদায় গরিমা কলুষিত হইয়াছিল।"[৩৭ক]

"মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিস্তর অনুরোধ করেন। তাহাতে সম্মত না হইয়া এই উত্তর করিলেন যে মহাশয়ের পিতার নিকট লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি, আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না।"[৩৮]

নবকৃষ্ণ বাহাদুরের রুচিজ্ঞান সম্বন্ধে বিবিধার্থ সংগ্রহের মত একটু পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, অন্য সূত্র থেকে আরও একটু দেওয়া গেল:

"কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কার্য্যে বিনোদনের উৎসাহী হন।"৩৯

। হেন পরিবেশে কলকাতার সংস্কৃতি-জগৎ যে পংকিলতায় আচ্ছন্ন হবে, এটা বিস্মিত হবার মত সংবাদ নয়। কবিওয়ালাদের সকলেরই জন্ম এইযুগে।

হরুঠাকুর —১১৪৬—১২২১ বঙ্গাব্দ।
নিধুবাবু —১১৪৮—১১৪৫ „
নিতাই বৈরাগী—১১৫৮—১২২৮ „
লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস—১১৫৮—১২২৬ „
রাম বসু—১১৯৩—১২৩৫ „

শুধু কবিসঙ্গীত নয়, বিদ্যাসুন্দর-প্রভাবিত আখ্যানমূলক কাব্য অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি সে যুগের বিকৃত রসচেতনার সাক্ষ্য বহন করছে।

"ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের আদর্শে যে কয়েকখানা কাব্য লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে "চন্দ্রকান্ত", কালীকৃষ্ণদাসের "কামিনীকুমার" ও রসিকচন্দ্র রায়ের "জীবনতারা" এই কাব্যত্রয় লোকরুচিব উপর বহুদিন দৌরাত্ম্য করিয়াছিল।"৪০

শুধু এই কাব্যত্রয় নয়, এক বিপুল কবিগোষ্ঠীরই জন্ম হয়েছিল এঁদের কেউ কেউ হয়ত পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করছেন, এইরূপ ভান করেছেন; আসলে তাঁরা ভারতচন্দ্রীয় ভাবধারাকে পুষ্ট করেছেন।

১। মদনমোহন তর্করত্ন—বাসবদত্তা—১৮৩৭
২। তারাচাঁদ দত্ত—মন্মথকাব্য—১৮৪৪
৩। মুন্সী এবাদত—কুরঙ্গভানু—১৮৪৫
৪। উমাচরণ ত্রিবেদী—মদনমাধুরী—১৮৫৬
৫। বনমালী ঘোষাল—পদ্মগন্ধ উপাখ্যান—১৮৬৪
৬। বিশ্বম্ভর দাস—রজনীকান্ত—১৮৭০
৭। গোবিন্দ শীল—হেমলতা-রতিকান্ত—১৮৭০

ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে মাইকেলের সচেতনতা লক্ষণীয়: "The Father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius."৪১ প্রতিভাহীন ব্যক্তিদের কবলে পড়ে বিদ্যাসুন্দরীয় রুচি-আরও কালিমালিপ্ত হোল।

যাত্রা ও 'সঙ'

যাত্রা এই যুগে তার চরিত্র স্থির রাখতে পারল না। প্রমোদলিপ্সু সমাজে কৃষ্ণলীলা থেকে ভক্তিবাদ বর্জিত হোল। মাথুর থাকলেও প্রেমবৈচিত্ত্যের আর কোন স্থান থাকল না।

"যাত্রার অধিকারী বয়স ৭৭ বৎসব, বাবরিকাটা চুল, কপালে উল্কী, কানে মাকড়ি। অধিকারী দূতী সেজে গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে আসরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচলেন, তারপর ব্যাসদেব ও মণি গোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত "কালো জল খাবো না।" "কালো মেঘ দেখবো না।" "কালো কাপড পরবো না।" ইত্যাদি কথাবার্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর" গানে লোকের মনোরঞ্জন করেন। থাল, গাডু, ঘডা, ছেঁডা কাপড, পুরান বনাত, পচা শালের গাদী হয়ে গেল।

আধুলি, সিকি ও পয়সা পর্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমাব নাম সুন্দব জেলে, ধবি মাছ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমারি গানেরও অভাব ছিল না। বেলা আটটার সময যাত্রা ভাঙ্গলো।[৪২] বলা বাহুল্য 'কেঁদেলি'র শিশুরাম এখানে ভিন্ন ব্যঞ্জনায় সাবালক হলেন। "শিশুরামের পব শ্রীদাস-সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রাব পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য হইয়াছে।"[৪৩] হুতোমের সাক্ষ্যে এই কৃতকার্যতাব স্বীকৃতি মাত্র নেই। যাত্রাব মধ্যে রঙ্গতামাশা আলাদা জাযগা করে নিয়েছে, দর্শকের মুখ চেয়ে সঙ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কলকাতা ত্যাগ করে সুদূর পূর্ববঙ্গে গিয়ে আত্মরক্ষায় সমর্থ হোল যাত্রার একটি অংশ।

সেই অর্ধশূন্য আসরেই শুরু হোল সখের যাত্রা। এতদিন চুঁচড়া, কৃষ্ণনগর, চন্দননগর, উলা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে নানা পূজাপার্বণ উপলক্ষে এক প্রকার সঙ বের হোত, সেই সঙ যাত্রার আসর দখল করে বসলো। বিদেশীরা এদেশে এসে কৃষ্ণযাত্রা দেখে আকৃষ্ট হননি, কিন্তু এই সঙ তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লেবেডেফ কেন 'সঙ্গবদল' অনুবাদ করেছিলেন, তার হেতু তাঁর হিন্দী ব্যাকরণের ভূমিকায় উল্লিখিত।

"আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম ভারতবর্ষীয়েরা সোজাসুজি গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধি ভাবনার—তাহা যতই শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হউক না কেন—তাহার অপেক্ষা

ভেঙচানি ও ভাড়ামি বেশি পছন্দ করে।" এই কারণে লেবেডেক নাটক রচনা করেছিলেন সঙসৃষ্টির মেজাজ নিয়েই।

এই সঙ দেখবার ও দেখাবার প্রবৃত্তি অতি আদিম লোক-প্রমোদকলা। এখনও আদিম জাতিগুলির মধ্যে এবং অনগ্রসর কৌম সমাজে সঙ-এর ব্যাপক প্রচলন আছে। কখনও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার জন্য, কখনও নিছকই ছদ্মবেশ বা বহুরূপীর বেশ ধরে সাধারণ মানুষকে আনন্দদান করার জন্য সঙ বের করা হত। সঙ-এর সঙ্গে নাচ ও গান সমানভাবে চলে। অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় ব্যাপক হাবে সঙ-এর প্রচলন ছিল, দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, দোল প্রভৃতি উৎসবে সঙ প্রদর্শিত হোত। পরে পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানেও সঙ বেব কবা হোত—গৃহ-প্রবেশ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ এমন কি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সঙ প্রদর্শন করা হোত।

আগে শুধু মাঝেমাঝে সঙ-এব জন্য আসর ছেড়ে দিত যাত্রা। অচিরেই যাত্রাকে বিদায় নিতে হোল, সঙ এসে আসব দখল কবে বসল। অর্থাৎ যাত্রাব মধ্য থেকে যখন গভীব গম্ভীব স্বর সম্পূর্ণ বিদায গ্রহণ করল, তখন সবটাই দাঁড়াল কৌতুক ও হাস্যরস সৃষ্টিব ব্যাপাব। প্রমোদকলায় 'প্রমোদ' শব্দটিই সর্বেশ্বর হয়ে পড়ল।

"এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইযাছে তাহাতে অনেক২ প্রকাব ছদ্মবেশধারী বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকাবী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সঙ হইয়া থাকে তাহাব বিববণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১সং কলিবাজা তৃতীয়তঃ সং রাজাব পাত্র চতুর্থ ১সং দেশান্তবীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২সং চট্টগ্রাম হইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্রে মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য-রহস্য সংবলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য২ প্রশ্নোত্তব ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুব বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞলোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।"[৪৩ক]

এই যাত্রাকে 'যাত্রা' বললে যাত্রার মর্যাদা নষ্ট করা হয়। যাত্রায় একটি কাহিনী থাকত, সেই কাহিনীর বিকাশ দেখান হোত, আর সমস্ত পালাটিতে বাজত

একটি গম্ভীর আধ্যাত্মিক সুর। গীতগোবিন্দ থেকে গোবিন্দ অধিকারী পর্যন্ত যাত্রার এই চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল। তার শিল্পগত মূল্যের তারতম্য ঘটেছে, কিন্তু প্রকৃতি বা স্বরূপের কোন রদবদল হয়নি। সখের যাত্রা যাত্রার মূল প্রকৃতি ধরে নাড়া দিয়েছে। সখের যাত্রা আসলে যাত্রা নিয়েই সৌখীনতা। উদ্ধৃত বিবরণে আমরা প্রথমতঃ দেখতে পাই, ঐ যাত্রার মধ্যে কোন ধারাবাহিক কাহিনী নেই, কাজেই তাকে একটি পালা বলা চলে না। নানা জাতের ছদ্মবেশী একত্রে মিলিত হয়ে কৌতুক রস পরিবেশন করছে, কোন গল্প গড়ে তুলছে না। এই ধরণের সখের 'যাত্রা'র জন্ম হয়েছে সব কিছু প্রাথমিক শর্ত অস্বীকার করে। কিন্তু এমন সখের যাত্রারও দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে এতটা কালাপাহাড়ী নীতি প্রথমে অবলম্বিত হয়নি।

"মহাভারত প্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর যে কথা আছে সে অতি সুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রস সম্পূর্ণ প্রসাদ অতএব শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবিরা স্বীয় শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করতে মহাকবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতী ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গে এক যাত্রা সৃষ্টি করিয়াছেন।" শ

"ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য ও গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন।"[৪৪] ঐ যাত্রার কথোপকথন ও সঙ্গীতের নমুনা সংবাদ প্রভাকরে কিছু উদ্ধৃত হয়েছে। নলদময়ন্তীর উপাখ্যান বিদ্যাসুন্দরের আবেদন আত্মস্থ করে এক নতুন রসের ভাণ্ডার খুলেছে।

"কলিকাতার নিজ দক্ষিণ ভবানীপুরস্থ ভদ্র সন্তানেরা যে এক 'নলদময়ন্তী' যাত্রার দল করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যে দলের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা হইয়া থাকে, রাম বসু সেই দলের সমুদয় গান ও ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই গীতে গায়কেরা সকলকেই পুলকিত করিয়াছিলেন। তাহার দুইটি গানের কিয়দংশ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

যথা।

কেন গো, সজনী আমার, উড়ু উড়ু
করে মন্।
পিঞ্জরের পাখি যেমন, পলাবারি
আকিঞ্চন॥

তথা।

নল্ নাম্ নল্। বলিস্ কি, বা বল্।
দাবানল, মনানল, প্রেমানল, কি অনল,
কি সেই, কুল মজানে কামানল্॥"

(সংবাদ প্রভাকর, ৮বাম বস্থ—১৮৫৪, ১৬ সেপ্টেম্বর)

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসব পবে কবিবব ঈ
উপহাব দিয়েছেন। অথচ তাব থেকে
পারি। মহাভারতীয় গল্পের স্বতোসিদ্ধ
নেই। উনিশ শতকের স্ফূর্তিবাজ সমাজে
অবশিষ্ট রাখেননি। এই যাত্রায় দুইটি অং
আমরা গোবিন্দ দাস অধিকাবীর পালা
ছিল ছড়া আর গীত। ছড়াগুলি সুব
রাগরাগিনী তাল সহ গীত হোত।
রাখাব চেষ্ট করা হলেও আসলে এগুলি
সমসাময়িক যুগের পত্রিকাসমূহ এগু
বিধিবহির্ভূত কাজ করেনি। যাত্রাব এ
বজায ছিল।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে একটি সংবাদ পাওয়া
তা থেকে জানা যায় যে, জগন্মোহন বসুর
যাত্রা হয়েছিল। সেই যাত্রাও আসলে বি

"বাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্র
পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত
এমতকালে একটা রাক্ষস তিনটা শ
উপনীত হইত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে
পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনু
সং অতি সুসজ্জিত হইয়া থাকে এবং
নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে
হায় হায় ধ্বনি করিয়াছিলেন।"

এদৃশ্য দেখে শুধু তাঁদের কেন, অ
ভবে ভিন্ন অর্থে।

পাশাপাশি যথার্থ সঙ-এর বাজার বেশ চড়া—চুঁচুড়ায় চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে দারুণ সঙ বের হচ্ছে।

আবার কবিগানের আসরে সঙ এনে হাজির করা হচ্ছে। নন্দকুমার সেট "যিনি হিন্দু থিয়েটার করিতে প্রাবর্তক হইয়াছেন" তিনি এই রকম এক সঙ উপস্থাপিত করেছিলেন—হাজি সাহেবের সঙ। সংবাদ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছিল। সখের যাত্রা কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনী পরিত্যাগ করে স্বতন্ত্র পথে চলল। মহাভারত বা অন্য কোন পৌরাণিক সূত্রে তার এই স্বেচ্ছাবিহার চূড়ান্ত হতে পারে না। খোঁজ পড়ল অন্য সূত্রের। কামরূপ যাত্রা প্রকাশ পেল; তর্জমা করলেন জগন্মোহন বাবু, শ্যামসুন্দর সরকারের গৃহে তার গাওনা হোল। সম্ভবত বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন রস-উপলব্ধিতে তার কোন সাড়া ছিল না। তখন বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ এল; ইতিপূর্বে অন্যবিষয়ক পালা অভিনয়ে শুধু তার সহায়তা নেওয়া হোত। লেবেডফ তাঁর 'সঙ-বদল' পালায় ভারতচন্দ্রের গীত (বিদ্যাসুন্দর থেকে) ব্যবহার করেছিলেন। এবার সোজাসুজি বিদ্যাসুন্দর এল, পর-নির্ভরতার পালা চুকিয়ে।

এই সময়ে ১৮২৬ সনে মণিপুর থেকে এক যাত্রা দল এল। মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা অভিনীত হোল, কিন্তু তখন ঐ প্রকার যাত্রা শ্রবণ ও তার রসগ্রহণ-উপযোগী মনোভাব বাঙ্গালী দর্শকের ছিল না। পদ্যে এক সমালোচনা বের হোল। সেই সমালোচনা থেকে কয়েকটি খবর জানা যাচ্ছে।

> ১। পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে,
> ২। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল,
> ৩। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চ স্বরা।
> শুনিলে সে মিষ্ট স্বর না যায় পাসরা।
> ৪। বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ।
> ৫। গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।[৪৫]

মোটামুটি এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে বুঝা যায় যে, এই যাত্রা আসামের 'অংকীয়া নাটে'র সমগোত্রীয় যাত্রা। কিন্তু জয়দেব-পদ-ভিত্তিক এই পালা নারী-অভিনেত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও জনসমাদর অর্জন করল না। মণিপুরীদের নাট্যানুষ্ঠান 'লম্ফঝম্ফ' রূপে প্রতীয়মান হোল। আসলে কলকাতার বাবুরা 'নামঘরে'র যাত্রা আর শুনতে চান না; তাঁরা তখন বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান

দিয়ে ফুরশি টানতে টানতে অর্ধ নিমীলিত লোচনে অন্য জাতের প্রমোদকলার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

তাই 'নন্দবিদায়' এর মত যাত্রাও নতুন ধরণের যাত্রা বলে অভিনন্দিত হচ্ছে। "যোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নন্দবিদায় নামক যে এক নূতন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যে স্বর ও গীত প্রস্তুত করেন তাহা শ্রবণ করিয়া সাধারণ গোচরার্থে আমি এই পত্র লিখিলাম।"[৪৬]

তখনও সুর এবং গীত যাত্রার উল্লিখিত বিষয়, সংলাপ নয়; অথচ তাই নতুন রীতি বলে বিদিত।

রামচাঁদবাবু হাফ-আখড়াই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; এই যাত্রার সঙ্গে হাফ-আখড়াই সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। "যে সকল ব্যক্তিরা সাজিয়াছিলেন তাহারদের বস্ত্রালঙ্কারাদি অতি উত্তম হইয়াছে, বেহালা তবলা এবং ঢোলক বাদকেরা অতিশয় গুণান্বিত এবং গীত সকলের মধ্যে প্রচুর কবিতাশক্তি প্রকাশ আছে, বোধ করি বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে মহাকবি নিধুবাবুর টপ্‌পার সমান অনেক হইবে, প্রায় তাবৎ গীত হাফ আখড়াইর খেয়াল কীর্তনের এবং এবং টপ্‌পার স্বরেতে গাহনা হইবাতে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্রাব্য হইয়াছিল, শ্রীযুত বাবু তিতুরাম বড়াল, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র (কি উপাধি জানি না) প্রভৃতি যাহারা নন্দ মন্ত্রী এবং উপানন্দ সাজিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যাঁহারা আসরে বসিয়াছিলেন তাঁহারা যে গান করিলেন বোধ করি এ প্রকার গান সচরাচর শুনা যায় নাই তাঁহাদের হাফ-আখড়াইর সুরে পয়ার কাটান বড় চমৎকৃত হইয়াছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিদাম নাম্নী এক বালিকার গানে তাবৎকে মোহিত এবং চমৎকৃত করিয়াছে, ছিদামের বয়স উর্দ্ধ ১৩ বৎসর।"[৪৬ক] এখানেও সেই গীত এবং সুরের প্রশংসা। সাজ-সজ্জার ব্যবহার বিজ্ঞাপিত হচ্ছে; সংলাপ যা ছিল, তা পরিষ্কার পয়ারের কাটান। অর্থাৎ হাফ-আখড়াই-এর রকমফের। এ যাত্রার নতুনত্ব নারী-অভিনেত্রী আমদানীর উপর নির্ভরশীল বলে অনুমিত হয়। কারণ, 'কলিরাজার যাত্রা' থেকে যে জাতীয় 'নতুনত্ব' চালু হয়েছে, 'নন্দবিদায়ে' এসে তার থেকে কোন অগ্রগতি চোখে পড়ছে না। তবু সংবাদ ভাস্কর লিখেছেন:

> "এতদ্দেশে যে সকল যাত্রা হইয়া থাকে এযাত্রা সেরূপ যাত্রা নহে, ইহা নূতন প্রকার।" (১৭ই এপ্রিল, ১৮৪৯)

ঐ কবিওয়ালাদের যুগে 'পয়ার-কাটান' নিশ্চয়ই খুব সাধুবাদ কুড়িয়েছিল। যাত্রা-সঙ্গীতকে অচিরেই কবি-সঙ্গীত প্রায় গ্রাস করে ফেলল, প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর।

নতুন যাত্রা ও বিদ্যাসুন্দর

কলকাতায় নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে, প্রমোদকলার ক্ষেত্রে রুচি পরিবর্তনের সামান্য ইতিহাস 'বঙ্গদর্শনে' বিবৃত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ধাপ থেকে কলকাতায় মহারাষ্ট্রীয় বাইজীদের আগমন ঘটতে থাকে। তাদের আগমনে খোলের পরিবর্তে তবলার প্রতিপত্তি হোল, নূপুরের বদলে এল ঘুঙুর। মনোহারশাহীকে বিদায় দিয়ে টপ্পার ভজনা শুরু হোল।[৪৭]

এই পটভূমিকায় বিদ্যাসুন্দর যাত্রা তার যোগ্যতা প্রমাণ করল। "নায়ক নায়িকাদিগেব প্রেমালাপ, বিভেদ, মিলন ইত্যাদিব অভিনয় কবিয়া শ্রোতা-দিগের চিত্তবঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য।"[৪৮]

কিন্তু বিদ্যাসুন্দব আরও একটু পৃথক্।

"বিদ্যাসুন্দরের মিলন পর্যন্ত অভিনীত হইয়া থাকে।···বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ অত্যন্ত অল্প। সুন্দরের আসিতে যেটুকু বিলম্ব হয়, সেইটুকুই বিদ্যার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা।"[৪৯]

এই হোল বিদ্যাসুন্দর পালার মুখ্য আবেদন।

এই অভিনয়ের রীতি কি?

"বিদ্যা আরও ঘুবিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে! রসিক শ্রোতাদের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল কেমন দুলিতেছে, বেশ্যা স্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন হৃদয়, ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে, ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিপদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়।

এক্ষণকার রুচির এই এক পরিচয়। শোকাকুলা নাচিয়া হাসিয়া চোক ঠারিয়া শোক করিতেছে, আর আমাদিগের চিত্ত আর্দ্র হইতেছে। শ্রোতাদিগের অন্য কেহ কেহ বলিতেছে, বড় আশ্চর্য যাত্রা হইতেছে। এমন যাত্রা না শুনিয়া অরসিক বৃদ্ধেরা কৃষ্ণবিষয়কীর্তন শুনিতে ইচ্ছা করেন কেন? কেহ বলিতেছেন যে, তাঁহারা ধর্মার্থে কালিয় দমন যাত্রা শুনিয়া থাকেন, সুখার্থে নহে। এরূপ শ্রোতাদিগের বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা।"[৫০]

লেখক কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে বিদ্যাসুন্দরের ভাববৃত্তের তুলনা হিসাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুন্দরকে সত্য সত্যই বেঁধে আনা হোল, কিন্তু তখনও বিন্দুমাত্র করুণ রস নেই। অথচ কৃষ্ণকে বাঁধবার কথা উঠতেই রাধা কেঁদে আকুল।

কৃষ্ণযাত্রা সম্বন্ধে লেখক বলছেন, "উহার প্রণেতৃগণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং শ্রোতৃগণ অপেক্ষাকৃত রসজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে উভয়েরই এক্ষণে অধঃপতন হইয়াছে। অধিক কি, পূর্বে যে যাত্রায় যে স্থলে দেবতা এবং দেবতুল্য ঋষি সাজাইত, এক্ষণে সেই স্থলে মেতর মেতরানী সাজিয়া শ্রোতাদিগের মনোরঞ্জন করা হয়।"

উক্ত লেখকের মতে আজ যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক, গভীর ভাবনার কোন স্থান নেই, প্রণয় তাই অগভীর। উপহাস, রহস্য ও রঙ্গরস প্রাধান্য পেয়েছে।

"এই যাত্রায় যদি রহস্যের ভাগ ত্যাগ করা যায়, তবে সুন্দরের বাক্‌রোধ হয়, মালিনীর ত কথাই নাই। এই যাত্রায় মালিনীই প্রধানা, তাহার রঙ্গরস লইয়াই যাত্রা।"

অপর একজন সমালোচকের প্রবন্ধে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এই নৃত্যের চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে।

"যখন সমগ্র বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন হইতেই বঙ্গবাসী খেমটা নাচের পক্ষপাতী হইতে থাকে, সুতরাং সেই সময়ে এরূপ নৃত্যের উপযোগী সুরোদ্ভাবনও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল॥

নৃত্যের ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কি মেথর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিদ্যা, সকলেই নৃত্য দ্বারা দর্শক মণ্ডলীর তৃপ্তি সাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসম্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই ক্লেশকর।"[৫১]

সঙ-এর বাকি থাকল কি?

উক্ত প্রবন্ধকারের মতে কালিয়দমন যাত্রার নৃত্য আর বিদ্যাসুন্দর যাত্রার নৃত্য এক নয়। রাধা দূতী খেমটা নাচেনি।

'শর্মিষ্ঠা' সমালোচনা প্রসঙ্গে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছেন, "বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সকলের প্রিয়।[৫২]

এখন কথা হচ্ছে এই বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রবর্তক কে?

এ বিষয়ে মোটামুটি স্বীকৃত তথ্য এই যে, বরাহনগরের রামজয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করেন, সে হোল ১৮২২ সালের কথা। কিন্তু তখনও এ পালা তত জনপ্রিয় হয়নি; পরে হাওড়া জেলায় ঠাকুরদাস দত্ত বিদ্যাসুন্দরের দল করেন। এ দলও তত খ্যাতি লাভ করেনি! আরও কয়েকজন বিদ্যাসুন্দর পালা যাত্রায় রূপান্তরিত করেন, কারও পালা তেমন জনপ্রিয় হোল না।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠলো গোপাল উড়িয়ার হাতে।

গোপাল উড়িয়া

বহুবাজারের রাধামোহন সরকার নামক এক ভদ্রলোক ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল খোলেন। এই দলে গোপাল যোগদান করেন। গোপাল ছিলেন জাতিতে করণ; বাড়ি যাজপুর, উড়িষ্যা। সামান্য ফেরিওয়ালা হিসাবে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮।১৯ বৎসর বয়সে। কি ভাবে তিনি রাধামোহন সরকারের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে 'বাঙ্গালীর গানে'র লেখক একটি কাহিনী বলেছেন।

> "একদিন মধ্যাহ্নের বৈঠক চলিতেছে, এমন সময় একজন ফেরিওয়ালা "চাঁপা কলা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার বৈঠকখানার বাবুদের কর্ণে আসিল। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন —"ওরে কে আছিস রে, 'গান্ধার' বলছে চাঁপা-কলাওয়ালাকে ধরে আন।' লোকজন গিয়া চাঁপা কলাওয়ালাকে ধরিয়া আনিল। এই চাঁপা কলাওয়ালা—গোপাল উড়ে।"[৫৩]

বাঙ্গালীর গানের লেখক আরও বলেছেন রাধামোহন সরকারের গৃহে গোপাল দশ টাকা মাহিনায় নিযুক্ত হলেন। বাড়ির ওস্তাদ হরি কিষণ মিশ্রের কাছে গোপাল গান শিখতে লাগলেন, এবং কিছু দিনের মধ্যেই টুংরি গানে দক্ষ হয়ে উঠলেন। গোপাল ছিলেন সুপুরুষ, তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট। তার ওপরে তিনি জানতেন নাচ। এখন এই নাচ কি বাংলাদেশের নাচ?

ওড়িষ্যার আর একটি নর্তক দল কলকাতায় রামলীলা যাত্রা অভিনয় করেছিল—সমাচার দর্পণ পত্রিকায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী সংখ্যায় এদের অভিনয়প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। অভিনেতাদের "উড়িয়া নৃত্যকর" বলা

হয়েছে। উড়িষ্যার যাত্রা এক জাতীয় নৃত্য-ভিত্তিক অভিনয়-অনুষ্ঠান, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর কাছাকাছি সময়ে গোপাল কলকাতায় আসেন এবং রাধামোহন সরকারের যাত্রা দলের সঙ্গে যুক্ত হন। গোপাল কি উড়িয়া যাত্রা-রীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না? তাঁর জীবনীকার এ বিষয়ে নির্বাক। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই অবহিত যে, গোপাল-প্রবর্তিত নৃত্য এক নতুন রীতির নৃত্য।

রাধামোহনের মৃত্যু হলে গোপাল নিজেই দল গঠন করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গোপালের মৃত্যু হয়। গোপালের দলের তিন জন অভিনেতার নাম আজও টিকে আছে—উমেশ ভোলানাথ ও কাশীনাথ ওরফে কেশে ধোবা। উমেশ ও ভোলানাথ বিদ্যা ও সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, আর কাশীনাথ অভিনয় করতেন মালিনীর ভূমিকা। মালিনীর ভূমিকায় স্বয়ং গোপাল প্রথমে অভিনয় করতেন। ভৈরব হালদার ছিলেন গোপালের গানের সুরকার। তিনি হুগলীর সিঙ্গুরের অধিবাসী। গোপাল যখন নিজে দল করলেন, তখন সম্ভবত নিজে আর অভিনয় করতেন না। তখন কেশে ধোবা মালিনী সাজত, কেশে ধোবা আগে থেকেই খেমটা নাচ শিখেছিল, 'বিশ্বকোষে'র মতে তার মত খেমটা নাচ তখন আর কেউ নাচতে পারত না।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গোপালের হাতে পড়েই নতুন আকার ধারণ করে।

"বিদ্যা আরও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকে। রসিক শ্রোতাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। বিদ্যার কঙ্কাল যেমন দুলিতেছে, বৈশ্যা স্বভাবানুকরণে সুপটু নট, কেমন নয়ন, হৃদয় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাচাইতেছে। ইহা দেখিয়া দুর্ভাগা সুন্দরের বিপদ শ্রোতারা একেবারে ভুলিয়া যায়।"[৫৪]

যেমন অভিনয়, দর্শকও তেমন।

"বাবুর চমকা ভেঙ্গে গেল; দেখলেন, কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে; অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন, "কোন বেটার সাধ্যি মালিনীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়," এই বলে সামনের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ তেগে ছুঁড়ে মাল্লেন।"[৫৫]

"শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ স্থানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হলো; কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে "কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও' বলে ক্ষেপে উঠলেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন

যে, 'ধর্ম-অবতার'! বিত্তাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই।" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝলেন না; কেষ্ট তাঁকে নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়, ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন।"[৫৬]

বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ প্রকাশনার দশ বৎসরের মধ্যে 'ভারতী'তে একজন উদ্বিগ্নমান কবি লিখলেন:

> "আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুলমোজা, কালাপেড়ে ধূতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাঁদর বাঁধিয়া পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে—এই ত চারিদিকের অবস্থা। এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্রচিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে?"[৫৭]

ইংরেজের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত বঙ্গীয় সামন্ততন্ত্রের এমনই অথর্ব অবস্থা সেদিন!

গোপাল উড়িয়ার বিত্তাসুন্দর যাত্রা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙ্গালীর বিকৃত রস-পিপাসার চূড়ান্ত দলিল। এই যাত্রার পালার একাধিক সংস্করণ পাওয়া গেছে।

শোনা যায় গোপাল উড়ের যাত্রার তিনটি সাট ছিল।[৫৮]

সেকালের সকল জনপ্রিয় কবিয়াল ও পাঁচালীকারই আসর বুঝে গান সাজাতেন। দাশরথী রায় প্রসঙ্গে এ-বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

আসরের দর্শক বা শ্রোতার চরিত্র বুঝে এই 'সাট' নির্ণীত হোত। নানা জনের গান নিয়ে এই পালা রচিত—আর সে যুগের সকল গানেই এক ধুয়া,—আদিরসের বিশেষ দিকটির সরব ঘোষণা।

"গোপাল রাধামোহনের বিত্তাসুন্দরের একেবারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান সংগ্রহ করিয়া গোপাল নূতন পালার সৃষ্টি করিল। শুনিতে পাই গোপাল উড়ের গান,—গোপালের দ্বারা একটিও রচিত নহে। কৈলাস বারুই, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এবং হুগলি জেলার সিঙ্গুর-গোপালনগর নিবাসী ভৈরব হালদার প্রভৃতির অনেক অনেক ভাল গান বিত্তাসুন্দরের টপ্পায়

সন্নিবেশিত হইয়াছে। যিনিই যে গান বাঁধুন না কেন, অস্তিত্ব আর কাহারও নাই, আছে কেবল গোপাল উড়ের।"৫৯

অস্তিত্ব অনেকেরই বিপন্ন হয়েছে। গোপাল উড়ের পালায় নিশ্চিত ভাবে কারা গান যুগিয়েছিলেন, সে খবব পাওয়া যায় না। বটতলার কল্যাণে আজ গোপাল উড়েব নামে অনেকগুলি পালা প্রচলিত আছে; তার মধ্যে কোন্‌টি গোপাল উড়ের পালা, তা বলা দুষ্কর। তবে অনুমান হয় শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত পালাটিই গোপালের পালা।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পালার সূচনায় আছে ভিস্তির দুইটি গান, একটি কালুয়ার গান, পাঁচটি মেথরানীব গান। তারপর জুডীর গান। জুডীর গান হোল পালাব নান্দীমুখ। সূত্রধার পূর্বে যে কাজ সম্পন্ন কবতেন, জুডী এখানে তাই করছে। যাত্রায় এই জুডীপ্রথা বদন অধিকারী প্রবর্তন কবেছিলেন। জুডী কি বলল ?

হায়! রসিক সুজন, নাবীব মনোরঞ্জন,
প্রিয়া সনে সঙ্গোপনে কবেন সুখ-আলাপন।
ছলে বলে কৌশলে, মালিনীরে ফাঁকি দিলে,
উভয়েব প্রেম অন্তঃশীলে, বহে ফল্গু নদী যেমন।
কি সুন্দব শুনিতে বিদ্যাসুন্দব-উপাখ্যান।
মাটিব ভিতর আনাগোনা আব কার সাধ্য, বল না,
বিনা দৈবেবই ঘটনা, না হয় ঘটন।
যেমন রতিপতি, তাব চেয়ে বিদ্যাপতি,
মাটির ভিতর একি বীতি উভয়ে গমনাগমন।
বৎসর পনর ষোল হইল বয়ঃক্রম।
ভেবে মরে রাজবাণী হইবে কেমন॥

তারপর রাজার উক্তি, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার খেদোক্তির মতই। বরের খোজে গঙ্গাভাট কাঞ্চীপুরে গিয়েছে, বাজাব উক্তিতে এসংবাদ জানা গেল। তখন সুন্দব আসরে প্রবেশ করল। তার প্রথম কথাই চাঁছাছোলা—

এতদিনের পরে বুঝি বিধি অনুকূল।
ফুটাইয়ে দিল মম বিবাহের ফুল॥

তারপর গড়গড়িয়ে চলল পালা। উপসংহারে ভরতবাক্যও আছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংস্করণ ছাড়া আরও কয়েকটি সংস্করণ আছে—এগুলি বটতলার সংস্করণ, তত ভদ্রভাবে প্রকাশিত হয়নি। বঙ্গবাসী সংস্করণ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন।

১. ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা (১ম খণ্ড) অঘোরচন্দ্র ঘোষ বিরচিত ও সঙ্কলিত, গোপাল উড়িয়ার সুর ও নানাবিধ চুটকী সুর সংবলিত এবং চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে (৩১৯ নং চিৎপুর রোড়। বটতলা) মাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও যদুনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। ১২৮২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪; গীত সংখ্যা ১১৭।

২. নূতন ছাঁকা বিদ্যাসুন্দর টপ্পা ৪র্থ-খণ্ড ১ম সংখ্যা। নন্দলাল রায় প্রণীত ও সঙ্কলিত গোপাল উড়িয়ার সুর সঙ্কলিত ও ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। ১১৭ নং চীৎপুর রোড, বটতলা। ১২৮২ বঙ্গাব্দ। পৃষ্ঠ সংখ্যা ৩৬, গীত সংখ্যা ১১৪।

৩. বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় টপ্পা—১-৫ খণ্ড। শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও (ভৈরবচন্দ্র গোপাল উড়িয়া কৈলাস বারুই প্রভৃতির গীত) সঙ্কলিত এবং বিদ্যারত্নযন্ত্রে (২৮৫নং আপার চীৎপুর রোড়। শোভাবাজার) অরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও পাণ্ডবচরণ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। ১২৮২. পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৬; গীত ৩৪০।

৪. বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়-নূতন সংস্করণ। গোপাল উড়িয়া কর্তৃক বিরচিত এবং মজুমদার লাইব্রেরী (মজুমদার প্রেস। ১০৬ নং আপার চীৎপুর রোড। বটতলা) হইতে মুটবিহারী মজুমদার দ্বারা সংগৃহীত মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩১৮।

মজুমদার লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত গীতাভিনয়খানি ব্যতীত আর সবগুলির গ্রন্থনা একই জাতীয়, গানের পর গান সাজানো। প্রথমে আছে ভিস্তি মেথরাণী কালুয়া ভেলুয়ার সঙ; পরে পালা। মজুমদার লাইব্রেরী প্রকাশিত গ্রন্থে কেবল গদ্য-সংলাপ আছে। কিন্তু আসলে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালায় কোন গদ্য-সংলাপ ছিল না। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ শীকদার এ সংবাদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন। তারাচরণ শীকদারের নাটক ১৭৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ গোপাল উড়িয়ার জীবিতকালে এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রবল প্রতিপত্তির যুগে।

"আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশের নাটকের ক্রিয়া সকল রচনায়

শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলববর্গ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।"৬০

তারাচরণ শীকদারের সাক্ষ্যের পর এবিষয়ে আর দ্বিতীয় কোন মত থাকতে পারে না।

শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক, তিনি গোপালের দলভুক্ত ছিলেন। তদুপরি তাঁর গ্রন্থ গোপালের মৃত্যুর পঁচিশ বৎসরে মধ্যে প্রকাশিত হয়। কাজেই সময়ের এমন বেশি ব্যবধান নেই, যার জন্য স্মৃতি প্রতারণা করতে পারে। তাঁর কাছে গোপালের পালার অনুলিপি থাকা খুবই স্বাভাবিক।

শ্যামলাল তাঁর সংগৃহীত পালায় ভৈরবচন্দ্র ও কৈলাস বারুই-এর পাশে গোপালেরও স্থান দিয়েছেন। তবে অনেকের মতে গোপাল উড়িয়ার বিদ্যাসুন্দর পালায় গোপালের এক পংক্তি রচনাও নেই। কারণ এই প্রকার 'স্মার্ট' স্বচ্ছন্দ মুখেব বুলি দু'-একদিনের অনুশীলনে অধিগত হওয়া সম্ভব নয়।

১. যাদু এমন কথা কেন বললি। ভোরের বেলায় সুখের স্বপন, এমন সময় জাগালি।

২. ছেঁড়া চুলে, বকুল ফুলে, খোঁপা বেঁধেছ।
প্রেম কি ঝালিয়ে তুলেছ।

৩. মদন আগুন, জলছে দ্বিগুণ, করলে কি গুণ, ঐ বিদেশী!

৪. তুমি যে পরেরি সোনা, আগেতে ছিল না জানা,
জানতেম যদি পরের সোনা, পরিতেম না কর্ণমূলে।

এই চলিত বাংলা কাজ-চালাবার ভাষা নয়, দোস্তর মত ভারতচন্দ্রীয়, বা বীরবলী ভাষার কাছাকাছি। এই অনায়াস ভাষা প্রভূত আয়াসসাপেক্ষ।

সহজ কথা লিখতে আমায় কহো যে!
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

গোপাল উড়িয়া ও রাম বসু

যাজপুরের গোপাল উড়িয়ার পক্ষে এ ভাষা আয়ত্ত করা সহজ নয়। সেকালের কবিসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সকলের পক্ষেও এই দক্ষতা অর্জন সম্ভব ছিল না। রাম বসু বা সমধর্মা কোন কবির পক্ষেই কেবল এটা সম্ভব ছিল।

কৈলাসচন্দ্র বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা দীনেশবাবু বলেছেন। রাম বসুর প্রসঙ্গ কেউ বলেননি। রাম বসুর সব গান অদ্যাবধি সংকলিত হয়নি। এমন কি, যে সব গান সংগৃহীত হয়েছে, তারও পূর্ণ বয়ান পাওয়া যায়নি। "আমরা পশ্চাদ্ভাগে উক্ত বসুর প্রণীত যে সকল গান প্রকাশ করিলাম যদিও তাহার কোন কোন গানের কোন কোন অংশের অভাব আছে, তথাচ পাঠকগণ তৎপাঠেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৬১]

এ খবর স্বীকৃত হয়েছে যে, রাম বসু মোহন সরকারের দলের পক্ষে গান লিখতেন, আরও অনেকের জন্য গান লিখেছেন।

এই সব গান গোপালের বিদ্যাসুন্দরের পালার মধ্যে ঢুকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দেই ঈশ্বরগুপ্ত রাম বসুর সব গানের তল্লাস পাননি। বিদ্যাসুন্দর টপ্পাতে এইগুলি আশ্রয় লাভ করলে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। রাম বসুর নিম্নোদ্ধৃত গানগুলি কি গোপাল উড়িয়ার টপ্পার প্রতিধ্বনি নয়?

১ তোরে ভালোবেসেছিলেন বোলে কিরে প্রেম আমার দুকূল মজালি।
দু মাস না যেতে, দারুণ বিচ্ছেদের হাতে, সঁপে দিয়ে আমায় ফেলে পলালি।

২ এমন ভাব রাখা ভাব কোথায় শিখিলে।
সে ভাব কোথাহে, যে ভাবে ভুলালে॥

৩ রমণী হোয়ে রমণীরে রতি মজালে।
তারো মৃতপতি, কেন বাঁচালে॥
বিরহিণীর দুঃখ ঘটালে।

৪ প্রাণ তুমি এ পথে আর এসো না।
শুধু দেখা, দিবে সখা, সেতো তা, মনেতে বুঝবে না।

৫ না বুঝে মজেছি প্রেমে, কপাল ক্রমে, একে হোলো আর।
আমি প্রাণ জুড়াতে গেলেম, শেষে প্রাণ বাঁচানো ভার॥[৬২]

গোপাল উড়িয়ার টপ্পার অনেকগুলি গানই একই রকম দাপটের সঙ্গে লেখা। তার ভাষা উনিশ শতকের স্ফূর্তিবাজ মজলিশী অতি-রসিক সমাজের বে-আব্রু ভাষা। একথা সত্য, সে-যুগে ব্যক্তিভেদে এই ভাষার বিশিষ্টতা খুব বেশি ফুটত না; তবু একমাত্র রাম বসুর লেখাতেই এমন একটা চতুর মসৃণতা দেখা যেত, যা অন্যত্র দুর্লভ। এই পালার অনেকগুলি গান রাম বসুর লিখিত হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ রাম বসু ভবানীপুরের দলের জন্য 'নলদময়ন্তী'র গান লিখে

দিয়েছিলেন। রাম বসুর মৃত্যুর পর গোপাল দল করেছিলেন। গোপালের পালা রাধামোহন সরকারের বা অন্য কারও গ্রন্থনা। এই প্রাপ্ত পালাটি প্রয়োজনমত গোপাল অদল-বদল করে নিতেন। আর রাধামোহনের কালে রাম বসু ছিলেন জীবিত এবং অতিশয় জনপ্রিয়।

গোপাল তাঁর পালার গানগুলিতে নিজে সুর সংযোগ করেছিলেন; নৃত্য-পরিকল্পনাও তাঁর। প্রথম জীবনে নিজেই নাচতেন, পরে তাঁর সাকরেদ কেশে ধোপা প্রভৃতি নাচতেন। নৃত্য-সংযোজনায় তিনি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এটা সম্ভবত ওড়িয়া-সংস্কৃতির বঙ্গীয়করণ।

বাংলাদেশের প্রচলিত যাত্রায় নাচগানের সঙ্গে পয়ারও ছিল। গোপাল পয়ার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। ওড়িষ্যায় নাটক অর্থে নাচ, বাংলা দেশে এই বিধান থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা চলছিল। গোপাল গান ও নাচকে একত্রে বেঁধে একটি পুরো Ballet তৈরি করলেন। একখানি ইংরিজি পত্রিকায় ঐ ধরনের নাট্য-প্রয়াসেব জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল।[৬৩]

বিদ্যাসুন্দর পালা বৈষ্ণব ভাব-পরিমণ্ডলের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। নায়ক ধীরললিতগুণ সম্পন্ন হলেই চলবে, মধুর রসই মুখ্যরস, —এই সব সিদ্ধান্ত মেনে চলা হয়েছে। কেবল নায়িকা পরকীয়া নন, তিনি অনূঢ়া। তবু এই পালা আদিরস-ভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিকতা-বর্জিত।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত ঝুমুর-সঙ্গীত ও কৃষ্ণযাত্রার গঠনরীতির সঙ্গে গোপালের নিজস্ব-ঠাট যুক্ত হয়ে এই বিচিত্র 'যাত্রা'র সৃষ্টি।

আঙ্গিক পুরাতন, শুধু স্পর্ধাটা নতুন। কলকাতার বিলাসী ধনীর দল এত দিন কৃষ্ণ ও রাধাকে সামনে রেখে, প্রমোদলোলুপতা চরিতার্থ করত, এবার লাস্যের সেই বাতাবরণ খারিজ হোল।

গীতাভিনয়

যাত্রা এবার পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় কলকাতায় বিদেশী রঙ্গমঞ্চের খোঁজ রাখতেন; সেখানে নাটক দেখতে যেতেন। স্কুল-কলেজে ছাত্রেরা নাটকের দৃশ্য বিশেষ অভিনয় করত। সৌখীন নাট্যমঞ্চে দেশীয় নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে যাত্রা কলকাতায় সাবেকী চালে আর আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হোল না। থিয়েটারের কাছ থেকে অনেক আধুনিক উপকরণ সে গ্রহণ করল; গ্রহণ করল নানা জাতের কাহিনীসমৃদ্ধ পালা; নানা রস সেখানে স্থান

গেল। তারপর নিল পোশাক-পরিচ্ছেদের চাকচিক্য ও বৈচিত্র্য ; নানা জাতের ইঙ্গ-বঙ্গ বাদ্যযন্ত্র। নতুন ঐকতান বাদন (Orchestra) দেখা দিল। আলো, সাজসজ্জা, অর্কেষ্ট্রা—সব মিলিয়ে কৃষ্ণযাত্রা ও বিদ্যাসুন্দরী যাত্রার গ্রাম্যতা ও নিরাভরনতা বহিষ্কৃত হয়ে গেল। এমন কি, বিদ্যাসুন্দরী নাচের পরিবর্তে নতুন থিয়েটারী নাচ দেখা দিল।

'গীতাভিনয়ে' থিয়েটারী নাটকের মত দৃশ্যঅন্তর আছে, কিন্তু অঙ্কবিভাগ নই। কৃত্রিম মঞ্চ ছিল না ; তাই-দৃশ্যপটের কোন ব্যবহার ছিল না। তবে আলোর ব্যবহার ছিল। গীতাভিনয়ের সঙ্গে থিয়েটারী নাটকের পার্থক্য প্রধানত গানের সংখ্যাধিক্যজনিত।

"প্রচলিত যাত্রাগুলির প্রতি যথার্থ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিদারুণ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। রঙ্গভূমি করিয়া নাটকের অভিনয় করা অধিক ব্যয়সাধ্য বিবেচনায় কলিকাতার কয়েকজন- শিক্ষিত যুবক সামান্যতঃ তৎপ্রণালীতে গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিযাছেন। ইহা দেশের পক্ষে শ্লাঘনীয় অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই।"৬৪

গীতাভিনয় থিয়েটারের নাটকের আদর্শ গ্রহণ করেছিল, এ সংবাদ এখানে পাওয়া গেল। কারণ "সামান্যতঃ তৎপ্রণালী"তে তাঁরা নাটক করছেন শুধু ব্যয়সংক্ষেপের জন্য। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শকুন্তলা গীতাভিনয়" প্রথম এই জাতীয় নাটক।

যাত্রার নিন্দায় গীতাভিনয়ের রচয়িতাও কম সরব ছিলেন না। 'শকুন্তলা গীতাভিনয়ে'র উৎসর্গ-পত্রে লিখিত হয়েছে :

> "অতুল্য প্রীতিকর নাট্যাভিনয় অভাবে যাত্রা নামক অপকৃষ্ট জঘন্য অভিনয় তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। * * বস্তুতঃ যদিচ এখানে ভদ্রসাধারণের যাত্রাদির প্রতি যথোচিত অনাদর জন্মিয়াছে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে অন্য কোন যোগ্য প্রতিনিধি প্রাপ্ত না হওয়াতে বিশুদ্ধ আমোদের উপয়াভাব ঘটিয়াছে। এ তাবৎ বিবেচনা করিয়া আমি যাত্রার প্রণালী সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; এবং প্রথমতঃ কবিকুলচূড়ামণি কালীদাস রচিত শকুন্তলা' নাটক গীতাভিনয়চ্ছলে পরিবর্তিত করিয়া কয়েকবার অভিনয় করিয়াছি।'

(উৎসর্গ-পত্র—শকুন্তলা গীতাভিনয়—অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
—১২৮৭ বঙ্গাব্দ)

গীতাভিনয় হোল গীত ও অভিনয়ের মিশ্রণ অভিনয় অর্থে এখানে সংলাপ উচ্চারণের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যাত্রায়, অন্তত বিদ্যাসুন্দরীয় যাত্রায় কোন সংলাপ ছিল না, সবই ছিল গীত। গীতের সঙ্গে সংলাপ যুক্ত হয়ে গীতাভিনয়ে এক নতুন শ্রেণীর নাটকের উৎপত্তি ঘটল।

এই গীতাভিনয় রচনার পিছনে বিদেশী থিয়েটারী নাটকের সাফল্য অনেকখানি কাজ করেছে। বাঙ্গালী দর্শক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার বিকল্প একটা নাট্যরস চাইছিল। সৌখীন নাট্যমঞ্চ সে দাবী মিটাবার চেষ্টা করছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তবান ও তাঁদের কয়েকজন সহযোগীরাই শুধু এই নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন বা দর্শক হিসাবে উপস্থিত হবার অধিকার লাভ করতেন। দ্বিতীয়তঃ এই গরীব শোষিত পরপদানত দেশে স্বাচ্ছন্দ্যের ভূমণ্ডল বড়ই সীমিত। থিয়েটারী নাটক অভিনয় করাতে হলে চাই অর্থপ্রাচুর্য ; তাই এদেশে থিয়েটারের প্রসারলাভ করার পথে বাধা আছে।

গীতাভিনয় পুরোপুরি থিয়েটারী নাটক নয়। তার স্বতন্ত্রতা গানের সংখ্যাধিক্যের মতই মঞ্চ-নির্দেশনাতেও বেশ প্রকট। অভিনয়-কালে কোন দৃশ্যপট লাগত না, শুধু খোলা আসর।

'শকুন্তলা গীতাভিনয়ে' কোন অঙ্কবিভাগ নেই, কোন দৃশ্যবিভাগ নেই, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু সবই আছে, ভিন্ন বেশে ॥

গীতাভিনয় শুরু হয়েছে বন্দনা দিয়ে—বেদোক্ত ঈশ্বরের স্তুতি করা হয়েছে। লেখক এই বন্দনাঅংশটি ব্যক্ত করেছেন একটি পদ্যের মধ্য দিয়ে; এই পদ্যাংশকে ধুয়া বলা হয়েছে। বন্দনাকালে হিন্দু দেবদেবী কালী, কৃষ্ণ, শিব বা চৈতন্য-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। সম্ভবত গ্রন্থকার পৌত্তলিক নন, ব্রাহ্ম ছিলেন।

এই ধুয়াটি আবৃত্তি করেছেন পারিপার্শ্বিক। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে পারিপার্শ্বিক আছে; চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে পারিপার্শ্বিকের উল্লেখ আছে। তারপর নট ও নটী প্রবেশ করল। নটীর মুখ থেকে জানা গেল—

শকুন্তলা যাত্রাচ্ছলে করিব প্রকাশ।
অধিনীর মনে আজি এই অভিলাষ ॥
সভ্যজন মুখে যদি অনুমতি পাই।
সপুলকে সবে মেলি সাজিবারে যাই ॥

নট-নটী প্রবেশ করলে আর একটি 'ধুয়া' বলবেন পারিপার্শ্বিক। পারিপার্শ্বিক গল্পের আখ্যানঅংশের খেই ধরিয়ে দেবেন। রাজার সঙ্গে শকুন্তলার দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, তার সঙ্গে বাকিটাও হয়েছে॥

উভয়ে উভয়ে চান, অমনি কুসুম বাণ,

একত্রে বিঁধিল দুই মন।

তারপর পারিপার্শ্বিক একটি গান গাইবেন। প্রতিটি গানের শীর্ষেই রাগরাগিণী ও তালের উল্লেখ আছে। এরপর অনসূয়া, প্রিয়ংবদা ও শকুন্তলা প্রবেশ করবেন। তাঁদের কথাবার্তায় রাজা ও শকুন্তলার মনোভাব অনেকটা আঁচ করা যাবে। এর মধ্যে কথার ফাঁকে ফাঁকে অনসূয়া তিনটি গান গাইবে, প্রিয়ংবদা দুইটি গান গাইবে, শকুন্তলা গান গাইবে পাঁচটি, রাজাও গান গাইবে। গান গাওয়া ছাড়াও রাজা আর একটি মারাত্মক কাজ করবেন। তিনি অনেকটা ব্রজের কানাইএর মত শকুন্তলার পা ধরতে যাবেন। সঙ্গীরা অবাক হবে।

তারপর শকুন্তলা আর রাজার মধ্যে পদ্যের লড়াই ও গান।

শকুন্তলা। প্রথমে কথা কৌশলে হাতে দেয় চাঁদ।

মিষ্টিমুখ পুরুষ কিবল (কেবল ?) নাবি মজাবার ফাঁদ॥

আগে বাড়াবাড়ি শেষে সঘনে পতন।

কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ॥

রাজারও পদ্যে উত্তর :

বাড়াবাড়ি না হল্যে কি বাঁধে লো প্রণয়।

এলো প্রেম, ছ্যাচা জল, কতক্ষণ রয়॥

আর একটা কথা বলি শুনলো সুন্দরি।

নারীর মন পাওয়া ভার তাই এত করি॥

এইভাবে অনেকক্ষণ ছড়া কাটাকাটি চলল; বিদ্যাসুন্দরী ঢংএর গানও চলল সমানভাবে।

এইভাবে চলার পর দৃশ্যান্তর হোল। কারণ পারিপার্শিক একটা ধুয়া বলছেন :

হল শুভ সম্মিলন।

মনসুখে তপোবনে বিহরে দুজন॥

এই দৃশ্যে রাজা, প্রিয়ংবদা, অনসূয়া ও শকুন্তলা পূর্বতনভাবে অনেক কথাবার্তা বলবেন। রাজা শকুন্তলাকে বিদায় জ্ঞাপনের পূর্বে একটি অঙ্গুরীয় দিয়ে গেলেন।

তৃতীয় ধুয়া থেকে জানা গেল যে রাজা চলে গেছেন; তাই শকুন্তলা বিষাদমগ্না।

শকুন্তলা রাজসভায় যখন প্রবেশ করছেন, তার পূর্বে কোন ধুয়া নেই। দৃশ্যবিভাগের জন্য এই একটি ক্ষেত্রে ধুয়া ব্যবহার করা হয়নি। শকুন্তলা কোন স্মারকচিহ্ন দেখাতে পারলেন না। ফলে রাজা তাঁকে চিনতে পারলেন না। পঞ্চম দৃশ্যে দেখতে পাই আর একটি ধুয়া।

হায় কি অদ্ভুত বিধির ঘটন।
মনোদুঃখে শকুন্তলা করেন গমন॥

এই দৃশ্যে আংটি পাওয়া যাবে। জেলেনীর গান আছে একটি; এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একেবারে বিদ্যাসুন্দরী ঠাটে গানটি লেখা:

কুলবতীর কুল রাখা যে ভার,
পোড়া লোকের জ্বালায়।
বলবো কি ঠাকুরপো আমার,
বার হওয়া হয়েছে দায়॥

ষষ্ঠ ধুয়ায় আর একটি দৃশ্যান্তর হোল। পারিপার্শ্বিকের কাছ থেকে জানা গেল যে অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তিতে রাজার স্মৃতিতে সমগ্র বিষয়টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

সকাতর নরপতি।
দিবারাত্র চিন্তানিমগন॥

এই দৃশ্যে রাজার সঙ্গে দানবদের লড়াই হবে। নাট্যকার দানবদের মুখে গান দিয়েছেন; এই গান লৌকিক ছন্দে লেখা:

ফলারের বড় ঘটা
ফলারের বড় ঘটা
কোথা হতে মানুষ বেটা
এসেছে ঐ হাতে ধনর্বাণ।
চলরে, চলরে ভাই ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত করি পান॥

সর্বশেষ ধুয়া থেকে নাটকের শেষ দৃশ্য অনুমান করা যায়। পারিপার্শ্বিক বলছে:

ঘোরতর যুদ্ধ করি
সবংশে রিপু সংহরি

স্থরপুর করিয়ে স্থস্থির।
মনের উল্লাসে শেষে, স্বরাজ্যে গমন আসে,
রথে উঠিলেন মহাবীর।

রাজা এখানেও গান গাইলেন। শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হবার পর সখেদে তিনি গাইলেন—

যেদিন প্রাণপ্রেয়সি তোমার হইল স্মরণ।
সেই হতে অন্তবে আমার জ্বলে বিচ্ছেদ হুতাশন॥

রাজার সঙ্গে শকুন্তলার মিলন হয়ে গেল। রাজা এবার শুধু প্রিয়া পেলেন না, সপুত্র পত্নী পেলেন, সবার শেষে নট এসে প্রবেশ করলেন, দর্শকের কাছে তাঁর নিবেদন -নাটকের দোষ-ত্রুটি তাঁরা যেন ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখেন।

অন্নদাপ্রসাদ গীতাভিনয় রচনাব সময় যাত্রা ও নাটক মিলাতে চেয়েছিলেন। তিনি যাত্রার আঙ্গিক আবিষ্কারের জন্য বিদ্যাসুন্দবের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেননি: সোজা তিনি ভক্তি-নাটকের অন্দরমহলে,—অন্তরমহলে দৃষ্টিপাত করেছেন। ভক্তিনাটকই বাংলার প্রচলিত নাটক। এখান থেকে তিনি পারিপার্শ্বিক চরিত্রটি বেছে নিয়েছেন। এরই বক্তৃতা থেকে দৃশ্যান্তর ঘটিয়েছেন। 'ধুয়া' শব্দটিও তিনি পাঁচালির ও তর্জার অর্থে মোটামুটি ব্যবহার করেছেন। এখানে 'ধুয়া' প্রসঙ্গান্তরে গমনেব উপায় হিসাবে দেখা দিয়েছে। পরবর্তী কালে নন্দলাল রায় তাঁর শকুন্তলা নাটকে 'পয়ার' শব্দটি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন। 'ধুয়া'র দ্বারা শুধু দৃশ্যান্তর বোঝাননি, সমগ্র ঘটনার ওপব একটা পর্যালোচনা রাখা হয়েছে। পরবর্তীকালে যাত্রার নাটকে এই কাজ 'বিবেকে'র দ্বারা প্রতিপালিত হবে। গান ও কথাকে অন্নদাপ্রসাদ প্রায় সমান মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং নাটকের আখ্যান-ভাগের অগ্রগতিতে গান ও কথার সম অবদান আছে।

শকুন্তলা গীতাভিনয়ে দুষ্মন্তের মুখে গান শুনে অনেকে বিস্মিত হতে পারেন। কালিদাস শকুন্তলা নাটকে রাজাব মুখে গান বসাননি, একথা সত্য। কিন্তু বিক্রমোর্বশী নাটকে চতুর্থ অংকে বিরহকাতর রাজা কয়েকটি গান গেয়েছেন। এবং তাও আবার প্রাকৃত ভাষায়। হতে পারে এইগানগুলি কালিদাসকে নাট্য-প্রযোজকের নির্দেশে এবং মঞ্চের প্রয়োজনে সন্নিবেশিত করতে হয়েছিল।

কালিদাসের নাটকে রাজার মুখে গান বেমানান, এ-বক্তব্য খারিজ হয়ে যাচ্ছে।

"We acknowledge in our last issue the receipt of Sakuntollah by Babu Unanda Prasad Banerjea. This is the first opera in Bangalli. It has been written in a simple and elegant style and the interest is wellsustained throughout. The songs are appropriate and exquisite. We had the pleasure of witnessing the performance more than once and we must say that it did credit to those who were engaged in it. We hope that the opera will supersede and degenerate Yatras."

লেখকের সর্বশেষ মন্তব্যটি মনে রাখবার মত। গীতাভিনয় যাত্রার চরিত্র পরিবর্তিত করে দিল। কলকাতার প্রমোদকলা হিসাবে যাত্রা আর পূর্ব রীতিতে মর্যাদা পেল না।

অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় শকুন্তলা গীতাভিনয় প্রকাশের পর কালিদাস সান্যালের 'নলদময়ন্তী গীতাভিনয়' প্রকাশ পেল।

সৌখীন থিয়েটারের মঞ্চ-সফল নাটক গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত হতে লাগল; রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' এবং মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' এই রূপান্তর থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। "দিন দিন ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইলে জগর্ত্তৃপ্তিকর সঙ্গীতবিদ্যার নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা।"৬৬ বহুবাজারে রাজেন্দ্র দত্তের গৃহে 'পদ্মাবতী গীতাভিনয়' অভিনয় কালে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৌলবী আবদুল লতীফ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এই গীতাভিনয়ই কলকাতায় যাত্রার অবসান ঘটিয়ে দিল। নতুন যুগ থিয়েটারী নাটকের যুগ।

গীতাভিনয়-রচনায় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অনুজ্ঞা অমান্য হয়েছে; সরাসরি যে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র অনুসরণ করা হয়েছে, তাও ত বলা যায় না। শুধু বৈষ্ণব ভাবনার চাপ দূরীভূত হোল, এইটিই বড়ো কথা। নাটক মুক্ত হোল ভক্তিবাদের খবরদারি থেকে, স্বরু হোল ধর্মীয় নিরপেক্ষতার যুগ। উনিশ শতকের নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে তা-ই কি ছিল না সঙ্গতিপূর্ণ?

এ চিত্র শহর কলকাতার চিত্র। মফঃস্বলে পুরাতন রীতির অনুবর্তন চলতে থাকবে; এবং সে-অনুবর্তন কলকাতার মত রুগ্ন মানসিকতায় নয়, এটাই লক্ষ্য করার।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার পালায় যে সুরটি ধ'রে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, অচিরকালের মধ্যেই তা স্তব্ধ হয়ে গেল। কলকাতা শহর তো নবদ্বীপধাম নয়, নয় ভক্তিরসের বিলসন-ভূমি। কলকাতা হোল আখড়াই, হাফ-আখড়াই বিদ্যাসুন্দরী যাত্রার প্রকৃষ্ট রঙ্গভূমি। তার সমাজ-জীবন ঐপ্রকার সাংস্কৃতিক অপচর্চার সঙ্গে কেবল সহযোগিতায় সক্ষম॥

যাত্রার শহুরে রূপান্তর ঘটল গীতাভিনয়ে। কিন্তু যাত্রার প্রাণশক্তি লোক-জীবনের সঙ্গে যুক্ত, তাই এই সংস্কৃতি-শাখা কখনও শুকিয়ে যেতে পারে না। লোক-জীবনের নানা পবিবতনেব সঙ্গে তারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তার মৃত্যু নেই।

যাত্রা ক্ষণকালের জন্য শহবে এসেছিল দেবমন্দির ত্যাগ করে, বারোয়ারীতলা ত্যাগ করে. আখড়ার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে, ধনীর প্রাসাদে এসে আসর জাঁকিয়ে ব'সেছিল। সেই ক্ষয়িষ্ণু লম্পট সামন্তপ্রভুদেব প্রভাবে তার সারা শরীরে বিকৃতিব স্ফোটক উদ্গত হয়েছিল। পরিবেশ-প্রভাবজনিত যে বিকৃতি, তাকেই সমালোচকেবা যাত্রার স্বভাবগত বিকৃতি বলে ভুল করছেন। গীতাভিনয়ের আবিভাবে শহুবে রস-পিপাসা চরিতার্থ করার দায় থেকে যাত্রা নিষ্কৃতি পেল। যাত্রা স্বস্থানে ফিবে গিয়েই প্রাণশক্তি ফিরে পেল। রাঢ়ের রুক্ষতায় বা পূর্ব-বাঙ্গলার সজলতায় যে তাব চরিত্রধাতু নবীন ব্যঞ্জনায় ধন্য হোল, তা বলা যায় না। শুধু বলা যায় যে, গ্রাম-বাংলাব সমাজ-জীবন তার পুরাতন রসবোধ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেনি। রাঢে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২) আর পূর্ববঙ্গে কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮) যাত্রাব পূর্বগৌবব ফিরিয়ে আনলেন। শহর-পরিক্রমারত গোবিন্দ অধিকারীর মত অবিরত সংকটের সঙ্গে তাঁদের মোকাবিলা করতে হোল না।

কৃষ্ণকমলের কর্মক্ষেত্রে ঢাকা, কিন্তু জন্ম নবদ্বীপের নিকটবর্তী ভাজনঘাটে। কৃষ্ণকমল নবদ্বীপে ছাত্রাবস্থায় 'নিমাইসন্ন্যাস' নামে একটি পালা রচনা করেন।

কিন্তু সত্য ঘটনা অপেক্ষা সত্যের বিলাস তাঁর কলমে ঝরেছে ভাল, 'reality' অপেক্ষা 'illusion'। বিবাহের পর ধনীশিষ্য রামকিশোরের অনুরোধে তিনি ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করলেন। শীতলক্ষ্যা- বুড়ি-গঙ্গার তীরেই তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফূরণ ঘটল। তিনি লিখলেন তাঁর অনন্য-

সাধারণ পালা 'স্বপ্নবিলাস'। 'স্বপ্নবিলাস' বিশ্লেষণ করলে তাঁর শিল্পকৌশল অনুধাবন করা যাবে।

'স্বপ্নবিলাস' শুরু হয়েছে গৌরচন্দ্রিকা দিয়ে। তারপর প্রস্তাবনা বিষকম্ভক।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ-খেদে যত ব্রজবাসী।
কৃষ্ণ-আগমন চিন্তা করে দিবানিশি॥
সর্বদা করয়ে সবে কৃষ্ণানুলোচন।
আসিবার পূর্বে হোল মঙ্গল-সূচন॥
নিশিযোগে যশোমতী ব্রজনিশাচরে।
স্বপনে দেখিয়ে কেঁদে বলেন ব্রজেশ্বরে॥

এইভাবে প্রস্তাবনা চলল।

তারপর নাটক আরম্ভ হোল। নাটকে অংকবিভাগ উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু দৃশ্যবিভাগ আছে। দৃশ্য একটি বেশি অন্তরিত হয়েছে, ঘন ঘন স্থান-পরিবর্তনে দৃশ্যপরিবর্তন ঘটেছে। ঘটনা যেখানে যেখানে ঘটেছে, সেখানেই একটি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। প্রথম দৃশ্য যেমন শ্রীনন্দালয়; দ্বিতীয় দৃশ্য শ্রীরাধা-নিকেতন। এইভাবে চন্দ্রাবলী-নিকেতন, কালিন্দী তীর, শ্রীনন্দালয়, শ্রীরাধা-নিকেতন, ব্রজপথ, শ্রীরাধা-নিকেতন; ব্রজপথ, শ্রীরাধা-নিকেতন, সঙ্কেত কানন---এই ১১টি দৃশ্যে পালা শেষ। এ ছাড়া একটি অমর্ত্য দৃশ্য আছে--স্বপ্ন-দৃশ্য ; সে হোল নবদ্বীপ-দৃশ্য। সঙ্কেত-কাননে শ্রীমতীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন হলে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়।

রাধিকা। ওহে বঁধূ! কও দেখি, সে নাগর কে, —
স্বপনে আজ দেখেছি যাকে?

কৃষ্ণ। প্রিয়ে, স্বপ্নে যে রূপ দেখেছ, সে আমারই রূপ।

রাধিকা প্রাণনাথ, স্বপ্নে দৃষ্ট তোমার সেই অপরূপ গৌররূপ দেখবার জন্য আমার মনে অতিশয় ইচ্ছা হয়েছে।

কৃষ্ণ। প্রিয়তমে! তুমি কি নিতান্তই সে রূপ দেখবে? তবে আমার এই বক্ষঃস্থ কৌস্তুবে দৃষ্টিপাত কর।

তখন রাধিকা কৌস্তুবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর গৌররূপ দর্শন ঘটল—নবদ্বীপ-দৃশ্য উদঘাটিত হোল। দেখা গেল নগরপথে সংকীর্ত্তন করছেন গৌরসহ গৌরপারিষদগণ। দৃশ্যটি অদৃশ্য হলে শ্রীমতী বংশীধারীকে বলেন—

আহা মরি মরি! নাথ! কি চমৎকার আজ আমাকে দেখালে!

পালার এখানে শেষ হোল। এইভাবে পালায় স্বপ্নে-সত্যে, কল্পনায়-বাস্তবে মাখামাখি হয়ে গেল। দ্যুলোক-ভূলোক এক হয়ে গেল—নবদ্বীপ আর ব্রজধাম! গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভাবনার এমন রসঘন রূপায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আর হয়নি।

'দিব্যোন্মাদ' ও 'বিচিত্রবিলাস' একই আঙ্গিকে রচিত। নাট্যকার ভিন্ন রঙের কালি ব্যবহার করেননি। সেই প্রেমবৈচিত্ত্যের মধুরতম আবীরে পালা দুইটি বিচিত্রিত। দুইটি পালা পড়লেই মনে হবে যেন দুইটি ভাব-গম্ভীর বৈষ্ণব পদ, যাব অন্তরপ্রকৃতির সঙ্গে চণ্ডীদাস বা জ্ঞানদাসের রয়েছে সুগভীর আত্মীয়তা।

এই দুইটি পালাতেও কোন অংকবিভাগ নেই। ঘটনাসংস্থানে দৃশ্যান্তর ঘটেছে।

লেখক কোন পালাকেই অংকে বিভক্ত করেননি; অথচ স্বপ্নবিলাস খুব ছোট পালা নয়, ১১টি দৃশ্যের সমষ্টি। আর 'দিব্যোন্মাদ' ও 'বিচিত্রবিলাসে' যদিও দৃশ্য-সংখ্যা তুলনায় কম, তাহলেও কোন কোন দৃশ্য বেশ বড়—যেমন 'দিব্যোন্মাদ' পালায় বনদৃশ্যটি ৩৬ পাতা জুড়ে আছে।

লেখক অংকবিভাগ করেননি, ঘটনা কোন স্থলে অপ্রত্যাশিতভাবে অগ্রসর হয়নি, সমগ্র পালার মধ্যে ঘটনার কোথাও কোন উত্থান-পতন নেই—সমান তরঙ্গে এগিয়ে গিয়ে শেষ দৃশ্যে স্বাভাবিকভাবে একটি তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। পালাকার গীতিকবির কলমে নাটক রচনা করেছেন। বহুসংখ্যক গান অবশ্যই তিনি প্রয়োগ কবেছেন; তবু এই কারণে এই উক্তি আমরা করছি না। পালার সমগ্র কাহিনী একটি মাত্র বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উৎকণ্ঠিত—সে হোল ব্রজেশ্বরী রাধিকা আর নদীয়ার গৌরচন্দ্র হলেন অভিন্ন। গৌরচন্দ্রিকায় যার আভাস থাকে, সারা নাটকে তাকে ফুটিয়ে তোলার আয়োজন। উপসংহারে এসে সেই আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনের' পৌষ সংখ্যায় সঞ্জীবচন্দ্র সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গের এই কবির পালার বিশিষ্টতার প্রতি রসজ্ঞের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। 'যাত্রা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেন, রঙ্গরস নয়—করুণরস পূর্ববঙ্গের যাত্রায় প্রবল।

দীনেশবাবু বলেছেন, "তিনি···বৈষ্ণব পুনরুত্থানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।"[৬৫] দীনেশবাবুর এই মূল্যায়নে কিছুটা আতিশয্য থাকতে পারে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ না

হন, কৃষ্ণকমল যে সত্যিকার কবি, এবিষয়ে মতান্তর নেই। দীনেশবাবু এই উক্তি অবশ্যই গ্রাহ্য :

> "কৃষ্ণকমলের রাধিকা চৈতন্যদেবের ছায়া, তাঁহার প্রেমের আবেগ নির্মল, নিষ্কাম ও আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ। রাধিকা এই প্রেমের আবেশে জড়জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণ-সত্তা অনুভব করিতেছেন, তাঁহার প্রেমবিলাপ প্রলাপের ন্যায় অসংবদ্ধ, মধুর ও আত্মবিহ্বলতার কারুণ্যে মাখা।"৬৬

ঢাকার সমাজজীবন দেশের বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। ঢাকায় তখনও 'অবিশ্বাসী'দের আবির্ভাব ঘটেনি ; ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলন ও 'সংস্কার'-আন্দোলন পররর্তীকালের ঘটনা। এই কারণে গোবিন্দ অধিকারী অপেক্ষাও কৃষ্ণকমলেব পালায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক প্রভাব অনেক বেশি অনুভূত হয়েছে। বৃন্দাবনলীলার বর্ণনা করতে গিয়ে ভোগবাসনা সেখানে প্রধান হয়নি, প্রেমবৈচিত্ত্য সেখানে প্রধান।

* * * * *

সঞ্জীবচন্দ্র বলেছিলেন, সুন্দর বিদ্যা মালিনী কোনোটাই গৃহস্থ সংসারের আদর্শ চরিত্র নয়। আমরা বলছি, কবিসঙ্গীতের রাধিকাও নয়। কৃষ্ণকমলের শ্রীরাধিকা গৃহস্থসংসারের বাস্তব চরিত্র হতে চায়নি, সে হয়েছে অপার্থিব চরিত্র। তবে গৃহস্থ চরিত্র না হলে সে-চরিত্র অপার্থিব হবে, এমন কথা নেই।

"আদিরস থাকিলেই যাত্রা দ্বারা কুশিক্ষা প্রদত্ত হয়, এমত নহে। কেবল বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় নায়কনায়িকা হইলেই সেরূপ শিক্ষা সম্ভব।"৬৭

বিদ্যার ন্যায় ডেসডিমোনাও আদিরসের নায়িকা।

"কিন্তু ডেসডিমোনার কার্যে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, চিন্তায় এত সরলতা, এত নির্মলতা, এত পবিত্রতা প্রকাশ আছে যে তাহা দেবদুলভ বলিয়া বোধ হয়।"৬৮

অগ্রজের এই ডেসডিমোনা-প্রশস্তি অনুজের রচনায় স্ফুটতর হবে।

যাত্রার অধিকারিগণ এই যুগোচিত সমালোচনার মর্মগ্রহণে অক্ষম ছিলেন। তাই অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে যাত্রার একাংশ গীতাভিনয়ে পরিবর্তিত হোল।

আত্মরক্ষার তাগিদে যাত্রার অপরাংশ গ্রামে ফিরে গেল। যতদিন এ দেশে মধ্যযুগীয় শ্রেণীবিন্যাস অটুট থাকবে, শাস্ত্র-পাঁজি-পুঁথি ও গুরুবাক্য শিরোধার্য হবে, ততদিন ভক্তিবাদী যাত্রার জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে না। সে-যাত্রা নতুন

যুগের নাট্য-পিপাসার সঙ্গে আড়াআড়ি করে চলবে। পরশাসনহেতু বাংলা-দেশের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত; য়ুরোপের মত এখানে আধুনিক যুগের উদ্ভব ও বিকাশ দ্রুত বা স্বচ্ছন্দ হয়নি। এখানে মৃত ভাব আগলে নিয়ে বসে আছে স্থবির সামন্ততান্ত্রিক সমাজ।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান; আর গীতকার হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গানখানি সাধারণ অর্থে জাতির জাগরণীসঙ্গীত, কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে বাংলা নাটকের প্রস্তাবনা :

উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর.
হইল হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।[৬৯]

দিনকরদীপ্তি সদর্পে এসে পৌঁছাচ্ছে। কারণ নতুন জাতের বাংলা নাটকের আবির্ভাব আসন্ন। কুসুমদামসজ্জিত উজ্জ্বলিত নাট্যশালা তৈরি; রবাব-বীণা-মুরজ-মুরলী ঐকতানসঙ্গীত সৃষ্টির জন্য উন্মুখ।

আর দর্শক? দর্শকও উঠে এসেছে—স্কুল-কলেজ থেকে, সওদাগরী অফিস থেকে, সরকারী দপ্তর আরও নানা কর্মকেন্দ্র থেকে।

আয়োজন যেমন প্রতুল, প্রত্যাশাও তেমনি গভীর।

পাদটীকা

১. Ankia Nat—Edited by Dr. B. K. Barua. P. 10.

২. The Early History of Vaisnava Faith and Movement—S. K. De. Firma K. L. Mukherjee—Calcutta—P. 450.

৩. ঐ —P. 448.

৪. ঐ —P. 439. k

৫. Aristotle's Poetics—Butcher. P. 24.

৬. Bengali Literature in the Nineteenth Century—S. K. De; 1962. P. 402.

৭. ঐ, P. 403.

৭ক. Consideration on the Indian Affairs (1768-1771)—Bolt—Preface P. VII.

৭খ. Voyages to the East Indies—Stavorinus—Vol I. P. 414.

৭গ. History of Bengali Language and Literature—D. C. Sen. Calcutta. P. 615.

৭ঘ. সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ১৫৮।

৮. বঙ্গ সাহিত্যে দ্বিতীয় যুগ—ধর্মানন্দ অধিকারী—প্রবাসী, ১ম ভাগ, ৫ম সংখ্যা।

৯. ঐ।

১০. করুণানিধান বিলাস—পৃঃ ৩৪০—৩৪১।

১১. বিবিধার্থ সংগ্রহ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র— ১৮৫৮ শকাব্দ, মাঘ।

১২. The Bengali Drama—P. Guha Thakurta. P. 14.

১৩. সাহিত্যের কথা—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পৃঃ—২১৯।

১৪. সংবাদ প্রভাকর, ১লা শ্রাবণ, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

১৫. সমাচার দর্পণ, ২১শে অক্টোবর, ১৮২০।

১৬. বিশ্বকোষ—১৫ খণ্ড।

১৭. গীতরত্ন-ভূমিকা—তৃতীয় সংস্করণ।

১৮. লোক-সাহিত্য—কবিসঙ্গীত—রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ৭৯।

১৯. সমাচার দর্পণ—১৮৫২।

২০. রামমোহন গ্রন্থাবলী—পরিষৎ সংস্করণ। চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃঃ ১৫।

২১. বঙ্গসাহিত্যে দ্বিতীয় যুগ—ধর্মানন্দ অধিকারী। প্রবাসী, ১ম ভাগ. ৫ সংখ্যা।

২২. বঙ্গভাষার লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ৫৮০।

২৩. বাঙ্গালীর গান—ঐ, পৃঃ ৩২১।

২৪. মানভঞ্জন যাত্রা—গোবিন্দদাস অধিকারী, বিজ্ঞাপন। কৃষ্ণযাত্রা—গোবিন্দদাস অধিকারী (পাঁচ খণ্ড)—পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত।

২৫. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩৩৬। রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

২৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড - সুকুমার সেন. পৃঃ ৯৫৯।

২৭. Bengali Literature in the Nineteenth Century—S. K. De. P. 410—411.

২৮. যাত্রার ইতিবৃত্ত, বঙ্গদর্শন—১২৮৯, ফাল্গুন।

২৯. ঐ

৩০. ঐ

৩১. হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—বসুমতী সংস্করণ—পৃঃ ১১৪।

৩২. ঐ—পৃঃ ২৮।

৩৩. Marx on India.

৩৪. রামমোহন গ্রন্থাবলী—চারি প্রশ্নের উত্তর পৃঃ ১৫।

৩৫. হুতোম—পৃঃ ৩৪।

৩৬. অরুণোদয়, ১৮৫৭—১৫ সেপ্টেম্বর, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

৩৭. সংবাদ প্রভাকর—১লা পৌষ, ১২৬১।

৩৭ক. বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাঘ, ১৭৮০ শকাব্দ।

৩৮. সংবাদ প্রভাকর, ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ।

৩৯. ঐ।

৪০. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য – দীনেশচন্দ্র সেন। ৭ম সংস্করণ ; পৃঃ ৫২।

৪১. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত চিঠি—জীবনচরিত—পৃঃ ৩২৭।

৪২. হুতোম—পৃঃ ৩৫।

৪৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ– মাঘ, ১৭৮০ শকাব্দ।

৪৩ক. সমাচার দর্পণ,- -১৬ জুন, ১৮২২।

৪৩খ. ঐ, ১৮২২, ৪ মে।

৪৪. ঐ ১৮২২, ১৪ জুলাই।

৪৫. সমাচার দর্পণ—১৯ আগস্ট, ১৮২৬।

৪৬. সম্বাদ ভাস্কর ৩০ মার্চ; ১৮৪৯।

৪৬ক. ঐ।

৪৭. যাত্রার ইতিবৃত্ত-বঙ্গদর্শন—১২০৯, ফাল্গুন।

৪৮. যাত্রা সমালোচনা-বঙ্গদর্শন—১২৭৯ ; বৈশাখ।

৪৯. ঐ।

৫০. ঐ।

৫১. বিশ্বকোষ, ১৫ খণ্ড।

৫২. বিবিধার্থ সংগ্রহ ৫৮ খণ্ড।

৫৩. বাঙ্গালীর গান পৃঃ ৩৬০।

৫৪. যাত্রা সমালোচনা—বঙ্গদর্শণ।

৫৫. হুতোম—পৃঃ ৩৬

৫৬. ঐ, পৃঃ।

৫৭. বাঙ্গালী কবি নয় কেন—ভারতী, ১২৮৭, আশ্বিন।

৫৮. রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র—ডঃ মদনমোহন গোস্বামী। পৃঃ ৩০৪

৫৯. গোপাল উড়ের টপ্পা--হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বঙ্গবাসী, ১৩৬৭। ভূমিকা পৃঃ ২।

৬০. ভদ্রার্জুন—তারাচরণ শীকদার। ১৭৭৪ শকাব্দ। ভূমিকা।

৬১. কবিজীবনী—ঈশ্বর গুপ্ত। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত।

৬২. ঐ।

৬৩. Hindu Patriot—May 22, 1865.

৬৪. সংবাদ প্রভাকর—পূর্ব কথিত।

৬৫. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন। পৃঃ ৫৫৩।

৬৬. ঐ, পৃঃ ৩৫৬।

৬৭. যাত্রা--বঙ্গদর্শন। চৈত্র, ১২৭৯।

৬৮. ঐ।

৬৯. মধুসূদন গ্রন্থাবলী- শর্মিষ্ঠার ভূমিকা। (পরিষৎ সংস্করণ)।

বিলাতী নাট্যমঞ্চ ও দেশীয় নাট্যানুরাগ

ইংরেজ কোথাও বসতি স্থাপন করলে তিনটি ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করত— গির্জা, রঙ্গালয় ও রেসকোর্স স্থাপন। কলকাতায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় পলাশী যুদ্ধেরও পূর্বে, কিন্তু সেদিন সে-নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য কোন বাঙ্গালী দর্শক উপস্থিত থাকত না। তখনও ইংরেজিজানা ভারতীয়ের উদ্ভব হয়নি। কলকাতার নাট্যশালার ১৭৫৩-১৮১৩—এই ষাট বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালী দর্শকের সংযোগশূন্য।

১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে 'The Play House'-এর উদ্বোধন হয়, প্রখ্যাত বৃটিশ নট ডেভিড গ্যারিক নাকি এই উদ্যোগে সহায়তা করেছিলেন, এমন একটা জনশ্রুতি আছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের এই 'Play-House'-টিকে গির্জায় পরিণত করার জন্য চাপ দেওয়া হতে থাকে, কারণ তখন পর্যন্ত "There is a noble play house, but no church".[১]

এই 'play-house' কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলাম ঘরে রূপান্তরিত হোল, বণিকের মানদণ্ডে এই ত ন্যায়দণ্ড! পরে অবশ্য শেয়ার বিক্রী করে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা থিয়েটারের পত্তন হোল। লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হোল।

এই মঞ্চ স্থাপনেও নটশ্রেষ্ঠ গ্যারিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি মঞ্চের দৃশ্যপট আঁকার জন্য এক দক্ষ চিত্রকর পাঠালেন। বিলেত থেকেও জাহাজ বোঝাই হয়ে বহু দৃশ্যপট এল। প্রেক্ষাগৃহের আসনব্যবস্থা, আলোক-সম্পাত ব্যবস্থা—সবই আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আয়োজিত হোল। "It is very neatly filled up, and the scene and decorations are quite equal to what could be expected."[২] পেশাদার শিল্পীর পাশাপাশি এ্যামেচার শিল্পীরাও মঞ্চাবতরণ করলেন। সে-যুগে পুরুষঅভিনেতারাই সব ভূমিকায় অভিনয় করতেন। কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা তখন নারীঅভিনেত্রীর মঞ্চাবতরণে অণুমাত্র উৎসাহ দিতেন না। দৃশ্যপটের সঙ্গে বিলেত থেকে অভিনেত্রী আমদানীর যে পরিকল্পনা ছিল, এইকারণে তা স্থগিত থাকল। নাটক সে-যুগে

অভিনীত হোত নানা জাতের ; সমাদর পেত কমেডি ও প্রহসন জাতীয় নাটক। অন্য কিছু নয়,এর জন্য দায়ী সমসাময়িক নাট্যরুচি। এ ছাড়া ট্রাজেডি-অভিনয়ে সক্ষম অভিনেতার অভাবও এর জন্য দায়ী। তবু হ্যামলেট, মার্চেন্ট অব ভিনিস, ম্যাকবেথ সে-যুগে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সে-যুগে আসর জাঁকিয়ে ছিলেন শেরিডান, কংগ্রীব, জর্জ ফারকুয়ার, বেন জনসন, ফ্রান্সিস বোমন্ট, জন ফ্লেচার, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, জনফোর্ড, নিকোলাস রো, হেনরি ফিল্ডিং। এঁদের লেখা প্রহসনজাতীয় নাটক অভিনীত হোত বেশি। ভারতীয়দের নাট্যরুচি সম্বন্ধে রুশ নাট্যামোদী লেবেডেফ বলেছিলেন, "Having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed ....."৩।

১৭৯৫ সালের কথা!

তখনকার নৈকষ্যকুলীন ইংরেজদের রসবোধও এর থেকে উন্নত ছিল না। "The theatrical talents must have been at a very low ebb indeed"

তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ-এর ছবি দেখাতে হোত, দেখাতে হোত নৌকা-বাইচ। "The farces and other plays announced from time to time in the Calcutta Gazette are of the most mediocre description, and one learns without surprise that the theatre soon fell into debts."৪

মিসেস বিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার, হুইলার প্লেস থিয়েটার—একই রকম নাট্যাভিনয়ে নিয়োজিত ছিল। যেদিন ব্যারাকপুরে ঘোড়দৌড় হোত, সেদিন থিয়েটারে দর্শকের অভাব ঘটত। তখনকার দিনে ভালো অভিনেতা মিলত না বলেই হয়ত প্রহসনের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়েছিল। একবার এ্যাথেনিয়াম রঙ্গমঞ্চে 'ডগলাস' অভিনীত হয়। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, অভিনয়ের 'গুণে' ট্রাজেডি কমেডিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

চৌরঙ্গী থিয়েটার

কলকাতার অভিনয়জগতে নতুন যুগের প্রকৃত সূচনা হোল চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে। এই মঞ্চের উদ্যোক্তাদের মধ্যে শিক্ষিত রুচিশীল ইংরেজ ভদ্রলোকসহ আধুনিকমনা কতিপয় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার স্থাপনার পূর্বে দেশীয়রা ইংরেজদের রঙ্গশালায় প্রবেশ করতেন না, তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ঐসব রঙ্গশালা প্রধানত সৈনিকদের প্রমোদ-

গৃহ ছিল। যেখানে যেখানে ক্যান্টনমেন্ট বা সেনানিবাস ছিল, সেখানেই ছিল রঙ্গমঞ্চ। মীরাট, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বহরমপুর, দমদম, দানাপুর—সর্বত্রই রঙ্গমঞ্চ ছিল। তবে এগুলি নিয়মিত ও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ হিসাবে কতটা কাজ করত, সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। ইংরেজ সৈনিক, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী—এঁরাই ছিলেন রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষক। চৌরঙ্গী থিয়েটারের উদ্ভবে এই দর্শক-নিয়ন্ত্রণনীতির বিলোপ সাধিত হোল। দর্শনী দিলে সকলেরই প্রবেশাধিকার থাকবে, এই হোল সাধারণ পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নীতি। কলকাতার আদি যুগের ইংরেজ নাট্য-শালায় এই নীতি পদদলিত হয়েছিল। বর্ণ-বিদ্বেষ তার কারণ।

চৌরঙ্গী নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন উদারনীতিক ইংরেজ।

হোরেস হেইমান উইলসন ছিলেন হিন্দু-কলেজের পরিদর্শক, বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতৈষী। ইনি নিজেও নাট্যামোদী, প্রখ্যাত অভিনেত্রী সিডান্স-এর পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। আর একজন হলেন হেনরি মেরেডিথ পার্কার; তিনি ছিলেন প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী। ইনি নিজেও ছিলেন এক খ্যাতনাম্নী নর্তকীর পুত্র। তাছাড়া যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ স্বয়ং। পরবর্তীকালে খ্যাতনামা ক্যাপটেন ডেভিড লিস্টার রিচার্ডসন এই নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সামরিক কাজের অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় কলকাতাকে তিনি তাঁর কর্মস্থল মনোনীত করেন। তখন থেকেই তিনি চৌরঙ্গী মঞ্চের অভিনেতাদের একজন উপদেষ্টা হয়ে দাঁড়ান।

১৮১৩ সালের ২৫শে নবেম্বর চৌরঙ্গী থিয়েটারের যবনিকা উত্তোলিত হয়। বিলেত থেকে কয়েকজন নামকরা অভিনেত্রী এসে পৌঁছালেন। দৃশ্যপটের ওপর বেশ নজর দেওয়া হোল—একটি বিজ্ঞপ্তি থেকেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে—"A drop scene has been presented to the establishment by the kindness of Mr. Home, and it was hoped that it might have been exhibited on Friday night. Unfortunately, it is not quite dry enough, so that its appearance necessarily postponed till the next night of performance."[৫]

এই রঙ্গমঞ্চের পোশাকপরিচ্ছেদ তৈরি করতেন বিখ্যাত পোশাকপরিচ্ছদ নির্মাতা র‍্যাঙ্কিন এণ্ড কোম্পানী (Ranken & Co.)। দৃশ্যপট, পোশাক

পরিচ্ছদের পারিপাট্যের সঙ্গেসঙ্গে আলোকেরও সুবন্দোবস্ত ছিল। গ্যাসের আলোর প্রচলনে বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আলোক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হোত।

এই মঞ্চে সেক্সপীয়ারের একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল; কিন্তু আসর জাঁকিয়ে বসত নানা কমেডি ও প্রহসন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একটি অভিনয় দেখে জনৈক দর্শক লিখেছেন :

"It was, in a word, a splendidly executed picture, and every feature and hue of which was in the most excellent taste and keeping. Falstaff, we need scarcely say, was done in a style of the most matchless kind. We have seen some one or two stars at home attempt the character, but we never beheld Shakespeare's Falstaff—until we saw him embodied as in Friday night."[৬]

অভিনয়টি সেক্সপীয়ারের 'হেনরি দি ফোর্থ'। অভিনয় যে সবসময়ে ভালো হোত, তা নয়। তবে রঙ্গমঞ্চ সুসংগঠিত। সে-যুগ ছিল হৈ-হুল্লোড়ের যুগ। সুস্থ রসবোধ তখনও অধিকাংশ দর্শকের মজ্জাগত হয়নি। ঐ পত্রিকা থেকে আর একটি মূল্যায়ন উদ্ধৃত করা গেল :

> "The Theatre, an elegant building, is much better attended. The performers are indifferent—only to see and to be seen ; to talk loud, laugh and swear about the pleasure and politics of the day.
>
> Nothing can be heard that is said upon the stage ; all is dumb-show and pantomime"[৭]

ঐ পত্রিকা তখনকার কলকাতার বিদেশীদের সমাজজীবনের ছোট্ট একটি বিবরণও দিয়েছে :

> "Intoxication meets encouragements in numerous taverns, the cheapness of delicious wines and cordials and the seductive places they are served up—where women of all colours are dressed up for the worst of purposes"[৮]

এইভাবে চলতে-চলতে চৌরঙ্গী থিয়েটার একদিন নীলামে উঠল; সে-নীলাম দ্বারকানাথই ডেকে নিলেন। সে হোল ১৮২৭ সালের কথা। নতুন করে চৌরঙ্গী থিয়েটারের পাদপ্রদীপে আলো আবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে আলো

অতিশয় জলল চিরতরে শীঘ্রি নিভে যাবে ব'লে। বারো বৎসর পরে ১৮৩৯ সালের ৩১শে মে আগুন লাগল চৌরঙ্গী থিয়েটারে। ভস্মীভূত হয়ে গেল সেই সৌখীন প্রমোদশালা। চৌরঙ্গী থিয়েটারের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কলকাতার বিদেশী রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণময় যুগের অবসান হোল।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের ইতিবৃত্তে পেশাদারী অভিনয়ের একটা বিশেষ পর্বের সাক্ষাৎ মিলছে। ইতিপূর্বে অভিনয়ে পুরুষভূমিকার অভিনেতারা অধিকাংশই ছিলেন এ্যামেচার; অভিনেত্রীরা ছিলেন পেশাদার। তাই অভিনেতারা কেউ দীর্ঘ-কাল মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না। শুধু অভিনেত্রীরাই অভিনয়কলাকে পেশা হিসাবে যথার্থভাবে গ্রহণ করতেন, ফলে তাঁদের অভিনেত্রীজীবনের আচমকা যবনিকাপাত ঘটত না। সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হলেন মিসেস ইস্থার লীচ; ১৮২৬ সন থেকে ১৮৩৮ সন পর্যন্ত চৌরঙ্গী থিয়েটারের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

> 'She has been sixteen years connected with the stage. She began her career at Dum Dum, when the Old Theatre, now dilapidated, was in existence and since that time she has gone through a vast range of characters, tragic, comic, melodramatic and operatic."[৯]

১২ই এপ্রিল তারিখে এক 'সম্মান-রজনী'তে মিসেস লীচ বলেছিলেন,

> In you I've found, through many a happy years;
> The fostering guardians of my stage career.[১০]

সত্যই তিনি দর্শকের প্রীতি অজস্র পেয়েছিলেন।

সাঁ-সুচি নাট্যশালা ও দেশীয় সহযোগিতা

মিসেস লীচের উদ্যোগেই সাঁ-সুচি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হোল। এই নতুন থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় প্রথমে যাঁর নাম চোখে পড়ে, তিনি হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। উনি এক হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ এই রঙ্গমঞ্চের প্রথম অভিনয় সংসাধিত হোল। বিলেত থেকে একজন নাম-করা অভিনেত্রী এলেন—তিনি হলেন মিসেস ডীক্‌ল। মঞ্চ সুন্দরভাবে সংগঠিত হোল; দৃশ্যপট প্রশংসনীয়ভাবে তৈরি হোল। এমন কি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মঞ্চ বলে প্রেক্ষাগৃহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্যও চেষ্টা করা হোল।

এতৎসত্ত্বেও ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর এই নাট্যশালার জীবনে দারুণতম বিপর্যয় নেমে এল। ঐ রাত্রে অভিনয়কালে মিসেস লীচের বস্ত্রপ্রান্তে আগুন ধরে যায় আকস্মিকভাবে; তিনি দারুণভাবে দগ্ধ হলেন। ১৮ই নবেম্বর তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর কয়েক বছর ধ'রে নানা ব্যক্তি এই মঞ্চ চালাবার চেষ্টা করলেন। ১৮৪৯ সালে সাঁ-সুচি মঞ্চের আলো চিরতরে নিভে গেল।

সাঁ-সুচি মঞ্চের আলোকমালা নিভে যাবার সঙ্গেসঙ্গে কলকাতায় বিদেশী রঙ্গমঞ্চের গৌরবরশ্মি লুপ্ত হোল; এর পরের অধ্যায় হোল ভ্রাম্যমান দলের অভিনয় বা এ্যামেচার দলের সৌখীন নাট্যপ্রয়াস।

বিদেশী রঙ্গমঞ্চ ও নবীন নাট্যরুচি

কলকাতায় দেশীয়দের রস-পিপাসার পরিবর্তন ঘটিয়েছে বিদেশী রঙ্গমঞ্চ।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা থেকে নাট্যজগতে একটি উদার যুগের সূচনা হয়। চৌরঙ্গী থিয়েটারে দেশীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিনয় দেখতে যেতেন। ফলে দেশীয়দের রসবোধ পরিবর্তিত হতে লাগল। তার প্রমাণ মিলছে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে 'ক্যালকাটা মনথলি জার্নালে' জোড়াসাঁকো নিবাসী জনৈক ব্যক্তির একটি চিঠি থেকে; তাতে তিনি গরানহাটার দেশীয় নাটকের সমালোচনা করে বলেছেন—এদের নাটক শুধু দুই প্রকার—ভক্তিমূলক (sacred) আর প্রহসন (farce)।

"The 'Ackroy gown' as its is called, afford neither pleasure nor information. The people who represent them, are generally ignorant of true principals of the histrionic art, and their representation is as rude as their music; devoid of both instruction and amusement The representation, songs and their musical performance, if all performed with ease and precision of the British drama, would not occupy a little-some length of time, but when each line is repeated a thousand times, it requires more than ordinary patience to submit to its tedium "[১১]

পত্রের লেখক আত্মপরিচয় গোপন রেখেছেন; নিজেকে "A Native of Calcutta—Zora Sanco" বলে পরিচয় দিয়েছেন। ভদ্রলোক সম্ভবত দ্বারকানাথ ঠাকুর। কারণ তাঁরই শুধু দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ নাট্য ও

সঙ্গীতানুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক এবং সে-যুগের অন্যতম প্রধান মঞ্চাভিনেতা মিঃ ষ্টোকলার তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—

"Dwarkanauth had the good taste to appreciate European music and theatricals, and so quickly became enamoured of Italian opera, when in his own country, that he engaged one of the travelling artists to give him lessons in singing No wonder, therefore, that he yeilded to the intoxication of similar delights or a large scale when he arrived in England."[১২]

(Memoirs of Stocqueller)

রসপিপাসার পরিবর্তন ঘটলেও প্রবেশে বাধা ছিল।

১৮৩৩ সালে সংবাদপত্র জগতে একটি বিতর্ক হয়। সেই বিতর্ক থেকে বোঝা যাবে যে সাহেবদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষীর সংখ্যা কম ছিল না।

মিসেস ফ্রান্সিস-এর সম্মান-রজনী (Benefit Night) অনুষ্ঠিত হচ্ছে॥ জনৈক 'বাবু' নিজে না উপস্থিত হয়ে তাঁর সরকারমহাশয়কে দুখানা টিকিট দিয়েছিলেন। সরকারমহাশয় আবার জমাদারসহ চৌরঙ্গী থিয়েটারে গিয়ে বসেছেন। 'Calcutta Courier' পত্রিকা 'Native'-এর এই স্পর্ধায় ক্ষোভ প্রকাশ করল এবং অভিমত প্রকাশ করল যে, নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রন করা হোক। 'কুরিয়রে'র এই অশালীন মন্তব্যে অনেকে ক্ষুব্ধ। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' ২২শে জুন বিরুদ্ধে মন্তব্য করা হোল—

We really wish our correspondent would revise his opinion, for they are completely out of date, and are as much opposed to good feeling as to sound policy."[১৩]

সেকালের বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রগতিশীল পত্রিকা 'রিফর্মারে' লেখা হোল যে, একজন জমাদার হাজির হয়েছে বলে আপত্তি উঠেছে! এত আসলে কাউকে অপমান করার জন্য জমাদারকে সঙ্গে আনা হয়নি। রিফর্মার পাল্টা অভিযোগ করল: যখন থিয়েটারের উঁচু আসন 'dress circle'-এ ইউরোপীয়দের ভৃত্যকে বসানো হয়, তখন তো আপত্তি ওঠে না!

"The cases are preceisely parallel, and there can be no objection in one case that is not equally applicable to the other"[১৪]

'ক্যালকাটা কুরিয়র' পত্রিকার ২১শে মে-র সংখ্যা থেকে জানা যাচ্ছে যে, বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর চৌরঙ্গী থিয়েটারে তাঁর ও তাঁর বন্ধুদের জন্য বেশ

কিছু সংখ্যক আসন রিজার্ভ করে রাখেন। বলা বাহুল্য 'কুরিয়র' খুসি মনে এই সংবাদ দেয়নি। বরং ঐ পত্রিকার চোখ টাটিয়েছে-'Young Hindoos got into the house so smartly" [১৫]

ইতিপূর্বে 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ২রা জুন তারিখে এই সব নীচ কথার জবাব দিয়েছিল। ঐ পত্রিকা পূর্ব-ইতিহাস পর্যালোচনাচ্ছলে জানাল, চৌরঙ্গী থিয়েটার একদা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়ানদের সম্পত্তি ছিল; অংশীদারদের মধ্যে একজনের স্থান শূন্য হলে জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক ঐ স্থানে নির্বাচিত হন। "However, thanks to the liberality of the gentlemen who then had the management of the theatre that his admission was secured by a majority of votes."[১৬]

এ সব কথাতেও বর্ণবিদ্বেষীদের অন্তরে সুবুদ্ধির উদয় হোল না। তারা দেশীয়দেব পাশে অবাঙ্গালী ভৃত্য বসিয়ে 'অপমান' করার চেষ্টা করে চলল।

'ইণ্ডিয়া গেজেট' আবার তার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করল;

> "How would be, let us ask this worthy gentleman, like were a Baboo to send a half dozen of his servants to sit alongside of him and his friends!"[১৭]

ইংরেজদের মধ্যে ভদ্রঅংশ স্বভাবতই বর্ণাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, তাঁরা উদারনীতিক ভাবধারায় পুষ্ট। এঁদের সঙ্গে কলকাতার নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল।

এই সাঁ-সুচি নাট্যশালার সংগঠনে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালী শিক্ষিতসমাজ কেবল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন নি, তাঁরা দলে দলে এখানে অভিনয় দেখতে আসতেন। এমন কি, কেউ কেউ নাট্যসমালোচকের ভূমিকাও গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারীর 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকা থেকে একটি মূল্যবান খবর আমরা জানতে পারছি। সাঁ-সুচি রঙ্গমঞ্চের ওথেলো-অভিনয়ের যে সমালোচনা ক্যালকাটা লিটরারী গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল, তার লেখক হলেন হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্র।[১৮] সম্ভবত বঙ্কুবিহারী দত্ত বা মধুসূদন দত্তের লেখনী থেকেই এই রচনাটি বহির্গত হয়েছিল। কিন্তু সহযোগিতার পালা এখানেই শেষ নয়।

সাঁ-সুচি নাট্যশালায় বাঙ্গালী বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নায়কের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

Under the Patronages of Maharajah Radha Kaunt Bahadur; Maharajah Buddhinauth Roy; Maharajah Apurvokrishna Bahadur; Maharajah Jadhubkrishna and Brothers; Maharajah Brogendranarain Roy; Maharajah Protaub Chundar Singh and Brother; Baboos Prawnkrishna Mullick and Brothers; Baboos Greeschunder Dutt and Brothers; and Baboo Hurrowunauth Mullick. Mr. Bary having obtained the above patronages and also the kind and gratuitous services of a Native Gentleman in conjunction with the valuable and of several English Gentlemen Amateurs, will present to his friends and the public a novel entertainment.

On Thursday Evening, August 10th, 1848, will be acted Shakespear's Tragedy of 'Othello'. Othello……The Moor of Venice…… By a Native Gentleman.—etc. etc.[১৯]

তাঁর বিপরীতে ছিলেন নীচকন্যা মিসেস আণ্ডারসন।

তিনি ডেসডিমোনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নাটকের অভিনয় রসোত্তীর্ণ হয়েছিল কিনা সেটাই বড় কথা নয়। সেদিন 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দুঃসাহসের পরিচয় বৈষ্ণবচরণের অভিনয়ে ফুটে উঠেছিল; এই দিকটা অবহেলার বস্তু নয়। আর এই কারণেই এদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাঁর নাম।[২০] সমালোচকের এই অভিমত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য।

আধুনিক নাট্যকলার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্পর্ক গভীরতর হয়েছে। এই ঘটনা একদিনের ব্যাপার নয়। একদিকে দেখছি বিদেশী রঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয়ে তার কৌতূহল জাগছে; অপর দিকে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন সভ্য মারফৎ বাঙ্গালীর নতুন নাট্যবোধ ক্রমশ পুষ্টিলাভ করছে দেখতে পাই।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু হিন্দু কলেজের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। ঐ সময়ে হিন্দু কলেজ সরকারী তত্ত্বাবধানে আসে. এবং বিখ্যাত ভারত-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন

ঐ কলেজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন; তত্ত্বাবধায়ক পদাভিষিক্ত হয়ে তিনি কলেজে কতিপয় সুযোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

আমরা চৌরঙ্গী থিয়েটারে বাঙ্গালী দর্শকের সন্ধান পাচ্ছি প্রায় ঐ রকম একটা সময় থেকে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকেই ভারতীয় ভদ্রলোকেরা চৌরঙ্গী থিয়েটারে অধিক সংখ্যায় অভিনয় দর্শনে যেতেন। হিন্দু কলেজের পঠন-পাঠনে বিদেশী নাট্যসাহিত্যের একটা বড় স্থান ছিল। সেক্সপীয়রের বিভিন্ন ট্রাজেডি ও কমেডি ছাত্রদের পাঠ্য ছিল। পরবর্তীকালে রিচার্ডসনের **'Selections from British Poets'** প্রকাশিত হলে ছাত্রেরা মোটামুটি শ্রেষ্ঠ বৃটিশ নাট্যকারদের অধিকাংশ রচনার সঙ্গে পরিচিত হল। এই সংকলনে নাট্যকারদের নিম্নলিখিত রচনা স্থান পেয়েছিল :

সেক্সপীয়র—হ্যামলেট, ওথেলো, ম্যাকবেথ,
কিং লিয়ার, মীড সামার'নাইটস্ ড্রিম,
কিং লিয়ার. হেনরিদিফোর্থ,
বোমন্ট ও ফ্লেচার—দি ফেটফুল শেপার্ড, ফিলাষ্টার,
লাব লাইস আ-ব্লিডিং।
বেন জনসন—ভলপোন অর দি ফক্স।
ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার—দি আননেচারল কমব্যাট।
মিলটন—লাইসিডাস, কোমাস।
ড্রাইডেন—অল ফর লাব।
জোশেপ এ্যাডিসন—ক্যাটো।

দেখা যাচ্ছে তখনকার নাট্যশালায় যে সব নাটক বারবার অভিনীত হোত, সেইগুলিই ছিল হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত। হিন্দু কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন ক্যাপটেন রিচার্ডসন (১৮৩৫—১৮৫১)। তাঁর সেক্সপীয়ার পড়ানো কিম্বদন্তীতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতনিন্দুক তৎকালীন আইন-সচিব লর্ড মেকলে পর্যন্ত বলেছিলেন, আমি ভারতের সব কিছু ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ক্যাপটেন রিচার্ডসনের সেক্সপীয়ার পড়ানো কখনও ভুলব না।

ক্যাপটেন ছিলেন শুধু সেক্সপীয়র-রসিক নন, ব্যাপক অর্থে নাট্যরসিক।

"কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে. অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপীয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও

দেখি না। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপীয়ারআবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare" তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্সপীয়ার বুঝাইয়া দিতেন। * * * তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন, "Are you going to the Theatre today?" তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তিবিদ্যা শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন। তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।"[২১]

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতি 'কাপ্তেন সাহেবে'র অতিপ্রেম ড্রামণ্ড সাহেব সুনজরে দেখেননি।

১০ই নবেম্বর ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে চৌরঙ্গী মঞ্চে ম্যাকবেথ অভিনীত হয়; ঐ অভিনয় মোট দর্শকের এক তৃতীয়াংশ ছিল বাঙ্গালী—একথা জানাচ্ছেন বড়লাটভগ্নী মিস ইডেন।[২২]

রিচার্ডসনের হিন্দু কলেজে যোগদান করার পর এই পরিবর্তন দ্রুত দেখা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে শুধু দ্বারকানাথ এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবেরাই বিদেশী রঙ্গালয়ে হাজিরা দিতেন। মিস ইডেন তাঁর ঐ চিঠিতে বঙ্গীয় যুবকদের বেশ প্রশংসা করেছেন। এই যুবকসমাজের অস্তিত্ব পূর্বে কল্পনা করা যেত না। "But the present class of youngmen are very prudent and quiet, run into debt very little and generally marry as soon as they are out of the collage."[২৩] শেষ পর্যন্ত তিনি এই রকম মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন—"But still I cannot tell you what the wide difference is between a European and a native."[২৪]

আর ১৮৪৮ সনের সেই দিনটি, যেদিন ওথেলো নাটকে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। সেদিন তাঁকে অভিনন্দিত করার জন্য প্রেক্ষাগৃহ বঙ্গসন্তানে পুরিপূর্ণ ছিল। একই ভূমিকালিপি নিয়ে ওথেলো নাটক দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়; মঞ্চাধ্যক্ষ মিঃ বারি বহু দর্শকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন—

> "Having received intimations from a number of influential persons as well as solicitations from a large body of Native students for the repeatation of the Tragedy of Othello!"[২৫]

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই বিপুল উৎসাহ বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের মঞ্চাবতরণের জন্যই, এমন কথা হয়তো সম্পূর্ণভাবে বলা চলে না। সেক্সপীয়রের প্রতি আকর্ষণও নব্য বাঙ্গালীর অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেক্সপীয়রের আর বৈষ্ণবচরণ উভয়েই দর্শক-চরিত্র নিরূপণ করেছিলেন। ঐ অভিনয় সম্পর্কিত রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছিল :

> "The friends of Young Bengal mustered in considerable numbers at this place of recreation, on Thursday night, to witness the long looked for 'debut' of a native amateur in the character of Othello".[২৬]

বঙ্গীয় নাট্যচর্চার ইতিহাসে সাঁ-সুচি মঞ্চের ওথেলো অভিনয় একটি ঘটনা হিসাবে যেমন উল্লেখযোগ্য, সেখানকার এই দর্শক সমাবেশও তেমনি উল্লেখযোগ্য।

নতুন যুগ : নতুন দর্শকসমাজ

এই দর্শক সমাজের জন্ম একদিনে হয় নি। হুতোম-বর্ণিত দর্শকগোষ্ঠী আর এই দর্শকসমাজ এক জাতীয় নয়।

॥ ১ ॥

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হিউজ সাহেব আর্মানী গির্জার কাছে একটি স্কুল করেছিলেন। ১৭৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

"প্রথম যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে সেট বসাখ বাবুরা সওদাগিরি করিতেন॥ কিন্তু কলিকাতায় একজনও ইংরাজী ভাষা জানিত না। ইংরাজদিগের সহিত কারবারের কথাবার্তা ইশারা দ্বারা হইত। মানবস্বভাব এই চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয়, ইশারা দ্বারাই ক্রমে২ কিছু২ ইংরাজী কথা শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে, আইন আদালতের ধাক্কায় ইংরাজী চর্চা বাড়িয়া উঠিল। ঐ সময় রামরাম মিশ্রীর শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্রী উকিলের কেরানিগিরি করিতেন ও অনেক লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন, তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্রদিগকে ১৪।১৬ টাকা করিয়া মাসে মাহিনা দিতে হইত; পরে রামলোচন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই স্কুল মাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন। ছেলেরা তামসুডিস পড়িত, ও কলার মানে মুখস্থ করিত।

বিবাহে অথবা ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন পড়িতে পারিত, সকলে তাহাকে চেয়ে দেখিতেন ও সাবাস বাওহা দিতেন।

ক্রেসকো ও আরাতুন পিট্রন প্রভৃতির দেখাদেখি শারবোরন সাহেব কিছু কাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন। ঐ স্কুলে সম্ভ্রান্ত লোকেরা ছেলেরা পড়িত।"[২৭]

দ্বারকানাথ ঠাকুর এই শারবোরণ সাহেবের স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

> "তিনি শৈশবে শারবরণ নামে যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বার্দ্ধক্যদশা পর্যন্ত চিরদিন তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"[২৮]

শুধু দ্বারকানাথ নন—তাঁর সহযোগী ও জ্ঞাতিভ্রাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুরও শারবোরণ সাহেবের ছাত্র ছিলেন।

"শারবোরণ সাহেব একপ্রকার বাঙ্গালি ছিলেন বলিলে হয়। শুনিয়াছি, প্রতি বৎসর পূজার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটি হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন হাতে করিয়া লইয়া যাইতেন।"[২৯]

"সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ প্রথম জীবনে ঐ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন। এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি কৃষ্ণমোহন বসু প্রথমে শারবোরণ সাহেবের স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন।"[৩০]

ধীরে ধীরে কলকাতায় আরও অনেক স্কুলের পত্তন হোল; তার মধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্কুল, ডেভিড হেয়ারের স্কুল ও ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল বিখ্যাত। এবং তৎসহ হিন্দু কলেজ। এই সমস্ত স্কুল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সমস্ত স্কুল ছাত্রসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্বে শুধু ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে পারলেই ছাত্রেরা স্কুল পরিত্যাগ করত। বর্তমানে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। ছাত্ররা ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করে। অবশ্য এই পরিবর্তন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। "এই ইস্তেহামেতে বালকেরা ইংরাজি ভাষায় যেমত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্রূপ ইহার পূর্বে কখন দেখা যায় নাই।

পূর্বে ইংরেজেরা এ মত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরানিগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু তখন দেখা গেল যে তাহারা আপনাদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে।"[৩০ক] "কিছুদিন আলোচনার পথ (road) অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, এইক্ষণে পুনর্বার তদপেক্ষা।

সদবস্থা হইয়াছে ; অনেকেই লেখার দ্বারা ও বক্তৃতা-দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে উৎসুক হইয়াছে, বিদ্যার্থিগণ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করিয়া অনুশীলনের ক্রীড়ায় আমোদ করিতেছে, সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় লিখিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছে। …বেকনের এসে, সেক্সপিয়ারের প্লে, কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ ও বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে।"[৩১]

নানা সভাসমিতির মধ্য দিয়ে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছিল। হিন্দু কলেজের অনন্যসাধারণ শিক্ষক ডিরোজিয়োর নেতৃত্বে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে Academic Association গঠিত হয়। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার প্রভৃতি এই সভার সদস্য ছিলেন। এই সভায় সর্ব বিষয়ে স্বাধীনতার বাণী আলোচিত হোত। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা গঠিত এই সমিতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের সহযোগিতায়, 'Society for the Acquisition of General Knowledge' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে। ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনা এখানে নিষিদ্ধ ছিল।

এ ছাড়া সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), দেশহিতৈষিণী সভা (১৮৪১), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪০) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবীন সমাজের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হতে থাকে।

শুধু জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্‌টে গেল না, আনন্দ-উৎসবে, প্রমোদকলায় তাঁদের রুচি ভিন্নতর হোল।

নব্য বাঙ্গালী ও নাট্যানুষ্ঠান

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রুশ নাট্যামোদী গেরাসিম লেবেডেফ ডোমতলায় বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন ; তখন বাঙ্গালী শিক্ষিতসম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেনি।

॥ ১ ॥

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এই স্কুল কলেজ স্তরে উন্নীত হলে দুই তিন উৎসবের মধ্যেই সমাজে এক দারুণ পরিবর্তন দেখা দেয়। শিক্ষার ক্ষেত্রের এই পরিবর্তনের চাপ অন্যত্র অনুভূত হতে থাকে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে অনেকেই রত ছিলেন ; কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে একমাত্র স্কটপণ্ডিত ডেভিড ড্রামণ্ড-প্রতিষ্ঠিত ধর্মতলা একাডেমির শিক্ষা-সূচীতে মানুষ গড়ার আদর্শ ছিল ; শুধু অক্ষরজ্ঞান বা ভাষাজ্ঞান দান করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। শারবোরণের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আত্মচেষ্টায় বড় হয়েছিলেন। ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের অভ্যন্তরে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল। এবং প্রতি বৎসর বার্ষিক পরীক্ষা অন্তে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকত। আমাদের কাছে চার বৎসরের নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত রিপোর্ট আছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের নাট্যাভিনয়ে আমরা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়োর প্রসঙ্গ পাচ্ছি। ডিরোজিয়ো ১৮২২ খৃষ্টাব্দে শাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন,[৩২] দ্বিতীয় বৎসর 'ডগলাস'[১] নামক ট্রাজেডিতে তিনি অবতীর্ণ হন। 'জনবুল' পত্রিকায় এই অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।[৩৪]

এছাড়া ১৮২৬ ও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ধর্মতলা একাডেমির বাৎসরিক পরীক্ষার খবরে কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (Kissenchunder Dutt) নামক এক বালকের কৃতিত্বের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর বেঙ্গল হরকরা তাঁর সম্বন্ধে লিখছে "an honour to the institution".

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বহু পুরস্কার পান ; তাঁর এবারকার অভিনয় খুবই ভালো হয়েছিল। 'ক্যালকাটা মন্থলি জার্নালে' বলা হোল,

> "··His correct pronunciation, action in the character of Shylock, and in his recitation of Cato's Soliloquy On the Soul, drew forth the most enthusiastic admiration of the whole audience".[৩৫]

এই কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত রামবাগানের রসময় দত্তের পুত্র ; কৈলাসচন্দ্র দত্তের ভাই। অর্থাৎ দত্তপরিবারের অন্যতম রত্ন। ইনি পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটারের' ছিলেন একজন উদ্যোক্তা।

স্কুলের উৎসবে নাট্যাভিনয়-প্রবর্তনা ড্রামণ্ড সাহেবেরই কীর্তি। এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে অন্যান্য স্কুলের বার্ষিক উৎসবে নাট্যানুষ্ঠান বা আবৃত্তির ব্যবস্থা নিয়মিত দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবত ড্রামণ্ডের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করা হয়েছে।

১৮২৮, ১লা মার্চ শোভাবাজার রাজবাটিতে হেয়ার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সর্বজন সমক্ষে উপস্থাপিত হোল। সেখানে রামতনু লাহিড়ী সাইকাস্

(Syphax)-এর ভূমিকা অভিনয় করে সকলের প্রশংসাভাগী হন।[৩৬] সম্ভবত রামতনু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে যোগদান করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার পুরস্কার-বিতরণী উৎসবে **The Merchant of Venice, Cato** ও **Venice Preserved** থেকে নির্বাচিত অংশ অভিনীত হয়। এতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, ও রাধানাথ সিকদার অংশ গ্রহণ করেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ শাইলকের ভূমিকা অভিনয় করেন ; তাঁর অভিনয় খুব ভালো হয়েছিল—"He has a proper conception of the character and did it all justice".[৩৭]

১৮২৮ সালে জগন্মোহন বসু মহাশয়ের ভবানীপুরস্থ ইংরাজি পাঠশালার ছাত্রেরাও বার্ষিক পরীক্ষায় হ্যামলেট এবং ওথেলো থেকে আবৃত্তি করে প্রশংসা অর্জন করে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে চৌরঙ্গী থিয়েটারে সেক্সপীয়রের Cariolanus নাটকের অভিনয় দেখে এসে হিন্দু কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এক সমালোচনা লিখলেন। সেকালের ভারত-বিদ্বেষী পত্রিকা জন বুল (John Bull) লিখেছিল :

> "The mere language of the English has been hitherto their principal, if not exclusive object, but now in these scenes, the habits and manners of Europeans became to them a matter of familiar study and an acquirement. This is certainly a grand step towards enlarging and freeing them from the spell of prejudice."[৩৯]

১৮২৮ খৃষ্টাব্দের বিবরণীতে দেখছি, এবার এ্যাংলো-হিন্দু কলেজে ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, জুলিয়াস সিজার থেকে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করা হয়েছে। আবৃত্তিকারীদের মধ্যে আছেন রামতনু লাহিড়ী, দিগম্বর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, মহেশচন্দ্র সিংহ, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামচন্দ্র মিত্র ও হরচন্দ্র ঘোষ। হরচন্দ্র ঘোষই হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা নিছক আবৃত্তি করেননি, অভিনয় করেছিলেন ; কারণ সংবাদপত্রে পাচ্ছি যে, তাঁরা বেশভূষা ধারণ করেছিলেন। সাময়িক পত্রের বর্ণনা এইরূপ—"graceful manners and elegant dress of the actors in Hamlet."[৪০]

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের বার্ষিক পরীক্ষার পর পুরস্কারবিতরণী উৎসবে 'The Merchant of Venice' সুঅভিনীত হয়েছিল।[৪৩]

হিন্দু থিয়েটার

এই বৎসরই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার জন্মলাভ করে ; বিদ্যালয়ের প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করে নব্য বাঙ্গালীর নাট্য-উৎসাহ বৃহত্তর পরিবেশে সার্থকতা খুঁজতে চলল। নব্য বাঙ্গালীর নাট্য-পিপাসার এ হোল দ্বিতীয় স্তর, উন্নততর স্তর। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ভালোই অভিনয় করত; সম্ভবত সাহিত্যের অধ্যাপকদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা নাট্য-অভিনয়ে সুদক্ষ। ডিরোজিয়ো সুঅভিনেতা ছিলেন, ; আর পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের নাট্যখ্যাতি একটি সর্বজনবিদিত ঘটনা।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাই লাটভগ্নী প্রশংসাভরে লিখেছেন—

> "Yesterday we had an examination of the Hindu College at the Government House. The great banqueting hall was completely filled with natives of the higher class. Some of the boys in their gorgeous dresses looked very well, reciting and acting scenes from Shakespear. It is one of the prettiest sights I have seen in Calcutta."[৪১]

এ ছাড়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষান্তে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী অবশ্য এ ব্যাপারে একটু বেশি মনোযোগ দিয়েছিল। উইলিয়াম পামার সাহেব এখানকার শিক্ষক ছিলেন; তিনি ছিলেন পেশাদারী মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এই উইলিয়াম পামার ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যবসায়ী পামার কোম্পানীর (Palmer & Co) মালিক জন পামারের পুত্র।

হিন্দু কলেজের বিশেষ শিক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষান্তে পুরস্কার বিতরণীয় সভায় আবৃত্তি এবং অভিনয়—এই সব কিছু একত্রে মিলে নব্য বাঙ্গালীকে নবীন নাট্যশালা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট Enquirer কাগজে একটি সংবাদ বের হোল; তার শিরোনামা হোল এই—'Proposed Native Theatre'. সংবাদটি এইরূপ :

> "It is rumoured that a respected Hindu Gentleman is exerting himself for setting up a theatre among the natives !'[৪২]

ঐ সংবাদে আরও বলা হোল উদ্যোক্তারা হিন্দু কলেজ ও হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের অভিনয়কুশলতার কথা স্মরণে রেখেছেন। ঐ বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বর আরও বিস্তৃত খবর বেরুলো :

"We understand that the theatre is to be got up in the English style and its entertainments are to be presented in the English language. To those conversant with the natives who speak English, with those even who had been educated at the Anglo-Indian College, it must appear evident that such an estabisment as a theatre on the plan of the one proposed, will tend very much to purify their mode of speaking English and introduce a reform in the present barbarous articulation of the language. We wish those, whose object it is to introduce literature and science amongst their countrymen, entire success and more enterprise."[৪৩]

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকায় এই সব সংবাদের সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হোল। রাজা বৃদ্দিনাথ রায়ের (বৈদ্যনাথ রায়?) কাশীপুরের বাগানবাড়িতে এ সম্পর্কে এক সভা আহবান করা হোল; সভার আহবায়ক হিসাবে স্বাক্ষর করেছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও হরচন্দ্র ঘোষ।[৪৪]

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখ প্রকাশিত সংবাদে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল; তাতে বলা হোল প্রসন্নকুমার ঠাকুর "has taken upon himself the expenses that may be incurred." এই নাট্যকে গোষ্ঠীর নাম হোল "The Hindu Theatrical Association" আহবায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই একটি তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠিত হোল।

কর্মচ্যুত নব্যবঙ্গের দীক্ষাগুরু ডিরোজিয়ো হিন্দুদের নিজস্ব নাট্যশালা স্থাপনে উৎসাহ দিলেন না; তিনি তাঁর পত্রিকা 'The East Indian'-এ লিখেছেন, "a theatre among the Hindoos, with the degree of knowledge they at present possess will be like building a palace in the waste."[৪৫] ডিরোজিয়োর বাস্তবজ্ঞান অতিশয় প্রখর ছিল। কারণ এই নাট্যশালা সত্যই অতিশয় ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালে ড্রামণ্ডসাহেবও

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের অতি-রঙ্গশালা প্রীতি নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ বর্ষণ করেছিলেন। [Calcutta Courier, 1840, June 22 উদ্ধৃত][৪৬]

তাঁদের উভয়েরই মত ছিল এই, হিন্দু যুবকদের পক্ষে প্রমোদকলায় শক্তি ব্যয় করার মত সময় এটা নয়, এখন চাই 'useful knowledge' অর্জন। তাই 'East Indian' কাগজে লেখা হোল, 'useful informations should precede amusements.' আর তা ছাড়া বিদেশী নাটকে কোন রকমেই দেশের বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত হয় না।

১৮৩১ সনের ২৫শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়া বাগানবাটিতে হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন হোল। ভবভূতির 'উত্তর চরিত' ও সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজারে'র অংশ বিশেষ অভিনীত হয়। ভবভূতির 'উত্তর চরিত' প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমন উইলসন কর্তৃক ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছিল। এই হিন্দু থিয়েটারের অভিনয় মাতৃভাষায় বা দেবভাষায় সম্পন্ন হয়নি, সম্পন্ন হয়েছিল রাজভাষায়, যে ভাষাকে তখনকার শিক্ষিত শ্রেণী ও ভদ্রসমাজ একমাত্র রুচিসম্পন্ন ভাষা বলে গ্রহণ করত।

'রিফর্মার' জানাচ্ছেন যে, জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের তত্ত্বাবধানে অভিনয় আয়োজিত হয়েছিল।

'সমাচার চন্দ্রিকা'র খবরেও এই সংবাদ স্বীকৃত হয়েছে :

"ইহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানাপ্রকার বেশভূষা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইংরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন।[৪৭]

রক্ষণশীল সমাজ এই নাট্যাভিনয়ে খুশি হননি; কারণ তাঁরা এই নাট্যাভিনয়ের স্বতন্ত্র চরিত্র উপলব্ধি করতে পারেননি। নাটক যে সঙ নয়, এটা তাঁরা সেদিন অনুধাবন করতে পারেননি।

"রামলীলা নাটকের মত যাহা২ ইংরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাষা ত্যাগ করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণপূর্বক রাম, লক্ষ্মণ সীতা ইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন।"[৪৮]

তবে 'চন্দ্রিকা'র বক্রোক্তি এখানেই থামে নি; এখানে এলে দর্শকদের যে অনেক আর্থিক সুরাহা হবে, এ বিষয়েও মন্তব্য করা হয়েছে :

"এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ়দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায় এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে

হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইহারা ধনিলোকের সন্তান ইহাদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না কালিয়দমনের ছোঁড়াগুলো সর্বদাই টাকা পয়সা চাহে তাহারা পয়সা বা সিকি আধুলি না পাইলে দর্শকদিগের নিকট আসিয়া অনেক রকম রঙ্গভঙ্গ করে সম্মুখ হইতে যায় না সুতরাং তাহাতে মনে সন্তোষ জন্মুক বা না হউক কিঞ্চিৎ দিতেই হয় এ রকম যাত্রায় সে আপদ নাই।'[৪৯]

'সমাচার দর্পণ' এই সমালোচনার একটি উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল। "যদ্যপি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে চন্দ্রিকা ও রত্নাকরের সম্পাদকেরা হিন্দু হইয়া হিন্দুরদের নাট্যশালা এবং ঐচ্ছিক যাত্রাকরেরদের বিশেষতঃ ঐ নাট্যশালা সংস্থাপকেরদের অতি অপভাষা ও তিরস্কার দ্বারা তুচ্ছ করেন তাহার উত্তর অতি সহজ। প্রকৃত নাট্যের ব্যাপারে তাঁহারদের কিছুমাত্র রসবোধ নাই তাঁহাদের বুদ্ধি অল্প কেবল গালাগাল দিতে সমর্থ সেই বিদ্যায় নিপুণ ..."[৫০]

কিন্তু 'সমাচারদর্পণ' হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের 'জুলিয়াস সিজার' ও 'উত্তরচরিতে'র একত্র অভিনয় সমর্থন করতে পারেনি; ঐ পত্রিকার মতে নাট্যশালায় সেদিন যে গণ্ডগোল হয়েছিল, তার কারণ দর্শকদের একাংশ মনে করেছিল যে রামযাত্রা হবে। তাই 'দর্পণে'র বক্তব্য যে, শুধুমাত্র জুলিয়াস সিজার অভিনয় করা উচিত ছিল।

হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোক্তারা সেক্সপীয়ার ও ভবভূতিকে একাসনে বসিয়ে বৈদেশিক আদর্শের সঙ্গে জাতীয় আদর্শের সমন্বয়প্রয়াসী হয়েছিলেন।

এই নাট্যাভিনয় ছিল নব্য সমাজের অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজের মত আর একটি কাজ।

> "What child of enlightenment, what man of patriotic feelings will not hail with ruptures of joy that day when our hitherto degraded countrymen will turn their backs with disgust against the gross, barbarous, and obscure performance of *Cobbies* and *Jatras* to relieve of their aching heart by the sight of a rational, tasteful and dignified performance on the stage of our Hindu Theatre."[৫১]

নাট্যাভিনয় আরম্ভ হবার পূর্বে একটি স্বাগতসম্ভাষণমূলক বক্তৃতা পাঠ করা হয়েছিল, এটি লিখেছিলেন 'a classic liberal and well-known

friend of native genius'. সম্ভবত ইনি হলেন উইলসন। অভিনয় দেখবার জন্য স্যার এডওয়ার্ড রিয়ানের ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত। অভিনয় শেষে আতসবাজী পোড়ান হয়।'[৫২]

॥ ২ ॥

শুধু ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য বা ইংরেজি নাটকের প্রতি নয়, দেশীয়দের প্রেম ইংরেজ শাসনের প্রতিও সমান তোড়ে ধাবিত হোত। সে যুগের নব্য বাঙ্গালী তার এই মানসিকতা গোপন করেনি; সে খোলাখুলি বলেছে:

> "This kind and wise dispensations of God must be acknowledged by the improved Hindoo in timely sending a civilised and in every respect a clever people to give light where there was darkness, to elevate what was low, to improve what was mean, and to reform what was corrupt '[৫৩]

শুধু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা লিটরারী গেজেটে'র যে সংখ্যায় কৈলাসচন্দ্র দত্তের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; চটকদার ভাষায় লেখা হয়,

> "The people of India and particularly those of the metropolish had been subject for the last fifty years to every species of subaltern oppression. The dagger and bowl were delt out with merciless hands, and neither age, sex, nor conditions could repress the rage of the British barbarians. These events together with the grievances suffered by their ancestors, roused the dormant spirit of the generally considered timid Indian."[৫৪]

প্রবন্ধটি ছিল নিছক পরিহাস বিজল্পিতম্। কিন্তু 'ক্যালকাটা কুরিয়ের' এই প্রবন্ধ পড়ে আঁতকে ওঠেন এবং রাজদ্রোহসূচক বলে লেখকের প্রতি চরম দণ্ডবিধান দাবী করেন। 'কালকাটা লিটরারী গেজেটে' বলা হয় যে, এই প্রবন্ধ হোল একটি কাল্পনিক সংলাপ, শুধু ইংরাজি ভাষার নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য (printed only for its English) মুদ্রিত করা হয়েছে।[৫৫] তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

হিন্দু থিয়েটার বাঙ্গালীর যুবকের প্রথম নাট্যপ্রয়াস। মঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আলোকসজ্জা, অঙ্কবিধৃত নাট্য-গ্রন্থনা—এই প্রথম পেলাম। সংলাপ-

নির্ভরতার জন্য এই নাট্যপ্রয়াস বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। তবে মনে রাখা দরকার, এই নাট্য-প্রয়াস মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে ইংরাজি ভাষার মধ্য দিয়ে। শুধু ইংরেজ নাট্যকার সেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার অভিনয় নয়, সংস্কৃত নাট্যকার ভবভূতির নাটকও ইংরেজিতে অনূদিত করে তবে অভিনীত হয়েছিল। ইংরেজি তখন শুধু আধুনিক ভাষা নয়, রুচিবানদের ভাষা; আর বাংলা ভাষা ছিল অমার্জিত ভাষা। বিদ্যাসুন্দর-কবিসঙ্গীত-অধ্যুষিত ভূখণ্ডে পদচারণা করতে নব্য নাট্যপ্রয়াসীদের ছিল কুণ্ঠা! সে যুগের বাঙ্গালী যুবক ইংরেজি অবলম্বনে যেমন প্রবন্ধ লিখেছে, কবিতা লিখেছে, তেমনি নাটকও লিখেছে।

অনভিনীত ইংরেজী নাটক

১৮৩১ সনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'The Persecuted' নামক এক ব্যঙ্গ নাটক প্রকাশিত হয়। এই নাটকে হিন্দুধর্মদ্বেষী ইয়ং বেঙ্গলের ক্রোধ নির্মম ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে।[৫৭]

'The Persecuted' নব্য বাঙ্গালীর প্রথম ও আধুনিক নাট্যরচনা; এবং এই নাটক নবীনচন্দ্র বসুর বিদ্যাসুন্দর নাট্যাভিনয়ের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভাষা ইংরেজী, বিষয় বঙ্গীয়। শুধু বঙ্গীয় নয়, বাংলাদেশের সমসাময়িক কালের জীবিত কুশীলব এমন উদ্ধত ও স্পষ্টভাবে সম্ভবত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আনন্দ বিদায়' ব্যতীত আর দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ করেনি।

ক্যাপটেন রিচার্ডসনের সম্ভাব্য নাটক নিয়ে সে যুগে কত হৈ চৈ না হয়েছে! সাঁ-সুচি নাট্যশালার জন্য তিনি নাটক লিখেছেন, এই খবর প্রকাশ পেলে কত গবেষণা চলতে লাগল। তারপর ১০ই মার্চ, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে 'The Bag of Gold' নামে তাঁর এক কমেডির খবর শোনা গেল। হরকরা কাগজে ৭ই এপ্রিল ঐ নতুন নাটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হোল।[৫৮] এই নাটক আদৌ মঞ্চস্থ হোল না, এবং সম্পূর্ণ মুদ্রিত হোল না। অংশবিশেষ যা আমরা দেখেছি, তার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে।

অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের নাটক যেমন আজ লুপ্ত, আর একখানি নাটকও তেমনি হারিয়ে গেছে। 'উত্তর চরিত' নাটক অভিনীত হলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে নাটক রচনায় একটা উৎসাহ দেখা দেয়। সমাচার দর্পণ লিখছে,

"জনৈক সুরসিক বিবেচক এক নাটক গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন।" (সমাচার দর্পণ ২১ এপ্রিল, ১৮৩২) এ নাটকের বিষয়বস্তু, রচনারীতি, এমন কি নাম পর্যন্ত বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবে গেছে।

চতুর্থ নাটক রচনা করেন কলুটোলার রাজনারায়ণ দত্ত; তাঁর নাটকের নাম **Osmyn** (বা ওসমান)। রাজনারায়ণ দত্ত পরবর্তী কালে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ওসমান অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা রোম্যানটিক রীতির নাটক। এই নাটক সেক্সপীয়ার-রীতির নাটক নয়; অনেকটা বাইরণের '**Monte Blanc**'-এর প্রভাবজাত।[৫৯]

শশিচন্দ্র দত্ত '**Stray Leaves**' গ্রন্থে ছোট নাট্যকাব্য আছে। ঐ বইতে এক নিবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,

> "We for our part, are certainly not prepared to depreciate the taste that has preferred Bacon, Milton and Addison to the Chundee, the Bidya Sundar and the Madhab-Malati."[৬০]

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের 'Eurasian' পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের '**Rizia**' নামক কাব্যনাট্য সাতটি দৃশ্যে বিভিন্ন মাসে প্রকাশিত হয়। রিজিয়া কাব্যনাট্য ইংরিজিতে লিখিত; মাইকেল একদা এই নাটক বাংলায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগে মুসলমান-ইতিহাস সম্বন্ধে 'ইয়ং-বেঙ্গল' সমাজের এক বড় অংশের মনোভাব অনুদার ছিল।

> "If ever any conquest proved a blessing to the conquered, it was the empire of Great Britain in India. The barbarous rage of the Mohametan despot trampled upon the feeling of the Hindoos and inflicted death without discrimination if his naughty mind took pleasure."[৬১]

মাইকেল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। কবে হিন্দু কলেজে আবদুল লতিফের সঙ্গে একত্রে পড়েছেন, মাদ্রাজ বসবাসকালে কলকাতার বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখতে গিয়ে লতিফের খবর নিয়েছেন! তাছাড়া, হাসান-হোসেনের কাহিনী নিয়ে তিনি নাটক লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেলগাছিয়ার অধ্যক্ষদের সমর্থন না পাওয়ায় সে ইচ্ছা ত্যাগ করেন। তাঁর 'বুড়ো শালিখ' হোল হিন্দু জমিদার, উৎপীড়িত প্রজা হোল মুসলমান।

নাটক বিদেশী ভাষায় আর আবদ্ধ থাকচে না; মাতৃভাষার নাট্যরীতিতে আধুনিকতা শীঘ্র অবতরণে সক্ষম হবে।

নাটক হোল দৃশ্যকাব্য, পাঠ্যসাহিত্য নয়। তাই ইংরেজি ভাষায় নাটক লেখার পর্ব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। এমন কি, বঙ্গসন্তানদের হিন্দু থিয়েটারও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 'উত্তর চরিত' ও 'জুলিয়াস সিজার' অভিনয়ের পর আর একবার মাত্র হিন্দু থিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল।

২৮শে এপ্রিল রিফর্মার জানিয়েছিল:

> "The Hindoo Theatre reopens tomorrow with the performance of a small Turkish Farce."

'রিফর্মার' পত্রিকায় পাওয়া যাচ্ছে যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ হিন্দু থিয়েটারে একটি প্রহসন (a Turkish farce) 'Nothing Superfluous' অভিনীত হয়েছিল।

হিন্দু থিয়েটারের স্বাভাবিক মৃত্যুই হোল।

অভিনীত আধুনিক বাংলা নাটক: লেবেডেফের প্রয়াস

শিক্ষিত বাঙ্গালীব নাট্য-পিপাসা মাতৃ ভাষার মাধ্যমে ধাবিত না হওয়ায় বাঙ্গালা ভাষার নাট্যপ্রয়াস পুরাতন রীতির অনুবর্তনে বহুকাল মগ্ন থাকবে।

॥ ১ ॥

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এক রুশ পর্যটক মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন। কিছুদিন এদেশে বসবাস করার ফলে এদেশীয় ভাষা ও শিক্ষাসহবতের সঙ্গে মোটামুটি তিনি পরিচিত হলেন। সে যুগের কলকাতায় চিত্তের চেয়ে বড় ছিল বিত্ত: বিদ্যার চেয়ে অর্থ, চরিত্রের চেয়ে সৌখীনতা। সে যুগের সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর আর বিড়ম্বিত নানা মঙ্গলকাব্যের ছিল আধিপত্য। কলকাতার তখন নববাবুদের বিলাসতীর্থ। এই তীর্থের মৃত্তিকা দিয়ে লেবেডেফ-নাটকের অঙ্গ তিলকায়িত। গল্প নির্বাচনের সময়েও সমসাময়িক কলকাতার মেজাজ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ভাষান্তরণে সম্পূর্ণই অষ্টাদশী কলকাতার বুলি ফুটেছে। এ নাটক আকারে স্পেনীয় হলেও স্বভাবে বাঙ্গালী, সাময়িক বাঙ্গালী। একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হোল:

By Permission of the Honorable The Governor-General

Mr. LEBEDFF'S

New Theatre in the Doomtullah

DECORATED In The Bengallee Style

Will be opened very shortly, with a play called

The Disguise,

The characters to be supported by Performers of

of both sexes

To Commence with Vocal and Instrumental

Music, Called

The Indian Serenade.

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengalees, will be added European. The words of the much admired Poet Shree Bharot Chondro Roy, are set to music.

Between the Acts.

Some amusing curiosities will be introduced.

The day for exhibition, together with a particular detail of the performance, will be notified in the course of the next week.[৬৪]

এই বিজ্ঞপ্তির তিন সপ্তাহ পরে আর একটি বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের তারিখ, স্থান ও টিকিটের মূল্য সর্বসাধারণকে জানান হোল।

প্রথম অভিনয়ের পর দ্বিতীয় অভিনয় হোল, ১৭৯৬ সালের মার্চ মাসে; এই অভিনয় উপলক্ষে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, তাতে নাট্যকারের নাম উল্লিখিত হয়। দ্বিতীয় অভিনয়ের বিজ্ঞাপনটি নাটকের দিক থেকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

Calcutta, Monday the 21st of March, 1794 Bengallie Theatre,/ of Mr. Lebedeff/No. 25,/Doom polah./ The Disguise,/ a Comedy, in three acts,/ Written by M. Joddrell, esq/Translated by Mr. Lebedeff/Act I. Entirely Bengalese—Act II, Scene the/First into Moors,—the second scene into Bengalese, and the Third (and last) scene of this Act, will de / livered in English.—Act III, translated entirely into/Bengalese. In the original, the scenes are laid out in Spain; but/in the translation, the scenes are

changed to this/country; the places spoken of, instead of being Ma/drid and Serive, are Calcutta and Lucknow; and the/names of the Persons in the Drama, are changed from/European Names, to proper names of this country....[৬৫]

লেবেডেফ বলেছেন যে, তিনি এম. জোডরেল প্রণীত ইংরেজী নাটকের সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ করেছেন। জোডরেলের মূল নাটক কি ধরণের ছিল এবং আদৌ মুদ্রিত ছিল কিনা, এ নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠেছে। 'Love is the Best Doctor'-এর কোন লিপি পাওয়া যায়নি।

> "লেবেডেফ স্বয়ং মূল ইংরেজী নাটকটির রুশ ও প্রতিটি বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণানুগ রুশ প্রতিশব্দ দিয়া অশেষ পরিশ্রম সহকারে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পত্র তিনভাগে বিভক্ত বাম-পার্শ্বে ইংরেজী নাটক, মধ্যে রুশ অনুবাদ, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বঙ্গানুবাদ।"[৬৬]

ডঃ গোস্বামীর মতে: "পাণ্ডুলিপি সুন্দর, লিপিকারের নাম নাই। অসম্ভব নহে, গেরাসিম স্বয়ং ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস এবং অপরাপর পণ্ডিতবৃন্দ লেবেডেফকে অনুবাদকার্যে সহায়তা করিয়া থাকিবেন কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি অনুবাদ কর্তা নহেন।"[৬৭]

ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক অনুসন্ধানেও জোডরেলের পরিচয় পাওয়া যায়নি; কিন্তু লেবেডেফের কল্যাণে সুদূর প্রাচ্যের এক বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বেঁচে আছেন।

॥ ২ ॥

ঐ নাটকের কাহিনী এই রূপ:

নায়ক ভোলানাথ তাঁর ভৃত্য রামসন্তোষকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে; নায়কের প্রেমাস্পদা সুখময়ী (বানান সুখময়) থাকে সুদূর লক্ষ্ণৌ। রাম-সন্তোষের স্ত্রীর নাম ভাগ্যবতী। ভোলানাথ তাকে কতটা ভালবাসে তা যাচাই করার জন্য সুখময়ী ভাগ্যবতী ও রতনমণি নাম্নী রমণীকে নিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছাল গোপনে। সুখময়ী মোহনচাঁদ নাম গ্রহণ ও ছদ্মবেশ ধারণ করে ভোলানাথের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে।

এখানেই শুরু হোল 'কাল্পনিক সঙবদল' নাটকের রহস্য। এদিকে স্বামী-প্রবর ভোলানাথ শশিমুখী নাম্নী এক দুষ্টা মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়। ভোলানাথ মোহনচাঁদবাবুর সঙ্গে এত কথা বলে, কিন্তু তাকে চিনতে পারে না।

এদিকে ভৃত্য রামসন্তোষের কাণ্ডকারখানা কম নয়, তিনিও পিছিয়ে থাকলেন না ; পথে অবগুণ্ঠবতী ভাগ্যবতীকে দেখে প্রণয়াসক্ত হোল ভিন্ন নারী মনে করে। মোহনচাঁদের ছদ্মবেশের অন্তরাল থেকে সুখময়ী শশিমুখীর প্রসঙ্গ শুনেছে ; কি করে স্বামীকে ঐ দুষ্টা নারীর কবল থেকে মুক্ত করা যায়, এই তার উৎকণ্ঠা।

শশিমুখীর স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য ভোলানাথকে দিয়ে মোহনচাঁদবেশী সুখময়ী এমন এক চিঠি লিখিয়ে নেয়, যা পড়লে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অবশ্য-সম্ভাবী। ভাগ্যবতীর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় ঐ চিঠি শশিমুখীর কাছে পৌঁছে দেবার। ভাগ্যবতী আবার ঐ কাজটি রামসন্তোষের কাঁধে চাপিয়ে দেয়।

এই চিঠি শশিমুখীর কাছে পৌঁছে দিতে গিয়ে রামসন্তোষ শাশিমুখীর ভাড়া-করা দুর্বৃত্ত যুবকের দ্বারা লাঞ্ছিত ও সর্বস্বান্ত হোল। শশিমুখীর প্রত্যুত্তরটি পথে ফেলে দিয়ে চলে আসে। পড়বি ত পড়, চিঠিখানি ভোলানাথেরই হাতে পড়ল। চিঠি পড়ে ভোলানাথ শশিমুখী সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়। রামসন্তোষের সঙ্গে একদল ভিখিরী গায়কের পথে দেখা হোল। তাদের দলের মেয়ে রামসন্তোষকে উকিলের বাড়ি নিয়ে গেল এই লাঞ্ছনার প্রতিবিধানের জন্য।

ছদ্মবেশী মোহনচাঁদের সঙ্গে ভোলানাথের পথে দেখা হয়ে গেল, পুরুষবেশী সহচরী রতনমণিও সঙ্গে আছে। মোহনচাঁদকে ভোলানাথ জানাল যে সে শীঘ্রি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে—পত্নী সুখময়ীর সঙ্গে মিলিত হবে। শশিমুখী নিযুক্ত দুর্বৃত্ত তিনকড়ি ও পাঁচকড়ি ওদের ওপর আক্রমণে উদ্যত হোল ; তবে পেয়াদার হাতে তারা ধরা পড়ল।

বন্ধুর একটি স্মৃতিচিহ্ন চাইলে মোহনচাঁদ ভোলানাথকে একটি লকেট দেয় ; এই লকেট প্রদানের সময় সুখময়ীর একটি ছবি তার নজরে পড়ে। মোহনচাঁদ অবশ্য বলে ঐ চিত্র তার প্রতিবেশিনী জনৈকা অভিনেত্রীর চিত্র। ভোলানাথ মোহনচাঁদের কাছে বিদায় নিল, কিন্তু সন্দেহটুকু সঙ্গে নিয়ে গেল।

পথে ব্যাপারটি আরও জট পাকিয়ে গেল। এক গৃহে সুখময়ীর কণ্ঠস্বর শুনে সে হতচকিত হয়ে গেল ; নানা কথাবার্তার পর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করল। সেখানে সুখময়ীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হোল। জেরার সম্মুখে সে স্বীকার করল যে শশিমুখীর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল। কিন্তু সে-আকর্ষণও শশিমুখীর বিশ্বাসহন্ত্রীর মত ব্যবহারে লোপ পেয়েছে। তার সন্দেহ হোল সুখময়ী ভালবাসে মোহনচাঁদবাবুকে।

—আমি জানিয়াছি যে, তুমি ভালবাস মোহনচাঁদ বাবুকে সে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছে।

ভাগ্যবতী এসে জানাল যে, মোহনচাঁদ আসছেন। অতএব পলায়ন করো। কিন্তু ভোলানাথবাবুর মনে তখন হেস্তনেস্ত করার জিদ চেপেছে।

—স্থির হয়, ধনি। দেয় আসিতে ওকে। আমি উহার উস্ফ দেখিব।

তখন সুখময়ী মুস্কিল আসান করল। ভাগ্যবতীকে তফাৎ যেতে বলল। দুজনে কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় ভাগ্যবতী আবার গীতবাদ্যের দল নিয়ে প্রবেশ করল এবং মোহনচাঁদবাবুর বিবাহ উপলক্ষ্যে এই গীত বাদ্যের আয়োজন হয়েছে, এই সংবাদ জানাল। ভোলানাথ আবার মুষড়ে পড়ল। তখন সুখময়ী আত্মপ্রকাশ করল বা আত্মপরিচয় দিল।

—সত্তী ভোলানাথবাবু। আমি আর মোহনচাঁদবাবু হই সেই সকল বেক্তী। আমি হই প্রীয়সী আর স্বরিত ঐ মানুষের জারে আমি ভালবাসি।

ভুল বোঝাবুঝির অবসান হোল। ভোলানাথের মনের আঁধার কেটে গেল। এমন সময় ভৃত্য রামসন্তোষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করল। অন্য রমণী ভেবে ফষ্টিনষ্টি করার জন্য তার স্ত্রী তাকে ভৎর্সনা করে। রামসন্তোষ ভুল বুঝতে পারল, তার অবগুণ্ঠনবতী প্রণয়িণী আসলে তার পূর্বপরিণীতা।

—বটে এ প্রকত, আমি এক দুঃখে, ক্ষুদ্র, অসামর্থ, হিণ ছিল বেক্তী—না আকার, না প্রকার।

জোড়ায় জোড়ায় মিলন হয়ে গেল। সুখময়ী অবশ্য বলল—আমারদিগের সকলেরি ক্রটি আছে। কিন্তু এই সম্বেতে আমরা বিস্মিত হব আর মর্জাদা করিব উহারদিগের সকলকে।

এইভাবে ভ্রান্তিবিলাসের অবসান হোল; নাটকে সত্য-সত্যই সঙ্ বদল হোল।

॥ ৩ ॥

এ নাটক সম্পূর্ণত বিদেশীর অপরিণত ভাষা জ্ঞানের দৃষ্টান্তস্থল। কী শব্দ চয়নে, কী শব্দবিন্যাসে, কী বাক্যযোজনায় এবং যতিস্থাপনে এ নাটক সর্বতোভাবে বাংলা ভাষার স্বভাবধর্মের প্রতিকূলতা করেছে। মনে রাখা উচিত তখনও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় নি, তখনও 'কেরীর 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়নি, তখনও দেশীয় সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করেনি, 'আলালের ঘরের দুলাল' ও ''হুতোম' তখনও আঁতুড় ঘরে চোখ

মেলেনি; সেই যুগে লিখিত সাহিত্যে বাংলা গদ্যের কি সাধু, কি কথ্য কোন নজির ছিল না। সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় এই দুরূহ কাজে তাঁকে আত্ম-নিয়োগ করতে হয়েছিল। তিনি অবশ্য বলেছেন,

> 'When my translation was finished, I invited several learned Pundits, who perused the work very attentively and I then had the opportunity of observing those sentences which appeared to them most pleasing, and which most excited emotion; and I presume I donot much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much heightened, and which could in vain be imitated by any European who did not possess the advantage of such an instructor as I had the extra-ordinary good fortune to possess."[৬৮]

তাঁর ভাষাশিক্ষক ছিলেন গোলোকনাথ দাস (Golucknath Dass, my linguist)। কিন্তু শুধু গোলোকনাথকে অভিযুক্ত করে লাভ নেই, কোন পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব ছিল না সে সময়ে নাটকের উপযোগী সংলাপ তৈরি করে দেওয়া।

"ব্রাহ্মণ-রোম্যান-ক্যাথলিক-সংবাদ' বা "কৃপা শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' গ্রন্থ-দুখানির ভাষা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জন্ম-মুহূর্তে বাংলা গদ্যের সাধারণ রূপ কী অমার্জিত! অষ্টাদশ শতকে মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগীজ পাদরীদের গ্রন্থ দুখানি লিসবনে মুদ্রিত হয়। আর তার পঞ্চাশ বৎসর পরে কলকাতায় লেবেডেফ তাঁর নাটকে প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করেছেন। পর্তুগীজ প্রয়াসের যেমন কোন অনুসরণ ছিল না, লেবেডেফ-প্রয়াসেরও তেমনি কোন অনুবর্তন নেই। লেবেডেফ একেবারে নিঃসঙ্গ।

লেবেডেফ নাটক সাজিয়েছেন ইউরোপীয় আদর্শে; অংক-দৃশ্যবিভাগ করে নাটকের প্লট গেঁথেছেন। তাঁর Act হোল 'ক্রীয়া'; আর Scene হোল 'ব্যক্তা'। প্রথম ক্রীয়াতে দুইটি ব্যক্তা; দ্বিতীয় ক্রীয়ায় দুইটি ব্যক্তা, তৃতীয় ক্রীয়ায় তিনটি ব্যক্তা। অর্থাৎ এই তিন অঙ্কের নাটক সাতটি দৃশ্যসমন্বিত।

নাট্যকার বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করেছেন। যেটুকু তাঁর ব্যর্থতা, বাংলা ভাষা জ্ঞানের অপ্রতুলতা তার জন্য দায়ী। নাটকটিতে কোথাও কোন ক্লাইমেক্স নেই; স্পেনীয় কমেডির আদর্শ সম্মুখে রেখে এই ভ্রান্তিবিলাসমূলক প্রহসনের আখ্যায়িকা এগিয়ে গেছে। প্লটের গাঁথুনি সম্পূর্ণই স্পেনীয় কমেডিসুলভ। আর গল্পের motifটিও ঐ দেশের নাটক থেকে নেওয়া। নাটকের প্রতি দৃশ্য কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অঙ্কবিভাগেও কাহিনীর স্তরভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মনে হয়, চরিত্রচিত্রণ নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কমেডির নাট্যকারগণ চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা প্লটের বৈচিত্র্য সম্পাদনেই অধিকতর যত্নবান।

নাটকের কুশীলবদের মধ্যে পুরুষ চারজন, মেয়ে তিনজন। এছাড়া পুরুষ কান ও মায়্যা কান আছে। কান হোল কিন্নরের অপভ্রংশ; "গাউয়্যা, বাজিয়া" বলে নাট্যকার এদের পরিচয় দিয়েছেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সঙ্গীতশিল্পী অর্থে 'কান' শব্দটির প্রচলন ছিল। ঢপ্ কীর্তনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মধুসূদন ছিলেন কান অর্থাৎ কিন্নর। এই কানদের নাটকে উপস্থিতির কোন সার্থকতা নেই, গীতবাদ্য ব্যতীত। পরবর্তীকালে সঙ্গীত সৃষ্টির জন্য কি যাত্রায়, কি থিয়েটারে অনেক অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আমদানী করা হবে!

"পাণ্ডুলিপিতে কোথাও কোন গানের উল্লেখ নাই। নাটকটির বঙ্গানুবাদে গাউয়্যা-বাজিয়্যার কথা থাকিলেও বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কোন্ কোন্ গান লওয়া হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। (মদন-মোহন গোস্বামী-ভূমিকা-পৃ—১৪)। ডক্টর গোস্বামীর এই উক্তি সম্বন্ধে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু "অনুমান হয়, প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্যে এবং দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে গানগুলি সংযুক্ত হইয়াছিল।"[৬৯] এই উক্তি একটু সংশোধন-সাপেক্ষ। ১ম ক্রিয়া ব্যক্তা প্রথমে নাট্যকার লিখেছেন "নানান বাজিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন পোসাখেতে আর মখসের কাব্য করেন জানালার সম্মুখে।" বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল "To commence with vocal and Instrumental Music, called The Indian Serenade." সোজা কথায় যা যাত্রায় প্রচলিত ছিল, সেই নান্দীমুখ এবং ঐকতান বাদন সহযোগে পালা শুরু হোল।

দ্বিতীয় ক্রিয়ার দ্বিতীয় ব্যক্ততায় নাট্যকার 'পুরুষ কানের' ও 'ম্যায়া কানের' 'গান বান্দী' করার কথা বলেছেন। "The words of the much admired poet Shree Bharotchandro Roy are set to music"—এই প্রতিশ্রুতির

সার্থকতা ঘটিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের গানই তিনি ব্যবহার করেছেন। নিধুবাবু তখন সবে কলকাতায় এসেছেন (১৭৯৪); গান বাঁধতে শুরু করেননি। গোপাল উড়ের গান আরও পরবর্তীকালের ঘটনা। ·

এছাড়া ঐ বিজ্ঞাপনে আর একটি প্রতিশ্রুতি ছিল—"**Between the Acts some amusing curiosities will be introduced**". অঙ্কান্তরে নাট্যকার "**amusing curiosities**" দিতে চেয়েছেন। নিশ্চয়ই নিছক গাউয়্যা-বাজিয়্যার দ্বারা তা সম্পন্ন হতে পারে না। প্রথম ক্রিয়া ব্যক্ততায় প্রথমে তিনি বলেছেন "নানান বাজিয়ারা ভিন্ন ভিন্ন পোসাখেতে আর মখসের কাব্য করেন জানালার সম্মুখে।" ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত ও মুখোস পরিহিত এই কাব্যকারীরা হোল সঙ। নাট্যকার অঙ্কান্তরে এই সঙ মঞ্চে নামিয়ে দিতেন। নাটকে যেটুকু রঙদার ঘটনায় বিন্যাস আছে, তাকে আরও রঙ্‌দার করে দিয়েছেন।

তখনকার কলকাতার কলা-রসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এইভাবে ইউরোপীয় আদর্শায়িত নাট্য-রচনার বঙ্গীয় করণ সম্পন্ন হয়েছে। এই সঙ আমদানী করা ছাড়া ছিল দেশীয় ও বিদেশীয় যন্ত্র সহযোগে গঠিত এক ঐকতান-বাদনগোষ্ঠী। তারা দৃশ্য বা পটপরিবর্তনের ফাঁকে সঙ্গীত পরিবেশন কবত। "**To those musical instruments which are held in esteem by the Bengalees, will be added European.**" পরবর্তী কালে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য যে অর্কেস্ট্রা দল গঠন করেছিলেন, তার আদর্শ এখানে রয়েছে। ভারতীয় যন্ত্র তবলা, বেহালার পাশাপাশি ক্লারিওনেট, ফ্লুট এখানে স্থান পেয়েছিল। শুধু "**Commodious Theatre, on a plan of my own**" তিনি তৈরি করেন নি। প্লট-ভিত্তিক নাটক, মঞ্চ, ঐকতান-বাদন-ব্যবস্থা,—প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি বাংলা নাট্যশালার জন্য তিনি দিয়ে গেলেন। তাঁর নাট্যশালার অভিনয় "**attracted an over-flowing house.**" সে-যুগের রসরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার কারণে তিনি এই জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন, যদিও নাটক ছিল এক বিদেশী নাটকের ছায়া মাত্র।

কলাকৌশলে লেবেডেফের নাট্য-প্রয়াস আধুনিক, কিন্তু মেজাজে অষ্টাদশ শতকীয় কলকাতার অনুরূপ। তখনও রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস শুরু করেননি, তখনও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, হিন্দু কলেজ আরও বিশ বছর পরে দ্বারোদঘাটিত হবে; নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর

স্বতন্ত্র নবীন নাট্যবোধের জন্য উৎকণ্ঠা আরও দশ বৎসর পরে অনুভূত হবে। এই পরিবেশে তাঁর আধুনিক প্রয়াস হয়ে পড়ল সেই ইংরাজি প্রবাদের বাস্তব রূপায়ণ —"নতুন বোতলে পুরাতন মদ,"—আঠার শতকের মুৎসুদ্দি-বেনিয়ান-অধ্যুষিত প্রমত্ত কলকাতার মজলিশী উল্লম্ফনের সহযোগী রূপে বিদিত থাকল, উত্তরণের নবীন নায়ক হতে পারল না। তবু তিনিই প্রথম 'সেকুলার' নাটক দিলেন।

তিনি তাঁর কালের পূর্বে কলাকার হতে চেয়েছিলেন।

নবীনচন্দ্র বসু ও বাংলা রঙ্গমঞ্চ

॥ ১ ॥

নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টা ঠিক এই পর্যায়ে পড়ে না। (নবীন বসুর গৃহে প্রথম নাট্যাভিনয় হয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৬ই নবেম্বর।) অর্থাৎ তখন আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়ে গেছে—এমন কি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার-এর অভিনয় সম্পন্ন হয়েছে।

নবীন বসু এক অভিনব মঞ্চ তৈরি করেছিলেন ;

> "দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেকটিভ', মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতিজ্ঞান, উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটি বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। দেশীয় কারিগরদের দ্বারা কৃত হইলেও একটু নিপুন হাতে পড়িলে এগুলি আরও অনেক ভাল হইতে পারিত ; উহাদের মধ্যে রাজা বীরসিংহের প্রাসাদ ও তাঁহার কন্যার কক্ষ অঙ্কন একটু ভাল হইয়াছিল।"৭০

তিনি ঐকতান-বাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন ঃ

> "সুমধুর ঐকতান বাদনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ প্রভৃতি দেশীয় যন্ত্র হিন্দুরাই বাজাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই আবার ব্রাহ্মণ। ঐ বাদকদের মধ্যে বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতিশয় দক্ষতার সহিত বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং চারিদিকের শ্রোতাদের নিকট হইতে ঘন ঘন করতালি লাভ করিয়াছিলেন।"৭১

নবীন বসু তাঁর নাট্যশালায় নারী-চরিত্র অভিনয়ে অভিনেত্রী আমদানী করেন ; সম্ভবত লেবেডেফের দৃষ্টান্ত তখনও লোকে বিস্মৃত হয়নি। রাধামণি, জয়দুর্গা ও রাজকুমারী—এই তিনজন ছিলেন অভিনেত্রী।

নবীন বসুর বাড়ি নাট্যাভিনয়ে "যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্র পাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়।" নান্দীপাঠ সম্পন্ন হলে নাট্যাভিনয় শুরু হয়েছে। মোটামুটি শাস্ত্রীয় নির্দেশ এতে পালন করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করে অভিনয়ের বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া হোত। এ বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে, এ অভিনয় প্রচলিত নাটকের অভিনয় নয়। সংলাপ অদৌ ছিল না, তা নয়। কারণ, "প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও তার ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের ও নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়।"[৭২] কথা দুই একটি ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ভাব অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গী। সুন্দরের অভিনয় সম্পর্কে শুধু এই প্রসঙ্গটিই উল্লেখ করা হয়েছে। "এই চরিত্রের অভিনয়ে বারবার ও হঠাৎ ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া অথবা নায়িকার পিতা যাহাতে প্রণয়ের খেলা না ধরিয়া ফেলিতে পারেন, এইরূপ কৌশল দেখাইয়া অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। যুবা শ্যামাচরণ মাঝেমাঝে ভঙ্গী পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছে সত্য, কিন্তু অঙ্গ সঞ্চালন ও ভঙ্গী যেন ইচ্ছাকৃত ও আড়ষ্ট বলিয়া মনে হইল।"[৭৩] আসলে এ অভিনয় সংলাপ-ভিত্তিক অভিনয় ছিল না, কোন লিখিত নাটকেরও অভিনয় ছিল না, এ ছিল গীত ও পদ্য-আবৃত্তি-ভিত্তিক অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গী। এ ছিল নাট্যভিনয় অপেক্ষা 'Pantomime' বা মূকাভিনয়ের নিকটবর্তী। তখন ও গোপাল উড়ে আসরে দেখা দেন নি, তাই অঙ্গভঙ্গীর স্থলে নৃত্য দেখা দেয় নি। নতুন এই নাট্যানুষ্ঠান গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার মতই সংলাপহীন অভিনয়।

এমন কি গোপাল উড়ের পালায় যেমন কালুয়া-ভুলুয়া ছিল, এই নাট্যানুষ্ঠানেও কালুয়া-ভুলুয়া ছিল, স্বয়ং গীতিরাজ নিধুবাবু কালুয়ার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন। লেবেডেফ ভারতচন্দ্রের গান ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু পালা তাঁর নিজস্ব ; তাঁর পালা ভারতচন্দ্রের নয় ; কিন্তু ভারতচন্দ্রীয় আখ্যানের ভাবতুষ্ট গানই ছিল এই পালার ভিত্তি। বস্তুত পরবর্তীকালে

গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা'র উপর নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর নাট্যাভিনয়ের প্রভাব পড়েছিল এবং তার কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করেছিল। এবং নিধুবাবুর উপস্থিতিতে এই পালার সঙ্গীত-নির্ভরতার পথ মসৃণতর হয়েছিল। পরবর্তীকালে গোপাল উড়ের পালার বাঁধনদার কে, এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। গোপাল উড়ের পালার গান এক ব্যক্তি রচনা করেননি, এটা সর্বজন-স্বীকৃত ঘটনা। নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর নাটকের প্রযোজনায় নিধুবাবুর হাত ছিল, কিন্তু গানগুলি হয়ত সবই তাঁর রচনা নয়। খোদ ভারতচন্দ্রও সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন।

॥ ২ ॥

নবীন বসুর নাট্যাভিনয় নতুন নাট্য-ঔৎসুক্যের সঙ্গে যুক্ত নয়। প্রথমতঃ তাঁর নাট্যাভিনয়ের বিষয় আধুনিক যুবকদের কাছে রুচিহীন বলে পরিগণিত হয়েছে। এই নাট্যাভিনয়ে "এক হাজারের ওপর হিন্দু, মুসলমান, কয়েকজন ইউরোপীয় ও অন্যান্য নানা জাতীয় দর্শকের ভিড় হইয়াছিল।" তবু এ-নাটক নব্য সমাজের তৃপ্তির কারণ হয়নি। একা 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারী ক্রনিকল'-এর অভিমত বিরূপ ছিল, তা নয়। তখনকার নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিচালিত পত্রিকায় এই নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরবতা দেখতে পাই।

"আমাদের পত্রলেখক এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ রাখেন, তাহা আমরা জানি। তিনি প্রকৃষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন যে, এই সকল নাট্যাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার উন্নতি ত হয় না, বরং দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। এই সকল অভিনয়ে কোন নূতনত্ব, উপকার, এমন কি, শালীনতাও নাই।"[৭৪]

এই অভিমতটিকে একান্ত খৃষ্টীয় নীতিবাগিশতার নমুনা বলে অগ্রাহ্য করা যায় না।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে দুর্নীতিপরায়ণ মেয়েদের (immoral women) নাচের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছে।

১৮৩২ সালে ১৪ই এপ্রিল 'Enquirer' গাজনওয়ালাদের বিরুদ্ধে বলছে যে, দেশীয় বাবুরা যদি এদের প্রশ্রয় দেন, তাহালে 'should forsake all connections with refined societies."[৭৫]

১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' লিখছে :

> "The nautches have been losing their charms, and the only house where musicians and songsters of superior accomplishments were entertained this year was that of Rajah Radhacant.[৭৬]

১৮৪৩ সালে ঐ পত্রিকায় খুসির সঙ্গে জানাচ্ছে যে, "কলকাতায় দুর্গা পূজার সংখ্যাও ক্রমশ কমে যাচ্ছে।"[৭৭]

নাট্যানুষ্ঠান ও নীতিবোধ নিয়ে তখন নানা কাগজে আলোচনা হয়েছে।

১৮৪১ সালের মে মাসে ইংরেজি সংবাদপত্রে নাট্যশালার সঙ্গে খৃষ্টীয় নীতিজ্ঞানের কোথায় বিরোধিতা তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।[৭৮] এ আলোচনা খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে যাঁরা 'পিউরিটান' তাঁদের মত, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আলোচনার সূচনা দেখতে পাই 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায়। এই পত্রিকায় নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজের নানাবিধ অভিমত প্রকাশ পেত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ এ পত্রিকায় একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে :

> "Whether dramatic amusements are consistent with morality and religion ?'[৭৯]

মনে রাখা উচিত ; কেবল নারী-অভিনেত্রী প্রবর্তনের জন্য প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় নি ; নাটকের মূল আবেদন, বিষয়বস্তু ও অভিনয়রীতি কি প্রকার হবে, সে প্রশ্ন তখন সকলকে ভাবিত করেছে।

তবু নব্য শিক্ষিতসম্প্রদায় নাট্যানুষ্ঠানকে অন্যান্য সামাজিক প্রগতিমূলক অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত।

অন্যান্য 'সংস্কার' আন্দোলনের মত নব্যনাট্য প্রয়াসও ছিল একটা 'সংস্কার' (reform)। নবীন বসুর নাট্যানুষ্ঠানে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে ; কিন্তু তা নবীনের দিশারী নয়। কারণ—

১. বিষয়বস্তু নতুন ভাবনায় সমৃদ্ধ নয়।

২. অভিনয় কোন লিখিত নাটকের অভিনয় ছিলনা।

৩. এই নাট্যাভিনয় সংলাপ-ভিত্তিক অভিনয় নয়।

৪. সঙ্গীত-ভিত্তিক অঙ্গভঙ্গী ছিল এখানে মুখ্য ; প্রচলিত মঙ্গলকাব্য বা পদাবলী অবলম্বনে মূকাভিনয়।

৫। নবীন বসুর মঞ্চ বিক্ষিপ্ত মঞ্চ, এক এক দৃশ্য এক এক স্থানে অভিনীত হয়েছিল। আধুনিক অর্থে অখণ্ড সংহত মঞ্চ তখন রচিত হয়নি।

বোয়ালিয়ার নাট্যানুষ্ঠান

সম্ভবত বাংলায় লিখিত প্রথম নাটকের অভিনয় হয়েছিল কলকাতার বাইরে, মফঃস্বল সহরে। 'বেঙ্গল স্পেকটেটরে' আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পাচ্ছি :

> "The performers had neither talents, nor dress and what was worse they knew not even how to conduct the conversational parts. In fact the natives of the country are so great strangers to the theatrical performances that I advance nothing new when I say that the performances of the night was a mere mookery "[৮০]

বোয়ালিয়ার সরকারী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই অভিনয় হয়। অভিনয় হয়েছিল "Vidyasunder yatra on English fashion."

নবীন বসুর নাট্যাভিনয়ের মতই এ নাটক বিদ্যাসুন্দব কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পত্র লেখক একে 'বিদ্যাসুন্দর যাত্রা'ই বলেছেন। তবে "on English fashion"—এই বাক্যাংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে এর সঠিক চরিত্র।

এ নাট্যাভিনয় সঙ্গীত-ভিত্তিক ছিল না, কারণ, এখানে "conversational parts' ছিল। সম্ভবত এই সংলাপ-অংশই ছিল মুখ্য। তাই এই সংলাপ উচ্চারণের ব্যর্থতা পত্রলেখককে অতিশয় বিরক্ত করেছে।

এ-অভিনয় যদি সঙ্গীত-ভিত্তিক হোত, তাহলে ব্যর্থতা এতটা প্রকটিত হোত না। কারণ, ঐ জাতীয় অভিনয়-রীতি ছিল সে-যুগের প্রচলিত অভিনয়-রীতি। অভিনেতাদের অনেকেই কম বেশি সেই অভিনয়ে পারঙ্গমতা দেখাতে সক্ষম হোত।

বোয়ালিয়ার বিদ্যাসুন্দর 'যাত্রা' সত্য সত্যই নাটকজাতীয় রচনার অভিনয় ছিল, শুধু মঞ্চ-আশ্রিত মূকাভিনয় নয়। অপরিচিত এবং নতুন রীতির নাট্যাভিনয় বলে অভিনেতারা ব্যর্থ হয়েছিলেন অধিকতর মাত্রায়। ক্ষুব্ধ সমালোচক লিখেছেন, "the performance of the night was a mere mockery."

অনেক 'সিরিয়াস' নাটকের অভিনয়ে অনেক পেশাদার অভিনেতাও প্রহসন সৃষ্টি করে ফেলেন—এ নজির আমাদের হাতে অনেক আছে। কিন্তু

বোয়ালিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও নাট্য-প্রযোজক শারদাপ্রসাদ বসু যে অভিনয়োপযোগী আধুনিক নাটক প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন, এ কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নাটকটি মুদ্রিত হয় নি। তবু সমালোচকের বর্ণনা থেকে যেটুকু তথ্য উদ্ধার করা গেছে, তার থেকে বোঝা গেল, এটি একটি স্বতন্ত্র ধরণের নাটক। বাংলা নাট্য-রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্তর ফুটে উঠেছে।

কথাবস্তু গতানুগতিক, অভিনয় ব্যর্থ, কিন্তু সংলাপের গুরুত্ব স্বীকার করবার ফলে বোয়ালিয়ার নাট্যানুষ্ঠান নাটকের নবীন পথের দিশারী। মনে রাখা উচিত যে, বোয়ালিয়ার প্রধান শিক্ষক শারদাপ্রসাদ বসু কলকাতার নব্য সমাজের নেতা, তিনি ছিলেন হিন্দু বেনিভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসনের (১৮৩৮) প্রতিষ্ঠাতা।[৮১] এ-যুগে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটি নাট্যানুষ্ঠান করে; একটি ব্যতীত দুইটি বঙ্গভাষা-আশ্রিত। সেই দুইটিই লিখিত নাটকের আশ্রিত কতটা, এটা প্রশ্নসাপেক্ষ।

নাট্যকৌতূহল ও নাটকরচনা এক কদমে চলছে না।

পাদটীকা

১. Asiaticus—Philip de Stanhope.

২. Original Letters from India—Eliza Fay. Letter, dated 26th March, 1781.

৩. A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects (1801) Introduction—Herasim Lebedeff pp. vi.

৪. Cotton, H.E.A.-Calcutta Old and New, 1907.

৫. Calcutta Gazette—13 May, 1814.

৬. Calcutta Monthly Journal—Nov, 1824.

৭. ঐ — August, 1824.

৮. ঐ — August, 1824.

৯. Bengal Harkaru, 12 April, 1828.

১০. ঐ।

১১. Calcutta Monthly Journal, December 1825.

১২ Memoirs of Stocqueller.

১৩. India Gazette—22 June, 1833.

১৪. ঐ।

১৫. Calcutta Courier, 22 June, 1833

১৬. India Gazette—2 June, 1833

১৭. India Gazette—16 June, 1833

১৮ The Bengal Herald—12 February, 1842

১৯. The Calcutta Star—4 August, 1848

২০ কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র, প্রকাশভবন, কলিকাতা—১৩৭৪ ; পৃঃ—২১২

২১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত—ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী সংস্করণ।

২২. Letters from India—Emily Eden. Vol I.
P—231) -Edited by her Neice.

২৩. ঐ।

২৪ ঐ। পৃ--২৮০—২৮১

২৫. কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র। পৃ—২১৩-২১৫।

২৬. Bengal Harkaru, 15 August, 1848

২৭. আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র।

২৮. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ—১৩১

২৯. হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ণ বসু। পৃ—১।

৩০. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃ—১১৩

৩০ক. সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী, ১৮২৮।

৩১. সংবাদ প্রভাকর, ১লা চৈত্র, ১২৬০ বঙ্গাব্দ।

৩২. সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী, ১৮২৮।

৩৩. সমাচার দর্পণ, ২৬ জানুয়ারী, ১৮২৮।

৩৩. Calcutta Monthly Journal, Decmber 23, 1822.

৩৪. Calcutta Monthly Journal, Jan, 1824.

৩৫. ঐ, Jan, 1828.

৩৬. Bengal Chronicle, March 2, 1828

৩৭. ঐ, Jan 10, 1828

৩৮. John Bull, Jan 18, 1828

৩৯. Calcutta Monthly Journal, Feb 19,1829.

৪০. Bengal Chronicle, 1831, Jan 15.

৪১. Eden's Letters.—পৃ—২৬৫

৪২. Enquirer—August, 1831.

৪৩. ঐ, 15 September, 1831.

৪৪. Reformer, 20 December, 1831.

৪৫. The East Indian edited by H. L. V. Derozio.
20 September, 1831.

৪৬. Quoted in Calcutta Courier, 22 June. 1840

৪৭. সমাচার চন্দ্রিকা—২৪শে পৌষ, ১২৩৮.

৪৮. ঐ

৪৯. ঐ

৫০. সমাচার দর্পণ—১৪ জানুয়ারী, ১৮৩২

৫১. Reformer, 5 Jan, 1832.

৫২. Calcutt Monthly Journal, Jan. 1832.

৫৩. Enquirer, 10 Feb. 1832.

৫৪. Calcutta Courier, 9 June, 1835.

৫৫. Calcutta Literary Gazette—July, 1835.

৫৬. Bengal Hurkaru, 7 April, 1841.

৫৭. Calcutta Municipal Gazette—Annual Number, 1935.

৫৮. সমাচার দর্পণ, ২১ এপ্রিল ১৮৩২।

৫৯. সুবর্ণ বণিক সমাজের ইতিহাস-৩য় খণ্ড।

৬০. Stray Leaves—Soshee chunder Dutt. পৃ—৯৭.

৬১. Eurasian—1849.

৬২. Enquirer, 10 Feb, 1832.

৬৩. Reformer, 28 March, 1832.

৬৪. Calcutta Gazette, 5 November, 1795.

৬৫. কাল্পনিক সংবদল—মদনমোহন গোস্বামী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা। ১৯৬৩।

৬৬. ঐ পৃঃ—৯।

৬৭. ঐ পৃঃ—৯।

৬৮. A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects 1801. Introduction—Herasim Lebedeff.—(VI)
(৺ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত—ব. না. হ.)

৬৯. কাল্পনিক সংবদল—মদনমোহন গোস্বামী। পৃঃ—১৪।

৭০. Hindu Pioneer, 22 October, 1835 (৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ ব্যবহৃত)।

৭১. ঐ।

৭২. ঐ।

৭৩. ঐ

৭৪. Englishman and Military Chronicle, 1885. (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ; পৃঃ ২৫)

৭৫. Enquirer, 14 April, 1832.

৭৬. Bengal Spectator, 1842, Vol. I No. 9.

৭৭. ঐ, 1843, Vol. II, No. 7.

৭৮. Christian Observer, May, 1841.

৭৯. Bengal Herald, 14 March, 1841.

৮০. Bengal Spectator, August, 1842 (Vol. I, No. 6)

৮১. সংবাদ প্রভাকর, ২০শে মে, ১৮৩৮।

বাংলা নাটকের বিচলিত রূপ (১৮৩৬-১৮৫৭)

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে বাংলা নাটক রচনা শুরু হয়েছে ; কিন্তু সে-নাটক মঞ্চের সান্নিধ্য লাভ করছে না। কারণ, তখন পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালী নাট্যরসিকদের দুইটি ধারণা ছিল, এক বিলাতী ষ্টেজে ইংরেজি নাটকই শুধু অভিনীত হতে পারে ; দ্বিতীয় ধারণা —বাংলা ভাষায় কোন সুরুচি-সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে না। এই দুইটি ধারণাই ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হোল। এই যুগে নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থী দুই দলই নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, কিন্তু মঞ্চ দখল করে থাকছে ইংরেজি নাটক। অর্থাৎ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারেব প্রভাব অতিক্রম করা যাচ্ছে না।

বোয়ালিয়া স্কুলের ছাত্রেরা বাংলা নাটক অভিনয় করছে, কিন্তু শহর কলকাতার স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ইংরেজী নাটকেব মোহ ত্যাগ কবতে পারছে না।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁ-সুচি রঙ্গমঞ্চে বৈষ্ণবচরণ আঢ্য অবতবণ করেছিলেন, সে মঞ্চই ছিল ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের জন্য সংরক্ষিত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বটতলায় ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্রেবা সেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনয় করেন ; এ অভিনয় নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় নয়, সমগ্র নাটকের অভিনয়। এই প্রথম একান্তভাবে ছাত্রদেব দ্বারা সমগ্র নাটক অভিনীত হোল।

"গত শুক্রবার সন্ধ্যার পরে 'হেয়ার একাডিমি' নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পুনর্বার ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপীয়ার সাহেব প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থেব 'মারচেন্ট অব ভেনিস' নামক নাটকের অনুরূপ দেখাইয়া বহু লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের গৃহে প্রায় ৬০০।৭০০ এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী, কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য লোক ও সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই উক্ত ছাত্রগণের নিকট যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন···বিচারাগারের অনুরূপ শোভা দর্শন ও তাহার প্রশ্ন, বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া অনেকে হেয়ার একাডিমিকে সাঁসসশি থিয়েটার বোধ করিয়াছিলেন।"[১]

দেশীয় কিশোরদের এই অভিনয় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নাট্যানুষ্ঠানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে খবরটি স্মরণযোগ্য। সেকালের

অন্যতম খ্যাতিমান নাট্যশিক্ষক মিঃ ক্লিঙ্গার ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছিলেন। মিঃ ক্লিঙ্গার ছিলেন 'ক্যালকাটা মাদ্রাশা'র ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ! এই ক্লিঙ্গারের অধিনায়কত্বে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রেরা 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' সংগঠিত করেন। তাঁরা ওথেলো মঞ্চস্থ করেছিলেন। এই অভিনয়ের তারিখ হোল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর। "This is the first time that an English play has ever been acted by a corps composed entirely of Hindoo youths."[২] এই মঞ্চে 'ওথেলো' পুনরভিনীত হয়েছিল। দ্বিতীয় নাটক তাঁরা অভিনয় করেছিলেন 'মার্চেন্ট অব ভেনিস।' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ এই অভিনয় হয়। 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'ও পুনরভিনীত হয়েছিল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই মঞ্চে সেক্সপীয়রের 'হেনরি দি ফোর্থ' ও হেনরি মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' অভিনীত হয়।

প্রায় একই সময়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ইংরেজি নাটক হোল অভিনীত। এই রঙ্গশালার প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্যারীমোহন বসু; ইনি নবীন বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৩রা যে এই মঞ্চে 'জুলিয়াস সিজার' অভিনীত হয়। সংবাদ প্রভাকর জানাচ্ছেন :

> "প্যারীমোহন বসুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যান্য মনোহর ও নয়ন প্রফুল্লকর দ্রব্যাদির দ্বারা বিশেষ রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ নাট্যশালার শোভা বর্ণন করা যায় না, উক্ত হৃদয়বিদীর্ণকর নাট্যকাণ্ড প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যে ধারে যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক হয় সেইধারেই সেই সেই দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা শোভিত হইয়াছিল। ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিয়াছিলেন……"

এই দুইটি রঙ্গমঞ্চই স্থায়ী হয়নি; উদ্যোগ আয়োজনের অপ্রতুলতা ছিল না, তবু স্থায়ী হয়নি। কারণ কি?

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক দুঃখ করে লিখেছিলেন যে, কলকাতার ধনীলোকেরা ইতর তামাশা—বুলবুলি পাখীর লড়াই ও নাচওয়ালীর জন্য অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেন না, অথচ নাটকের মত বিশুদ্ধ ও উন্নত স্তরের আমোদের জন্য সাহায্য করতে নারাজ। কিন্তু সমস্যা এখানে নয়। সমস্যার মর্মকথা রয়েছে নিধুবাবুর ঐ গানে—

বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা!

Citizen পত্রিকায় ঠিক ঐকথাই বলা হোল:

> "We see no reason why they should not infuse a little more of nationality in their efforts...The Bombay Hindoos have set an example in this respect to the Bengalees which they would do well to imitate—they have got up a theatre where they represent the most approved portions of the ancient Hindoo drama"
>
> (Citizen, May 13, 1854)

১২ই মে Hindu Patriot জোড়াসাঁকোর থিয়েটারের অভিনয় সমালোচনার শেষে লিখেছেন: "Let the Zorasankowallas take in hand a couple of good Bengallee plays and we will promise them sucecss."

১৮৫৫ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারী ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অভিনয় প্রসঙ্গ বর্ণনাচ্ছলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও এই কথা বলেন:

> "We wish also that the managers of the Oriental Theetre will hereafter think of getting up Bengallee plays after the manner of our very spirited brethren of Bombay who are now starring it at the Grant Road Theatre"
>
> (Hindu Patriot, Feb, 22, 1855)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও বোম্বাইএর এই সংবাদটি পরিবেশিত হয়।

'তথাকথিত' নাটক

সমস্যা নাটক নেই তা নয়। নাটক আছে। কিন্তু মঞ্চোপযোগী নাটক নেই। পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করে সাতখানি 'নাটক' আবিষ্কার করেছেন; এই সাতখানি 'নাটক'ই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রচিত বা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সাতখানি নাটক' হোল যথাক্রমে—

১. আত্মতত্ত্বকৌমুদী—প্রবোধচন্দ্রোদয়ের বাংলা অনুবাদ—১৮২২
২. হাস্যার্ণব—১৮২২ (অনুবাদ)
৩. কৌতুকসর্বস্ব—১৮২৮—(অনুবাদ)—রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার
৪. বিল্বমঙ্গল—দ্বারিকানাথ রায়—১৮৪৫

৫. অভিজ্ঞান শকুন্তল—১৮৪৯—রামতারক ভট্টাচার্য।

৬. প্রবোধচন্দ্রোদয়—১২৪৬ (প্রকাশ পরবর্তী কালে ১৮৭২)—বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন।

৭. প্রেমনাটক— } পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

৮. রমণী নাটক } ১২৪৮ ও ১২৬০ বঙ্গাব্দ

"পয়ারে বা ত্রিপদীতে কথোপকথন, পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক দীর্ঘ সমাসবদ্ধ বক্তৃতা কখনই অভিনয়ের উপযুক্ত হইতে পারে না।" আত্মতত্ত্বকৌমুদী, বিল্বমঙ্গল, প্রবোধচন্দ্রোদয় যদি নাটক পদবাচ্য হয়, তাহলে নবদ্বীপের ন্যায়চর্চার কেন্দ্রগুলি এক একটি নাট্যশালা এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায়তত্ত্বচিন্তামণি একখানি নাটক। নাটকোচিত বিষয় অবলম্বনে এগুলি রচিত নয়।

'হাস্যার্ণব' ও 'কৌতুকসর্বস্ব' সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মন্তব্য উদ্ধার করা গেল :

> তাহাতে (হাস্যার্ণবে) নাটকচ্ছলে কামপবরশ মূর্খ রাজা, লোভী মন্ত্রী, অজ্ঞ চিকিৎসক, ভীরু সেনানী প্রভৃতি জঘন্য অকর্মণ্য রাজকর্মচারিদিগের তিরস্কৃত করা হইয়াছে। যদিচ তাহা সম্যক হাস্যজনক ও সুতীক্ষ্ণ হইয়াছে বটে, তত্রাপি তাহা অশ্লীলতা দোষে দূষিত হওয়াতে অনেকের পক্ষে আদরণীয় নহে। তৎকালজাত কৌতুকসর্বস্ব নাটক তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। পরন্তু তদুভয়ই সংস্কৃত ভাষাজাত; তাহা বাঙ্গালির শরক্ষেপ-বাক্যের প্রসঙ্গে কেবল উপমাকল্পে উল্লিখিত হইতে পারে। (বিবিধার্থ সংগ্রহ)

দ্বিতীয়ত এগুলি নাটকের গঠনরীতি মেনে চলেনি; ডাঃ সুকুমার সেনের মতে, "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'নাটক' নামে অনেক বই গদ্যে পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে লেখা হইয়াছিল। এগুলি হয় সংস্কৃত পাঠ্য অনুবাদ, যেমন রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের "কৌতুকসর্বস্ব নাটক" (১২৩৫), নয় আদিরসাত্মক বা উপদেশ মূলক আখ্যায়িকা বা নক্সা, যেমন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (১৮৪৮) ও 'প্রেমনাটক' (১২৬০) এবং দ্বারিকানাথ রায়ের 'বিল্বমঙ্গল নাটক' (১৮৪৫)। এগুলিকে বাঙ্গালা নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করা ভুল।"[৩]

'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' ও 'হাস্যার্ণব' আদৌ নাটকের আকারে লেখা নয়। সাধারণ সন্দর্ভ জাতীয় রচনার মাধ্যমে গল্পদুটি বলা হয়েছে—অনেকটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'ভ্রান্তিবিলাসে'র মত।

ব্রজেন্দ্রবাবু নীলমণি পালের রত্নাবলী নাটকের অনুবাদের উল্লেখ করেছেন ; এ-অনুবাদও আখ্যানমূলক রচনার আঙ্গিকে লেখা।

'প্রহসন' ব্যতীত সবগুলি রচনাই রূপক। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রূপকের অর্থ নাটক। কিন্তু এখানে 'রূপক' শব্দটির অর্থ-সংকোচন ঘটেছে। এই সঙ্কীর্ণ অর্থে নাটক ও রূপক সমার্থক হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবিতাও এইভাবে রূপকধর্মী হয়ে পড়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রূপক ও কবিতা সমার্থক হয়ে পড়েছিল।[৪]

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'প্রেম নাটক' ও 'রমণী নাটক' গ্রন্থদ্বয়ে শুধু নামটুকু ছাড়া নাটকত্ব কিছুই নেই। শ্যামপুকুর পল্লী অধিবাসী এই ভদ্রলোকের গ্রন্থদ্বয়ের সঠিক মূল্যায়ন প্রথম করেন শরচ্চন্দ্র ঘোষাল 'নারায়ণ' পত্রিকায়। '১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ--২০১) "উভয় গ্রন্থের নামের সহিত নাটক 'শব্দ' আছে বটে, কিন্তু বস্তুত গ্রন্থ দুখানি কাব্য, পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত।"

এই ধরনের গ্রন্থ 'নাটক' নামে অভিহিত হবার কারণ কি? "যদুনন্দন দাস রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধবে'র, প্রেমদাস 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ে'র ও লোচনদাস 'জগন্নাথ বল্লভে'র বঙ্গানুবাদ করেন। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কাব্যাকারেই নাটকগুলি অনূদিত হইয়াছিল, অথচ অনুবাদকগণ নামকরণের সময় নাটক নাম বজায় রাখিয়াছিলেন। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কাব্যাকারে অনুবাদিত নাটক দেখিয়া নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা পোষণ করেন ও পয়ারাদি ছন্দে লিখিত কাব্যকেও নাটক বলিতে পারা যায়, এই বিশ্বাসে নিজের 'রমণী' ও 'প্রেম নাটক' কাব্যদুখানির 'নাটক' নাম দিয়াছিলেন।"[৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নাটক সম্বন্ধে বাঙ্গালীর ভ্রান্ত ধারণার নজির হয়ে রয়েছে এই গ্রন্থগুলি। আসলে বাংলা দেশে লিখিত নাটক অনুপস্থিত থাকায় এবং শাস্ত্রসম্মত নাটক অপ্রচলিত হওয়ায় এই ধরণের কাব্যাকারে লিখিত গ্রন্থ নাটক নামে অভিহিত হয়েছে।

আর এই তথাকথিত 'নাটক'গুলির ওপর পরিবর্তিত সমাজ-প্রভাব আদৌ অনুভূত হয়নি। এগুলি ছিল পুরাতনের রোমন্থন।

অনভিনীত বাংলা নাটক : আধুনিক আদর্শ-অনুসারী

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক আদর্শে মঞ্চোপযোগী বাংলা নাটক লিখিত হতে শুরু করে। অথচ এই নাটকগুলি মঞ্চের দাক্ষিণ্য

অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। কোন কোনটি অভিনীত হবে বলে পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অভিনীত হয় নি। অভিনীত না হলেও এগুলি আধুনিক নাটকের জন্য বাঙ্গালীর আন্তরিক চাহিদার প্রমাণ; নাটকের আধুনিক ইতিহাসের প্রস্তুয়মান অধ্যায়ের উপকরণ।

এই আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে প্রথম প্রকাশিত হয় জি. সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস (১৮৫২, কলিকাতা)। জি. সি. গুপ্তের প্রকৃত নাম কি, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মোটামুটি স্বীকৃত হয়েছে যে, তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। খুব একটা পরিচিত বা খ্যাতনামা তিনি না হতে পারেন, সে যুগের কোন না কোন নব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত থাকবেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। আমরা বেথুন সোসাইটির সদস্য তালিকায় তাঁর নাম পাচ্ছি। প্রায় একই সময়ে রচিত ভদ্রার্জুন নাটক (১৮৫২, কলিকাতা)। এই নাটকের লেখক হলেন তারাচরণ শীকদার, তিনি ছিলেন হিন্দুস্কুলের গণিত শিক্ষক।

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' গ্রন্থে বলেছেন, "ভদ্রার্জুন নাটক বাঙ্গালা ভাষার প্রথম প্রকাশিত নাটক। তারপরে ভানুমতীচিত্তবিলাস।" কীর্তিবিলাস নাটকের প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম ডক্টর সুকুমার সেন উল্লেখ করেন। ডঃ সেনের মতে "রচনা অমার্জিত এবং বিশৃঙ্খল হইলেও বিষাদান্ত নাটকরচনায় প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া কীর্তিবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে।"[৬] রেভারেণ্ড লঙ তাঁর মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকায় লেখকের নাম দিয়েছিলেন জি. সি. গুপ্ত। তাই কেউ কেউ এঁকে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বলে অনুমান করেছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্র যে কৃতবিদ্য ছিলেন, সে খবর তাঁর ভূমিকা পড়লেই জানা যায়। ভূমিকায় এ্যারিষ্টটলের ট্রাজেডিতত্ত্ব আলোচনা করেছেন, এমন কি সেনেকা-প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। তিনি অবহিত ছিলেন যে, শুধু ভিন্ন আঙ্গিকে নয়, তিনি ভিন্ন রসে নাটক রচনা করছেন।

"ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরি ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে, আপদগ্রস্ত হইতে হইবে না, এমত নহে।

অস্মদ্দেশীয় লোকেরা করুণাভিনয় করিয়া অবশেষে সেই ব্যক্তির সুখাভিনয় করিলে ইহা না করিলে অধর্মভোগী হইতে হইবে ইহা স্থির জানিতেন। অদ্যাবধি যাত্রার সময়ে কোন বীরের মরণান্তর সেই বীরের উদ্ধার না করিয়া যাত্রা বন্ধ করে না।

দেশ বিশেষে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতল দেশ নিবাসিগণ স্বভাবত প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণ দেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সদাই অভিলাষী।"[৭]

'কীর্তিবিলাস পঞ্চাঙ্ক নাটক। Act এখানে 'অঙ্ক' নামে অভিহিত হয়েছে, তবে scene অর্থে 'অভিনয়' ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমাঙ্কে দুইটি 'অভিনয়', দ্বিতীয়াঙ্কে চারিটি অভিনয়, তৃতীয়াঙ্কে ২, চতুর্থাঙ্কে ৪, পঞ্চম অঙ্কে ৫--এই সর্ব সাকুল্যে ১৭টি অভিনয় বা দৃশ্যে নাটক সম্পূর্ণ।

কীর্তিবিলাসের লেখক এত আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও নান্দী ব্যবহার করেছেন। নান্দ্যন্তে সূত্রধারও এনেছেন। লেখক বোধ হয় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন; কারণ, নান্দীতে আমরা পাচ্ছি—

তাঁরে ভজ মন, করেন যে জন, সতত সৃজন, পালন লয়
ত্রিলোক তারণ, ত্রিলোক ধারণ, অনাদি নিধন, করুণাময়।

এই সঙ্গীতে ব্রহ্মসঙ্গীতেরই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি। প্রচলিত হিন্দু দেবদেবী-ভজনার নামগন্ধ এতে নেই। নাটকের শেষে একটি ভরতবাক্য আছে

এই ছিল, এই গেল, এইরূপে সকলে।
সব ভুলে, কুতূহলে, ভাসে সুখে কমলে।

ইত্যাদি।

'কীর্তিবিলাসে'র গল্প অনেকটাই হ্যামলেট থেকে গৃহীত; তবে লেখক সেই বিদেশী প্লটকে বসিয়েছেন আমাদের রূপকথার আধারে।

'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' নিয়ে এদেশে বহু রূপকথা প্রচলিত আছে। কাঙাল হরিনাথের সে-যুগের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'বিজয় বসন্তে'র আখ্যান-অংশও তাই। তবে কাঙ্গালের গ্রন্থ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিক থেকে 'কীর্তিবিলাস' আধুনিক যুগে রূপকথাকে নতুন অর্থে প্রথম ব্যবহার করেছে।

রাজ্যের নাম হেমপুর, রাজার নাম চন্দ্রকান্ত, তাঁর দুই ছেলে জ্যেষ্ঠ কীর্তিবিলাস আর কনিষ্ঠ হলেন মুরারি। রাজা চন্দ্রকান্ত বৃদ্ধবয়সে বিপত্নীক

হলে নলিনী নাম্নী এক তরুণীকে বিবাহ করলেন, আর তার ভাইকে করলেন পরামর্শদাতা। রাজার আর একটি পারিষদ জুটল, তার নাম প্রাণনাথ; সে যেমন লম্পট, তেমনি দুরাচার। কীর্তিবিলাস তার লাম্পট্যে বাধা দিতে গিয়ে চক্রান্ত জালে জড়িয়ে পড়ল। আর সেই চক্রান্তজাল আরও দৃঢ়ীভূত হোল, যখন বিমাতা নলিনী তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হোল। কীর্তিবিলাস এই বিষ-প্রেম প্রত্যাখ্যান করল; রাণীর ধারণা হোল যে, কুমার শুধু প্রত্যাখ্যান করেনি, তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছে। নলিনী রাজার কানে অনেক বিষ উদ্গীরণ করল।

বৃদ্ধ স্ত্রৈন রাজা কীর্তিবিলাসের প্রাণদণ্ডাদেশ দিলেন, পরে অবশ্য তিনি সেই আদেশ রহিত করলেন। এবং নিজে অসুস্থ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, ইতিমধ্যেই তা হয়ে গেছে। কীর্তিবিলাসের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখে তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী ভাবলেন, কীর্তিবিলাস নিশ্চিতই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তিনি আত্মহত্যা করলেন। ঠিক সেই সময়েই কীর্তিবিলাস তাঁব পত্নী সকাশে এসে হাজিব হলেন, পত্নীর এই শোচনীয় পরিণতি দেখে নিজেও আত্মঘাতী হলেন।

লেখক ইচ্ছা করেই হ্যামলেটের মূল কাহিনীর সঙ্গে বড় রকমেব পার্থক্য বজায় রেখেছেন। মাকে বিধবা না করে পিতাকে বিপত্নীক করেছেন। কারণ এদেশে বিধবা রমণীর পুনর্বিবাহ প্রচলিত নয়। আর তা ছাড়া কীর্তিবিলাসও ঠিক হ্যামলেটের মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও আত্মজিজ্ঞাসাবিব্রত যুবক নয়। তবু গল্পের পরিণতি একই প্রকার। তত্ত্ব হিসাবে ট্রাজেডি হয়ত কিছুটা বুঝেছিলেন, কিন্তু প্রয়োগে সার্থক লেখক তত হননি। কারণ এখানে মৃত্যু, আত্মঘাতন—সবই আছে, কিন্তু যে মানবিক স্পর্শ থাকলে তা হৃদয়বিদারী তাৎপর্য পায়, তা এখানে কই? শুধু বিয়োগ বা মৃত্যু-ঘটনা-ই সে-যুগে একটা অভিনব ব্যাপার ছিল। সম্ভবত গুপ্ত মহাশয় ঐটুকু সম্পন্ন করতে পেরেই নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেছেন। রচনার মধ্যে সেই 'high seriousness' কোথাও নেই, তবে 'seriousness' আছে। কারণ লেখক গল্পকে প্লটে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন; সেই কারণে অবান্তর বিষয় কিছুমাত্র নেই। এমন কি ঘটনা যাতে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে, এই নিমিত্ত দৃশ্যসমূহ খুবই সংহত করে রচনা করেছেন। কোন কোন দৃশ্য মাত্র এক পৃষ্ঠায় শেষ করা হয়েছে (১।২, ১।৪)।

লেখকের ভাষা ছিল নাটকের উপযোগী। কেউ কেউ বলেছেন "তাহাতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।" ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব অবশ্যই আছে, তবে লেখক ঐ ভাষার অতিশয্য সংশোধিত করে নিয়েছেন। কথকতার ভাষারীতি অবলম্বিত হয়নি।

লেখক পয়ার ব্যবহার করেছেন; নন্দলাল রায়ের মত সে-পয়ার পাত্র-পাত্রীদের অধিকারের বাইরে তুলে রাখা হয়নি। নন্দলাল রায়ের পয়ার নাটকের কুশীলবের মুখে স্থান পায়নি, ওটি অধিকারী বা সূত্রধারেব মুখে আরোপিত হয়েচে।

সহচরী। কি হেতু করিল মান প্রতিজ্ঞা এমন।
রাজপুত্র। কি কারণ কর মান জাননা কখন। (৩।১)
প্রাণনাথ। কেন কেন বিধুমুখি বিরস বয়ান।
বিষাদিত কেন দেখি কহ নারে প্রাণ॥
স্বর্ণলেখা। অহরহ কার রূপ বিরাজিত মনে।
সেজন ত্যজিয়া মোবে ভাবে অন্যজনে॥ (৪।২)

এখানে পয়ার নাটকের ভাষা-সীমা লঙ্ঘন করেনি, কথোপকথনের যা ধর্ম, সেই পালটা-পালটি জবাব দেবার তাগিদ এখানে বজায় থেকেছে। কয়েকটি গান আছে, কিন্তু গানে কোন কথোপকথন হয়নি। অর্থাৎ দাশু রায় কলমের ডগায় ভর করেননি।

কথোপকথনের ধর্ম গদ্য-সংলাপে আরও পরিষ্কার ফুটেছে। গদ্য-সংলাপ অতিশয় তির্যক, এবং নাটকোচিত।

রাজপুত্র। তুমি এক্ষণ কোথায় গমন করিতেছ?
প্রাণনাথ। মহারাজের অন্বেষণে।
রাজপুত্র। যথার্থ?
প্রাণনাথ। আজ্ঞা হাঁ।
রাজপুত্র। স্বরূপ?
প্রাণনাথ। হাঁ মহারাজ।
রাজপুত্র। অবিকল কহ?
প্রাণনাথ। মহারাজ, আমি কি মিথ্যা কহিতেছি।

বাংলা নাটকে এই সংলাপের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা আছে। কিন্তু সে-যুগে এ নাটক অভিনীত হয়নি. জনপ্রিয়তাও লাভ করেনি নাট্যসাহিত্য

হিসাবে। বাংলা নাটকের আদি যুগে পাঠ্যনাট্য হিসাবে কোন বস্তু ছিল না।

তারাচরণ শীকদার

একই বৎসরে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটক প্রকাশিত হয়। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাটক বিরচিত; এ নাটকে কোন নান্দী নেই। তবে আছে 'আভাস'।[৭] ভদ্রার্জুনের সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন, "নাট্যারম্ভেব পূর্বে এই কবিতাটি সুর করিয়া পড়িতে হইত কিনা বলা যায় না।" আমাদের মতে এই অংশ সুর করে 'পডা' হোত, 'পড়া' অর্থাৎ কথিত হোত, যাত্রার অধিকাবীব মত। এই নাটক একবার অভিনীত হবে বলে শোনা গিয়েছিল

"Harkaru states that the Oriental Seminary students intend this year to act a vernacular drama Bhadra Urjoon."[৮]

কিন্তু অভিনীত হয়েছে. এই মর্মে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয়নি।

লেখক নাটকটি যে আধুনিক রীতি অনুসারে লিখেছেন, একথা ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন:

"এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউবোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-পদ্য রচনায় নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাটকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইউরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে। সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, তাহাকে ইংরেজি ভাষায় (Act) একট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) একট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে। তন্নিমিত্ত সিন (Scene) শব্দের পরিবর্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই (Scene) সিন কহে।

* * *

এই গ্রন্থ ইউরোপীয় নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম।"

তারাচরণ শীকদার তাঁব সময়ে অনূদিত সংস্কৃত নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ যথার্থই করেছেন।

"আক্ষেপের বিষয় এই. যে এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আঁসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয় কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই উহার মূল কারণ।'

লেখক এই অভাব দূরীকরণের জন্য মহাভারতের আদিপর্ব থেকে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সংকলন করে এই নাটক রচনা করেছেন।

প্রথম অঙ্কে ১ম সংযোগস্থলে নারদ এসে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন যে :

"তোমরা পঞ্চভ্রাতা পাঞ্চালীর স্বামী, এই হেতু তোমাদিগকে কহি, তোমার আপন আপন মধ্যে এক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া কৃষ্ণাসহ বাস কর।

"তোমরা এক একজন দ্রৌপদীর সহিত কালক্ষেপণ করিবে, এবং একের সময়ে অন্য যিনি দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত তীর্থপর্যটন করিতে হইবেক, নতুবা সে পাপ ধ্বংস হইবেক না।"

এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই এক ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধারের জন্য অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কক্ষে প্রবেশ করতে বাধ্য হলেন, তখন যুধিষ্ঠির পাঞ্চালীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ফলে অর্জুনকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তীর্থযাত্রায় বহির্গত হতে হোল। নাটকের ১ম অঙ্ক এইখানে শেষ হোল।

দ্বিতীয় অঙ্ক তিনটি দৃশ্য বা সংযোগস্থলে সম্পূর্ণ। দ্বারকায় বসুদেবের অন্তঃপুরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বসুদেবের উৎকণ্ঠা হোল সুভদ্রাকে শীঘ্রই পাত্রস্থ করা।

সম্প্রাপ্ত যৌবনাবস্থা সুভদ্রা সম্প্রতি।
অনূঢ়া রাখিতে নাই এমন সন্ততি।

বসুদেবের অন্তঃপুরচারিকারাও একই রকম উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে আছে নয়টি সংযোগস্থল। অর্জুনের প্রতি সুভদ্রার পূর্বরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে বলভদ্র স্থির করেছেন যে, তিনি সুভদ্রাকে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করবেন। নারদকে দূত করে দুর্যোধনের কাছে বার্তা পাঠান হোল।

চতুর্থ অঙ্কে তিনটি সংযোগস্থল আছে। এখানে সব কয়টি দৃশ্য হস্তিনাপুরে ঘটেছে। দুর্যোধন বিবাহ করতে চলেছেন, পাণ্ডবেরাও বরযাত্রী হলেন।

তাঁরা বরযাত্রী কেন ? কল্যাণের লোভে ? তাঁরা তো পূর্বাহ্ণে অবগত হয়েছেন যে, অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ ঘটে গেছে। যুধিষ্ঠির যুক্তি দিলেন—

সদ্ভাবে গমন কর না কর কলহ।
বরযাত্র ভাবে যাও কৌরবের সহ॥
অর্জুন নিকটে নাই তাহে ভীত মন।
যদি উপস্থিত হয় কে করিবে রণ॥

অন্য পরে কা কথা, যাত্রার পূর্বে দুর্যোধনের সঙ্গে স্বয়ং ভীম একটু ঠাট্টা-তামাসা করলেন।

পঞ্চম অঙ্কে দশটি সংযোগস্থল। দুর্যোধনের বিবাহ সাধ অপূর্ণ রইল, অধিকন্তু যৎপরোনাস্তি অপমানিত হলেন। কৌরবেরা সদলে হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন; বলভদ্রের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। তিনি অভিমানভরে জানালেন—

এখন দুঃখের পাশে কি করিব গৃহ বাসে
লোকালয়ে না রহিব আর।
ছাড়ি সবে মম আশ সুখে কর গৃহ বাস
সব আশা ঘুচেছে আমার।

নাটক এইখানেই শেষ হোল।

নাটকে মহাভারতীয় ঘটনাকে যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে। ঘটনা বর্ণনাই করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও সেই ঘটনাকে কোন সঙ্কটে দাঁড় করান হয়নি। লেখক গদ্য-পদ্য মিশিয়ে সংলাপ লিখেছেন। পয়ারই সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্বগত-উক্তির ক্ষেত্রে বা মান-অভিমান বা আবেগ-বিধৃত সংলাপের জন্য ত্রিপদী সংরক্ষিত হয়েছে।

এ দেখি বিষম দায় কি করিব সদুপায়
দুই দিক হইল বিপদ।
অবিচার ধর্মরাজ্যে বেঁচে থাকি কোন কার্যে
ইহাতে কি পাইব সম্পদ।

নাট্যকার বলেছেন—'অর্জুন আপন মনে বিতর্ক করিতেছেন।'

মোট চারিটি ক্ষেত্রে ত্রিপদী ব্যবহৃত হয়েছে।

পয়ারের ব্যবহারে বেশ অভিনবত্ব আছে। পয়ারের মধ্যে লেখক খানিকটা সংলাপীয় ধর্ম প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছেন।

অর্জুন। কে-তুমি এখানে কর আক্ষেপ প্রকাশ।

ব্রাহ্মণ। দেখহে অর্জুন মম হয় সর্বনাশ॥

অর্জুন। কি কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন।

কিবা হেতু সর্বনাশ হইল ঘটন॥

ব্রাহ্মণ। বৎসর রাজস্ব যদি এমন হইবে।

ধনপ্রাণ রক্ষা তবে কোথায় পাইবে॥

অর্জুন। বিশেষ করিয়া বল ?

ব্রাহ্মণ। আমার গোধন।

অর্জুন। তাহার কি ঘটিয়াছে ?

ব্রাহ্মণ। যায় গাভীগণ

অর্জুন। বিশেষ করিয়া তার কহ বিবরণ।

ব্রাহ্মণ। ধর্মরাজ্যে অরাজক হয় কি কারণ ? (১।২)

সংলাপ-ব্যবহারে অন্যত্রও একই রীতি ব্যবহৃত হয়েছে—

দ্রৌপদী। অর্জুন কি বলিতেছে।

যুধিষ্ঠির। তীর্থেতে যাইবে।

দ্রৌপদী। কিরূপে সম্ভব ইহা।

অর্জুন। অন্যথা হইবে।

দ্রৌপদী। কি কাবণে হেন উক্তি।

অর্জুন। সন্ধি লঙ্ঘিয়াছি।

দ্রৌপদী। লঙ্ঘিয়াছ তাহাতে কি ?

অর্জুন। দোষী হইয়াছি।

দ্রৌপদী। কিসে সন্ধি ভঙ্গ হোল।

অর্জ্জুন। তোমার গৃহেতে।

যবে তুমি ছিলে ধর্মরাজের সনেতে॥ (২।৩)

পয়ার ত্রিপদী ছাড়া একবার মাত্র একাবলী ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্য সংলাপ সম্পূর্ণই সাধুভাষায় লেখা। এমন কি বাতুল, মদ্যপায়ী ও পথিকের সংলাপের ক্রিয়াপদে পর্যন্ত সাধুভাষার রূপ বর্তমান। তবে মাঝে মাঝে দুই এক ছত্রে কথ্য ভাষার প্রয়োগ আছে।

মদ্যপায়ী। কয় পাত্র, —ওরে শালা অগুন্তি—অগুন্তি। সেই সকালে আরম্ভ করিয়াছি, আবার অর্জ্জুনকে দেখে আবার খাব।

আজ বড় আমোদ তুই বেটা পাগল বৈত নৈস। তুই কি জানবি, তোর বুদ্ধি আছে, না জ্ঞান আছে! (৩।৫)

এ নাটকে তিনটি গান আছে। প্রথম গানটি নারদের মুখে বসিয়েছেন। এই গানটি অনেকটা মঙ্গলাচরণের মত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গান তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম সংযোগস্থলে দেখতে পাই। এই দৃশ্যটিই কল্পিত হয়েছে নাটকীয় 'রিলিফ' (**dramatic relief**) সৃষ্টির জন্য। সেকালের দর্শকদের রুচির প্রতি নজর রেখেই এই দৃশ্যটির অবতারণা।

ঐ আসতেছে অৰ্জ্জুন।
আমি মদের জন্য হব খুন।
যখন অৰ্জ্জুন আসবে কাছে।
তার কাছে ভিক্ষা চাব,
সে আমায় যা ভিক্ষা দেবে,
তাই দিয়ে মদ কিনে খাব।
ঐ আসতেছে অৰ্জ্জুন।

এ হোল সে-যুগের কালুয়া-ভুলুয়ার নবীন সংস্করণ। নাটকের সঙ্গে এই তিনটি গানেরই কোন সম্পর্ক নেই।

নায়ক নায়িকার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণেও তিনি গান ব্যবহার করেছেন। সেখানে ইংরাজী আদর্শ তাঁর লেখণী শাসন কবেছে।

নাটকে চরিত্রগুলি মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে বিচিত্রিত। শুধু বলরাম, দুর্যোধন, দুঃশাসন কিছুটা নতুন। লেখক নব্যপন্থী, কিন্তু নতুন কোন জীবনবোধ এর মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেননি। এই বচনার কাঠামোটিই কেবল আধুনিক, অন্তরটি সেকেলে।

"মন্মথ দাবানল আমার বক্ষঃস্থল দগ্ধ করিতেছে—এসো স্পর্শ করিয়া শীতল হই।" অৰ্জ্জুনের এই উক্তি থেকে শুধু সংলাপের চরিত্র নয়, নাটকের চরিত্র উদ্ঘাটিত হচ্ছে। এ নাটকের প্রাণধর্ম বিদ্যাসুন্দরীয় সাহিত্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত—বিশেষ করে যখন শ্লেষের ব্যবহার ভুরি ভুরি দেখা যাচ্ছে। তবে নাট্যকার মহাভারতের আখ্যানকে প্রায় বাঙ্গালী পারিবারিক গল্পে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। বিয়ের সময় স্ত্রী-আচার, বৈবাহিক-বৈবাহিকা সম্পর্কাদি নিয়ে হাসিঠাট্টা প্রভৃতি বাঙ্গালীসুলভ নানা অনুষ্ঠান এখানে স্থান পেয়েছে। লেখক নতুন প্রণালীতে নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন; প্রণালীটি

নতুন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নাটকের মর্মবস্তু নতুনত্বে তত মর্মরিত হয়নি। বহিরঙ্গে এ নাটক আধুনিক, অন্তরঙ্গে মঙ্গলকাব্যীয়, মধ্যযুগীয়।

হরচন্দ্র ঘোষ

এই সময়ে আরও একজন নাট্যকার দেখা দেন; তিনি উনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত সমাজের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি; হুগলি কলেজের সেরা ছাত্র। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' লিখিত হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে; প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে। ভানুমতীচিত্তবিলাস 'The Merchant of Venic'-অবলম্বনে রচিত। নাট্যকার ভূমিকায় (Preface) বলেছেন:

> "I took their advice and undertook in the shape of a Bengali Natuck or Drama, taking only the plot and underplots of The Merchant of Venice, with considerable addition and alteration to suit the native taste, but at the same time losing no opportunity to convey to my countrymen, who have no means of getting themselves acquainted with Shakespear, save through the medium of their own language, the beauty of the author's sentiments as expressed in the best passages in the play in the question."৯

হরচন্দ্র ভূমিকাতেই কবুল করেছেন তিনি বেশ কিছু সংযোজন করবেন (considerable addition) এবং দেশীয়দেব রুচিব (native taste) প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রম দেখাবেন।

হরচন্দ্র 'ভানুমতীচিত্তবিলাসে' সেক্সপীয়ারের গল্পের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বিড়ম্বনা আমদানী করেছেন।

অঙ্ক শব্দ Act অর্থে ব্যবহৃত; Scene হয়েছে অঙ্গ। ১ম অঙ্ক ১ম অঙ্গে নাটক শুরু হচ্ছে সরস্বতী-বন্দনা দিয়ে। তারপর সূত্রধার ও নটী প্রবেশ করেছেন। অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুমোদিত হয়েছে।

হরচন্দ্র ডাকসাইটে 'ডিরোজিয়ান', কিন্তু সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অগ্রাহ্য করেননি।

এই নাটকের ১ম অঙ্কের সঙ্গে সেক্সপীয়ারের কোন সম্পর্ক নেই। সেক্সপীয়ার দেখা দিয়েছেন দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে।

১ম অঙ্ক তিনটি অঙ্ক নিয়ে গঠিত। ২য় অঙ্কে নাটকের কুশীলবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতকার ঘটে। উজ্জয়িনীর রাজঅন্তঃপুরে রাজা বীরবর ও রাণী চন্দ্রাবলীকে দেখতে পাবো। কন্যার বিবাহের জন্য রাণী উৎকণ্ঠিত। এই উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হোল পয়ার ও ত্রিপদীতে। ত্রিপদী-পয়ারে কথোপ-কথন অনেকটা বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যাব জনক-জননীর সুরে অভিব্যক্ত হয়েছে।

রাণী। শুন শুন মহারাজ, কি কব তোমার কায,
নাহি ভাব লোক লাজ,
হিতাহিত দেখি কিছু নাহি কর গণনা।
ভানুমতী তব কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা,
মহীতলে নাহি অন্যা,
বিবাহের নাহি তার কর কোন ঘটনা।

তারপর ভানুমতীকে বিবাহ করার জন্য নানান দেশের রাজপুত্র এসে পৌঁছাতে লাগল। তাদের রূপ বর্ণনা করেছে পুরনারীগণ—

হের দেখ অঙ্গ অঙ্গ রাজসুত।
অনঙ্গের অঙ্গ যার শুনিতে অদ্ভুত॥
কুরঙ্গ নয়ন তার তুরঙ্গের বল।
গতি দেখি ক্ষোভ পরে মাতঙ্গের দল॥
অঙ্গের লাবণ্য দীপ দীপ্যমান তায়।
আতঙ্গে রমণী পোড়ে পতঙ্গের প্রায়॥
নবীন বয়স বটে তর্কশাস্ত্রে পটু।
এইমাত্র দোষ তার বাক্য কিছু কটু॥

এ-ভাষা কি নবীন ভাষা? পূর্বেই বলেছি, হরচন্দ্র নব্যসমাজের একজন প্রধান ব্যক্তি। কিন্তু সাহিত্যে তিনি ভারতচন্দ্রীয় কাব্যরীতি পরিহার করতে পারলেন না কেন? প্রথম অঙ্ক না হয় হরচন্দ্রের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন তিনি সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছেন, তখন তিনি সেক্সপীয়রকেও ভারতচন্দ্রের হেঁসেলেই অন্নজল গ্রহণে বাধ্য করলেন কেন?

২য় অঙ্কে ১ম অঙ্কে চারুদত্ত-চিত্তবিলাসের কথোপকথন থেকে লক্ষপতির কন্যার রূপের একটি বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এ বর্ণনায় কার অনুসরণ আছে, পাঠককে তা বলে দিতে হবে না।

কঠিন কটাক্ষে যার কন্দর্পের ফাঁস।
বিহঙ্গ পুরুষ মন করিবারে নাশ ॥
চাঁচর চিকুরে ঢাকিয়াছে পৃষ্ঠদেশ।
অপূর্ব বিনানি বেণী বিশেষে স্ববেশ ॥
সম্মুখেতে কেশগুছি পড়িয়াছে আসি।
ঘেরিতেছে শশি যেন নীরদের রাশি ॥
হৃদয়ে ফুটিছে কুচ কমলের কলি।
সুগন্ধেতে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমিতেছে অলি ॥
জিনিয়া সুবর্ণ বর্ণ অঙ্গের বরণ।
অনঙ্গের রতি জিনি অতি সুচিকণ ॥ (২।১)

কিন্তু যেখানে যথার্থই সেক্সপীয়রকে অনুসরণ করা হয়েছে, সেখানকার সংলাপের চরিত্র কি প্রকার? নমুনা কিছু উদাহৃত করা গেল :—

লক্ষপতি। হাঁ, আপনারা দশ সহস্র টাকা ঋণ চাহেন।

চিত্ত। সে কেবল তিন মাসের জন্য মাত্র।

লক্ষ। কেবল তিন মাসের জন্য হয়তো ভাল।

চিত্ত। আর শুনিয়া থাকিবে। যে এতদর্থে চারুদত্ত ঋণপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

লক্ষ। চারুদত্ত কি ঋণপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। তাহা হইলে ভাল।

চিত্ত। আপনার অভিপ্রায় কি? এই সকল কথায় আপনি কি উত্তর দেন?

লক্ষ। দশ সহস্র টাকা—তিন মাসের জন্য—আর (ভাবনা যুক্তরূপে) চারুদত্ত অধমর্ণ। হানি কি।

চিত্ত। হাঁ, আমি এই সকল কথার উত্তর চাহি।

লক্ষ। চারুদত্ত বিশিষ্ট লোক বটে।

চিত্ত। আপনি ইহার কিছু অন্যমত শুনিয়াছেন না কি?

লক্ষ। না, তা নয়। চারুদত্ত বিশিষ্ট লোক এই কথা আমার বলার এই, অভিপ্রায় যে সেই ব্যক্তি বিভববিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহার বিভব কেবল আনুমানিক, ফলে স্বপ্নবৎ, এখন আছে, এখন নাই। তাহার তিন ডিঙ্গা দক্ষিণ প্যাটান গিয়াছে, দুই ডিঙ্গা মগরা, এক ডিঙ্গা আগরা, কিন্তু ডিঙ্গা কেবল কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ, আর নাবিক মনুষ্য মাত্র, জলধি অতি দুস্তর, বিশেষতঃ ঘূর্ণা বায়ু ও মটকা সমুদ্র ও জলপথে নিরন্তর হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন

জলচোর ও স্থলচোর অর্থাৎ বোম্বেটিয়া ও বাটপাড়দিগেরও দৌরাত্ম্য আছে, বাণিজ্যের এই নানা উৎপাত তথাচ চারুদত্ত লোক বিশিষ্ট। আর দশ সহস্র টাকা, বিবেচনা করি যে তাহার খত লইলেও লইতে পারি।

চিত্ত। ইহাতে সংশয় কি? আপনি নিশ্চয় লইতে পারেন।

লক্ষ। আমি নিশ্চয়রূপে লইতে পারি, এইজন্য সংশয়চ্ছেদন কর। আবশ্যক যেন উত্তরকালে কোন সংশয় না থাকে, ভাল চারুদত্ত কোথায়? আমার সহিত তাহার একবার কি সাক্ষাৎ হয় না?

চিত্ত। অবশ্য হইতে পারে? বরং যদি আপনকার ইচ্ছা হয় তবে অদ্য তথায় মধ্যাহ্নে ভোজন করেন।

লক্ষ। এমন কথা কহিও না। অভক্ষ ভক্ষ্য ও অপেয় পান করিবার জন্য তোমাদের সঙ্গে ভোজনে বসিব? পরকাল নষ্ট করিবার জন্য তোমাদের পাপ ঘরে পাপান্ন গ্রহণ করিব? না, তবে তোমাদের সহিত একত্রে ক্রয় বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসায় করিব। একত্র বাক্যালাপ করিব। কিন্তু একত্র ভোজন পান করিব না ও একত্রে পূজাও করিব না। ইনি কে আসিতেছেন?

[Act I/III.

Shy. Three thousand ducats, well.

Bass. I Sir, for three thousands.

Shy. For three thousands, well.

Bass For which, as told you,
Antonio shall be bound.

Shy. Antonio shall be bound, well.

Bass May you sted me? Will you pleasure me? Shall I know your answer?

Shy. Three thousand ducats for three months.
And Antonio bound.

Bass. Your answer to that.

Shy. Antonio is a good man

Bass. Have you heard any imputation to the contrary?

Shy. Ho no, no, no, no; my meaning is saying he is a good man, is to have you understand me that he is sufficient, yet his

means are in the supposition, he hath an Argosie bound to Tripolis, another to the Indies I understand moreover upon the Royalta, he hath a third at Mexico, a fourth for England and other ventures he hath squaunderd abroad, but ships are but boards, saylers but men, there be land rats, and water rats, water thieves, and land thieves, I mean pyrots, and then there is the perril of waters, windes and rocks ; the man is notwithstanding sufficient, three thousand sufficient, three thousand ducats, I thinke I may take his bond.

Bass. Be assured you may.

Jew. I will be assured I may : that I may be assured, I will bethinke, may I speake with Anthonio ?

Bass. If it please you to dine with us.

Jew. Yes, to smell porke, to eat of the habitation which you prophet the Nazarite conjured the divell into ; I will buy with you, tell with you, talk with you, walke with you and so following, but I will not eate with you, drinke with you, nor pray with you. What newes on the Raylta ? Who is he comes here ?

এ-ভাষা বিদ্যাসুন্দর-লালিত ভাষা নয়। এ-ভাষা স্বচ্ছন্দ না হতে পারে, কিন্তু এ-ভাষা পৃথক পথের দিশা খুঁজছে।

এ নাটকের অনুবাদ লেখক শুধু প্রথম অঙ্কেই স্বতন্ত্র করেননি, তিনি কালু রায় ও মালতী দুই চরিত্র খাড়া করে একটি স্বতন্ত্র উপকাহিনীও গড়ে তুলেছেন।

কালু রায় জাতিতে নাপিত, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতিষী ; পাঁজি দেখে সে তার কাজকর্ম সম্পন্ন করে। পাঁজির মতে যে দিনটি খারাপ, সেদিন তার উপার্জনের ভাগে পড়ে শূন্য।

কালু। শুন মালতি ইদানীং তুমি কিঞ্চিৎ মুখরা হইয়াছ আর আমাকে অনেক কটু কহিতেছ, দেখ এ ভাল নয়।

যে স্ত্রী স্বামীর বাক্যে উত্তর প্রত্যুত্তর করে সেই অঘীয়সী জন্মান্তরে গ্রাম মধ্যে কুক্কুরী ও নিবিড় বন মধ্যে শৃগালী হইয়া বাস করে।

মালতী। -তোমার মুখে ছাই, তোমার শাস্ত্রের মুখে ছাই, যদি আমি কদাচ শৃগালী হই তবে তোমার মাংস অগ্রে ছিঁড়িয়া খাইব। এখন পাইয়াছ কি তা বল।

কালু। অদ্য বৃহস্পতিবার, ক্ষুরিকার্য নিষেধ অতএব কিছুলাভ হয় নাই।

মালতী। তবে এখন ছেলে পিলে খায় কি ?

কালু। যিনি জীব দিয়াছেন তিনিই আহার দিবেন।

মালতী। জীব তো তুমিই দিয়াছ। সে তো পাড়াপ্রতিবাসি দেয় নাই।

কালু। আ নির্বোধ!

মালতী। হাঁ, এখন তাই বটে, এবার জীব দিতে যাইও যা মনে আছে তা করিব।

লেখক কালু রায়-মালতী প্রসঙ্গ নাটকে উপস্থাপিত করেছেন রঙ্গরস সৃষ্টির জন্য। এখানে জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। মূল রচনার ক্ষেত্রেও সর্বত্র তিনি সেক্সপীয়রকে অনুসবণ করেননি। 'ভানুমতী-চিত্তবিলাসে'ব প্রণয়লীলাকে লেখক তাঁব যুগের উদ্ভিন্নমান রুচির কাছে না নিয়ে অপস্রিয়মান রুচির পায়ে সমর্পণ করেছেন। ভানুমতীকে চিত্তবিলাস কৌশলে ক্রোড়ে ধারণ কবল। লেখক তখন আর সংযম রক্ষা করতে পাবেননি। রতিলীলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা কবে শান্ত হয়েছেন.

করে ধরি প্রাণেশ্বর, অঙ্গে নাহি দিও কর.
হের মোর অঙ্গ কাঁপে ডরে।
তরুণ তরুণী আমি, রতির পণ্ডিত স্বামি,
ক্ষমা কর নিতান্ত কাতরে।
যদি নাথ হয় ক্ষুধা, পান কর অন্য সুধা,
প্রস্ফুটিত কত পুষ্প আছে।
তোমার হইবে তোষ, আমি না করিব রোষ
যাও অলি সেই পুষ্প কাছে।
হের যুগ পয়োধর তোমার প্রখর কর,
নখাঘাতে করিল বিক্ষত
ঝর ঝর ঝরে ঘাম থরথর কাঁপে ঠাম,
দরদর ডরে অঙ্গ কত।

এ বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরে কবির ঝুলি থেকে ঋণ স্বরূপ নেওয়া হয়েছে। হরচন্দ্রের সেক্সপীয়ার অনুবাদের এই ভাষা যুগরুচির বিরোধী। তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে

এতদিন যে মূল্যায়ন হয়েছে, তা ভ্রান্তির মধ্যে আটকে ছিল। হরচন্দ্রের 'অনুবাদ' যেখানে স্বাধীন, সেখানে তিনি ভারতচন্দ্রের অধীন। আর যেখানে সেক্সপীয়রের অধীনতা আক্ষরিকভাবে অঙ্গীকার করেছেন, সেখানে তিনি অন্তত ভাষার ক্ষেত্রে একটা নবীন পথ তৈরি করেছেন। কিন্তু তার পরিমাণ তুলনায় কম। বরং তাঁর নাটকের প্রধান আবেদন সেক্সপীয়রের সঙ্গে থাকেনি। তিনি পয়ার ত্রিপদী ছাড়াও দ্বিপদী, মালঝাঁপ, দীর্ঘ চতুষ্পদী, চামর, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই কৃতিত্বও তাঁকে সেক্সপীয়ার-বিরোধী পথে চালনা করেছে। এই সব ছন্দ নবীন যুগের জীবনের বক্তব্য ধারণের অনুপযোগী।

হরচন্দ্র ইচ্ছা করেছিলেন যে, তাঁর এই গ্রন্থ পাঠ্যগ্রন্থের (text book) তালিকাভুক্ত হোক। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। হরচন্দ্র সে-যুগের অন্যতম প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি; তাঁর ইংরিজি রচনা নব্যরুচিকে পুষ্ট করেছে; গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; বেকন অনুবাদ করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন; হিউম অনুবাদে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। অথচ মাতৃভাষায় মৌলিক রচনায় তাঁর পথ ভিন্ন। এখানে তিনি ভারতচন্দ্রের খেলুড়ি। আশ্চর্য এই যে, অনুরূপ পরিণতি হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের সাহিত্যসৃষ্টিতেও দেখা গিয়েছিল। তিনি ইংরিজি ভাষায় যে ধরণের সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁর বাংলা রচনা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হরচন্দ্রের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' পাঠ্যতালিকায় স্থান পেল না।

দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ তাঁর প্রকাশিত হোল প্রায় এক যুগ পরে—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও বদলে গেল—'**with the view to adapt the same more to the study than to the stage** "(preface)।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হরিনাথ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক 'verbatim et liberat ne' ম্যাকবেথ অনুবাদ করেছিলেন, বলে Citizen কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটি উদ্ধৃত হয়েছিল Friend of India, (July 27, 1854). নাটকটি পাওয়া যায় নি। হরিনাথ আর হরচন্দ্র কি অভিন্ন? হরচন্দ্রের 'চারুমুখচিত্তহরা 'Remeo and Juliet'-এর অনুবাদ। পূর্ববর্তী গ্রন্থ অপেক্ষা এখানে লেখক যথেষ্ট বিশ্বস্ত হবার চেষ্টা করেছেন। Montague আর Capulet হয়েছে ভোজবংশ আর সিন্ধুবংশ। রোমিও হোল চারুমুখ, জুলিয়েট হোল চিত্তহরা।

এই নাটকেও সূত্রধার আছে; সূত্রধারের দুইটি গান আছে। গান দুটিতে নিধুবাবুর অনুসরণ আছে।

তুমি যে কর চাতুরি, আমি তা জানি সকল।
মুখেতে অমৃত বর্ষ, অন্তরে গরল ॥
মুখে বল ভালবাস, মরিলেও নাহি জিজ্ঞাস ;
ছেড়েছি সে সব আশ, পীরিতেরি যেই ফল ॥

দ্বিতীয়টি গানটিও একই আদর্শে লিখিত :

আর কি দিয়ে বল সখি! আমি তুষিব তাহারে।
ধন মন দিয়ে শেষে, যৌবন দিলেম যাহারে ॥
পর জনে প্রিয় জানি, প্রয়োজন তাহে মানি,
তবু না পারিলাম আমি, তারি মন বুঝিবারে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে যথার্থ নাটক শুরু হোল। সেতা ও নেতা প্রবেশ করল; তাদের মুখ থেকে ভোজবংশ-সিন্ধুবংশের কলহবিবরণ শোনা গেল। এখানে অনুবাদ অনেকটা মূলানুগ। ইংরিজি 'ইডিয়াম' বাংলায় রূপান্তরিত করা কষ্টকর। তবু হরচন্দ্র চলতিবুলির সাহায্য নিয়ে সে-চেষ্টায় অনেকটা সফল হয়েছেন—যেমন প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে,

"women grow by men"—তিনি অনুবাদ করেছেন, "বিয়ে হলে এতদিনে তোমার মেয়ে ফুপিয়ে উঠতো।"

তবে লেখক অনেক সুন্দর সুন্দর অংশ বাদ দিয়েছেন, যেমন ১ম অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে Mervolio-র বিখ্যাত উক্তিটি বাদ দিয়েছেন। আবার কোন কোন অংশ সংক্ষেপিত করেছেন।

রোমিও যখন জুলিয়েটের প্রতি এই অনবদ্য উক্তিটি করেছে,

Romeo, (To Juliet).

If I profane with my unworthiest hand
This only shrine, the gentle fine is this,
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss.

এই অসমাপ্ত উক্তিটি উত্থাপিত হবার পূর্বে লেখক রোমিও অর্থাৎ চারুমুখের সঙ্গে মুক্তি, চন্দ্রকলা ও চিত্তহরার সঙ্গে প্রায় পৃষ্ঠাব্যাপী কথোপকথনের অবতারণা করেছেন। তারপর এই উক্তিটি :—

চারু। (চিত্তহরাকে উদ্দেশ করিয়া) যদি আমি আপন অপবিত্র করে সেই ইন্দুমুখির পুণ্যক্ষেত্র স্পর্শ করিয়া থাকি, তবে তাহার মুখপদ্মে মুখ মিশাইয়া আমার সলজ্জ ওষ্ঠযুগল যাত্রীরা, তাহা হইতে নিঃসৃত অমৃত গ্রহণরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই অঘের মোচন করিতে প্রস্তুত আছি।

Juliet. Good pilgrim, you do wrong your hand too much
Which mannerly devotion shows in this ;
For saints have hands that pilgrims hands' to touch
And palm to palm is 'holy palmedrs' kiss.

Rom. Have not saints lips, and holy palmrs too ?

Jul Ay pilgrim, lips that they must use in prayer.

Rom. O, then, dear saint, let lips do what hands do.
They pray, grant thou, lest faith turn to despair.

Jul Saints donot move, though grant for prayers' sake.

Rom. Then move not ; while my prayers' effect I take.
Thus from my lips by thine my sin is purged.
(Kissing her)

Jul. They have my lips the sin that they have took.

Rom. Sin from my lips ? O tresspass sweetly urged.
Give me my sin again.

Jul. you kiss by the book.

চিত্তহরা। হে তীর্থযাত্রী! তোমার ঐকান্তিক ভক্তিতে তুমি আপনার ক্ষীণপুণ্য ব্যাখ্যা করিয়া আত্মপক্ষে অন্যায় করিতেছে। পুণ্যাত্মা ও সিদ্ধবিত্তারা প্রথম মিলন কালে কেবল হাত ধরিয়াই অভ্যুত্থান করিয়া থাকেন, মুখের ঘ্রাণ লওয়া তাঁহাদের প্রথাসিদ্ধ নহে।

চারু। উভয়েরই তো অধর ওষ্ঠ আছে।

চিত্ত। হাঁ, তা আছে বটে, কিন্তু সিদ্ধলোকেরা প্রায় আরাধনার জন্যই অধরোষ্ঠ রাখিয়াছেন।

চারু। হে সিদ্ধদিব্যে! যদি হস্তের কার্য আরও কোমলভাবে অধরের দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাতেই বা ব্যতিক্রম কি আছে? আমার ওষ্ঠদ্বয় শ্রীমন্দিরে সেই আরাধনা করিতেছে, অতএব হে সুলোচনে! তোমার নিতান্ত নৈষ্ঠিক

এই উপাসকের প্রতি বরদাত্রী হও, নচেৎ সাধকের ভক্তি বিচলা হওনেব আটক নাই।

চিত্ত। আরাধনাতেই কেবল সিদ্ধবিদ্যারা বরদান করেন, কিন্তু তদ্বারা বিচলিত হন না।

চারু। তবে আমিও যদবদি অঘান আরাধনায় সাফল্য না করি, তদবধি হে প্রতিমে! তুমিও অধিষ্ঠান কর। আমি, "ইহ তিষ্ঠ" ধ্যানে তোমার বন্দনা করিতেছি যে, তোমার বদনকমলের সুঘ্রাণ লইয়া, আপন অঘের বিমোচন করি।

চিত্ত। তবে তো তোমার কৃত দুরিত আমারি অধরে থাকিবে?

চারু। যদি এমনি হয়, তবে তুমিও মুখে মুখে মিশাইয়া আমার পাপ আমাকেই প্রত্যর্পণ করিবে। তাহালে যেখানকার পাপ সেইখানেই যাবে।

চিত্ত। তোমার এ বিষম সমতা। (উভয়ের হাস্য)

এই অনুবাদের কাব্যমূল্য কতখানি, তা নিয়ে বির্তক চলুক, এ বিষয়ে আমরা আপত্তি জানাব না। কিন্তু এ অনুবাদে যে মূলানুসরণ রয়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ কি!

কিন্তু হরচন্দ্রেব কাঁধে বিদ্যাসুন্দরীয় ভূত প্রথম থেকেই ভব করে আছে। যেখানে তিনি বিশ্বস্তভাবে অনুবাদ করেননি, সেখানে ভাবতচন্দ্র তাঁর লেখনী শাসন করেছেন—ভারতচন্দ্র "father of a vile school of poetry, though himself a very elegant poet." ভাবতচন্দ্র আধুনিক কবি নন, তিনি মধ্যযুগীয় কবি। যে নাটক ইংরেজি সাহিত্যের বেনেসাঁসীয় যুগেব প্রতিনিধি, হবচন্দ্র তাকে মধ্যযুগের ভাষায় অনূদিত কবতে গেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কেও পদ্ধতি একই প্রকাব।

তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে চিত্তহরাব মুখে নাট্যকার যে গানটি বসিয়েছেন, তা আদ্যন্ত কবিসঙ্গীত।

দেখা দিতে প্রাননাথ, রাখ এই বা—বো।
বিরহ অনলে দেহ দহে, অনিবা—রো।
বল, কি হবে আমা—রো।
আঁখির মিলন বিনা, কি হবে অবলা—বো।

চতুর্থ অঙ্ক ৫ম দৃশ্যে দুইটি গান আছে, গান দুটি রচনায় ব্রহ্ম-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি আছে।

১. ঐহিকেরি যত সুখ সকলি বিফল হবে।

২. অনিত্য সংসার মাঝে, নিত্য নিরাকার সেই।

৫ম অঙ্কে একটি গান আছে।

আর শুনিব না সুধাবাক্য
তারি বিধুমুখে।

হরচন্দ্র সেক্সপীয়ারকে সাধ্যঅনুযায়ী অনুসরণ করে চলেছেন; একেবারে উপসংহারে এসে সমসাময়িক বাংলা নাট্য-রুচির নির্দেশে একটি ভরতবাক্য দিয়েছেন।

পদ্য

ন ভাবি ন ভূত, হেন বিপদের বাণী।
চারুমুখ—চিত্তহরা প্রেমের কাহিনী ॥

এই নাটকে নাট্যকার চোদ্দটি গান বসিয়েছেন; এই গানগুলি নাট্যরস সংহত না করে শিথিল করেছে।

'ভানুমতীচিত্তবিলাস' ও 'চারুমুখচিত্তহরা' রচনার মাঝখানে হরচন্দ্র 'কৌরব বিয়োগ' নাটক রচনা করেছিলেন।

হরচন্দ্রের 'কৌরববিয়োগ' ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। ঐ নাটকের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর 'ভানুমতীচিত্তবিলাস' ঠিক ছাত্রপাঠযোগ্য গ্রন্থ নয়। "ঐ প্রতিষ্ঠিত কাব্য (The Merchant of Venice) নানা রসঘটিত ও স্থানে স্থানে এতদ্রূপ সরস আদিরসে রচিত যে নীতিজ্ঞানান্বেষী ছাত্রগণের তাহা পাঠের যোগ্য বোধ করিলে ভারতচন্দ্রের স্থান নির্বাপণ করা নৈষ্ঠুর্যবোধ হয়?"[১০]

লেখক 'কৌরব বিয়োগ' নাটককে 'Historical Tragedy বলে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের কাহিনীর মলিনত্ব তিনি সংশোধন করেছেন। "Change which has been carefully introduced in it, brings altogether new, and agreeable to the approved taste of the modern literati of the country" (Preface) লেখকের উদ্দেশ্য যুগোপযোগী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল করতে হইল যে যুগন্ধর প্রতিভার প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল না। ফলে 'কৌরব বিয়োগ' আর একখানি 'ভদ্রার্জুন' হয়ে রইল।

এখানে 'Act' অঙ্ক, 'Scene' অঙ্গ হয়েছে। প্রথম অঙ্ক প্রথম অঙ্গে নান্দী সূত্রধার ও নটী রয়েছে। ১ম অঙ্কে পাঁচটি অঙ্গ (দৃশ্য), দ্বিতীয় অঙ্কে ৬, তৃতীয় অঙ্কে ৪, চতুর্থ অঙ্ক ৫, এবং পঞ্চম অঙ্কে ৮টি অঙ্গ আছে।

ঘটনার বড় রকমের পরিবর্তন অনুসারে অঙ্কবিভাগ সম্পন্ন হয়েছে। নাটকীয় রসের উত্থান-পতনে নাটকের অঙ্ক নির্ণীত হয়নি। আখ্যায়িকাধর্মী কাব্যের মতই ঘটনা একটানা বয়ে চলেছে। দুর্যোধনের মৃত্যুতে নাটকের শেষ হয়েছে।

অনুবাদে হরচন্দ্র নাটকের কাঠামো ক্ষুণ্ণ করেননি; কিন্তু মৌলিক রচনায় তিনি পাঁচালির রীতি দুই-একস্থানে অনুসরণ করেছেন। বিশেষ করে পদ্য-অংশে নাটকের কাঠামো রক্ষিত করা হয়নি।

৫ম অঙ্ক ৭ম অঙ্গ

গান্ধারী। শোকার্তা কৌরবমাতা এই কথা শুনি।
করযোড়ে প্রণমিয়া কহে মহামুনি॥
ত্রিলোক নাহিক কর্ম অসাধ্য তোমার।
দেবের আরাধ্য ত্বং হি দেব অবতার॥

দ্রৌপদী। অনন্তর পঙ্কজাক্ষি পাণ্ডব ঘরণী।
করপুটে কাছে দেবী বিদ্যুৎ বরণী॥
হতভাগ্য মম সম নাহি তিন লোকে।
জীর্ণজরা হৈল তনু নানামত শোকে॥

সুভদ্রা। নিবেদনে অবধনি কর মুনিবর।
[সজল লোচনে ভদ্রা যুড়ি দুই কর।]

দুঃশীলা। প্রফুল্ল কমলমুখী কহে ধীরে২।
চিকণ হেমাঙ্গ অঙ্গ ভাসে নেত্রনীরে॥

ব্যাসদেব। তথাস্তু বলিয়া আশ্বাসিল সবে ব্যাস।
অদ্য নিশি সকলের পূর্ণ হবে আশ॥

কৌরব ও পাণ্ডব
বধূগণ। সহর্ষ হইল সব মুনির বচনে।
না ভাবি ন ভূত কর্ম ভাবে মনে মনে॥
নিমিষ রহিতা আঁখি কৌরব কাহিনী।
কুতুহলে কম্পিতা কহিছে কুলনারী।

হরচন্দ্র ঘোষ আরও একখানি নাটক লিখেছিলেন তার নাম 'রজতগিরি-নন্দিনী' (১৮৭৪)। বর্মীয় আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত ইংরেজি নাটকের অনুবাদ (?) এটি। এই গল্পটি বাংলা নাট্যসাহিত্যে বারবার ব্যবহৃত হবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই গল্প অবলম্বনে দুইখানি পৃথক নাটক লিখেছেন। লেখক রজতগিরিনন্দিনীর ভূমিকায় এদেশে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। নাটকে কিন্তু সে-উৎসাহের কোন চিহ্ন নেই। তাঁর অন্যান্য রচনায় যেমন এই নাটকে বিগত যুগের মৃত ভাষা অবলম্বনীয় হয়েছে। শুধু ভাষা নয়, বাংলা নাট্য মঞ্চের বাস্তব অবস্থার প্রতি নজর রাখেনি তিনি। তাঁর নাটক হয় বিদেশী-প্রদর্শিত পথে, না হয় মধ্যযুগীয় পথে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়েছে।

এই ব্যর্থতা শুধু তাঁর একার নয়। ইংরেজীনবীশ অন্যান্য নাট্যকারও এই ব্যর্থতা পরিহার করতে পারেননি।

আধুনিক নাটকের বিম্বিত সূচনা

মাইকেল-পূর্ব যুগে কীর্তিবিলাস ও ভদ্রার্জুন সর্বাপেক্ষা ইংরেজি-প্রভাবিত নাটক।

কীর্তিবিলাস ট্রাজেডি; লেখক ভূমিকায় বলেছেন "হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকালস্থায়িনী।" কিন্তু তবু তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন—নাটকের প্রয়োজন স্বীকার না করে। কারণ "বঙ্গ দেশ উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্যরসাভিনয় অবলোকন করিতে সদাই অভিলাষী।" গানও তিনি ব্যবহার করেছেন, তবে গানের জন্যই গান, নাটকের নিমিত্ত নয়। নাটকে কিভাবে গানগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটু সংবাদ দেওয়া গেল।

দ্বিতীয়াঙ্ক প্রথম অভিনয়ে (দৃশ্য অর্থে) নগরস্থ আঢ্য লোকত্রয়ের বণিতাদের অন্যতমা হেমলতা উদ্যানে উপবেশন করে গাইছে—

সই রাখিব প্রাণ কেমনে।
দেশান্তরে থাকে কান্ত সদা ভাবি মনে মনে।
নিষ্ঠুর নির্দয় কান্ত, আসিবে না একান্ত,
হইল মোর প্রাণান্ত; যাতনা সহে না প্রাণে।

তৃতীয়াঙ্ক প্রথম অভিনয়ে দ্বিতীয় সংখ্যক গানের অবতারণা করা হয়েছে; এই গানটিও গেয়েছে হেমলতা।

যে জন আপন নহে, তার লাগি প্রাণ দহে
হায় হায় একি দায়।
কিছু নাহি বুঝা যায়, শুন শুন সুধাংশুবদনী।
মনে ভাবি প্রতিক্ষণ, প্রাণের কপট মন
মরি মরি কি চাতুরী।
তবু প্রেম সাধ করি, করি বলনা সজনী।

তৃতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় অভিনয়ে গানের উল্লেখ আছে, তবে গানটি দেওয়া হয়নি। সম্ভবত লেবেডফের নাটকের মত কোন জনপ্রিয় সঙ্গীত এখানে ব্যবহৃত হবে। গানটি হালের হতে পাবে, কিন্তু রীতিটি প্রাচীন। সংস্কৃত নাটকের রীতি এখানে অনুসরণ করা হয়েছে।

দূত মহারাজাকে জানাল--

"মহারাজ নাট্যশালে সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে আজ্ঞা হইলে সঙ্গীতারম্ভ হয়।"

চতুর্থ অঙ্কে প্রথমাভিনয়ে নায়ক কীর্তিবিলাস তাঁর স্ত্রীব সহচরীকে বলছেন—

"বীণা গ্রহণ করিয়া সঙ্গীত কবহ। আমাব অন্তঃকরণ শোকতাপে তাপিত। সঙ্গীত দ্বারা সমস্ত দূব কবহ।"

সহচবী তখন গান ধরল—

তরুণীব কক্ষে কুমাবীব বক্ষে
দেখি চঞ্চল অন্তর।
অভিমান ভাবে বসি মান ভাবে
ভাবিয়া হয় কাতব।

নাটকের ভাববস্তুব সঙ্গে এই সব গানের কোনই যোগ নেই। অথচ আমরা জানি, হ্যামলেটেও গান আছে, আছে ওফেলিয়াব মুখে। সেখানে গান নাটকের বক্তব্যকে আরও ফুটিয়েছে। 'কীর্তিবিলাসে' নান্দী, সূত্রধার, নটীব মতই সঙ্গীত ও হাস্যরসকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছে নাট্যকারকে। অথচ কীর্তি-বিলাসে নৈষ্ঠিকভাবে ইউরোপীয় আদর্শ অনুসবণ করতে চেয়েছিলেন লেখক।

ভদ্রার্জুন এতটা ইউরোপীয় আদর্শচালিত নয়। ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন সঙ্গীতে নাট্যরস বিড়ম্বিত হয়, অপ্রয়োজনীর ভণ্ডামি নাট্যসংহতি ব্যাহত করে। কিন্তু তারাচরণ প্রতিজ্ঞায় যতটা কঠোর, ব্যবহারে ততটা হ'তে পারেন নি।

ভদ্রার্জুনের গানগুলিও দর্শকের মুখ চেয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, কুশীলবদের মুখ চেয়ে নয়।

এছাড়া নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনায় তিনি এ যুগের কোন কেন্দ্রীয় বিষয় বেছে নেননি; তাই কোন বিশেষ অংশে তাঁর নাটকের সুর উঁচুতে তোলেননি, আর সেই সুর নামাবার প্রশ্নও ওঠেনি। তাঁরা অঙ্ক-দৃশ্যে বিভক্ত করে একটা কাহিনীকে বিবৃত করে গেছেন। নাটকের সঙ্গে আখ্যায়িকামূলক কাব্যের পার্থক্য শুধু দৃশ্যসংস্থাপনায়, এই রকম একটা অসচেতন ধারণা তাঁরা পোষন করতেন বলে মনে হয়। তবে গুপ্তমহাশয় অনেক সতর্ক; অপর পক্ষে শীকদারমহাশয় কাহিনীধর্মী রচনার আঙ্গিক পরিহার করতে সমর্থ হননি।

১ম অঙ্ক ২য় সংযোগস্থল :

এইরূপে বিবেচনা করিয়া অর্জুন গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্বক ধনুর্বাণ লইয়া তস্করদিগকে ধৃত করিলেন ও গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ গোধন প্রাপ্ত হইয়া অর্জুনকে আশীরাশি প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন।

১ম অঙ্ক ৩য় সংযোগস্থল—

অর্জুন ইহা বলিয়া যুধিষ্ঠির ভীম ও কুন্তীকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদি সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

২য় অঙ্ক ১ম সংযোগস্থল—

অনন্তর এই সকল কথোপকথনান্তে তিন জনেই আপন আপম শয্যাগারে গমনপূর্বক শয়ন করিলেন।

শীকদাবমহাশয় এগুলিকে নিছক মঞ্চনির্দেশ বলে চালাতে পারেন না। এই অংশগুলির তাৎপর্য দর্শক বুঝবে কি করে? সম্ভবত নেপথ্য থেকে বলা হবে, এই ছিল নাট্যকারের ইচ্ছা। যাই হোক এই নাটকগুলি অভিনীত হয়নি বলে সে সমস্যার বাস্তব মীমাংসা কিভাবে ঘটেছিল, তা জানার প্রয়োজন নেই। এই নাটকগুলি অভিনীত না হবার পক্ষে একাধিক কারণ আছে।

এগুলি দেশীয় নাট্যবোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল না। প্রচলিত নাট্যাভিনয় থেকে এগুলি স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয়নি; এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু সমসাময়িক দেশীয় বস্তুবোধের সঙ্গে যুক্ত নয়; এবং সংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট বাক্যরীতির সন্তান নয়। এগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে ও শব্দে ইংরেজি বাক্যবিন্যাস।

পাদটীকা

১। সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩, ২৬শে ফেব্রুয়ারী।

২। Bengal Harkaru, 1853, 28 September.

৩। বা. সা. ইতিহাস ২য় খণ্ড—সু. সে. পুঃ ২৭।

৪। বাংলা কবিতার নবজন্ম—সুরেশচন্দ্র মৈত্র ১৯৬১. পৃ—১৬২

৫। সাহিত্য—১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা।

৬। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রাজনারায়ণ বসু। ২য় খণ্ড, পৃ—২৯।

৭। কীর্তিবিলাস—ভূমিকা।

৮। Hindu Intelligencer—1853, June 5.

৯। ভানুমতীচিত্তবিলাস—হরচন্দ্র ঘোষ—Preface.

১০। কৌরববিয়োগ—হরচন্দ্র ঘোষ—ভূমিকা।
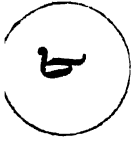
সৌখীন নাট্যমঞ্চ থেকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চ

"সাহেবেরা কি কখন বাঙ্গলা কি সংস্কৃত সুমধুর রসপূরিত নাটকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালি বাবুরা স্বজাতীয় ভাষায় নাট্যক্রীড়া করিয়া কেন ইংরেজদিগের অনুগামী হন না।" ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নব্যপন্থীদেব উদ্দেশে এই পরামর্শ পরিবেশন করলেন।

এই পরামর্শকে খুব বেশি দিন অগ্রাহ্য করা গেল না। কারণ পরামর্শটা শুধু 'চন্দ্রিকা'র নয়, অনেকেবই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আর আধুনিক বাংলা নাটকেব উদ্ভব একই বৎসরে ঘটে। অর্থাৎ বাংলা নাটক বাঙ্গলাব সৌখীন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হোল এমন এক মুহূর্তে, যখন সাবা ভারতবর্ষে একটি দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। মহাবিদ্রোহ সূচিত হবার কয়েক মাস পূর্বে বাংলা নাটকেব প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হোল। কিন্তু সাবা ১৮৫৭ সাল জুড়ে বাংলা দেশে নাট্যতৎপরতা দেখা যায়। ঘটনাটি কৌতূহল ও কৌতুকেব বটে।

সেকালে 'বেঙ্গল হবকবা' পত্রিকায় লেখা হোল: "In the days of mutiny and panic, it would not be circumspect, perhaps to complain of the sullen silence in which the Calcutta public are not...enveloped. Is it on account of wars and rumours of wars, that threaten to baseige us on every side. that we are to look as ghastly as the walls, and forego all our recreations ?" (Bengal Hurkaru, 21 May, 1857) 'হরকরা'র প্রশ্ন কি সে-যুগের ইংরেজিশিক্ষিত বঙ্গসন্তানদেরও প্রশ্ন ছিল না ?

নব্যপন্থীবা প্রায় সবাই সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিলেন, হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি পত্রিকাও ছিল বিমুখ। পুরাতনপন্থীদেব মুখপাত্র কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বিশাল বিদ্রোহ' দেখে 'হায় হায়' করেছেন, আর "কাতর হইয়া কত ডেকেছে তোমায়"। তিনি নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণীব প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করেছেন। বিলেতে সেদিন গির্জায়-গির্জায় প্রার্থনা হোত, আর এদেশেও তার অনুগমন।

ফিরিঙ্গীদের মনোভাবের সঙ্গে বাংলার নবীন-প্রবীণ কোন গোষ্ঠীর এ ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল না।

মহাবিদ্রোহের জন্য সংবাদপত্র শাসিত হয়েছে, কলকাতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিলিটারী মোতায়েন রাখা হয়েছে, সারা শহর সৈন্য দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। এই অবরুদ্ধ শহরেই বাংলা নাটক মুক্তি লাভ করল।

"আমরা শ্রুত হইলাম ৺বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞানপ্রদায়িণী সভায় সভ্য সকলে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রায়ের কৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তলা" নামক নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহুদিবস আমারদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই, উক্ত সভায় বঙ্গভাষায় আলোচনা অতি সুচারুরূপে হইয়া থাকে।"[১]

এখনও 'অভিনয়' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। নাট্যাভিনয়ের এ হোল ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত; তাই শব্দচয়নেও এই অস্পষ্ট ধ্বনি; সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ। সাময়িক পত্রের অভিলষিত অভিনয় ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার সমৃদ্ধিশালী ধনীগৃহের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নাট্যানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল।

"শকুন্তলার অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎবাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন stage-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণীবেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল।"[২]

এ হোল বাংলা নাটক ও বাংলা অভিনয়ের সত্যযুগ। তাই অরণ্যচারিণী বিশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার পরিধান করেও প্রশংসা পেয়েছেন। "নাট্যশালার পারিপাট্য ও নটদিগের নিপুণতায় বিশেষতঃ শকুন্তলার রূপলাবণ্যে ও ভাবভঙ্গিতে এবং তাহার আর্যপুত্র রাজা দুষ্মন্তের সহিত সম্ভাষণের মাধুর্যে অধিকন্তু রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার সহিত পবিত্র প্রণয় পূরিত কথাব চাতুর্যে উপস্থিত ব্যক্তিরা মোহিত হইয়াছিলেন সময়ে সময়ে চমৎকার চমৎকার কেবল এই শব্দ করিয়াছেন।"

(সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮৫৭, ৯ ফেব্রুয়ারী)

'সংবাদ প্রভাকরে' ঐ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের বিশেষ প্রশংসা আছে। হিন্দু প্যাট্রিয়টও প্রশংসা করেছে; তবে তার প্রশংসার হেতু ছিল ভিন্ন প্রকার:

"It is not every day that the native gentlemen of wealth and position are observed to spend money on amusement of a rational kind. It is altogether a relief to contemplate our youthful aristocracy apart from the low and grovelling pursuits which too unfortunately constitute the normal condition of many of that body."[৩]

আসলে এই অভিনয়ে নাটকের বিষয় ও ভাববস্তুর প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি। এক্ষেত্রে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-চারণায় সঠিক ইঙ্গিত আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

"সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে শকুন্তলার অভিনয় ভালই হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় অথচ ১৮৭৩ সনের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র যে এই অভিনয় সফল হয় নাই বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।"[৪]

সমসাময়িক সংবাদপত্রের অধিকাংশ সম্পাদক বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়ের অতি-উৎসাহী সমর্থক হয়েছিলেন; তাঁরা বিচারক হতে পারেননি। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত রূপটি তুলে ধরেছেন। আর তার সমর্থন পাচ্ছি 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সারসে'র সমালোচনায়।

"The charming simplicity of the innocent retirement was misrepresented by the gorgeous luxury of a proud metropolis. The plain garb of Shakuntolah was substituted by the richest dress that the great family of the Sarat Babu was ever proud to possess. To see the simple Shakuntolah clothed in the splendid garments of the richest Hindu girls, and decorated with the most precious jewels brings to our mind a painful sight of the murder of truth and nature. Again, the scenes were most absurdly inconsistent. The scenes of an English play acted in the Oriental Theatre were made use of in the Bengali play of Shakuntolah."

'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে কিশোরীচাঁদ লিখেছেন, শকুন্তলা নাটকের ভাবসম্পদ অভিনয়ে রক্ষা পায়নি ; তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন, "The performance of Sakuntalah at Simla was a failure."[৬]

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক অভিনীত হয়েছিল নব্য শিক্ষিতদের দ্বারা। শকুন্তলার ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্মন্ত সেজেছিলেন প্রিয়মাধব মল্লিক, এক সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন ; দুর্বাসার ভূমিকায় নেমেছিলেন অন্নদা মুখোপাধ্যায়, পরবর্তী কালে তিনি হয়েছিলেন পুলিশ ইনস্‌পেক্টর ; অনসূয়া হয়েছিলেন অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি হয়েছিলেন হাইকোর্টের 'interpreter' ; প্রিয়ম্বদার ভূমিকায় যিনি নেমেছিলেন, তিনি হলেন ভুবনমোহন ঘোষ ; তিনি ছিলেন স্কুলশিক্ষক। এঁদের মধ্যে কেউ-ই ছিলেন না অশিক্ষিত।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক' কালিদাসের অমর নাটকের বিশ্বস্ত অনুবাদ ; কালিদাসের শ্লোকগুলি পর্যন্ত রায়মহাশয় পদ্যে (পয়ার ও ত্রিপদীতে) অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থকার পাত্রপাত্রী ভেদে সংলাপের চরিত্র বদলাননি ; এমন কি ধীবর পর্যন্ত দুষ্মন্তের ভাষায় কথা বলেছে। তাতে নাট্যরস ক্ষুন্ন হয়েছে। তবে সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই অনুবাদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। অধিকাংশ অনুবাদে বা মৌলিকগ্রন্থে বিদ্যাসুন্দরীয় ভাষা আধিপত্য করত। রায়মহাশয় এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, এমন কি যাত্রার বিখ্যাত পালালেখক নন্দলাল রায় তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' পালায় বিদ্যাসুন্দরীয় প্রভাব পরিহার করতে পারেননি। ভারতচন্দ্র বা নিধুবাবুকে পাশ কাটিয়ে কেউ দু-পা এগুতে পারতেন না। এক্ষেত্রে নন্দকুমার ব্যতিক্রম।

আশুতোষ দেবের বাড়িতে দ্বিতীয় নাটক অভিনীত হয় 'মহাশ্বেতা'। এ নাটক "বাণভট্ট প্রণীত সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের অন্তর্গত। সংস্কৃত গ্রন্থ নাটক নহে। বাবু মণিমোহন সরকার অভিনয়ের জন্য নাটকচ্ছলে তাহা রচনা করিয়াছেন।" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় এই নাটকের মূল্য আজ বিচার করবার উপায় নেই। তবে ঐ পত্রিকা থেকেই জানা যায়—"স্থানে স্থানে সঙ্গীতগুলি উৎকৃষ্ট রূপে রচিত হইয়াছে। বোধ হইল মূল বিশেষে প্রযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থের অবিকল অনুলিপি হইয়াছে। • যথা পুণ্ডরীক দর্শনে মহাশ্বেতা প্রণয় বদ্ধ হওন এবং সখী সমক্ষে তদ্বিষয়ের উক্তি, কপিঞ্জলের বন্ধুকে প্রবোধদান ইত্যাদি।"[৭]

নাটক এখানে সন্দর্ভ-জাতীয় রচনার প্রভাব এড়াতে পারে নি। নাটকের সংলাপ ও কথা-সাহিত্যের সংলাপ একজাতীয় নয়, এসব প্রশ্ন তখনও নাট্যামোদীদের মনে উদিত হয়নি। মণিমোহন সরকার 'উষানিরুদ্ধ' নামে একখানি নাটক লিখেছিলেন। এ নাটক মুদ্রিত হয়েছিল (১২৬৯)।

রামজয় বসাকের গৃহে যে নাটকের অভিনয় হয়েছিল, বস্তুত সেই নাটকই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মঞ্চ-সফল মৌলিক নাটক। এই নাট্যাভিনয়েব নির্দিষ্ট তারিখটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দিতে পারেননি। তবে এ অভিনয় যে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ এডুকেশন গেজেট ও হিন্দু প্যাট্রিয়টে এই মর্মে সংবাদ আছে। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' সে-যুগে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। রামজয় বসাকের বাড়িতেই দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়, তৃতীয় অভিনয় হয় গদাধর শেঠ মহাশয়ের বাসভবনে, চতুর্থ অভিনয় হয় চুঁচুড়ায়। প্রথম মৌলিক নাটকের পক্ষে এইরকম উপর্যুপরি অভিনয়ের গুরুত্ব আছে। সৌখীন নাট্যশালা আর পেশাদারী রঙ্গশালা এক নয়; কিন্তু যখন একই নাটকের উপর্যুপরি অভিনয় ঘটে, তখন এর ফলে সৌখীন নাট্যশালার সীমিত গণ্ডী লঙ্ঘিত হতে থাকে। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' নাটকের প্রথম অভিনয়ের কোন বিবরণ কোন সাময়িক পত্রিকায় পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারেও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

"চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্তমান টেগোর ক্যাসল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড়বাবু রাজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কুলীন কুল সর্বস্ব নাটক এই বাড়িতে চারবার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভবাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি সখের দল বাজাইত। আমি কুলাচার্য সাজিতাম।"[৮]

আরও একজন অভিনেতা এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তী বাংলা নাট্যমঞ্চের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ইনি ছিলেন ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের অভিনেতা—ইংরিজি নাট্যাভিনয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন মিঃ ক্লিঙ্গারের অধিনায়কত্বে ও শিক্ষকতায়।

স্থায়ী নাট্যশালার আকৃতি

এই দুইটি অভিনয়ের পর বাংলা নাটক অভিনয়েব জন্য একটি স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপনের কথা কারও কারও মনে এল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর বিদ্যোৎসাহিনী সভার তরফ থেকে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। সিংহবাবুদের নাট্য-উৎসাহ পুরাতন; শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারের অন্যতম উদ্যোক্তা—সে ছিল ১৯৩১-৩২ সালের কথা।

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ থেকে বহুবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়—মাত্র আঠার বৎসরের ইতিহাস। স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা নাটকের সঙ্গে আধুনিক মঞ্চেব যোগাযোগ গভীরতর ও ঘনিষ্ঠতব হবে।

এই মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক হোল 'বেণীসংহার'—১৮৫৭, ১০ই এপ্রিল; রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুবাদ করে দেন। বেঙ্গল হরকরা (১৮৫৭, ১৫ই এপ্রিল) এই অভিনয়েব এক সমালোচনা প্রকাশ করেছিল। অভিনীত নাটকটিও মুদ্রিত হয়েছিল, এই মঞ্চেব দ্বিতীয় অভিনীত নাটক হোল 'বিক্রমোর্বশী নাটক'— স্বয়ং কালীপ্রসন্ন এই নাটক অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় 'বেণীসংহার' নাটকেব অভিনয়াদি সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে।

"মান্যবর নটগণ যথাবিহিত নিয়মক্রমে অনুরূপ করায় দর্শক মহাশয়দিগের প্রীতিভাজন ও শত শত ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছিলেন।"

মঞ্চ সম্বন্ধে কোন তথ্য পরিবেশিত হয় নি। বিক্রমোর্বশী নাটক ১৮৫৭ সনের ২৪শে নবেম্বর মঞ্চস্থ হয। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় এই অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

"বুদ্ধিস্বরুচি বিজ্ঞতা বিলাস ও সম্ভ্রমে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের দেশীয় সমাজের যাঁহারা প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তাঁহারা সকলেই মহার্ঘ্য শীতবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা নাট্যশালাব আয়তনের অনুপাতে বেশি হইয়াছিল। আমবা অত্যন্ত দুঃখের সহিত শুনিলাম দর্শকদের টিকিটের জন্য, চৌরঙ্গীর অভিজাত বর্গের মধ্যে অনেকে, চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বিচাবে টিকিট বিতরণ সম্বন্ধে জনসাধারণের যতই আপত্তি থাকুক না কেন, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতি আমাদের অবিচার করা উচিত নয়।"[৯]

কালীপ্রসন্ন স্বয়ং নায়কের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেছিলেন; হিন্দু প্যাট্রিয়টের মতে তাঁর হাবভাব রাজোচিত হয়েছিল, কণ্ঠস্বরও ছিল রাজাসুলভ;

নাটকের প্রথম দৃশ্যে বিদূষকের সঙ্গে রাজার আলাপ মনোজ্ঞ হয়েছিল; শেষ দৃশ্যে উর্বসীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন প্রীতিপ্রদ হয়েছিল। **“Every word he gave utterance to was suited to the action which followed it.”** রাজ-রাজড়ার কাহিনীসমৃদ্ধ এই নাটকে কালীপ্রসন্ন তাঁর আড়ম্বরপ্রিয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন মঞ্চে। তিনি নিজে মূল্যবান মুক্তার মালা পরে মঞ্চাবতরণ করেছিলেন। কোন কোন পত্রিকা অবশ্য লিখেছিল যে, তাঁর কণ্ঠস্বর প্রথম কয়েক সারির দর্শকের কেবল শ্রুতিগোচর হয়েছিল। সে-যুগে স্বর-নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন যান্ত্রিক কলাকৌশল অবলম্বিত হোত না। কিশোরীচাঁদ ‘বেণীসংহারে’র অভিনয় অপেক্ষা ‘বিক্রমোর্বশী’র অভিনয়কে অধিকতর সার্থক (**more brilliant**) বলেছিলেন।[১০]

বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে আর কোন নাটক অভিনীত হয় নি, তবে পঠিত হয়েছিল, এবং সেই পাঠের সঙ্গে গীতগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত হয়েছিল। ‘মালতী-মাধব’ ও ‘সাবিত্রী-সত্যবান’ নাটক দুখানি এই সৌভাগ্যের অধিকারী।

সেদিন রঙ্গমঞ্চ ছিল সৌখীন নব্যবাবুদের ঐশ্বর্য ও শক্তিমত্তা প্রকাশের মাধ্যম। তবু তাঁরা প্রশংসাভাগী হয়েছিলেন। এর কারণ হোল ঐতিহাসিক। “এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর পথের অগোচর রহিয়াছে তাহার পুনরুজ্জীবনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি।”[১১]

রামজয় বসাকের বাড়ি বা আশুতোষ দেবের বাড়িতে নাট্যশালা তৈরী করা হয়নি, অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে অভিনয় হয়েছিল। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। ফলে ঐসব দৃশ্যপট নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি পায় নি। এই মঞ্চ দুটি ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত সন্তানদের সৃষ্টি, ধনীর ঐশ্বর্যবিলাসের মঞ্চ নয়। বিদ্যোৎসাহিনী নাট্যশালা প্রথম ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ১৮৫৬ সনে এই রঙ্গমঞ্চ -প্রতিষ্ঠিত হবার সংবাদপাওয়া যায়; আর এই মঞ্চের যবনিকা ওঠে ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে। এবার আর দৃশ্যপট প্রভৃতি অন্যত্র থেকে চেয়ে আনা হোল না। নাটকের প্রয়োজন অনুসারে সব কিছু নির্মিত হোল। বলা বাহুল্য এই জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে স্থায়ীরূপে দেখতে সবাই চাইবে এবং সে-যুগে এই প্রকার দাবীও উঠেছিল।

কালীপ্রসন্ন নানাবিধ উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে; তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বৎসর।

বেলগাছিয়া নাট্যশালা

একই প্রকার উৎসাহ দেখা গেল পাইকপাড়ার সিংহবাবুদের ক্ষেত্রে। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁদের বেলগাছিয়া ভবনে এক নাট্যশালা স্থাপন করেন। এই নাট্যশালা বেলগাছিয়া নাট্যশালা নামে বাঙলার সংস্কৃতি-জগতে সুপরিচিত। "এই নাট্যশালা বঙ্গ সাহিত্যে নবযুগ আনিয়া দিবার পক্ষে উপায় স্বরূপ হইয়াছিল।"[১২] পাইকপাড়ার রাজাদের এই নাট্য-উৎসাহে সহযোগী ছিলন বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ। "এই নাট্যশালার অভিনেতাদের মধ্যে সকলেই ছিলেন সে-যুগের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী।"[১৩] শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই নাটক নিয়ে ১৮৫৮ সনের ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। রত্নাবলী আধুনিক নাটক নয়, কিন্তু মঞ্চস্থ হোল আধুনিক নাট্যশালায়। বিষয়টি স্মরণযোগ্য।

কিন্তু এই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য নবীনদের কম উদ্যোগ-আয়োজন করতে হয়নি। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মঞ্চসজ্জার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। দৃশ্যপট অঙ্কনে নামকরা শিল্পীরা সহযোগিতা করেছেন। "নাট্যশালা অতি পরিপাটি হইয়াছিল।"[১৪]

এমন কি, ঐকতান বাদনে গোরার বাদ্য ভাড়া করা হোল না। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই ঐকতান দল গঠন করেন, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেন যদুনাথ পাল। ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা হয়; শাস্ত্রীয় সুর আরোপ করা হয়। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন সে-যুগের নব্য সমাজের মধ্যমণিগণ—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিশ মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং স্বয়ং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্র কালীপ্রসন্ন সিংহের মত নায়ক-ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি; যোগ্য অভিনেতাদের সম্মান দিয়েছিলেন।

এক কথায় অভিনয় হয়েছিল পরিপাটী। এই পারিপাট্য আরও বহুগুণ বেড়ে গেল 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়কালে।

"রঙ্গভূমির পট উৎক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সম্মুখে এককালে চির নীহার-মণ্ডিত হিমালয়ের ভীষণ প্রকৃতি ও তাহার উপযুক্ত প্রহরী একজন ভীম কায় দৈত্য বিদিত হয়।

* * * * *

আমরা স্বয়ং বেলগাছিয়ার রঙ্গভূমিতে বকাসুরের অনুকারক কুশীলবের অসিচর্মকবচাদি প্রাচীন হিন্দু যোদ্ধাদিগের বিচিত্র বেশভূষা ও অপূর্ব-কায়িক সৌষ্ঠব দেখিয়া যে রূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি অন্যত্র শর্মিষ্ঠার অভিনয়ে তদ্রূপ হইলে দর্শকদিগের কাহার পক্ষে আক্ষেপ করিতে হইবে না।"[১৫]

'শর্মিষ্ঠা' নাট্যাভিনয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; তাঁর সাক্ষ্য এই কারনেই প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য বলে গ্রহণ করা যায়। 'শর্মিষ্ঠা' নাট্যাভিনয়ে দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা রচনায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ নাটকের প্রাণরসের সঙ্গে অভিনয়-উপকরণের সামঞ্জস্য ছিল।

আর এক সাংবাদিক ও সুধীশ্রেষ্ঠের সাক্ষ্য নেওয়া থাক। "We are glad to state that the scenic arrangements and accoutrements of the corps dramatique pictured forth with a marvellous accuracy of the Indian life, habitudes and usages of the distant age. Our antiquarian friends present on the occasion bore cheerful testimony to their accuracy, * * * * * The court was splendidly represented, the courtiers observing fidelity of manner and bearing which those who accuse our countrymen of deficiency in either ought to have witnessed to disabuse themselves of their erroneous ideas. The performance was not charged with any appreciable exaggeration."[১৫ক]

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই নাট্যশালার নাট্য-শিক্ষক, তাঁর নট-জীবনের উন্মেষ ছাত্র-জীবন থেকে। বিদেশী সাহিত্য ও নাট্য-বিশেষজ্ঞদের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তিনি শুধু নটশ্রেষ্ঠ নন, তিনি নাট্যসাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত। এই 'নট-শিরোমণি'কে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক উৎসর্গ করতে গিয়ে 'মহাঅভিমানী' মাইকেল মন্তব্য করেছিলেন—

"আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গ-দেশীয় নটকুলশিরোমণি, ইহার দোষগুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত

থাকিবেক না। বিশেষতঃ আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতেন।”

মাইকেলের এই প্রশংসাপত্রের মূল্য অকিঞ্চিতকর নয়। কিশোরীচাঁদ মিত্র এঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—“Life and soul of the performance.” সিংহবাবুরা অকাতর অর্থব্যয়ে দৃশ্যপট তৈরি করেছিলের; এবং সে দৃশ্যপট ভারতীয় ভাবমণ্ডিত হয়েছিল। এ ব্যাপারে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও কেশবচন্দ্র ছিলেন পরামর্শদাতা।

এই নাট্যশালার দর্শকেরা সবাই হতেন আমন্ত্রিত। নাট্যশালার দ্বার অবারিত ছিল না। অভিনীত নাটকের প্রাণধর্মের মধ্যে যে সংযম ও রুচি-নিষ্ঠার চিহ্ন আছে, তার পরোক্ষ কারণ এই নিয়ন্ত্রিত শ্রোতৃসমাজ।

দর্শকেরা অভিনয় দেখে বলেছিলেন, “এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা যত অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এ সম্প্রদায়কে সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবে।”[১৬]

পনের বৎসর পরে কিশোরীচাঁদ মিত্র স্মৃতি-চর্চা করতে গিয়ে বলেছেন, “a great success.”

বেলগাছিয়া নাট্যশালাকে অবলম্বন করে বাংলা নাটকের একটি সমৃদ্ধতর যুগের উদ্ভব ঘটতে পারত। কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্ণধারগণ নাট্যশালাটিকে সৌখীনতার মঞ্চ অপেক্ষা উন্নততর কিছু করতে পারেননি; হয়ত চাননি। অনুবাদ-নাটক দিয়ে এই মঞ্চের পাদপ্রদীপ আলোকিত হয়ে ওঠে। এবং একই 'রত্নাবলী নাটক সাতবার ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়।

“What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play.”[১৭]

প্রতিভাবান ব্যক্তি যুক্ত হতেই এল মৌলিক নাটক; ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ঐ মঞ্চে ‘শর্মিষ্ঠা’ অভিনীত হোল। একাধিকবার অভিনীত হোল ঐ মঞ্চে শর্মিষ্ঠা। অথচ শর্মিষ্ঠা’ নাটকের মধ্যে মাইকেল-প্রতিভার সামান্যতম প্রকাশ।

‘রত্নাবলী নাটকের ইংরিজি অনুবাদের বিজ্ঞাপনে মধুসূদন লিখেছিলেন:

“The friends who wish that our countrymen should possess a literature of their own, a vigorous and independent literature, and not a feeble echo of everything sanscrit, will rejoice to hear that a taste for the Drama is beginning to develop itself rapidly among

the higher classes of Hindu Society. I am fully convinced that the day is not far distant, when the princely munificence of such patrons as the Rajas of Paikparah will call into field a host of writers who will discard Sanscrit models and look for higher sources for inspiration."[১৮]

অথচ এই বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চেই মাইকেলের দ্বিতীয় কোন নাটক অভিনীত হয়নি।

ঐ মঞ্চ ছিল সৌখীনতার মঞ্চ, জীবন-নির্ভর শিল্প সৃষ্টির মঞ্চ নয়, অথচ মাইকেলের চাহিদা ছিল তাই। রাজা প্রতাপচন্দ্রের মনে উৎসাহের কোন অভাব ছিল না; বরং দুই-একটি ঘটনা থেকে নাট্যানুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর প্রচণ্ড ব্যগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে। গৌরদাস বসাক মহড়ার সময় কোন-কোন দিন অনুপস্থিত ছিলেন। রাজা লিখছেন :

"I am really ashamed at your conduct. You are the friend who is determined to put me to shame not only before the amateur company, with which we have identified ourselves, but the audience that we expect on the night of performance. Barring yourself, there is not a single individual who trifles or absents himself from the rehearsal night···You must know that after so much trouble, anxiety, expense and what not, I am not the man to abandon the idea or throw the theatre and all to the dogs. No; call me a fool or vagabond or any name you wish, I am not so silly as to relinquish one of my favourite hobbies, the drama."[১৮ক]

চিঠিতে বিদেশী ভাষায় লিখতে গিয়ে ভাষা ব্যবহারের প্রলোভনে অতিকথন অনেকখানি হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার সেই সত্যযুগে এটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু একথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রাজা তাঁর অন্যতম প্রিয় খেয়ালকে বর্জন করতে চান না। তবে সে খেয়াল 'হবি'র ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। মাইকেলের উৎসাহ নিছক 'হবি' নয়। প্রহসনদুটি অভিনীত হোল না, কিন্তু ঐগুলির মুদ্রণ-ব্যয়ভার বহন করলেন পাইকপাড়ার ছোট রাজা। কাজেই আপত্তিটা ব্যক্তিগত নয়।

তাই উৎসাহের আতিশয্যে মাইকেল যা কিছু বলে ফেলেছিলেন, তার একটা বড় অংশই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৬১ সাল—সামান্য ব্যবধান। কিন্তু মাইকেলের অভিজ্ঞতার মানচিত্রের যেন দুই মেরু! 'Higher classes of Society' শুধু মাইকেলের প্রহসন দুটি অগ্রাহ্য করেননি; তাঁরা অগ্রাহ্য করেছেন 'সুভদ্রাহরণ', যার পুরো একটি অঙ্ক লিখিত হয়েছিল। তাঁদের কাছে সমর্থন পায়নি 'রিজিয়া' নাটকের পরিকল্পনা, কারণ মুসলমানী বিষয়বস্তু। এইভাবে 'higher sources of inspiration' অঙ্কুরেই কীটদষ্ট হোল।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় প্রভূত আশা জেগেছিল মাইকেলের মনে। আর মাইকেলের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যই এই নাট্যমঞ্চের এতটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব। হতাশাও তাই বড় তীব্র হয়েছিল মাইকেলের। কৃষ্ণকুমারী নাটকের পাণ্ডুলিপি হাতে করে তিনি লিখেছেন—"Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall foreswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese"[১৯] এ হুমকি কেউ গ্রাহ্য করেনি; বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' অভিনীত হোল না। শর্মিষ্ঠা ব্যতীত তাঁর কোন নাটকই ঐ মঞ্চে অভিনীত হয় নি, অথচ শর্মিষ্ঠা ছিল অপেক্ষাকৃত প্রাচীন রীতির রচনা। "I wish you would stir them up, সখে মাধব্য! It is a downright shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tentamount to it, the gaze of Bat-like men!"[২০]

মাইকেলের এই ক্রোধ মাত্রাহীন হতে পারে, কিন্তু যুক্তিহীন ছিল, একথা কি বলা যায়?

মাইকেলের প্রহসন তাঁরা অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু গ্রাহ্য হোল বিদেশী প্রহসন; তার মহড়া চলতে লাগল। হাসতে তাঁরা চান, কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয়। আঁচড়টি যেন গায়ে না লাগে। বিঘ্নকে পাশ কাটিয়ে সখের হাওয়া প্রবাহিত হোক, এমনি করে বাতায়নের অর্গল তাঁরা মুক্ত করতে প্রস্তুত। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যু এই নাট্যশালাকে অধিকতর অধোগতি থেকে বাঁচিয়ে দিল। একথা স্বীকার করতেই হবে এই মঞ্চে যে সাংগঠনিক কলা-কুশলতা দেখা দিয়েছিল, তা অভূতপূর্ব। রুচিবান দর্শকগোষ্ঠি, প্রতিভাবান

অভিনেতাদের সহযোগিতায় এই নাট্যশালার ইতিহাস আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বন্ধ্যাত্ব এই নাট্যশালার অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। নাটক ও নাট্যকার আকস্মিকভাবেই দেখা দিল, যেন বাংলাদেশের হৃদয় অনেক দিন ধরে এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল। প্রথম নাটক রচনার পর সেই শক্তিধর অথচ বিনয়ী নাট্যকার বললেন, "**Ease can be only obtained by practice and I am as yet a novice.**"[২১] এই 'নভিশ'কে অভিজ্ঞ নাট্যকার করবার সুযোগ সেদিন আমরা দিইনি। নাটক বিশুদ্ধ কলা যতটা, ততটাই ফলিত কলা, প্রয়োগ ব্যতীত কুশলতর হতে পারে না। 'মহা-বিদ্রোহে'র যুগে এই নাট্যশালা ভারতীয় 'নীরো'দের প্রমোদ-ভবন শুধু হতে চেয়েছিল, শিল্প-নিকেতন নয়। জীবনের তাপে শিল্প উত্যক্ত হয় না, উত্তপ্ত হয়। উত্তাপ ব্যতীত বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটে না। নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালার স্থান চিরকালের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে। তার ব্যর্থতা, তার আয়ু-সংক্ষিপ্তি—সবই নাট্যরসিকদের কাছে পরম বেদনার ব্যাপার। এই সময়ে আরও কয়েকটি নাট্যশালার উদ্ভব হয়।

অন্যান্য নাট্যশালা

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা (১৮৫৯—১৮৭৩) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঞ্চকে "**an institution**" বলা হয়েছিল। এখানে 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মালতীমাধব', 'রুক্মিণীহরণ' অভিনীত হয়। 'বিদ্যাসুন্দর নাটক' যতীন্দ্রমোহনের রচনা, নাট্যকার অবশ্য সযত্নে বিদ্যার গর্ভধারণ, শ্মশানে সুন্দরের আনয়ন প্রভৃতি অংশ বাদ দিয়েছেন। নাটকে যা নেই, দর্শকদের তা কল্পনা করে নিতে বাধা ছিল না। কারণ এ কাহিনী খুবই পরিচিত, আর তখনও গোপাল উড়ের পালা জনশ্রুতির পর্যায়ে নিমজ্জিত হয়নি। বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত আর সব নাটকই রামনারায়ণ তর্করত্নের রচনা। এগুলির মধ্যে ততটুকুই নাটকত্ব আছে, যা অনুসরণে থাকা সম্ভব। আর আধুনিকতা এগুলির কোন কোনটির মধ্যে ছিটেফোঁটা থাকলেও তার জন্য কারও মাথাব্যথা ছিল না। এই মঞ্চে তিনখানি প্রহসন অভিনীত হয়, 'উভয় সঙ্কট', 'চক্ষুদান' এবং 'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। তিনখানি প্রহসনই প্রকৃষ্টরূপে হসনের জন্য রচিত। আর প্রহসন যখন কেবল হসনের জন্য রচিত হয় তখন তা 'সঙ' জাতীয় রচনা হয়, এবং তখনই তার মরণ

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫—১৮৬৭) মাইকেলের বেদনা অপনোদন করতে চেয়েছিল "কৃষ্ণকুমারী" ও "একেই কি বলে সভ্যতা" মঞ্চস্থ করে। "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রহসনের অভিনয়-বিবরণী থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক।

"প্রথমে নট ও নটী রঙ্গভূমিতে আগমন করিয়া সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিয়া যান।"

উদ্যোক্তারা মাইকেল থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। মাইকেলের উৎকণ্ঠা অবশ্যই ছিল দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন, কিন্তু উপায় ছিল ভিন্ন।

প্রধান প্রধান সৌখীন নাট্যমঞ্চে শিল্পসৃষ্টি ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল সৌখীনতা। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, বেলগাছিয়া নাট্যশালা, পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালা—সর্বত্রই সৌখীনতা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্যের সাক্ষাত মেলে না। মাইকেলের ইচ্ছার সঙ্গে এই নাট্য-প্রযোজকদের ইচ্ছার ছিল বহু যোজন ব্যবধান।

ভিন্নতর উদ্দেশ্য নিয়ে এল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (১৮৬৬—১৮৬৭)। এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। এই যুগ বিদ্যাসাগরের যুগ। রামজয় বসাকের বাড়িতে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় বা সিঁদুরিয়াপটির রাম গোপাল মল্লিকের গৃহের 'বিধবা বিবাহ নাটকের' অভিনয় (১৬ এপ্রিল, ১৮৫৯) ঐ সংস্কার-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল। স্বয়ং বিদ্যাসাগর অভিনয়-কালে উপস্থিত থেকে অশ্রুমোচন করতেন। এই বিক্ষিপ্ত প্রয়াস সংহততর রূপ পেল জোড়োসাঁকো ঠাকুরগৃহে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্মৃতি-চারণায় বলেছেন, গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে তাঁরা নাট্যাভিনয়ে উৎসাহী হন। গোপাল উড়ের যাত্রা নৃত্যসহ অঙ্গভঙ্গীসমৃদ্ধ গীত মাত্র; আর জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অভিনয়ে যেমন গীত ছিল, নৃত্য ছিল, তেমনি শুধু অঙ্গভঙ্গী ছিল না, ছিল সংলাপ। জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল দস্তুরমত শাস্ত্রসম্মত নাটক অবলম্বনে। পূর্বেই বলেছি, এঁদের নাট্যাভিনয়ের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল। হয়ত ঐ গৃহের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল স্বদেশপ্রীতি। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বহুবিবাহ, হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা ও পল্লীগ্রামস্থ জমিদারগণের অত্যাচার—এই তিনটি বিষয়ে নাটক লেখার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধে কোন নাটক পাওয়া যাচ্ছে না। নবনাটকের ভূমিকায় অর্থাৎ প্রস্তাবনায় পাচ্ছি এই গান—

জাগো হে ভারতবাসি, চিত্তকমল সুপ্রকাশি,
এ যে শুভকর কর্মনাশি, ত্যজ হে ঘুমঘোর।

অভিনয়ের শেষে ভারত-বাক্য হিসাবে বলা হোল :

আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গবেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনার বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন ও দুষ্প্রথা আর রাখতে চাবেন ?

দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থকার বিপিনমোহন সেনগুপ্ত লিখেছেন :

"সত্য বটে, এতন্নগরীস্থ সম্পত্তিসম্পন্ন মহোদয়রা সময়ে সময়ে অভিনয় সন্দর্শনে পরাঙ্মুখ নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে চিত্তরঞ্জক পরিণতি মিলনসূচক সংস্কৃত অনুবাদিত ও অভিনব প্রণীত, নাট্টাভিনয় নিচয়, যখন অভিনয়ের সমীচীনতা সাধারণের অন্তর্নিহিত হইবে, তখন সহজেই তত্তাবৎ অনুষ্ঠিত ও আচরিত হওয়া সুদূর সম্ভব নহে। যে মতে স্বদেশ হিতকরী চিত্তাকর্ষণী শোচনীয় ঘটনাবলীই সর্বাগ্রে তাঁহাদিগের ঈপ্সিত ও অভিলষিত হওয়া কর্ত্তব্য।"

নাট্যকার বিপিনমোহন হিন্দুমহিলা নাটক (১৮৬৮) অর্থাৎ হিন্দু যোষাদিগের হীনাবস্থা ব্যঞ্জক দৃশ্যকাব্য রচনা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন জোড়াসাঁকো নাট্যশালার অধ্যক্ষদের কাছে। কিন্তু "প্রোক্ত নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন হওয়ায়" এই নাটক অভিনীত হয় নি।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অন্যবিধ মৌলিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে—মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ হয়েছিল। এছাড়া গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বাবু বিলাস' অভিনীত হয়েছিল।

কিন্তু প্রধানত সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকই এখানে সমাদৃত হয়েছে।

বহুবাজার বঙ্গনাট্য সমাজ

(১৮৬৮—১৮৭৫)

বহুবাজার বঙ্গ নাট্যসমাজে মৌলিক নাটক অভিনীত হয়; কিন্তু সে নাটকগুলির পৌরাণিক বিষয়বস্তু ও যাত্রাধর্মী রচনারীতি নব্য নাট্যআন্দোলনের সঙ্গে কতটা সহযোগিতা করেছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অথচ এই নাট্যালয়ের সাজসজ্জা ও অভিনয় যুগোপযোগী ছিল।

> "অর্থব্যয়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছিল এবং দৃশ্য পটগুলিও প্রয়োজনানুরূপ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ দর্শকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ অভিনেতারা উপযুক্ত ও রুচিসম্পন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। সর্বশেষে, অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। অভিনয়ের বিষয়বস্তু খুব করুণ হওয়াতে অনেকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই। কিন্তু অভিনয়-নৈপুণ্যের কোন অভাব হয় নাই, কারণ প্রায় সকল দর্শকই অশ্রুধারার দ্বারা পোশাক নষ্ট করিবার ভয়ে রুমাল বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছিল।"

(ন্যাশন্যাল পেপার, ২৫ মার্চ, ১৮৬৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ)।

জাতীয় নাট্যশালার দাবী

মাইকেল একটি কথা বারবার উচ্চারণ করতেন—সে যুগে তা ছিল সকলের প্রাণের কথা।

মাইকেল চাইতেন জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালা। শর্মিষ্ঠার উৎসর্গ পত্রে তিনি সিংহভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে বলেছেন—

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশ-হিতৈষিতা গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যা বিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

জাতীয় নাট্যশালার সংগঠক তাঁদের এখানে বলা হোল না; শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজি অনুবাদের বিজ্ঞাপনে বলা হোল—'**Shermista is to be acted at the elegant Private theatre attached to the Belgatchia villa of the Rajas of Paikpara. Should the Drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen —the earliest friends of our rising National Theatre**".

১৮৬০ সালে ২৪ শে এপ্রিল রাজনারায়ণকে লিখছেন:

You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have farces. (জীবনচরিত—পৃঃ ৩১০—৩১১)।

জাতীয় নাটক ব্যতীত জাতীয় মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন ;

"If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation-stone of our National Theatre." (মধুস্মৃতি—১৬২)

মধুসূদন জাতীয় নাটক সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। জাতীয় জীবনের দ্বন্দ্বমুখর অধ্যায় থেকে তিনি নাটকের কথাবস্তু সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। অপর পক্ষে ধনাঢ্য সৌখীন নাট্যরসিকেরা চাইতেন বাস্তব-জীবন বিরহিত সৌখীন নাটক ও সৌখীন নাট্যশালা। এই দুইটি চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্যের সুযোগ নেই।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে অনেকেরই দৃষ্টি সমপরিমাণে পরিচ্ছন্ন ছিল না ; কিন্তু সবাই যে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ চাইছিলেন তার প্রমাণ আছে। প্রথম যুগে হিন্দু প্যাট্রিয়ট বঙ্গসুধীজনকৃত ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে বারবার বাংলা নাটক অভিনয়ের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্যও আবেদন করেছেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সমালোচনান্তে লেখা হোল :

"With all its excellencie: the Biddoth Shahinee Theatre is a private establishment, though its very existence is a sign of the time. This attempt to cultivate the Drama is justly praiseworthy, but what we would like to have is a public institution of the kind of a permanent character. The age is much advanced to wait for an elaborate dissertation on the usefulness of such an institution in order to get it established."

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার অভিনয় দেখে সোৎসাহে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখলেন :

"In Drama as in politics the Hindus are in one of those epochs of transition—which are charactristics of a nation that has made rapid progress in Education, among whom the old times are being changed, the old ideas exploded, and the old

watchwords lost and old marks swept away. We hope and trust that acting will soon be raised to the dignity of an art, and not followed as a profession by men belonging to the low class of yatrawallas. We advocate establishment of a public theatre as the best way of preparing the drama."

নাটক যখন ধনীর প্রাসাদের দেউড়ির মধ্যে আবদ্ধ, শিল্প যখন বিলাসের উপকরণ বা মৌতাত মাত্র হয়ে রয়েছে, তখন সাবা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনা চলেছে।

বিকৃত নাট্যরুচি

কলকাতার ধনী সমাজের সৌখীনতা সমাজের নিম্ন স্তরেও ছড়িয়ে পড়ল, শুধু কলকাতায় নয়, মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে।

নাটকের কোন মানদণ্ড তৈরি হবার পূর্বেই নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করল। নাটকেব দর্শক তৈরী হবার পূর্বেই নাটকের প্রকাশ-সিদ্ধির পথে বহু পথিকেব আনাগোনা শুরু হোল।

স্বল্পবিত্ত ও স্বল্পশিক্ষিতদের নাট্যকৌতুহল পুবাতন যাত্রাওযালাদেব নিন্দিত পদচিহ্ন অনুসরণ করল।

"নগর নিত্য নূতন রঙ্গ। এক সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের গর্জনের বিশ্রাম ছিল না, এবং তন্নিঃসৃত গোলাপকান্ত, নলিনীকান্ত, কামিনীবিলাস, দূতীবিলাস, প্রভৃতি কাব্যকরকাভিঘাতে বাগ্‌দেবীর অস্থি চূর্ণ হইবাব উপক্রম হইয়াছিল, তাহাতে সহৃদয় বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রেই ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত সে বিপদ হইতে বঙ্গভাষাকে রক্ষা করেন। এক্ষণে পুনঃ নাটকের শিলাবৃষ্টিতে প্রায় সেইরূপ আপদ উপস্থিত, প্রায় প্রত্যেক গলিতে নাটক অভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্ম লোক মাত্রেই নাটক লিখিবাব জন্য এক প্রকার উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা অনাথিনী বঙ্গভাষাকে যথেচ্ছামত অঙ্গ ভঙ্গ করিয়া জনসমাজে উপনীত করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিতেছেন না। যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার কবিতেছেন"। (রহস্যসন্দর্ভ, সংবৎ ১৯২৯)। নানা ব্যঙ্গাত্মক রচনা এই সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে প্রহসনের নামে এবং সমাজ সংস্কারের সদিচ্ছায়। "বুঝলে কিনা," "কিছু কিছু বুঝি" প্রভৃতি অত্যন্ত নিম্নরুচির গ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল। সৎ নাটকগুলিব আবার রূপান্তর

সাধন চলতে লাগল। আমরা ইতিপূর্বে অন্নদাপ্রসাদ রচিত 'শকুন্তলা গীতাভিনয়ে'র কথা বলেছিলাম। সে ছিল মৌলিক রচনা, যাত্রার প্রয়োজনে রচিত। কিন্তু থিয়েটারী নাটকও একই রকমভাবে পরিবর্তিত হোল। হরিমোহন কর্মকার করেছেন, কি অন্য কেউ করেছেন, এটা বড় কথা নয়। বড় হোল মঞ্চের নাটক বিকৃত হোল। রত্নাবলী গীতাভিনয় প্রকাশ পেল, পদ্মাবতীরও গীতাভিনয়-সংস্করণ হোল; শর্মিষ্ঠাও বাদ পড়ল না। নাট্যরস কিরূপ গেঁজিয়ে উঠেছিল, শর্মিষ্ঠা গীতাভিনয়ের অভিনয় বিবরণ থেকে তার একটু নমুনা দেওয়া গেল:

"ক্রমে যাত্রারম্ভ হইলে (সখের যাত্রা যে সময় হইয়া থাকে) পাছে আমরা সাবেক ঘুঁটের যাত্রার ভিস্তি কালুয়া ভুলুয়া বিস্মৃত হই বা ইতিহাসের পাতা হইতে তাহাদের নাম উঠিয়া যায় ও তাহাদের রহস্য শ্রবণ ও ভাবভঙ্গী দর্শনে জন্ম সার্থক করিতে না পারি, এ কারণে অভিনেতৃ মহাশয়েরা আমাদিগকে ভিস্তীর নাচ রঙ্গ রসিকতায় বঞ্চিত করেন নাই।" (মধ্যস্থ, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২)।

আমরা ইচ্ছা করেই সমগ্র উদ্ধৃতিটি দিলাম না। কারণ রুচির অধোগতির সবটুকুই কি প্রকাশযোগ্য ?

সখের অভিনয় অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করল।

নাট্যাভিনয়ের দুর্দশা দেখে 'নব প্রবন্ধ' পত্রিকায় ঐরূপ প্রস্তাব পেশ করা হোল:

"এদেশে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নাটকাভিনয় ও গীতাভিনয়ের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ আমোদ যে পূর্বকালীন জঘন্য হাপ আখড়াই ও পাঁচালীর অপেক্ষা মঙ্গলজনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কতকগুলি অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতকগুলি বালক মিশিয়া ইহাকে জঘন্য পেশাদারের যাত্রার অপেক্ষাও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অতি কদর্য পুতুলনাচওয়ালাদের ন্যায় লোকের বাটিতে ইষ্টেজ ফিট করিয়া লুচিমোণ্ডা মদ মারিয়া বিশুদ্ধ নাট্যামোদকে কলঙ্কদোষে দূষিত করিতেছে। পাঠক মহাশয়দিগের নিকট সেই২ নাটকগুলির ও সমাজের নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।... ... ...

বিশুদ্ধ নাট্যামোদ যে এদেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে তাহার অনুমাত্র ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান

করিয়াছি যে, যে সকল অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সৌখীন, নেহাত ইয়ার লোক ও সৌখীন অভিমানে পরিপূর্ণ। সর্বদা তাহাদের মনের মত মন যোগাইতে না পারিলে অথবা কিঞ্চৎ ক্রটি হইলে অমনি মুখ ভার করিয়া বসেন এবং অভিনয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ কল্লেন না।

* * * * *

অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদের তো দশা এই, ইহাদের দ্বারা যে বহুকাল নাট্যাভিনয় এদেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের দুরাশা মাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থলে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নটনটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা সমুদয় ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে, উর্দ্ধতন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযাগ দ্বারা অভিনয়কার্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবে।"

(নব-প্রবন্ধ, শ্রাবণ ১২৭৪ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত, পৃ-৮৮-৮৯)।

সৌখীন নাট্য-কৌতূহল ধনীগৃহের দেউড়ি ডিঙ্গালো। মধ্যবিত্ত ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় সখের নাটকের দল গড়ে তুলতে লাগল। এই রকম একটা সখের দল হোল 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ', নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশের মুস্তফী প্রভৃতি ছিলেন এই দলের সদস্য। ১৮৬৮ সনে সপ্তমী পূজার রাত্রে এঁরা বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের গৃহে 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করেন। ঐ নাটক দ্বিতীয়বার অভিনীত হোল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে। পর পর সাতবার এই নাটক অভিনীত হলো। এই দলের সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দিল। এঁরা দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক লীলাবতী অভিনয় করলেন ১৮৭২ সনের ১১ই মে। এবারকার অভিনয় কেমন হয়েছিল, সে-সংবাদ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হোল যে, উদ্যোক্তারা এবার টিকিট বেচে অভিনয় দেখান। এঁদের সকলেই ছিলেন স্বল্পবিত্ত ভদ্রসন্তান।

গিরিশচন্দ্র লিখছেন—"এ সম্প্রদায় স্থাপনে আমার একজন পূর্ববঙ্গীয় বন্ধু উদারচেতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ উৎসাহী। তাঁহার

উদ্যম ও উৎসাহ না থাকিলে সম্প্রদায় স্থাপিত হইত না, তাহারই অর্থব্যয়ে আক্‌ড়া খরচ চলিত। বহুদিন লীলাবতীর আক্‌ড়া চলে।

... ...

অর্থবলহীন সম্প্রদায়ে বালক সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। নগেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দু, ধর্মদাস প্রভৃতি বহুকষ্ট ও লাঘবতা স্বীকার করিয়া এই কার্য করিতেন।
(নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর, ১৮-১৯)

লীলাবতীব অভিনয়েব খুব বেশী সংবাদ সংগ্রহ করা আজ সম্ভব নয়। তবু এই অভিনয়ের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

"শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাসবাবুর তুলিতে অঙ্কিত; সামান্য চাঁদার অর্থে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত যে দলে দলে লোক টিকিটের জন্য উমেদাব।"

রঙ্গভূমি অতি প্রশস্ত ও সুন্দর; আটখানি দৃশ্য ছিল, তন্মধ্যে গ্রাম দৃশ্য ইংলণ্ডেব রাজপ্রসাদ, সিদ্ধেশ্বরের পুস্তকালয় ও অনাথবন্ধুর মন্দির—এই কয়খানি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল। লীলাবতী পর পর তিন শনিবারে ঐ একই মঞ্চে অভিনীত হয়।" (ঐ; পৃ—২০)

(দর্শকেরা অভিনয় দেখে খুসী। এমন কি স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বললেন, তোমাদের অভিনয়ের সহিত চুঁচুড়ার দলের তুলনাই হয় না, আমি পত্র লিখব-'তুয়ো ব্রঙ্কিম'।)

গিরিশচন্দ্র আর একটি খবর দিয়েছেন সাধারণ ভাবে:

"সুপ্রসিদ্ধ ৺কানালাল দে, ঠাকুর বাড়ির অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়া আপনাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন, "আপনাদের অভিনয় সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোষা।"

কিন্তু খবরটি অসাধাবণ। কানাইলাল দে সে-যুগে কলকাতা শহরের একজন 'জাষ্টিস অব পীচ' ছিলেন।

এ ঠাকুরবাড়ি কোন ঠাকুরবাড়ি? নিশ্চয়ই পাথুরিয়াঘাটা; কারণ শ্যামবাজার নাট্যসমাজের কেউ কেউ ঐ নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেখানে মহা আড়ম্বরে বিদ্যাসুন্দর, রুক্মিনী-হরণ অভিনীত হোত।

সোনার খাঁচায় দাঁড়কাক পোষাই বটে!

আর এখানে অভিনীত হচ্ছে যুগের আগুনে ঝলসানো-নাটক—সধবার একাদশী, লীলাবতী। তারপর অভিনীত হবে 'নীলদর্পণ'। তখন এই সংস্থারও নাম বদলে যাবে—'ন্যাশানাল থিয়েটার'; বাংলা দেশের প্রথম পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ!

১. সংবাদচন্দ্রিকা, ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭.
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

২. পুরাতন প্রসঙ্গ -১ম পর্যায়—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযেব স্মৃতিকথা; পৃ—১৫০—১৫১.

৩. The Hindu Patriot—5 February, 1857.

৪. বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ—৩৭.

৫. The Hindu Intelligencer—Kashiprosad Ghose. 2 March, 1857.

৬. Calcutta Review—Modern Hindu Drama—Kissori chund Mitter. 1873.

৭. এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ—১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭.

৮. পুরাতন প্রসঙ্গ—১ম পর্য্যায়—পৃ—১৪৮.

৯. The Hindu Patriot—3 December, 1857.
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ।

১০. Calcutta Review—1873—Modern Hindu Drama. Kissori chund Mitter.

১১. সংবাদ প্রভাকর, ২৫ নবেম্বর ১৮৫৭.

১২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-শিবনাথ শাস্ত্রী—নিউ এজ সংস্করণ—পৃ ১৯৫.

১৩. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪. সংবাদ প্রভাকব, ৪ আগষ্ট, ১৮৫৮

১৫. বিবিধার্থ সংগ্রহ—৫৮ খণ্ড।

১৫ক. The Hindu Patriot—10 September, 1859.

১৬. সংবাদ প্রভাকর, ৪ আগষ্ট, ১৮৫৮

১৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু ; পৃ—২১৮

১৮. মাইকেল রচনাবলী—পরিষৎ সংস্করণ।

১৮ক. জীবন-চরিত—পৃ ২১৮-২১৯ ; পাদটীকা।

১৯. জীবন-চরিত—দ্রষ্টব্য।

২০. মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃ ১৫৮—১৫৯.

২১. জীবন-চরিত পৃ—২১৮—২২০

সৌখীন নাট্যমঞ্চ ও রামনারায়ণ তর্করত্ন

(১৮২৩—১৮৮৫)

বাঙ্গালীর সৌখীন নাট্যমঞ্চ একদিনের চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি। সেই ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার থেকে এই চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছে।

কলকাতার বিত্তবান ব্যক্তিরা কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দর যাত্রা, পাঁচালী, কবি-গান, ঢপ কীর্তনের ছিলেন পোষ্টা। বিদেশী রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে দেশীয় যুবকদেব মধ্যে নাটকের ঝোঁক দেখা দিলে ধনী সম্প্রদায় নীরব থাকতে পারলেন না। সৌখীন মঞ্চে তাঁরাও এসে জাঁকিয়ে বসলেন। ফলে উষালগ্নে দুই জাতীয় বাংলা নাটক জন্ম নিল। এক জাতীয় নাটকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকদের ইচ্ছানুযায়ী 'সংস্কার' মতবাদ প্রবল হয়ে দেখা দিল; অপর জাতীয় নাটকে দেখা গেল পুরাতনের অনুবর্তন। অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকেব বাংলা রূপান্তব। শেষোক্ত শ্রেণীর নাটক কখনও কখনও শিল্পগত উৎকর্ষের জন্য অভিনীত হয়েছে, কখনও কখনও নিছক রঙ্গরসেব জন্য মঞ্চস্থ হয়েছে।

রামনারায়ণ যখন লেখনী ধারণ করলেন, তখন এই দুই নাট্যপ্রবণতাব চাপে তিনি শাসিত হয়েছিলেন।

রামনারায়ণ প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে; আর তাব সর্বশেষ নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। তারপরও তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন; কিন্তু তখন আর তিনি নাটক লেখেননি। লিখেছেন সংস্কৃত স্তোত্র ও গীতিকা। তর্করত্নমহাশয় সাহিত্য-সাধনা শুরু করেছিলেন সংস্কৃত রচনার মধ্য দিয়ে। 'সমস্যাকল্পলতা'য় (১৮৪৫) তাঁর রচিত কয়েকটি সমস্যা স্থান পেয়েছে।. তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি আবার ফিরে গেছেন সংস্কৃত রচনায়।

তিনি নাটক লিখেছেন একুশ বৎসর ধরে। তাঁর নাট্যসাধনার যুগে আবির্ভূত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র ও মনোমোহন বসু। আর এই সময়ের মধ্যেই তাঁর বহু দানে পুষ্ট বাংলা নাট্যমঞ্চ সৌখীনতার স্তর থেকে পেশাদারী স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। কী সামাজিক, কী রাজনৈতিক, কী ধর্মীয় ক্ষেত্র—সর্বত্রই যে পরিবর্তন বা সংস্কারের হাওয়া বইছিল। রামনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিত হয়েও তার থেকে দূরে ছিলেন না। বরং রামনারায়ণ পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়েই নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন।

হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা ও অন্যান্য উন্নতিকামী ব্যক্তিরা পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, এনকোয়ারার, রিফর্মার, বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রভৃতি পত্রিকায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তীব্র আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ইচ্ছাকে একটি সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সংহত করেন। আর সেই যুগেরই নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটক রচনার জন্য 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহিনী, বেলগাছিয়া, জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা—এই চার প্রধান সৌখীন নাট্যমঞ্চের প্রিয় নাট্যকার ছিলেন। নাট্যকার জীবনের শেষার্ধের অধিকাংশ রচনা পাথুরেঘাটার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। শেষোক্ত নাটকগুলি প্রধানত ছিল 'সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাববর্জিত।

রামনারায়ণের নাট্যকৃতিত্ব প্রথম স্বীকৃতি পায় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধে ও রাজনারায়ণ বসু লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য়। রাজনারায়ণ লিখেছেন, "গম্ভীর ভাবের প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও আমারদিগের ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক প্রকাশিত হইয়াছে বটে; রামনারায়ণ ও দীনবন্ধু তাহাদের প্রণেতা।"[১] রাজনারায়ণ সম্ভবত কেবল 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দেখেই তাঁর মতামত নির্ধারিত করেছেন। রামনারায়ণের 'নব-নাটক' বিয়োগান্তক নাটক।

রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, "গ্রন্থকার বড় পরিহাসরসিক; সে পরিহাস রসিকতা সর্বস্থলেই প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত করা হইয়াছে।"[২] তবে একথাও তিনি বলেছেন, "নবনাটকে পরিহাসোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ থাকিলেও ইহা করুণরসোত্তর গ্রন্থ।"[৩] রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন, "রামনারায়ণ প্রথম শ্রেণীর হাস্যকর নাটক লেখক।"[৪] আধুনিক যুগে ডক্টর প্রভু গুহঠাকুরতা বলেন, "He was perhaps not strictly speaking the first Bengali dramatic, but he was most assuredly the great dramatic of Bengal."[৫] পণ্ডিত মহাশয়কে কেবল পরিহাসপ্রিয় নাট্যকার বলে ডক্টর গুহঠাকুরতা সাব্যস্ত করেননি।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "বাঙ্গালা নাটকলেখকদের মধ্যে রামনারায়ণই প্রথম এ কাজে অর্থ ও যশ লাভ করিয়াছিলেন।"[৬]

নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণের স্থান কোথায়, এ প্রসঙ্গে ডক্টর সেন নীরব থেকেছেন। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, "রামনারায়ণই সর্বপ্রথম আধুনিক বাংলায় সাধারণ বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে স্থান দান করিবার গৌরব লাভের অধিকারী হইয়াছেন। বাংলা নাটকের যথার্থ ইতিহাস রামনারায়ণ হইতেই সূত্রপাত হইয়াছে।"[৭] ডক্টর ভট্টাচার্য রামনারায়ণের নাট্যরচনার একাংশের মূল্যায়ণ এখানে করেননি। আমরা তাঁর পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যের প্রসঙ্গে বলছি। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "রামনারায়ণ সামাজিক নাটক, পৌরাণিক নাটক, প্রহসন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার নাট্যরচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে হাস্যরসের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রহসনে।"[৮] ডক্টর ঘোষ মনে করেন রামনারায়ণের নাট্যপ্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

হায়! লেবেডফ বহুবৎসর পূর্বে বলেছিলেন, "Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed" সে-মূল্যায়ণ কি চিরন্তন হবে?

রামনারায়ণ কি তবে ভাঁড়ামিকে ('mimicry' ও 'drollery' শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দ কি?) সম্বল করে নাটকের ভুবনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

রামনারায়ণের নাটকের শ্রেণীবিভাগ

রামনারায়ণ সর্বসাকুল্যে তেরখানি নাটক রচনা করেছেন। অনেকে এগুলিকে সামাজিক-পৌরাণিক, অনুবাদমূলক ও প্রহসন এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬) সামাজিক নাটকের পর্যায়ভুক্ত; রুক্মিণীহরণ (১৮৭১), ধর্মবিজয় (১৮৭৫), কংসবধ (১৮৭৫) মৌলিক পৌরাণিক রচনার পর্যায়ে পড়ে; বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তল (১৮৬০) ও মালতীমাধব (১৮৬৭) অনুবাদমূলক নাটক; যেমন কর্ম তেমনি ফল (১৮৬৫), চক্ষুদান (১৮৬৯) ও উভয় সঙ্কট (১৮৬৯) প্রহসন জাতীয় নাটক। এছাড়া 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩) নামে আর একখানি নাটক আছে, যা পৌরাণিক অথচ পুরাণ-ভিত্তিক নয়। এ পুরাণের আবাসস্থল হোল নাট্যকারের কল্পনা।

রামনারায়ণের অধিকাংশ নাটকই মঞ্চের তাগিদে রচিত; শুধু 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' ভিন্ন প্রেরণাজাত। এই নাটক রচনার পিছনে মঞ্চের তাগিদ পূর্বাহ্নে কিছু ছিল না। ছিল 'সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব।

১৮৫৩ সালের 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে একখানা নাটক রচনা করার জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

সেই বিজ্ঞাপন দেখে ঐ নামেই রামনারায়ণ একখানি নাটক রচনা করলেন; এবং বলা বাহুল্য ঘোষিত পুরস্কার তিনি লাভ করেছিলেন। ঠিক এক বৎসর পূর্বে তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপন করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুণ্য প্রভাবে তাঁর নাট্যবোধ নির্মিত হয়েছিল, একথা বললে অত্যুক্তি হবে; কিন্তু তাঁর জীবনবোধ নির্মিত হয়েছিল, একথা বললে কি অত্যুক্তি হয়? প্রথম নাটক ধনীর গৃহে অভিনীত হলেও ধনীর অর্থানুকুল্যে অভিনীত হয়নি; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক এই নাট্যাভিনয়ের উদ্যোক্তা।

রামনারায়ণের নাট্যকার খ্যাতি একবার প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে সৌখীনতার মঞ্চে গিয়েই দাঁড়াতে হোল। তাঁর দ্বিতীয় নাটক হোল 'বেণীসংহারনাটক' (১৮৫৬)। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়।

কালীপ্রসন্ন মহাভারতের অনুবাদকার্য সম্পন্ন করিয়েছেন, নীলদর্পণ-এর প্রকাশক ও অনুবাদকের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সম্বর্ধিত করেছেন; কিন্তু তাঁর নাট্যমঞ্চ সেকালের সংস্কার আন্দোলনকে পুষ্ট করেনি। পাথুরেঘাটার মঞ্চের মত এ মঞ্চ নিতান্ত ছিল প্রমোদ মঞ্চ, সৌখীনতার মঞ্চ।

'বেণীসংহার' নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হবার পর তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বহুগুণ বাড়ল। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাঁকে দিয়ে রত্নাবলী নাটক অনূদিত করিয়ে নেন। কিছুকাল পরে বেলগাছিয়া নাট্যশালা উঠে যায়। তখন তর্করত্ন মহাশয় পাথুরেঘাটা নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন। এবং এক 'নবনাটক' ব্যতীত তাঁর প্রায় সমস্ত নাটকই ঐ রঙ্গমঞ্চের জন্য রচিত হয়। 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষদের আহ্বানে রচিত হয়েছিল। "কুলীনকুল সর্বস্ব" নাটক যেমন এক বিজ্ঞাপনের জবাবে রচিত, নবনাটকও তেমনি ভাবে রচিত।

বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটির পক্ষ থেকে এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' নামক সংবাদপত্রে বহুবিবাহবিরোধী একটি নাটক রচনার জন্য দুশো টাকা পারিতোষিক ঘোষণা করা হয়। পরে ঐ বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে বলা হয় যে, রামনারায়ণ নাটক রচনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। অতএব আর প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই।

এই খবরটি ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই Indian Mirror পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবনীকারের মতে এর অল্প দিন পরেই রামনারায়ণ এই নাটকের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেন ; এবং দুই শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্বস্ব রচনা করে যে নাট্যধারার তিনি সৃষ্টি করেন, তারই পরিণতি হোল নব-নাটক। ইতিমধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহনাটক' (১৮৫৬) প্রকাশিত হয়েছে। রামনারায়ণ কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এমন কি দীনবন্ধু মিত্র থেকে ভিন্ন প্রকৃতির নাট্যকার ? উভয় নাট্যকারের নাটকের চরিত্র, তথা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশিষ্ট ধারণা ছিল ; মঞ্চের অধিকারীদের রুচি অনুযায়ী তাঁরা নাটক রচনা করতেন না। দীনবন্ধু ত মঞ্চের মুখাপেক্ষীই ছিলেন না। অথচ তাঁর নাটক মঞ্চে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে তাঁরই নাটক নিয়ে।

রামনারায়ণের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট কোন নাট্যচিন্তা ছিল না। তিনি বিচলিত নাট্যকৌতূহলের যুগে জন্মগ্রহণ করে বিচলিত নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

সৌখীন নাট্যমঞ্চ ও তাঁর নাট্যবিষয়

প্রথমত তিনি ছিলেন সৌখীন নাট্যমঞ্চের সর্বাধিক সমাদৃত নাট্যকার। এবং এখানকার নাট্যকার হিসাবে তিনি পুরাণ-আশ্রিত নাটকই বেশি রচনা করেছেন।

তাঁর পুরাণ-আশ্রিত নাটক সমূহ বেণী সংহার, রত্নাবলী, অভিজ্ঞান শকুন্তল, মালতীমাধব অনুবাদ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র বেণীসংহার নাটকের আখ্যান-অংশ ভিন্ন সুরে বাঁধা। বাদ বাকি নাটকে পূর্বরাগ, পরিণয় ও বহুপত্নীগ্রহণ প্রভৃতি সে যুগের মনোরম বিষয়সমূহ স্থান

পেয়েছে। শুধু নাটকের বিষয়বস্তু নয়, নাটকের নায়ক-নায়িকারাও তদানীন্তন ভোগবাসনার চরম সার্থকতার চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে।

কাজেই এই নাট্যসমূহের আখ্যান বস্তু (Theme) ও নায়কনায়িকা-কল্পনা উনিশ শতকীয় নাট্যরুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত ছিল। সবগুলি নাটকই ছিল মিলনাত্মক। অভিনয়ে জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনীর প্রচুর সুযোগ ছিল। 'বেণী-সংহার' পৃথক জাতীয় নাটক; কিন্তু এই নাটকের অভিনয়েও আড়ম্বরপ্রিয়তার অভাব ছিল না।

রত্নাবলীর আখ্যায়িকা কি ?

বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে নিজ কন্যা রত্নাবলীর বিয়ে দেবার জন্য সিংহলরাজ তাকে মন্ত্রিসহ প্রেরণ করলেন। পথে ঝড়বৃষ্টিতে নৌকাডুবি হলে বৎসরাজের মন্ত্রী রত্নাবলীকে উদ্ধার করে এবং তার পরিচয় জানতে পেরে এই কন্যারত্নকে রাজমহিষী বাসবদত্তার কাছে লুকিয়ে রাখলেন।

কিন্তু উদয়ন হলেন প্রেমিকপ্রবর; তিনি যথাকালে রত্নাবলীর খোঁজ জানতে পারলেন; এবং তার পরের অধ্যায় খুবই সহজ। বাসবদত্তার কাছে এই সংবাদ গোপন থাকল না; তিনি রত্নাবলীকে অপরিসীম যন্ত্রণা দিলেন। এদিকে সিংহল রাজার মন্ত্রী বৎসদেশে উপনীত হয়ে রত্নাবলীর পরিচয় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন। তখন রাণী বাসবদত্তাই স্বামীর সঙ্গে রত্নাবলীর বিবাহ দিলেন।

সে-যুগের বহুবিবাহ-অধ্যুষিত বঙ্গীয় অভিজাত সমাজের কাছে বড় মনোরম কাহিনী এটি।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ঘটনাও ঘোরাফেরা করেছে এই জাতীয় ঘটনার আনাচে-কানাচে। সেখানে দেখতে পাই, মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বের হয়ে কণ্বমুনির আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। সেখানে হরিণ শিকার না করতে সক্ষম হোন, একটি আশ্রম-বালিকাকে শিকার করতে সক্ষম হলেন। এই বালিকা হোল শকুন্তলা। শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। কিন্তু জন্মের পরই সে পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। এবং তখন কণ্বমুনি তাকে আশ্রমে নিয়ে এসে প্রতিপালন করেন। শকুন্তলাকে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করে মহারাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। যাত্রার পূর্বে অভিজ্ঞান স্বরূপ একটি অঙ্গুরীয় শকুন্তলাকে দিয়ে যান। এদিকে পতিবিরহকাতরা আশ্রমে আগত দুর্বাসাকে পরিচর্য্যা করতে ভুলে গেল; ফলে অভিশাপগ্রস্ত হোল।

কণ্বমুনি আশ্রমে ফিরে এসে শকুন্তলার পরিণয়কাহিনী জানতে পারলেন এবং গর্ভবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করা সমীচীন মনে করে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক শিষ্যদ্বয় ও ভগিনী গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে পতিগৃহ অভিমুখে পাঠালেন। ইতিমধ্যে শকুন্তলা দুষ্মন্ত-প্রদত্ত অঙ্গুরীয়টি হারিয়ে ফেলেছেন। আর দুর্বাশার অভিশাপে রাজাও শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। মাতা মেনকা সহসা এসে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে ঋষি মরীচির আশ্রমে নিয়ে যান; সেখানে শকুন্তলা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রই ভরত।

এদিকে রাজা দুষ্মন্তের হাতে শকুন্তলার হারান আংটি এসে পৌঁছাল; রাজার তখন সব কিছু মনে পড়ল। রাজা দুষ্মন্ত ইন্দ্রের আহ্বানে স্বর্গে অসুর নিধনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মরীচির আশ্রমে শকুন্তলার দেখা পেলেন; সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দুষ্মন্ত-শকুন্তলার মিলন ঘটল। রামনারায়ণ কালিদাসের কাহিনীর খোলসটুকু মাত্র নিয়েছেন। গ্যেটে যা দেখে আত্মহারা হয়েছিলেন, সেটুকু খারিজ।

মালতী-মাধবের আখ্যান অংশ এত পরিচিত নয়।

বিদর্ভদেশের রাজার দুই মন্ত্রী ভুরিবসু ও দেবরাত। তাঁরা পরস্পরেব পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহবন্ধন প্রতিষ্ঠা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। মালতী হলেন ভুরিবসুর কন্যা, আর মাধব হলেন দেবরাতের পুত্র। পরিব্রাজিকা কামন্দকীর উদ্যোগে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাতকার ঘটে, এবং প্রেম সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু রাজা বাদ সাধলেন। তাঁর আদেশে মালতীর সঙ্গে আর এক পাত্রের বিবাহের আয়োজন হতে থাকে। মালতী কি আব করবেন? গৃহ ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করেন। কিন্তু সেখানেও বিপদ এল। অঘোরঘণ্ট নামক এক কাপালিক তাকে ধরে শ্মশানে নিয়ে চলল। কিন্তু মাধব এসে পড়লেন। কাপালিককে হত্যা করে তার কাছ থেকে মালতীকে উদ্ধার করলেন। কামন্দকীর আশ্রমে মালতী ও মাধবের বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হয়। কিন্তু নিহত কাপালিক শিষ্যা কপালকুণ্ডলা মালতীকে অপহরণ করে পলায়ন করে। এক্ষেত্রেও আবার মালতী উদ্ধার পেল। কামন্দকীর জনৈকা শিষ্যা মালতীকে কপালকুণ্ডলার কবল থেকে উদ্ধার করে মাধবের নিকট প্রেরণ করলেন। উভয়ের মধ্যে মিলন সম্পূর্ণ হোল।

তিনটি নাটকের ঘটনার কেন্দ্র স্থলে রয়েছে পত্নীলাভ ; এবং নায়ক-নায়িকারা হয় রাজা ও রাণী, নয় রাজবংশজাত।

সে যুগের প্রমোদাসক্ত ভোগবিলাসী নাট্যপ্রেমিকদের জীবন-রীতির সঙ্গে এই সব কাহিনীর কোন মিল নেই, এমন নয় ; তাদের কাছে এই সব কাহিনীর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা একই সুরে গাঁথা। তাই বেলগাছিয়া মঞ্চে এই দুই নাটক সমাদৃত হোল। কিন্তু এই মঞ্চে কৃষ্ণ-কুমারীর স্থান হয়নি, স্থান হয়নি পদ্মাবতীর। যেমন কর্ম তেমনি ফল, চক্ষুদান, উভয় সঙ্কট—তিন তিনখানি প্রহসন পাথুরেঘাটার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু এগুলির পূর্বে রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' মঞ্চস্থ হোল না। সব কিছু নেহাৎ অকস্মিক ঘটে নি।

সংস্কৃত নাটক ও রামনারায়ণের রূপান্তর

'বেণী সংহার'-সহ চারিখানি নাটককে অনুবাদ-নাটক বলা হয়। প্রকৃত পক্ষে এদের কোনটিই যথার্থ অনুবাদ-নাটক নয়। তবু এই চারিখানি নাটকের মধ্যে রত্নাবলী অনেকাংশে মূলানুগত, অপর তিনখানি বহুলাংশে স্বাধীন রচনা। তবে যে অর্থে রুক্মিণীহরণ, কংসবধ ও ধর্মবিজয় স্বাধীন নাটক, সে অর্থে অবশ্য নয়।

মূলানুগ হলেও রত্নাবলী নাটকের গঠনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নান্দী, সূত্রধার ও নটী বজায় আছে। 'বেণীসংহার নাটকের' পরিবর্তনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দৃশ্যসংখ্যা কমিয়ে বা পুনর্বিন্যাস করে এই নাটকের নব রূপ দিয়েছেন তিনি।

'মালতীমাধব নাটকের' পরিবর্তনও একই প্রকার। কোন কোন ক্ষেত্রে গল্পের মেজাজের পরিবর্তন ঘটান হইয়াছে। সংস্কারান্তরেও পরিবর্তন অব্যাহত থেকেছে।

এ সবই করেছেন মঞ্চের অনুরোধে, এবং গল্পের সাবলীল প্রবাহের জন্য।

'রত্নাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণে আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। লেখক ঐ সংস্করণের ভূমিকায় লিখছেন: "এবারে পূর্ব প্রকাশিত প্রাথমিক যোগন্ধরায়ণের প্রস্তাবটি অনুপযোগী বোধে উঠাইয়া দিয়া এবং কএকটি স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত করিয়া মুদ্রিত।"

নন্দকুমার রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন ; আর রামনারায়ণ চলিত ভাষায় 'অনুবাদ' করেছেন—বহু সমালোচক এইভাবে বিষয়টি দেখেছেন।

নাটকের ভাষায় রামনারায়ণ রূপান্তরিত করেছেন, পুথির ভাষায় নয়। মূল রত্নাবলী নাটকের ঐন্দ্রজালিক রামনারায়ণের নাটকে কতটা বাঙ্গালী বেদে হয়ে পড়েছে, এটা বড় কথা নয়। অনুবাদ মাত্র না হয়ে, মঞ্চ-উপযোগী কতটা হয়েছে, এটাই বড় কথা। পুরাতন সংস্কৃত নাটকের তিনি উনিশ শতকীয়-'ষ্টেজ কপি' তৈরি করে দিয়েছেন। রামনারায়ণ তাঁর প্রথম নাটক থেকেই এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

বেণী সংহার

বেণীসংহার তাঁর প্রথম অনুবাদ-নাটক। মূল বেণীসংহারের গঠন-পরিকল্পনার সঙ্গে অনুবাদের গঠন-পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করলে রামনারায়ণের মঞ্চ-সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বেণীসংহার নাটকের প্রথমাংকে আছে নান্দী, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক। ওদের কথাবার্তা ও গীতের পরে ভীম ও সহদেব মঞ্চে প্রবেশ করবেন। কিন্তু রামনারায়ণ নান্দী সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিয়েছেন, সূত্রধার স্থলে দ্রৌপদী ও চেটীর কথোপকথন দিয়ে নাটক শুরু করেছেন। তবে এই কথোপকথন অনেকটা প্রবেশকের কাজ করেছে। ভীমের প্রথম সংলাপ যেহেতু সূত্রধারের উক্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল, তাই সেটি বাতিল করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংলাপ থেকে নাটক অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। সহদেবের প্রথম সংলাপও একই কারণে পরিত্যক্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ছিল। নাট্যকার সব কয়টি দৃশ্য জোড়া দিয়ে একটি দৃশ্য তৈরি করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে একটি বিষ্কম্ভক ছিল; সেটি পরিত্যক্ত হয়েছে। লেখক সোজা ভানুমতীর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের উপস্থিত করিয়েছেন। বাকি অংশটুকু একই রকম।

তৃতীয় অঙ্কে মূল গ্রন্থে রাক্ষসী-রাক্ষস দিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝাবার জন্য একটি প্রবেশক ছিল। লেখক সেই প্রবেশক অংশটির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন অশ্বত্থামা-কৃপাচার্যের কথোপকথন-অংশ। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই কর্ণ-দুর্যোধন প্রসঙ্গ।

চতুর্থ অঙ্কেও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমে বর্ণিত হয়েছিল প্রহার-মূর্ছিত দুর্যোধনকে নিয়ে সারথীর প্রবেশ। নাট্যকার এই অংশটি বর্জন করেন নি, স্থান পরিবর্তন করিয়েছেন। ফলে ঘটনার শোকাবহতা বেড়েছে।

সর্বাপেক্ষা বড় পরিবর্তন হোল মঞ্চে ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান। লেখক বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

[ভূতলে পাতন ও নানারূপে বধ পূর্বক তাহার বক্ষঃস্থলের রক্তপান করিয়া অট্টহাস্য করত নৃত্য]।

মূলে ছিল নেপথ্যে ভীমের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে ; ভীম বলছে :

"ওগো কৌরব সৈন্যের বীরগণ !—আমাকে দেখে ভয়ে যাদের ধনু, কৃপাণ, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র হস্ত হতে স্খলিত হয়ে পড়ছে—আর ওগো পাণ্ডব-পক্ষপাতী-যোদ্ধগণ ! তোমাদের ভয় নাই, ভয় নাই। আমি নিহত দুঃশাসনের পীবর-বক্ষঃস্থল-নিঃসৃত শোণিতাসব পান করে মদোদ্ধত হয়ে দ্রুতবেগে চলেছি।"[১০]

[ভো ভো অস্মদ্দর্শনভয়স্খলিতকার্মুক কৃপাণতোমরশক্তয়ঃ কৌরবচমূভটাঃ পাণ্ডবপক্ষপাতিনশ্চ যোধাঃ ন ভেতব্যম ন ভেতব্যম, অয়মহং নিহতদুঃশাসন-পীবরোরঃস্থলক্ষতজাসবপানমদোদ্ধতো রভসগামী স্তোকাবশিষ্টপ্রতিজ্ঞা মহোৎসবঃ কৌরবরাজস্য দ্যূতনির্জিতো দাসঃ পার্থমধ্যমো ভীমসেনঃ সর্বান ভবতঃ সাক্ষী করোমি, শ্রূয়তাম্।]

ইংরেজী শিক্ষিত দর্শকসমাজের সম্মুখে মঞ্চের ওপর দুঃশাসনের বক্ষ বিদারণ করতে নাট্যকার সঙ্কোচবোধ করেননি। আধুনিক রুচির মুখ চেয়ে সংস্কৃত কলেজের অলংকারেরই অধ্যাপক পণ্ডিত রামনারায়ণ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রীদের অনুজ্ঞা মেনে চলেননি।

বিজয়ী ভীম রণস্থল ত্যাগ করলে মঞ্চে মূর্ছিত দুর্যোধনকে নিয়ে সারথি প্রবেশ করলেন। দুর্যোধন সংজ্ঞালাভ করে সুন্দরকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও সঞ্জয় প্রবেশ করবেন। মুল নাটকে ৫ম অঙ্কে এই প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু রামনারায়ন নাটকের গতি বাড়াবার জন্য এই প্রসঙ্গটি ৪র্থ অঙ্কে স্থান দিয়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র যে ভাষায় কথা বলেছেন, তাতে তাঁর পৌরাণিক রূপ প্রকাশ পায়নি ; তিনি এখন আর মহাভারতীয় পুরুষ নন, বঙ্গীয় পুরুষ। তিনি সন্ধি করার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুপথযাত্রী দুর্যোধন সে পরামর্শও অগ্রাহ্য করলেন। এখন সময় খবর এল কর্ণ নিহত হয়েছেন। দুর্যোধন শোকের কাতর হলেন। আর এই সময়েই সম্পূর্ণ নিরস্ত্রভাবে ভীম ও অর্জুন প্রবেশ করলেন ; এবং ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে প্রণাম করলেন। তাঁরা চলে

গেলে ধৃতরাষ্ট্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। দুর্যোধন সে পরামর্শও গ্রহণ করল না।

নাট্যকার ৪র্থ অঙ্ক খুবই ঘটনাবহুল করেছেন; শেষ অঙ্কের জন্য ঘটনার গ্রন্থি মোচনে অপেক্ষা করেননি।

৫ম অঙ্কে অনেকটা ইয়োরোপীয় নাট্যশাস্ত্র অনুসারে ঘটেছে—denouement-এর মতই। মূল নাটকের ৫ম অঙ্ক থেকে যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী প্রসঙ্গ নিয়েছেন। মুনিবেশধারী চার্বাকরাক্ষসের মিথ্যা সংবাদ প্রদানের কাহিনী নাট্যকার ব্যবহার করেছেন; কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে।

৬ষ্ঠ অঙ্কে ভীম কর্তৃক দ্রৌপদীর বেণী সংহারে এই নাটকের কথাবস্তুর যথার্থ অবসান ঘটল। কিন্তু লেখক সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অনুসারে শান্তিবচনে নাটকের অবসান ঘটালেন। রামনারায়ণ বিপ্লবী নাট্যকার নন; তিনি সংস্কারপন্থী ও সমন্বয়বাদী। তাই নাট্য-গ্রন্থনায় উনিশ শতকীয় রুচির সঙ্গে সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত কাব্যাদর্শের পরিণয় সাধনে তিনি সচেষ্ট।

রত্নাবলী

'রত্নাবলী নাটকে'র অনুবাদে তিনি একই প্রকার সংহত রূপের দিকে নজর দিয়েছেন। 'রত্নাবলী' মূল নাটকে চারিটি অংক আছে; প্রস্তাবনা ছাড়া একটি বিষ্কম্ভক, একটি প্রবেশক ও বারোটি দৃশ্য নিয়ে এই নাটক গঠিত। রামনারায়ণ অঙ্ক সংখ্যা কমাননি; তবে দৃশ্য সংখ্যা কমিয়ে আট করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্যান্তর ছিল ঘন ঘন—আসলে তা ছিল একই দৃশ্যের একটু অবস্থান্তর। যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য প্রাসাদের উদ্যান, তারপরের দৃশ্য কদলীকুঞ্জ, তারপর উদ্যানের অপর অংশ, পরবর্তী দৃশ্য উদ্যানের অন্য একটি অংশ, শেষ দৃশ্য কদলীকুঞ্জ। আসলে দ্বিতীয় অঙ্কের সমগ্র ঘটনা দুইটি দৃশ্যে সন্নিবেশিত করা অযৌক্তিক নয়। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশালা আর আধুনিক রঙ্গমঞ্চের গঠনপ্রণালী এক জাতীয় নয়; তাই এই প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় অঙ্কে দৃশ্যান্তর আরও বেশি। প্রাসাদের অভ্যন্তর, তোরণদ্বার, মাধবীলতা মণ্ডপ, রাজ অন্তঃপুর, চিত্রশালার দ্বারদেশ, ও মাধবীলতা মণ্ডপ। রামনারায়ণ এখানে রাজ-উদ্যান ও মধবীলতার মণ্ডপে সমস্ত ঘটনা বসিয়ে দিয়েছেন—ছয়টি দৃশ্যে যা ফুটেছিল, দুইটি দৃশ্যে তা অস্ফুট থাকেনি। রত্নাবলী হোল চার অঙ্কের সম্পূর্ণ একটি নাটিকা; অনেকখানি সংহত রচনা। জনৈক অনুবাদক বলেছেন,

"ইহার নাটকীয় সংস্থানগুলি ও ঘটনার পাকচক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেই জন্য এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী।"[১১]

যেটুকু বাধা ছিল, দৃশ্য সংখ্যা কমিয়ে রামনারায়ণ তারও সংশোধন করে দিয়েছেন।

মালতীমাধব

'মালতীমাধব' হোল দশ অংকবিশিষ্ট একখানি মহানাটক; তবু একই রীতি তিনি অবলম্বন করেছেন।

'মালতীমাধব' নাটকের রূপান্তরকালে তিনি বহু অদলবদল করেছেন। নান্দী সূত্রধার পারিপার্শ্বিক বাতিল করে দিয়েছেন। দশ অঙ্কের এই বৃহৎ নাটককে তিনি সেই যুগের মঞ্চের দাবী অনুসারে পঞ্চমাঙ্কে রূপান্তরিত করেছেন।

মূলের বহু ঘটনা সংক্ষেপিত হয়েছে, স্থানপরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে, বা পরিত্যক্ত হয়েছে। দৃশ্যগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং তাদের সংখ্যা বহু হ্রাস পেয়েছে।

বিষকম্ভক-প্রবেশক হয় বাতিল হয়ে গেছে, না হয় অন্য কোন দৃশ্যের মধ্যে সেধিয়ে গেছে। কোন কোন দৃশ্যের অভ্যন্তরে তার সারাংশ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। দশ অঙ্কের এই নাটকটি উনিশটি দৃশ্য ও চারটি বিষ্কম্ভক নিয়ে গঠিত ছিল। রামনারায়ণ পাঁচ অঙ্কে ও এগারটি দৃশ্যে তাকে রূপান্তরিত করেছেন। এ রূপান্তর ছিল বাঞ্ছনীয় রূপান্তর।

এই সংক্ষেপীকরণ কোন সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি তিনি বাতিল করেছেন, কিন্তু প্রবেশকটি বাতিল করেননি। প্রবেশক অংশটি দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু করেছেন। ৫ম অঙ্কের বিষ্কম্ভক বাতিল করেছেন। অর্থাৎ নাটকের বিস্ময়রস ও ঔৎসুক্যবোধ বজায় রাখার জন্য অনেক ব্যাখ্যানমূলক (Explanatory) অংশ তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন।

শুধু যে দৃশ্য-সংস্থাপনায় বা অঙ্ক-নির্ধারণে তিনি নিরংকুশ হয়েছেন তাই নয়। আধুনিক রুচির মুখ রেখে তিনি বহু আদিরসাত্মক ঘটনার পক্ষচ্ছেদ করেছেন,। মূল নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মালতী লবঙ্গিকাভ্রমে মাধবকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন; আনন্দবিহ্বল মাধব বললেন—

পীবর-কুচ-মুকুলে
তনু মোর বিমর্দিত হইল যখন
মনে হল যেন আহা
কর্পূরের হার, চন্দ্রমণি সুচন্দন,
শৈবাল, মৃণাল, দ্রব
একত্রে সমস্ত অঙ্গে হতেছে লেপন।[১২]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকের এই অংশটুকু নিয়ে বড়ই বিব্রত বোধ করেছিলেন।

"যে স্থলে মালতী লবঙ্গিকা-ভ্রমে মাধবকে অলিঙ্গন করে, সেই স্থলটি ঠিক স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মাধব স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ ধারণ করে নাই—লবঙ্গিকার ভাষার অনুকরণে কোন বাক্যালাপ করিতে চেষ্টা করে নাই—কেবল, মাধব সেই সময়ে লবঙ্গিকার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এইমাত্র। চক্ষু কতকটা বাষ্পজলে রুদ্ধ ছিল বটে এবং কবির কথার আভাষে মনে হয়—সেই জন্যই মালতীর এইরূপ ভুল হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে ক্ষণিক ভুল হওয়াই সম্ভব, এতক্ষণ ধরিয়া ভুলক্রমে আলিঙ্গন ও বাক্যালাপ করাটা ঠিক মনে হয় না।" [অনুবাদকের মন্তব্য]

'প্রকৃত' অনুবাদকের সমস্ত সমসার সমাধান করে 'তথাকথিত' অনুবাদক রামানারায়ণ সেখানে লিখছেন—'লবঙ্গিকার কিঞ্চিদপসরণ ও তদঙ্গিতক্রমে মালতীর নিকটে মাধবের আগমন।' তখন মালতীয় মুখে একটি মাত্র কথা—'সখি, তুমি যে কিছুই বলচো না।'

তারপর মালতী মাধবের কণ্ঠে শুধু মালাই পবিয়ে দেবে, আর কিছু না। 'বিমর্দন' প্রভৃতির সুযোগ অব্যবহৃত হবে। তখন "মালতী সবিস্ময়ে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন"।

রামনারায়ণ আধুনিক যুগের রসবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে এইপ্রকার রূপান্তর সাধন করলেন। প্রকৃত পক্ষে অনুবাদকের এই সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে উনিশ শতকের উদ্ভিন্নমান রুচিবোধ ও মঞ্চবোধ। আর যাই হোক, এইকাজ অনুবাদকের কাজ নয়। রামনারায়ণ জানতেন যে, তিনি প্রকৃত অনুবাদ করছেন না, তিনি তৈরি করেছেন সে-যুগের নাট্যমঞ্চের অধ্যক্ষদের অনুরোধে পুরাতন নাটকের মঞ্চসংস্করণ।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ভূমিকায়[১] তিনি বলেছেন, "অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থান স্থানে রসভাবাদি

পরিবর্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত” হয়েছে। মালতীমাধবের ভূমিকায় বলেছেন, “অনুবাদ অবিকল হয় নাই, অভিনয়ের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্ত পরিত্যক্ত ও প্রক্ষিপ্ত করিতে হইয়াছে।” লেখক জানতেন যে, “উপরন্তু মূলগ্রন্থের অবিকল রসভাবাদি ভাষান্তরে অবতীর্ণ করা সুদূরপরাহত।” ‘রত্নাবলী’ অনেকটা ছিল মূলানুগ; কিন্তু পরবর্তীকালে তাকেও পরিবর্তিত করেন, এই কথা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে রামনারায়ণের অনুবাদ-নাটকের মূল্য অনেকখানি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘বিক্রমোর্বশী নাটক’ ‘আক্ষরিক অনুবাদ’ ব’লে ব্যর্থ। রামনারায়ণ অবিকল অনুবাদ করেননি, তিনি অনুসরণ করেছেন মাত্র; তাই তাঁর নাটক মঞ্চ-সফল। ‘বিক্রমোর্বশী নাটক’ বেণীসংহারের পরবর্তী নাটক; রামনারায়ণ এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহের পদাঙ্ক অনুসরণ করেননি। বরং কালীপ্রসন্ন রামনারায়ণের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ না করায় ব্যর্থ হয়েছেন। রামনারায়ণ যথার্থ ‘নাটুকে রামনারায়ণ’ ছিলেন।

তিনি সংস্কৃত নাটকের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন অভিনীত হবার জন্য, এবং এক বিশেষ দর্শকসমাজের জন্য।

প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যে এ জাতীয় দৃষ্টান্ত আছে। গ্রীক নাটক যা অভিনীত হয়েছিল, আর যা লিখিত আকারে বা মুদ্রিত বেশে পাওয়া যায়, তা কি এক?

মৃত গ্রন্থের পূজা হয়, অভিনয় হয় না। এমন কি অতি সাম্প্রতিক মুদ্রিত নাটক কখনও কখনও মঞ্চস্থ নাটক নয়। মঞ্চস্থ নাটক যদি মুদ্রিত নাটককে না ডিঙিয়ে যায়, তাহলে আদপেই সে নাটক হতে পারে না।

বই-এর মধ্যে ডিমনস্থিনিসের বক্তৃতা যতটা আছে, বইএর বাইরে তার থেকে আছে বেশি। নাটকেরও আছে এমনতর বিচলিত সত্তা, দ্বিধান্বিত সত্তা। মুদ্রিত আকারে নাটক আমরা পড়তে পারি; কিন্তু মুদ্রিত রূপ তার খণ্ডিত রূপ, তার ভগ্নাংশ। মঞ্চস্থ নাটকই তাই আত্মস্থ নাটক।

রামনারায়ণ কাদের জন্য কলম ধরেছেন, তা তিনি জানতেন। কি বিষয়ে কলম ধরেছেন, তাও তিনি জানতেন।

বাংলা নাটকের প্রাতরুষা কালের তিনিই হলেন আদি বৈতালিক, যিনি রাজদ্বারে গান গেয়েছেন, কিন্তু পুরাতনের নব্য ভূষণ দিয়ে।

পৌরাণিক নাটক

রামনারায়ণের মৌলিক পৌরাণিক নাটক একই জাতীয় রচনা। এই নাটকগুলির আখ্যান-অংশ পুরাণ থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন ; আর গ্রন্থনা করেছেন তাঁর পোষ্টাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁর 'অনুবাদ' নাটক আর পৌরাণিক নাটক একই প্রেরণাজাত ; শুধু বিভ্রান্তিবশত আমরা দুই পর্যায়ে এগুলিকে বিভক্ত করি। তাঁর 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১). 'কংসবধ' (১৮৭৫), 'ধর্মবিজয়' পুরাণ-ভিত্তিক নাটক। রুক্মিণীহরণ পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ , চতুর্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে রুক্মিণী অপহৃতা হয়েছেন। কিন্তু তারপরও নাট্যকার দুইটি দৃশ্য যোজনা করেছেন। একটিতে দেখতে পাই (৪/২) নারদ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত রাজাদের উস্‌কে দিচ্ছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর যুগল-মিলন বর্ণনা করা হয়েছে, আর আছে এয়োদের স্ত্রী-আচারের বর্ণনা। প্রথমটির নাটকীয় উপযোগিতা ছিল, দ্বিতীয়টির উপস্থাপনা দর্শক মনোরঞ্জনার্থে। রুক্মিণীহরণ নাটকে বা কংসবধ নাটকেও নান্দী নটী-সূত্রধার নেই। রুক্মিণীহরণ পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ , কিন্তু 'কংসবধ' তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ। রুক্মিণী হরণের মত নান্দী-সূত্রধার না থাকলেও এ নাটকের উপসংহারে নৃত্যগীত আছে, এবং শান্তিবচন নেই।

কংসবধ তিন অঙ্কের নাটক। বেণীসংহার নাটকে তিনি যেমন মঞ্চের ওপর ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদারণ দেখিয়েছিলেন, এই নাটকেও তেমনি মঞ্চের ওপর কংসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে ; কংসবধের মত কার্যটি মঞ্চের ওপরই সংসাধিত হয়েছে। কংস নিহত হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে ; নাটক তৃতীয় অংক পর্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় অঙ্কে চারিটি গর্ভাংক আছে। নাট্যকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ জুড়ে কংসবধের প্রতিক্রিয়া বা পরবর্তী ঘটনা মঞ্চের ওপরে দেখিয়েছেন।

ধর্মবিজয় নাটক (১৮৭২) পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কোপের কবলে পড়লেন। ফলে রাজ্যসম্পদ স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে চণ্ডালের জীবিকা গ্রহণে বাধ্য হলেন। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই শ্মশানভূমির সাক্ষাৎ পাই। রাজ্যসম্পদ ফিরে পেলে ও স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পুনর্মিলিত হলে নাটকের যবনিকা নেমে আসবে।

স্বপ্নধন (১৮৭৩) নাটকটি একটি কাল্পনিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত। সম্ভবত হরচন্দ্র ঘোষের 'রজতগিরিনন্দিনী' পাঠে তিনি এই ধরণের

নাটক রচনায় উৎসাহ বোধ করেছিলেন ; কারণ এই নাটক নিছকই আনন্দ রসের প্রকটনে লিখিত। দুই বিভিন্ন দেশের রাজপুত্র ও রাজপুত্রী স্বপ্নে পরস্পরকে অবলোকন করল এবং বাকি কাজটুকুও করল। প্রেমে পড়লে তার জন্য যে উদ্বেগ মনস্তাপ ও অশ্রুবিসর্জন ঘটে, সবই এই নাটকে আছে। এই নাটকখানির অঙ্ক সংখ্যা কিছু অধিক। সাত অঙ্কে এই নাটকখানি শেষ হয়েছে। প্রচলিত, রূপকথার প্রভাব থাকার ফলে নাটকের ঘটনা শিথিলবদ্ধ।

রামনারায়ণের নাট্য-কৌশল

রামনারায়ণের 'অনূদিত' বা পৌরাণিক নাটকের অধিকাংশের কথাবস্তুর মূল প্রেরণা হোল স্ত্রীরত্ন-লাভ। শুধু দুইখানি নাটক কংসবধ ও ধর্মবিজয় ভিন্ন প্রেরণাজাত।

এই নাটকগুলির নায়ক-নায়িকা হয় রাজা, নয় রাজবংশজাত। কাজেই প্রেমে পড়া ব্যতীত অন্য কোন উৎকণ্ঠা তাঁরা বোধ করেননি। 'স্বপ্নধন' হোল একমাত্র কল্পনামূলক নাটক, তারও যাবতীয় উৎকণ্ঠা ক্ষয়িত হয়েছে দয়িত-দয়িতার অন্বেষণে। নাটকের Theme বা কথাবস্তু এইভাবে এক বিশেষ ভূখণ্ডেই বিচরণ করেছে।

তবে রামনারায়ণ এই সব আখ্যানসমূহে সংস্কৃত নাটকের শরীরী অংশ অনেকখানি বর্জন করেছেন। তাঁর সময়কার যাত্রার পালার রুচির নিম্নগামিতা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। 'রত্নাবলী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "অশেষ আনন্দের বিষয় যে, অধুনাতন লোকদিগের নাট্যব্যাপারে বিশিষ্ট অনুরাগ জন্মিতেছে। সরস সংস্কৃত ও ইংরাজিভাষার নাটক সমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে।" অশ্রদ্ধা তিনি যাত্রা সম্বন্ধে প্রকাশ করেছেন ; একাজ যথার্থ কাজ হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ আদিরসের অতি-উদ্ঘাটনও তিনি সযত্নে পরিহার করেছেন—করেছেন নবীন রুচির মুখ চেয়ে। একাজই কি কম প্রশংসার ?

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের ভূমিকায় তিনি যা বলেছিলেন, তা এখানে পুনঃ উদ্ধৃত করা গেল :

"অধুনাতন নিয়মানুসারে নাটক অভিনয়োপযোগি করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে রসভাবাদি পরিবর্তিত পরিত্যক্ত ও সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

শুধু রসভাবাদি নয়, নাটকের অবয়বও তিনি সুসংহত করেছেন; একমাত্র 'স্বপ্নধন নাটক' ব্যতীত আর সব কয়টি নাটককেই তিনি পাঁচ অঙ্কের মধ্যে বেঁধে রাখবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তিনি জানতেন সংস্কৃত নাট্যসম্ভার যে প্রকার মঞ্চে অভিনীত হোত, আধুনিক মঞ্চ তদনুরূপ নয়। এখানে দৃশ্যান্তর সবই দৃশ্যের অন্তর। একই মঞ্চে নানা দৃশ্য শুধু পদক্ষেপে (পটক্ষেপে নয়) উদ্‌ঘাটিত হয় না। এই কারণে কোনও দৃশ্য বাতিল করে, কোন দৃশ্য পিছনে ঠেলে, কোনও দৃশ্য অপর দৃশ্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তিনি পুরাতন নাটকগুলিকে আধুনিক মঞ্চের উপযোগী করে দিয়েছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল এইখানে। পরবর্তী কালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ও 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক রচনা করতে গিয়ে তাঁরই নাট্যীয় কাঠামো ব্যবহার করেছেন।

গান তিনি নাটকে ব্যবহার করতেন। কোন কোন নাটকের গান তাঁর নিজের রচনা নয়। রত্নাবলীর গান লিখে দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য গুরুদয়াল চৌধুরী। মালতী মাধবের গানগুলি লিখেছেন বনওয়ারিলাল রায়; রায় মহাশয় ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা কবি, যোজনগন্ধা প্রভৃতি তাঁর কাব্য। ধর্মবিজয় নাটকের গান লিখেছিলেন কালীকুমার চক্রবর্তী ও কাশীনাথ সান্যাল। গান তিনি ব্যবহার করেছেন মঞ্চকর্তাদের অনুরোধে: যে-নাটক রচনায় তিনি নিরঙ্কুশ ছিলেন, সেখানে কোন গান ব্যবহার করেননি। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে কোন গান নেই, নান্দী ব্যতীত। পোষ্টারা মাইকেলকেও খাতির করেননি; শর্মিষ্ঠা নাটকে তাঁর-দেওয়া গানগুলি যথেষ্ট হয়নি, অভিনয়কালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আরও কয়েকটি গান রচনা করে সংযোজিত করেছিলেন।

শ্রোতাদের মুখ চেয়ে তিনি গান সংযোজনা করেছেন।

সব কয়টি নাটকে তিনি সমসংখ্যক গান পরিবেশন করেননি; যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে গানের সংখ্যা কম। এই কারণে ডক্টর সুকুমার সেন বলছেন, "নাট্যরচনা হিসাবে এটি রত্নাবলীর অপেক্ষা উন্নততর। গান বেশি নাই।"

বস্তুত রামনারায়ণের নাটকে গান অনিবার্য অঙ্গ নয়, প্রক্ষিপ্ত। রামনারায়ণের নাটকে হাস্যরস একটা বড় জায়গা জুড়েছে। এর জন্যও অনেকখানি দায়ী হোল যুগরুচি।

যখন তিনি সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ করেছেন, তখন বিদূষকচরিত্রটি হাস্যরস সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হয়েছে। রত্নাবলী নাটকে বিদূষক বেশ একটি বড় ভূমিকা লাভ করেছে। মাঝে মাঝে ধাবমান ঘটনার ওপর মন্তব্য করে দর্শকদের কৌতূহল সঞ্জীবিত রেখেছে বিদূষক।

বাসবদত্তা। (হাস্য করিয়া) হাঁ নাথ, আমারি অনুরোধে বটে, তা যা হোক, এর মা বাপ দূর দেশে আছেন, আপনি একে একটু স্নেহ মমত্ব করবেন।

বিদূষক। (স্বগত) তার জন্যে আর বড় বলতে হবে না। ঐ যে কথায় বলে "পাগলা ভাত খাবি। না হাত ধোব কোথা?" তাই।

বিদূষক রাজার মন জানতেন; দর্শকদের কাছেও সেটি গোপন নয়। তাঁর মন্তব্য শুধু কৌতুকই সৃষ্টি করল না, কৌতূহলও।

তবে বিদূষক কোন কোন ক্ষেত্রে ঔদরিক, যথা 'রুক্মিনী হরণে' ধনদাস। কখনও কখনও তোতলা, যথা 'ধর্মবিজয় নাটক'। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও প্রচলিত যাত্রার রীতি তাঁর কাছে অনাদৃত থাকেনি।

রামনারায়ণ অনেক নাটকে নান্দী পরিহার করেছেন; কিন্তু বহু নাটকেই ভরতবাক্য বা শান্তিবচন ব্যবহার করেছেন।

বেণীসংহার

যুধিষ্ঠির। দাতালোক দীর্ঘজীবী হউক, তোমাতে সকলের মতি থাকুক, সজ্জনেরা পণ্ডিতের গুণ গ্রহণ করুন, রাজা নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কোরো সুখী থাকুন।

কৃষ্ণ। তাই হবে। (৬ অঙ্ক, পৃঃ ৯৬)

রত্নাবলী

রাজা। এখন ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা, পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হোক, প্রজারা সুখে থাকুক; লোকে সাধুসমাগম লাভ করুক, আর বজ্রতুল্য কঠোর, গরলতুল্য দুঃসহ, খলের দুর্বাক্য, যেন কাহারো কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তল

কাশ্যপ। আর কি কিছু প্রার্থনা আছে?

রাজা। আর প্রার্থনা কি? বরং এই প্রার্থনা যে, সাধুসমাগমেই আমার এই সম্পদ লাভ হলো তা যেন সকলের সর্বদাই সাধু সমাগম লাভ হয়।

কাশ্যপ। তাই হবে। (৭ম অঙ্ক)

রুক্মিণীহরণ নাটকেও শান্তিবচন আছে ; তবে তা জয়দেব-অনুসারী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। কৃষ্ণ-স্তুতি প্রসঙ্গে নারদ শান্তিবচন আবৃত্তি করেছেন।

মালতীমাধব

ভুরি। কেমন বাপু, তোমরা এখন সন্তুষ্ট হলো তো ?

মাধব। আজ্ঞা, আপনারা সকলেই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, এতেই আমার সন্তোষ ; তবে সভ্যজন মালতীমাধবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা বলা যায় না। [অগ্রসর হইয়া দর্শদের প্রতি করযোড় করিয়া) আপনারা সকলে সন্তুষ্ট হলেন কি ?

স্বপ্নধন

মতি। তবে আর কি, সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হয়েছে বলে মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন, স্বপ্নধন লাভ হয়েছে, সুতরাং রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয়েছেন, সখীরে! তোমরাও সকলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, এখন সভ্যগণ! এই স্বপ্নধন নাটক দর্শনে আপনারা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, এই গ্রন্থকর্তার হাতযশ আর আমার অদৃষ্ট।

একটু নজর করলেই দেখা যাবে যে, এই ভরতবাক্য বা শান্তিবচনের প্রয়োগরীতি ধীরে ধীরে বদলে গেছে। প্রথম যুগের ভরতবাক্যে দর্শকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা ছিল না। 'মালতীমাধব' থেকে এই দিকে লেখকের মনোযোগ পড়েছে।

সৌখীন নাট্যমঞ্চে তিনি সমাদৃত নাট্যকার ; এখন এই সমাদর যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য তিনি উদ্বেগ বোধ করেছেন।

রামনারায়ণ তাঁর অনুবাদমূলক নাটক বা পৌরাণিক নাটকে সংলাপ-ব্যবহারে সহজগ্রাহ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, একথা অনেকেই বলেছেন। তাঁর বর্ণিত পৌরাণিক রাজসভাগুলি সংলাপের আধুনিকতায় উনিশ শতকীয় ধনী গৃহের বৈঠকখানায় রূপান্তরিত হয়েছে।

রুক্মিণীহরণ নাটক

দ্বিতীয়। পাশা কি আবার পাড়া যাবে ?

যুব। মাথা ঘুরে গেছে আর পাশা। মন্ত্রি এখন কি করা কর্ত্তব্য ?

প্রথম। আজ্ঞে, আপনি যা অনুমতি করবেন তাই। উনি প্রাচীন হয়েছেন, ওঁর কথা কি হবে ?

যুব। কি আশ্চর্য। দেখ মন্ত্রি, বিষয়ের মমতা ত্যাগ করেছেন, তবু এখনো সংসারের মমতা ছাড়তে পারেন নি।

তৃতীয়। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। (১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক)

বেণীসংহার নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে মনস্বী রাজেন্দ্র লাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে লিখেছিলেন "সর্বত্র কাব্যরস রক্ষা করিয়া অভিনয়োপযুক্ত চলিত ভাষায় পরিপাটিরূপে বেণীসংহার অনুবাদিত করিয়াছেন।" (৪১ খণ্ড)

চলিত ভাষায় অনুবাদিত করার ফলে এগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রামনারায়ণ যখন লেখেন,

সোনা। তাহলেই কি বাপের কথা শুনতে হয় না? সে কি কথা।

শ্যামা। দিদি তুইও যেমন, এখানকার কালে ছেলেরা কি বাপের বাধ্য থাকে? এখনকার উপযুক্ত ছেলের কাছে বাপ ছোলার খোসা। (রুক্মিনী হরণ, ৪/১)

তখন তা ত নিছক পৌরাণিক আপ্তবাক্যের মত শোনায় না। অথবা

রাজা। রাজাদিগের প্রজাই ধন, প্রজাই মান, প্রজাই ভূষণ, প্রজাই দেহ। প্রজাদের মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল।

বিদূষক। হাঁ, ম-ম-মহারাজ যা বলেছেন স-সত্য কথা, কিন্তু স-সকল রাজ্যের প্রজা তো রাজার প্রতি পি-পিতৃ-ভক্তি করে না।

রাজা। যেখানে করে না সেখাই রাজারই দোষ; যে সকল রাজপুরুষ, রক্ষকপুরুষ, করদায়ি লোক, নিযুক্ত থাকে তাদের মূর্খতায় অমনোযেগিতায় স্বার্থপরতায় প্রজাদের বিরাগ জন্মে ওঠে। (ধর্মবিজয় নাটক, ১ম অঙ্ক)

এলোমেলোভাবে এখানে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা ভূম্যধিকারী সভার কর্মকর্তাদের (Landholders' Association) মনোভাবের অনুরূপ।

আধুনিক জীবন থেকে থেকে উঁকি দিলেও সে-যুগের Reform আন্দোলনের কোন চাপ এতে পড়েনি। তার জন্ত তাঁকে সোজাসুজি প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে।

নব্য নাটকের সূচনা

এবং আনন্দের বিষয় যে, সে-কাজ তিনি তাঁর নাট্যকার জীবনের সূচনা-লগ্নেই করেছিলেন। তাঁর প্রথম নাটক সে যুগের বহুনিন্দিত বহুবন্দিত

কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে। লেখকের নিজের বুকের মধ্যে একটা বেদনা ও ক্ষোভ জমা না থাকলে এমন বাস্তব ও জীবন্ত নাটক রচনা করা সম্ভব নয়।

তখন রামনারায়ণ নিতান্তই যুবক ; সংস্কৃত কলেজ থেকে এক বৎসর পূর্বে পাঠ সমাপন করে বেরিয়েছেন। সেই জীবনের প্রভাত বেলায় তিনি নবীন বাংলার প্রাণের কথাটি কান পেতে শুনেছিলেন। কোন প্রবন্ধকার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন ; যশোহরে যখন তিনি ছাত্র, তখন একটি বালিকা তাঁর মনকে জাগিয়ে দিয়ে যায় ব্যথার ঘায়ে। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে কৌলীন্য প্রথার যুপকাষ্ঠে বঙ্গ বালিকাদের বলিদানের যে ইতিহাস তিনি বিবৃত করেছেন, তার ভিতর লুকিয়ে আছে সেই কৈশোরে-দেখা ছোট্ট বালিকার স্নেহসিক্ত স্মৃতি। 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' মঞ্চকারদের অনুরোধে যে রচিত হয়নি, এটা তাঁর সৌভাগ্য। কারণ তখন পর্যন্ত যাঁরা মঞ্চ তৈরি করতেন, তাঁরা নাটক অভিনয়কালে তাঁদের বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী খুলতেন। বাজ-রাজড়াদের জীবনের সুখদ অভিজ্ঞতাপূর্ণ নাটক তাঁরা অভিনয় করতেন ; মাঝে মাঝে বাস্তব জীবনেব কোন চিত্র তাঁরা যে পরিবেশন করতেন না, তা নয়। কিন্তু সে চিত্রে কোন মহৎ ভাব থাকত না, থাকত শুধু পরচর্চা ও কুৎসা। কালীপ্রসন্নসিংহের 'বাবু' নাটক পাওয়া যায় নি বলে ঐতিহাসিকদের অনেকেই মনস্তাপে ভুগছেন। কিন্তু আমরা সে নাটকের কথাবস্তু অনুমান করতে পারি। সে নাটক হুতোমী কেচ্ছা-বিলাসের আর একটি দূষিত সংস্করণ মাত্র, যা পড়ে মাইকেলকে হয়ত বলতে হোত

"চাঁড়ালের হাত দিয়া পুড়াও পুস্তকে"।

পাথুরেঘাটার রঙ্গমঞ্চে যে সব প্রহসন অভিনীত হয়েছে, সেগুলির কুলশীল খোঁজ করলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের প্রসঙ্গ আবিষ্কার করা কষ্টকর নয়।

রামরানায়ণ অন্তরের তাগিদেই প্রথম নাটক লিখেছিলেন, মঞ্চের মালিকের বায়নায় নয়। নাটক রচনার পিছনে পুরস্কারের প্রত্যাশা থাকলেও প্যালার লোভ ছিল না। কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক (১৮৫৪) ও নবনাটক (১৮৬৬)— দুখানি গ্রন্থই সমাজের বাস্তব চিত্র সমৃদ্ধ। কিন্তু রূপায়নে বা তুলির টানে পার্থক্য আছে। কুলীনকুলসর্বস্বে সমাজব্যাধির একটি বিশেষ দিক তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন ; আর আর 'নব নাটকে' তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্রোহের কথা।

প্রথমখানি প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চ-সচেতনতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল না; দ্বিতীয়খানি মঞ্চের অধিকারীদের অনুপ্রেরণায় রচিত; অধিকন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে দশ বৎসর ধরে সৌখীন নাট্যমঞ্চের জন্য নাটক লিখে তদকালীন মঞ্চ-প্রয়োজন তাঁর অধিগত হয়েছিল। 'নব-নাটক' সৌখীন মঞ্চের নাট্যরীতির উদাহরণ। একটা কেন্দ্রীয় গল্প তিনি দিয়েছেন। এক গ্রাম্য জমিদার বহুবিবাহের জন্য দণ্ডভোগ করলেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর পরামর্শে প্রথমা পত্নী ও তার গর্ভজাত সন্তানের উপর নির্যাতন চলল; নাটকের শেষে একাধিক মৃত্যু দেখান হয়েছে।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক সম্বন্ধে যে অভিযোগটি প্রায় সর্বজনীন, 'নবনাটকে' যেন তার একটি জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম অভিনয়-রাত্রে নাটকের অসাধারণ মঞ্চ-সাফল্যে বিহ্বল হয়ে রামনারায়ণ স্বয়ং সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমরা অবশ্য 'কুলীনকুল সর্বস্বে' আদৌ কোন প্লট নেই, এই মত মানিনা; প্লট আছে।

বাংলা দেশের উনিশ শতকীয় সমালোচনায় এ্যারিষ্টটল তত প্রভাবশালী নন; কিন্তু বিশ শতকীয় সমালোচনায় তিনি প্রায় ঈশ্বরতুল্য।

স্বয়ং নাট্যকার 'কুলীনকুলসর্বস্বনাটকে'র কাহিনীর সারাংশ এইভাবে সংকলিত করেছেন:

"এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে কুলকামিনীগণের আচারব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিষয়ীর দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ।"

লেখক ছয়টি দৃশ্যে নাটকখানি বিভক্ত করেছেন এবং এই ছয়টি দৃশ্যে উপরিউক্ত ছয়টি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এই ছয়টি ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত; এবং বিনা কারণে সংগৃহীত হয় নি। কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাদের বিবাহকে কেন্দ্র করেই ঘটনাগুলির অবতারণা।

বিবাহ একটা সামাজিক ব্যাপার। এ দেশে বিবাহ কেউ করে না, বিবাহ হয়; ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, হয় পরিবারের সঙ্গে পরিবারের, স্বসমাজে ও স্ববর্ণে। তাই এই প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডে একটা ব্যাপক সামাজিক অংশ গ্রহণ ঘটে থাকে। শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে

দাঁড়িয়ে আছে রমা-রমেশের ব্যক্তিগত জীবন। কিন্তু সমগ্র পল্লীসমাজ সেখানে হাজিরা দেওয়ায় উপন্যাসের অঙ্গহানি ঘটেনি।

তেমনি কুলপালকের গৃহে তাঁর কন্যাচতুষ্টয়ীর বিবাহ উপলক্ষে এত বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন :

"কাহিনী সাধারণ নাটকের মত ধারাবাহিক নয়, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত। প্লট বলিতে কিছুই নাই, আছে নিতান্ত ক্ষীণ সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি কৌতুকাবহ ব্যঙ্গ চিত্র। নায়ক নায়িকা বলিয়াও কিছু নাই।"[১৪]

ডক্টর সেনের মত আরও বিস্তৃতরূপে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল ডক্টর প্রভু গুহঠাকুরতার কণ্ঠে :

"The author......is not at all consistent in the developement of the plot. He introduces a large number of relevant and irrelevant episodes and shows excessive fondness for digressions. He makes no serious attempt at characterisation or dramatic motivation.[১৫]

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন :

"নাটকখানি ছয়ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এক ভাগের সহিত অন্য ভাগের সংযোজনা নিরবচ্ছিন্ন হয় নাই।"[১৬]

ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ের অভিমত অনেকটা একই প্রকার। তিনি বলছেন, 'ছয়টি বিভিন্ন অংশ পরস্পরাপেক্ষী নয়, বরং পাঁচটি অংশ অপ্রাসঙ্গিক।' নাট্যকার নাকি নাটকে এমন বহু অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করেছেন, নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে যেগুলির কোনই সম্পর্ক নেই![১৭]

এই সব সমালোচনার মূল্য আমরা বাতিল করতে চাই না। কিন্তু একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্লট প্রসঙ্গটি চিরকাল একই প্রকার গুরুত্ব পায় নি; আর প্লট সম্পর্কিত ধারণারও যুগে যুগে পরিবর্তন ঘটেছে। এ্যারিষ্টটলের প্লট-সর্বস্বতা মেনে নিয়ে রামনারায়ণকে অভিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

রামনারায়ণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র জানতেন; সেখানে এই জাতীয় নাট্য-কাঠামোর সমর্থন নেই। তবু কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে রামনারায়ণ সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনেক নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছেন :

এ নাটকে নান্দী, সূত্রধার ও নটী আছে।

* সংস্কৃত রূপকনাটকের প্রভাবে কুশীলব ব্যক্তি না হয়ে শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি হয়েছে।
* নারী পুরুষভেদে সংলাপে পার্থক্য দেখিয়েছেন।
* দৃশ্যবিভাগে সংস্কৃত রীতি অনুসৃত হয়েছে।

বাহ্যত সংস্কৃত রীতির অনুসরণ থাকলেও কুলীনকুলসর্বস্ব প্রকৃত পক্ষে আধুনিক নাটক। আধুনিক নাটকরূপে পরিগণিত হবার প্রধান কারণ দুইটি—১. এই নাটকের আলোচিত সমাস্যাটি বহুপুরাতন হলেও তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তৎকালেই কেবল প্রশ্ন উঠেছে ; ২.এই নাটকে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে কেবল মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়ও চালিত হয়েছে। যে বেদনাবোধ থেকে এই নাটকের সৃষ্টি, তার জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে।

পূর্ববর্তী সাহিত্যে বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে মন্তব্য আছে ; কিন্তু কোন বেদনাবোধ নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বিষয়টি উপহসিত হয়েছে। আর ভারতচন্দ্র যাদের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন, তারা সবাই বিবাহিতা। আইবুড়ো-মেয়েদের কথা তাঁর মনেই ওঠেনি। অথচ ভারতচন্দ্র হলেন অষ্টাদশ শতকের রাঢ়-বঙ্গের কবি, যেখানে কৌলীন্যপ্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। পরবর্তী যুগে রাঢ় বঙ্গের আর এক লেখক 'বামুনের মেয়ে' লিখে এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতা সর্ব সমক্ষে তুলে ধরেছেন।

রামনারায়ণের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে মহাত্মা রামমোহন মসী ধরেছেন। যখন সাত বৎসর বয়স, তখন এনকোয়ারার, জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে। আর যখন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' আত্মপ্রকাশ করছে, তখন চলছে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন। বহুবিবাহ বিরোধী উত্তেজনা তখনও সৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে মাত্র। রিফর্মার, বেঙ্গল স্পেকটেটর, ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সমাজসংস্কারের পক্ষে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে ; সেই রচনাগুলি দেশের যুবমনে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে।

গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল বাইরের উৎসাহে, কিন্তু তার উপকরণ লেখকের বুকের মধ্যেই ছিল। কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় যে আঘাত তিনি পেয়েছিলেন সে আঘাত তাঁকে বিদ্বেষপরায়ণ করেনি।[১৮] ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে 'পতিব্রতো-পাখ্যানে' কৌলীন্য প্রথার দোষ ত্রুটি বিশ্লেষিত হোল। কুণ্ডীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরীর বায়নায় তিনি কলম ধরেননি। তিনি ছিলেন স্বভাবত নারীমুক্তিকামী।

পৌরাণিক নাটক কখনও 'অনুবাদ' করেছেন, কখনও নিজে লিখেছেন ; কিন্তু সর্বত্রই তিনি এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন। ব্যথাহত নারীকুল তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে ; মালতী, রুক্মিনী, রত্নাবলী, শৈব্যা, শকুন্তলা, দ্রৌপদী তাঁর এই সব নাটকের প্রধান চরিত্র। এঁরা দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন বলেই তাঁর কাছে স্পৃহনীয়া হয়েছেন। পুরুষচরিত্র থেকে এদের মৌলিক আবেদন সুস্পষ্টভাবে পৃথক।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে যে সব চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, সমালোচকগণ সেগুলিকে 'টাইপ বলছেন। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রধান হেতু চরিত্রগুলির নামকরণ। কুলপালক অর্থে আমরা পরিবারের কর্তা বুঝে থাকি ; এ নাটকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার নাম হোল কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটক দুজনের নাম অনৃতাচার্য ও শুভাচার্য। দুজনের চরিত্র অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে। এই রকম আরও কয়েকটি চরিত্রে রূপক-আশ্রয়তা আছে।

কিন্তু কুলপালকের স্ত্রী, কন্যাচতুষ্টয়ী কোন রূপকের ধার ধারেনি। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ। ঠানদিদি, ফুলকুমারী, ভোলা কেউ-ই আর রূপকের আঁচল ধরে হাটে নি। এরা সবাই সহজ জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ চরিত্র।

সমসাময়িক যুগে রচিত যাত্রার পালাগুলির কুশীলবের সঙ্গে তুলনা করলে পার্থক্য উপলব্ধ হবে। যাত্রার পালায় কোন চরিত্র থাকে না, থাকে কয়েকটি কুশীলব। তাদের সংখ্যাও অতিশয় কম। এগুলি হয় প্রমোদের প্রভু', না হয় ভক্তের ভগবান। চরিত্র হতে হলে দেবত্ববর্জিত মানবিক গুণসম্পন্ন হতে হয়।

রামনারায়ণ প্রথম কুশীলব নয়, প্রথম চরিত্র সৃষ্টি করলেন ; এবং দুটি-একটি নয়, বহু চরিত্র সৃষ্টি করলেন। জীবনের সজীবতা ও বৈচিত্র্য দুই-ই তাঁর রচনায় ফুটে উঠল। রামনারায়ণের নাটকের বিষয়বস্তু আধুনিক, এবং চরিত্রগুলি সমসাময়িক। যাত্রার পালার মত মৃত চরিত্র নিয়ে তিনি পিরামিড তৈরি করেন নি।

কুলপালক বন্দ্যঘটীয় কেশব চক্রবর্তীর সন্তান ; তাঁর চারিটি কন্যা ; পাল্‌টি ঘরে কুলীন সন্তান পাওয়া যায়নি বলে কন্যাদের এতদিন বিবাহ হয়নি। কুল নষ্ট করে কন্যা সম্প্রদানে তিনি রাজি নন। অনৃতাচার্য ও শুভাচার্য নামে দুই ঘটক কন্যাদের জন্ত পাত্র সন্ধান করছে। অনৃতাচার্য এক পাত্রের সন্ধান এনেছে, পাত্রের বয়স খুব বেশি নয়, মাত্র ষাট। ঘটকের নির্দেশে একদিনের ব্যবধানে

বিবাহের দিন ঠিক হোল। এত দ্রুততার কারণ কি? বিবাহের কোন লগ্ন নেই, তবু ঐ দিনই বিবাহ হবে। শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করলে পাত্র হাত ছাড়া হতে পারে। কুলপালক ঘটকের যুক্তি মাথা পেতে নিলেন।

কুলপালকের স্ত্রী সংবাদটিতে যারপর নাই আনন্দিত হলেন; কন্যাদায়-পীড়িতা জননী এতকাল কত অশান্তিই না ভোগ করেছেন! মেয়েদের কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে দিতে চললেন তিনি।

কুলপালকের চার মেয়ে—বড়টির নাম জাহ্নবী, মেজো শাম্ভবী, সেজো কামিনী এবং কনিষ্ঠা মেয়ে কিশোরী। বিয়ের কথা শুনে চার কন্যার মনে চার প্রকার প্রতিক্রিয়া হোল। বড় কন্যা বলল,"এই বয়সে যমের সঙ্গে বিবাহ হলেই ভালো হয়। বৃদ্ধকালে আর বিড়ম্বনা কেন?" মেজো মেয়ে শাম্ভবী খবরটি শুনে চিন্তিত হোল; সে বিশ্বাস করতেই পারছিল না। তৃতীয়া কন্যা বয়স কম; সে ঔৎসুক্য চেপে রাখতে পারল না। একবার ভাবল যে মা হয়ত তাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন। আর মা ত এই প্রকার ভুয়া আশ্বাস মাঝে মাঝেই দিয়ে থাকেন। কনিষ্ঠা কন্যা কিশোরী পাড়ায় খেলুড়িদের সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল; ভগ্নীদের আহ্বানে গৃহে ফিরে এল। বিবাহ ব্যাপারটিই তার কাছে অবোধ্য; মা তাকে বুঝিয়ে দিলেন। সে কী বুঝল, তা সে-ই জানে। কিন্তু সে খুসি হোল। মেয়েদের জানান হোল; এইবার জানাতে হবে পাড়াপ্রতিবেশীদের। কুলীনের কন্যার বিবাহ। এটা একটা জানাবার মত খবর!

অল্পক্ষণের মধ্যে প্রতিবেশিনীরা এসে জমায়েত হলেন কুলপালকের গৃহে। পুরনারীরা নিজেদের দাম্পত্য জীবনের নানা অসঙ্গতির কথা বলে চল্লেন। বাঙ্গালাদেশে কৌলীন্যব্যবস্থা পারিবারিক জীবনে কী অভিশাপ ডেকে এনেছে, তার একটা বিবরণী পাওয়া গেল এই দৃশ্যে।

বিবাহ লগ্ন উপস্থিত হল। পুরোহিত মহাশয় সশিষ্য এসে উপনীত হলেন। ফলারলোভাতুর নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ একে একে আসতে শুরু করলেন। এইখানে ফলারের সেই বিখ্যাত বর্ণনাটি আছে।

বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ প্রায়; তখন চার কন্যার প্রতিক্রিয়া জানা গেল আবার। প্রথমা জাহ্নবী শাম্ভবীকে বলল, "এখন আর বিবাহ হইয়া কি হইবে?" কারণ সে বিগতযৌবনা। শাম্ভবীর বয়স অত বেশি হয়নি; তাই সে বলল, "হউক না, দেখা যাউক।" কনিষ্ঠা ও তৃতীয়া তাদের চাঞ্চল্য

চেপে রাখতে পারল না। তারা বর দেখতে ছুটে গেল। হতাশ হোল তারা। শাম্ভবীর কাছে বরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলল, "প্রবীন বয়স শীর্ণজীর্ণ কলেবর।" কামিনী পরিষ্কার বলল, "একমাত্র বড়দিদির সঙ্গে তাহাকে মানাইতে পারে।" শাম্ভবী পিতার কাছে আপত্তি জানাবে বলল। কিন্তু পরে সবাই ভেবেচিন্তে বুঝল যে আপত্তি জানিয়ে কোন লাভ নেই।

বিবাহসভায় বরকে উপস্থিত করা হলে দেখা গেল যে তিনি শুধু বৃদ্ধই নন। তিনি অকাট মূর্খ, বধির ও কালা। আর রূপ? সর্বাঙ্গে দাদের দাগ, মুখে বসন্তের চিহ্ন। কিন্তু তাতে কি হবে, তিনি যে বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, ফুলের মুখুটি! কুলপালক কুল রক্ষা করলেন; এই অতি সৎ পাত্রের হস্তেই তাঁর চারিটি কন্যাকে সম্প্রদান করলেন!

এই কথাবস্তু যাত্রায় ছিল না—কৃষ্ণযাত্রায়, বিদ্যাসুন্দরযাত্রায় মানবজীবনের কোন সংবাদ ছিল না, ছিল শুধু প্রণয় আর তার ছলাকলা। হরচন্দ্র ঘোষ ইংরিজি নাটকের বঙ্গীয়করণ করেছেন—তার বঙ্গীয়ত্ব বর্তমান কালের বঙ্গীয়ত্ব নয়। সেই বঙ্গ-অস্বীকৃতির যুগে রামনারায়ণ নাটকের সমগ্র গল্পাংশ দেবলোক থেকে নামিয়ে নিয়ে এলেন চলমান বঙ্গলোকে। এই জাতীয় কাহিনী-নির্বাচন বাঙ্গালা নাটকের অঙ্গনে শুধু নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৃহত্তর পটভূমিকাতেও একটা বড় ঘটনা। "আলালের ঘরের দুলাল," "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" ও 'নীল দর্পণ' প্রকাশের পূর্বে এই নাটকের আত্মপ্রকাশ। প্লটের বুনুনি কতটা নিখুঁত, সে প্রশ্ন অপেক্ষা বহুগুণ প্রাসঙ্গিক হোল এই প্রকার আখ্যান-অংশের উপস্থাপনা সেযুগে আদৌ সম্ভব ছিল কি? শুধু নাটকের নয়, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করাবার কাজে রামনারায়ণের একটা বড় অবদান থাকল।

তাঁর নাটকের আখ্যানবস্তু চরিত্রগুলিও অভিনব। রাজেন্দ্রলাল মিত্র কুলীনকুলসর্বস্ব সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে হাস্যার্ণব নাটকের চরিত্রের সঙ্গে এই নাটকের কুশীলবদের মিল আছে। উভয় নাটকের চরিত্রগুলি রূপকধর্মী (allegorical)[১৭ক]। কবি জগদীশের সংস্কৃত প্রহসন 'হাস্যার্ণবে'র কুশীলবদের নাম হোল লোভী রাজা, দুরাকাঙ্ক্ষ মন্ত্রী, নির্বোধ চিকিৎসক, ভীরু সেনানী। এদের মতই কুলীনকুলসর্বস্বের কুশীলবদের নাম হোল কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনৃতাচার্য ঘটক, অভব্যচন্দ্র, ধর্মশীল, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরনারায়ণ, বিরহিপঞ্চানন, বিবাহবাতুল প্রভৃতি। অস্বীকার করা যায় না

যে জগদীশের রচিত হাস্যার্ণবের সঙ্গে আঙ্গিকগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু এই পুরাতন আঙ্গিকের মধ্যেই তিনি নবীনত্ব সঞ্চার করেছেন। চরিত্রগুলি রূপক থেকে 'টাইপে' পরিণত হয়েছে।

রূপকের নিজস্ব কোন পরিচয় থাকে না, রূপকিত চরিত্রের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না, সে ভিন্ন ব্যক্তির মজুরবৃত্তি করে। আর 'টাইপ' স্বতন্ত্র, তার স্বাতন্ত্র্য প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ প্রকট বলে সে চরিত্র হতে পারে না। কিন্তু টাইপ রূপকের মত অপরের মুখোস পরে চলাফেরা করে না।

মিত্রমহাশয় হাস্যার্ণবের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন, কিন্তু পার্থক্যটুকু দেখাননি। রামনারায়ণ বাংলা নাটকের চরিত্র-জগতেও একটা পরিবর্তন আনলেন।

রামনারায়ণের সৃষ্ট চরিত্রগুলি হাস্যার্ণবের চরিত্রের সগোত্র নয়। এবং এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করার জন্য শুধুমাত্র কুলপালকমহাশয়ের চার কন্যার উদাহরণই যথেষ্ট। কুলপালকমহাশয় অবশ্যই কৌলীন্য-প্রভাবিত সমাজের এক সাধারণ ও অতি পরিচিত পিতৃ-চরিত্র। তাঁর কোন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। কিন্তু তাঁর কন্যা চারটি যত নিগৃহীতই হোক, তাদের হৃদয়ের ঐশ্বর্য কত অপরিসীম! এই ঐশ্বর্যের বলেই তারা সকলে স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি। তারা দলে পড়ে দলা পাকিয়ে যায় নি।

মা এসে তাদের বিবাহের খবর দিলেন। বড়ো কন্যাতিনটি সেখানে উপস্থিত ছিল; তাদের বয়স যথাক্রমে প্রথমার ৩২, দ্বিতীয়ার ২৬, তৃতীয়ার ১৮। তিনজন এই সংবাদে তিন প্রকারে প্রতিক্রিয়া জানাল। জাহ্নবী যখন বলল 'আর বিবাহ করিয়া কি হইবে?' তার জবাবে শাম্ভবীর এই উক্তি অবিস্মরণীয়— "দিদি ক্ষতি কি, হলোই বা।" অনেকে এই নাটকটিকে প্রহসন মাত্র বলেছেন। এ যদি প্রহসনের ব্যাপার হয়, জানি না ক্রন্দনের বিষয় কি? আর আট বৎসরের বালিকা যখন বাড়িতে বিবাহ-অনুষ্ঠানের খবর শুনল, তখন তার প্রথম প্রশ্ন হোল, 'তা আমি কি খাব।' সত্যিই, বিয়ে বাড়ির ভালোমন্দ ভোজ্যবস্তুই ত তার কাছে আকর্ষণীয়। তারপর বুঝিয়ে দেওয়া হোল যে, তাদের চার জনের একত্রে বিবাহ হবে, তখন সে জিজ্ঞাসা করল, "ও মা! তবে তোর হবে না?"

কেউ কেউ একে বলেছেন, স্থূল হাস্যরস! জানি না এর থেকে সত্য (নির্মমও বটে!) পরিহাস আর কি হতে পারে।

সম্ভবত এই সময়ে চুপিচুপি 'নাটুকে রামনারায়ণ' তাঁর টোলের জীবনের সেই ক্ষুদ্র বালিকার কাছে চলে গেছেন। সেই যে 'ডাকঘরে' একটি মেয়ে বলেছিল, 'ও জাগলে, ওকে বোলো যে সুধা তাকে ভোলেনি।' ঠিক তেমনি ভাবেই যেন রামনারায়ণ বলেছেন, আমি ভুলিনি। আঘাত তাঁকে নৃশংস করেনি, প্রত্যাঘাতে প্ররোচিত করেনি। তাঁকে বেদনার্ত করেছে, স্নেহার্দ্র করেছে। তুলনা করুন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে। সামাজিক বা পারিবারিক অবিচার তাঁকে বিদ্বেষী করে তুলেছিল। "স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান. গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী. পুণ্যময়ী করিতে পারেন না।"

রামনারায়ণ আঘাত পেয়েও নারীকে সুখময়ী রসময়ী পুণ্যময়ী করেই এঁকেছেন। অন্তত আঁকতে চেয়েছেন। সব কয়টি নারীচরিত্রই জীবনের সুধাপাত্র হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে, দেবতার প্রসাদ কামনায়।

অতি তুচ্ছ এক নারী; নাম তার ফুলকুমারী। ফুলকুমারী তার স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী ঠান্‌দিদির কাছে বর্ণনা করছে—

একদিন ঘাটে বসিয়া কাপড় কাচিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, তোমাদের জামাই আসিতেছে। কাপড় কাচা পড়িয়া রহিল, মনের আনন্দ মনে চাপিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলাম; আশা করিয়া রহিলাম বহুদিন পর তাহার সহিত আমার সুখের মিলন হইবে। এতদিন পর কি ভাবে তাহার সঙ্গে আমি ব্যবহার করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, বাড়ির সকলেই জামাতাকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা জানাইতে গেল; কিন্তু জামাতা বলিল, "ব্যাভার না পাইলে এখানে আর পা ধুইব না।" শুনিয়া মাতা খাড়ু বাঁধা দিয়া টাকা ধার করিয়া আনিলেন, সেই টাকা হাতে লইয়া জামাতা পা ধুইল। তথাপি টাকা অল্প বলিয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিতে লাগিল। রাত্রে জামাতার আহারের আয়োজন করা হইল। আহারে বসিয়া "ইহা খায়, উহা ফেলে নবাবী করিয়া।" রাত্রিতে শয়নগৃহে নিদ্রার ভাণ করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় সেই পাষণ্ড গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া বলিল, 'শীঘ্র করি অর্থ মোর হাতে দেও আনি।' নতুবা তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কাটনা কাটিয়া যে

কিছু কড়ি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা সবই আনিয়া তখন তাহার হাতে দিলাম। তথাপি 'অধিক দেও' কহিল পাগল। কিন্তু আর অধিক দিতে পারিলাম না, সেই ক্রোধে সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া বাবার টোলে দরমা পতিয়া শুইয়া রাত্রি কাটাইল। তারপর প্রভাতে উঠিয়া কখন চলিয়া গেল। আর তাহার দেখা পাওয়া গেল না। আর এদিকে আমি, 'একাকিনী বিরহিনী যামিনী জাগিয়া, নয়ন করেছি রাঙা কাঁদিয়া কাঁদিয়া' এই বিবরণ শুনে ঠান্‌দিদি বলেছিলেন,

"আর বলিসনে, বলিসনে, বুক ফেটে যায়।"

কিন্তু আমাদের আর একটু শুনতে হয়েছে। ফুলকুমারী বলেছিল,

"ঠানদিদি এ থাকাচ্চেয়ে না থাকা ভাল।"

বাক্যটি বলেছিল ফুলকুমারী অঘোরে কাঁদতে কাঁদতে; যদি শুকনো গলায় শুকনো চোখেও বলত, তবু এই ভাষণের অশ্রুময়তা গোপন থাকত না।

সমালোচক যখন বলেন, "কৌতুকরস মন্দ নয়, যদিচ প্রায়ই তা গ্রাম্যত্বে পর্যবসিত,"[১৮] বা "সংলাপে ঔচিত্যের অভাব আছে"[১৯] বা "ব্যঙ্গ চিত্রগুলির বাস্তব সরসতার জন্য অভিনয়ে খুব জমত"[২০] বা "The dialogue is sparkling and highly entertaining at times, especially in the comic scenes, but otherwise, it is flat and highly declamatory," বা "Ramnarayon didnot realise that humour might be capable of sincere emotion and not purely intellectual and destructive,"[২১] আবার তখন সমগ্র নাটকখানি নতুন করে পড়তে হয়। একটি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হবো। ধর্মশীলের সঙ্গে অধর্মরুচির কথোপকথন আমরা তুলে দিচ্ছি :

ধর্মশীল। আপনার নিবাস কোথায় মহাশয়?

অধর্মরুচি। শ্বশুর বাড়ি।

ধর্ম। শ্বশুরবাড়ি নিবাস ইহা কেমন কহিলেন?

অ। যেখানে থাক্তে হয় সেই নিবাস।

ধ। আপনি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায় করেন?

অ। (সক্রোধে) আঃ, আমি কি ডোম, যে ধর্মশাস্ত্র শিখে ধর্মপণ্ডিত হব?

ধ। আপনি ক্রোধ করিবেন না, জিজ্ঞাসা এমন রীতি আছে লোকে করে থাকে, তায় ক্ষতি কি? বলুন না কেন কি ব্যবসায় করেন?

অ। আমার বিবাহ ব্যবসা আর কি ব্যবসা ?

ধ। বিবাহ ব্যবসায় কি দেহযাত্রা নির্বাহ হয় ?

অ। হাঁ, হয়ে থাকে। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন আমাদিগকে যে নিষ্কর তালুক দিয়া গেছেন তার হাজা শুকো নেই তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েত নেই, সেঠেরও খাতক নই।

এই সংলাপের প্রহসনাত্মক দিক নিশ্চয়ই আছে, শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষনীয়া'র মধ্যেও হাস্যরসাত্মক দিক আছে। কিন্তু বহুগুণ বেশি আছে করুণ রসাত্মক দিক, বেদনার দিক।

কুলপালকের বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেছেন ব্রাহ্মণপুঙ্গব, নাম তাঁর উদয়নারায়ণ। শিশু পুত্রটিকে সঙ্গে নেবার জন্য স্ত্রী সুমতি তাঁর স্বামীপ্রবরকে অনুরোধ জানালেন। "ভালমন্দ সামগ্রী খেতে পায় না, নে যাও খেয়ে আসবে।" কিন্তু উদয়নারায়ণ অপরের উদরের সংবাদ রাখেন না। শিশুপুত্রকে চপেটাঘাত করে ফেলে রেখে তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চললেন। 'পল্লীসমাজে' সনাতনের যে চিত্র আছে, তার থেকেও এই চিত্র অধিকতর মর্মান্তিক। দর্শকদের হাসাবার জন্য শিশুর গালে চপেটাঘাত করেননি নাট্যকার।

রামনারায়ণের নাটকের সংলাপ যা বলবার, তাই শুধু বলেছে। এ-সংলাপ তির্যক, অর্থবহ ও চরিত্র উদ্‌ঘাটন-প্রয়াসী। এ-সংলাপ নাটককে এলিয়ে দেয় নি, এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একে 'Patterned Language' বলা যায় না।

রামনারায়ণ সর্বপ্রথম যথার্থ জীবন-ভিত্তিক নাটক লিখলেন, এবং সৌখীন নাট্যমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হবার পূর্বে। তারপর দীর্ঘ বারো বৎসর তিনি পুরাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মঞ্চাধ্যক্ষদের ইচ্ছাপূরণে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার কর্মকর্তাদের ইচ্ছায় তিনি আবার জীবন-ভিত্তিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে ফিরে এলেন।

নব-নাটক

"বাবা মশায়, জ্যোতিকাকা মশায় ও কৃষ্ণবিহারী সেন এক স্কুলে পড়েন। আর্ট স্কুলের প্রথম ছাত্র ওঁরা। আমাদের বাড়ির একতলায় একটি কোণের ঘরে ওঁরা মতলব করছেন মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয় করবেন। জ্যাঠামশায়ের কানে গেল কথাটা। উনি ছোটভাইকে ডেকে পাঠালেন। তখনকার দিনে ছোটো ভাই বড়ো ভাই খুব বেশি কাছাকাছি আসতেন না। তা

ছোটো ভাই আসতে বললেন, থিয়েটার করবে সে তো ভাল, তবে কৃষ্ণকুমারী নয় —ওতো হয়ে গেছে পাথুরেঘাটায়। নতুন একটা কিছু করতে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, যে বহুবিবাহ সম্বন্ধে একখানা নাটক লিখে দিতে পারবে তাঁকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন বহুবিবাহ বিরোধী নাটক। একখানা দামী শাল ও পাঁচ শো টাকা পুরস্কার পেলেন। নাটকের নাম হল নবনাটক।"

পুরস্কারের টাকার পরিমাণটা স্মৃতিতে একটু ভারী হয়ে গেছে তা নইলে অবনীন্দ্রনাথ ইতিহাসটি যথাযথই বলেছেন।[২২]

এ নাটক মঞ্চস্থ করার পিছনে নতুন একটা কিছু করার তাগিদ ছিল; আর ছিল সামাজিক সুবুদ্ধি উদয়ে সহায়তা করার। ইতিপূর্বে বিধবা-বিবাহনাটক' লিখিত হয়েছে, অভিনীত হয়েছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচিত হয়েছে, নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও মঞ্চস্থ একদা হয়েছে। 'নবীন তপস্বিনী' রচিত হয়ে গেছে। 'নবনাটক' আর 'নবীন তপস্বিনী'র আখ্যানভাগের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

সংস্কার-আন্দোলনে সহযোগিতার বাসনায় নানা নাট্যকার কলম ধরেছেন। সেগুলির অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয় নি; কাজেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে লাভ নেই।

নব-নাটক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এ নাটক পুরোদস্তুর ট্রাজেডি এবং তদকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশ্বস্ত পারিবারিক চিত্র। গল্পের নায়ক হলেন গবেশবাবু; তিনি একজন গ্রাম্য জমিদার; তাঁর স্ত্রীর নাম সাবিত্রী; পুত্রদ্বয়ের নাম সুবোধ আর সুশীল। গবেশবাবু প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন; বয়স তখন পঞ্চাশ। কতিপয় মোসাহেবের পরামর্শে তিনি আবার বিবাহের সঙ্কল্প করলেন। যাঁরা এর বিরুদ্ধে মত দিলেন, তাঁদের ম্লেচ্ছাভাবাপন্ন বলে গালাগাল দিলেন; এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করাকে কৃশ্চানী কাজ এবং নাস্তিকের কাজ বলে মনে করলেন। গবেশবাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করে যে বালিকাটিকে গৃহে আনলেন, তার নাম চন্দ্রলেখা। সাবিত্রী স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহে মনস্তাপে দগ্ধ হলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ জানালেন না। এদিকে চন্দ্রলেখা স্বামীকে সহজেই বশ করে ফেলল, কারণ স্বামীর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি ছিল না। সে সাবিত্রী ও তাঁর পুত্রদ্বয়ের উপর নানারকম অত্যাচার চালাতে লাগল। স্বামীর সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিল, সাবিত্রী

ও তার পুত্রদ্বয়কে বঞ্চিত করে। সাবিত্রীকে অন্তঃপুর থেকে বিতাড়িত করা হোল। বাড়ির বাহিরে এক গোলপাতার ঘর বেঁধে তিনি বসবাস করতে লাগলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র এত অপমান সহ্য করতে না পেরে একদিন দেশান্তরী হোল। পুত্রের গৃহত্যাগে সাবিত্রীর কষ্ট বাড়ল ; একদিকে পুত্রের জন্য দুর্ভাবনা, অপর দিকে চন্দ্রলেখার অত্যাচার। এই দ্বিবিধ যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মঘাতিনী হলেন। গলায় দড়ি দিয়ে তিনি ভবযন্ত্রনা সংবরণ করলেন।

গবেশবাবুর জীবনও সুখে অতিবাহিত হোল না ; নানা দুর্ভাবনার চাপে তাঁর শরীর ভেঙ্গে গেল ; অবশেষে একদিন হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। একদিন সুবোধ বিদেশ থেকে ফিরে এল , এসে দেখল পিতা ও মাতা উভয়েই পরলোকে গমন করেছেন। ক্রমশঃ অনুসন্ধান করে জানল যে মা আত্মঘাতিনী হয়েছিলেন। এ খবর যে-মুহূর্তে সে শুনতে পেল, তখনই মূর্ছিত হয়ে পড়ল এবং তারও মৃত্যু হোল।

নাটকের শিরোনামে লেখক লিখেছিলেন—

"বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব-নাটক"। এটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'কুলীনকুল সর্বস্বে' উদ্দেশ্য-প্রবণতা 'নব-নাটকের' মতই প্রকট। তবে 'কুলীন কুলসর্বস্বে' নাটকের বক্তব্য নাটকই বলেছে, এখানে নাট্যকার বলেছেন।

রামনারায়ণের এই দুখানি নাটকের ঘটনাই আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাস্তব জীবনের ছবি এখানে ফুটেছে, একথা বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু বক্তব্য হোল, যা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় হয়, জনসভায় বক্তার কণ্ঠে মুক্তি পায়, তা কি নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রামনারায়ণ তাঁর নাটকে নাট্যবস্তুর কোথায় সন্ধান পেয়েছেন ? এ বিষয়ে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত পরিবেশন করা খুব কঠিন নয়। পূর্বতন নাটকের মধ্যে কেন্দ্রীয় কথাবস্তু নেই, এই অভিযোগে তিনি বিব্রতবোধ করেছিলেন ; তাই 'নব-নাটক' অভিনয়ের রাত্রে তিনি সদর্পে বলেছিলেন, "যারা পলাট নাই পলাট (Plot) নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাক।"[২২ক]

বিশ্বনাট্য-ইতিহাসে প্লট নানাভাবে উপস্থাপিত। এ্যাণ্টিগোনেকে নিয়ে যে প্লট গড়ে উঠেছে, তার রূপ এক প্রকার ; আবার হ্যামলেটকে ঘিরে যে প্লটের বিন্যাস, তার চরিত্র পৃথক ! ইবসেন নোরাকে কেন্দ্র করে যে প্লট গঠন করেন, সে ত হ্যামলেটের অনুবাদ নয়।

আর শেহবের 'চেরি অর্চাডে'র প্লট কেবল মানুষের জীবনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে, তা-ই বা ভাবি কি করে? ঐ বাগানটিকে ত বাদ দিতে পারছি না! এবং সাম্প্রতিক কাল বার্টলট ব্রেশ্‌টতো এ বিষয়ে একেবারে স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসার প্রাথমিক ভিত্তি হোল এ্যারিষ্টটল-বিরোধিতা। দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্লটের কেন্দ্রস্থলে থাকতে পারে; এতকাল সে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘটত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির। ব্রেশ্‌ট তাকে ঘুরিয়ে দিলেন; বললেন, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বই আসল দ্বন্দ্ব।

নবনাটকের নাট্যকার এত সব তর্ক জানতেন না; এবং জানার প্রয়োজনও মনে করতেন না। তিনি কিন্তু মনে করতেন ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্ব চলছে। ব্যক্তি এগুতে চাইছে, সমাজ তাকে বাধা দিচ্ছে পুরাতন প্রথার দোহাই দিয়ে; কখনও বা ঈশ্বরের নাম করে মানুষকে ছোট করছে। মানুষকে বিচার করতে হবে মানবিক মূল্য অনুসারে। তর্করত্নমশাই একথা প্রথম বলেছিলেন 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'; আবার বললেন 'নবনাটকে'। অবশ্য এখন আর তিনি একা নন, তাঁর অনেক সঙ্গী জুটেছে, মাইকেল, উমেশচন্দ্র মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র। এমন কি গদ্যে এবিষয়ে নিবন্ধ লিখেছেন বিদ্যাসাগরমহাশয়, তথ্য সংগ্রহ করেছেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

আবেদনপত্র পাঠাচ্ছেন ২০৮৪১ জন ব্যক্তি, তার মধ্যে আছেন বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ সহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।'[২৩] নবনাটকের নাট্যকার এইভাবে বিষয়টি খুঁজে পেলেন। এর জন্য স্বতন্ত্র কোন প্রয়াস তাঁকে করতে হয় নি।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই নাটক থেকে "কুলীনকুল সর্বস্বে'র জের কাটে নি; নাটকের কয়েকটি কুশীলবের নামকরণে রূপক-আশ্রয়ী মনোভাব দেখা দিয়েছে। বিধর্মীবাগীশ, দম্ভাচার্য প্রভৃতি নাম তার দৃষ্টান্ত। অন্যান্য চরিত্র শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গবেশবাবু, চন্দ্রলেখা, সাবিত্রী সকলেই যেন এক একটি 'টাইপ', পুরো চরিত্র নয়। নাট্যকার-জীবনের সূচনা-মুহূর্তে যে শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, উপসংহারে তার কোন বিকাশ ঘটাননি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মত তিনি একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি নবনাটকে নাট্যকাহিনীর পরিণতি দেখিয়েছেন। এবং 'কুলীনকুল সর্বস্ব' থেকে উন্নততর কলা-নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রশ্নটি বিচার করে দেখা দরকার।

'নবনাটক' ছয় অংকে বিভক্ত নাটক ; দৃশ্যবিভাগ আছে, দৃশ্যগুলিকে বলা হয়েছে 'প্রস্তাব'। এ ছাড়া আছে গর্ভাঙ্ক। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেছেন :

"নবনাটকের মধ্যে রামনারায়ণ ইংরেজি নাটকের অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্গত করিয়া গর্ভাঙ্কের (scene) ব্যবহার করিয়াছেন, কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে তাহা করেন নাই।"[২৩]

ডক্টর ভট্টাচার্যের বৃহৎ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বিষয় অবহেলিত হয়েছে। তর্করত্ন মহাশয় 'Scene' অর্থে গর্ভাঙ্ক আদৌ ব্যবহার করেন নি, প্রস্তাব 'Scene' অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থ সংবাদ দিয়েছেন, "গর্ভাঙ্কগুলি ইংরেজি নাটকের Act ও Scene-এর অনুকরণে অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং এক একটি অঙ্ক শেষ হইলে একটি গর্ভাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকে গর্ভাঙ্ক বিরল হইলেও সংস্কৃত গর্ভাঙ্ক শব্দের ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য।"[২৪]

১৮৬৬ সালে রামনারায়ণ দৃশ্য বা সংযোগস্থল বিষয়ে মনস্থির করতে পারেন নি ; কিন্তু পরবর্তী নাটক 'রুক্মিনীহরণ' ও 'ধর্মবিজয়ে' তিনি দৃশ্য (Scene) অর্থে গর্ভাঙ্ক ব্যবহার করতে আর ইতস্তত করেননি। বেণীসংহারে' দৃশ্যবিভাগ করেছেন, 'রত্নাবলী'তে দৃশ্য অর্থে 'প্রকরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

শুধু দৃশ্য অর্থে গর্ভাঙ্ক ব্যবহারে তাঁর বিভ্রান্তি নয়, নাটক কয় অঙ্কে সীমাবদ্ধ থাকবে, এবিষয়েও তিনি শেষ পর্যন্তও স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। নব-নাটকে (ট্রাজেডি গঠনে) তিনি ছয় অঙ্কের অবতারণা করেছেন। অথচ পৌরাণিক 'অনুবাদ'মূলক নাটকে একদা তাঁকে দেখেছি পঞ্চাঙ্কাধিক নাটককে পাঁচ অঙ্কের প্রাচীরে বদ্ধ করার কী আপ্রাণ প্রয়াস !

নব-নাটক নানা ব্যাপারেই তাই কুলীনকুলসর্বস্ব থেকে উন্নততর রচনা নয়।

'কুলীনকুলসর্বস্বের' মূল নাট্যীয় কাঠামোর সঙ্গে 'digression' মানিয়ে গেছে। নব-নাটক আধুনিক ট্রাজেডি ; তবু এই নাটকের প্লট-গঠনে 'digression'-এর প্রশ্রয় দিয়েছেন—যেমন তৃতীয় অঙ্কে গ্রাম্য ও নাগরের কথোপকথন, রসময়ী এবং কৌতুকের কথোপকথন।

কুলীনকুলসর্বস্বের মত এখানেও পয়ারের কাটান ছিল। এটা নিন্দা করবার মত বিষয় নয়। কারণ পয়ার-অনুরাগ সে-যুগের রসসংস্কারের অন্তর্ভূত। মাইকেলে আছে, দীনবন্ধু মিত্রে আছে। 'আলালের ঘরের দুলালের' মত উপন্যাসেও আছে।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

"নব-নাটকের আর একটি প্রধান গুণ—ইহার মধ্যে কোথাও 'কুলীনকুল সর্বস্বের' মত পয়ার—ত্রিপদী ছন্দে রচিত দীর্ঘ পদ্য ব্যবহৃত হয় নাই।"[২৫]

ভট্টাচার্য মহাশয় সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি দেখেছেন, এবং শুধু গ্রন্থখানিই, ভূমিকাটি নয়।

"এই নবনাটকে যে কএক স্থানে পদ্য ছিল তৎপরিবর্তে তৎবিষয়ক কএকটি সুললিত সংগীত সংযোজিত করিয়া এবার মুদ্রিত করিলাম।"—(দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন) এককথায় 'নব-নাটক' তার পূর্বতন 'নাটক কুলীন কুল-সর্বস্বে'র মতই পুরাতন অবয়বে আধুনিক আত্মার অধিকারী। তখন সহজেই দর্শকদের অভিভুত করে রাখা যেতো। তাই নান্দী-নটী-সূত্রধার-গর্ভাঙ্ক— সব কিছু আমদানী করেও এ-নাটক নবীপন্থীদের মনোরঞ্জন করেছিল। কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছিলেন :

"The acting was infinitely better than the writing of the play."[২৬]

সে ছিল বাংলা রঙ্গমঞ্চের সত্যযুগ। সবই তখন বিস্ময়ের! সবই তখন অভিনব! রঙ্গমঞ্চে হারমোনিয়াম বাজান হবে, এই নাটকের অভিনয় বিষয়ে সেটাও ছিল একটা বলার মত খবর! এই রকম বিস্ময়ের ঘোর না কাটার জন্য নাটক রচনায় কোন শৃঙ্খলাবোধ আসছে না। বিশেষ করে অল্প প্রতিভাবান নাট্যকারগণ মঞ্চের কর্ণধারদের অপটুচালিত অস্থির তরণীতে উপবেশন করে নিজেরাও বিচলিত থেকেছেন সর্বদা। নাটকের বিষয়, রচনারীতি সবই নড়বড়ে থাকছে।

প্রমোদবিলাসের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে না, শিক্ষা ও রুচিকে তখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়। জোড়াসাঁকো মঞ্চে হয়ত তা সম্ভব হোত না।

"তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে—সমবেত বাদ্যদ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে—কবিত্ব রসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যমভায়ার উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"[২৭]

কিন্তু পাথুরেঘাটা ও অন্যত্র এই সংযম রক্ষিত হয়েছিল, একথা জোর করে বলা যায় না। ঐ মঞ্চের জন্য তিনি 'রুক্মিনীহরণ' 'মালতীমাধব' রচনা করেছিলেন। আর রচনা করেছিলেন তিনখানি প্রহসন—'যেমনি কর্ম তেমন ফল', 'উভয় সংকট', 'চক্ষুদান'। যে কলম দিয়ে পুরাণের কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন, সেই কলম দিয়েই চলমান জীবনের বিষয় নিয়ে লিখলেন প্রহসন।

এগুলি সে-যুগের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কুলীনকুলসর্বস্ব ও নবনাটকে যা বেদনার জন্য সঞ্চিত হয়েছিল, এখানে তা উপভোগের উপকরণ হয়েছে। সৌখীন নাট্যশালার দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে নাটক রচিত হয়েছে।

কর্তা। ওরে ছেড়েদে, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, একবার ছাড়, খালি সভ্যমহাশয়দিগের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাত ছাড়ে না যে, কৃতাঞ্জলি হতে পেলাম না, কি করি সভ্য মহাশয়েরা, একটা কথা বলি, ওরে একটু স্থির হ, ওগো মহাশয়েরা আমার দুর্গতি আপনারা দেখছেন, আপনাদের মধ্যে আমার মত সৌভাগ্যশালী পুরুষ কেহ থাকেন তিনি এমন সময় উপস্থিত হলে না-জানি কি করেন, বোধ করি তাঁরও এইরূপ উভয়সংকট। (উভয়সংকট)

নিকুঞ্জ। বসুমতি, তুমি আজ কেবল আমাকেই চক্ষুদান দিলে এমন নয়, সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চক্ষুদান হলো। (সভা প্রতি কৃতাঞ্জলিপূর্বক) সভ্যমহাশয়েরা কি বলেন? আপনাদেরও কারু কারু চক্ষুদান?

(চক্ষুদান)

কুলীনকুলসর্বস্ব, ও নব-নাটক লোকশিক্ষার অভিপ্রায় থেকে রচিত। কিন্তু প্রহসনগুলি লোকশিক্ষার ভাণ করেছে। এগুলি সেকালের অজস্র নক্‌সা জাতীয় রচনার ভিড় বাড়িয়েছে। সমাজের অনাচার উদ্ঘাটন করাই যদি এগুলির উদ্দেশ্য হবে, তাহলে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' অনাদৃত থাকবে কেন? 'একেই কি বলে সভ্যতা' দেখে ভয় পাবার কারণ কি? সমাজের কুপ্রথার সমালোচনারও একটি সীমা মানতে হবে, যা ডিঙ্গানো চলবে না।

'যেমন কর্ম তেমনি ফল-এ' আছে নারী মাংসলোলুপতা, 'উভয় সঙ্কটে' বহু বিবাহের কুফল, 'চক্ষুদানে' আছে বেশ্যাসক্ত মাতাল স্বামীর সুবুদ্ধি উদয়। কিন্তু এ সমালোচনা সর্বত্র বয়স্কের সমালোচনা। চাই শিল্পীর নিরপেক্ষ রূপসন্ধানী দৃষ্টির প্রণিপাত। 'নব নাটকে' সংলাপ যেখানে গম্ভীর, সেখানে

অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ ও বর্ণনামূলক। প্রহসন তিন খানিতে ভাষাকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য অনুপ্রাস ব্যবহার করা হয়েছে, ভুল পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এ যেন অঙ্গবিকৃতি ঘটিয়ে হাসির অবকাশ তৈরী করা।

কৃত্রিম ও আড়ষ্ট পরিবেশে প্রাণখোলা হাসির সন্ধান মিলবে না। আসলে রাজসভার ভাঁড় কখনও আপন ইচ্ছায় হাসে না, তাকে হাসাতে হয় বলে হাসতে হয়। কুলীনকুলসর্বস্ব থেকে নব নাটক এই দ্বাদশ বৎসর (অজ্ঞাতবাসে নয়) তিনি যাপন করেছেন সৌখীন ভুবনে। তাই ভাষায় ও ঘটনা-সংস্থানে তাঁর লেখনী তাঁর প্রকৃতিদত্ত লৌকিক ও জীবন্ত স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করে ফেলেছিল।

কুলীন কুলসর্বস্বই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হয়ে রইল ; এবং তাঁর বিশ বৎসরের রচনায় কোন অগ্রগতির চিহ্ন ফুটে উঠল না। রত্নাবলীর ভূমিকায় তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, "দীপ শিখার অনুপস্থিতিতে খদ্যোতের দীপ্তি দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে।"

যিনি সত্যসত্যই দীপশিখা অপেক্ষাও খরতর দীপ্তিময় ছিলেন, তিনিও পূর্ণ আলোকচ্ছটা বিকীরণ করতে পারেননি। ব্যর্থতা ব্যক্তির হয়েও ব্যক্তিগত নয়, এ ব্যর্থতা সামাজিক ব্যর্থতা।

পাদটীকা

১. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু। পৃ-৫১।

২. বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন ; চতুর্থ সংস্করণ, চুঁচুড়া। ১৩৪২ সাল। পৃ—২৬২।

৩. ঐ পৃ—২৬৩।

৪. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু। পৃ—৫১।

৫. The Bengali Drama—P. Guha Thakurtha M.A. (Harvad) Ph. D. (London). London. 1930. P—63.

৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—সুকুমার সেন। ২য় খণ্ড, পৃ—৩৫।

৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ১৯৬০। পৃ—১২১।

৮. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ৬৬—৬৭।

৯. সাহিত্যসাধকচরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম খণ্ড রামনারায়ণ তর্করত্ন। পৃঃ—৩১।

১০. বেণীসংহার—মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সম্পাদিত।

১১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ—তৃতীয় ভাগ।

১২. ঐ, চতুর্থ ভাগ।

১৩. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সংকলিত। পৃ—১১২।

১৪. বা-সা-ই—২য় খণ্ড-সু. সে। পৃ—৩৮।

১৫. The Bengali Drama—P. Guha Thakurta. P—50.

১৬. বা. না. ই.—অ. কু. ঘো। পৃ—৬৮।

১৭. রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক—সুশীলকুমার দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮।

১৭ক. বিবিধার্থ সংগ্রহ—৩৫ খণ্ড—রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮. নারায়ণ, ১৩২১—অগ্রহায়ণ, রামনারায়ণ তর্করত্ন—অশ্বিনীকুমাব সেন।

১৮ক. বা. সা. ই.—২য় খণ্ড—পৃ…৩৮।

১৯. ঐ। পৃ—৩৮।

২০. ঐ। পৃ—৩৮।

২১. The Bengali Drama—P. Guha Thakurta. P,—59.

২২ক. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১১২।

২২. ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। ১৩৫৮ সংস্করণ। পৃ—৭৬।

২৩. Hindu Patriot—26 march, 1866.

২৩ক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। পৃ—১৪৩।

২৪. পরিষৎ পত্রিকা পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধ—ডঃ সুশীলকুমার দে।
সাহিত্য-১৩২২, আশ্বিন—নাটুকে রামনারায়ণ - নলিনীকান্ত ভট্টশালী

২৬. Calcutta Review—1873—Modern Hindu Drama—Kissory chund Mittra.

২৭. নবনাটক অভিনয় উপলক্ষে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট মহর্ষির পত্র—আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক সংস্করণ; পৃ—৩৪।

১০ সৌখীন নাট্যমঞ্চ ও বিদ্রোহী নাট্যকার

ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটে—১৮৫৬ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলকাতায় এসে পৌঁছুলেন বন্ধুবান্ধবদের বিস্মিত করে।

১৮৪৩ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ; তখন থেকে ১৮৪৮ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত থাকলেন শিবপুর বিশপস্ কলেজ-ভবনে, ১৮৪৮ সালে তিনি মাদ্রাজ চলে যান।

কার্য্যতঃ তের বৎসর পরে, এক দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পরেই বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির মধ্যে তিনি এসে উপনীত হলেন।

মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁর প্রথম সাহিত্যরচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা' আত্মপ্রকাশ করল। বন্ধুরা বলছেন, আকস্মিকভাবে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন।

সাহিত্য তিনি রচনা করবেন, অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী তিনি হবেন, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এমন কি, কৈশোর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তিনি একজন মহাকবি হবেন, এবং তাঁর একজন জীবনীলেখকও দরকার। এর জন্য তিনি গৌরদাস বসাককে তৈরী হতে বলছিলেন।

তারপর মাদ্রাজে বসবাসকালে তাঁর 'ক্যাপটিভ লেডি' আত্মপ্রকাশ করল। বন্ধুদের মারফৎ কাব্যখানি বেথুনসাহেবের হাতে পৌঁছায়। এ কাব্য পড়ে তিনি যা বললেন, তারই সারাংশ সংকলিত হয়ে আছে 'বঙ্গভাষা' নামক এক সুখ্যাত সনেটে। তিনি স্বগৃহে ফিরে যেতে বললেন, এবং মাইকেল ফিরলেন।

পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

শর্ম্মিষ্ঠার রচনাকাল হোল সেই মাতৃভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য প্রণিধানের কাল।

রামনারায়ণের নাটকের ইংরেজী সংস্করণ প্রস্তুত করছিলেন ; বাংলা নাটকের পরানুকরণের দৈন্য তাঁকে পীড়িত করেছিল। দুঃখভরে বলেছিলেন, এইরকম অক্ষম রচনার জন্য রাজারা এত অর্থ ব্যয় করেন! বলেছেন, এবার আমি নিজেই কলম ধরব। বন্ধুশ্রেষ্ঠ গৌরদাস বসাক স্মৃতিকথায় লিখছেন,

আমি মধুর কথায় হাসলাম। মধু সে হাসির জবাবে শুধু হাসেন নি; তিনি বললেন. আচ্ছা, তোমরা দেখবে।

ফলে 'শর্মিষ্ঠা' রচিত হোল।

মঞ্চের প্রয়োজনেই মধু নাটক লিখেছিলেন; কারণ তিনি জানতেন মঞ্চ আর নাটক অবিচ্ছেদ্য; মঞ্চ ব্যতীত নাটক হোল জল বিনা মাছের মত, বিগতজীবন।

"There is no use of writing a play and then leaving it to rot in the desk."

বেলগাছিয়া মঞ্চে ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয়; এই মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতারা 'সৎ' নাটকের জন্য উৎকণ্ঠাবোধ করেছিলেন। তাঁরা যে ধরণের বৈভবপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, নাটকে চাইতেন তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁদের মঞ্চে দর্শকেরা ছিলেন সবাই নিমন্ত্রিত। অর্থাৎ নাট্যকারকে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিচিত্র রুচির দর্শকদের মনোরঞ্জনে কলম ধরতে হোত না।

মাইকেলের প্রথম নাটক বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের পোষ্টাদের রুচির অনুরূপ হয়েছিল।

The chota Raja writes in raptures about it and swears "the drama is a complete success."

* * * *

Jatindra says "it is the best drama in the language, chaste, classical, and full of genuine poetry."

এই সব প্রশংসার সবটুকু যে গ্রহণযোগ্য নয়, তা নাট্যকার জানতেন। নাট্যকার যতটুকু জানতেন, আমরা আজ তার থেকে বেশি জানি।

"Several persons totally ignorant of English have spoken of it in terms so high that, at times, I feel disposed to question their sincerity"

তা সত্ত্বেও গভীর আত্মপ্রত্যয় তিনি অর্জন করলেন এই নাটকের মঞ্চ-সাফল্যে।

"The Shermistha has very nearly put me at the head of all Bengali writers. People talk of its poetry with raptures."

শর্মিষ্ঠার মৌলিকতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সৃজনশীল অধ্যায় তখনও সূচিত হয়নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' তখনও মুদ্রাযন্ত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আখ্যায়িকাসমৃদ্ধ রচনা কোনটাই মৌলিক সৃষ্টি নয়; বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' আরও আট বৎসর পরে আত্মপ্রকাশ করবে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অলাল' ও কালীপ্রসন্নের 'হুতোম' পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ হলেও এই দুটি গ্রন্থকে 'সিরিয়াস' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' প্রথম মৌলিক 'সিরিয়াস' রচনা, আধুনিক দৃষ্টিতে।

প্রতিভাবান নাট্যকার মঞ্চবিশেষের কারিগরী ও সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা উত্তীর্ণ হয়ে যান; এবং তাকে সংশোধন করে থাকেন। নাটক শুধু ভাষা-নির্ভর নয়; দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত সবই নাটকের প্রকাশে সহায়তা করে। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গতিটুকু খেয়াল রেখেই মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করেছিলেন।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, রত্নাবলীর অভিনয় ও মহলার সময় তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি তাঁর নাট্যবোধ জাগ্রত করে।[১] ঐতিহাসিক মহাশয়ের এই উক্তির মধ্যে সত্য আছে; তবে এই বক্তব্যের সঙ্গে আরও কয়েকটি তথ্য জুড়ে দিতে হবে। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখন সেখানে নাট্যপ্রীতির জোয়ার চলেছে; সেই জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন স্বয়ং রিচার্ডসন। মধুসূদন হিন্দু কলেজের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। এ ত গেল মঞ্চকৌতূহল। নাটক রচনার ক্ষেত্রেও তিনি আগন্তুক নন। মাদ্রাজ বসবাসকালে 'Eurasian' পত্রিকায় তাঁর নাটক 'Rizia' প্রকাশিত হয়েছে।[২]

'রত্নাবলী'র সাফল্যে ঈর্ষাবোধ করে তিনি নাটক রচনায় হাত দেননি, তাঁর বুকের মধ্যেই নাটক সংক্রান্ত অনেক বাসনা নিদ্রিত বা অস্ফুট ছিল। অনুকূল পরিবেশ সেই কুঁড়িগুলি ফুটিয়ে তুলেছিল।

শর্মিষ্ঠা নাটকে সূচনায় তিনি লিখছেন—

অলীক কুনাট্য রঙ্গে
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

একি শুধু রামনারায়ণের বিরুদ্ধে কবির ভৎর্সনার শরনিক্ষেপ? আদৌ নয়, এ হোল প্রচলিত নাট্যবিধির বিরুদ্ধে মধুর সমালোচনা। কারণ এ ত তাঁরই উক্তি

"I am a born literary rebel." শর্মিষ্ঠা রচনার সময়ই তিনি জানতেন যে বেলগাছিয়ায় অভিনীত 'নাটক' নাটক নয়।

"What a pity, the Raja should have spent such a lot of money on such a miserable play." রামযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, বিদ্যাসুন্দরযাত্রাকে রামনারায়ণও ধিক্কার দিয়েছেন। মধুর ধিক্কার আর এক ধাপ অগ্রসর হোল। বাংলা মঞ্চে তিনি বাংলা নাটকই চেয়েছেন, সংস্কৃত নাটকের রোমন্থন নয়। শুধু বাংলা নাটক নয়, তাঁর লক্ষ্য হোল আধুনিক বাংলা নাটক। "আমি আমার স্বদেশবাসীর সেই অংশের জন্য লিখছি, যাঁরা আমার মত ভাবেন।"

শর্মিষ্ঠা নাটকের সঙ্গে রত্নাবলীর সাদৃশ্য সম্বন্ধে বহু সমালোচক একমত। নানা ঘটনার সাদৃশ্য বর্ণনার পর জনৈক সমালোচক লিখেছেন, "Not only in these various details of the plot itself but in the general tone and atmosphere of the play, Madhusudan scrupulously imitates the fashion set by Ramnarayan in his Ratnavali. So in reality Madhu obeys rules which he never wanted to obey, and follows conventions which he affected to despise Ratnavali made a deep impression on his mind."[৩]

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "বাংলা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই মধুসূদনের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে'র প্রতি।"[৪] ডক্টর সেনের মতে কাহিনীর সূত্র মধুসূদন পেয়েছেন শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্বচন থেকে। ঘটনা সংস্থানেও কালিদাসের প্রভাব অলক্ষ্য নয়, এমন কি শর্মিষ্ঠার কুশীলব ঐ নাটকের আদর্শে কল্পিত, এবং শকুন্তলার কোন কোন ছত্রের অনুবাদ বা প্রতিধ্বনিও শর্মিষ্ঠার বহুস্থানে আছে।

আসলে সৌখীন নাট্যমঞ্চে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হোত—মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলা রত্নাবলী প্রভৃতি, তার সব গুলির ঘটনাসংস্থান, নায়ক-নায়িকা-কল্পনা ও রচনাভঙ্গী এক জাতীয় ছিল। যাকে শিল্পসংস্কার বা 'motif' বলে তা ছিল সর্বত্র সমান।

মধুসূদন কোন নাটক বিশেষের অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি, তিনি নাট্য-সংস্কারকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। শর্মিষ্ঠা রচনার সময় তিনি সংস্কার মেনে চলেছেন। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, 'শর্মিষ্ঠার উপর রত্নাবলীর প্রভাব বাহির করিয়া মাইকেলের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করা অনর্থক ও

অনাবশ্যক। কারণ মধুসূদন আর কোনো মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করেন নাই ; মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তন বলিয়াই শর্মিষ্ঠার সহিত রত্নাবলীর সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।[৫]"

যে ভদ্রলোক রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করবেন, এবং বিবিধ পৌরাণিক সূত্র ব্যবহার করে 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করবেন, তিনি মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করতে গিয়ে 'রত্নাবলীর' সাদৃশ্য পরিহার করতে পারেন নি, একথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

নাটক আর নাটকের কাহিনী এক নয়। একই ঘটনা নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হতে পারে, এবং একাধিকভাবে হতে পারে। সেক্সপীয়ারে তার উদাহরণ আছে, রবীন্দ্রনাথে তার উদাহরণ আছে, এবং মাইকেলেও সে দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কোন ঘটনা বিশেষ এবং সেই ঘটনা-অনুসারী সাহিত্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী থাকে না।

এ বিষয়ে ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের অভিমত বিবেচনার যোগ্য। "মঞ্চ নাট্যকারের অধীন না হইয়া নাট্যকারকেই যদি মঞ্চের অধীন হইতে হয়, তাহা হইলে নাট্যরচনার যে সকল দোষ প্রকাশ পায়, মধুসূদনের নাটকগুলির বহিরঙ্গে সেই সকল ত্রুটিই প্রকাশ পাইয়াছে।[৬]

মধুসূদনের অন্যান্য নাটক সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। তবে শর্মিষ্ঠা নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্মকর্তাদের মুখ চেয়ে রচিত হয়েছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"রত্নাবলী নাটক ইহার অভিনয়-সাফল্যের গুণে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, মধুসূদনের পক্ষে সেই আদর্শের পরিবর্তন করা অসাধ্য ছিল। অতএব তাঁহাকে প্রথম অবস্থায় 'রত্নাবলী' নাটকের বাংলা অনুবাদের প্রায় সমুদয় বহিরঙ্গকে স্বীকার করিয়া লইয়াই নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।"[৭]

রত্নাবলী নাটকের বহিরঙ্গ শর্মিষ্ঠা নাটকে কেবল প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়নি, প্রভাব বিস্তার করেছে যে নাট্যশালায় রত্নাবলী মঞ্চস্থ হয়েছিল, সেই মঞ্চের কর্মকর্তাদের নাট্য-সংস্কার। ডক্টর ভট্টাচার্য শর্মিষ্ঠানাটক ও বেলগাছিয়া নাট্যশালার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটি প্রায় নির্ণয় করে ফেলেছিলেন ; শেষ মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। নাটক ফলিত কলা ; তার মঞ্চ, মঞ্চনিয়ামক ও দর্শক—সকলের চরিত্র স্পষ্টভাবে উপলব্ধি না করলে নাটকের স্বরূপ-বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি অনিবার্য।

শর্মিষ্ঠা ঃ মহাভারত ঃ আধুনিকতা

শর্মিষ্ঠা নাটকের আখ্যান-অংশ মধুসূদন মহাভারতের আদিপর্ব থেকে সংগ্রহ করেছেন। মহাভারতের গল্পে যে বর্বর আদিমতা ছিল, উনিশ শতকের নাট্যকার তা সংশোধন করে নিয়েছেন।

প্রথমত মহাভারতে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা যযাতির পশ্চাদ্ধাবন করেছে। ভারতীয় সমাজে অতীতে কি সম্ভবপর ছিল, মাইকেল তার জন্য কালক্ষেপ করেন নি। মধুসূদনের যুগে নারীকে উপযাচিকা হতে দেখা যেত না ; তাই রাজাই প্রণয়প্রার্থী হয়েছেন। দেবযানীর ক্ষেত্রে প্রণয়মুগ্ধতা রাজার দিকে থেকে এসেছে, শর্মিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। দ্বিতীয়ত শর্মিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহাভারতে শুধু প্রণয়-বাসনা ব্যক্ত হয় নি। ব্যক্ত হয়েছে বিবাহিতা সখীর সন্তান প্রসবে ঈর্ষ্যাতুরা রমণীর (অবিবাহিতা) সন্তানবাসনা। রাজাকে নির্জনে দর্শন লাভ করে শর্মিষ্ঠা নিছক আত্মনিবেদন করেন নি, তিনি তাঁর ঋতু রক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। মাইকেল দুইটি ক্ষেত্রেই উনিশ শতকীয় নীতিজ্ঞান ও বাস্তবতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে ঘটনাগুলির রাশ টেনে ধরেছেন, পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। মধুসূদন পৌরাণিক কাহিনী নিয়েছেন, কিন্তু পৌরাণিক নীতিবোধ গ্রহণ করেন নি।

যযাতির জীবনে দুই নারীর সাহচর্য তাঁর যুগের স্বাভাবিক জীবন-চর্চার পরিচায়ক। আত্মসুখপরায়ণ রাজা আপন স্বাস্থ্য ও ভোগ বাসনার জন্য আপন পুত্রের আয়ু হরণেও পিছপা হন নি। সে-যুগের কলকাতার ধনিক শ্রেণীর প্রবল ভোগ-বাসনার সঙ্গে এই কাহিনীর ঐক্য আছে। অতীতের কাহিনী বর্তমানের আবেদন হরণ করেছে।

নায়ক-নায়িকা-কল্পনায় যুগের ঔচিত্যবোধই প্রধান হয়ে উঠেছে। রাজা একপত্নীক অবস্থায় বেশিক্ষণ টিকতে পারলেন না ; শুক্রাচার্য তাঁকে দিয়ে যে ভয়াবহ প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন—"নেয়মাহ্বয়িতব্যা তে শয়নে বার্ষপর্বণী।" শর্মিষ্ঠা অনায়াসে একবার মাত্র তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েই সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হোল। শর্মিষ্ঠার যুক্তিগুলি ধারালো হতে পারে, কিন্তু তার থেকে ধারালো ছিল তার রূপযৌবন। এবং তার থেকে ধারালো ছিল রাজার নারীমাংস ক্ষুধা।

শুধু বহুপত্নীকতা নয়, নানাভাবেই রাজা তাঁর প্রগাঢ় ভোগবাসনার পরিচয় দিয়েছেন। "সংস্কৃত শৃঙ্গার রসাত্মক নাটকের নায়কের মতই তিনি আচরণ

করেছেন," একথা বললে প্রকৃত সত্যটুকু বলা হয় না। পুত্রের স্কন্ধে আপন জরাভার ত্যাগ করতেও তাঁর যে দ্বিধা নেই, সে কেবল ভোগবাসনার জন্য।

রত্নাবলী নাটকের সাগরিকা চরিত্রের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার সাদৃশ্য আছে, এ খবর তত জরুরী নয়। মাইকেলের শর্মিষ্ঠা বহুপত্নীবিশিষ্ট সমাজের এক নারী,—আপন স্থৈর্যে গাম্ভীর্যে তিনি এখানে মাননীয়া হয়ে উঠেছেন। কৈশোরে এক সাধারণ অপরাধের জন্য তাঁকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, তা কিন্তু সামান্য নয়। রাজার কাছে তিনি উপযাচিকা হন নি। কিন্তু রাজার প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও পারেন নি। পৌরাণিক জগতের নীতিবোধ তাঁকে যযাতিকে পতিরূপে বরণ করতে প্ররোচিত করেছে। অথচ তার জন্য তাঁকে বিস্তর দুঃখ পেতে হোল।

অন্যদিকে দেবযানী অপরকে দুঃখ দিতে বদ্ধপরিকর; দেবযানী শক্তিময়ী প্রখরা রমণী; আর শর্মিষ্ঠা তার বিপরীত। মধুসূদনের অন্যান্য সাহিত্যে এই দুই নারী-চরিত্র নানাবেশে এবং নানা তারতম্যে বারবার দেখা দেবে, কিন্তু কোথাও তারা সন্ধি স্থাপন করে একত্রে সংসার বাঁধে নি।

মাইকেল নিজের জীবনেও এই প্রকার দুই বিপরীতধর্মী নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। জীবনে যা পারেন নি, একটি নাটকে তাই করলেন। শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী একত্রে সম্মিলিত হোল। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন যে শর্মিষ্ঠা অপেক্ষা দেবযানীর মধ্যে নায়িকা হবার যোগ্যতা অধিক ছিল। তাঁরা মাইকেলের রচনার তাৎপর্যই উপলব্ধি করতে পারেননি। শর্মিষ্ঠা মাইকেলের বিচ্ছিন্ন রচনা নয়, মাইকেল-সাহিত্যধারার অপরিহার্য অংশ। মাইকেল আকস্মিকভাবে এই দুই চরিত্র গ্রহণ করেন নি; তাঁর সমগ্র সাহিত্যে এই দুই নারী বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে। এই দুইটি চরিত্র নির্বাচন-মুহূর্তে হয়ত তিনি এই সম্ভাব্যতার কথা সচেতনভাবে ভাবেন নি; কিন্তু নাট্যকারের অন্তরের ইসারা এখানে ছিল। পরবর্তীকালের বহু বিশিষ্ট রচনার শিক্ষানবিশী এখানে শুরু হয়েছে।

বহুবিবাহবিরোধী মাইকেল একবারই মাত্র এই দুই নারীকে এক সূত্রে বেঁধেছেন। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে যা বারবার দেখা দিয়েছে নগেন্দ্রে, সীতারামে ব্রজেশ্বরে, রাজসিংহে; মাইকেলের সাহিত্যে (বেলগাছিয়া মঞ্চের প্রভাবে) তা মাত্র একবারই দেখা দিয়েছে। দেবযানী মহাভারতের উৎস থেকে সরে গেছে এবং নাটকের প্রয়োজনে শুধু নয়, মাইকেলের নতুন জাতের বক্তব্যের খাতিরে।

মহাভারতে ঘটনা ছিল ভিন্নরূপ ; দেবযানী যখন জানতে পারল সমগ্র ঘটনা, তখন রাজার কাছে তার অভিযোগ হোল এই যে, সে পাটরাণী হয়েও মাত্র দুই পুত্র লাভ করেছে। আর শর্মিষ্ঠা দাসী হয়েও তিন পুত্র লাভ করেছে।

মধুসূদন দেবযানীর অভিযোগের এই নিরাভরণ আদিমতা বর্জন করেছেন ; এখানে দেবযানীর অভিমান : কেন রাজা যযাতি শর্মিষ্ঠাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেছেন। পিতা শুক্রাচার্য যখন বুঝালেন :

—আঃ ! এরই নিমিত্তে এত ? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই ? বৎসে, গান্ধর্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না ?

এর উত্তরে দেবযানী যা বলেছেন, তা কোন পৌরাণিক নারী বলেননি।

—তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রনা ভোগ করবে ?

মাইকেল দেবযানীকে আধুনিক নারীত্বের ভূষণে ভূষিত করেছেন। শুক্রাচার্য আর দেবযানীব যুক্তি বৃথা বিপরীতমুখী হয়নি। দুজন দুই মত-বাদের, এবং যেন দুই যুগের প্রতিনিধি।

শর্মিষ্ঠায় বিদূষক

মাইকেল শর্মিষ্ঠা নাটকে বিদূষক সৃষ্টি করেছেন। "শর্মিষ্ঠার বিদূষক শকুন্তলার মাধব্যের অনুরূপ। শুধু শকুন্তলার মাধব্য কেন, স্বপ্নবাসবদত্তার বসন্তক, মালবিকাগ্নিমিত্রের গৌতম, মৃচ্ছকটিকের মৈত্রেয় প্রভৃতিকেই বা গণনা করা হবে না কেন? মাইকেল ঔদরিক বিদূষক সৃষ্টি কবে প্রথাসিদ্ধ হাস্যরসের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মাইকেল কি ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন? না, ঐখানেই থেমে থেকেছেন?

রত্নাবলী নাটকে যিনি বিদূষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এ-নাটকেও তিনি সেজেছিলেন বিদূষক। এ খবর শুধু নাট্যপ্রযোজকেরা জানতেন, তা নয় ; মাইকেলেরও জানা ছিল। ঐ ধরণের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে সেই অভিজ্ঞ অভিনেতা এমন কতকগুলি হাবভাব ও বাচনভঙ্গি তৈরি করেছিলেন, যা দর্শকদের প্রচুর আমোদ দিত। এর ফলে নাটকের যাই হোক, অভিনয়ে বিদূষক-ভূমিকা একটু বেশি প্রাধান্য পেত।

বেলগাছিয়া মঞ্চে বিদূষকের ভূমিকায় একাধিক নাটকে অভিনয় করে কেশব গাঙ্গুলী বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটকে তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, "This time, as on past occasions, the jester was the soul of the corps." "Jester বা বিদূষকের এই অতি-আধিপত্যের

ফলে নাটকের অর্থই তাঁদের কাছে ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। উক্ত সমালোচক শর্মিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছেন, "a serio-comic drama by Mr. Michael M. S Dutt." ৮.

হাস্যরসের ওপর ঝোঁক বিশেষভাবে পড়ায় নাটকের প্রকৃতি ভিন্ন অর্থে গৃহীত হতে লাগল।

সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করে বিদূষক শর্মিষ্ঠায় এক ভাবে দেখা দেন, আর পদ্মাবতীতে অন্যভাবে দেখা দেন। প্রথমে প্রথার আঁচল ধরে তিনি হাটতে শুরু করেছিলেন; কিন্তু সত্বরই তাঁর চলনে সাবালকত্ব এল। তাই বিদূষকের বিদূষণবৃত্তির পাশাপাশি সমালোচনবৃত্তি দেখা দিতে লাগল।

বিদূষক। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই চিনেছে, রসিকতা দেখে না। (২/২)

*　　*　　*

—কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তাহলেই ত আমি গেলেম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না। আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, আমার কি তা চলে? ও সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়। (৩/৩)

*　　*　　*

বিদূষক। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণ ভোজনটা আবশ্যক।

দ্বিতীয়। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গোব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্তব্য।

বিদূষক। বটে? তবে ভালোই হলো। অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গোব্রাহ্মণ দুইয়েরি সেবা করা হবে। (৪/১)

মধুসূদনের এই মন্তব্যগুলির মধ্যে নিছক রসিকতা নয়, মর্মান্তিক সত্যও লুকিয়ে আছে। সামন্ততন্ত্রের সমালোচনা একটি। এইভাবে মধুসূদন বিদূষককে দিয়ে সংস্কৃত-অনুসারিতা হ্রাস করে আনছিলেন।

এ-নাটকে সংস্কৃত-নাট্যরীতি অনুযায়ী চেটি, দৌবারিক, নর্তকী, সখি, মন্ত্রী—সবই আছে। কিছু পরিমাণে নাট্যীয় প্রয়োজনে, কিছু পরিমাণে পৌরাণিক পরিবেশ রচনার জন্য।

শর্মিষ্ঠার আখ্যান-অংশ ও নাট্যীয় সার্থকতা

আখ্যান-অংশে ও চরিত্রচিত্রণে মাইকেল পুরাতন আধারের পরিবর্তন সাধনে চেষ্টা করলেন।

নাটকের কাঠামো রচনায় মাইকেল পুরানা সূত্রকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও অবহেলা করেন নি। যেমন সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসারে তিনি বিষ্কম্ভক-প্রবেশক ব্যবহার করেছেন। ১ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে তিনি একটি বিষ্কম্ভক ব্যবহার করেছেন। এই গর্ভাংকটির নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই।

প্রবেশক অনেকবার ব্যবহৃত হয়েছে - ১ম অঙ্কে ২য় গর্ভাঙ্ক দেবিকার উক্তি থেকে রাজার বিবাহের পূর্ব-আভাস পাওয়া গেল। দ্বিতীয় অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে দুইজন নাগরিকের যে কথোপকথন দেওয়া হয়েছে, সেটিকেও একটি প্রবেশক রূপে গ্রাহ্য করা যায়। তেমনি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেও একটি প্রবেশক আছে।

অনুসন্ধান করলে আরও দুই একটি উদাহরণ যে সংগ্রহ করা যাবে না, তা নয়। সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণের ফলে মঞ্চে কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি, বা ঘটাবার সুযোগ নেওয়া হয়নি।

এ-নাটক যতটা বর্ণনামূলক, ততটা সংঘাতমূলক নয়। বিশেষ বিশেষ ঘটনার ওপর ঝোঁক না পড়ায় নাট্যীয় সুযোগ স্খলিত হয়ে গেছে বলে কোন কোন সমালোচক আপ্‌শোষ করেছেন। বস্তুত ঘটনাবিশেষের ওপর নাট্যীয় সুযোগ নির্ভরশীল নয়। লেখক কিভাবে ঘটনাকে ব্যবহার করবেন, তার ওপর নাট্যীয় সুযোগ দাঁড়িয়ে থাকে। মাইকেল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে নাটক ও আখ্যানকাব্যের মধ্যে তেমন কোন ভেদরেখা ছিল না। অনেক আখ্যান-কাব্যও নাটক নামে অভিহিত ছিল। তারই জের দেখা গেল মাইকেলের পরবর্তী যুগে। মাইকেলের নাটকেও এ ধরনের অনিশ্চয়তা বর্তমান ছিল। প্রথম অঙ্কের দুইটি গর্ভাঙ্ক কেবলই বর্ণিত ঘটনায় পরিপূর্ণ। নাটক যদি দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে শুরু হোত, তাহলেও কোনরূপ বিশৃঙ্খলার সাক্ষাত পেতাম না।

মাইকেল বিবরণ-ধর্মিতা ছাড়তে পারেন নি। ঘটনা পরিবেশনে নানা কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে তৃতীয় গর্ভাঙ্কে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিবৃত হয়েছে— রাজা যযাতি চলেছেন বিবাহ করতে। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নগর-বর্ণনা। নাটকে এই নগর-বর্ণনার কি প্রয়োজন ?

তৃতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেও গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ স্থান পেল। এখানে শুরুতে রাজা ও রাণী পূর্বপ্রসঙ্গ আলোচনা করছেন। নাটকের তাল পূর্বাপর মৃদু; অথচ এই দৃশ্যেই শর্মিষ্ঠাপ্রসঙ্গ প্রকাশ পাবে, এবং রাজা ধনুর্বাণ হস্তে দুরাচার দস্যুদের শায়েস্তা করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করবেন। তবু নাট্যকার ঘটনার গতি একইভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নাটকে যেন ঘটনার কোলাহল সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী ও শুক্রাচার্যের সাক্ষাতকার বর্ণিত হয়েছে; তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রাজার দেহে জরার আক্রমণ ও দেবযানীর মনে অপরাধবোধ বর্ণিত হোল। এই সব ঘটনা একই স্বরগ্রামে বর্ণিত হয়েছে। সংলাপের মধ্যেও স্থানেস্থানে 'হাহুতাশ' ও রঙ্গরস ছাড়া অন্য কোন রকম উত্থান-পতন আনা হয়নি। তুলনায় 'কীর্তিবিলাসের' সংলাপ অধিকতর নাটকীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটকের পাঁচটি অঙ্ক যেন উপন্যাসের পাঁচটি পরিচ্ছেদ।

সম্ভবত মাইকেল প্রচলিত নাট্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে চেয়েছিলেন। তাই শর্মিষ্ঠায় নাট্যরস বর্ণিত হোল, উদ্গীত হোল না। রাজা যযাতি বা শর্মিষ্ঠার জীবনে সবই ঘটল ঘটেছিল বলে, ঘটছে বলে নয়। অর্থাৎ সব ঘটনা অতীতের হয়েছে, বর্তমানের হয়নি, পুরাণের হয়েছে। তাই যযাতি পুঁথির নায়ক, পৃথিবীর নায়ক নন।

নাটকের গ্রন্থনায়ও একই প্রকার শিথিলতা দেখা যায়। ঘটনাসমূহ আদৌ কালগত সংহতি পায়নি। রাজা যযাতির সঙ্গে দেবযানীর বিবাহের দেড় বৎসর পরে তৃতীয় অঙ্ক শুরু হয়েছে, যে তৃতীয়াঙ্কে রাজার সঙ্গে শর্মিষ্ঠার গান্ধর্ব বিবাহ হোল। আবার বিবাহের দীর্ঘকাল পরে চতুর্থ অঙ্কের সূচনা। তৃতীয় অঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্কের ব্যবধানের মধ্যে শর্মিষ্ঠার তিনটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে শুক্রাচার্য দেবযানী সম্বন্ধে বলেছেন—'যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, যে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা পাইয়াছে।' কাজেই দেবযানীর বিবাহের পর আঠার বৎসর কেটে গেছে। রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হলে তাঁর সর্বকনিষ্ঠপুত্র পুরু স্বেচ্ছায় সেই জরা গ্রহণ করেন। মোটামুটি বিশ বৎসর ধরে ঘটনা বিস্তৃত। প্রথম দৃশ্যের রাজা আর জরার আক্রমণ-মুহূর্তের রাজা একই বেশে দেখা দেবে না। আর এই বিশ বৎসরে দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা সাধারণ নায়িকা থেকে জননী পদে অধিষ্ঠিতা। কালগত এই অসংহতির মত

দেখা যাচ্ছে স্থানগত অনৈক্য নেই। প্রথম দুইটি দৃশ্য ব্যতীত আর সমস্ত দৃশ্যই রাজপুরীতে সংঘটিত হয়েছে। চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেবযানী গৃহত্যাগ করলে নাটকের ঘটনাস্থল রাজপুরীর সান্নিধ্য ত্যাগ করেছে সাময়িকভাবে। ঘটনা আবার রাজপুরীতে ফিরে এসেছে। পঞ্চম অঙ্ক সম্পূর্ণভাবেই রাজপুরীর ঘটনা। এইভাবে স্থানগত ও কালগত বোধ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

তিনি বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করেছেন। এই নাটকে চরিত্রের সংখ্যা প্রচুর; কিন্তু কোন দৃশ্যেই দুইএর অধিক ব্যক্তি একত্রে কথাবার্তা বলে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চে কেবল দুটি চরিত্র অবস্থান করেছে; তারা প্রস্থান করলে তবে অন্যান্য চরিত্র প্রবেশাধিকার পেয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—যে দৃশ্যে রাজা যযাতি ঋষি শুক্রাচার্যের অভিশাপে জরার দ্বারা আক্রান্ত হলেন, সে দৃশ্যেও কথাবার্তা যা চলছে, তা দুজনের মধ্যে। চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে প্রথমে শর্মিষ্ঠা ও দেবিকার কথোপকথন দেখতে পাই, কিন্তু রাজা আসবেন বলে নৈপথ্য থেকে দেবিকাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হোল। তারপর মঞ্চে একা শর্মিষ্ঠা উপস্থিত, তখন রাজা প্রবেশ করলেন। রাজা প্রথমে একান্তে কথা বললেন, পরে তাঁর কথাবার্তা হোল শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। এঁদের দুয়ের কথাবার্তার দেবিকা পুনঃপ্রবেশ করল, কিন্তু কথা বলল কেবল শর্মিষ্ঠার সঙ্গে। তখন রাজা জরার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। রাজাকে বহন করে নিয়ে যাবার জন্য দ্বিতীয় লোকের প্রয়োজন হয়েছিল বলে তাকে মঞ্চে আনা হয়। তারা প্রস্থান করলে প্রথমে বিদূষক, পরে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করবে। ঐ পরিচারিকা প্রস্থান করলে মন্ত্রী প্রবেশ করবেন। মন্ত্রী ও বিদূষক মঞ্চত্যাগ করলে সেই শূন্যস্থানে রাজ্ঞী দেবযানী ও পূর্ণিকা প্রবেশ করবে।

এই দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এখানে দুইয়ের অধিক চরিত্র আমদানী করা হলেও মঞ্চ দখল করে থাকছে সর্বদাই দুইটি চরিত্র। ঘটনার গুরুত্ব নাটকের পাত্র পাত্রী ব্যবহারে নতুন পথ খোলেনি।

যাত্রার নাটকে এই রীতি প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম যুগের বাংলা নাটকে একই প্রকার রীতির অনুসরণ দেখা যায়।

নাট্যীয় সংলাপ ঃ স্বগত উক্তি

অধিকাংশ সংলাপ আত্মকথনমূলক বা বর্ণনামূলক। স্বগতোক্তির কোনটি শুধু পূর্ব-ঘটনা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত, কোনটি বা পাত্র-পাত্রী হৃদয়ভার লাঘব করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে জনৈক দৈত্যসৈন্যের বক্তৃতায় ঘটনার শুধু বর্ণনা আছে; আর আছে দৈত্যপুরীর বর্ণনা। ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে সখী দেবিকার স্বগতোক্তিতে রাজকন্যা শর্মিষ্ঠার দুরদৃষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে। ৩।১ গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীর স্বগতোক্তি; ২।১ কপিলের স্বগতোক্তি, ৩।১ ৩।৩ ৪।৩ ৫।১ বিদূষকের স্বগতোক্তি, ২।৩-৪।৩ রাজার স্বগতোক্তি, ৩।৩ ৪।৩ শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তি, ৪।২ শুক্রাচার্যের স্বগতোক্তি, ২য় অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কপিলের স্বগতোক্তি, ১।২ গর্ভাঙ্কে ও ৩য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে মন্ত্রীর স্বগতোক্তি বা ৪র্থ অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শুক্রাচার্যের স্বগতোক্তি কেবল ঘটনা বর্ণনার জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু বিদূষকের স্বগতোক্তি কেবল ঘটনা বর্ণনার জন্য নয়—২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক ও ২য় গর্ভাঙ্কের স্বগতোক্তি ঘটনার সূত্র ধরে আছে। কিন্তু ৩।১, ৩।৩, ৩।৪, ৫।১ তার স্বগতোক্তি থেকে তার চরিত্র সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। মন্ত্রী-দৈত্য-সখীদের স্বগতোক্তি আর রাজা যযাতি ও শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তির মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই। প্রথমটি নিছক সংবাদবাহী, দ্বিতীয়টি স্বগতোক্তির প্রকৃত ভূমিকা পালন করেছে। এগুলি রাজা ও শর্মিষ্ঠার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তরসংকট তুলে ধরেছে। বিদূষকের স্বগতোক্তি এই দুই বিপরীতধর্মী স্বগতোক্তির মধ্যবর্তী রূপ। এই স্বগতোক্তিতে নিছক সংবাদ সরবরাহও আছে, আবার আত্ম-বিশ্লেষণও আছে। যেমন ২য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে বিদূষকের ভাষণ—

বিদূষক। (স্বগত) হরিবোল হরি। সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষি কন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্ছি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে; কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর কি ঔষধ আছে?

এ স্বগতোক্তি শুধু ঘটনার খেই ধরিয়ে দেবার কাজে ব্যস্ত।

কিন্তু ৩য় অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে যে স্বগতোক্তিটি বিদূষকের মুখ থেকে বেরিয়েছে, তার ভূমিকাটি পৃথক।

—প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানাদেশ পর্যটন আর নানা তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মতন পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্মল সলিলে স্নান করিলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়!

এ উক্তি থেকে উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিদূষকের স্বরূপটি আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

রাজা যযাতি ও শর্মিষ্ঠার স্বগতোক্তিতে হৃদয়সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। তবে শুরু থেকেই নয়। হৃদয়ে সংঘাত সৃষ্টি হলে স্বগতোক্তিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ৩।৩ গর্ভাঙ্কে রাজা উদ্যানে প্রবেশ করে নিসর্গ-সৌন্দর্যই কেবল বর্ণনা করছেন। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাত হবার পর তাঁর স্বগতোক্তির প্রকৃতি বদলে গেল। প্রথমে বিস্ময়, পরে মনস্তাপের বর্ণনা স্বগতোক্তিতে স্থান পেয়েছে। রাজার কোন কোন স্বগতভাষণে দুই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাত মিলবে—যেমন ৪।৩ গর্ভাঙ্কে রাজার স্বগতোক্তি শুরু হয়েছে নিসর্গ-বন্দনা দিয়ে ; শেষ হয়েছে হৃদয় বেদনার উন্মীলনে। তবে এগুলির নাটকীয় যোগ্যতা যে কোথায়, তা অনুমান করা কষ্টকর।

—আহা ! নিশাকরের নির্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবরসলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজীব ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী।

ঐ বিরাট নিসর্গবর্ণনা হৃদয়বেদনা ন্যস্ত করার পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই বর্ণনার শেষে রাজা বলছেন আসল কথাটি—

—কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাবো ? আহা ! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

শর্মিষ্ঠার স্বগত-উক্তি শুধু হৃদয়ভার লাঘব করার মাধ্যম। ৩।৩ গর্ভাঙ্কে প্রথম স্বগত-উক্তি থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় :

শর্মিষ্ঠা (স্বগত) হা হৃদয় ! তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরও আবদ্ধ হও।

দ্বিতীয় ভাষণে একইপ্রকার আত্মনিষ্ঠতা দেখা যায়—এ দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে ? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ? তা তোমারই বা দোষ কি ? (রোদন) আমি আপন কর্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। গুরুকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে

দাসী হলেম ; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিলনা ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা ! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন লাভ হবে ?

মূর্তিমান্ কন্দর্পরূপী রাজা যযাতিকে দেখার পর থেকেই ভদ্রমহিলা প্রেমে পড়েছেন এবং প্রেমে পড়ার পর থেকেই স্বগতউক্তি করে চলেছেন। তার পূর্বে কোন স্বগতউক্তি নেই। শর্মিষ্ঠা যে আপন হৃদয়-কারাগারে বন্দিনী, স্বগত-উক্তি ব্যবহার থেকে তা ধরা পড়ে।

পূর্বেই বলেছি, স্বগত-উক্তির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে নিসর্গবর্ণনা আছে। এ এক প্রকার আলেখ্য-দর্শন। আখ্যানকাব্য আর নাটকের মধ্যে তখনও পার্থক্যবোধ জাগে নি। সে যুগে শকুন্তলা (১৮৫৪) কাদম্বরী (১৮৫৫) গ্রন্থদ্বয়ে যে ধরণের বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক তা পছন্দ করতেন। নাটক দেখতে বসেও তাঁরা সম্ভবত ঐ জাতীয় বর্ণনা প্রত্যাশা করতেন। আর এই অনুসরণের মধ্য দিয়ে নাট্যকারও সংস্কৃত রীতির শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা অর্জন করলেন।

রঙ্গমঞ্চের এই হোল আদিযুগ। যাত্রায় ত দৃশ্যপট আদৌ থাকত না ; খোলা আসরে অভিনয় হোত। যাত্রার পালায় তাই পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে স্থানকালের উল্লেখ থাকলেও কোনরূপ বিশদ বর্ণনা থাকত না। থিয়েটারের মঞ্চে থাকে পিছনে ঝোলানো দৃশ্যপট (scene) ; প্রথম যুগের নাটকের সংলাপে এই নব-অর্জিত পট সম্বন্ধে অতিসচেতনতা থাকত। নির্বাক দৃশ্যপট পাত্রপাত্রীর মুখে এসে মুখরতা লাভ করত। মধুসূদনের নাটকে যেমন পাত্র-পাত্রীরা অবসর পেলেই মুখে মুখে নিসর্গ বর্ণনা করত, দৃশ্যপটের দৃশ্যভেদে পরিবর্তন হোত, তেমনি পাত্রপাত্রীদের মুখেও নানাবিধ নিসর্গের হোত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। দৃশ্যপটের আড়ম্বরপ্রিয়তা হোল ইতালীয় রঙ্গমঞ্চের বৈশিষ্ট্য। আঠার শতকে বৃটেনের মঞ্চে একই প্রকার জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যপটের ব্যবহার দেখা যেত। উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী ধনীগৃহের রঙ্গমঞ্চে তার অনুকরণের সুযোগ ছিল।

সংলাপের ভাষা : ধ্রুপদী আদর্শ

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের ভাষা নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাছে নাকি পাঠিয়েছিলেন সংশোধনের জন্য। তিনি নাকি

বলেছিলেন, দাগ দিতে গেলে কিছুই এর থাকবে না। আর একটি কাহিনী হোল, রামনারায়ণ মাইকেলের নাটক আদ্যন্ত সংশোধন করে দিয়েছিলেন। 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রসঙ্গ আছে। মধুর কোন চিঠিতে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের প্রসঙ্গ নেই, রামনারায়ণের প্রসঙ্গ আছে। তবে ভিন্ন তাৎপর্যে। গৌরদাসকে লিখিত মধুর চিঠি থেকে জানা যায়: **Ram narayan's "Version", as you justly call it, disappoints me. I have at once made up mind to reject his aid."** কাজেই এ নাটকের সবটুকুই মধুর সৃষ্টি। **"I have no objection to allow a few alterations and so forth, but recast all my sentences—The Devil ! if I would, sooner burn the thing."**

আজ শর্মিষ্ঠার ভাষার আড়ষ্টতা সম্বন্ধে সমালোচকদের কেউ কেউ বলছেন, পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষা এবং সংস্কৃত নাটকের একান্ত আনুগত্য এই দোষের প্রধান কারণ। কিন্তু সেদিন এই নাটক বিদেশী-অনুপ্রাণিত বলে সমালোচিত হয়েছিল, **"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama, but if the language be not ungrammatical, if the thought be just and glowing, the plot interesting, the characters well-maintained, what care if there be a foreign air about the thing ?"**

এই পত্রেই তিনি বললেন, আমি লিখেছি আমার দেশবাসীর সেই অংশের জন্য, যাঁদের ভাবনা আমার ভাবনার মত।

মধুসূদনের নাটকের প্রকৃত ভাষা শর্মিষ্ঠায় ফুটেছে বলে আমাদের মনে হয় না। তবু সে যুগে ঐ নাট্যীয় ভাষাই সাধুবাদ পেয়েছিল।

"বাঙ্গালী নাট্যকার ও দত্তজয়ে এই বিশেষ প্রভেদ যে পূর্বোক্তেরা অভিনয়ে কি প্রকার বাক্যে কি প্রকার ফলোৎপত্তি হইবে তাহার বিবেচনা না করিয়া নাটক রচনা করেন, দত্তজ তাহার বিপরীতে অভিনয়ে কি প্রয়োজন, কি উপায়ে অভিনেয় বস্তু সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবে এবং কোন প্রণালীর অবলম্বনে নাটক দর্শকদিগের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবেক ইহা বিশেষ বিবেচনাপূর্বক শর্মিষ্ঠা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবেরও কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি অনাবশ্যক কৌতুক বাক্য এমত চতুরতার সহিত প্রস্তাবিত নাটকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন যে, তাহা কোন মতে অসংলগ্ন বোধ হয় না।"৯

রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদকালীন চলিত নাটকের ভাষার সঙ্গে তুলনা করে শর্মিষ্ঠার ভাষার মূল্য নিরূপণ করেছেন। কুলীনকুলসর্বস্ব, বেণীসংহার ও রত্নাবলী ব্যতীত আর যে সব 'নাটক' সে-যুগে প্রচলিত ছিল, তার সংলাপাদি পাত্র-উচিত ছিল কিনা তা বিতর্কসাপেক্ষ।

শর্মিষ্ঠা নাটকে সকলের ভাষাই প্রায় এক রকম। "ক্রিয়াপদগুলিতে কথ্য রূপ থাকিলেও তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং সংস্কৃত রীতির বাক্‌ভঙ্গি নাটকের ভাষাকে গতিমন্থর করিয়াছে। সংস্কৃত পদ্ধতির অলঙ্কারের, বিশেষ করিয়া রূপক-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার গদ্যে একেবারে খাপ খায় নাই।"[১০]

সকল কুশীলব এক ভাষায় কথা বললেও স্বরের উচুঁ পর্দা সর্বদা বজায় থেকেছে।

—নির্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে। ১।২

—শশধর আকাশমণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন। ১।২

—দেখুন বজ্রাঘাতে কোন বিশাল আশ্রয়তরু জ্বলে যায় তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে। ২।১

—সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তিব কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে? ২।২

—চন্দ্র উদিত না হলে কি আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভামান হয়? ২।৩

—আহা! যেন সুচারু সমীবৃক্ষেব অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে। ৩।১

—রাজহংসী বিকশিত কমল কাননেই গমন করে থাকে। ৩।১

—যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কবল্যেম সে ভাগ্যক্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠল। ৪।২

—যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সবোবর সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। ৪।৩

—ঐ দেখুন, এখনও সূর্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি করে নি। আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্যন্তও মুক্তাফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভামান হচ্চো। ৫।১

—যেমন আদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। ৫।২

আমরা ইচ্ছা করেই উদ্ধৃত সংলাপগুলির বক্তা বা বক্ত্রীর নাম উল্লেখ করি নি। নাগরিক থেকে শুরু করে রাজা, রাণী, মন্ত্রী, নটী, বিদূষক, গুরু অর্থাৎ শুক্রাচার্য—সকলের কণ্ঠ-উদগীর্ণ বাণী আমরা উৎকলিত করে দিয়েছি। এক্ষেত্রে কারও বক্তব্যের সঙ্গে কারও বক্তব্যের তেমন কিছু পার্থক্য নেই বলে আমাদের ধারণা হয়। সংলাপের এই একাক্ষরিতা আসলে সে যুগেব শিক্ষিত সমাজের বাগ্‌ধারা।

"I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry."

রামনারায়ণ সকলের সংলাপ একই ধাঁচে গড়তে চেয়েছিলেন। মাইকেলের তাতে ছিল আপত্তি। **"I sha'nt have him. He has made my poor girls talk d-d cold prose."**

মাইকেলের এই সকল বিবৃতির আন্তরিকতা আমাদেব স্পর্শ করে; কিন্তু দাবীর সারবত্তা স্বীকার করতে পাবি না। মৃত শীতল ভাষায় তাঁর নায়িকারা শেষ পর্যন্ত কথা বলেছে।

ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন, "শর্মিষ্ঠাব ভাষায় মধুসূদন নূতন কোন পথের সন্ধান পাইলেন না, প্রচলিত পুরাতন রীতিরই অনুসরণ করিলেন মাত্র, বাংলায় নাট্যোপযোগী ভাষায় তখনও জন্ম হয় নাই, অথচ মধুসূদন সত্যমাত্র সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া বাংলা ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছেন তখন পর্যন্তও বাংলায় সামঞ্জস্য স্থাপন কবিয়া লইতে পারেন নাই। সেইজন্য প্রচলিত নাটিক ভাষা অপেক্ষাও তাঁহার শর্মিষ্ঠা'র ভাষা কোন কোন স্থলে দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে।"[১১]

"প্রচলিত নাটক" বলতে ডক্টর ভট্টচার্য কি বুঝিয়েছেন অনুমান করতে পারি। মুদ্রিত নাটক মাত্রেই নাটক নয়। তখন পর্যন্ত মঞ্চস্থ নাটক হোল—নন্দকুমার রায় অনূদিত শকুন্তলা, মনিমোহন সরকার অনূদিত মহাশ্বেতা, তৃতীয় নাটক কুলীনকুলসর্বস্ব, চতুর্থ নাটক বেণীসংহার, পঞ্চম নাটক বিক্রমোর্বশী, ষষ্ঠ নাটক রত্নাবলী, সপ্তম নাটক হচ্ছে শর্মিষ্ঠা। নন্দকুমার রায় শকুন্তলা অনুবাদ করেছিলেন সম্পূর্ণ সাধু ভাষায়, তার মাঝে মাঝে ছিল পদ্যানুবাদ অর্থাৎ পয়ার। মনিমোহন সরকারের মহাশ্বেতা নাটক মুদ্রিত হয় নি, কিন্তু তার ভাষা কি জাতীয় ছিল, তা সেকালের সমালোচকদের মুখ থেকেই শোনা যাক্।

"বোধ হইল স্থল বিশেষে শ্রীযুক্ত তারাশংকর ভট্টাচার্য প্রণীত কাদম্বরীর এক অবিকল অনুলিপি হইয়াছে। যথা পুণ্ডরীক দর্শনে মহাশ্বেতা প্রণয়বদ্ধ

হওন নটীসমক্ষে তদ্বিষয়ের উক্তি, কপিঞ্জলের বন্ধুকে প্রবোধদান ইত্যাদি।"[১২]

তৃতীয় নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ভাষা সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। এ নাটকের বক্তব্য ও সুর ভিন্নজাতীয়; এই নাটকের ভাষায় 'শর্মিষ্ঠা' রচিত হতে পারে না।

বেণীসংহার ও রত্নাবলীর ভাষা ছিল খুবই সহজবোধ্য। কিন্তু সে ভাষায় ধ্রুপদী সাহিত্যের রস কতদূর রক্ষিত হয়েছিল, তা বিতর্কের বিষয়।

বেণীসংহার

ভীম। হাঁ মহারাজ, প্রধান কর্মই বাকি আছে। এই দুর্যোধনের রক্ত, না শুখাতে শুখাতেই দ্রৌপদীব বেণীবন্ধন কোরে দিতে হবে।

যুধিষ্ঠির। যাও ভাই, দুঃখিনী দ্রৌপদীর বেণীসংহার হউক।

ভীম। (দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া) প্রিয়ে, এই তো তোমার শুভদৃষ্টে শত্রুকুল ক্ষয় কোরে এলেম।

দ্রৌ। (সভয়ে উঠিয়া) নাথ এস।

ভী। (সহাস্যমুখে) দেবি, আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হয়েছে? ভয় নাই, দুঃশাসন সভামধ্যে তোমার কেশাকর্ষণ করেছিল, তার রক্তপান করা হয়েছে; দুর্যোধন তোমাকে আপন উরুদেশে বসাতে চেয়েছিল, এখন তার উরু চূর্ণ কবে রক্ত মেখে এলাম। (সখীর প্রতি) কৈ সে দুরাত্মা দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতী এখন কোথায়? বড় যে পরিহাস করেছিল? (দ্রৌপদীর প্রতি) প্রিয়ে, মনে পড়ে কি? আমি বলেছিলেম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে তোমার মনোদুঃখ দূর করিব।

দ্রৌ। হাঁ নাথ, এখন তাই যথার্থ করিলে।

ভী। তবে এখন চুল বাঁধো।

দ্রৌ। অনেককাল বাঁধিনি ভুলে গেছি কেমন কোরে বাঁধিব? (ভীম দ্রৌপদীর বেণীসংহার করিতে উদ্যত হইলে সখী বন্ধন করিয়া দেয়)। (ষষ্ঠ অঙ্ক)

এই সংলাপের ভিত্তি হোল সাধারণ মানুষের মুখের বুলি, তবু ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যরূপের মিশ্রণ ঘটে গেছে। এই আটপৌরে ভাষায় ধ্রুপদী সাহিত্যের অন্তরপ্রকৃতি ধরা পড়ে না। শর্মিষ্ঠার ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় বলা হোল, "The work······is the first attempt in Bengali language

to produce a classical and regular Drama." রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে মধুসূদন বলেছেন—"Shermistha is exactly after the pure classical model".

রামনারায়ণের প্রায়-গ্রাম্য ভাষার বিকল্প ছিল ভারতচন্দ্রের নাগরিক ভাষা ও কবিওয়ালাদের নাগরালি ভাষা। মধুসূদন ঐ দুইটি ভাষাকে আধুনিক সাহিত্যের যোগ্য বাহন বলে মনে করেন নি,—কী কাব্যে, কী নাটকে! শর্মিষ্ঠার অভিপ্রায় ছিল ধ্রুপদী রীতির নাটকরূপে বিবেচিত হবার। এই ইচ্ছার সঙ্গে তখনকার সাধারণ ইচ্ছার মিল ছিল; কিন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কি কোন মিল ছিল? বাংলা গদ্য তখনও শৈশব অতিক্রম করে নি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। আর প্রকাশিত হয়েছে তারাশংকরের 'কাদম্বরী'। এ হেন অবস্থায় ধ্রুপদী নাটক রচনা কবতে গিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র ভাষা তৈরি কবতে চেয়েছেন। নিবন্ধের ভাষা নয়, নাটকেব ভাষা।

তাঁর ভাষা ছিল জাঁকজমকপূর্ণ; বিষয়েব পক্ষেও হয়ত তত প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ নয়। মধুর বক্তব্য হোল, "the only fault found with it, is that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronize it." অর্থাৎ নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, দর্শকদের পক্ষে দুরধিগম্য।

এই আত্মসমালোচনা আমাদেব কানে বাজছে আজ আত্মস্তুতিব মত।

১. অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, সখে শকুন্তলে, বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকা-কুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবাল জলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য কবিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন কবিতে আসিয়াছি, এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদর স্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহার সেচন সমাপ্ত হইল; এক্ষণে যাহাদের কুসুমের সময় উত্তীর্ণ অতীত হইয়াছে, আইস তাহাদিগের সেচন করি। (শকুন্তলা—বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার—বিশী সম্পাদিত। মিত্র ও ঘোষ। পৃ—৬৯)

২. এখন শকুন্তলা একান্ত অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি, পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। এখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি? দুষ্মন্তকে স্মরণ কর; রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। (ঐ—পৃ ৭১)

এখানে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী যে ভাষায়-কথা বলেছে, শর্মিষ্ঠার পাত্রপাত্রীরা তার থেকে কোন পৃথক ভাষার উদ্ভব ঘটায়নি। উদাহরণ একটি দেওয়া গেল।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, করিলোভে ধাবমান হলে, জীবন উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এবিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা আমার পক্ষে মরীচিকা স্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা। হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে। কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ। (২।৩)

শকুন্তলার ভাষা অপেক্ষা এ ভাসা অতীতমুখী নয়। এই ভাষা সে-যুগের দর্শকদের কাছে প্রীতিপ্রদ হয়েছিল—"People talk of its poetry with raptures."

যথার্থ ত্রুটি মাইকেলের অন্যত্র। নাটকে বাংলা গদ্যের চাকা তিনি পিছনে ঘুরিয়ে দেননি, তিনি পারেননি নাটকের বিশিষ্ট ভাষা তৈরি করতে।

নাটকে কবিত্ব করতে হবে, এইপ্রকার একটা প্রেরণায় এই সব উপমা-বহুল সংলাপ রচনা করা হয়েছে। কি বলা হচ্ছে তার থেকে কিভাবে বলা হচ্ছে, তার প্রতি ঝোঁকই প্রবলতর। বাস্তবিক পক্ষে নাটকের কুশীলবেরা এখনও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে না, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা বর্ষণ করছে। অথচ এই আঙ্গিক মাইকেলের আঙ্গিক নয়। এই অযথা আড়ম্বর সৃষ্টি তাঁর শিল্পকৌশল নয়। পরে তিনি নিজেই এবিষয়ে সমালোচনা করে বলেছেন—"In the Sarmistha, I often stepped out of the path of the dramatists for that of the mere poetry. I often forgot the real in search of the practical."

শর্মিষ্ঠায় অলঙ্কারের পর অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে ; কোন একটি বিশেষ অলঙ্কারকে নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়নি ; ফলে অলঙ্কারগুলি স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, নাটকের সামগ্রিক প্রয়োজনের কাছে নতিস্বীকার করেনি। মাইকেল নিজেই বলেছেন, কাব্যের খোঁজে ছুটে আসল বস্তু হারিয়ে ফেলেছিলাম। নাট্যকার থেকে কবি বড় হতে গিয়েছিলেন। নাট্যকার হলে তিনি সেই সব অলংকার নিশ্চয়ই ছেঁটে ফেলতেন, যেগুলি তাঁর নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক।

নাট্যকার হলেন সংহতির উপাসক, গতিরাগের সঙ্গীতসাধক, অথচ মাইকেল এই নাটকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করেছেন। শুধু সংলাপে নয়, দৃশ্য-পরিকল্পনায়, অঙ্ক-সংগঠনে—সর্বত্রই তাঁব নাটক-বিরোধী নাট্যপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তবে একথাও ঠিক, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনেকগুলি অনুজ্ঞা তিনি লঙ্ঘন করেছেন। বাংলা নাটক এই প্রথম অঙ্কে (Act) ও গর্ভাঙ্কে (Scene) বিভক্ত হোল।

যযাতির দেহে জরা আক্রমণ ব্যতীত অন্য কোন আকস্মিক বা অলৌকিক বিষয় নেই ; এবং ভক্তিভাব বা কোন অসাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে তিনি পুরাণপ্রসঙ্গের চর্চা করেননি। সম্পূর্ণ সৌন্দর্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নাটক রচনা করেছেন। তবু সৌখীন নাট্যশালার চাহিদা পূরণে তিনি এই নাটকে যত্নপরায়ণ হয়েছিলেন।

কিন্তু এই বিশ্বস্ত সভাসদবৃত্তি তিনি অধিককাল বরদাস্ত করতে পারেননি। দ্বিতীয় নাটক থেকেই তাঁর সম্মুখের পথরেখা পৃথক্ এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল।

পদ্মাবতী নাটক

পদ্মাবতী মাইকেলের অ-ভারতীয় নাটক : কাহিনীতে গ্রীক পুরাণের অঙ্গীকার আছে। শর্মিষ্ঠা-লেখকের দ্বিতীয় নাটক পদ্মাবতী! ভাবতে বিস্ময় লাগতে পারে যে, সাফল্যই তাঁকে স্বতন্ত্র পথে যাত্রা করতে প্ররোচিত করেছে। "I have got the taste of blood."

পদ্মাবতী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, অভিনীত হয়নি। কেন অভিনীত হয়নি? সে কি তার না-হিন্দু আখ্যানবস্তুর জন্য? বিজাতীয় বক্তব্যের জন্য? শর্মিষ্ঠা রচনার সময় তিনি বলেছিলেন "I am aware, my dear fellow,

that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama."

পদ্মাবতীর আখ্যান-অংশ

শর্মিষ্ঠা সম্পূর্ণ মহাভারতের কাহিনী নিয়ে লেখা। আর পদ্মাবতীতে এক গ্রীক পুরাণ-কাহিনীকে 'হিন্দুভূষণে' সজ্জিত করা হয়েছে। গ্রীক পুরাণের গল্পটি কতটুকু অনুসরণ করা হয়েছিল? এবিষয়ে সমালোচককুল কোন আলো দেখাতে পারেন নি।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "গ্রীক পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটকের পরিকল্পনা।"[১৩]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেছেন, "গ্রীক পুরাণ হইতে মধুসূদন তাঁহার নাটকের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

* * * *

গ্রীক পৌরাণিক আখ্যানের সঙ্গে পদ্মাবতীর আখ্যানের মূল পার্থক্য এই যে, গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী বিয়োগান্তক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের আদর্শে মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকের আখ্যানকে মিলনান্তক করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।"[১৪]

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "যে Apple of Discord নিয়া জুনো, ভিনাস ও প্যালাস দেবীত্রয়ের বিবাদ বাধিয়াছিল এবং যাহার ফলে ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল সেই উপাখ্যান সকলেরই সুবিদিত। ঐ গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মাইকেল 'পদ্মাবতী' নাটক রচনা করেন।"[১৫]

অথচ এ বিষয়ে মাইকেল নিজে বলছেন, "I am sure, I need not tell you that in the first act you have the Greek story of the golden apple Indianised."

সুতরাং ডক্টর সেন যখন বলেন গ্রীক পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটকের পরিকল্পনা, তখন নাটকের একটি অঙ্ককে সমগ্র নাটক হিসাবে ধরে তিনি হিসাবে ভুল করছেন।

ডক্টর ভট্টাচার্য বলেছেন গ্রীক কাহিনী বিয়োগান্তক, আর মধুসূদনের কাহিনী মিলনান্তক। অথচ মধুসূদন গ্রীক কাহিনীর সামান্য অংশ গ্রহণ করেছেন।

ডক্টর ঘোষ বলেছেন পদ্মাবতী নাটকের সম্পূর্ণ আখ্যান-অংশই গ্রীক পুরাণ থেকে গৃহীত। স্বয়ং মাইকেল কি এই কথা জানতেন?

গ্রীকপুরাণের আখ্যায়িকার সারাংশ দেওয়া যাচ্ছে। গ্রীক দেবতা জিউসের কন্যা থেটিসের সঙ্গে পেলেউসের বিবাহ হতে চলেছে, এমন সময় ঈর্ষ্যাদেবী এরিস গণ্ডগোল পাকাবার জন্য একটি আপেল পাঠিয়ে দিলেন। যে নারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে বিবেচিত হবেন, তিনিই পাবেন এই আপেলটি। এখন কলহ উপস্থিত হোল—কে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী? হেরা, আথেনে ও আফ্রোদিতের মধ্যে শুরু হোল কলহ। মধ্যস্থতা করার ভার পড়ল প্যারিসের ওপর। তিনি ছিলেন সুশ্রীতম পুরুষ। তিন স্ত্রী-দেবতাই প্যারিসকে প্রলোভন দেখাতে লাগলেন। হেরা বললেন, তাঁকে মনুষ্যপ্রধান করবেন; এ্যাথেনে বললেন, তাঁকে যুদ্ধজয়ী করবেন; আফ্রোদিতে বললেন, শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে এনে দেবেন তাঁর পত্নীরূপে। প্যারিস আফ্রোদিতের হাতে ফলটি তুলে দিলেন। তার ফলে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেলেনকে পত্নীরূপে লাভ করলেন। অবশ্য এই পরিণয় শুভ হয় নি। মাইকেল গল্পের সে অংশ অবশ্য গ্রহণ করেন নি।

পদ্মাবতী নাটকের আখ্যান অংশ হোল এই প্রকার: প্রথমাঙ্কে আমরা বিন্ধ্যগিরির দেবউপবনে উপনীত হই। সেখানে রাজা ইন্দ্রনীল ধনুর্বাণ হস্তে হরিণের পশ্চাদ্‌ধাবন করছেন। স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বড়ই রমণীয়। ইন্দ্রনীল এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং শচীদেবীর মায়ায় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। সেই সময় শচী, রতি ও মুরজা মঞ্চে প্রবেশ করলেন। মুরজা দেবীকে দেখতে পাওয়া যাবে মনমরা অবস্থায়; মনমরা হবার কারণ মুরজা দেবীর কন্যা পার্বতীর অভিশাপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। আজ পনেরো বৎসর ধরে তার কোন খবর নেই। দূরে নারদ প্রবেশ করলেন, তিনটি দেবনারীকে একত্রে দেখে এঁদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার জন্য তিনি এক ফন্দি আঁটলেন। কয়েক দিন পূর্বে তিনি নাকি কৈলাসপুরী গিয়েছিলেন হরগৌরী দর্শনে; ফেরার পথে মানসসরোবরের সলিলে একটি ভাসমান স্বর্ণপদ্ম দেখতে পান। পদ্মটির সৌন্দর্য দেখে তিনি জলপানের ইচ্ছা ভুলে যান; তিনি ঐ পদ্মটি তুলে আনেন। যখন তিনি পদ্মটি তুলছেন তখনি আকাশমার্গে এক দৈববানী হোল যে, "হে নারদ! এ ভগবতীর পার্বতীর পদ্ম; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" দেব-নারীদের তিনজনই এ পদ্মের দাবীদার হলেন। কলহপ্রিয় নারদ এইটিই

চাইছিলেন। নারদের মতলব সিদ্ধ হোল। তিন স্বর্গকন্যা দারুণ কলহে রত হলেন।

তিন স্বর্গকন্যা যখন এই প্রকার কলহে মত্ত, তখন আবার আর এক দৈববাণী হোল: "হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করো দেবসমাজে নিন্দনীয় হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মানো।" শচী ইন্দ্রনীলকে মায়াজাল থেকে মুক্ত করলেন। ইন্দ্রনীলের নিদ্রা টুটে গেল। ইন্দ্রনীল জাগ্রত হলে তিন দেবী এসে জানালেন যে পর্বতশৃঙ্গের ওপর একটি কনক পদ্ম রয়েছে, ঐটি যাঁকে তিনি প্রদান করবেন, তিন জনের মধ্যে তিনি সুন্দরী শ্রেষ্ঠা বলে বিবেচিত হবেন। ইন্দ্রনীল বুঝতে পারলেন যে এঁরা তিনজনই দেবনারী। এখন এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট করেন, আর কাকে রুষ্ট করেন, তাই হোল সমস্যা। রাজা এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। কিন্তু তাঁরা নাছোড়বান্দা।

শচীদেবী জানালেন যে তিনি ইন্দ্রের স্ত্রী; তিনি ইচ্ছা করলে রাজাকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করে দিতে পাবেন। মুরজা দেবীই কম যাবেন কেন? তিনি বললেন যে, আমি কুবেরপত্নী; এ বসুমতী তাঁরই রত্নাগার। অতএব ...ইত্যাদি। রতিদেবী বললেন, ইন্দ্রত্ব বা কুবেরত্ব কোনটিই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। তিনি রূপকের আশ্রয়ে বললেন, এ পৃথিবীতে মধুকরই সর্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান করা ছাড়া তার আর কোন কর্ম নাই।

রাজা ইন্দ্রনীল আর দ্বিধা করলেন না; তিনি কনক পদ্মটি রতিদেবীর করকমলে অর্পণ করলেন। তখন শচী ও মুরজা উভয়েই ভীষণ কুপিত হলেন, এবং প্রতিফল দেবেন বলে শাসালেন। বয়স্য ও সারথি এলে ইন্দ্রনীল রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ হোল।

দ্বিতীয়াঙ্ক থেকে গল্প এরই ধাক্কায় এগিয়ে চলেছে। তখন আর গ্রীক পুরাণের কোন পাত্তা নেই। নাট্যকার তখন দেশীয় পৌরাণিক এবং লৌকিক আখ্যায়িকার বিভিন্ন মোচড় ধরে ধরে এগুবার চেষ্টা করেছেন। কখনও তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে রূপকথার বিভিন্ন শ্রীছাঁদ, কখনও সংস্কৃত নাটকের গল্পের ছাঁদ।

দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত নাটক নানা সময়ে কখনও রূপকথা, কখনও সংস্কৃত দূতকাব্যের (পবনদূত) কৌশল অনুসরণ করেছে।

এখানে প্রায় পরীর গল্পের মত নানা অসম্ভব ঘটনা ঘটেছে; চিত্রকর বেশে রতির পদ্মাবতীর সঙ্গে সাক্ষাতকার প্রভৃতি রূপকথার গল্পেরই মত। মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-উদ্যানে রতি তবু ছদ্মবেশে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু শচী ও মুরজা স্ব স্ব বেশেই বিচরণ করেছেন।

রাজা ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁরা রাজকন্যা পদ্মাবতীকে শাস্তি দিতে পিছপা নন; তার জন্য কলির সহায়তা গ্রহণ করলেন। এ দিকে পদ্মাবতীর দেশে মাহেশ্বরী পুরীতে রাজা ইন্দ্রনীল ছদ্মবেশে গিয়ে হাজির হলেন; ইতিপূর্বে ইন্দ্রনীলের চিত্রপট পদ্মাবতী দেখেছেন। তাঁর হৃদয়ে অনুরাগ জন্মেছে। বণিকবেশী ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দৈবক্রমে পদ্মাবতীর দেখা হোল, কিন্তু তাঁকে তিনি সামান্য বণিক ভাবলেন; এবং তিনি ভীষণ ব্যথাহত হলেন। তাঁর অসুস্থতায় স্বয়ম্বরসভা ভেঙ্গে গেল। কিন্তু বয়স্য এত কথা গোপন রাখতে পারল না। প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে পদ্মাবতীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের বিয়ে হয়ে গেল। স্বয়ম্বর সভায় যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই বা কম কিসে! তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে ইন্দ্রনীলের গলায় মাল্যদানে তাঁরা বেজায় চটে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে রাজা ইন্দ্রনীলের যুদ্ধ বেধে গেল। রাজা যখন যুদ্ধে ভীষণ ব্যস্ত, সেই অবসরে শচীর প্ররোচনায় কলি সারথীর বেশ ধারণ করে পদ্মাবতী ও তার সহচরীকে অপহরণ করে নিয়ে গেল।

এখান থেকে কলির খেলা শুরু হোল। অনেকটা মহাভারতের নল-দময়ন্তী বা শ্রীবৎস-চিন্তার ভাগ্যবিপর্যয়ের মতো। পদ্মাবতী ও সহচরীকে এক পর্বত শিখরস্থ গহন কাননে এনে রেখে দিয়ে গেল কলি। কিছুকাল পরে সে আবার যোদ্ধার ছদ্মবেশ ধারণ করে পদ্মাবতীর কাছে এসে জানাল যে যুদ্ধে রাজা ইন্দ্রনীলের মৃত্যু হয়েছে। এখবর শুনে পদ্মাবতী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

এখানেই এসে মহাভারতীয় গল্পের প্রভুত্ব থেমেছে। এখান থেকে কাহিনীর পরিণতি অনেকাংশে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের শেষাংশের অনুরূপ। এই কারণে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, "মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনাদি, মরীচিসকাশে শকুন্তলাসহ দুষ্মন্তের মিলনের অনুকৃতি বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ শকুন্তলা পাঠের পরই যে, কবি এই নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভুরি ভুরি স্পষ্ট প্রমাণ লক্ষিত হয়।"[১৬]

পুরাণের অন্তর্ভুক্ত কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত না হলেও একে পৌরাণিক নাটকের সমস্ত সর্ত পালন করতে হয়েছে। মিলন ব্যতীত

অন্য পরিণতি বরদাস্ত করা হয় নি। এটা ছিল বেলগাছিয়া মঞ্চের সম্ভবত অ-লিখিত নির্দেশ। আশ্রমে নায়ক-নায়িকাকে এনে না তুলতে পারলে এই কাহিনীর পরিণতি শুভ হতে পারত না।

সুভদ্রা-হরণ চলবে না। আলতামাস-রিজিয়ার গল্প চলবে না। এ হেন অবস্থায় পুরাণের সংকীর্ণ ভুবনে বিচরণ করতে হলে অপর নাটকের ব্যবহৃত সড়কে পদার্পণ না করে উপায় কি?

পদ্মাবতী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে কাঠুরিয়া-নারীর বেশে রতি দেবী এসে পদ্মাবতী ও তার সখীকে তপস্বীদের আশ্রমে এনে রেখে গেলেন।

রাজা ইন্দ্রনীল বাহুবলে যুধ্যমান রাজাদের পরাজিত করলেন। রাজধানীতে ফিরে এসে পদ্মাবতীকে দেখতে না পেয়ে তিনিও আবার মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এবং ততক্ষণে কুবেরপত্নী মুরজা জানতে পেরেছেন যে, রাজকন্যা হোল তাঁরই শাপভ্রষ্ট কন্যা বিজয়া। আর এদিকে রতি গিয়ে পার্বতীর কাছে অভিযোগ করলেন যে, ইন্দ্রনীল শিবভক্ত, কিন্তু তাকে শচী ভীষণভাবে নির্যাতিত করে চলেছেন। পার্বতী এই বিবরণ শুনে শচীর ওপর ভীষণ বিরক্ত হলেন।

দেবর্ষি নারদ এই গণ্ডগোলের স্রষ্টা; কাজেই তাঁকে আবার শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করা হোল। এই ঘটনার জট তিনিই খুললেন। নারদ গিয়ে শচীকে জানালেন পার্বতীর অসন্তোষ। তখন শচী রাজার ক্ষতিসাধন প্রয়াস থেকে নিরস্ত হলেন। "ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে কার সাধ্য।" নারদ মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে ঋষি অঙ্গিরার আশ্রমে চললেন; মুরজা তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। অঙ্গিরার আশ্রমে রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে পদ্মাবতীর মিলন হোল। স্বয়ং শচী পদ্মাবতীকে রাজার হস্তে তুলে দিলেন। নারদ, রতি ও মুরজা এই মিলন-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নারদ আশীর্বাদ করলেন।

যশঃসরে চিররুচি কমলিনী রূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতী—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয় জন কাব্যরত্নহারে
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

গ্রীক পুরাণের গল্পকে মধুসূদন ভারতীয় পুরাণের মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন, তাই শর্মিষ্ঠার পার্শ্বে পদ্মাবতীর নাম শোভা পাবে, এই তাঁর কামনা।

বিদেশী পুরাণ শুধু গল্পের উৎসমুখ মুক্ত করে দিয়েছে ; কিন্তু তার প্রবাহ আপন বেগে চলেছে। সেই প্রবাহে নানা ভূভাগের আকাশ ও পার্শ্বস্থ বনরাজি ছায়া ফেলেছে।

মাইকেল এই আখ্যায়িকার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে একটি দ্বিধায় পড়েছেন। এ নাটক তিনি লিখেছেন বেলগাছিয়া মঞ্চের মুখ চেয়ে। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ-দেখা দর্শকদের জন্য লেখা এই নাটক। তাই যতদূর সম্ভব ঐ রীতি প্রতিপালনে তিনি যত্নবান।

রাজপুত চিত্রশিল্পী যখন রাধার পট আঁকেন, তখন তিনি এক বিশেষ রীতিতেই আঁকেন। কাংড়া চিত্রের রাধা সব চিত্রেই কয়েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গীর অধিকারিনী। তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও মঞ্চবিশেষের কতকগুলি বাঁধাধরা দাবী মেনে নিয়েই নাটক লিখতে হয়। সঙ্গীতে যাকে বলে ঘরানা, এ হোল তাই।

পদ্মাবতীর নাট্য-কৌশল

পদ্মাবতীর নাট্যকৌশল শর্মিষ্ঠা থেকে উন্নত, একথা কেউ কেউ বলেছেন। ডক্টর গুহঠাকুরতার মতে, "In the handling of its subject-matter Madhusudan showed a decided improvement on his first work. It has a strong plot that twists itself up into a knot and then disentangles itself. He shows greater economy of means and attempts to create the dramatic effect, not by circumlocution but by simplification. The language of this play is much less artificial and much more appropriate to the evolution of the essential of the story."[১৭]

এই বিশ্লেষণের বিপরীত মন্তব্য করেছেন ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ; তিনি বলেছেন -'পদ্মাবতী' শর্মিষ্ঠা হইতে নিকৃষ্ট। শুধু তাহাই নহে, 'পদ্মাবতী' নাটক মধুসূদনের নিকৃষ্টতম রচনা।"[১৮]

কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, "একমাত্র চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস ইহাতে সার্থক হয় নাই বলিয়াই; কাহিনীর দিক দিয়া গৌরবান্বিত হইয়াও নাটক হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।"[১৯]

ডক্টর গুহঠাকুরতা এই নাটকের সংলাপের প্রশংসা করেছেন ; ডক্টর ভট্টাচার্য্যও করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্য্যের মতে, ভাষার দিক দিয়ে পদ্মাবতী

শর্মিষ্ঠা থেকে উন্নত। গুহঠাকুরতা এই নাটকের গঠনবিন্যাসের প্রশংসা করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্য্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষন করেন। "পদে পদে সংস্কৃত আদর্শের নিকট মস্তক অবনত করিতে গিয়া ইহার ঘটনার প্রবাহকে নাট্যকার অনেকাংশে সংযত করিয়াছিলেন। ইহাতেই দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া ইহাদের মধ্যস্থিত ঐক্যসূত্রটি হারাইয়া ফেলিয়াছে।"[২০]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নাটকের নাট্যীয় কাঠামো কতটা সংহত। ভাষার প্রশ্ন পরে আলোচিত হবে।

পদ্মাবতী পঞ্চমাঙ্কবিশিষ্ট নাটক। ১ম অঙ্কে একটি গর্ভাঙ্ক আছে। সাহিত্য-দর্পণের মতে নাটকের ১ম অঙ্কে থাকবে নাটকের মূল অংশ। সেদিক থেকে পদ্মাবতী নাটকের প্রথম অঙ্ক খুবই সার্থক। দ্বিতীয় অঙ্ক দুইটি দৃশ্য নিয়ে গঠিত। এই অঙ্কে রতিদেবীর উদ্যোগী রূপ চোখে পড়ে; শচী ও মুরজাকে বিরোধী ভূমিকায় দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কে ও চতুর্থ অঙ্কেও তিনটি দৃশ্য। নাটকের ঘটনার যা কিছু জটিলতা এইখানে চরম আকার ধারণ করেছে। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ; স্বয়ম্বরসভায় আগত রাজাদের কোপ, যুদ্ধ, পদ্মাবতী-অপহরণ, রাজার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন, পদ্মাবতীকে না দেখে মূর্চ্ছা—সবই এই পর্বে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি কাঠুরিয়া-নারীর বেশে রতি পদ্মাবতীকে ঋষি অঙ্গিরার আশ্রমে পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেছেন। পঞ্চম অঙ্কে ঘটনার অবরোহ (denouement) ও সুখদ পরিণতি ঘটেছে। নারদের মধ্যস্থতায় ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর মিলন সংসাধিত হোল। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নাটকের অঙ্কগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়, এবং দৃশ্যগুলিও ঐক্যসূত্রহীন নয়। বরং ডক্টর সুকুমার সেন যখন বলেন, পদ্মাবতী নাটক পুরোপুরি গল্পসর্বস্ব, তখন এই নাটকের বস্তুবিন্যাসে যে কোন শৈথিল্য নেই, তা মোটামুটি স্বীকৃত হয়।

এ-নাটকে কোন প্রবেশক বা ভূমিকা নেই; ঘটনা কারও মুখে ঘটছে না, ঘটছে মঞ্চে। এখানে কুশীলবেরা সংবাদ বহন না করে সংবাদ রচনা করে চলেছে। আর যখন কারও মুখ থেকে কোন সংবাদ জানছি না, তখন ঘটনা নেপথ্যে ঘটে চলেছে। যেমন চতুর্থ অঙ্কে ইন্দ্রনীল ব্যর্থমনোরথ রাজাদের সঙ্গে যে লড়ছেন, এ খবর আমরা কলির মুখ থেকে জানতে পারি। এই 'রিপোর্টিং' শর্মিষ্ঠার বিবরণ পেশ করার মত নয়। এখানে বিবৃতি-মুখীনতার প্রকৃতি পাল্টে গেছে।

শর্মিষ্ঠা নাটকে নাট্যকারের সূচনা ও উপসংহারের মধ্যে কোন সচেতন নাট্যিক বিস্ময় সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। অপর পক্ষে পদ্মাবতীতে নাট্যকার সূচনাতেই আমাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত করলেন; এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে ঘটনাকে জটিল করেছেন এবং পঞ্চম অঙ্কের দুইটি গর্ভাঙ্কে তার সুরাহা করেছেন।

তবে নাট্যগত সংহতি যে সর্বত্র সুঠাম হয়েছে, এ কথা বলা যায় না। যেমন প্রথম অঙ্কে রতি শচী মুরজার প্রস্থানের পর রাজা ও বিদূষকের কাণ্ডকারখানা নাটকের প্লটের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়; কারণ এই সব কাণ্ড-কারখানার ফলে ঘটনার কোন অগ্রগতি হয় নি।

কেবল বিদূষকের মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকে রঙ্গরস সৃষ্টি করা হোত। আরও নানা উপায় অবলম্বন করা হোত; যেমন "আরে! আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে।" (২।২) কঞ্চুকীর এই সব উক্তিতেও রঙ্গরস সৃষ্টি হয়; শর্মিষ্ঠার ৫ম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের মত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়েও মধুসূদন বিদূষক, নাগরিকদের দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেননি। অনেক সময় অপ্রধান ও অনভিজাত চরিত্র দিয়ে হাস্যরস ও হালকা হাওয়া তৈরি করা হয়।

কথাবস্তুর প্রয়োজনে মধুসূদন সখী-পরিচারিকা আমদানী করেছেন, কিন্তু তারা কেবল হাস্যরস সৃষ্টি করেনি। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বা তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে নটী-পরিচারিকা হাস্যরস সৃষ্টি না করে অতি-প্রয়োজনীয় নাটকীয় দায়িত্ব পালন করেছে। এইভাবে প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমূহ পদ্মাবতী নাটকের গল্পকে সংহত করেছে।

এ্যারিষ্টটলের ভাষ্য-অনুযায়ী এই নাটকে কালগত ঐক্য হয়ত নেই; কিন্তু সেক্সপীয়ার-ভাষ্য অনুযায়ী অবশ্যই আছে। ইন্দ্রনীলের জীবনে স্বর্গীয় নারীদের খেয়ালে যে সঙ্কট নেমে এসেছিল, সে সঙ্কট ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলনে মীমাংসিত হোল। নাটকের ঘটনাকাল এক বৎসরের অধিক নয় বলেই মনে হয়। স্থানগত ঐক্য সেক্সপীয়ার-অনুযায়ী বলা যায়।

তবে এই নাটকের নাট্যীয় সংঘাত নাটকের চরিত্রের মধ্যে না থেকে ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

পদ্মাবতীর নায়ক-নায়িকা

পদ্মাবতী নাটকের নায়ক-নায়িকা জীবনে প্রচুর দুঃখকষ্ট পেলেন, মর্ত্যের মানব-মানবীর মত পেলেন না।

ঘটনারও নানা উত্থানপতন আছে ; ঘটনা এক স্থলে দাঁড়িয়ে তোলপাড় করে নি, ঘটনা এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধে সেই অনুপাতে নতুন করে বিশেষ কিছু আমরা জানছি না।

রাজা ইন্দ্রনীল শিকারে পটু, বীর সৈনিক, এবং সৌন্দর্যের পূজারী—এ খবর আমরা প্রথম দৃশ্যে পাই। নাটকের শেষ দৃশ্যে এর থেকে বেশি কি সংবাদ পাই ?

স্বর্গের তিন দেবনারী তাঁর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন কে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী, তার নিশানা করে দিতে। ঐ দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন, সুন্দরীকে তিনি চিনেছেন ; পুরস্কারও পেয়েছেন। কিন্তু নাটক একজন সক্রিয় সুন্দর নায়কের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হোল।

রোমিও-জুলিয়েটের নায়ক প্রেমমুগ্ধ, নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে সে তার প্রার্থিতা নারীর কাছে গিয়ে পৌঁছেছিল। হোক না তা হৃদয়বিদারী, কিন্তু সেই পৌঁছাবার প্রয়াসের সঙ্গে তালে তালে তার হৃদয়ের পূর্ণ ছবি নাটকের অঙ্কে অঙ্কে উদ্ঘাটিত হতে লাগল।

ইন্দ্রনীলকে নাট্যকার একই রকম কৃতিত্বের ভাগী করেন নি। নাটকের মূল ঘটনা, মূল সংঘর্ষ যেন ঘটেছে, যেন কেন্দ্রায়িত হয়েছে শচী-মুরজা-রতির বিরোধে। অথচ ইন্দ্রনীলের অন্তরের মধ্যে এই সংঘর্ষকে স্থানান্তরিত করলে নাটকের দ্বন্দ্ব অধিকতর মানবতাপূর্ণ হোত, হোত জীবন্ত।

রাজা ইন্দ্রনীল ঘটনার আবর্তে কেবল আবর্তিত হলেন, বিবর্তিত হলেন না। তিনি যেন এক অসহায় দর্শক! নিয়তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নন তিনি। মেঘনাদবধ কাব্যের সেই ভাগ্যতাড়িতব্যক্তি চরম আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত। তিনি ত ঘটনার বিক্ষুব্ধ প্রবাহের অসহায় দর্শক মাত্র নন, সেই ঘটনা-প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াসী, হলেনই বা ব্যর্থ। বীর সন্তানেরা একে একে ক্ষুদ্র বনচারীর হস্তে নিহত হচ্ছে, কিন্তু তবু "অ-রাম বা অ-রাবণ হবে ভব আজি" এই শপথ ত তিনিই গ্রহণ করছেন।

তার কারণ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' জীবনের অন্দরমহলে মাইকেল প্রবেশ করেছিলেন। সে ছিল ঘরে বসে পড়বার মত কাব্য। মঞ্চের দর্শকের ন্যায়

বিশেষ এক জনসমষ্টির মনোরঞ্জনের জন্য রচিত নয়। মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে গ্রীক সৌন্দর্যবাদের (Hellenism) দ্বারা তিনি উদ্বুদ্ধ, এখানে শুধু গ্রীক কাহিনী।

তাই বাহ্যত মনে হয়, ইন্দ্রনীল না হোল দুষ্মন্ত, না হোল রাবণ। সে হোল রূপকথার তর্কহীনতার দেশের রাজপুত্র ; পদ্মাবতীও রূপকথার এক রাজকন্যা। তার শুধুই প্রণয়-বাসনা, আর ঈপ্সিত যুবার জন্য দুঃখভোগ। তার মনের আর কোন মানচিত্র আমাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি। সে সুন্দরী, সদ্বংশজাতা ; এবং একনিষ্ঠা প্রেমিকা। কিন্তু সে কতটা জীবন্ত, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। তার মান নেই, অভিমান নেই, কলহ নেই, ভৎর্সনা নেই, আছে কেবল ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা। সোহাগে লালিত পদ্মাবতী মাহেশ্বরী রাজপ্রাসাদের অন্যতম মহামূল্য পুত্তলিকা। পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সে বলেছে "সখি তাই ত। বিধাতা কি তবে এতদিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন।" এই আনুকূল্য বহু পূর্বে দেখা গেলেও এই চরিত্রের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হোত না।

কৃষ্ণকুমারী নাটকেব বিদূষক মাঝে মাঝে খল-চরিত্রের আভাস এনেছে, বা স্বয়ং লেখক এই সুবাদে রাজশক্তির সমালোচনা করে নিয়েছেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত চরিত্রের সমালোচনা আছে ; পদ্মাবতীতে আছে রাজশক্তির শ্রেণীগত সমালোচনা।

—রাজা বেটা রয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে ন্যায়।

—বটে ? সে না বড় অসৎ ?

—মহাশয়, ওকথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

—বটে ? রাজার কয় সংসার ?

—আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করেনি।

—কেন ?

—মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বলে বিয়েও করে না।

(১ম অঙ্ক)

লেখকের উদ্দেশ্য হোল হাস্যরস সৃষ্টি করা, কিন্তু অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকল না, তাই বা বলি কি করে !

এই নাটকে রাবণ বারবার উল্লিখিত। তবে রাবণ এখনও সহানুভূতির তিলক পায় নি ; প্রচলিত মূল্যায়ন পেয়েছে।

এই নাটকে লেখক দেবচরিত্র সৃষ্টিতে নতুন ভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বা মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পূর্বে পদ্মাবতীতে মাইকেলের বহু নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর রয়েছে। হিন্দু দেবদেবী আর গ্রীক দেবদেবী পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। দেবতাদের মধ্য থেকে স্বর্গীয় ভাব তিনি বর্জন করেছেন ; মানবিক ভাবে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের দেবদেবী-চরিত্রের পক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "You shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem." তবে কি পদ্মাবতী নাটকের দেবীচরিত্রগুলি নিয়ে হিঁদুয়ানীর প্রশ্ন উঠেছিল ?

এই দেবীচরিত্রগুলি সৃষ্টির পিছনে মঙ্গলকাব্যীয় সংস্কার থাকা বিচিত্র নয়। কারণ এদের কোন নীতিবোধ নেই, এদের হাতে নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত হচ্ছে - তার জন্যও এদের অনুশোচনা নেই। ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য এরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত।

নারদ বা কলি-চরিত্র কল্পনায় পৌরাণিক কল্পনা তাঁকে প্রভাবিত করেনি। এ ক্ষেত্রে লৌকিক সংস্কার সম্ভবত সহযোগিতা করেছে।

পদ্মাবতী নাটকের ভাষা

পদ্মাবতী নাটকে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুসরণ কম। এ নাটকের ভাষা তার নিজের সৌন্দর্যে বিভোর হয়নি। পদ্মাবতী নাটকে স্বগত-উক্তির পরিমাণ কম। আর যখন আছে, তখন তা কোন না কোন নাটকীয় প্রয়োজন সমাধা করেছে।

১ম অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে রাজা ইন্দ্রনীল একা একা অনেকক্ষণ কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর সংলাপ ঘটনাকে ধরে এগিয়েছে। নারদের মুখেই যথার্থ স্বগতোক্তি প্রথম শোনা গেল। সেই স্বগতোক্তিতে নারদ তাঁর মতলবটি আঁটছেন। নারদের প্রত্যেকটি স্বগতোক্তিই মতলব আঁটার স্বগতোক্তি। শচীর মুখে একটি স্বগতোক্তি আছে নারদকে দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বলেছেন—

ও মা ! আমি এ কি কচ্ছি ? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে।

বিদূষকের মুখ থেকেও আমরা বহু স্বগতোক্তি শুনতে পাবো ; সেগুলি অবশ্য ঘটনাবাহী ততটা নয়, যতটা তার ঔদরিক বৃত্তিপরায়ণতাকে উদ্ঘাটিত করেছে।

হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে আর এই নগরের চারিদিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর কত যে লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট-নটীরা নৃত্যগীত করচে তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেমনিই বেরুচ্যে। আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসচে যাচ্যে তা দেখলে একেবারে চক্ষুঃ স্থির হয়। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামনের কপালে এর কিছুই নাই। (৩।১)

রাজা ও পদ্মাবতীর স্বগতোক্তি শুধু হাহুতাশে-ভরা ; কিন্তু সে হাহুতাশ জীবনের গভীরে গিয়ে হাজির হয় নি।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে? (৩।১)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে। একি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনী প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনী দেবী দিবাভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাস কল্যেন তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদসাগর হতে উত্তীর্ণ হতে দেখতে পেলেম না। (৪।২)

পদ্মাবতী। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্র-নন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিনী করেও আবার অনাথ যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিনীর মত বনে বনে ফেরালে। (রোদন।) (৫।২)

স্বগতোক্তি এইভাবে সংলাপের নাট্যীয় উপযোগিতায় ভূষিত হয়েছে। তবে সেক্সপীয়ারের স্বগতোক্তিতে (soliloquy) যেমন একটি গীতিকবিতার স্বাদ থাকে, এগুলিতে তা নেই।

পদ্মাবতী নাটকে সংলাপের ভাষা অনেক সহজ হয়েছে, সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শনিষ্ঠ উপমা-উৎপ্রেক্ষা থাকলেও লৌকিক ভাষার পরিমাণ অনেকখানি বেড়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটকে অরণ্য, আশ্রম, নদী, গিরি, রাজপ্রাসাদ—এই সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে নাট্যকার প্রতিটির বর্ণনা না দিয়ে স্বস্তি পেতেন না। এখন সে অভ্যাস চলে গেছে। কঞ্চুকীর মুখে প্রথম অমিত্রাক্ষর বসেছে, ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কে সেটি শব্দ-বিলাসে পর্যবসিত।

কঞ্চুকী। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন!

সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায়রে! কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত।

(চিন্তা করিয়া)

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে। মলয়-মারুত,

কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি,
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতুহলে।
হিমাদ্রির কনক ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে।

(পরিক্রমণ)

এ উক্তি নবীন শব্দবিলাসীর উক্তি; রেনেসাঁসীয় ঐশ্বর্যবাদের সাহিত্যিক পরিণতি। অযথা উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ, বা অতিশয় অনুপ্রাস-অনুরাগ-হোল সদ্য-অর্জিত ক্ষমতার অতি-ব্যবহার। নাটকের প্রয়োজন অপেক্ষা নাট্যকারের আত্মজাহির ইচ্ছাই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

এ প্রকার ভাষা নাটকের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও আছে। নাট্যকার যখন লেখেন,

কলি। (স্বগত) এই হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রানী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

(প্রকাশ্যে) দেবি, আশীর্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?
কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা; যতনে, ইন্দ্রানী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গ পুরে।
শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?
কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে।

মুরজা। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে? (প্রকাশ্যে)
ভাল কলিদেব—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?
কাকি। সে কি, দেবি, হরিণীরে মৃগেন্দ্রকেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

এ-ভাষা নাটকোচিত ভাষা; কারণ এ ভাষা সংক্ষিপ্ত অথচ ঐশ্বর্যময়, বিষয়উন্মেষী অথচ পরিণামমুখী।

মাইকেল শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়, প্রথম নাটকীয় ভাষাও পদ্মাবতীতে প্রয়োগ করলেন। "I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose" কিন্তু তখন তাঁর মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছে কে? তিনি আগ্রহভরে জানাচ্ছেন, "I intend to write three or 4 more plays of the classical kind."

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়" এ উপলব্ধি বড় বিলম্বিত হয়ে গেল!

পদ্মাবতী : মাইকেল-মানস

পদ্মাবতী নাটকের সংঘাত কেন্দ্রায়িত হয়েছে শচী-মুরজা-রতির পারস্পরিক কলহের মধ্যে। ঐখান থেকে উৎখাত করে ইন্দ্রনীলের বুকের মাটিতে রোপন করলে এই দ্বন্দ্ব ভিন্নরূপ ধারণ করত। কখনও কখনও মনে হয় পদ্মাবতী নাটকের কাহিনী অর্ধসমাপ্ত 'মায়াকানন'। এ নাটকের গল্প আর এ নাটকের পরিণতি সামঞ্জস্যহীন; সূচনা আর পরিণতি পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কপরায়ণ।

নাট্যকারের সমস্ত শক্তি যখন ছিল সুশৃঙ্খল, তখন মঞ্চের সংস্কার তাঁর নাটকের পরিণতিকে বিপথগামী করেছে। পদ্মাবতী তারই সাক্ষ্য। আর যখন কবি মৃত্যুপথযাত্রী, কবির শক্তি বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খল, তখন পরিণতি হয়েছে সঠিক পথে ধাবিত—সে নাটক হোল মায়াকানন। মাইকেলের নাট্যকার-জীবন এক অনির্দেশ্য সূত্রধারের প্রযোজনা!

পদ্মাবতী সম্বন্ধে সবাই বলেছেন গ্রীক সান্নিধ্যের কথা। কিন্তু সে কাহিনীর মর্মস্থলে দুর্লক্ষ্য নিয়তির মতই যে একটি পুরাণকথা হেঁটেছে, সেটি ত কারো চোখে পড়ল না!

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পট বেচতে এসেছেন এক চিত্রকরী। বহু পটের মধ্যে একটি পট ছিল এইরূপ : অশোক কাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদছেন।

ভগবতী বৈদেহীর দুঃখে পদ্মাবতীর নয়ন অশ্রুসজল হোল।

এই চিত্রপট হঠাৎ প্রদর্শিত হয় নি ; আর অশ্রুজল বিনা প্রয়োজনে নয় ব্যয়িত।

তৃতীয়াঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক থেকেই এই পুরাণকাহিনীর আভাস ফুটে উঠতে থাকে।

পরি। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায় ?

সখী। সুমেরু পর্বত যে কোথায় তা কে বলতে পারে? কনক লঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখতে পায় ?

* * *

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তো আমার কর্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ করো অবশেষে সীতাদেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। ৩।১

*

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর! তুই যে দ্বিতীয় হনুমান।

ঐ। কেন? হনুমান কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস? দেখ দেখি যেমন হনুমান রাবণের মধুবন লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃত ফল বনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস। ৩।২

চতুর্থ অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে কলি ছদ্মবেশে ধারণ করে পদ্মাবতীকে অপহরণ করেছে। এই ঘটনার পিছনে আছে সীতাহরণ কাহিনীর ভাব-অনুষঙ্গ। তবে লঙ্কেশ্বর রাবণ তখনও ধিক্কৃত!

কলি। রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হল—হাসি আসে মুখে। ৪।২

কবি যা ইঙ্গিতে বলেছেন, পদ্মাবতীর নিজের জবানীতে তাই হোল স্পষ্ট।

পদ্মা। হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনাদোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন। ৪।২

বিরহসন্তাপে তাপিত ইন্দ্রনীলও একই ভাববস্তুকে সমৃদ্ধ করেছেন।

রাজা। সখে, এ স্বর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্ নিশাচর চুরি করে্যে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কি কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে আর এমন কেউ নাই? হায়! ৪।৩

আর নাটকের উপসংহারে যখন মিলনপর্ব সুসম্পন্ন হোল, তখন নারদ বলেছেন,

হে মহীপতে, যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন। ৫।২

চিত্রপটে অশোককাননে দুঃখিনী সীতার যে চিত্র নাট্যকার আমাদের দেখিয়েছিলেন, সমগ্র কাহিনীতে সেই চিত্রই 'serialised' হয়েছে।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, কাহিনীর "বাহিরের দিক দিয়া ইহার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থাকিলেও, ইহার অন্তরের আদর্শ দেশীয়।"[২১]

আমরা আর একটু অগ্রসর হয়ে বলতে চাই, বাহিরে গ্রীক পুরাণ, রূপকথা, এবং এমন কি, শকুন্তলা উপস্থিত থাকলেও, অন্তরে রয়েছে রাম-কথা। শুধু সেই রাম-কথা দ্বিতীয় অর্থে স্পন্দিত হয়নি।

অথচ এই রাম-কথা মাইকেলের হাতে এক বীণাযন্ত্র, সপ্তস্বরা। বারংবার বাজাতে বাজাতে একদিন অকস্মাৎ তাঁর অন্তরতম বাণী (যা যুগবাণীও বটে) ঐ যন্ত্রে মুখর হয়ে উঠবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' একদিনের সাধনায় ত সম্ভব নয়। কী জীবনে, কী কাব্যে অলৌকিকতার কোন স্থান নেই! মাইকেল মানতেন, "Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice."

মেঘনাদবধ কাব্যে পৌঁছে কবির কল্পনা তার সঙ্গত ও সার্থক পরিণতি খুঁজে পেল। কিন্তু প্রস্ফুটিত পুষ্প বহুদিনের আয়োজনের পরিণতি। রাম-কাহিনীর এ-পর্ব, ঐ-পর্ব, নানা পর্ব তিনি নানাভাবে বাজাবেন, শেষে অকস্মাৎ রাবণ-প্রসঙ্গ অনন্য বক্তব্যে দীপ্তিময় হয়ে উঠবে।

'পদ্মাবতী' কত অস্ফুট ইঙ্গিতে ভরা! সেই সব অস্ফুট কথাকণিকা নাটকে কি পূর্ণতরভাবে পরিস্ফুট করা সম্ভব ছিল? সম্ভবত নয়। দর্শক হয়ত তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু শুধু সহৃদয় নয়, উজ্জ্বল রসবুদ্ধিসম্পন্ন গুণী পোষ্টার তখনও অভাব।

"So you must not be very severe upon poor me. If spared, perhaps I shall yet do better!"

যে আনুকূল্য তিনি যাজ্ঞা করেছিলেন, তা প্রত্যাখ্যাত হোল।

নাটকের বস্তুবিন্যাসে গ্রীক পুরাণের যে আখ্যায়িকা মাইকেল ব্যবহার করেছেন, তার গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি বলে জনৈক গবেষক নাট্যকারকে ভৎর্সনা করেছেন।

যে মাইকেল গ্রীক পুরাণের অন্তরে রামকথার ইসারাগুলি অলক্ষ্যে বসিয়ে গেছেন, তিনি যে ব্যবহৃত কাহিনীর মর্মন্তুদ পরিণতির কথা জানতেন না, তা নয়।

এ নাটক সেদিন গৃহীত হয়নি, "The play is wellworthy of the author of Shermistha; but you must excuse me, my dear sir, if I still betray a greater leaning towards our favourite Daitya Rajbala." পদ্মাবতী নয়, দৈত্যরাজবালাই তাঁদের কাছে আদরণীয়।

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ যে-মঞ্চে অভিনীত হোত, সেই মঞ্চের জন্যই তিনি এই নাটক লিখেছেন।

অনভিনীত হলেও মাইকেল-প্রতিভার আত্মআবিষ্কারের ইতিহাসে এই নাটকের একটি নিশ্চিত মূল্য আছে। কারণ মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যাটি বাইরে পদ্মাবতী, অন্তরে সীতা।

"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা বৈদেহি।"

এই হোল সেই বৈদেহি-অনুরাগের প্রথম সশঙ্কিত চরণধ্বনি! নাট্যকারকে তত নয়, মাইকেলকে বুঝতে এ ধ্বনি কান পেতে শুনতে হবে বৈকি!

কৃষ্ণকুমারী নাটক

কৃষ্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি নয়, প্রথম মঞ্চস্থ ট্রাজেডি। 'কীর্তিবিলাস' প্রথম বাংলা ট্রাজেডি; কিন্তু সে যুগে 'অনুবাদ'-নাটক মঞ্চস্থ নাটক হোত; কীর্তিবিলাস আদৌ মঞ্চস্থ হয় নি। কৃষ্ণকুমারীও বিলম্বে মঞ্চস্থ হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে কৃষ্ণকুমারী মুদ্রিত হয়, কিন্তু অভিনীত হয় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক।

কৃষ্ণকুমারী নাটক ও মেঘনাদবধ কাব্য একই সময়ে রচিত হচ্ছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের স্বরূপ ব্যাখ্যার জন্য এই সংবাদ স্মরণযোগ্য।

কবি ইতিপূর্বে কয়েকবার বলেছেন যে, তাঁর কলম সাহিত্যের অন্য অঙ্গনে খঞ্জ নয়।

"As for me, excuse my vanity, I think I have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will you answer at the Bar of Posterity?"

তাঁরা ভাবছেন সাময়িক আনন্দের কথা, আর মধুসূদন ভাবছেন ভবিষ্যত কালের কথা।

'রিজিয়া' নাটকের কাহিনীর চুম্বক প্রস্তুত; ইংরেজি 'রিজিয়া' বহুপূর্বেই রচিত হয়ে গেছে।

কেশব গাঙ্গুলি মশাই 'রিজিয়ার' কথাবস্তু পছন্দ করলেন না; "the Mohamedan names will not perhaps hear well in a Bengali drama" তিনিই রাজপুত-ইতিহাস ঘাঁটতে পরামর্শ দিলেন। "By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs?"

তারপর চলল অন্বেষণ; নাট্যকার স্বয়ং জানাচ্ছেন "For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about I A. M. last saturday, the muses smiled!"

তবু সমালোচক লেখেন যে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনীর সন্ধান পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধে! (স্মৃ. সে. পৃ. ৫৮)

বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর কাছে লিখিত চিঠিতে মধুসূদন জানাচ্ছেন, "...I have been dramatising, writing a regular tragedy in—prose! That plot is taken from Tod vol I, *P*. 461".

৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাটক লেখা শেষ হয়ে গেল। একই সময়ে চলছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা। নাট্যকার নাটকের অভিনয় ও তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের জন্য আর সময় দিতে পারছেন না। "Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into heroic poetry."

মধ্যযুগের প্রায় অবসানকালের এক পারিবারিক কাহিনী নিয়ে এই নাটক রচিত। ঘটনাচক্রে এক বিশেষ পারিবারিক কাহিনী দুই দেশের অন্তর্কলহের

রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে কাহিনীটি সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়; সেই বিলীয়মান মধ্যযুগের ক্ষমতাদ্বন্দ্বের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে। মাইকেল ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক লিখতে বসেন নি। ঐতিহাসিক নাটক লিখতে বসেছেন।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "ইতিহাসকাহিনীর সহিত নাটককাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ। তাই কৃষ্ণকুমারীকে পুরাপুরি ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না"।[২২]

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'রাজসিংহ' যে অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কৃষ্ণকুমারী সেই অর্থে ঐতিহাসিক নাটক নয় কেন?

মধুসূদন মূলকাহিনীর ঐতিহাসিক উপাদান অবিকৃত রেখেছেন। কিন্তু এই কাহিনীকে নাটক করতে গিয়ে যা যা করনীয়, তিনি তা সব-ই করেছেন।:

প্রথম অঙ্কে আমরা দেখতে পাই জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহ রাজকার্যে আদৌ মনোনিবেশ করতে চান না; মন্ত্রী নানা কাজের কথা উত্থাপন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। রাজা অত্যন্ত বিলাসী; তাঁর সর্ব লাম্পট্যে ও বিলাসলীলায় সঙ্গী হোল ধনদাস, সে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পট দেখিয়ে রাজাকে উত্তেজিত করল। ধনদাস অর্থলোলুপ; পট বিক্রয়ের নাম করে অনেক অর্থ আত্মসাত করল। জগৎসিংহ উদয়পুরের রাজকন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এবিষয় পত্র লেখার জন্য মন্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন; মন্ত্রী বললেন, রাজকুমারীর সঙ্গে মরুদেশের বর্তমান অধিপতি মানসিংহের বিবাহ স্থির হয়ে আছে। রাজা এ সংবাদে দমলেন না; তাঁর ধারণা মানসিংহ আদৌ সুপাত্র নয়; আর তাছাড়া তিনি হলেন উপগত্নীর দত্তক পুত্র। মন্ত্রী রাজাকে সতর্ক করে বললেন, এ সময়ে গৃহবিবাদ করা যুক্তিসঙ্গত নয়; বিশেষ করে যখন দেশবৈরিদল চতুর্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে। রাজা সে কথা কানে তুললেন না; তিনি ধনদাসকে উদয়পুরে দূত হিসাবে পাঠাবার নির্দেশ দিলেন; ধনদাসকে বিশ সহস্র মুদ্রা এবং একটি অঙ্গুরীয় দান করলেন।

জগৎসিংহের বিলাসবতী নামে এক রক্ষিতা ছিল। এই বিলাসবতীকে ধনদাসই অর্থের লোভ দেখিয়ে ধর্ম নষ্ট করে, পরে রাজার পণ্যা নারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ধনদাস বিলাসবতীর গৃহে এলে বিলাসবতী অভিযোগ করল। তখন তাকে সে বোঝাল যে, তার উপকারের জন্যই উদয়পুর যাচ্ছে। বিলাসবতীর এক পরিচারিকা ছিল; তার নাম মদনিকা। সে খুবই বুদ্ধিমতী, সে ধনদাসের ফন্দি ধরে ফেলেছে। ধনদাসকে সে উচিত শিক্ষা দেবে এইরূপ মনস্থ করল।

উদয়পুর রাজগৃহে উদয়পুরের পটেশ্বরী অহল্যাদেবী, ও জনৈকা তপস্বিনীর মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। সেই কথাবার্তা থেকে জানা গেল যে কৃষ্ণার যৌবন-কাল উপস্থিত, এখনই বিবাহ দেওয়া সঙ্গত। রাজা বড়ই বিব্রত ; তার কারণ এই মাত্র মহারাষ্ট্রঅধিপতিকে ত্রিশলক্ষ মুদ্রা উৎকোচ দিয়ে সন্ধি ক্রয় করতে হয়েছে। তপস্বিনী রাজার কাছে কৃষ্ণার বিবাহ প্রসঙ্গ তুললেন। রাজা বললেন, তার জন্য ব্যস্ত হবার কি আছে। রাণী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, কৃষ্ণা এখন পনেরো বৎসর বয়সে পা দিয়েছে। তপস্বিনী কৃষ্ণাকে দেখতে চাইলে তাকে ডেকে আনা হোল। সবাই যখন নানা প্রসঙ্গে আলাপ করছেন, তখন আবার দুন্দুভিধ্বনি হোল। দুন্দুভিধ্বনিতে রাজা প্রমাদ গনলেন ; কিন্তু ভৃত্য জানাল যে, অমঙ্গলজনক কিছু ঘটেনি ; জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ এক দূত প্রেরণ করেছেন। রাজা বললেন, জয়পুরের অধিপতি আমার পরমাত্মীয়। তিনি রাজসভার উদ্দেশে চললেন।

ধনদাস যেমন উদয়পুরে এসেছে, মদনিকাও তেমনি উদয়পুরে এসে পৌঁছেছে। নাম নিয়েছে মদনমোহন। তার মুখ থেকেই জানা গেল তার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা। সে বিলাসবতীর দাসী ; বিলাসবতীর ইচ্ছা সফল করতে এসেছে। বিলাসবতীর ইচ্ছা নয় যে, আদৌ এই বিবাহটা সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণকুমারীর নাম জাল করে রাজা মানসিংহের নামে সে একখানা পত্র লিখেছে। পত্রখানা এমন কৌশল করে লেখা হয়েছে যে, তা পাওয়া মাত্র মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। ধনদাস দৌত্য করতে গিয়ে শুনল যে, রাজা জগৎসিংহ যে বিলাসবতীর বাধ্য, তা এখানকার রাজা জানেন। ধনদাস বললেন, ধনীদের এরকম দোষ থেকেই থাকে। এদিকে মদনিকা মদনমোহন বলে নিজের পরিচয় দিয়ে ধনদাসকে বলল, যে, সে বিলাসবতীর কাহিনী জানে ; দরকার হলে রাজমহিষীকে খবরটা জানিয়ে দেবে। তবে ধনদাস যদি হাতের অঙ্গুরীয়টি দান করে তবে সে বলবে না। তখন ধনদাস কি আর করে ? এত সাধের অঙ্গুরীয়টি মদনিকাকে দিয়ে ফেলল।

মদনিকা মরুদেশের মানসিংহের দূতী হয়ে কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে দেখা করে বললে যে, তাদের মহারাজা রাতদিন কেবল কৃষ্ণার কথাই ভাবছেন। কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কয় রাণী ? তখন মদনিকা জানালেন যে তাঁর এখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি ; এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন, কৃষ্ণা না পেলে তিনি আর বিবাহ

করবেন না। মদনিকা রাজার রূপ বর্ণনা করে বললে যে, তিনি সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজকুমারীকে জানাল সে যে রাজার একখানা পট কৃষ্ণকুমারীকে দেখাবে। কৃষ্ণকুমারী অসামান্য সুন্দরী; এই রমণীরত্নকে দেখলে যে মহারাজা জগৎসিংহ আর বিলাসবতীর প্রতি অনুরক্ত থাকবেন না, এ বিষয়ে মদনিকার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। তাই সে সঙ্কল্প করল, কৃষ্ণার মন রাজা মানসিংহের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। "নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে আর কি কোন দিকে ফেরে?" রাণা ভীমসিংহ ও রাণী অহল্যাদেবী ও তপস্বিনী যখন কৃষ্ণার বিবাহ প্রসঙ্গে রাজা জগৎ সিংহের দূতের আগমন নিয়ে আলোচনা করছেন, তখন জনৈক রাজভৃত্য এসে জানাল যে, মরুদেশের রাজা মানসিংহ রাজ সম্মুখে দূত পাঠিয়েছেন।

এদিকে মদনিকা কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের পট এনে দেখাল; এই চিত্রপট দেখে কৃষ্ণা মুগ্ধা হোল। মদনিকার ফাঁদে কৃষ্ণকুমারী ধরা দিতে চলেছেন।

তৃতীয়াঙ্কে দেখতে পাই কৃষ্ণকুমারীর জাল চিঠি পেয়ে মানসিংহ রাজকন্যার প্রতি ভীষণ অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। মদনিকা এ সব খবর জানলো মরুদেশের দূতের কাছ থেকে; মদনিকা এই পত্রের কথা গোপন রাখতে তাকে পরামর্শ দিল। মরুদেশের দূতকে ধনদাসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করল। সে নাকি বলে বেড়ায় যে মহারাজা মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তকপুত্র মাত্র; তিনি মরুদেশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নন।

মস্ত একটা গোলযোগ সে বাধিয়ে দিয়েছে, এটা মদনিকা বুঝতে পারছে, এবং এতে সে খুশিও। কিন্তু তার ভাবনা হোল, পাছে রাজকুমারী কৃষ্ণার কোন ক্ষতি হয়। ধনদাসের সঙ্গে মানসিংহের দূতের সাক্ষাৎ হলে উভয়ের মধ্যে খুব কলহ হোল।

ধনদাস মদনমোহনের কাছে সেই অঙ্গুরীয়টির বিষয়ে প্রশ্ন করল; উত্তরে সে জানাল যে এই নগরে মদনিকা নামে একটি বেশ্যা বাস করে, তাকে সে ঐ অঙ্গুরীয়টি দিয়েছে।

কৃষ্ণকুমারীর অন্তরের কথা তপস্বিনী জানতে পেরেছেন; তপস্বিনী আবার সে খবর রাণীকে জানালেন।

রাজা বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছেন: কারণ জগৎ সিংহ তাঁদের পুরাতন বন্ধু। অধিকন্তু তাঁর দূত পূর্বাহ্নে এসে পৌঁছেছে। এদিকে মরুদেশের রাজা মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন; এবং তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের অধিপতি, মানসিংহের পক্ষে তিনি অনুরোধ জানাচ্ছেন। এক্ষেত্রে যাঁকে কন্যা দান না করা

হবে, তিনিই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। রাণা ভীম সিংহ প্রশ্ন করলেন, প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্বনাশ কর্ত্তে এসেছে? ...আমার হৃদয়নিধি যে আমার সর্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজার এই বাক্যে রাণী অহল্যা অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। রাজা তাঁকে প্রবোধবাক্য শোনালেন।

এদিকে কৃষ্ণকুমারী ধীরে ধীরে মানসিংহকে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে ফেলেছে। একদিন রাজউদ্যানে ভ্রমণকালে সে আকাশে কোমল বাদ্য শুনল, ও মূর্চ্ছাগত হোল। মূর্চ্ছাগত অবস্থায় সে যেন দেখতে পেল স্বর্ণ মন্দিরে এক কমল-আসনে সে বসে রয়েছে; কোন পরমা সুন্দরী নারী একটি পদ্ম হাতে করে তার সম্মুখে এসে তাকে প্রণাম করতে বললেন, এবং জানালেন যে, তিনি হলেন এই কুলেরই বধূ, নাম পদ্মিনী। তিনি বললেন, যে-যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা করে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।

কৃষ্ণার মুখে এই কথা শুনে সবাই খুব শঙ্কিত হলেন। রাজা জগৎসিংহ মন্ত্রীর মুখে শুনলেন যে রাণা ভীমসিংহ তাঁর কন্যাকে রাজা মানসিংহের হস্তে সম্প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রী আরও জানালেন যে, এ সবই ধনদাসের চক্রান্ত। একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে কিছু অর্থ রোজগার করাই তাঁর মতলব। রাজা জগৎসিংহ বিশেষ ভাবে অপমানিত বোধ করলেন; তিনি বললেন, আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তাহলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল বলে মনে করবে। ধনদাস যে তাঁর বহু কুকীর্তির প্ররোচক, এ বিষয়ে তিনি অবহিত। কিন্তু ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে অপমান হজম করতে তিনি পারবেন না। রাজা জগৎ সিংহের কাছে ধনদাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে। রাজা তার মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চূণকালি মাখিয়ে, দেশান্তরী করে দেবার আদেশ দিলেন।

রাজা জগৎ সিংহ সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করে যুদ্ধযাত্রা করলেন। ধনদাসের কষ্ট দেখে মদনিকার মন গ'লে গেল। সে তাকে তার অঙ্গুরীয়টি ফিরিয়ে দিল, এবং ধনদাসকে সে-ই যে নাকানি-চুবানি খাইয়েছে, মদনমোহন যে আসলে মদনিকা, এ সব খবর জানাল।

রাজা মানসিংহ কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী। রাণা ভীম সিংহ তাঁর কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না। ভীম সিংহকে মন্ত্রী

একখানা পত্র দিলেন ; তাতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার পরামর্শ দেওয়া হোল। বলেন্দ্রসিংহ ও ভীম সিংহ কেউ-ই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। মন্ত্রী যুক্তি দিলেন, যিনি নরপতি, তিনি প্রজাকূলের পিতাস্বরূপ। একজনের মায়ায় কি শত সহস্র জনের প্রাণনাশ করা উচিত? বলেন্দ্রসিংহ হলেন কৃষ্ণকুমারীর খুল্লতাত ; মন্ত্রী তাঁর অভিমত কি জিজ্ঞাসা করলেন। দারুণ মানসিক যন্ত্রনায় রাজা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

কৃষ্ণকুমারীর প্রাণ নাশের দায়িত্ব রাণা ভীমসিংহ বলেন্দ্রসিংহের ওপর অর্পণ করলেন। মন্ত্রী এসে সেই নির্দেশ তাঁকে জানালেন। বলেন্দ্রসিংহ রাজার চরণ স্পর্শ করে শপথ নিলেন যে এই কর্তব্য তিনি পালন করবেন। বলেন্দ্র সিংহ প্রস্থান করলে ভীমসিংহ অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হলেন। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেল।

বলেন্দ্র কৃষ্ণকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। রাজকন্যা তখন শয্যাগত ছিলেন। বলেন্দ্র সিংহ যখন অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত হয়েছেন, তখন সহসা কৃষ্ণ-কুমারী গাত্রোত্থান করলেন। রাজকুমারীর প্রশ্নে বলেন্দ্র সিংহ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। কৃষ্ণকুমারী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে বলেন্দ্রসিংহ তাঁকে হত্যা করতে এসেছিলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি রাজপুত্রী, মৃত্যুভয় তাঁর নেই। এই সময় ভীমসিংহ ঐ গৃহে প্রবেশ করলেন। রাজা তখন উন্মাদ-প্রায়। এমন সময়ে আবার রাজকন্যা শুনতে পেলেন আকাশে সেই রকম কোমল বাদ্য এবং পদ্মিনীর আহবান। তিনি সকলের কাছে বিদায় প্রার্থনা করলেন। এবং সবার অলক্ষ্যে খড়্গ দিয়ে স্বীয় বক্ষে আঘাত করলেন। তখন তপস্বিনী ও রাণী সেইকক্ষে প্রবেশ করলেন ; সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উদয়পুরের রাজকন্যা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কন্যার শোচনীয় মৃত্যুতে রাণী অহল্যা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হলে তিনি রাজাকে ভৎর্সনা করে স্থান ত্যাগ করলেন ; কিছুক্ষণ পরে সংবাদ পাওয়া গেল তিনিও পরলোকগমন করেছেন।

বলেন্দ্রসিংহ শোকপ্রকাশ করতে লাগলেন।

আর রাণা ভীমসিংহ তখন সম্পূর্ণ উন্মাদ।

ইতিহাস : রাজনীতি : কৃষ্ণকুমারী

এই হোল নাটকের কথাবস্তু। ইতিহাসের আখ্যায়িকার সঙ্গে নাটকের আখ্যায়িকার প্রধান গরমিল দেখা দিয়েছে—ধনদাস-মদনিকার ভূমিকায়।

রাজা জগৎ সিংহের এক গণিকা ছিল; তার নামও ইতিহাসে আছে। কিন্তু মদনিকা-ধনদাসের বিবরণ নাট্যকারের নিজস্ব সৃষ্টি।

মূল কাহিনীতে নাট্যকার কিছু কিছু নতুন সংযোজনা করেছেন। বলেন্দ্র সিংহ তাঁরই সৃষ্ট; রাণী অহল্যাদেবী ও তপস্বিনী ঐতিহাসিক প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসেননি।

মাইকেল রাজনীতিক বিষয় ভালই বাসতেন; তাঁর প্রথম নাটক 'রিজিয়া' রাজা-উজিরের গল্প; শর্মিষ্ঠা-পদ্মাবতীতে রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক সবাই আছে। আসলে সে যুগের দর্শকেরা মঞ্চের ওপর রাজা-উজির দেখতে পছন্দ করত। মাইকেল সে পছন্দের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি সেই রাজনীতিক কাঠামোকে উদারতায় ভরে দিলেন; রাজনীতির উৎকণ্ঠা থেকে বড় করলেন মানবিক উৎকণ্ঠা।

রাণা ভীমসিংহ ও জগৎ সিংহ উভয়েই ঐতিহাসিক চরিত্র; কিন্তু ইতিহাস তাঁদের সব আচরণের সাক্ষ্য দেয় না। মাইকেল বলছেন, "I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow ; Bheem Sing as a sad, serious man." ইতিহাস থেকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাদের শুধু ইতিহাসসম্মত আচরণে বেঁধে রাখেননি। রাণা ভীমসিংহ উদয়পুরের রাজা, কিন্তু রাজত্বের খুঁটিনাটি প্রশ্ন নিয়ে নাটক পরিপূর্ণ হয়নি।

"For you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader."

তিনি রাজনীতির উত্তেজক ঘটনাবলী দিয়ে দর্শকের চোখ ঝলসে দিতে চাননি। বলেন্দ্রসিংহ বলেছিলেন, "মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" কিন্তু সে প্রাণ কাতর হয়েছে স্নেহদুলালী কৃষ্ণার জন্য সব চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক কার্যকলাপ অপেক্ষা মানবিক কার্যকলাপের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানেই এই নাটকের সার্থকতা।

হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের বাহ্য সমস্যা হোল রাজনৈতিক; কিন্তু উক্ত নাটকদ্বয়ে নায়ক দুজনের অন্তর্দ্বন্দ্বই দর্শককে বিচলিত করে। এখানে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিতান্তই সামান্য ব্যাপার; এমন কি, সেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক

নাটকে ইতিহাস-আনুগত্য পুরোপুরি রক্ষা করা হলেও রিচার্ডচরিত্র রাজনৈতিক কারণে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। যতটা সে সাধারণ মানুষ, ততটাই সে আকর্ষণীয়। মূলত রাজনৈতিক চরিত্র হলেও তাদের একটা অন্তর-জীবন আছে। এবং নাট্যকার সেখানে আমাদের উঁকি দেবার সুযোগ দিয়েছেন।

মাইকেল ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক আর লেখেননি; ইংরেজিতে 'রিজিয়া' অবশ্য আছে। সেখানেও তাঁর ঔৎসুক্য রাজনীতি অপেক্ষা মানবহৃদয়ের প্রতি বেশি ধাবিত হয়েছে। আরও একটু গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক জীবনে যাঁরা বিফল, তাঁদের প্রসঙ্গেই তাঁর সহানুভূতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

ইতিহাসের সৌগন্ধ্য রক্ষা করা কষ্টকর ব্যাপার। লণ্ডনের এক নাট্যশালায় 'জুলিয়াস সিজারে'র অভিনয় দেখে ফরাসী দার্শনিক ভলটেয়ার বলেছিলেন, যারা মঞ্চে কথাবার্তা বলছে, তারা রোমবাসী নয়; তারা অতীত যুগের চাষী, কোন ভাটিখানায় বসে ষড়যন্ত্র করছে। যে-সিজার এক পাত্র মদ্য পান করবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, তিনিও সিজারের মত নন। সব ব্যাপারটিই গাঁজাখুরী।

অর্থাৎ ইতিহাসের কুশীলবদের নিয়ে নাটক লিখলে তাদের মধ্যে বিশ্বাস-যোগ্যতা আনতে হবে।

মাইকেল রাজপুত চরিত্রকে বাঙ্গালী করে তুলেছেন, এই রকম অভিযোগ কেউ করেন নি। রাজপুত ইতিহাসের রাজপুত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেই সর্বজনীন আবেদনের প্রকাশ ঘটাতে হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আকর্ষণ হোল মুখ্যত রাজনৈতিক; তিনি দেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন, মাইকেল নাটকই কেবল রচনা করতে চেয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে চরিত্রগুলি তত প্রয়োজনীয় নয়, প্রয়োজনীয় হোল সেই আদর্শ, যার জন্য তারা লড়ছে। মাইকেল মানবিক কারণেই কেবল তাদের প্রসঙ্গ বলেছেন। উনিশ শতকের নীতিবাগীশ পরিবেশে, এবং রাজ-নারায়ণ বসুর এক বন্ধুর পক্ষে এই নিস্পৃহ শিল্পদৃষ্টি হোল অন্যতম আশ্চর্য ঘটনা।

কৃষ্ণকুমারীর প্লট

ইতিহাস থেকে গৃহীত কথাবস্তুতে তিনি নতুন সাজ দিয়েছেন। পূর্বতন নাটকের মত সরল পথে এই নাটক চলে নি; এবার প্লট জটিল পথ

ধরেছে। পূর্বতন নাটকে গল্প ছিল একটি মাত্র; এই নাটকে দুইটি গল্প আছে। বিলাসবতী-ধনদাস-মদনিকার প্রসঙ্গ হোল সেই দ্বিতীয় গল্প; কিন্তু স্বতন্ত্র গল্প নয়। মুখ্য কাহিনীর পাশাপাশি একটি উপকাহিনী বাংলা নাটকে এই প্রথম দেখা দিল। মাইকেল এই উপকাহিনী এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—"The জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. It gives her the name as the "essence of camphor"; I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a *fine contrast* to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—as she should have her 'familiar' or সখী"

নাটকের প্লট দুইভাবে সাজান যায়—ঘটনামুখী ক'রে; না হয় চরিত্রমুখী করে। মাইকেল চরিত্রমুখী করে ঘটনাকে সাজিয়েছেন; তাই উপকাহিনীরও লক্ষ্য হোল "Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine." নায়িকাচরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিলাসবতী ও মদনিকার সৃষ্টি। যে নাটকে জীবন্ত চরিত্রের মেলা থাকে, সে-নাটকের প্লট আর সময়ের মুঠোয় বন্দী হয় না। কৃষ্ণকুমারীর প্লট দেশপ্রেমের চুল্লিতে বড় বড় বুলির শুকনো কাঠ জোগান দেয় নি; অথচ তার সুযোগ ছিল। উদয়পুরের ওপর মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণ নিশ্চয়ই জাতীয় প্রতিরোধের রূপ পরিগ্রহ করতে পারত। দ্বিতীয়াঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে রাণা ভীম সিংহের মুখ থেকে আমরা স্বদেশপ্রেমসূচক একটি উক্তি শুনতে পেয়েছি :—

"ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতির, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখন অব্যাহতি পাবো?"

কিন্তু দেশপ্রেম নয়, কিছুক্ষণ পরে কুল ও বংশের সম্মান বড় হয়ে পড়ল। তারপর বড় হয়ে দেখা দিল কুলমান নয়, পিতৃহৃদয়। নাটকের শেষাংশ পিতা ভীম সিংহের আর্তনাদে নিনাদিত; রাণা ভীম সিংহ তখন অবলুপ্ত।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গকে তত গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য সে-যুগে তাঁকে সমালোচিত হতে হয়েছিল।

প্লটগঠনে কালগত ও স্থানগত ঐক্য তিনি কতটা রক্ষা করেছেন, এটা একটা প্রশ্ন। শর্মিষ্ঠায় কালগত ঐক্য খুবই ব্যাহত হয়েছিল; পদ্মাবতীতে এই ঐক্য অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত; কৃষ্ণকুমারী নাটকে আরও অগ্রগতি দেখা যায়। "A word about the scenes :—I am very fond of varied scenes ; and as for the French idea of not allowing one set of actors to refine and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve 'unity of place' and as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time."

কালগত ঐক্য সম্বন্ধে হয়ত নাট্যকারের মনে একটু সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু মাস-বৎসর গুণে কালের হিসাব করা অর্থহীন। কৃষ্ণকুমারীর মর্মন্তুদ পরিণতি একদিনের ব্যাপার নয়। সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা আছে। প্রথমাঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে ধনদাসের চক্রান্তে নাটকের যবনিকা প্রথম উন্মোচিত হোল; আর সব জটিলতার অবসান হোল কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যায়।

১ম অঙ্কে দুইটি গর্ভাঙ্কই একদিনে ঘটেছে; ২য় অঙ্ক ও ৩য় অঙ্ক একদিনে ঘটেছে। ৪র্থ অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্ক থেকে ২য় গর্ভাঙ্কের মধ্যে তিন দিনের ব্যবধান। ২য় ও ৩য় গর্ভাঙ্কের ঘটনা একদিনে ঘটেছে। পঞ্চম অঙ্ক খুবই ঘন সংহত। তিনটি গর্ভাঙ্কই একদিনের মধ্যে ঘটেছে। তবু বলব, সময় কতটুকু লেগেছে, এটা বড় প্রশ্ন নয়। ঘটনার গতি কখনও ব্যাহত হয় নি, সেটাই বড় কথা। ব্যাহত হয় নি বলেই ঐক্য অব্যাহত আছে।

মধুসূদন বলেছেন প্রত্যেক অঙ্কে স্থানগত ঐক্য অটুট আছে। এই দাবী অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রথমাঙ্কে দুইটি গর্ভাঙ্ক, দুইটির ঘটনাস্থল জয়পুর; দ্বিতীয়াঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক, তিনটিই ঘটেছে উদয়পুরে। তৃতীয়াঙ্কের ঘটনাস্থল উদয়পুর; চতুর্থাঙ্ক ও পঞ্চমাঙ্কের ঘটনাস্থল উদয়পুর। কখনও রাজগৃহ, কখনও উদ্যান, কখনও নগরতোরণ, কখনও একলিঙ্গ দেবের মন্দির। প্রথম অঙ্ক ব্যতীত আর সব কয়টি অঙ্ক ঘটেছে উদয়পুরে। শর্মিষ্ঠায় কালগত ব্যবধান এত বেশি যে, স্থানগত ব্যবধান অপেক্ষাকৃত কম থাকলেও সেটা চোখে পড়ে। শর্মিষ্ঠায়

১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল হোল হিমালয় পর্বত, ২য় গর্ভাঙ্কের ঘটনাস্থল হোল দৈত্যদেশ। এখানে একই অঙ্কে স্থানগত পার্থক্য বড় প্রকট। ২য় অঙ্ক থেকে ৫ম অঙ্কের সব ঘটনা ঘটেছে প্রতিষ্ঠানপুরীতে। পদ্মাবতী নাটকে ১ম অঙ্ক ঘটেছে বিন্ধ্যগিরিতে; ২য় ও ৩য় অঙ্কের সব কয়টি গর্ভাঙ্কই মাহেশ্বরী পুরীকে আশ্রয় করেছে। চতুর্থ অঙ্কে এই নীতি বিঘ্নিত হয়েছে। ১ম গর্ভাঙ্কে বিদর্ভনগর, ২য় গর্ভাঙ্ক পর্বতশিখরস্থ গহনকানন, ৩য় গর্ভাঙ্ক আবার বিদর্ভ-নগরে ফিরে এসেছে। ৫ম অঙ্ক আবার নতুন ঘটনাস্থল বেছে নিয়েছে। ৫ম অঙ্কের ঘটনাস্থল হোল শচীতীর্থ।

কৃষ্ণকুমারী নাটকে একটি সুনির্দিষ্ট নীতি আছে; শর্মিষ্ঠার ১ম অঙ্কের মত ঘটনাকে একই অঙ্কের ভিতরে নানাস্থানে ছুটাছুটি করান হয়নি। বা পদ্মাবতীর মত একই অঙ্কে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাস্থল বেছে নেওয়া হয়নি।

কাজেই 'ঐক্য' ব্যবহারে এখানে যে নিশ্চিত অগ্রগতি ঘটেছে, এ বিষয়ে সংশয় করা চলে না।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্লটের দ্বিমুখীনতা লক্ষ্য করবার। প্লটের এই দ্বিমুখীনতার ফলে কৃষ্ণকুমারী ইফিগেনেয়া থেকে সরে এল। নাটকের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে মদনিকা-ধনদাসের বিবরণ। অথচ এই বিবরণ একবারও স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী হয়ে দেখা দেয় নি। তার কারণ গৌণ গল্পের খুঁট সব সময় মুখ্য গল্পের হাতে ধরা ছিল।

ধনদাসের চক্রান্তে নাটকে ঘটনার নানা উন্মোচন ঘটেছে; আর সেই চক্রান্তকে প্রতিহত করতে গিয়ে মদনিকার লীলাখেলা। আর তারই ফলে কৃষ্ণকুমারীর পানি গ্রহণের জন্য দুইজন দাবীদারের উপস্থিতি।

গৌণ কাহিনী শেষ পর্যন্ত মুখ্য কাহিনীর পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। এবং দুই ধারা শেষ অঙ্কে এসে এক বেণী হয়ে দেখা দিয়েছে। শর্মিষ্ঠা নাটক বা পদ্মাবতী নাটক একটি কাহিনীকে সম্বল করেছে বলে অধিকতর সংহত, একথা বলা চলে না। বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য, তার আস্বাদ আলাদা। শুধু সমাজজীবনে নয়, সাহিত্যেও।

মাইকেল নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য একই সুরে গাঁথেন নি। ১ম অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে যদিও একটি মতলব হাসিল করার চেষ্টা হচ্ছে, তবু বলবার ভঙ্গিটা খুবই তরল। ২য় গর্ভাঙ্কে সুর অপেক্ষাকৃত গম্ভীর।

তেমনি ২য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্ক বেশ গম্ভীর। যদিও ২য় গর্ভাঙ্কে ছদ্মবেশী মদনিকার কার্য্যকলাপের ফলে অনেক কুঘটন ঘটবে, কিন্তু সুর হালকা, পরিহাস-বিজড়িত।

চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত এই ভাবে কখনও হালকা, কখনও গম্ভীর সুরে নাটক এগিয়েছে; কিন্তু পঞ্চম অঙ্কে নাটক এক মুহূর্তের জন্য তার গম্ভীর ভাব বর্জন করে নি; বরং পঞ্চম অঙ্ক সমগ্রভাবে একটানা আর্তনাদের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বারংবার সুরের পরিবর্তনে নাটকের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় সর্বপ্রথম দৃশ্যপটের সুচারু ব্যবস্থা হয়। এবং দৃশ্যভেদে নেপথ্য যন্ত্রসঙ্গীত ও দৃশ্যপটের পরিবর্তন সাধিত হোত, আলোকের তারতম্য প্রদর্শিত হোত। এই সব পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাট্যকার দৃশ্যভেদে নাটকের বক্তব্যে পরিবর্তন এনেছেন।

চরিত্রাবলী

কৃষ্ণকুমারী নাটকে চরিত্রসংখ্যা কম নয়; এক সঙ্গে দুইটি কাহিনী থাকার ফলে চরিত্রের সংখ্যা বেড়েছে। মুখ্য কাহিনীতে রাণা ভীম সিংহ, রাণী অহল্যাদেবী; বলেন্দ্র সিংহ, তপস্বিনী ও কৃষ্ণকুমারী হোল উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এছাড়া সত্যদাস (মন্ত্রী) ভৃত্য, দূত, রক্ষক প্রভৃতি আছে। উপকাহিনীতে আছে রাজা জগৎ সিংহ, ধনদাস, মন্ত্রী, বিলাসবতী, মদনিকা।

এই দুই কাহিনীর কুশীলবদের বাসস্থান পৃথক; কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর বিবাহকে কেন্দ্র করে এই দুই স্থানের লোকের মধ্যে পারস্পরিক আনাগোনা শুরু হবে। ফলে নাটকের চরিত্রগুলি পরিবর্তিত না হোক, নাটকের ঘটনার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হবে; এবং সেই গতি একটা নির্দিষ্ট পরিণতি খুঁজে পাবে। বিজ্ঞানে বিদ্যুতের জন্ম ব্যাখ্যায় যেমন friction অপরিহার্য, নাটকের চরিত্রগুলির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুটনে তেমনি পারস্পরিক সংঘর্ষ আবশ্যক।

ভীম সিংহ-দুহিতা কৃষ্ণকুমারী ইতিহাসের সন্তান, কিন্তু নিছক একটি ঐতিহাসিক চরিত্র নয়—"the princess, I hope, is dignified yet gentle." শর্মিষ্ঠায় ও পদ্মাবতী নাটকে নাট্যকার যে দুটি প্রধানা নারী চরিত্র উপস্থাপিত করেছিলেন, তাঁরাই যেন আরও সুসঙ্গত ও সুস্পষ্ট রূপ পেয়ে কৃষ্ণকুমারী হয়েছেন। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রের এই নম্র স্নিগ্ধ অভিজাত আচরণ আধুনিক ও অনাধুনিক দুই যুগের প্রভাবজাত।

মাইকেলের সমগ্র সাহিত্যে দুই জাতীয় নারীচরিত্রের প্রাধান্য ; শর্মিষ্ঠা আর দেবযানী হোল তাদের প্রতিনিধি। তাঁর সাহিত্যপ্রয়াসে সকল পর্বে এই দুই চরিত্র ঘুরে ফিরে নানা আকারে দেখা দিয়েছে। এক জাতীয় চরিত্র শান্ত ও ভদ্র; সম্ভ্রমসূচক তাদের আচরণ। অপর একজাতের চরিত্র হোল তৎপর, গর্বিতা ও প্রভুত্বপ্রয়াসিনী।

আলোচ্য নাটকে শুধু প্রথমোক্ত শ্রেণীর চরিত্রই স্থান পেয়েছে। আর আছে এই দুয়ের মধ্যবর্তী এক ভিন্ন জাতের নারী। এরা প্রাণোচ্ছল, বুদ্ধিমতী অথচ পরদুঃখকাতর। মদনিকা এই শ্রেণীর চরিত্র।

রাণা ভীম সিংহ এই নাটকের প্রধান চরিত্র; প্রচলিত নাটকের মত নায়িকার প্রেমিক এখানে নায়ক হয়নি।

নাট্যকার বলেছেন তিনি চেষ্টা করেছেন ভীম সিংহকে '**as a sad serious man**' রূপে চিত্রিত করবার। প্রথম আবির্ভাব-মুহূর্তেই তাঁর এই বিমর্ষ রূপ আমাদের চোখে পড়েছে। মঞ্চে আবির্ভাবকালে তাঁর প্রথম স্বগতোক্তি হোল খেদসূচক:

"হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে!"

তপস্বিনীর প্রশ্নের উত্তরে ঐ একই গর্ভাঙ্কে শঙ্কাপীড়িত রাণা বলছেন:

"ভগবান একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এরপর থাকবেন কিনা, তা বলা দুষ্কর।"

ঐ একই সময়ের রচনা হোল 'মেঘনাদবধ কাব্য'; সেখানেও রাবণের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথম সর্গে কবি বলেছেন:

এহেন সভায় বসে রক্ষ: কুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে।
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে।

রাণা ভীম সিংহ প্রথম থেকে বিমর্ষ, দুঃখভারাক্রান্ত ও শংকিত; এই শংকা রাজ্য ও প্রজাপুঞ্জের শান্তি ও কল্যাণের জন্য। রাবণও বিচলিত হয়েছেন 'রাক্ষসকুলের মান' রক্ষার জন্য। এই নাটকে রাবণ-প্রসঙ্গ একবারও উচ্চারিত হয় নি; কারণ রাবণ হাজিরা দিয়েছেন ভীম সিংহের বুকের মধ্যে। স্নেহ আর সম্মানবোধের বিরোধে তিনি ক্ষতবিক্ষত। তবে মেঘনাদবধ কাব্যে

রাবণ গভীর শোকের সময়ও প্রকৃতস্থ ছিলেন ; আর ভীমসিংহ উন্মাদ হয়ে গেলেন। অথচ স্রষ্টার যেমন রাজা লিয়ার সম্বন্ধে বলেছিল—"O ruined piece of nature." ভীম সিংহ সম্পর্কে আমরা তেমনি উক্তি করতে পারি না। তুলনায় ভীম সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব যত বিবৃত, ততটা নাট্যায়িত নয়। রাবণ অধিকতর শক্তিময় পুরুষ।

তার জন্য দায়ী রাণী অহল্যাদেবী —"The Queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bhim Sing cannot but be sad and grave." রাণী অহল্যাদেবীকে প্রথম থেকেই রাজার প্রতিচ্ছায়া করে আঁকা হয়েছে। তিনি যদি ভিন্ন-প্রকৃতির নারী হতেন, তিনি তাঁর মাতৃত্বের আদিম বৃত্তিকে যদি পত্নীত্বের ওপর স্থান দিতেন, গ্রীক জননীর হৃদয় গ্রহণ করতেন, তাহলে নাটকের আয়তন (dimension) বেড়ে যেত। অহল্যাদেবী সাধারণ হিন্দু কুলস্ত্রী মাত্র হলেন ; আমাদের যাত্রা পাঁচালীর সুনীতি (ধ্রুবজননী), কয়াধূ-(প্রহ্লাদজননী) প্রভৃতির ন্যায় স্নেহবিহ্বলা জননী হলেন।

অহল্যা চরিত্রের সংকীর্ণতাই নায়ক-চরিত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য ও গভীরতা বিকাশে বাধা দান করেছে। কৃষ্ণকুমারী-চরিত্রের মধ্যে কোমলতা ও স্নিগ্ধতা আছে। নাট্যকার ভারতীয় দূত-কাব্যের নায়িকা চরিত্র থেকেই তার আদর্শ অংশত গ্রহণ করেছেন। চিত্রপট দর্শনেই প্রেমকাতরা হয়েছেন তিনি। আবার মূর্ছিত অবস্থায় অশরীরী পদ্মিনী দেখে ও দৈববাণী শুনে তিনি তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকে সত্যসত্যই ভাল বেসেছিলেন। সেই ভালবাসার স্বার্থেও ত আত্মরক্ষারচেষ্টা তিনি করতে পারতেন, কিন্তু সে চেষ্টা তিনি করেন নি। কৃষ্ণকুমারী গ্রীক রমণী নন, তিনি রাজপুতরমণী। তাঁর কাছে মুখ্য হয়েছে জাতির সম্মান, ব্যক্তির সাধ-আহ্লাদ নয়। রাজপুত রমণীসুলভ পন্থাই তিনি বেছে নিয়েছেন। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে ইফিগেনেয়া (Iphigeneiā) চরিত্রের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন।

বস্তুত আগামেম্‌নন্ কন্যার প্রাণদণ্ড বিধান করেছিলেন, আর কন্যা ইফিগেনেয়া হাসিমুখে বা বিনা প্রতিবাদে সে দণ্ডাদেশ মেনে নেন নি। পিতার চরণ ধরে প্রাণ ভিক্ষা করেছেন। ক্লাইটেমনেস্ট্রাও সেখানে অহল্যাদেবীর মত নীরব দর্শক থাকেন নি। শেষ পর্যন্ত হয়ত ইফিগেনেয়াকে আর্টেমিস উদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য নাটকের এই অংশ অনুমিত মাত্র, এই অংশ হারিয়ে গেছে। গ্রীক আদর্শ মাইকেলকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সেক্সপীয়ার সে যুগে প্রিয়তর। তাই মদনিকা-ধনদাস এসেছে। গ্রীক আদর্শের ওপর সেক্সপীয়রের রীতি কি প্রযুক্ত

হতে পারে? অধিকন্তু মাইকেল জানতেন, "I write under very different circumstances Our social and moral developments are of a different character. We are no doubt actuated by the same passions, but in us those passions assume a milder shape." কৃষ্ণকুমারী কেন ইফিগেনেয়া হোল না, ভীম সিংহ কেন রাজা লিয়ার হোল না, এই সব প্রশ্ন উত্থাপনের পূর্বে মাইকেলের এই বক্তব্য স্মরণ রাখা উচিত।

মাইকেল রাজসভায় কোন নারীকে উপস্থিত করেননি, এমন কি বিলাসবতী ও মদনিকাও কদাচ রাজা জগৎসিংহের রাজসভায় উপস্থিত হয়নি। তিনি পরবর্তী নাট্যকারদের মত এতটা নাটকীয় হতে চাননি যে, মোগল হারেমের অধিবাসিনীকে দিল্লীর দরবারে দাঁড় করিয়ে চমৎকারিত্ব সঞ্চার করবেন, সভাস্থ উজির-ওমরাহদের বিস্ময়-বিমূঢ় করবেন। তিনি আমাদের সামাজিক জীবনের চৌহদ্দিটুকু জানতেন এবং মেনে চলতেন।

এই নাটকে যে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে, সে হোল মদনিকা। মদনিকা বিলাসবতীর সহচরী। কোন রকম সামাজিক বিধি নিষেধ তার ওপর প্রযোজ্য নয়। 'As You Like It' নাটকের গ্যানিমিড যত সহজে প্রতিপক্ষকে প্রতারিত করেছিল, মদনিকাকে তার থেকে বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। গ্যানিমিড স্বৈরিণীর সহচরী নয়। গ্যানিমিড ছদ্মবেশিনী প্রেমিকা, স্বয়ং রোজালিণ্ড। মদনিকা-রচনায় সেক্সপীয়ায় তাঁর পথপ্রদর্শক নন। এই ছদ্মবেশ ধারণ স্পেনীয় নাটকের একটি পুরাতন কৌশল। ভারতীয় সাহিত্যেও ছদ্মবেশ-ধারণের উদাহরণ সংখ্যায় নিতান্ত কম।

'মালবিকাগ্নিমিত্রে' নীচজাতীয় স্ত্রীলোককে শেষপর্যন্ত রাজকন্যা বলে জানা গেল। 'মালতী মাধবে' মদয়ন্তিকা তার হৃদয় উন্মোচন করেছিল নারীবেশধারী মকরন্দকের কাছে, যে তার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ। 'বিশুদ্ধশালভঞ্জিকা' নাটকে মৃগাঙ্কাবলী একটি বালকের ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদে বন্দী হিসাবে পরিগৃহীত হয়েছিল।

উদাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই। মাইকেলের মদনিকা পুরাতন নাট্য-কৌশলের অনুসরণ। এই কৌশল একদা ছিল লোক নাট্যকলার অন্তর্ভুক্ত; পরে অভিজাত নাট্যশিল্পে স্থান করে নিয়েছিল।

মদনিকা মাইকেলের প্রিয় চরিত্র—"But Madanika is my favourite". 'Favourite' যে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ সে যা করেছে, তা কোন

মতেই প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু মাইকেল তাকে রক্ষা করেছেন। বিলাসবতীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সে একটি গুণবতী কন্যার সর্বনাশ সাধন করেছে। চক্রান্তজাল বিস্তার করার সময় সে অপরিণামদর্শিনী বালিকার ন্যায় ব্যবহার করেছে। ৩য় অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে তার এই উক্তিটি খুবই প্রণিধানযোগ্য—

মদ। (স্বগত) বাঃ! কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য! আমি একজন বেশ্যার সহচরী, বনের পাখীর মত কেবল স্বেচ্ছার অধীন; কখনই সংসার পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন?

মদনিকা এই ভবের হাটে হৃদয়-বিকিকিনিতে অভ্যস্ত হয়েও হৃদয় একেবারে বেচে ফেলতে পারেনি। রাজার কাছে যখন ধনদাসের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হোল, ধনদাস যখন অপমানিত হোল তিরস্কৃত হোল, এবং দণ্ডিত হোল, তখন তাকে দেখে মদনিকা দুটি সহানুভূতির কথা বলল।

মদন। না, না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধর্মদাস, আমি, ভাই সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে - হাজার হউক পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।

পরবর্তী নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র বেশ্যাকে ভক্তিপরায়ণ করে তুলবেন, কিন্তু মানবিক করবেন না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব।

মাইকেলের হাতে বেশ্যা মদনিকা এক উজ্জ্বল নারীচরিত্র হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণার দুঃখে তপস্বিনী অনেক কেঁদেছেন—তাঁর কান্না প্রত্যাশিত। কিন্তু মদনিকার কান্না অপ্রত্যাশিত, তাই এত আকর্ষনীয়। বিলাসবতী বেশ্যা হলেও আচরণের দ্বারা সম্ভ্রম উদ্রেক করে। বিলাসবতীর ভূমিকা সম্বন্ধে মাইকেল বলেছিলেন "I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes." কিন্তু সম্ভবত লেখকের এই উদ্দেশ্য সার্থক হয় নি, কারণ প্রথম থেকেই তার ভিতরে একটা দুঃখের সুর বেজেছে। —তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম নষ্ট করলে? আমি যদিও দুঃখী লোকের

মেয়ে, তবুও ধর্মপথে ছিলাম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন দুষ্ট বেদে এ পক্ষীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন) ১।২। এমন চরিত্রকে দিয়ে আর যাই হোক হাস্যরস সৃষ্টি হয় না—দুই চোখের এত জল শুকিয়ে তার স্থলে হাসির ফানুস উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। মৃচ্ছকটিক নাটকের বসন্তসেনার অনুরূপ চরিত্র হোল সে। ইংরিজি সাহিত্যে এই জাতীয় চরিত্র পাওয়া যাবে না। 'Courtesan' সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি হোল আলাদা।

বলেন্দ্র সিংহ ইতিহাসবহির্ভূত চরিত্র। এই চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি সেক্সপীয়রের King John নাটকের Bastard চরিত্রের সহায়তা নিয়েছেন। "I wish Bullender to be serious and light like Bastard in the King John." নাট্যকারের এই ইচ্ছাও হয়ত পূরণ হয়নি। ৩য় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে বলেন্দ্র সিংহকে আমরা প্রথম দেখি। ঐ সময় দুই একটি কথা সে বলেছিল, যার মধ্যে তার পরিহাসরসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

—কি হিতোপদেশ দিলেন বলুন দেখি? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন। হা! হা! হা!

—হা! হা! দূত মহাশয়, আপনি যে দেখছি স্বয়ং চাণক্য অবতার! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি যে, আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী নাকি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন। তা বলুন দেখি, আপনাদের কাজকর্ম কিরূপে চলে। (৩।১)

এই দৃশ্যটি ব্যতীত আর তাঁকে আমরা দেখব পঞ্চমাঙ্কে। তখন আর হাস্যরসের অবকাশ নেই। সেই থমথমে পরিবেশে সর্বাপেক্ষা কঠিনতম কাজ করার দায়িত্ব তারই কাঁধে অর্পিত হয়েছিল। বলেন্দ্র এ নাটকের সর্বাপেক্ষা অভিশপ্ত চরিত্র—

আমার দেখচি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো,
কোন দিকেই পরিত্রাণ নেই।

যে দ্বন্দ্ব রাণা ভীমসিংহের অন্তরে উত্থিত হয়েছে, সেই দ্বন্দ্বই বলেন্দ্রসিংহের অন্তরে। পিতা ভীম সিংহ উন্মাদ হয়ে পরিত্রাণ পেয়েছেন। খুল্লতাত বলেন্দ্র সিংহ প্রকৃতস্থ থেকে দগ্ধ হয়েছেন। বলেন্দ্রসিংহ ভীমসিংহের মতই অস্ফুট, কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে ট্রাজিক। নাট্যকার এই দুইটি চরিত্রের রেখাচিত্র মাত্র দিয়েছেন, পূর্ণচিত্র মহাকালের কাছে গচ্ছিত।

নাটকের ভাষা ও কৃষ্ণকুমারী নাটক

কৃষ্ণকুমারী ট্রাজেডি; ট্রাজেডির ভাষা মিলনান্তক নাটকের ভাষা নয়। বিষয়ের গাম্ভীর্য ও বক্তব্যের বিষাদান্তিকতা ভাষারীতিকে শাসন করে থাকে।

সেক্সপীয়ারের নাটকের ভাষা কমেডি ও ট্রাজেডি ভেদে বিভিন্ন হয়েছে। সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডি আবার গ্রীক ট্রাজেডির মত নয়। সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডিতে হাস্যরসের জোগান থাকে; হ্যামলেটে শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে কবরখননকারীরা হাসিমস্করা করেছে।

তুলনায় ভারতীয় নাটক বড়ই একমুখীন; এই কারণেই হয়ত তিনি বলছিলেন, "Ours are dramatic poems.···In the Shermistha, I often stepped out of the path of the dramatist, for that of the mere poet. I shall endeavour to create characters who speak as nature suggests and not mouthmere poetry."

অন্য একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, "As the play is a Tragedy I have not thought it proper to begin any scene with determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the play. But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it."

এই দুইটি চিঠি থেকে আমরা বুঝতে পারছি—

১. মাইকেল তথাকথিত কাব্যনাট্য লিখতে বসেন নি; তবে নাটকের কুশীলব কাব্যের ভাষায় কথা বলুক, তাই তিনি চেয়েছেন।

২. ট্রাজেডিতে হাস্যরস-উদ্দীপক দৃশ্য মানায় না; তবে কথাবার্তার ফাঁকে যদি দুই একটি রসাল উক্তি ঝ'রে পড়ে, তাতে তাঁর আপত্তি নেই।

শর্মিষ্ঠায় কাব্যভাষার বাড়াবাড়ি ছিল; শর্মিষ্ঠার সংলাপে প্রকৃতি-বর্ণনা একটা বড় অংশ জুড়েছে; ভাষায় সংস্কৃত-অনুমোদিত উপমাউৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি।

পদ্মাবতী নাটকে নিসর্গ-বর্ণনা (বন্দনাও বলা চলে) বাতিল হলেও সংলাপে সংস্কৃত অলঙ্কার-অনুসরণ পরিত্যক্ত হয়নি।

—আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘিরে বসেছে।

—সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয় ? ২।২

—যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয় ৩।১

—যে অকূল সাগরকে শতসহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে ? ৩।২

—কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যো, তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন ? ৪।২

—তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যো-এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যো—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যো। ৪।৩

—বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়, ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষ তার পূরণ হয়, ৫।২

এ সংলাপের বনিয়াদ গড়েছে ধার-করা ভাষা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ; ধার-করা ভাষা বলেই এ ভাষা স্বাভাবিক ও গতিশীল নয়। ধার-করা ভাষার ধার থাকে না। কৃষ্ণকুমারীর ভাষা পূর্বতন দুটি নাটকের ভাষা থেকে উন্নততর। কিন্তু এ ভাষাও নাটকের উপযোগী ভাষা কি ? নাট্যকার সানন্দে লিখছেন : **I am happy you like the language.**

কিন্তু এখনও বহুদূর অগ্রসর হতে হবে। কোন রকম অহমিকার প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি বলছেন—"**Ease can only be obtained by practice and I am as yet a mere novice. But I hope I am a progressive animal.**" উল্টোপথে দৌড়লেও কি এগুনো যায় ?

মাইকেল গদ্যরীতিকে নাটকের বাহন হিসাবে গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীতে এই সিদ্ধান্তের জন্য দণ্ড নিতে হয়েছে।

কৃষ্ণকুমারীর ভাষার কোন নির্দিষ্ট মান নেই। রাণা ভীম সিংহ থেকে শুরু করে বেশ্যার সহচরী মদনিকার সংলাপে আড়ষ্টতা ও আন্তরিকতা যুগপৎ লক্ষ্য করা যায়। রাণা ভীম সিংহ, অহল্যা দেবী, তপস্বিনী, কৃষ্ণকুমারীর সংলাপে একটা আভিজাত্য আছে। তৎসম শব্দ, অলংকার এবং অন্বয়ধর্মী বাক্যের ব্যবহার শুধু এই সব অভিজাত ব্যক্তিদের সংলাপে দেখা গেছে। কিন্তু অনভিজাত চরিত্রের ভাষা আটপৌরে

জগৎ সিংহ। (সসম্ভ্রমে) বটে! (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলেছিলে এ সুধা-চন্দ্রালোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা, যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন; যে বংশের যশঃ সৌরভে এ ভারতভূমি চিরপরিপূর্ণ; সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। ১।১

ভীম সিংহ। হায়! হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়া রাজ্য রক্ষা কত্তো হলো! ২।১

তপস্বিনী। মহিষি, স্বর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন। ২।১

অহল্যা। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনবাস করা ভাল! রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্মরাজ রাজ্যত্যাগ করো মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন। ২।১

বলেন্দ্র। মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতেই আমি প্রস্তুত আছি। তবে কিনা এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যাহোক, যে পর্যন্ত আমার কায় প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। ৫।১

এঁদের সকলের সংলাপ অতিশয় সাধুভাষার সংলাপ, ক্রিয়াপদেই শুধু চলিত রূপ রয়েছে। মাইকেল অভিজাত সমাজের ভাষা অভিজাত করতে চেয়েছিলেন।

মাইকেল চেয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে কৃষ্ণকুমারী লিখতে, কিন্তু সুহৃদগণ উৎসাহ দিলেন না। তাঁরা অবশ্যই নাট্যকারের সুহৃদ, বাংলা নাটকেরও সুহৃদ। তাঁদের আন্তরিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত নয়। সাধু গদ্য সর্বদা কতকগুলি রীতির নিগড়ে বন্দী; তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র

ভূমিকায় মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সাধু গন্থরীতি সম্বন্ধেও ঐকথা বলা চলে। সাধু গন্থ কতকগুলি অভ্যস্থ ভাবই প্রকাশ করতে পারে। প্যারীচাঁদ মিত্রের জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার কবলে এই প্রথাসিদ্ধ বাক্যবিলাসের হাত থেকে তিনি রেহাই পেতেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর নাটক হোক—"clothed in loftier diction." কিন্তু প্রচলিত গন্থকে নির্বাচিত করে তিনি প্রতারিত হলেন।

তিনি শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র স্বগত-উক্তিতে অমিত্রাক্ষরছন্দ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, "Blank verse only in soliloquies? What you say?" সায় না পেয়ে পুরো প্রচলিত গন্থে লিখলেন নাটকখানি। "অমিত্রাক্ষর পন্থই নাটকের উপযুক্ত পন্থ, কিন্তু অমিত্রাক্ষর পন্থ এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।" অমিত্রাক্ষর ছন্দ যদি নাটকে ব্যবহৃত হোত, তাহলে ঐ ছন্দের বহু ঐশ্বর্য আমবা দেখতে পেতাম। দীর্ঘ-সংলাপে যেমন গীতিকবিতার মূর্চ্ছনা থাকত, তেমনি বিরতি বা ভাবের উঁচুনীচু পর্দার তালে তালে বাক্যের অন্বয় নানাপ্রকার হোত। ছোট তির্যক সংলাপে এই ছন্দ ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশে ব্যবহৃত হয়ে নাটকের কাব্যধর্মী ভাষার উৎপত্তি ঘটাত। কিন্তু এ ছন্দ অচ্ছুত থাকল।

"আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় বঙ্গভূমিতে গন্থ অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্ত কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।"

এ হোল প্রতারিত ব্যক্তির আত্মতুষ্টিব স্বগতভাষণ। কৃষ্ণকুমারীর ভাষা তার বিষয়ের যোগ্য হয় নি। বিষয়ে যে ঝড, অশনি নির্ঘোষ আছে, ভাষায় তা প্রতিফলিত হয় নি।

তুলনায় মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা অনেকটা নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত। ইন্দ্রজিৎ-বিভীষণ-লক্ষ্মণের সংলাপ-অংশ তার নাটকীয়তার জন্ম সর্বজন-পরিচিত; চিত্রাঙ্গদা-রাবণ, প্রমীলা-ইন্দ্রজিৎ সংলাপও নাট্য-লক্ষণিক। এমন কি রাবণের বিভিন্ন আত্মভাষণের মধ্যে ট্রাজেডির নায়কের মত তার বুকভাঙ্গা হাহাকার সার্থকভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তুলনায় রাণা ভীমসিংহের হাহাকারধ্বনি অনেক তরল, অনেক অ-সংহত। ট্রাজেডিতে অলঙ্কার অলঙ্কৃত করবে না,

বক্তব্যকে গতিষ্ণু করবে। এই কারণে ট্রাজেডিতে উপমা অপেক্ষা উৎপ্রেক্ষা অধিকতর সমাদৃত। সেক্সপীয়র যখন লেখেন

"To take up arms
Against the sea of troubles."

তখন তার অর্থ নিয়ে যত তর্কই হোক, এভাষা যে বিন্দুমাত্র থমকে দাঁড়ায়নি, ত্বরিত চরণে পরিণতিমুখী হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। নাটকের নিয়তির মতই এ ভাষা নির্মম ও নিরপেক্ষ।

নাটকের ভাষা সৃজন করতে দুঃসাহসী মাইকেল প্রচলিত আখ্যান-সাহিত্যের ভাষাকে ব্যবহার করলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা' বা তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী' ভাষার মূল্য অন্যত্র, নাটকে নয়।

অলংকার যখন শুধুই সালংকারা, তখন তা নাটকের পথের প্রতিবন্ধক।

মধুসূদন চেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্ট কুশীলব স্বভাবদত্ত ভাষায় কথা বলুক; কিন্তু হোল বিপরীত, তাদের অধিকাংশের আলাপচারিতা ঘটেছে অনালাপী ভাষায়।

মায়াকানন

মায়াকাননই মধুসূদনের শেষ রচনা। ঐ নাটকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশকদ্বয় জানিয়েছিলেন—"বঙ্গ-কবি-শিরোমণি ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া 'মায়াকানন' নামে এই নাটকখানি রচনা করেন। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহাকে দুইখানি উৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তদনুসারে তিনি 'মায়াকানন' নামে এই নাটক ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একখানি নাটকের অংশ রচনা করেন।"

কাজেই 'মায়াকানন' তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বিষ না ধনুর্গুণ' অসমাপ্ত ছিল। 'মায়াকানন' মধুসূদনের দেহাবসানের পর প্রকাশিত হয়। "কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনের প্রকৃত নাট্যকার জীবনের অবসান হয়।"—সমালোচকের এ উক্তি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, এবং ডকটর গুহঠাকুরতা তাঁদের গ্রন্থে 'মায়াকাননে'র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি।

মঞ্চস্থ না হলে নাটকত্ব প্রমাণিত হয় না, মধুসূদন এ-সত্য মনে-প্রাণে স্বীকার করতেন। তাই যখন বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্ণধারগণ

পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী রচনা সমাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও শর্মিষ্ঠা ব্যতীত তাঁর আর কোন নাটকই মঞ্চস্থ করলেন না, তখন তিনি নাটকের ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়স তখন তাঁর।

দীর্ঘ তের বৎসর পরে (এই তের বৎসরে তাঁর জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে) প্রস্তাবিত বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ণধারগণ তাঁর কাছে নাটক প্রার্থনা করেন, তখন তিনি আবার কলম ধরলেন।

নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ কোন সময় মন্দীভূত হয়নি, পাথুরিয়াঘাটা নাট্যালয় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই নাট্যশালা যেহেতু মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ন্যায় ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত, মাইকেল প্রথম থেকেই এই নাট্যশালার অভিনয়-অনুষ্ঠানে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু এই নাট্যশালায় তাঁর কোন নাটক অভিনীত হয়নি। "যখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি ষ্টেজ বাঁধা হইল, সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়।"[২৪]

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল পার্টির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিলনা। এই দল প্রথম অভিনয় করেন ১৮৬৫ সনের ১৮ই জুলাই, তখন তিনি বিলেতে। ঐ তারিখে 'একেই কি বলে সভ্যতা' মঞ্চস্থ হয়। কৃষ্ণকুমারী নাটকও এই মঞ্চে অভিনীত হয় সর্বপ্রথম।

জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় তাঁর যাতায়াত ছিল। এমন কি, কয়লাহাটার বঙ্গ নাট্যালয়ের অভিনয়েও তিনি উপস্থিত থাকতেন। এই রঙ্গমঞ্চে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর অভিনয় দেখে তিনি নাকি হর্ষভরে বলেছিলেন, "মৃত্তিকেরে বাবা, মৃত্তিকে।" অতএব দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনের নাট্য-ঔৎসুক্য কোন সময়ই ঘুমিয়ে পড়েনি।

কৃষ্ণকুমারী রচনার পরই তিনি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলেত যাত্রা করেন। ১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬৭ সাল থেকে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়-উৎসবে তিনি উপস্থিত থাকতেন।

মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার এক উৎসাহদাতারূপে দেখা দেন। শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার সময় মাইকেল অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। "মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল।

তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটার খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব ; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না।' মাইকেল ও শরৎবাবুর ভগ্নীপতি Mr. O. C. Dutta (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন।"[২৫]

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে ইহার তের বৎসর পর তিনি একখানি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।"[২৬]

ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন, "নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই মধুসূদনকে মায়াকানন লিখিতে হয়।"[২৭] "দায়ে পড়িয়া" বা "নিতান্ত অর্থের প্রয়োজনে" যে নয়, এখবর নতুন করে বলতে হচ্ছে, এটাই পরিতাপের। নাটক ও মঞ্চ তাঁর অতিশয় প্রিয়। সেই প্রীতির টানেই তিনি অসুস্থ শরীরেও 'মায়াকানন' রচনায় প্রবৃত্ত হন।

জনৈক সমালোচক বলেছেন, "মধুসূদনের শেষ জীবনের অনির্বাণ আত্ম-গ্লানিবহ্নি শুদ্ধিলাভ করিয়াছে বলিয়াই মায়াকাননের প্রধান ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য।"[২৮]

আর একজন সমালোচক লিখেছেন "কবি নিজে আজ জরাজীর্ণ, রুগ্ন, পরাজিত। তার নায়কও প্রথমাবধি এই পরাজয়ের মনোভাব বহন করেছে।"

মায়াকানন মধুসূদনের বিশিষ্ট জীবন-দৃষ্টির অনিবার্য পরিণতি, এ বিষয়ে কেউ ভাবছেন না। সবারই বক্তব্য তাঁর রুগ্ন শরীর তাঁর নাটকের কুশীলবকে দুঃসহ ট্রাজেডির পথে টেনে নিয়ে গেছে। এই ধরণের বক্তব্য স্বীকার করে নিলে মাইকেলের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টিকে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে সাব্যস্ত করা যায় না, বিভিন্ন রচনাকে এক একটি বিচ্ছিন্ন জলাশয় বলে চিহ্নিত করতে হয়। কিন্তু তাই কি উচিত?

মায়াকাননের আখ্যানভাগ

মায়াকাননের আখ্যান-অংশে ইতিহাস ও 'মিথে'র মিশ্রণ ঘটেছে। কাহিনীটি এইরূপ:

ছদ্মবেশ ধারণ করে ইন্দুমতী ও সখী সুনন্দা মায়াকাননে এসেছে। তপস্বিনী অরুন্ধতীর কাছে ওরা শুনেছে যে এই মায়াকাননে এক পাষাণময়ী দেবমূর্তি আছে। যে লগ্নে দিনমণি কন্যারাশির সুবর্ণগৃহে প্রবেশ করেন, সেই সুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা ঐ দেবীর পদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো করে, তবে কুমারী হলে তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে আর

পুরুষ হলে আপন ভাবী পত্নীকে দেখতে পাবে। আজ সেই শুভলগ্ন উপস্থিত। সুনন্দার ইচ্ছা যে এই শুভলগ্নে ইন্দুমতী দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে আপনার ভাবী স্বামীর দর্শন পায়। ইন্দুমতী হোল গান্ধারের পদচ্যুত রাজা মকরধ্বজের কন্যা; এখন সিন্ধুদেশে বসবাস করছে।

সখী সুনন্দার নির্বন্ধাতিশয্যে ইন্দুমতী এই মায়াকাননে এসেছে। কিন্তু তার মনে কোন উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই। তাই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপনে সে বলল—

"কি বললি? আমার বিবাহ? আমার বর? —যম।" মায়াকাননে প্রবেশ করে ইন্দুমতী ভীষণ চঞ্চল হয়ে পড়ল। সুনন্দা হাতে ফুল তুলে দিলে সেই পাষাণ মূর্তির সম্মুখে হাজির হোল সে, অর্ঘ্যও প্রদান করল। তৎক্ষণাৎ আকাশে বজ্রধ্বনি হোল; এবং ঝড় উঠল। ইন্দুমতী সশঙ্কিতা হয়ে উঠল; এমন সময় নেপথ্যে শৃঙ্গধ্বনি হোল। ইন্দুমতী সচকিতা হয়ে উঠলে সুনন্দা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে, তার বর আসছে; তাই ঐ শৃঙ্গধ্বনি। কিছুক্ষণ পরে সত্যই মৃগয়া-বেশধারী রাজকুমার অজয় প্রবেশ করল এক বন্য বরাহের পশ্চাদ্ধাবন করে। সে ঐ পাষাণ মূর্তি দেখে থমকে দাঁড়াল। তার পদশব্দ পেয়ে ইন্দুমতী ও সুনন্দা মূর্তির আড়ালে আত্মগোপন করল। অজয় পুষ্প গ্রহণ করে দেবীর চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করল। মূর্তি পরিভ্রমণ করতে গেলে ইন্দুমতী ও সুনন্দা তার নয়নপথে পড়ল। সে মনে করল তার পূজায় প্রসন্ন হয়েই ভগবতী বনদেবী এই দুটি নারীকে এখানে উপস্থিত করেছেন। এদের মধ্যে একজন তার 'হৃদয়তোষিণী' হবে। কিন্তু ইন্দুমতী আপন পরিচয় গোপন করল। ভাগ্যকে নিয়ে তখনই খেলা আরম্ভ হোল। নিজেকে বণিককন্যা ব'লে সে পরিচয় দিল। অজয় এ পরিচয় স্বীকার করল না। অজয় ইন্দুমতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবে বলে শপথ গ্রহণ করল। ঠিক সেই সময়ে আকাশে বজ্রধ্বনি হোল। এই বজ্রধ্বনি অমঙ্গলসূচক। এদিকে অজয়ের পিতা অজয়ের বিবাহের সম্বন্ধ করে পাঞ্চালরাজের কাছে দূত পাঠিয়েছেন। অজয়কে এ সম্বন্ধে বললে অজয় আপত্তি জানাল; বলল তাকে না জানিয়ে কেন দূত পাঠান হয়েছে। অজয়ের এই ব্যবহারে বৃদ্ধ রাজা ভীষণ দুঃখিত; কন্যা শশিকলার কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে প্রায় দুই মাস পূর্বে অজয় মায়াকাননে গিয়ে এক অচেনা তরুণীকে হৃদয় দান করে এসেছে। তাকে বৈ আর কোন নারীকে এ জন্মে সে বিবাহ করবে না।

এ কথা শুনে রাজা পরিতাপ করতে লাগলেন; কারণ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে এই বংশের কোন রাজা বা রাজকুমার মায়াকাননের পাষাণময়ী দেবীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করলে সে নিশ্চয়ই সুন্দরী স্ত্রীর সাক্ষাৎ পাবে, কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই ঐ রমণীর সঙ্গে তার পরলোক প্রাপ্তি ঘটবে। তবে অজয়কে এই বিবাহের সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।

মন্দিরে পূজা দিতে গিয়ে বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করলেন। অজয় সিংহাসনে আরোহণ করলে পাঞ্চাল রাজার দূত বিবাহের সম্মতিপ্রার্থনা করে হাজির হোল। অজয় মন্ত্রীর পরামর্শে সে প্রস্তাব গ্রহণও করল না, বর্জনও করল না। কিন্তু তাতেই দূত কুপিত হোল।

অজয় যে কোন্ নারীকে হৃদয় দান করেছে, এখনও তা নির্ণীত হয় নি। শশিকলা মন্ত্রীর পরামর্শে এক ব্রত উদ্‌যাপন করার সঙ্কল্প নিল। এই ব্রত উপলক্ষে নগরবাসিনী সমস্ত কুমারীকে আমন্ত্রণ করা হোল। অরুন্ধতীর উপদেশক্রমে ইন্দুমতী এই ব্রতে যোগদান করল; সেখানে তার সঙ্গে অজয়ের সাক্ষাতকারের পূর্বেই পট্টবস্ত্রাবৃত বৃদ্ধ রাজার আকারবিশিষ্ট এক পুরুষ এসে বলে গেলেন যে অজয় যদি পাঞ্চাল অধিপতির কন্যাকে বিবাহ না করে তবে এই পুরাতন রাজবংশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অজয়ের বৃদ্ধমন্ত্রী চাণক্য অরুন্ধতীর কাছে ইন্দুমতীর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হোল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জ্ঞাত হোল যে দেবতারা এ বিবাহে প্রতিকূল। অরুন্ধতী আপাতত বিপদ ঠেকাবার জন্য ইন্দুমতীকে পরামর্শ দিল সে যেন ব্রত পালনের জন্য অজয়কে এক বৎসর অপেক্ষা করতে বলে। অজয় ইন্দুমতীকে দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

অরুন্ধতীর কৃপায় তার চেতনা ফিরে এল। ইন্দুমতী ও শশিকলার মধ্যে যথেষ্ট সম্প্রীতি জন্মাল। অজয় ইন্দুমতীর কথা ভেবে ভেবে রাজকার্যে উদাসীন, আর ওদিকে পাঞ্চালরাজ অপমানের শোধ নেবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করছেন। এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য অরুন্ধতী অজয়ের মন্ত্রীর কাছে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন; তিনি বললেন গুর্জরের রাজা রাজকর না দেওয়াতে গান্ধারের বর্তমান অধিপতি ধূমকেতু সিংহ সসৈন্যে গুর্জর দেশ আক্রমণ করতে আসছে। তাকে খবর দিতে হবে গান্ধারের ভূতপূর্ব রাজা ও তাঁর কন্যা ইন্দুমতী এই রাজ্যেই বাস করছে। আর এ কথা ধূমকেতু সিংহ শুনলে তার

পুত্র জয়কেতুর জন্য ইন্দুমতীর পাণি প্রার্থনা করবে, কারণ এই কন্যার সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ হলে পরিণামে তার রাজ্য নিষ্কণ্টক হবে। ইন্দুমতীকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করতে অজয়ের বিষম মনঃপীড়া হবে; কিন্তু এ মহারোগের উপশমের জন্য এই প্রকার কঠিন ঔষধ প্রয়োজন। অচিরকালের মধ্যেই সিন্ধুদেশ থেকে এক দূত এই বার্তা নিয়ে রাজা ধূমকেতুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হোল। ধূমকেতু এই প্রস্তাব জেনে পরম সন্তোষ লাভ করল।

এইভাবে প্রায় দশ এগারো মাস কেটে গেল। অজয় রাজকার্যে আদৌ মনোনিবেশ করে না। মন্ত্রীর অনেক অনুরোধে একদিন সে রাজসভায় এল; গুর্জর ও পাঞ্চালের দূত তার সম্মুখে উপনীত হোল। পাঞ্চাল দূত তার রাজার বৈরিতার কথা জ্ঞাপন করল। গুর্জরের দূত ইন্দুমতীকে গুর্জর রাজপুত্রের হস্তে অর্পণ করার জন্য অজয়কে অনুরোধ জানাল। এই অনুরোধে অসম্মতি জানালে গুর্জররাজও সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ইন্দুমতী এ খবর জানতে পেরে মনে মনে একটি কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করল; কারো কাছে প্রকাশ করল না। অরুন্ধতী দেবী বললেন অজয় ইন্দুমতীকে বিবাহ করলে তার রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে ইন্দুমতীর উচিত গুর্জর রাজার পুত্রকে বরণ করা।

ইন্দুমতী ভাবছিল সিন্ধুদেশের রাজা আমাকে বিনিময়- সামগ্রী মনে করলেন। না, ইন্দুমতী একটি কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। সে সঙ্কল্প কি তা সে সখী সুনন্দার কাছেও প্রকাশ করল না।

মায়াকাননে যাত্রার পূর্বে ইন্দুমতী তপস্বিনী অরুন্ধতীকে অনুরোধ করল তিনি যেন তার বৃদ্ধ পিতাকে দেখাশুনা করেন।

সুনন্দা প্রস্তাব করল,—এস আমরা সিন্ধুদেশ থেকে পলায়ন করি। ইন্দুমতী এ প্রস্তাবে সম্মত হোলনা; কারণ ধূমকেতু দেশ বিদেশে চর পাঠিয়ে ঠিক তাদের ধৃত করে ফেলবে। প্রস্তর মূর্তির সম্মুখে এসে দেখল সেই মূর্তির কোন পরিবর্তন ঘটেনি; কিন্তু এই দুই বৎসরে তার জীবনে কী দারুণ পরিবর্তনই না ঘটেছে! পাষাণময়ী দেবীর সম্মুখে নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে সে আত্মহত্যা করল। অজয়, শশিকলা, রাজা ধূমকেতুর দূত প্রভৃতি সেখানে এসে উপনীত হোল। একটু পূর্বে সুনন্দাও বিষপান করেছে। মৃত্যুপথযাত্রী সুনন্দা জানাল যে ইন্দুমতী জানিয়ে গেছে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে পুনর্জন্মে অজয়ের সঙ্গে তার মিলন হবে, আর গান্ধারের রাজকন্যা বিনিময়ের দ্রব্য নয়।

সুনন্দা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। রাজা অজয়ও আত্মহত্যা করল। আর সেই মুহূর্তেই ঐ পাষাণময়ী মূর্তি আপনা থেকে ভেঙ্গে পড়ল। এক দৈববাণীতে জানা গেল যে ঐ যুবক যুবতী পূর্বজন্মে গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়ায় এবং অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করায় দুর্বাসা মুনির শাপে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে। আজ তাদের শাপের অবসান হোল। মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন—এ পাপ মায়াকানন যতদিন থাকবে, ততদিন সকলেই এ বিষম দুর্ঘটনা বিস্মৃত হবে না। অহো! কি ভয়ানক মায়াকানন!

মায়াকানন নাটকের বর্তমান রূপ

পদ্মাবতী এবং কৃষ্ণকুমারীর ভাব-বলয় পরিত্যাগ করে নাট্যকার মায়াকাননে যাত্রা করেননি। পদ্মাবতী থেকে কৃষ্ণকুমারী যেমন আকস্মিক নয়, তেমনি কৃষ্ণকুমারী থেকে মায়াকাননে প্রবেশ আকস্মিক হতে পারে না।

'মায়াকাননে'র কাহিনীতে পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী উভয়ের উপস্থিতি। পদ্মাবতী নাটকে ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে নারদ বলেছিলেন, "আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখলেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষাণমূর্তি ধরে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাকতে হবে।" নারদের মতলবের জন্য না হলেও মায়াকাননে সেই প্রস্তরমূর্তিই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারীর জন্য দুই দেশের রাজা উদয়পুর আক্রমণে উদ্যত হলে কৃষ্ণকুমারীকে স্বদেশ রক্ষার জন্য আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতে হোল। আর মায়াকাননেও দুই রাজার আক্রমন থেকে প্রাণপ্রিয় অজয়ের রাজ্য রক্ষার জন্য নায়িকা আত্মঘাতিনী হোল। যার জন্য ইন্দুমতী আত্মঘাতিনী হোল, স্বদেশ অপেক্ষা সে কম প্রিয়তর নয়।

পদ্মাবতীতে গ্রীক পুরাণ আছে; মঞ্চের চাহিদায় তা গ্রীক নাটকোচিত হয় নি। আর কৃষ্ণকুমারীতে গ্রীক আদর্শ আছে, কিন্তু প্রভুত্ব করেছে সেক্সপীয়র। 'মায়াকাননে' নাট্যকার স্বতন্ত্র পুরাণ তৈরি করেছেন। এবং এই নাটকে এসে তিনি গ্রীক আদর্শকেই আত্মস্থ করেছেন, নাটক বিয়োগান্তক হয়েছে। অথচ রঙ্গমঞ্চ এই নাটকের সুসংবদ্ধ ট্র্যাজিক রস অনেকখানি তরল করে নেবে।

মাইকেল নাটক শেষ করেছিলেন যেখানে, সেখানে শেষ হলে সম্ভবত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবিচার করা হোত। তাই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এসে এক গল্প ফাঁদলেন—

পূর্বকালে এই মহৎবংশে অসমঞ্জ নামে ভুবনবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। তাঁর অলোকসামান্যা সর্বগুণালঙ্কৃতা রূপবতী এক কন্যা ছিল, তাঁর নাম ইন্দিরা। তৎকালে ইন্দিরাসদৃশী রূপসী ত্রিভুবনে লক্ষিত হয় নি। কিন্তু মানবী ইন্দিরা প্রথম যৌবনে রূপমদে মত্তা হয়ে রতিদেবীর অবমাননা করায়, মন্মথমোহিনী কুপিত হয়ে ঐ অহঙ্কারিনী রাজনন্দিনীকে শাপ প্রদান করেন, যে, 'যতকাল তোর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপসী তোর সমক্ষে আত্মঘাতিনী না হয়, ততকাল তোকে এই ঘোর মায়াকাননে পাষাণী হয়ে থাকতে হবে।' তাতে ঐ ইন্দুনিভাননা ইন্দিরা করুণস্বরে দেবীকে বল্লেন, দয়াময়ি! যদি দয়া করে দাসীর মুক্তির উপায় অবধান করে দিলেন, বলুন, কি উপায়ে ভয়ানক বিজন কাননে অপরূপ রূপবতীর আত্মঘাত সম্ভব হয়? তাতে দেবী এই কথা বলে দিলেন যে, যে দিবস ভগবান মরীচিমালী, কন্যার স্বুবর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করবেন, এই স্বুলগ্নে যদি কোন পবিত্রস্বভাবা কুমারী, কি সুপবিত্র অনূঢ় যুবা তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করে, তবে কুমারী হলে স্বীয় ভবিষ্যৎ বরকে, আর পুরুষ হলে আপন ভাবীপত্নীকে সম্মুখে দেখতে পাবে। এই প্রলোভনে অনেকেই এই মায়াকাননে সমুপস্থিত হবে।

গল্পের যেটুকু বাকি থাকল, তারও পরিপূরণ ঘটল দৈববাণীতে—

দৈববাণী! হে সিন্ধুদেশবাসিগণ! অদ্য এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করে ক্ষোভ করো না, মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ কল্লে, সকলই সত্য, আর এই যে ভূপতিত কুমার কুমারীকে দেখচ, এঁরা পূর্বে গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন. ঐ যুবক যুবতী পরস্পর প্রণয়ানুরাগে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সমীপস্থ দুর্বাসা মুনিকে দেখিয়া অভ্যর্থনা না করায়, ঋষিশাপে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্য ইঁহাদেরও শাপান্ত হলো। এক্ষণে তোমরা সকলে রাজ-নন্দিনী শশিকলাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠান করে, সমারোহপূর্বক বর্তমান গান্ধারাধি-পতির পুত্রের সহিত বিবাহ দাও। তাহা হইলে সকল দিক্ বজায় থাকিবে।

নাটকের এই অংশ নাটকের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

প্রকাশকদ্বয় জানিয়েছেন, "সংবাদ প্রভাকরের সহ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।'

শুধু "দেখিয়া দিয়াছেন" বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ বাংলা মঙ্গলকাব্যের মত এই পরিণতি আর যাঁরই রচনায় ঘটুক, মাইকেলের রচনায় সম্ভব নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের পরিণতিতে দেখতে পাই—

ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্তি ! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্তযৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে !

শিবের অনুকম্পায় এই অঘটন ঘটল। কিন্তু তবু মঙ্গলকাব্যীয় আদর্শে নয়।

কৃষ্ণকুমারীতে এসে ঐ প্রকার ব্যবস্থাপত্রও আর তিনি লিখলেন না।

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্তব্য, দেখা যাক্‌গে। এদিকের তো সকলি শেষ হলো। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা ! আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি।

মৃত্যুকে স্বীকার করেই কৃষ্ণকুমারী নাটক শেষ।

মায়াকাননের পরিণতিও ছিল একই প্রকার। ঋষ্যশৃঙ্গের ভাষণ ও দৈববাণীর অংশ বর্জন করলে নাটকের মূল বক্তব্য অক্ষত থাকে।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের একজন ধুরন্ধর লেখক। স্বনামে ও বেনামে অনেক লেখকের খ্যাতির মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। মাইকেলের রচনার এই জন্মান্তরবাদমূলক অংশটি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর সংযোজনা। মাইকেল এখানে স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর ওপর নির্ভর করেছেন। সেই স্বাধীন স্বতন্ত্র মঞ্চে তিনি ভারতীয় কর্মফল তত্ত্বকে নিয়ামকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেবেন না। আর তা ছাড়া দেশের ভাব-জগৎ বদলে যাচ্ছে দ্রুত। শোভাবাজার থিয়েট্রিক্যাল পার্টি ও ন্যাশনাল থিয়েটার বিয়োগান্তক নাটক অভিনয় করায় ট্রাজেডী-ভীতি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। উপন্যাস অঙ্গনের 'কপালকুণ্ডলা' মঞ্চে নেমেছে। (১০ মে, ১৮৭৩) মায়াকানন এই পরিবর্তিত নাট্য-পরিবেশের নাটক।

মায়াকানন : পুরাণ : আধুনিকতা

নাটকের কাহিনী পৌরাণিক নয়, যদিও পুরাণের সঙ্গে যোগ আছে। মহাভারতের জয়দ্রথের বংশধর হলেন সিন্ধুদেশের বর্তমান রাজা। কিন্তু পুরাণকে ছুঁলেও এ গল্প পৌরাণিক নয়।

"এ দুরন্ত কলিযুগে দেখেছি, পিতা যদি সর্বতঃ প্রযত্নে পুত্রের শুভানুষ্ঠান করেন, তবুও পুত্র তাঁর প্রতিকূল হয়।" (১।২)

এ গল্প কলিযুগের গল্প, বর্তমান কালের গল্প। রাজা-মন্ত্রী-রাজপুত্র-রাজকুমারী ঋষি-তপস্বী-তপস্বিনী-এঁরা-সব কোন যুগের লোক? সম্ভবতঃ মাইকেল বর্তমান যুগ বা কলিযুগকে নিয়ে নতুন পুরাণ বা রূপকথা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন —যেমন রূপকথা সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শারদোৎসবে', 'ডাকঘরে', 'ফাল্গুনী'তে, 'রক্তকরবী'তে বা 'রাজায়'।

'মায়াকানন' নবীনকে নিয়ে পুরাণের অমৃতকথা। মায়াকানন নাট্য-কাহিনীর এই বিশিষ্টতা সম্বন্ধে নাট্যকার সচেতন। এই বিশিষ্ট নাট্যকাহিনীর স্বরূপ আরও ধরা পড়ে হঠাৎ একটি অনাবশ্যক আখ্যায়িকায়। সেটি হোল নাটকের মধ্যে আর একটি নাটিকা। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অজয়ের রাজসভায় একটি যুবতীর সঙ্গে তিনজন পুরুষের প্রবেশ ঘটল।

"এই যে কন্যাটি, এ আমার একান্ত সন্ততি, এই যুবকদ্বয় ইহার পাণিগ্রহণ-প্রার্থী। আমার ইচ্ছা এই যে ঐ মদন নামক যুবকের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হয় কেননা ইনি আমার সখ্যপুত্র, কিন্তু এই নৃসিংহ নামক যুবা, আমার অনভিমতে কন্যাটিকে গ্রহণ করতে সর্বদাই সচেষ্ট।" অথচ কন্যাটি বলছে— "মহারাজ, মদনকে আমি আপন সহোদর স্বরূপ জ্ঞান করি" তখন অজয় রায় দিলেন—"মহাশয়, আপনি কন্যাটি নৃসিংহকে অর্পণ করুন। স্রোতস্বতীর গতি তার স্বাধীন মনোবৃত্তি রোধ কত্তে প্রয়াস পাওয়া অনুচিত।"

মন্ত্রী মহাশয় রাজার আদেশ আরও ব্যাখ্যা করে দিলেন—"তুমি কি ভাই অন্যের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত করে থাকো? তা যদি কর, তবে, ঐ ভদ্রলোকের কন্যাটিকে তার অনিচ্ছায় কেন বিবাহ কত্তে চাও? তার কি হৃদয় নাই?

১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজের একটি ছাত্র লিখেছিলেন, "In India, I may say, in all the oriental countries women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of animal appetites of

men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they can not know until civilization shows them the way to attain it."

প্রায় তিরিশ বছর পরে 'মায়াকাননে'র নাট্যকার সেই বক্তব্যের এক নাট্যরূপ দিলেন। মায়াকাননের কাহিনী তাই বাহ্যত পৌরাণিক, অন্তরে আধুনিক। "The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete."

পছন্দমত 'পার্টনার' লাভ করতে গেলে যে কী যাতনা এই সমাজে যুবকদের ভোগ করতে হয়, নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন! পুত্র অজয় তাঁর মনোনীত পাত্রী বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় পিতা বলছেন. "মন্ত্রি! এরূপ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা পিতৃপিতামহের জলপিণ্ড লোপ করা, আমার বিবেচনায়, শ্রেয়ঃ।"

এই মধ্যযুগীয় মনোভাবের সঙ্গে আধুনিক জীবনদৃষ্টির সংঘাত থেকে যে জটিলতা ও ট্রাজেডী উদ্ভূত হয়, নাট্যকার তারই এক ভয়াল রূপ এখানে পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই ইচ্ছার পূর্তির জন্য তিনি মায়াকাননে পাষাণময়ী মূর্তি স্থাপন করে এক আধুনিক পুরাণের প্রতিষ্ঠা করেছেন। মায়াকানন পিতৃদ্রোহিতার গল্প নয়। রাম-কাহিনীরও প্রতিবাদ নয়। মায়াকানন আসলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অপমৃত্যুর ভয়ঙ্কর অটবী, ব্যক্তি-পুরুষের উন্মোচন-উদ্যান নয়। সারা জীবন যে যন্ত্রণায় ব্যক্তি মধুসূদন জর্জরিত, যে আগুনে তিনি ঝলসিত হয়েছেন, 'মায়াকাননে' এসে তারই চরম দহনরূপ প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর 'আত্মবিলাপ' কবিতায় যার স্ফুলিঙ্গকণা, 'মায়াকাননে' তারই খাণ্ডবদাহন। অগ্নিদেবতার আদিম ক্ষুধার কী মর্মান্তিক চরিতার্থতা!

মায়াকাননের নাট্যকৌশল

মায়াকাননের নাট্যসাফল্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা নিশ্চিত নন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "চতুর্থ নাটক মায়াকানন যখন লেখা হয় তখন মধুসূদনের প্রতিভা ভস্মাবশেষ।"

ডক্‌টর অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন, "শর্মিষ্ঠার দোষ পুনরায় 'মায়াকাননের' মধ্যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ সেই সংস্কৃত নাটকের অনুকৃতি—সংলাপের দীর্ঘতা, ভাবের কৃত্রিম আতিশয্য, কাব্যমিশ্রিত কারুণ্যের একাধিপত্য—সব আবার যেন মাইকেলের জীর্ণ হস্তের ক্লান্ত লেখনীকে পাইয়া বসিয়াছে।"

আমাদের ধারণা বিপরীত। উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে কারো প্রতিভা ভস্মীভূত হয় না, জীর্ণ-ক্লান্ত হয় না। শরীরী সামর্থ্যের ক্রীতদাসী নয় কল্পনাশক্তি। শর্মিষ্ঠা থেকে কৃষ্ণকুমারী পর্যন্ত মাইকেল একটার পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। শর্মিষ্ঠার কলেবরে সংস্কৃত ছাপ অক্ষুণ্ণ; পদ্মাবতীর আধুনিকতা সংশয়সম্পন্ন। কৃষ্ণকুমারী নতুন কালের নাটক, কিন্তু কালাতিক্রান্ত নয়। মাইকেল জানতেন, তাঁর এইসব রচনা তাঁর প্রতিভার ক্রমাভিব্যক্তি প্রকাশ করছে, চরমাভিব্যক্তি নয়।

মায়াকাননে এসে মাইকেল কৃষ্ণকুমারী নাটকের প্লট গঠনরীতি থেকে সরে গেছেন। উপরন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকে দুইটি আখ্যান-অংশ একটি বিন্দুতে এসে মিশেছিল। প্লটগঠনে কৃষ্ণকুমারী নাটকে তাই একটা জটিলতা ছিল, কিন্তু একমুখীনতা ছিল না।

মায়াকাননে এই তরল ও দ্বিমুখীন ঘটনার রশি নাট্যকার সযত্নে পরিহার করেছেন। এখানে ঘটনা বিচিত্রবর্ণা নয়, একবর্ণা; মায়াকাননের পরিণতি মায়াকাননের সূচনাতেই ব্যঞ্জিত।

মায়াকাননের নায়ক ও নায়িকা উভয়েই অভিশপ্ত কুশীলব। নায়ক-ঘটনাচক্রেই শিকারের পশ্চাদ্‌ধাবন করতে গিয়ে এক পাষাণময়ী মূর্তির সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; ঘটনাচক্রেই সে ইন্দুমতী সুনন্দার সম্মুখে এসে পড়েছে। অজয়ের পিতা পাষাণময়ী দেবী মূর্তির চরণে পুষ্পার্ঘ্য দানের গুরুত্ব জানতেন। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন ঘটনার গতিকে পরিবর্তিত করবার। কিন্তু পাশার দান একবার পড়ে গেলে তাকে ত আর বদলান যায় না। রাজার শীঘ্রই পরলোক প্রাপ্তি ঘটবে। তার মৃত্যুর পর মন্ত্রী চাণক্য ও অরুন্ধতী দেবী বহু চেষ্টা করবেন ঘটনার স্রোতকে পরিবর্তিত করবার, কিন্তু ফল হবে উল্টো। পাঞ্চাল—গুর্জর—গান্ধার নানান দেশ মিলে ক্ষুদ্র সিন্ধুদেশের ভূগোলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে; তারই পরিসমাপ্তি ঘটবে ইন্দুমতী-সুনন্দা-অজয়ের মৃত্যুতে।

ঘটনার কোণ মাত্র একটি। ইন্দুমতী-অজয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক হোল নাটকের কেন্দ্র। সকল ঘটনাই এদের সম্পর্কটি ফুটিয়ে তুলবার জন্য অবতারিত হয়েছে।

নিয়তি ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ঘটনার এই নিয়তি-মুখীনতা শেক্সপীয়রীয় নাট্যবিধির মধ্যে পড়ে না। কৃষ্ণকুমারীতে সঙ্কল্প আর সংস্কারে বিরোধ আছে। মাইকেল কি শেষ পর্যন্ত সেক্সপীয়ার-নাট্যরীতি থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন? "I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably." তবে কি 'মায়াকাননে' এসে নাট্যকার নিজস্ব নাট্য-চিন্তার প্রকাশ ঘটালেন? বা পূর্বতন পদস্খলন সংশোধন করে নিলেন?

মায়াকাননের প্লট সেক্সপীয়রীয় রীতির নয়। এমন কি ড্রাইডেন যাকে 'Dark tragedies' বলেছেন তারও অনুরূপ ভাবা যায় না।

প্লট গঠনে দুইটি দৃষ্টিকোণ দেখা যায়—কেউ মনে করেন প্লট নাটকগঠনের একটি কৌশল; কেউ মনে করেন প্লট যেন এক বিশেষ জীবনসত্য বা বক্তব্যের বাহক। মহৎ ট্রাজেডীতে শেষোক্ত রীতিই অবলম্বিত হয়।

মাইকেলের সব কয়টি নাটকের প্লট ঘটনাবহুল; শর্মিষ্ঠায় সব ঘটনা মঞ্চে না ঘটে কুশীলবের ঠোঁটে ঘটেছে; পদ্মাবতী থেকে মঞ্চে ঘট্‌ছে। প্লট যখন অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তখন আর কোন চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়নি, প্লটের ঘুরনি আরও পিছন থেকে আসছে—প্রাকৃতিক নিয়ম বা দৈবনির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে প্লট আবর্তিত হয়েছে।

মায়াকাননে দেখতে পাবো যে দুর্বিপাক বা ধ্বংস যখন আসছে, তাব পক্ষে তেমন কোন যৌক্তিকতা নেই। এই কারণে এ নাটকে কোন খল চরিত্র নেই; ধনদাসদের মত কোন ভূমিকা নেই। তপস্বিনী বা মন্ত্রী ট্রাজেডী ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু তারা কেউ খল নন, নিয়তির হাতের পুতুল। কৃষ্ণকুমারীতে খল-চরিত্র দুর্ভাগ্য আনবার জন্য দায়ী, নায়ক-নায়িকার কোন অপরাধ নেই। কৃষ্ণকুমারীতে তাই বৈচিত্র্য ছিল। সে যেন এক বিস্তীর্ণ ভুবন—কত বৈসাদৃশ্য, কতই না সংঘর্ষ!

মাইকেল এত বৈচিত্র্য এবং সাদৃশ্যের পরিসর থেকে কেন সরে এলেন মায়াকাননে? তিনি এই বিচিত্র উপকরণের প্রলোভনে আবদ্ধ না থেকে উনিশ শতকের বাস্তব জগতের গভীরে প্রবেশ করলেন এখন। তাঁর জীবনের নিগূঢ়তম অভিজ্ঞতাকে তিনি ভাষা দিলেন। মেঘনাদবধ কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক ও মায়াকানন নাটকের আখ্যায়িকা জীবনের একই আঙ্গিনা থেকে নেওয়া। অন্যত্র যে সব কুশীলব তিনি সৃষ্টি করলেন, তাদের বৈভব ও ঐশ্বর্য সৃষ্টিতে তিনি তৎপর হয়েছিলেন। একমাত্র মায়াকাননে তিনি প্রত্যয়কে সুসিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

কৃষ্ণকুমারীর প্লটে বিস্তৃতি আছে, মায়াকাননে সংহতি। কৃষ্ণকুমারীতে আছে জীবন-উপভোগ-ইচ্ছা ; মায়াকাননে জীবন অস্বীকৃত নয়, কিন্তু সেখানে আছে সংযম। কৃষ্ণকুমারীতে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখেছেন—কখনও ভীমসিংহের চোখে, বা ধনদাসের চোখে, কখনও মদনিকার চোখে, বা কৃষ্ণকুমারীর চোখে। মায়াকাননে একটি চোখে তিনি সব কিছু দেখেছেন। কৃষ্ণকুমারীতে বহুচারিতার ভাব ছিল, মায়াকাননে তা সংশোধিত করেছেন। মায়াকাননে 'নাট্যকার প্রথম থেকেই কাহিনীর পরিণতি সম্বন্ধে সজাগ।

—ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গর্ভে যে কি আছে, তার অনুসন্ধান করা অনুচিত কর্ম। বিধাতা যখন ভবিষ্যৎকে গূঢ় আবরণ দিয়ে আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করে রেখেছেন, তখন সে আবরণ উত্তোলন করতে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত ?

—আমার বিবাহ ? আমার বর ?—যম ! যেমন যদুপতি বাসুদেব রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ কবেন, তবেই আমি বাঁচি।

—তোকে আমি বারবার বলেছি, ভবিষ্যৎ নিয়ে জানবার চেষ্টা করা অজ্ঞানের কর্ম, সে চেষ্টা কত্তে নাই।

আমরা শুধু ইন্দুমতীর উক্তি থেকেই এগুলি সংকলিত করলাম।

মাইকেল সংশোধনের সুযোগ পাননি, এই কারণে অনেকে মনে করেছেন যে এই নাটক অনুন্নত রচনা।

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, "ইহাতে নাট্যরচনা উন্নতি পাইবার কথা নয়।"

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "শর্মিষ্ঠা হইতে কৃষ্ণকুমারীতে তাঁহার নাট্যপ্রতিভার ক্রমোচ্চ ঊর্ধ্বে আরোহণ আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারীর' পর আবার সেই প্রতিভার নিম্নপথে অবরোহণ হইয়াছে।" (পৃঃ ৯৪)

আসলে নাটকের বহিরঙ্গের ত্রুটি সমালোচকদের একমাত্র মনোযোগস্থল হয়েছে। 'মায়াকাননে' মধুসূদনের নাট্যবোধ নিম্নমুখী হয়নি, নাট্যবোধ পূর্ণতার পথে চলেছে। "I hope I am a progressive animal" চতুর্দশপদী কবিতাবলী বা অন্যান্য কবিতায় তাঁর প্রতিভার কোন অবনতি লক্ষিত হয়নি। লক্ষিত হয়েছে বহু রচনার অসম্পূর্ণতা। এটি প্রতিভার অবক্ষয় সূচিত করেনা, যা করে তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মায়াকাননের প্লট মাইকেলের সর্বাপেক্ষা সার্থকতম প্লট। তাঁর প্রারম্ভ ও পরিণতি গীতিকবিতার ন্যায় এক অখণ্ডতায় আবদ্ধ। গ্রীক ট্রাজেডীর মতই এ নাটকের প্লট প্রথম থেকেই ত্বরিতচরণে পরিণতির পানে ছুটেছে; কোন ভিন্ন রসের বা ভিন্ন মেজাজের কাহিনীর শৈবাল তার গতিকে দ্বিধান্বিত করেনি। নাটকের স্থান ও কালের ঐক্য লক্ষণীয়। একমাত্র চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটি ব্যতীত আর সব দৃশ্যই সিন্ধুদেশে ঘটেছে। নাটকের ঘটনাকাল দুই বৎসর মাত্র।

"সখি দেখ্ দুই বৎসর আগে যা যা দেখেছিলাম, তা সকলই সেইরূপ আছে।" ৫।২

নাটকের সূচনা মায়াকাননে, নাটকের শেষও মায়াকাননে। সেই সূচনা কত নিশ্চিতভাবে ঘটেছিল।

নাটকের ঘটনার এই নিশ্চিত অগ্রগমনই এ নাটককে 'বিধবা বিবাহ নাটকের' মত একান্ত মৃত্যু-নির্ভর ট্রাজেডী থেকে পৃথক করেছে। এ ট্রাজেডী তাই শুধু মরণে নয়, জীবনেও অভিব্যক্ত।

নাট্যকার সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডীর, বিশেষ করে King Lear-এর গঠন-রীতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেছেন, কিন্তু অনুকরণ করেছেন গ্রীক ট্রাজেডীর আদর্শ—যেখানে স্থানিক ও কালিক ঐক্য প্রাধান্য পায়, চরিত্র অপেক্ষা প্লটের শ্রেষ্ঠত্ব। "**Plot is the fundamental thing, the soul of tragedy, whereas character is secondary.**"[২৯]

এই দুই তথাকথিত স্বতন্ত্র রীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই কি মাইকেলের লক্ষ্য ছিল?

"**I have a certain dramatic notion of my own, which I follow invariably.**"

মাইকেল নাটকে স্বতন্ত্র সৃষ্টিকৌশল দেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে চাওয়া চাওয়াই থেকে গেছে। মায়াকাননে গ্রীক নাটকের আদর্শই আমরা পাচ্ছি। এখানে নিয়তি বা ভবিতব্য জীবনের সব কিছু বেঁধে রেখেছে।

নাটকের গাঁথুনিও ভবিতব্যের ইঙ্গিতের মত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অবধারিত।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই নাট্যবিষয়ের উপস্থাপন সম্পূর্ণ। তখনই নাট্যকার **dramatic irony**র সহায়তায় নাটকের ঘটনা কোন পরিণতি গ্রহণ করবে, তার ইঙ্গিতে দিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় অঙ্ক পর্যন্তও আমাদের যেতে হোল না ; ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কেই ঘটনার জটিলতা বৃদ্ধি পেল। কারণ এই দৃশ্যেই বৃদ্ধ রাজা অজয়ের বিবাহ বিষয়ে পাঞ্চালপতির কাছে দূত পাঠিয়েছেন এবং অজয় এই বিবাহ প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়েছে, তা জানা গেল। এই জটিলতা ৪র্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক পর্যন্ত চলবে, যখন পাঞ্চাল-গুর্জর সকলে মিলেই সিন্ধুদেশের রাজধানীকে চঞ্চল উদ্ব্যস্ত করে তুলবে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নাটকের ঘটনা নিম্নাভিমুখী হবে—কারণ গুর্জররাজ ধূমকেতুর শিবিরে প্রেরণ করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইন্দুমতী মনে মনে এক বিকল্প কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পঞ্চম অঙ্কে সমস্ত সমস্যার সমাধান। নাটকের ঘটনা যেমন দ্রুত জটিল থেকে জটিলতর হয়েছিল, আবার সেই একই প্রকার দ্রুততার সঙ্গে জটিলতার মীমাংসা হয়েছে।

নাট্যীয় কৌশলের চমৎকার স্ফূর্তি ঘটেছে—তৃতীয় গর্ভাঙ্কে। এই দৃশ্যে আটটি চরিত্র মঞ্চাবতরণ করেছে—কিন্তু কেউই নীরব শ্রোতা নয়। মঞ্চের সমস্ত চরিত্রই কথা বলেছে। এই দৃশ্যে অজয়—ইন্দুমতীর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার ঘটেছে। মঞ্চে আছে এই চরিত্রগুলির কথোপকথন ; নেপথ্যে আছে পদশব্দ, নূপুরধ্বনি, যন্ত্রধ্বনি ও নেপথ্যগীত—সেই গীতে কখনও বসন্ত বর্ণন, কখনও পূর্ণচন্দ্র বর্ণন, কখনও ব্রতসাঙ্গবিষয়ক। নেপথ্যগীত ছাড়া মঞ্চের ওপর বীণাবাদন পূর্বক একটি গীত আছে। এই দৃশ্যটির পরিকল্পনায় মঞ্চকৌশলের এক নতুন স্তর তৈরি হয়েছে। শব্দ সংলাপ হয় কেবল বাক্যে পরিণত হলে। কিন্তু শুধু শব্দও যে সংলাপের ভূমিকা নিতে পারে, মায়াকাননে আমরা তা দেখলাম। মঞ্চ ও নেপথ্য যুগপৎ এখানে ব্যবহৃত। বাংলা নাটকের ফলিত রূপের এক নতুন আয়তন সংযোজিত হোল।

এই নাটকের শেষ দৃশ্যটি পরিকল্পনায় দুইটি স্তর চোখে পড়ে। প্রথম স্তরে দেখতে পাই সুনন্দা ও ইন্দুমতীর প্রবেশ। তাদের কথোপকথনের মাঝখানে নেপথ্যে প্রথমে বজ্রধ্বনি, পরে তোপ ও রণবাদ্য শোনা যাচ্ছে। এই তোপ ও রণধ্বনি দূর থেকে ক্রমশ নিকটে শোনা যাবে। রাজা, শশিকলা কাঞ্চনমালা, রাজমন্ত্রী, রাজা ধূমকেতুর দূত ও কতিপয় সখী মঞ্চে প্রবেশ করবে। তাদের সকলের মুখেই নানা কথা শোনা যাবে, তারপরে রাজা অজয় আত্মহত্যা করবেন। এই আত্মহত্যার পর দ্বিতীয় স্তর শুরু। ঋষ্যশৃঙ্গমুনি ও কতিপয় নাগরিক প্রবেশ করবে। এই সময়কার সংলাপ দ্বৈত বাক্যালাপে পর্যবসিত হবে। শেষাংশে অপরের হস্তাবলেপ অনুমিত হয়।

কৃষ্ণকুমারীর প্লট নাটকের কুশীলবের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার অঙ্গন। মায়াকাননে চরিত্রের অনুগত প্লট নয়, চরিত্রই প্লটের অনুগত। তাই চরিত্রকে গড়ে তুলতে হয়নি; এগুলি গঠিত হয়েই এসেছে।

ইন্দুমতী প্রথম দৃশ্য থেকেই আমাদের কাছে স্বরূপে ধরা দেয়; আর অজয়ও অচেনা থাকেনা। অজয় চরিত্র হতে পারেনি, এই রকম একটা অভিযোগ আমাদের শুনতে হয়। অজয় এক বিশেষ জাতের ট্রাজেডীর নায়ক। এই জাতের ট্রাজেডীতে চরিত্র নয়, নিয়তি-তাড়িত ঘটনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সেক্সপীয়ার সম্বন্ধে যেমন আমরা বলি, 'character is destiny', এখানে আমরা বলব, ঘটনার অনিবার্যতাই একমাত্র গ্রাহ্য। অজয় কোন চরিত্র হয়নি, হয়েছে এক মর্মান্তিক দুর্ভাগ্যেব শিকার। অরুন্ধতী, মন্ত্রী, সুনন্দা—সবাই এক একটি পাত্র-পাত্রী, চরিত্র নয়।

এই নাটকে তাই কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই। মায়াকাননে নায়ক নেই। মায়া-কাননে নায়িকাও নেই—আছে একটি ঘটনা স্থল; সেই মায়াকাননই নাটকের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী 'চরিত্র'। কোন প্রধান চরিত্র না থাকায় সব চরিত্রই সমভাবে চোখে পড়ে। ইন্দুমতী যখন আত্মহত্যা করছে, তখন সখী সুনন্দাকেও অবহেলা করা হোল না। অজয়-ইন্দুমতী পছন্দমত দয়িত ও দয়িতা খুঁজেছে; তার জন্যই এই বিপত্তি। অভিশাপ তো স্থবির সমাজেব অভিশাপ।

অথচ নাট্যগ্রন্থনায় অধিকার সাধারণ নাগরিক ও নাগরিকাকেও দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এই নাটকে মঞ্চে এক বা দুই ব্যক্তি দখলদার হয়ে বসেনি। সংলাপের ক্ষেত্রেও এই গণতন্ত্রীকরণ চোখে পড়ে।

১ম অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে ইন্দুমতী সুনন্দার মধ্যে কথোপকথন প্রথমে সীমাবদ্ধ; তারপর মঞ্চে প্রবেশ করেছে অজয়। অজয়ের প্রথম সংলাপ নিঃসঙ্গতার সংলাপ, কিন্তু আত্মকথন নয়। তারপর সুনন্দা-ইন্দুমতী অজয়ের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয়েছে। মনে হতে পারে এই অংশে অজয় আর সুনন্দার বাক্যালাপ বুঝি মঞ্চ দখল করে বসেছে। কিন্তু তা নয়; ইন্দুমতীর ভ্রূভঙ্গি, বাক্যাংশ বা অর্ধস্ফুট বাক্য এই সবও কথোপকথনের পর্যায়ে পড়ে। এ গুলিও নাটকের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছে।

কৌমার্যের শোভন সুন্দর প্রকাশ হোল সুনন্দার এই ব্রীড়ালাঞ্ছিত অর্ধস্ফুট কাকলিগুলি। ভালবাসার দেবতায় পূজায় এই অর্ধস্ফুট কুসুমগুলিই ত যুগে যুগে নিবেদিত হয়। ১।২ গর্ভাঙ্কে রাজা-মন্ত্রীর কথোপকথনের পর শশিকলার

প্রবেশ—সেখানে রাজা, মন্ত্রী ও শশিকলা কেউ নির্বাক থাকেনি, আর তার সঙ্গে আর একটি সংলাপ যুক্ত হয়েছে, তা কোন মঞ্চস্থ কুশীলবের নয়। নেপথ্য থেকে 'পুরুষোক্তি বিরহগীত' শোনা গেল। রাজার কাছে শশিকলার ভাষণের চেয়ে এই বিরহসন্তপ্ত যুবাপুত্রের নেপথ্যগীত কম অর্থবহ নয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে একত্রে বহু নাগরিকের সমাবেশ ঘটেছে; এদের সংলাপ নাটকের নাটকত্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এরা অতীত ঘটনার স্মৃতিচারণ করেনি, তারা নাটকের চলমান ঘটনার মধ্যে অংশীভূত হয়েছে। রাজদরবারে একটি যুবতীসহ তিনজন পুরুষের প্রবেশে ঐ একই আঙ্গিক ব্যবহৃত। কোন চরিত্রই নীরব থাকেনি, মঞ্চের ওপর শ্রোতা ও কথক—এই দুইটি পৃথক্ শ্রেণী সৃষ্টি করেনি।

সংলাপের নাট্যসিদ্ধিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা বলেছি ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে ইন্দুমতীর ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংলাপ কুমারীর অর্ধস্ফুট কামনা ও অনুরাগের চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু প্রকৃত নাট্যগুণসম্পন্ন সংলাপের সাক্ষাত মেলে আর এক প্রকার উক্তিতে। নাটকের ভাবী পরিণতিকে ব্যঞ্জিত করে পাত্রপাত্রীরা কয়েকটি কথা বলেছে।

ইন্দুমতী। সখি! কি বল্লি? আমার বিবাহ? আমার বর?—যম। যেমন যদুপতি বাসুদেব রুক্মিণী দেবীকে হরণ করেছিলেন, তেমনি মৃত্যুপতি কৃতান্ত যদি এ দাসীরে শীঘ্র শীঘ্র হরণ করেন তবেই আমি বাঁচি।

এ উক্তি নাটকের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বার্তাবহ। এই ত যথার্থ dramatic irony। এ ভাষা হয়ত খুব স্বাভাবিক নয়; তবে মাইকেলের ইচ্ছা ছিল স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার। কিন্তু নাটকের ভাষা প্রধানত 'idealised' ভাষা।

ইন্দু। বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠছেন। উঃ কাননের বৃক্ষশাখা কম্পনে যেন ঝড় উপস্থিত হলো! বোধ হচ্চে, ভগবতী বনদেবী আমার উপর প্রসন্ন নন।

ভাবী ঘটনার ওপর এ কার কৃষ্ণ ছায়া পড়েছে!

ইন্দু। আজ যা দেখলাম, তা সত্য কি স্বপ্নমাত্র, এর প্রমাণ কেবল ভবিষ্যতেই হবে।

ভবিষ্যতে কি প্রমাণিত হয়েছিল, নাটকের দর্শকদের কাছে তা অজানিত নয়। একই প্রকার ধ্বংস বা মৃত্যুর চিন্তায় অজয়ের পিতা, অজয়—সকলেই ভারাক্রান্ত। অজয় মূর্চ্ছিত অবস্থায় বলেছে—আমি সম্মুখে কেবল রক্তস্রোত

দেখছি। আর ওকি? এক পরম সুন্দরী রমণীরূপে—সেই আমার মনো-মোহিনীর আর তার হৃদয়ে এক ছুরিকা। ৩।১

নিয়তির আক্রমন অপ্রতিরোধ্য!

এই নতুন কৌশল এই নাটকে বারবার ব্যবহৃত, নাটকের নিষ্করুণ পরিণতির সঙ্গে তাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ভিন্ন সুরও মাঝেমাঝে বেজেছে, নাটকের ২য় অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কটি সংক্ষিপ্ততম। এই দৃশ্যে ঢুলী প্রবেশ করেছে প্রমত্তভাবে, 'বিজ্ঞাপনী হস্তে' মধুদাস প্রবেশ করেছে। একবারই মাত্র মধুসূদন মধুর দাস হয়েছেন, নাটকের আর কোথাও প্রমত্ততার স্থান নেই।

নাটকের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অর্থসঙ্গতির পাশাপাশি সুরসঙ্গতি চাই। অপ্রয়োজনীয় অংশ পরিত্যক্ত হবে। তবে রেনেশাঁসের যুগে এ ব্যাপারে গ্রীকদের থেকেও অতি-গ্রীক হবার প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। মধুসূদন এসব বিষয়ে সজাগ ছিলেন। কারণ তিনি দেখেছেন গ্রীক ট্রাজেডীতে কমিক রিলিফ থাকত। নীট্‌শে বলেছিলেন, "Laugh, my young friends, if you are at all determined to remain pessimists"

সংলাপের মত এ নাটকে সঙ্গীত নাট্য-ঔচিত্য পালন করেছে। শব্দ আর ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য আছে। শব্দ থেকে বাক্যের উৎপত্তি, আর ধ্বনি থেকে সঙ্গীত। বাক্য ও সঙ্গীত দুই-ই সংলাপের অংশ হতে পারে। নাটকের সঙ্গীত আত্মস্থ সঙ্গীত হবে, পরস্থ সঙ্গীত নয়।

শর্মিষ্ঠার অধিকাংশ সঙ্গীতই পরস্থ সঙ্গীত—আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত (occasional songs); এগুলিকে দরবারী সঙ্গীতও বলা যেতে পারে। শর্মিষ্ঠার ২।২ গর্ভাঙ্কে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশিত—রাজার অনুরোধে গেয়েছে নটী। এটি ফরমায়েসী গান। দ্বিতীয় গান নেপথ্য সঙ্গীত—গেয়েছে শর্মিষ্ঠা। তৃতীয় গানটিও শর্মিষ্ঠার। এ দুটি গানই সংলাপের দোহারকি করেছে। চতুর্থ গান বন্দনাগীতি: এটিও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত।

পদ্মাবতীর আঙ্গিকও একই প্রকার।

কৃষ্ণকুমারীতে বিলাসবতীর মুখে একটি, সখীর মুখে একটি, কৃষ্ণকুমারীর মুখে দুইটি গান আছে, সে দুইটিই নেপথ্য সঙ্গীত। কৃষ্ণার গান পাখির গানের মতই স্বতঃস্ফূর্ত—হৃদয়বেদনা লাঘব করার মাধ্যম। এ গানগুলি ফরমায়েসী গান নয়, এগুলি নাট্যসংলাপেরই অংশ।

মায়াকাননে একটি ব্যতীত সবই নেপথ্যের গান। নেপথ্যগানের সংখ্যাধিক্যের কারণ, নাট্যকার গানগুলিকে দিয়ে শুধু নাটকের সংলাপের ঠিকাদারী বা গোলামি করিয়ে নিতে চাননি; ঐ নেপথ্য সঙ্গীতগুলি নাটকের মূল ব্যথাকে ব্যথিত করবে। পদধ্বনি, নূপুরধ্বনির মতই এগুলির ভাষা ভিন্ন ব্যাকরণের ভাষা। কখনও বসন্ত-বর্ণনা, কখনও পূর্ণচাঁদের বর্ণনা—এইভাবে মঞ্চের সংক্ষিপ্ত পরিসরের ব্যাপ্তি বাড়ান হচ্ছে। একটিমাত্র সংবাদবাহী গান—ব্রতসাঙ্গবিষয়ক গান। এটি ব্যতীত আর সব গানগুলিই যেন প্রকৃতির স্বকণ্ঠ নিঃসৃত গান। নেপথ্য থেকে মৃদু রোদনধ্বনিও আসবে ভেসে; সবই সংলাপের পর্যায়ভুক্ত। আসবে রণবাদ্য, তোপ ও যন্ত্রধ্বনি, বন্দীর গীত, কখন বজ্রধ্বনি, কখনও বা মৃতবাদ্য—সবই ত এ নাটকের নাট্যীয় সংলাপের নানান প্রকারভেদ।

মায়াকাননের গান তথ্যবাহী নয়, ইঙ্গিতপ্রবণ।

নাটকে সুখদ উক্তির স্থান নেই এমন নয়। কিন্তু বেদনার কথাই প্রধান; বৈরাগ্যের কথা নয়।

ইন্দুমতী শুনেছে সিন্ধুদেশের রাজা তাকে ধূমকেতুর হস্তে সমর্পণ করবেন। শশিকলা এসে জানাল।

ইন্দু। সখি! তুমি কাঁদো কেন?

শশি। প্রিয় সখি! তোমার মত অমূল্য ধন হারাতে গেলে, কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? তোমাকে কাল রাজা ধূমকেতু সিংহের শিবিরে গুর্জর নগরে যেতে হবে।

* * * *

প্রিয় সখি! তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয়ে থাকে, তা হলে না হয় কিছুদিন এ নগরে অবস্থিতি করো।

ইন্দু। না না সখি! অসুস্থ কি? এ ত আমার সুখের সময়। আমি এমন বরের অন্বেষণে যাত্রা করবো যে, তার সঙ্গে কখনো আমার বিচ্ছেদ হবেনা।

এই উক্তিতে ইন্দু দ্ব্যর্থব্যঞ্জক কথা বলেছে। নাটকের দর্শক এই উক্তির অর্থ জানে।

যখন ইন্দুমতী বলেছে, রাজা আমাকে বিনিময়ের সামগ্রী বিবেচনা করলেন। এই কি প্রেম? তখনই সিন্ধুনদের দিকে তাকিয়ে বলছে

—আজ রাত্রে সিন্ধুনদীর কি শোভাই হয়েছে! ওঁর কবরীতে কত শত তারারূপ ফুল শোভা পাচ্ছে। আর নিশানাথের রূপের কথা কি বলবো। যিনি ত্রিজগতের মনোহারী তাঁকে প্রশংসা করা বৃথা। মলয় বায়ু যেন সিন্ধুর সুশীতল জলে অবগাহন করে পুষ্পদলের দ্বারে দ্বারে পরিমল ভিক্ষা করছেন। হে বিধাতঃ তোমার বিশ্ব যে কি সুন্দর, তা কে বলতে পারে? তবু এতে এরূপ সুখহীন লোক আছে যে, তাদের কাছে এ আলোকময় সুখময় ভুবন অপেক্ষা, যমের তিমিরময় প্রভাহীন গৃহ বাঞ্ছনীয়। (করজোড় করিয়া) প্রভো! এ দাসীও ঐ ভাগ্যহীন দলের মধ্যে একজন! (রোদন)

ইন্দুমতীর এই উক্তি বৈরাগ্যের উক্তি নয়, এই সংলাপও শর্মিষ্ঠা-গোত্রীয় সংলাপ নয়, আর এই প্রকৃতিবর্ণনাও নাটকের অঙ্গসজ্জা নয়। যে-কান্নায় মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রাবণ বলেছে—

ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায় করিব
মহাযাত্রা।

সেই একই কান্নায় ইন্দুমতীর সমগ্র ভাষণ সিক্ত। ইন্দুমতীর এই কান্নার টীকা পাচ্ছি তপস্বিনীর উক্তিতে—

ভেবেছিলাম, যেমন, ভীষণদন্ত বরাহ ভগবতী বসুন্ধরার কোমল হৃদয় বিদারণ করে, উদ্যানশোভা লতিকার মূলোৎপাটন পূর্বক ভক্ষণ করে, সেইরূপ তাপসবৃত্তি কাল সহকারে অস্মদাদির হৃদয় কাননের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপে লতা-গুল্মাদির মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করেছে। কিন্তু এখন দেখছি আজও তা হয় নাই। তা হলে এ মোহের লহরী আজ কোথা থেকে উপস্থিত হলো।

মহাযাত্রার পূর্বে বারবার সিন্ধু নদের কথা মনে পড়ছে।

ইন্দু। হে সিন্ধুনদি! তোমার তীরে অনেক সুখ সম্ভোগ করেছি—কিন্তু এ চক্ষে তোমাকে আর এ জন্মে দেখবোনা। আশীর্বাদ করুন, এ কথা আর বলবো না, কেননা অতি অল্পকাল মধ্যে আমার পক্ষে কি আশীর্বাদ, কি অভিসম্পাত উভয়ই সমান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব, বিদায় করুন! আমি প্রণাম করি।

কপোতাক্ষ নদীতীরের অধিবাসী দত্তকবি আপন ধাত্রীস্বরূপা নদীকেই সিন্ধুনদের মধ্যে বোধ হয় প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই এ ব্যথা ইন্দুমতীরও বটে, ইন্দুমতীর স্রষ্টারও বটে।

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত, তোমার কথা, ভাবি এ বিরলে ;
* * *
বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?

শুধু প্রকৃতির প্রতি মমতা নয়,—এই মমতার অঞ্জনে মানবজীবনও কত সতৃষ্ণ আকুতির স্থল। ১ম অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্কে মায়াকাননে ইন্দুমতীর সঙ্গে অজয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটেছিল,—সেদিন আমরা দেখেছি ইন্দুমতীর প্রতি "সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অজয়ের প্রস্থান।" আর যেদিন চরম বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ, সেদিন সুনন্দার মুখে "বোধ করি, মহারাজ আসছেন" শুনে ইন্দুমতী বলেছিল :

"রে অবোধ মন! তুই এত চঞ্চল হলি কেন? ও চন্দ্রমুখ আবার দেখলে আর কোন সুখ আছে? ক্ষুধাতুরের সে সুখাদ্য অপ্রাপ্য, সে খাদ্য দেখলে তার ক্ষুধা বাড়ে মাত্র।"—এ উক্তি কি শ্মশান-বৈরাগ্য সূচিত করে?

ইন্দুমতীর সর্বশেষ উক্তিও একই প্রকার জীবন-অনুরাগে সিঞ্চিত।

ইন্দু। (আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্বক করযোড় করিয়া) হে বিশ্বপিতা! যে অমূল্য রত্নস্বরূপ জীবন এ দাসীকে প্রদান করেছিলেন, তা এর জ্ঞাতসারে এখনও কোন পাপে কলুষিত হয় নাই। তবে যে আপনার সম্মুখে অকালে যাত্রা করছি, এ দোষ, হে করুণাময়। মার্জনা করবেন! এ দুঃখ আর সয় না।

শুধু প্রকৃতির প্রতি মমতানিবদ্ধ নয়, এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য-মমতা ও করুণা প্রকাশমান, আর এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের মধ্যে যে সুধা ও বেদনার তরঙ্গ নিয়ত প্রবহমান, তা একসঙ্গে আকুলিত করেছে মায়াকাননের দুই অভিশপ্ত যুবক-যুবতীকে। **'Man and Nature stand in a continuous relationship in the tragedies'.**

এই কারণে এই নাটকের বড় অংশ নদীতীরে ও উদ্যানে সংঘটিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার সব আশা-ভরসা নিঃশেষে চুকে গেলেও জীবনের প্রতি মমতা ক্ষয় হয় নি। গভীর জীবন-অনুরাগ ব্যতীত কঠিনতম ট্রাজেডির উৎপত্তি ঘটে না। ওথেলো যখন মৃত্যুবরণ করে, তখনই ত সে বলেছে—

I pray you, in your letters,
When you shall these unlucky deeds relate,
Speak of me as I am ; nothing extenuate,
Nor set down aught in malice. Then must you speak
Of one that loved not wisely, but too well." (Act V, Sc II)

মায়াকানন গ্রীক নাটক ও নিয়তিবাদ

এ্যান্টিগোনে [১০] যখন ইসমিনেকে বলেছিল—**You need not fear for me, fear for yourself.** তখন থেকেই নাটকের ঘটনা প্রবাহ চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলল। নাটকের শেষে ক্রিওন বলল—**I am nothing. I have no life.**

কোরাসে বলা হোল—

Of happiness the crown
And chiefest part
Is wisdom and to hold
The Gods in awe
This is the law.
That, seeing the stricken heart
Of pride brought down,
We learn when we are old.

এ হয়ত নাটকের শিক্ষা, কিন্তু ক্রিওন তো আমাদের ইন্দুমতীর মতই মৃত্যুকে স্বাগতম জানাচ্ছে—

Come, my last home end fairest,
My only happiness...come soon
Let me not see another day.
Away......... ..away.

শুধুমাত্র সুনিবিড় আশাবাদের যুগেই গভীরতম ট্রাজেডি রচিত হতে পারে, নীট্‌শের এই মূল্যায়ন পুরোপুরি সার্থক।

"There is an intellectual predilection for what is hard, aweful, evil, problematical in existence owing to the fulfilment of life"—Nietzsche.

সুগভীর মর্ত্যানুরাগী ব্যতীত নিষ্করুণ বেদনার সঙ্গীত আর কে গাইতে পারে? যে-নাটকে এক মানবসন্তানের কণ্ঠ থেকে শোনা গেল—

"I am nothing. I have no life."

সেই নাটকেই ত সমবেত কণ্ঠে এই সঙ্গীত উদ্‌গীত হয়েছে—

Wonders are many on earth, and the greatest of these
Is man, who rides the ocean and takes his way
Through the deeps, through wind-swept-valleys of perilous seas.
That surge and sway.
He is master of ageless Earth, to his own will binding
The immortal mother of Gods by the sweat of his brow.
As year succeeds to year with toil unending * * *

মায়াকানন আর গ্রীক নাটক একই সুরে বাঁধা। সেই মানবপ্রেম, সেই অপরিসীম মর্ত্য-অনুরাগ, সেই অন্ধ নিয়তির দুরতিক্রম্য অনুশাসনের কাছে বিপন্ন মানবের মূঢ় নতিস্বীকার! কৃষ্ণকুমারী নাটক সমালোচনাপ্রসঙ্গে ডক্‌টর সুকুমার সেন বলেছিলেন, "কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্যচক্র গ্রীক ট্রাজেডির অপরিপূর্ণ নিয়তির মত সমগ্র নাটকটির উপর ছায়াপাত করিয়াছে।"

ডক্টর সেনের এই মূল্যায়ন নির্ভুল। কারণ সে যুগে কৃষ্ণকুমারীর এই ট্রাজিক রস সমালোচকেরা প্রীতির চোখে দেখেননি। গ্রেট ন্যাশনালে 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নাটক অভিনীত হলে সমালোচক এই নাটকটিকে কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে তুলনা করে বললেন, ঐ নাটক কৃষ্ণকুমারী অপেক্ষা উন্নততর রচনা। "কৃষ্ণকুমারীর নৈতিক উপদেশ অস্বাভাবিক বিকৃত ভাবাপন্ন।"[৩১] সমালোচক কর্মফলশূন্য নিয়তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করলেন। শুধু কি কৃষ্ণকুমারীতে এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান? মেঘনাদ বধ কাব্যেও একই নিয়তিতত্ত্ব দেখা দিয়েছে।

"মধুসূদনের কাব্যে যে অদৃষ্টবাদের একটি প্রবল ভাবধারা প্রায় আদ্যোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন; এবং ট্রাজেডি কল্পনায় ইহার উপযোগিতা বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্ত্য কবিদিগের নিকটেই ঋণী।"[৩১ক]

মোহিতলালের বক্তব্যের এই সীমারেখা পর্যন্ত আমরা সহযাত্রী হতে পারি; কিন্তু তিনি যখন লেখেন, "কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল; এই অদৃষ্টবাদে খ্রীষ্টিয়ান পাপ

তত্ত্ব অথবা আদি গ্রীক চিন্তার অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার—এ দুইয়ের কোনটিই নাই।"[৩২] তখন আপত্তি জানাতে হয়।

মোহিতলালের মূল্যায়ন শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে হবে মাইকেলের অদৃষ্টবাদের সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ তিনি হয়েছেন। রাবণ অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচারই সর্বত্র দেখেছেন; তাই তাঁর আক্ষেপ—'কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে।' নইলে পরস্ত্রী অপহরণ করেছেন তিনি, এবং সেটা যে জঘন্যতম পাপ, এ কথা লঙ্কার শিশুরাও জানে।

রাবণের কাছে পরস্ত্রীহরণ একটা কূটনৈতিক চাল, ভগ্নী অপমানের প্রতিশোধ। তাই তাঁর দুর্গতির পশ্চাতে কোন কারণ নেই। শুধু জানেন—

"প্রাক্তনের গতি হায় কার সাধ্য রোধে।"

একই প্রকার চিন্তা কৃষ্ণকুমারীতে দেখা দিয়েছে; কর্মফল নয়, অজ্ঞেয় নিয়তি জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তছনছ করে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ চলে না।

বাংলাদেশের বিশেষ সামাজিক অবস্থায় ব্যক্তির উল্লম্ফনের ইচ্ছা প্রকট, কিন্তু কোন এক অনির্দেশ্য শক্তি তার গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির (দুর্লক্ষ নয় অবশ্য) অদৃশ্য হস্তের নিপীড়নে সব আশা-আকাঙ্ক্ষার কুসুমগুলি মুকুলেই ঝরে যাচ্ছে। মাইকেল এই অপমৃত্যুকে নীরবে মেনে নেননি! রাবণের বিলাপ, ভীম সিংহের অব্যবস্থিত চিত্ততা, আর সর্বশেষে অজয়-ইন্দুমতীর আত্মহত্যা– সেই দুর্লক্ষ্য শক্তির অহেতুক অনাচারের বিরুদ্ধে উনিশ শতকীয় বাঙালীর দর্পিত প্রতিবাদ। এ আত্মহত্যা আত্মবিলুপ্তি নয়, নয় আত্মসমর্পণ।

সোপেনহাওয়ের বলেছিলেন, মানবজীবন হোল কতিপয় দর্পের সমষ্টি; আর ট্র্যাজেডি হোল সেই দর্পের 'প্যারাবেল'। মাইকেলের ট্রাজেডি হোল উনিশ শতকের নবজাগ্রত বঙ্গশিশুর কুণ্ঠিত আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যাহত 'প্যারাবেল'। এই অর্থেই রাবণের মধ্যে যেমন আমরা মাইকেলকে দেখেছি, ভীম সিংহের মধ্যে এবং অজয়ের মধ্যে আমরা মধুসূদনকেই নিঃসংশয়িতভাবে দেখতে পাই। স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই কান্নায় কাঁদছে। মায়াকানন এই ট্রাজেডি-চিন্তাকে আরও প্রকটিত করেছে, নিরঙ্কুশ করেছে। করুণরস আর এই ট্রাজিক রস এক বস্তু নয়। কোন ঐশ্বরিক অনুজ্ঞা ভঙ্গ করায় ট্রাজেডির এখানে সূত্রপাত; মায়াকাননে তাই সেক্সপীয়র পরিচালক-দেবতা নন।

মায়াকাননের নায়ক-নায়িকা কোন অসদ্‌বৃত্তির প্রশ্রয় দেয়নি, যেমন প্রশ্রয় ছিলনা কৃষ্ণকুমারীতে। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক সমসাময়িক; কাজেই এই দুইটি রচনায় সমজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্বাভাবিক। তের বৎসর পরে সেই দৃষ্টি কেবল প্রখরতর হয়েছে।

মায়াকাননে পৌঁছে আমরা কৃষ্ণকুমারীর জীবন-বীক্ষার তীব্রতর রূপ দেখতে পাই। ঘটনার পরিমাণ কমিয়ে এবং বক্তব্যের ফলায় শাণ দিয়ে এখানে ট্রাজেডির রূপকে আরও নির্দিষ্ট ও লক্ষ্যমুখী করা হয়েছে। শিল্পের ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে হেগেল বলেছিলেন, সৃষ্টির আদি যুগে বিষয়সম্ভার শিল্পকে আবৃত করে ফেলেছিল; বর্জন ও মার্জনার ফলে পরবর্তী যুগে বিষয় ও আত্মার মধ্যে দেখা দিল সঙ্গতি।

কৃষ্ণকুমারী আর মায়াকাননের মধ্যে কালগত ব্যবধান এতটা নয়। কিন্তু রূপগত ব্যবধান একই রকম। মায়াকাননে পৌঁছে মাইকেলের নাট্য-বিষয় ও ট্রাজেডিবোধের মধ্যে সঙ্গতি সাধিত হয়েছে।

দেহ অসুস্থ, মন অশান্ত—এই ধরনের নানা সংবাদ আমাদের জানা। কিন্তু এর কোন কিছুই তাঁর শিল্পপ্রত্যয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। ছোটখাটো ব্যাপারে অমনোযোগের চিহ্ন যে নেই, তা নয়। যেমন তপস্বিনীর ব্যবহারে বিশ্বাসযোগ্যতার পরিমাণ কম।

যে-মেধা নিরন্তর সাধনার বলে প্রবীণতায় ও পরিপক্কত্বে পৌঁছেছিল, শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে প্রতিবন্ধক হয়েছে। কয়েকখানি 'Epicling' লিখে মহাকাব্য রচনার উপযোগী 'puccafist' যেমন তিনি অর্জন করার অভিপ্রায়ী ছিলেন, শর্মিষ্ঠা থেকে কৃষ্ণকুমারী পর্যন্ত তেমনি ধাপে ধাপে এগিয়ে তিনি তাঁর জীবনের মহত্তম ট্রাজেডি রচনার জন্যও প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু—"শুখাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি"। শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনই তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠতম ট্রাজেডি হোল।

সমসাময়িক মঞ্চ তাঁর সমসাময়িক ছিল না। তাঁর পদ্মাবতী, তাঁর কৃষ্ণকুমারী, তাঁর প্রহসনদ্বয় তাঁর সাধের মঞ্চ "কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জলিত নাট্যশালা" কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তাই পরবর্তীকালে অভিনয়ের জন্য মায়াকাননের উপসংহার পরিবর্তিত করতে হয়েছিল। কোথায় 'ভারত সংস্কারক'-ভৎর্সিত "অস্বাভাবিক বিকৃত ভাবাপন্ন নৈতিক

উপদেশ"-পরিপূর্ণ ট্রাজেডি, আর কোথায় মঞ্চায়িত মায়াকাননের জন্মান্তরবাদ ও ভারতীয় কর্মফল !

যে-মঞ্চ সতী নাটকের সংস্করণান্তরে উপসংহার পরিবর্তনে বাধ্য করে, যে-মঞ্চে 'জনার' মৃত্যুর পর দেবলোকদর্শন বাধ্যতামূলক, সেই মঞ্চই তো মাইকেল মধুসূদনের মঞ্চ। তাঁর আত্মভাষণ-ই তাঁব সর্বোত্তম মূল্যায়ন—

"Born in an age too soon."

প্রহসন

মাইকেলের প্রহসনদুটি তাঁর নাট্যকার-জীবনের আদিপর্বে লিখিত। শর্মিষ্ঠা রচনার পরই 'একেই কি বলে সভ্যতা' রচিত হয়েছিল।

তখন শর্মিষ্ঠা নাটকের মহলা চলছে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ লিখলেন, "শর্মিষ্ঠার প্রথম অভিনয়ের পর এবং ঐ নাটকের পুনরভিনয়ের পূর্বেই আমি চাই কয়েকটি পারিবারিক প্রহসন অভিনীত হোক। দর্শকদের দেখাতে চাই একই সময়ে এবং একই অভিনেতৃগোষ্ঠীকে নিয়ে আমরা গম্ভীব ও হাস্যোদ্দীপক নাটক মঞ্চস্থ করতে পারি।"

এই ইচ্ছার দরুন প্রহসন দুটি রচিত হোল। শর্মিষ্ঠা থেকে কৃষ্ণকুমারী—কালগত ব্যবধান সামান্য। কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনার সময় তিনি জানালেন, "Instead of lengthening it I would rather write a Farce to be acted with it."

মাইকেল বড় নাটকের সহযোগী রূপে এই প্রহসনদ্বয় রচনা করেছিলেন। ইংরিজিতে যাকে বলে 'afterpieces, এ দুটি তাই। মাইকেল তাঁর রচনাকে 'farce' বলেই অভিহিত করেছেন।

প্রহসন রচনায় সে-যুগে ভীষণ ঝুঁকি ছিল। কারণ তখনকার নাট্যপ্রসঙ্গে তরল রঙ্গরস ছিল মুখ্য। যাত্রার সর্ববিধ আসরে সঙ ছিল সাধাবণ ব্যাপার। এই সঙ ছিল অশ্লীল গ্রাম্য ও ইতর পরচর্চা।

"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। ...যাত্রার মঞ্চ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্য রচিত।[৩২] ঈশ্বর গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হুতোম এই প্রাচীন রীতি বা প্রচলিত রীতির প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি।

মাইকেল প্রহসন রচনার সময় এই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তখনকার ভদ্রসাহিত্যের অঙ্গনে হাস্যরসের ঠিক স্থান দেওয়া চলত না। এই

কারণে মাইকেল এক চিঠিতে লিখছেন, "As a scribbler, I am of course to think that you like my farces but to tell you the candid truth, I half regret having published those two things. You know that as yet we have not established a National Theater, I mean we have as yet got a body of sound, classical dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces."

মাইকেল তবু প্রহসন লিখেছিলেন। এবং লিখেছিলেন গ্রাম্যতা পরিহার করে, অশ্লীলতার প্রসঙ্গ এড়িয়ে। অথচ তাঁর নাট্যপ্রসঙ্গের ভিত্তি হোল সে-যুগের প্রাচীনপন্থী-নবীনপন্থী উভয়ের বথামি। এই উভয় সম্প্রদায়ের আপাত বিরোধিতার পশ্চাতে মিলটা কোথায় তা-ই দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি।

দুইটি নাটকের গল্পই বিশেষ অর্থে সমসাময়িক। 'একেই কি বলে সভ্যতা' গ্রন্থে নব্য সমাজের আতিশয্য তিনি তুলে ধরেছেন।

একেই কি বলে সভ্যতা

একেই কি বলে সভ্যতাব কাহিনী হোল নিম্নরূপ :—নবকুমার এক নব্য শিক্ষিত যুবক, তার বাবা পরম বৈষ্ণব, বৃন্দাবনে বসবাস করেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। পুত্র নবকুমার ইয়ারবক্সী নিয়ে কলকাতায় দুশো মজা লুটে বেড়ায়। সেদিন তার কর্তা মহাশয় কলকাতা ফিরেছেন। নবকুমারের বাড়ি থেকে বেরনো ভার হ য়েছে। ইয়ার কালীনাথ বাবু কর্তার জ্ঞাতি ভাই পরম বৈষ্ণব ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভাইপো পরিচয় দিয়ে নবকুমারকে তাদের জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় নিয়ে যাবার অনুমতি আদায় করল। বৃদ্ধকে বুঝান হোল যে, কলেজে কেবল ইংরিজি চর্চা হয়; জাতীয় ভাষার কোন চর্চা হয় না। এই সভাটি সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি শনিবার একত্র হয়ে এখানে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করা হয়। বলা বাহুল্য একথা শোনার পর ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ ঐ সভায় পুত্রকে উপস্থিত হবার অনুমতি সানন্দে দিলেন। যাবার সময় তারা সভাস্থলের ঠিকানা জানিয়ে গেল।

কর্তামশায় জানেন এ কলকাতা শহর বিষম ঠাঁই। ছেলেকে একলা পাঠান যুক্তিযুক্ত হয় নি ভেবে এক বৈষ্ণব বাবাজীকে তত্ত্বতলাশ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

তত্ত্বতল্লাশ নেবার জন্য প্রেরিত হয়ে বাবাজী সিকদার পাড়া স্ট্রীটে এসে পৌছুলেন। এই গলিতে কোন ভদ্রলোক বাস করে ব'লে তাঁর মনে হোল না;

কারণ প্রথমে এক মাতালের সঙ্গে সাক্ষাতকার ঘটল, পরে দুই বেশ্যা। বেশ্যাদের রঙ্গমস্করায় বাবাজীর যন্ত্রনার এক শেষ হোল। দূরে সার্জন ও চৌকিদারের আলো দেখতে পেয়ে পলায়ন করতে গিয়ে পুনরায় ফ্যাসাদে পড়লেন। চোর বলে ধৃত হলেন। বাবাজীর ঝুলির মধ্যে চারটি টাকা ছিল; সার্জন টাকা কয়টা পেয়ে আর অত্যাচার করল না। সার্জন বেটার হাত-পাতা রোগ ছিল বলে এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। হোটেলের বাক্স নিয়ে দুজন মুটে প্রবেশ করল; তারপর মালী বরফওয়ালারা এল এবং চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে যন্ত্রীদের সঙ্গে নিতম্বিনী ও পয়োধরী নাম্নী দুই নর্তকী এল; তারা বিশেষ একটি গৃহে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে নবকুমার ও কালীবাবু এসে উপস্থিত হলেন। বাবাজীকে দেখে নবকুমার ভড়কে গেল। বাবাজীকে নবকুমার ভিতরে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু বাবাজী অন্যত্র কাজ আছে বলে সটকে পড়লেন। অবশ্য তার পূর্বে নবকুমার কিছু ঘুস দিয়েছে। এদিকে নবকুমারদের আসতে দেরী দেখে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার অন্যান্য রত্নেরা চৈতন্যবাবুকে সভাপতি করে সভার কাজ আরম্ভ করে দিল। প্রথমে এল ব্র্যাণ্ডি ও তামাক। তারপর বেশ্যার সঙ্গীত। পয়োধরীর গীত সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নবকুমার ও কালীনাথ বাবু এ হেন বিচিত্র সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রথমে শিবু নবকুমারকে 'লায়ার' বলায় একটু গণ্ডগোল হোল। এই গণ্ডগোল দুই এক কথায় মিটে গেল। পয়োধরীর নাচ শুরু হবার পূর্বে নবকুমারের 'স্পীচ' শুরু হোল। নবকুমারের বক্তৃতা থেকে এই সভার উদ্দেশ্য বুঝা গেল—

> আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে। এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সোসীয়াল রিফরমেশনের' কর্মসূচীও তিনি দিয়েছেন;

> জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এডুকেটকর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তাহলে এবং কেবল তাহলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে নচেৎ নয়।

এত সব বক্তৃতা শেষ হোল নিতান্তই মদ্যপানে ও বাইজীর নৃত্যগীত শ্রবণে।

নবকুমারবাবু এখানে বসে মদ্যপান করে এবং বাইজীর নৃত্যগীত শুনে স্বপরষ্টিসনের শিকলি কাটছেন ; আর তাঁর স্ত্রী তাঁরই শয়নকক্ষে আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে তাস খেলছেন। গৃহিনীর মুখ থেকে হরকামিনী জানতে পারলেন যে, তাঁর স্বামী আজ জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় গেছেন। এবং এই সভায় যাবার অর্থ কি তাঁর জানা। একদিন এই সভা থেকে এসে নবকুমার তাঁর বোনের গালে চুমো খেয়েছিলেন। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে নেপথ্যে মত্ত নবকুমারের চীৎকার শোনা যেতে লাগল। ভৃত্য বৈদ্যনাথের সঙ্গে তিনি ঘরে ঢুকে প্রলাপ বকতে শুরু করে দিলেন। কর্তা এই সময় গিন্নীর কক্ষে ভাত খেতে বসেছেন।

গৃহিনী পুত্রের প্রলাপ শুনে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর ধারণা তাঁর দুধের বাছাকে কেউ নিশ্চয়ই বিষটিষ খাইয়েছে।

কর্তা এসে পড়লেন! তিনি এক নজর দেখেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটি কি! পুত্ররত্নের প্রলাপ শুনে গৃহিনী কান্নারত, তাকে তিনি বললেন, কাঁদবার কারণ নেই, নব মাতার্ল হয়েছে। নবকুমার কর্তাকে মদ আনতে বললেন, স্ত্রীকে 'পয়োধরী' নামে সম্বোধন করলেন। কর্তা বললেন, কলকাতা শহর পাপের নিকেতন, এখানে কোন ভদ্রলোকের বাস করা উচিত নয়। কর্তা ঘোষণা করলেন যে, আগামী কাল প্রভাতেই সকলকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করবেন।

একেই কি বলে সভ্যতা ও সমসাময়িকতা

মাইকেলের এই কাহিনী সমসাময়িক কলকাতার নৈমিত্তিক কাহিনী। হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের সম্বন্ধেও একই প্রকার মদ্যপান-আসক্তির কথা শোনা যেত। সে-যুগে সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকরে এই সব খবর রসিয়ে-রসিয়ে প্রকাশ করা হোত। তবে নব্যশিক্ষার অর্থই এই প্রকার বেহায়াপনা নয়। সে যুগের নব্য শিক্ষিতরা যে একটু উন্নততর রুচি ও ন্যায়নীতিবোধের পরিচয় দিতেন, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। "A Young Bengal is a synonym with truth."[৩৩] ইয়ং বেঙ্গলদের ভূমিকার এই দুইটি দিক অনুধাবন করতে না পেরেই ডক্টর ভট্টাচার্য লিখেছেন," নববাবু ইয়ং বেঙ্গলের যোগ্য প্রতিনিধি।"[৩৪] ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ যেভাবে মানিকতলার সিংহবাবুদের

উষ্ঠানে একাডেমির অধিবেশনে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার স্ফুলিংগ ছড়াইয়া বাংলার সমাজ ও ধর্ম ধ্বংস করিতে চাহিতেন এখানে যেন তাহারই পুনরভিনয় চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত বাক্‌সর্বস্ব বিদ্রোহী যুবকবৃন্দের মূল লক্ষ্য যে সমাজ-সংশোধন কিংবা ধর্মসংস্কার নয়, পরন্তু ইন্দ্রিয়বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল এপিকিউরীয় নীতিই ইহাদের সারকথা, নবকুমারের উক্তির মধ্য দিয়া মাইকেল ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন—'ইন্ দি নেম অফ্ ফ্রীডম লেট য়াস এঞ্জয় আওয়ার-সেলভস্!"[৩৫]

এই দুই লেখকই ইয়ংবেঙ্গলদের প্রকৃত স্বরূপ খতিয়ে দেখেন নি; 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদকের বক্তব্য এতদিন পরে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে যুক্তি নেই।

ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন, "ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই আমাদের জানিত কোন না কোন নববাবুর দ্বারা আচরিত হইয়াছে।" অবশ্যই হয়েছে। এই কারণে নব্যবাবুদের আপত্তিতে এই নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হতে পারেনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এখানে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়েছে।

এ বিষয়ে ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতার বিশ্লেষণই ঠিক। তিনি বলেছেন,"... it only reveals some of the extreme tendencies which marked the action and behaviour of "Young Bengal."[৩৬]

'ইয়ং বেঙ্গল' সবাই এক শ্রেণীর লোক ছিলেন না। এ বিষয়ে বেশি-বাক্য ব্যয় না করে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেবরেণ্ড ডঃ মুলেন্সের বোম্বাই-প্রদত্ত বক্তৃতা উদ্ধৃত করা গেল:

"Of the class who are called Young Bengal, some were not young—some had attained the age of 40 or 50; but they were men who entertained advanced ideas about the government of the country, the education of the people, the rights they should enjoy, and think that the natives may take a greater part in political and social affairs than they have done before. These men were far in advance of their contemporaries. In Calcutta, there were 20,000 of them who possess a very good education, who speak, and read and write English well, and all of whom about one fourth or one fifth really enjoy the study of English literature

not merely for the sake of increasing their own powers to earn a livelihood, but because they highly enjoy it. To them study is a pleasure, and they enjoyed that pleasure as a relaxation from the graver business of life."[৩৭]

অতঃপর ডক্টর মুলেন্স ইয়ং বেঙ্গলদের তিনটি দলে ভাগ করেছেন—"first the beef-eaters, secondly, the thinkers,—men imbued with a very serious religious spirit , thirdly, the Brahmists or the Deist party." প্রথম দলকে তিনি বাতিল করে দিলেন ; দ্বিতীয় দল সম্বন্ধে তিনি বললেন, "it was composed of studious men who can talk sensibly upon many topics and who are really well-informed." এই দ্বিতীয় দল সম্বন্ধে ডক্টর মুলেন্স বলছেন যে তিনি এঁদের অনেককেই চেনেন ; এবং তিনি দেখেছেন এঁরা জীবনের গভীর প্রত্যয় সম্বন্ধে কৌতূহলী, আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু। "Many of them were honestly inclined, and heard and read and studied religious truth" (Hindu Patriot, April 9, 18:6)

কাজেই আধুনিক গবেষকেরা যখন 'ইয়ং বেঙ্গল' বলতে একবর্ণ সমাজের কথা বলেন, তখন প্রকৃত ঘটনা থেকে তাঁরা অনেক দূরে বিচরণ করেন ; সেকালের সভা-সমিতির ভূমিকা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

একাডেমিক এসোসিয়েশন অনেক পূর্বের ব্যাপার। মধুসূদনের ছাত্রাবস্থায় ছিল সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (Society for the Acquisition of General Knowledge) ; ১৮৩৮ সালে এই সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা সত্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র ছিল। মধুসূদনের সমসাময়িক আর একটি সভা হোল কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা ; ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক কল্যাণকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাছাড়া আরও অনেক সভা-সমিতি ছিল। মধুসূদন তাই সভা বা সঙ্ঘ বিশেষের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেননি ; বিভিন্ন সভা সমিতির প্রতিষ্ঠার নাম করে যে প্রকার বাড়াবাড়ি দেখা দিয়েছিল তাঁর লক্ষ্য ছিল তার প্রতিবাদ করা।

মাইকেল তাঁর কাহিনীকে দুইটি অঙ্ক ও চারিটি গর্ভাঙ্কে পরিবেশন করেছেন। নাটকের সমগ্র ঘটনা অপরাহ্ণ থেকে রাত্রি দশটার মধ্যেই শেষ হয়েছে। শুধু ঘটনার স্থান পরিবর্তনের জন্যই দৃশ্য পরিবর্তন করতে হয়েছে।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

মাইকেলের দ্বিতীয় প্রহসন হোল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যশোহর জেলার এক প্রাচীনপন্থী ভূম্যধিকারীর অনাচারের কাহিনীতে সমৃদ্ধ। 'এ কেই কি বলে সভ্যতা' কলকাতা নগরীর হালফিলের কেচ্ছা, আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সামন্ততান্ত্রিক বাংলার অতি পুরাতন সামাজিক দর্পণ। বাংলাদেশ পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পরিবর্তনের পথের প্রতিবন্ধকতা কোথায়—শহরে ও গ্রামে কোন কোন শক্তি বিপথগামিতার পথ প্রশস্ত করছে, মাইকেল তা তুলে ধরলেন।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকের গল্পাংশ হলো নিম্নরূপ :—

ভক্তপ্রসাদবাবু একজন গ্রাম্য ভূম্যধিকারী ; তিনি অতি প্রবীন ব্যক্তি, কিন্তু তবু পরস্ত্রী ফুসলাতে কার্পণ্য করেন না। হানিফ গাজী তাঁর এক প্রজা। বাকি খাজনার দায়ে তাকে ধরে নিয়ে জমাদারের জিম্মায় দিতে আদেশ দিলেন। যখন ভক্তপ্রসাদবাবুর কর্মচারী গদাধর জানাল যে হানিফের ঘরে এক সুন্দরী বৌ আছে, এবং সে অল্পবয়সী, তখন বৃদ্ধের জিহ্বা রসসিক্ত হোল। হানিফকে ছেড়ে দিতে বললেন। এবং গদাকে বললেন ছুঁড়িকে বশ করার ব্যবস্থা করতে। গদা ওরফে গদাধর কুড়ি টাকা চেয়ে বসল, কৃপণ ভক্তপ্রসাদ টাকার পরিমাণ শুনে প্রথমে একটু মুসড়ে গেলেন, পরে বললেন বৈঠকখানা থেকে টাকা নিয়ে আসতে।

সদ্যোমাতৃবিয়োগে কাতর বাচস্পতি মহাশয় এসে ভক্তপ্রসাদ বাবুর কাছে মাতৃদায় উদ্ধারের জন্য কিছু সাহায্য চাইলেন। ভক্তপ্রসাদবাবু বললেন, তাঁর এখন নিতান্ত কুসময়। অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল করতে হবে। এখন তিনি কিছু দানধ্যান করতে পারবেন না। বাচস্পতি মহাশয় একটু ক্ষুণ্ণ মনেই প্রস্থান করলেন।

বাচস্পতি মহাশয় প্রস্থান করলে ভক্তপ্রসাদবাবু হানিফের বৌ প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন ; আর তা ছাড়া ভটচাযিদের মেয়ে ইচ্ছা, পীতাম্বর তেলীর মেয়ে পঞ্চী সবার প্রসঙ্গেই বৃদ্ধের লোভাতুরতা প্রকাশ পেল। গদা তাই বলল, বুড়ো হলে লোভাত্তি হয় ; কোন ভালমন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষে থাকে না। পঞ্চীকে দেখে বুড়ো 'লোভাত্তি' হোল ; গদাকে এবিষয়ে বলল। গদা এ বিষয়ে অক্ষমতা জানালে তার পিসীর সন্ধান করা হোল।

পুঁটি কুট্টিনীর ভূমিকা গ্রহণ করে হানিফের গৃহে গিয়ে ফতেমাকে ভক্তপ্রসাদ বাবুর ইচ্ছার কথা জানাল। ফতেমা আগে থাকতেই স্বামীর সঙ্গে এ ব্যাপারে মতলব এঁটেছে। পুঁটির কাছ থেকে টাকা নিল, সন্ধ্যাবেলা আম বাগানে গিয়ে হাজির হতে রাজি হোল। হানিফের সঙ্গে বাচস্পতি মহাশয়ের দেখা হোল; হানিফ বাচস্পতিমহাশয়কেও তাঁর চক্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করে নিল। আমবাগান থেকে পুকুরের ধারে যে ভাঙ্গা শিবমন্দির আছে, পুঁটি ফতেমাকে সেখানে নিয়ে বলল। বাচস্পতি মহাশয় হানিফের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে বিস্মিত হলেন।

ভক্তপ্রসাদবাবু তাঁর ছেলে অম্বিকাপ্রসাদকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করেছেন; কিন্তু তাঁর ভয় পাছে ছেলে কোন অধর্মাচরণ করে। অধর্মাচরণ বলতে তিনি বোঝেন, দেবব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি। কলকাতায় নানান জাত একাকার হয়ে যাচ্ছে শুনে তিনি বড়ই চিন্তিত হলেন; কারণ এতে হিঁন্দুয়ানির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

ভক্তপ্রসাদবাবু অভিসারে বেরুবার জন্য উসখুস করছেন। খুব সেজেছেন আজ তিনি। শান্তিপুরে ধুতি, আর মাথায় তাজ পরে এক হাস্যকর সজ্জা করেছেন ভক্তপ্রসাদবাবু। তাজ পরায় টিকিটা ঢাকা পড়েছে। গায়ে একটু আতর মেখেছেন। মুসলমান নারী, যদি প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে।

যাত্রার সময় জানিয়ে গেলেন যে, যদি কেউ খোঁজ করে তবে যেন বলা হয় যে তিনি এখন জপে আছেন।

হানিফ ও বাচস্পতিমহাশয় পূর্বাহ্নেই ভগ্ন শিবমন্দিরের কাছে এসে উপনীত হয়েছে। হানিফ আজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা; বাচস্পতি মহাশয় তাকে শান্ত করছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে হানিফ বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে নিকটস্থ একটি গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকল।

ফতেমাকে সঙ্গে নিয়ে পুঁটি এল। একা ফেলে রেখে পুঁটি চলে যেতে চাইলে ফতেমা খুব আপত্তি জানাল। গদাধরের সঙ্গে ভক্তপ্রসাদবাবু এসে উপস্থিত হলেন। ভক্তপ্রসাদবাবু অনেক লালসার কথা বললেন; পুঁটি তখন জানায় যে, ফতেমার বড় ভয় করছে-পাছে কেউ দেখে ফেলে। সে পরামর্শ দিল—ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলে ভাল হয়। এই কথা শুনে ভক্তপ্রসাদবাবু বললেন যে, হাঁ, ভগ্নশিবে ত শিবত্ব কিছু নাই। এতে কোন অপরাধ হবে না। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ সরীর জন্য হিন্দুয়ানী ত্যাগ করলে কোন

অপরাধ হবে না। এমন সময় নেপথ্য থেকে গম্ভীর স্বরে ভক্তপ্রসাদের উদ্দেশ্যে ভর্ৎসনা বাণী উচ্চারিত হোল। ভক্তপ্রসাদ সন্ত্রস্ত হলেন, গদা কাঁপতে লাগল, পুঁটি মূর্চ্ছিতা হয়ে ভূতলশায়িনী হোল। ওষ্ঠ এবং চিবুকদ্বয় বস্ত্রে আবৃত করে হানিফ দ্রুত প্রবেশ করল; গদাকে দুইচার থাপ্পড় মারল; ভীত ভক্তপ্রসাদের পিঠের ওপর চেপে বসে দুইচার কিলঘুসি মারল, পুঁটিকে লাথি মারল। এবং এইসব প্রহারাদির পর চক্ষের নিমেষে প্রস্থান করল।

তখন রামপ্রসাদী পদ গাইতে গাইতে বাচস্পতি মশায় প্রবেশ করলেন, সকলকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখে, এবং একই স্থানে এই ভাবে হানিফগাজীর বৌকে দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তখন জাত-কুল-মান রক্ষার জন্য ভক্তপ্রসাদবাবু আর কী করেন! বাচস্পতি মশায়ের যে জমি গ্রাস করেছিলেন, তা ফিরিয়ে দেবার তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, এমন কি তাঁর মাতৃদায় উদ্ধারের জন্য আরও পঞ্চাশ টাকা সাহায্যস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। কিন্তু শাস্তি এখানেই শেষ নয়, ফতেমার স্বামী হানিফগাজী এসে হাজির হোল। ভক্তপ্রসাদবাবুর যে মুসলমান হতে সাধ গিয়েছে, সে খবর জেনে সে আনন্দ প্রকাশ করল, বলল, ফতেমা অপেক্ষাও সুন্দরী মেয়ে সে সংগ্রহ করে দেবে।

ভক্তপ্রসাদবাবু দেখলেন তাঁর জাতকুল সব কিছু যায়। তিনি তখন দুশো টাকা দিয়ে মুক্তি ক্রয় করলেন; সমুচিত শিক্ষা হোল তাঁর।

মাইকেল এই নাটকে পল্লীগ্রামস্থ জমিদারের লাম্পট্য বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন, "পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিত রূপ ভক্তপ্রসাদ কয়জন আছেন? কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমিদার সচরাচর দেখিতে পান কি? ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছে।" নব্য শিক্ষিতদের সমালোচনামূলক 'একেই কি বলে সভ্যতা' যে কারণে তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছিল, সেই একই কারণে দ্বিতীয় গ্রন্থ নিন্দিত হয়! মাইকেলের জীবনীলেখক যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন, "মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতার' ন্যায় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' তাঁহার কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ভক্তপ্রসাদরূপে কল্পিত রহিয়াছেন, এবং হানিফগাজী পাঁচী তেলিনী প্রভৃতি নামগুলিও তাঁহার স্বগ্রামের কোন কোন স্ত্রী পুরুষের নাম হইতে অবলম্বিত হইয়াছিল।"

হয়ত সত্য সত্যই গ্রামের বাস্তব মানুষ দেখে তিনি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু এ জাতীয় মানুষ সব যুগেই সত্য। ভণ্ডামি সনাতন সত্য।

রামমোহন রায় তাঁর 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তিকায় এক বকধার্মিকের চিত্র দিয়েছেন। হুতোম-প্রদত্ত বকধার্মিকের চিত্রের সঙ্গে তার আক্ষরিক সাদৃশ্য আছে। লালবিহারী দে-র সমালোচনায় যবণীরমণী গমনেরও সংবাদ আছে। কলকাতায় 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা' এক সময়ে বিশেষভাবে কুখ্যাত ছিল; কাজেই মধুসূদনের চিত্র অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট নয়।

প্রহসনের শিল্প-কৌশল

এই প্রহসন দুটি রচিত হয়েছে এমন এক নাট্যকারের দ্বারা, যিনি ঐ সময়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মত বিষাদঘন মহাকাব্য লিখছেন, 'কৃষ্ণকুমারী'র ন্যায় মর্মান্তিক ট্রাজেডি লিখছেন।

ট্রাজেডি ও কমেডি একই বাণীসাধকের লেখনী মুখে উৎসারিত হতে পারে না, এই রকম একটা বক্তব্য বহুদিন অনতিউচ্চারিত থেকে গেছে। অথচ বহুকাল পূর্বেই এই মতের মূল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন দার্শনিকেরা, তত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা ও সাহিত্যরসজ্ঞরা। "Tragedy is really implicit or un-completed comedy"—একথা গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। দান্তে তাঁর মহৎ গ্রন্থের নামকরণ করলেন 'Divine Comedy'; তখন তিনি এই ভেদ-চিন্তার বিলুপ্তি চাইলেন। মহামতি সক্রেটিস বলেছিলেন, "The genius of comedy is the same with that of Tragedy."

মানুষের মধ্যে দ্বৈত সত্তা আছে; নাটকে এসে সেই দ্বৈত সত্তা ট্রাজিক ও কমিক রূপে প্রকাশ পায়। কমেডি তাই ট্রাজেডির বিপরীত নয়, বিকল্প। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে যে বিরোধ, ট্রাজেডিতে তার আপোষহীন আত্মপ্রকাশ, কমেডিতে পাই এই বৈপরীত্যের একটা আসান।

সক্রেটিস বলেছিলেন ট্রাজেডি ও কমেডি একই মাতৃগর্ভের সন্তান। জনৈক আধুনিক সমালোচক বলেছেন যে, কথাটা তাঁর যুগ অপেক্ষা সেক্সপীয়রের যুগে অধিকতর সত্য ছিল।

আমরা অবশ্য মনে করি সেদিনও ঐ কথা সত্য ছিল। একই জ্বালায় সোফোক্লিস আর এ্যারিষ্টফেনিস কলম ধরেছিলেন।

মাইকেল যে-বেদনায় বিচলিত হয়ে রাবণের ভুবন এঁকেছেন, সেই বেদনা তাঁকে নবকুমার ও ভক্তপ্রসাদ আঁকতে প্ররোচিত করেছে।

এক ক্ষেত্রে তিনি সহানুভূতিতে একাত্ম হয়েছেন, অপর ক্ষেত্রে তিনি যুক্তির দাবী মেনে নিরপেক্ষ হতে চেয়েছেন। একস্থানে তিনি স্বয়ং রাবণ, ভীমসিংহ বা অজয়, অপর স্থানে তিনি নবকুমার নন, ভক্তপ্রসাদ নন। তিনি তাদের দ্রষ্টা। ট্রাজেডি প্রসঙ্গে তাই শুধু চোখের জল, আর কমেডি প্রসঙ্গে অট্টহাসি বিবেচ্য নয়। ট্রাজেডিতে জীবন আছে তার নিগূঢ় বাস্তবতা নিয়ে; কমেডিতে বাস্তবতা কালাতিশয় নয়, বরং বিশেষ কালের কূলবধূ। কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকাননে বাস্তব জীবন আছে সূক্ষ্ম শরীরে, আর প্রহসনদ্বয়ে আছে প্রত্যক্ষতার স্থূল রম্যতায়। কমেডিকে তাই বলা হয় নাটকে সাংবাদিকতা।

গ্রীক কমেডিতে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবন নিরপেক্ষভাবে বর্ণিত, আর বাস্তব জীবন সেক্সপীয়রীয় রীতিতে স্বপ্নের মায়াঞ্জন মেখে এসেছে। তখন রেনেসাঁস এসে গেছে, নব মানবতাবাদ দেখা দিয়েছে। শুধু বুদ্ধির বপ্রক্রীড়ায় কেউ আর সন্তুষ্ট নয়, মানুষ ঢুকে পড়ল তার মানবিকতা নিয়ে কমেডির প্রাঙ্গনে। তাই নির্বিশেষ চরিত্রের পরিবর্তে এল বিশেষ চরিত্র, 'টাইপে'র পরিবর্তে 'ক্যারাকটার'। রোমান্যটিক ট্রাজেডি যেমন বহু হত্যায় বা মৃত্যুতে অবসিত হোত, রোম্যানটিক কমেডি তেমনি জোড়ায়-জোড়ায় মিলনে বা বিরহে পরিসমাপ্তি লাভ করতো।

গম্ভীর নাটকে মাইকেল চলে এসেছেন সংস্কৃত আদর্শ থেকে গ্রীক আদর্শে, মাঝখানে ক্ষণকালের জন্য সেক্সপীয়ার ছিল তাঁর বিশ্রামনিকেতন।

কৃষ্ণকুমারীতে কিছুটা স্থান সেক্সপীয়ারের জন্য ছেড়ে দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত ভিন্ন পথগামী। কমেডিতে তিনি সেক্সপীয়রের ছায়াও মাড়ান নি। তিনি চলে গেছেন গ্রীসে, গ্রীসের থেকে রোমে। আর রোম হয়ে সোজা ফ্রান্সে মলিয়েরের রঙ্গস্থলে।

নাটক দুইখানিকে গ্রীক রীতির ছত্রছায়ায় এনেও মাইকেল সেই রীতির দ্বারা পুরো প্রভাবিত হন নি।

মাইকেল নাটক দুইখানিকে farce' নামে অভিহিত করেছেন। 'farce' বলতে আমরা এক বিশেষ জাতের নাটক বুঝে থাকি। ইটালীতে 'farce' এর ছড়াছড়ি—বলা হয়ে থাকে ওখানকার অবসরভোগীদের (lazzi) প্রিয় প্রমোদ-কলা এটি। এই farce হোল টুকরো ঘটনার বিচ্ছিন্ন সমাবেশে রচিত নাটক, অধিকাংশই স্ফীতিপ্রাপ্ত কুশীলবদের নিয়ে, আকস্মিকতা ও পুনরাবৃত্তির নৌকা বেয়ে বিহার করে। এগুলি ছিল বড় নাটকের সহযোগী; দর্শক টানবার শিল্প

'কৌশল'। আর অভিনেতারাও ছিলেন চিহ্নিত ব্যক্তি, আর তাঁদের অভিনয়ও ছিল বাঁধা সড়কে প্রাত্যহিক পদচারণা।

মাইকেল প্রথম থেকেই সযত্নে এ পথ এড়িয়ে গেছেন; অতিকথিত চরিত্র তিনি আমদানী করেন নি; ঘটনাগুলিও যোগসূত্রহীন নয় (Episodic), আকস্মিকতা ও পুনারাবৃত্তি তাঁর মূলধন নয়। আর এই জাতীয় নাট্যরস পরিবেশন করার জন্য তাঁর হাতে কোন অভিজ্ঞ অভিনেতৃগোষ্ঠী ছিল না। বরং উল্টোটাই সত্য। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের পত্রখানি স্মরণযোগ্য।

মাইকেল সম্ভবত আকারে ক্ষুদ্র এবং বড় নাটকের লেজুড় বলে এগুলিকে 'farce' নামে অভিহিত করেছিলেন। মাইকেলের প্রহসনের কোনটিই হাস্যার্ণব নয়, কলিরাজার যাত্রা নয়, বা জেলে পাড়ার সঙ নয়। তিনি হাসতে হাসতে নাটক লেখেন নি, তিনি হাসাবার জন্য নাটক লিখেছেন। কারণ তিনি জানতেন, "The genius of comedy is the same with that of tragedy." মলিয়েরের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর ভাষণ এক হয়ে গেছে—'If the object of comedy is to correct the vices of men...one can easily put up with rebuke but one cannot bear chaff. One may have no objection to being wicked, but one hates to be ridiculous" যে জীবন পরিপূর্ণতার স্বপ্ন দেখে, সেই রাবণের দুর্ভাগ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; সে-ই স্বপ্ন বিপর্যস্ত হলে নবকুমারের ভাগ্যকে নিয়ে পরিহাসে ব্রতী হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্রষ্টার চোখে ব্যঙ্গের হাসি ছাপিয়ে অন্য একটি প্রতিক্রিয়া চিক্ চিক্ করে ওঠে। ভক্তপ্রসাদ ভৎ'সিত হয়েছে, কিন্তু সংশোধনের পথও দেখতে পেয়েছে।

প্রহসনে সংশোধনের সদিচ্ছা সব দেশেই দেখা যায়—একটা নীতিবোধ থেকে এই ইচ্ছার দীপ প্রজ্জলিত হয়। এবং এই নীতিবোধ বিশেষ ভাবে সেই যুগের। মাইকেল নবকুমারকে নবীন পথের পথিক দেখতে চেয়েছেন নৈমিষ্যারণ্যের গুরুগৃহ-লালিত শিক্ষার্থীরূপে নয়। সেই নবীন পথ স্পষ্টভাবে আঁকা আছে 'আলালের ঘরের দুলালে', রামতনু লাহিড়ী ও বিদ্যাসাগরমহাশয়ের জীবনে। মাইকেলের নীতিবোধ সর্বকালীন নয়, বিশেষভাবে উনিশ শতকীয় অর্থাৎ তাৎক্ষণিক। কমেডির অন্তর-নির্দেশের সঙ্গে তার মিতালী রয়েছে। মাইকেল সভা-সমিতি স্থাপনের বিরোধী ছিলেন না, ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, কুসংস্কার বা প্রাচীন সংস্কার পরিবর্তনের অপক্ষপাতী ছিলেন না। কাজেই নবকুমারকে তিনি যে সমালোচিত

করেছেন, এই সব পরিবর্তনের বিরোধিতার জন্য নয়। তাঁর সমালোচনা স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, অনাচারের বিরুদ্ধে, নীতিহীনতার বিরুদ্ধে। যাঁরা সমাজকে অস্বীকার করেন, বিদ্রোহ করেন, তাঁরা মাইকেলের চোখে শত্রু নন; কিন্তু যারা তার স্থবিধা ভোগ করে অথচ তাকে বিকৃত করে, মাইকেলের চোখে তারাই হোল দুশমন। তিনি রামগতি ন্যায়রত্নের চক্ষু দিয়ে সমালোচনা করেন নি; সমালোচনা করেছেন রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতির চোখ দিয়ে। বাস্তব জীবন তাঁর যেমন সমালোচনার বিষয়, তেমনি আবার বাস্তব দৃষ্টান্তই তাকে এই সমালোচনায় উৎসাহিত করেছে। কেউ কেউ বলেছেন এই প্রহসন দুটিতে তাঁর বাস্তব জ্ঞান বিস্ময়কর! শর্মিষ্ঠা থেকে মায়াকানন সমসাময়িক জীবন অবলম্বনে রচিত সাহিত্য নয়। কিন্তু তাই বলে সমসাময়িক বাস্তব জীবন তার মধ্যে পরোক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তা কি বলা যায়? ঐ সব নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতিভূ হতে বাধা কোথায়? জীবন, চলমান জীবন যতখানি তার ওপর দখল ঘোষণা করে, ততখানিই সাহিত্য হিসাবে তা সার্থক। কারণ সাহিত্য জীবনের মুকুর নয়, জীবন তার অবলম্বন নয়, সে-ই জীবন; কখনও পূর্ণভাবে, কখনও অংশতঃ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এই নাটকদ্বয়ে অনেকে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলেন; শুধু এই কারণেই ত এ নাটক বেলগাছিয়া মঞ্চে অভিনীত হতে পারেনি। শুনেছি মলিয়েরের 'The Misanthrope' পড়ে প্রখ্যাত দার্শনিক রুশো দারুণ চটে গিয়েছিলেন। ঐ নাটকে তিনি বোধ হয় আত্মসাদৃশ্যের সাক্ষাৎ পান।

শুধু চরিত্রগুলির সমসাময়িকতার জন্য মাইকেলের এই নাটক অতিশয় বস্তুনিষ্ঠ বলে সমাদৃত হয়নি; জীবন্ত সাবলীল ভাষা এই নাটকের প্রখর বস্তুনিষ্ঠার আর একটি দিক। নাটকের বিষয় যেমন নীচে নেমে এসেছে, মাটির কাছাকাছি, এর ভাষাও তেমনি পুথির বেড়া ডিঙ্গিয়ে ওষ্ঠের সান্নিধ্যে এসেছে।

কেউ কেউ বলেছেন মাইকেল গদ্য লিখতে পারতেন না। অথচ নাটকের ভাষা গদ্য নয়, পদ্যও নয়, নাটকের ভাষা মুখের বুলি। সেক্সপীয়ার কমেডিতে পদ্য ব্যবহার করেছেন; কারণ তাঁর কমেডি গ্রীক কমেডির বা রোমক কমেডির আদর্শে নয়। মলিয়ের গদ্যে নাটক লিখেছেন কিনা, তা বলতে আমাদের সাহস নেই। তাঁর কোন নাটকের হঠাৎ-বাবু নায়ক যখন শুনল যে, সে যে-ভাষায় কথা বলছে, তা হোল গদ্য, তখন সে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আবার বলছি নাটকের ভাষা গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। নাটকের ভাষা মানুষের মুখের বুলি। মাইকেল নাটকের বিষয় যেমন বদলেছেন, শ্রেণী এবং যুগভেদে নাটকের সংলাপের ভাষাও তেমন-তেমন পালটেছেন।

প্রথম প্রহসন কলকাতার চলতি বুলি গ্রহণ করেছে। ইংরিজি শিক্ষিত উনিশ শতকীয় যুবার ভাষা, প্রবীন কর্তার ভাষা, গৃহিণীর ভাষা, বাইজীদের ভাষা, বধূদের ভাষা—সবই পৃথক। এমন কি বাইজীর গানও উনিশ শতকীয় গানের মেজাজের সঙ্গে শব্দ-সমতা রেখেছে।

দ্বিতীয় প্রহসনের ভাষাও বিষয়ের সঙ্গে খাপেখাপে মিশে গেছে। যশোহরের গ্রামীন ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন—কিন্তু সেখানে বাচস্পতি আর ভক্তপ্রসাদ দুই ভাষায় কথা বলেছে; আর হানিফগাজী ও তার স্ত্রী ফতেমা ও পুঁটি পর্যন্ত এক ভাষায় কথা বলেনি। তাই 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র ভাষা বলে পৃথক কোন ভাষা নেই, আছে ভক্তপ্রসাদের ভাষা. হানিফগাজীর ভাষা, ফতেমার ভাষা। আর এই সব বিশিষ্ট বাচনভঙ্গীকে শাসন করেছে যশোরের আঞ্চলিক উপভাষা।

১. আমার বোধ হয় অম্বিকা প্রসাদ কখনই এমন কুকর্মাচারী হবেনা—সে আমার ছেলে কিনা। প্রভো তুমিই সত্য। ভাল আমি শুনেছি যে কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, সোনার বেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই নাকি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়ার করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ। (১/২)

২. (সরোষে) এমন গরুচোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর তুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারী গো নামে মারো, তাগোর সব লুটে লিয়ে, তারপর এই করে। আচ্ছা দেখি এ কুম্পানির মুলুকে এনছাফ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এত বড় মকদুর। আমি গরিব হলাম বলে বয়্যে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর আমার বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবিগিরি করেনি। শালা— (১/২)

৩. (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু! পাতি নেড়ে বেটাদের বাড়িতেও আসতে গা বমি বমি। থু, থু, কুঁকড়র পাখা প্যাঁজের খোসা। থু, থু। তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে। এত যে বুড়, তবু

আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নেই। (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান, ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ মরি, কি নিষ্ঠে গো!

৪. শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী। রাম বলো! কলিদেব এতদিনেই যথার্থরূপে এ ভারত ভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ, দেখ, যে কথা বল্যেম তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস তবে দেখছি আমাদের উভয়েরই উপকার হতে পারবে।

বক্তার নাম আমরা উল্লেখ করলাম না। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। শব্দ-চয়ন, বাক্যগঠন, বিরামচিহ্ন-ব্যবহারের স্বতন্ত্র রূপ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। ভাষার এই স্বাতন্ত্র্যে নাটকের কুশীলবেরা নাটকোচিত হয়েছে। অন্যবিধ নাট্যীয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও রোমক রীতিতে মাইকেল শুধু টাইপ তৈরিই করেছেন। পরিতাপের ব্যাপার যে, মাইকেল আদৌ পূর্ণ অবয়বের কমেডি রচনা করলেন না। তিনি রচনা করেছেন পূর্ণ নাটকের সহযোগী ক্ষুদ্র নাটিকা। এ ক্ষেত্রেও প্রমিথিউস-প্রতিভা তার প্রকৃষ্ট পথে পরিচালিত হয়নি।

আমরা সবাই জানি মাইকেল নাটকের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় যোজনা করতে চেয়েছিলেন, স্বতন্ত্র নাট্যরীতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন; কারণ তিনি পোষণ করতেন স্বতন্ত্র নাট্যবোধ।

Plays are not simple dialogue or conversation with actions and tense events added or interpersed.

* * *

I am of opinion that our drama should be in blank verse and not in prose.

* * *

If I should live to write other Dramas, You may rest assured I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya darpan. I shall look to the great Dramatists of Europe for models. That would be the founding a real National Theatre.

I have certain dramatic notions of my own which I follow invariably. Some of my friends—and I fancy you are among them, as soon as they see a drama of mine, begin to apply the canons of criticism that have have been given forth by the masterpieces of William Shakespeare. They perhaps forget that I write under very different circumstances.

নাটকের অগৌণ সমস্যা থেকে শুরু করে নাটকের মৌলতম সমস্যা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সজাগ। বাংলার জাতীয় নাটক ও জাতীয় চরিত্রের ভূমিকাও ছিল তাঁর কাছে স্পষ্ট। তবু বাংলা নাটক তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বিশ্বসাহিত্যের পংক্তিভুক্ত হোল না। তবে তিনিই নবীন ও নিশ্চিত পথ বাতলে দিয়েছেন, রূপ ও রীতির প্রাথমিক সূত্রগুলি পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছেন।

"Ease can be obtained by only practice and I am as yet a mere novice. But I hope I am a progressive animal."

'প্রগতিশীল জীব' অচিরকালেই দেখেছেন নাট্যভূখণ্ডে তাঁর প্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের প্রচলিত' জীবনবোধ। উনিশ শতকের বাঙ্গালীর চিৎপ্রকর্ষের শ্রেষ্ঠ ধন তাই প্রকাশ পেল কবিতার মধ্য দিয়ে।

"Another branch of art is seducing my soul at present from the Old Love."

কাব্যের পথেই তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি সম্ভব হোল। নাট্যাধ্যক্ষদের উৎসাহহীনতা বা মঞ্চের শৈশবাবস্থা তার একমাত্র কারণ নয়। বরং নাট্যউৎসাহ ব্যাপক ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের তদকালীন সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট নাটক বা ঐ বিশেষ সাহিত্যরীতির সম্যক বিকাশের পক্ষে উপযোগী ছিল ব'লে আমাদের মনে হয় না। বোঁটায় আঘাত করলে ফুল ত ফোটে না। তাই মাইকেল অভিমানভরে বলেছিলেন, **"Born in an age too soon!"**

নাটক প্রমোদকলার অতিরিক্ত, এই বোধ তখনও জাগে নি। যে-চেতনার প্রস্ফুটনে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হোল, পরবর্তীকালে যে-চেতনার স্নেহচ্ছায়ায় 'কপালকুণ্ডলা'-'রাজসিংহ' রচিত হোল, নাটকে সেই উন্নত জীবনবোধের শিল্পিত রূপ স্বীকৃতি পেল না।

পাদটীকা

১. Bengali Drama—P. Guha Thakurta. Page—71.

২. Eurasian-10 Nov, —1848,

৩. Bengali Drama—P. Guha-Thakurta. P. 71

৪. বা. সা. ই—২য় খণ্ড—সু. সে. পৃ—৪৯—৫৪

৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ। পৃ—৮১।

৬. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য। ১ম খণ্ড। পৃ—১৫৬।

৭. ঐ, পৃ—১৫৭।

৮. Hindoo Patriot 1866

৯. বিবিধার্থ সংগ্রহ—১৭৮০ শক।

১০. বা. সা. ই—সু. সে. পৃ.—৫৩।

১১. বা. না. ই.—আ. ভ. ১ম খণ্ড—পৃ—১৬৭।

১২. এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ- ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭.

১৩. বা. সা. ই.—সু. সে. পৃ—৫৪।

১৪. ভট্টাচার্য—পৃ ১৬৭—১৬৯।

১৫. ঘোষ—পৃ—৮৩।

১৬. বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। ১৩৪২ সাল। চতুর্থ সংস্করণ, পৃ—২৩১।

১৭. Guha Thakurta P. 79.

১৮. ভট্টাচার্য—পৃ—১৬৭.

১৯. „ —পৃ—১৭২।

২০. „ —পৃ—১৭০।

২১. „ —পৃ—১৭০।

২২. সু. সে—পৃ—৫৮।

২৩. J. n Todd—Aunals and Antiquities of Rajasthan.

২৪. পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভটাচার্যেরস্মৃতি-বিপিনবিহারী গুপ্ত। ১৩২০ সংস্করণ। পৃ—১৫.

২৫. পুরাতন প্রসঙ্গ—অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা
২য় পর্যায়—পৃ—১৩১।

২৬. ভট্টাচার্য—পৃ—১৯৯।

২৭ সু. সে—পৃ—৬১।

২৮. ঐ পৃ—৬১

২৯. Poetics—Aristotle. Butcher. Book—VI ; Chap—14.

৩০. Antigone—Penguin classics.

৩১. কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার। পৃ—১২৮।

৩১ক. ভারত সংস্কারক, ২৫ মাঘ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ।

৩২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(সাহিত্য সংসদ সংস্করণ)

৩৩. ঐ

৩৪. ভট্টাচার্য পৃ——১৯০.

৩৫. ঘোষ—পৃ—৯৯.

৩৫. Guha Thakurta. Page—84

৩৭. Hindu Patriot—9 April, 1866

মাইকেল সমসাময়িক নাটক

মাইকেল যখন নাটকের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত, তখন আরও দুজন শক্তিমান নাট্যকারের আবিভাব ঘটল। এবং এই দুই নাট্যকার দুই বিপরীত প্রবণতা নিয়ে নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন।

একজন বাংলা নাটককে আরও বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে দিলেন, দ্বিতীয়জন পুরাণের আশ্রয়ে নবীন যুগের দাবী অংশত পূরণে সচেষ্ট ছিলেন।

প্রথমব্যক্তি যাত্রা শুরু করলেন নিয়মবহির্ভূত নাট্যশৈলীর অবতারণা করে; পরে ফিরে এলেন গৃহীত নিয়মের অঙ্কে। দ্বিতীয় ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ অবধি নিয়ম-অনুগত নাটক লিখলেন; সূচনায় সে-নিয়ম ছিল পুরাতনের বা প্রাচ্য সংস্কারের অনুবর্তন, পরে ধীরে ধীরে নবীন রীতি প্রশ্রয়িত হোল।

দীনবন্ধু কী ইউরোপীয়, কী ভারতীয় কোন নাট্যশাস্ত্রকে আদর্শ ভেবে মঞ্চে পদার্পণ করেন নি। বাস্তবের রূপায়নে স্বতঃই যা উদ্ভূত হয়, তাই হোল তাঁর নাটক। তাঁর নাটকের চরিত্র তোরাপের মতই তা মাটির একান্ত সন্তান। সম্ভবত এ নাট্যরীতি সে-যুগে ছিল অসমসাহসিক, রাজনৈতিক অর্থে নয়, নাট্যিক জিজ্ঞাসার দিক থেকে। শুধু স্বদেশীয় সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও। এ্যারিষ্টটল এবং ভরতমুনি দুই শাস্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে তিনি পথভ্রষ্ট হন নি। মনোমোহন প্রথমে ভরতমুনির নির্দেশ মাথা পেতে গ্রহণ করলেন (সতী নাটকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য), সেই মাথা আবার ইউরোপীয় আদর্শেও বিচলিত হোল—(প্রণয় পরীক্ষা দ্রষ্টব্য)।

বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে পরস্পরবিরোধী এই দুই পরীক্ষা-মূলক প্রয়াস আজ ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের বিষয়।

দুই নাট্যকারের পথ-পরিক্রমায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহাত্মক ভূমিকার গুরুত্ব আছে। মাইকেলই ত প্রথম দেখালেন যে, কোন নিয়ম অনিবার্য নয়, অবিনশ্বর নয়। নিয়ম সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশিত করে মাত্র। মাইকেলের ন্যায় দীনবন্ধু ও মনোমোহন এ সত্যকে মেনেছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৪)

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দীনবন্ধুর সাহিত্যজীবন স্থরু হয় ; এই সময় থেকে সংবাদ প্রভাকরে পদ্যরচনা স্থান পেতে থাকে। পদ্য ছিল সে যুগের কুলীনতম সাহিত্য-শাখা। বঙ্কিমের মত গদ্যের লেখকশ্রেষ্ঠকেও পদ্যরচনা দিয়েই সাহিত্য-জীবন শুরু করতে হয়েছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপন করে দীনবন্ধু সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ—এই পাঁচ বৎসর তাঁকে উড়িষ্যা ও বাঙ্গলা দেশের নানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে হয়। "দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছিলেন।" বাস্তবের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে তিনি আর মিলন-বিরহ নিয়ে পদ্য লিখলেন না। লিখলেন বাস্তব সমৃদ্ধ গদ্যরচনা, 'নীলদর্পণ'।

নীলকরদের কুকীর্তি নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৫০ সালে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হোল ; তার আট বৎসর পরে হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রেস থেকে 'বাপ্‌রে বাপ্‌ নীলকরের অত্যাচার' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশিত হোল ; গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় এ বিষয়ে নানা খবর বেরুল ; 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে (৮৫৮) একই সময়ে নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ে কিছু তথ্য স্থান পেল। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই বিষয়ে পদ্য লিখলেন।[২]

এই সব গদ্য-পদ্য রচনার খবর দীনবন্ধু জানতেন। হয়ত তিনি মনে করলেন যে সংকট যত গভীর, এগুলি তত গভীর নয়। এগুলি যত প্রত্যক্ষ, তত বাস্তব নয়। চাই দর্পণ! তাই ভূমিকায় তিনি লিখলেন—

> "নীলকর নিকর করে, নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শনপূর্বক তাঁদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা কলঙ্কতিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য।"

আর নাটকের উপসংহারে জনৈক পাত্র বলেছে,

> "স্বরপুর নিবাসী বসুকুল নীলকীর্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর!"

ভূমিকা আর উপসংহার পাশাপাশি বসালে দেখা যাচ্ছে যে, বিষয়টি বাস্তব ও জীবন্ত ঘটনার মধ্যে প্রকাশ পেলে তবেই প্রতিবাদ সার্থক হয়, এই রকম একটি ধারণা তিনি পোষণ করতেন। স্বভাবতই অন্যান্য প্রতিবাদকারী অপেক্ষা

তাঁর ভূমিকা ছিল পৃথক্। আর সবাই ছিলেন সাংবাদিক; আর তিনি হলেন শিল্পী। তাঁদের উৎকণ্ঠা ছিল প্রথমত রাজনৈতিক, আর দীনবন্ধুর ছিল মানবিক এবং সাহিত্যিক। দীনবন্ধুর পথ তাই স্বতন্ত্র।

শৈশবে যিনি লিখতেন কবিতা, যৌবনের পূর্ণাবস্থায় তিনি লিখলেন নাটক। পরেও তিনি কবিতা লিখেছেন, 'সুরধুনী কাব্যে' বাস্তব জগতের নানা সংবাদ স্থান পেয়েছে। কিন্তু তাঁর নাটকই তাঁর বাস্তবজিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট দলিল। শিল্পীর অজ্ঞাতসারেই নাট্যরূপ তাঁর বিশিষ্ট মাধ্যম হয়ে উঠেছে এবং বাংলা সাহিত্যে অভিজ্ঞতার ক্লিষ্ট উপস্থিতির সংশোধন ঘটিয়েছে।

দীনবন্ধুর নাট্যকারজীবন মাত্র বারো বৎসর স্থায়ী, মাইকেল অপেক্ষা দীর্ঘতর, তবে পৃথিবীর অন্যান্য মহৎ নাট্যকারের তুলনায় স্বল্পকালীন। নাটক যৌথশিল্প; মঞ্চ ও দর্শক সম্বন্ধে প্রারব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যতীত নাটক রচনা সম্ভব নয়।

দীনবন্ধু একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন; এবং আঠারো বৎসরের চাকুরী জীবনে তাঁকে অন্তত আঠারো বার বদলি হতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বিস্ময়ের বিষয় বাঙ্গলা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা! সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই।"[৩] কেবল বহুদর্শিতা কোন ব্যক্তিকে শিল্পী করে না, দীনবন্ধুকেও করে নি। কিন্তু তই বহুদর্শিতা তাঁর নাটকের ভিতটাকে শক্ত করেছে।

দীনবন্ধু ও আধুনিকতা

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মাইকেলের একটা সুস্পষ্ট প্রত্যয় ছিল: একদিকে মেঘনাদবধ কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী ও মায়া কানন নাটকদ্বয়; অপরদিকে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, ও বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রোঁ সেই ভুবনের মানচিত্রের সম্পূর্ণতা দান করেছে। দীনবন্ধুর জীবনবোধ এতখানি বিচিত্র ও বহুমুখী ছিল না, ছিল না তুলনীয়রূপে প্রজ্ঞাসমন্বিত। তাঁর নাটকের কোন প্রতীকপ্রবণতা নেই। তবু চলমান জীবনকে তিনি অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। সে-যুগের জীবনবোধ বাহ্যত তাঁর নাটকে অধিকতর প্রকট।

১. সরলতা। প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই। (নীলদর্পণ ২।২)

২. রাজা। হে প্রজাবর্গ, আমার প্রাণাধিকা প্রমদার পুনরাগমনের স্মরণচিহ্নস্বরূপ অদ্যাবধি আয় সম্বন্ধীয় করের নিরাকরণ করলাম।

তপস্বিনী। প্রাণবল্লভ, লবণ ব্যবসায় রাজার একায়ত্ত হেতু দীন প্রজাগণের যে ক্লেশ, অধীণী কাঙালিনী অবস্থায় বিশেষ রূপ অনুভব করচে, অধীণীর প্রার্থনায় এ নিদারুণ নিয়ম খণ্ডন করে, হীন প্রজাসমূহের অসহনীয় দুঃখভার হরণ কর। (নবীন তপস্বিনী ৫।২)

৩ বতা। ইনিস্পেক্টারবাবুর সহিত একদিন বিধবা বিবাহ উপলক্ষে তর্ক হয়েছিল, তাতে অনেক বিচারের পর ইনিস্পেক্টর বাবু বলেছিলেন, "আপনার ষাট বৎসর বয়সে স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে অধীর হয়ে পুনর্বার দারপরিগ্রহের জন্য উন্মত্ত হয়েছেন, অতএব আপনার পোনের বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা পুনর্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক কি না বিবেচনা করে দেখুন।" ব্যাটার বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, গলাবাজিতে যা কত্তে পারে; আর মুখখানি মেচোহাটা, ইনিস্পেক্টর বাবুকে যা না বলবের তাঙ্গ বল্যে। (বিয়ে পাগলা বুড়ো ১।১)

৪. জীবনচন্দ্র। তুমি জাত মান না, ব্রাহ্ম সভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখচি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিসপেন্সারি করবের সুযোগ কর। (সধবার একাদশী ১।২)

৫. শারদাসুন্দরী। সিদ্ধেশ্বরবাবু ব্রাহ্ম সমাজ করেছেন, তাঁর স্ত্রী ব্রাহ্মিকা হয়েছেন, এটা নিন্দার কথা না সুখ্যাতির কথা?

হেমচাঁদ। সুখ্যাতির কথা হলে তাকে লোকে একঘরে করতো না।

শারদা। যারা একঘরে করেছে তারাই বলে সিদ্ধেশ্বরের মত জিতেন্দ্রিয়, ধার্মিক, পরোপকারী এখানে আর নাই, আর তোমাদের লোকে যা বলে বা শুনে আমি কেবল নির্জনে বসে কাঁদি। ব্রাহ্মধর্মের মত

পুস্তক, আমার কাছে সকলি আছে, তুমি যদি শোনো, আমি তোমার কাছে বসে পড়ি। (লীলাবতী ১।২)

৬. পাঁচি। (অঞ্চল হইতে প্যাকগুলিন খুলিয়া পঠনান্তর প্রদান) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, মোহিনীমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়র, জগবন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সিনিয়র, রঙ্গলাল, বঙ্কিম—

তৃতীয় জামাতা। আমার নাম এখন বেরুলো না; কি সর্বনাশ আর কখানা আছে?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলবী আবদুল লতিফ। (জামাইবারিক ৩।১)

উদাহরণ আরও বাড়ান যেত। এগুলি থেকেই উপলব্ধি হবে যে দীনবন্ধুর নাটকে সমসাময়িক প্রসঙ্গ অতি প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরই অধীন।"

অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত বিষয় তাঁর প্রহসনের বিষয়, কিন্তু 'স্থূলতা' তাঁর সর্ববিধ নাটকের ভিত্তি। ভাব-জগতে নয়, স্থূল জগতেই তিনি বিচরণ করছেন। কী কাব্যে, কী নাটকে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের বস্তুবোধের বলয় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

দীনবন্ধু প্রথম নাটক রচনা করেন ১৮৬০ সালে, এবং বেনামীতে। তিনি জানতেন, এই নাটক শাসকশ্রেণীর প্রচণ্ড ক্রোধের কারণ হবে। 'কস্যচিৎ পথিকস্য' নিবেদনে তিনি নাটক রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। দুষ্টপ্রথার বিলুপ্তি এবং অন্যায়কারীর চরিত্র সংশোধন ছিল তাঁর লক্ষ্য। "তোমরা যে সাতিশয় অত্যাচার দ্বারা বিপুল অর্থ লাভ করিতেছ তাহা পরিহার কর।" তিনি নীলচাষের বিরোধী নন, সাহেবদের ব্যবসা ও সম্পত্তিভোগদখলেরও বিরোধী নন। "তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শত মুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ—" শুধু এই প্রকার রীতির তিনি অবসান চান।

এই শোষন ও অত্যাচারের পিছনে কি খোদ বৃটিশ সরকারের দায়িত্ব ছিল না? তাঁর মতে 'দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজা-জননী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন।" আর "সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদারচরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর জেনরল হইয়াছেন।" এ ছাড়া লেঃ গভর্নর হয়েছেন ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট; ইডেন হার্সেলের মত সত্যপরায়ণ নিরপেক্ষ কর্মচারীরা তাঁর সহায়ক। "অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিরারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।" এই সব উক্তি সে-যুগের British India Society ও Landholders' Association-এর 'মেমারিয়ালে'র অনুরূপ। এদেশে ইউরোপীয়দের ভূসম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার রাজা রামমোহন রায় স্বীকার করেছিলেন; প্রিন্স দ্বারকানাথও করেছিলেন।

বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ও ল্যাণ্ডহোলডার্স এসোসিয়েশন বৃটিশ ন্যায়-পরায়ণতায় বিশ্বাস রাখতেন, এদেশের শাসন-ব্যবস্থায় বৃটিশরাজের উপস্থিতি তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। দীনবন্ধুর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এই সব চলিত মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু শিল্পী দীনবন্ধুর আচরণ ছিল পৃথক। এই নাটক যে রাজভক্তিমূলক নয়, রাজদ্রোহসূচক, একথা সেদিন সবাই স্বীকার করেছিল।

এ দর্পণ শুধু নীলকরদের দর্পণ নয়, এ দর্পণ বৃটিশ চণ্ড শাসন-নীতিরও দর্পন! সেকালের জনপ্রিয় গায়ক ধীরাজ গেয়েছিলেন—

> ইংলণ্ডেশ্বরী শুন্ পিউনির সকল গুণ,
> আইনে যে সুনিপুণ, এবার তা বেরিয়ে পড়েছে॥
> যে অবধি কলিকাতা, পাইয়াছে এবিধাতা।
> সেই অবধি দেখি মাতা, রেস হেট্রেড খুব চেগেছে॥

নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক লং সাহেবের বিচারকে কেন্দ্র করে এই গীতটি রচিত হয়।

নীলদর্পণের আখ্যান-অংশ

নীলদর্পণের আখ্যানবস্তু পারিবারিক, যদিও সমস্যাটি রাষ্ট্রীয়। দীনবন্ধু গুয়াতেলির মিত্রপরিবার, কি দিগম্বর বিশ্বাস মহাশয়ের জীবন থেকে

কাহিনীর ইঙ্গিত নিয়েছেন, সেটা বড় প্রশ্ন নয়।[৬] এই প্রকার ঘটনা নীলবিদ্রোহের যুগে আরও অনেক ঘটেছিল ব'লে শোনা গিয়েছিল। আসলে ঘটনাটি ছিল অতি সত্য ও অতি বাস্তব; কিন্তু বাস্তব হলেই ত কোন ঘটনা সাহিত্যে বাস্তবিক হয়ে দেখা দেয় না। দীনবন্ধুর ছিল সেই প্রতিভা, যা পরিচিত ঘটনাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করতে পারে। এই প্রতিভার রহস্যবিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "...কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে,—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।"[৭]

স্বরপুর গ্রামের গোলোক বসু আর দশটি সম্পন্নগৃহস্থের মতই বাংলা দেশের এক সাধারণ বাস্তব সত্য। কিন্তু দীনবন্ধু স্বরপুরের এই গোলোক বসুকে বিশিষ্ট গোলোক বসু করেই এঁকেছেন, যিনি গ্রামের বাইরে কোনদিন যান নি, যাঁর এডো ঘর না হলে ঘুম হয় না। তাঁর দুইপুত্র নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধব গাঁয়ে বাস ক'রে পিতার বিষয়সম্পত্তি দেখেন, আর বিন্দুমাধব শহরে থেকে কলেজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছেন। গরীব প্রজাদের পক্ষ নিয়ে 'স্বরপুরবৃকোদর' নবীনমাধব দাঁড়ালেন। নাটকের ঘটনা তার ফলে সংকটে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নানা কারণে তাঁরা কুঠিয়ালদের রোষের লক্ষ্য হলেন। তিনি স্বগ্রামবাসী সাধুচরণের বিবাহিতা গর্ভবতী কন্যাকে কুঠিয়ালদের হাত থেকে মুক্ত করে আনলেন। এসব করে গরীব প্রজাদের বিশেষ উপকার করতে পারলেন না; কিন্তু নিজের পরিবারের ওপর বিপদ ডেকে আনলেন। নানা মিথ্যা মামলায় তাঁকে জড়িয়ে ফেলা হোল। প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তোলার মিথ্যা অভিযোগে পিতা গোলোক বসুকে কুঠিয়ালরা গ্রেপ্তার করিয়ে দিল। অভিযোগ মিথ্যা হলেও মধ্যবিত্তের কাছে এ এক দারুণ অপমান! জেলখানায় তিনি আত্মহত্যা করলেন। কুঠিয়ালদের নিযুক্ত লাঠিয়ালদের হাতে নবীনমাধব নির্দয়ভাবে প্রহৃত হলেন এবং দেহত্যাগ করলেন। শোকে উন্মাদিনী জননী সাবিত্রী সেই অবস্থায় তাঁর কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে হত্যা করে ফেললেন।

অন্য নাটকের মত নবীনমাধবের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শোকে দেহত্যাগ করলেন না, কারণ তাঁর বিপিন আছে। বিপিন হোল নবীনমাধবের একমাত্র সন্তান, বসু পরিবারের একমাত্র ভরসাস্থল।

নীলদর্পণের নাট্য কৌশল

ঘটনা সে-যুগের পরিচিত ঘটনা ; তাই এই ঘটনাকে নাটকে বাঁধতে গিয়ে লেখককে অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছে। আরও দশজন একই রকম দুর্দশা ভোগ করেছে—দীনবন্ধুর তাদের কথায় আসেন নি, শুধু গোলোক বসুর পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতিতে যে সব ঘটনার প্রয়োজন আছে, সেগুলিই নাটকের মধ্যে এনেছেন। সাধুচরণের পরিবারের কাহিনী, তোরাপ প্রভৃতির কাহিনী নবীনমাধবের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বলেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অত্যাচারের খতিয়ান তিনি খাড়া করেন নি। বিভিন্ন ঘটনাকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি এনেছেন। নিয়ম ব্যতীত নিত্যতার স্থান নেই। স্বরপুর তাই প্রচলিত অর্থে বাস্তব পল্লী নয়, 'নিয়ন্ত্রিত' পল্লী। শিল্পের নিয়ন্ত্রনে বাস্তবের বন্ধনমুক্তি ঘটে। দীনবন্ধু মাইকেলের আদর্শে উৎসাহিত হয়েছেন। নাটকের কিছু খুঁটিনাটি বিধিনিষেধ তিনি মাইকেল থেকে নিয়েছেন। নাট্যঘটনাকে তিনি অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করেছেন। আখ্যায়িকা কিছুটা অগ্রসর হলে নাটক আরম্ভ হয়েছে, এ রীতিও মাইকেলের রীতি।/

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন এমত বোধ হয় না। যাও বাবা স্নান করগে।

নাটকের প্রথমাঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে এই সংলাপ বসেছে ; অতএব ঘটনা আগেই অনেক ঘটে গেছে।

তবে মাইকেল 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে বাস্তবের যে প্রকার রূপ দেখিয়েছেন—এখানে তা নেই। নীলদর্পণে নাট্যকার বাস্তবের নিষ্ঠুর অথচ আদর্শায়িত রূপের সন্ধান দিয়েছেন। সাবিত্রী যখন বলেন,

'কর্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদুরিতে ধরে নিয়ে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে ; ভগবতি ! তোমার মনে এই ছিল মা ? আহা হা ! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপ চালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না।"

সাবিত্রী হলেন সংসারের কর্ত্রী ; তাঁর সম্বন্ধে এক সাধারণ গোপ বলেছে—

"মা ঠাকরুণ যে পিরতিমির মধ্যে কারে ভাল না বাসেন তাওতো দেখতি পাইনে। আ ! মাগি য্যান অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি অন্ন একেছ যে

তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়রে খেয়েছে, বুড়িরিও খাবেহ কত্তি নেগেছে।”

এ হোল পুরাতন বাংলা দেশের ‘সব-পেয়েছির দেশে’র এক খণ্ডিত চিত্র। ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’তে এ চিত্র স্থান পায় নি।

“আমার শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খানা লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার, পূজার সময়ে কি সমারোহ, লোকে বাড়ি পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙালীকে অন্ন বিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবগণের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি।’

নবীনমাধবের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী বলেছেন একই কথা।

“সেজো ঠাকরুণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আলপনায় হস্ত রাখিয়া বলেছিলাম, যেন রামের মত পতি পাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই, সেজো ঠাকরুণ! বিধাতা সকলি আমাকে আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ-প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী, অবিরল অমৃতমুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী; স্নেহপূর্ণ-লোচনা প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধূমাতা বলেই চরিতার্থ, দশদিক্ আলোকরা শ্বশুর; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। (৫।২)।

এ চিত্র বাস্তব সন্দেহ নেই; কিন্তু এ চিত্র যে স্বপ্নেদেখা চিত্র, এ বিষয়েও সন্দেহ নেই। তাই এ চিত্র ‘idealised’ চিত্র।

মাইকেল থেকে তিনি দূরে সরে গেলেন কেন? বাস্তবকে তিনি ভিন্নতর ভাবে ধরেছেন বলেই কি তাঁর এই ভিন্নমার্গিতা?

নাটকের ঘটনা অধিকাংশই ঘটেছে স্বরপুরে; একবার বেগুনবেড়ে, আর একবার মাত্র ইন্দ্রাবাদে। নাটকের ঘটনাকে এই স্থানসীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে স্থানগত ঐক্য রক্ষা করেছেন। ঘটনাকালও একই প্রকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঘোরাফেরা করেছে। প্রথম অঙ্কের সব ব্যাপার এক দিনে ঘটা বিচিত্র নয়। দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা খুবই ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন, তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দুটি গর্ভাঙ্ক বরং একটু স্তিমিত গতি। কিন্তু শেষ অংশ থেকে আবার দ্রুত পায়ে চলেছে। চতুর্থ অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দর্শকদের আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই,—গোলোক বসুর মৃত্যু, ক্ষেত্রমণির মৃত্যু, নবীনমাধব-

সরলতা-সাবিত্রীর মৃত্যু। মৃত্যুর পর মৃত্যু দেখিয়ে ঘটনা অকস্মাৎ শান্ত হোল। বিন্দুমাধবের আক্ষেপে নাটক এসে একস্থানে দাঁড়াল স্থির হয়ে।

দীনবন্ধুর ট্রাজেডির স্বরূপ

দীনবন্ধুর নাটকে ট্রাজেডি ঘটেছিল ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য নয়। আর সংসারে তেমন ট্রাজেডির সংখ্যাই ত বিপুল। রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অভিশাপে যুগে যুগে সাধারণ মানুষের জীবন তছনছ হয়ে যায়। তুলনায় পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বা যৌন সামঞ্জস্যহীনতার জন্য সন্দেহ-অবিশ্বাস, রাগদ্বেষ আর কতটুক ট্রাজেডির কারণ হতে পারে! শেষ পর্যন্ত এসব ঘটনার পিছনেও ত ইতিহাসের ইঙ্গিত থাকে।

'নীলদর্পণ' নাটকে না এ্যারিষ্টটল, না সেক্সপীয়ার কেউ অনুকৃত। ফলে শাস্ত্রধারী সমালোচকেরা নানাভাবে উষ্মা প্রকাশ করেছেন।

"The fact is that in Nildarpan, what Dina Bandhu attempted was to deal only with what he himself thought to be true, in its most naked and unvarnished form without the slightest regard for dramatic fitness or propriety."[৯]

"নীলদর্পণের উপসংহারে মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকটির ট্রাজেডিকে অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে।"[১০]

"যেখানে মৃত্যু এত সুলভ এত সহজ সেখানে মৃত্যু আমাদের দুঃখ উদ্রেক করে না, আতঙ্কও সঞ্চার করে না।[১১]

পারলে এঁরা নাটক সংশোধন করে নিতেন। কোন কোন দৃশ্য পরিত্যাজ্য তারও নিশানা আমরা পাই।

"Many of its unpleasant scenes (notably Scene 3, Act I; Scene I, Act II; Scene 2, Act V) are entirely unsuitable for dramatic representation. It deals with a most gruesome story in which horror is piled upon horror and everything seems to be covered with slime and mud."[১২]

বিলেতে বসে এবং ইংরিজি ভাষায় এই সমালোচনা লেখা হয়েছে! অবাক কাণ্ড!

দীনবন্ধু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নাটক লিখেছেন; তখন ইউরোপীয় শাস্ত্র সমাদৃত হচ্ছে; সংস্কৃত শাস্ত্রও একেবারে পরিত্যক্ত নয়। এই সময় তিনি দুই তরফের আতিথেয়তা মেনে না নিয়ে নতুন পথে হাটলেন।

মানুষের বড় বিপদ আত্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; রাষ্ট্রিক ও সামাজিক। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বর্তমান যুগের প্রখ্যাত নাট্যশাস্ত্রী ব্রেশ্‌টের দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাই। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের বিধিবিধান ব্যাখ্যা করলে সম্ভবত একইভাবে করতেন।

"The drama of our time still follows Aristotle's recipice for achieving what he calls catharsis. In Aristotlean drama the plot leads the hero into situations where he reveals his innermost being. All the incidents shown have the object of driving the hero into spiritual conflicts. It is a quite blasphemous but quite useful comparison if one turns one's mind to the burlesque shown on Broadway, where the public, with the yells of "Take it off," forces the the girls to expose their' bodies more and more."[১৩]

নাটকে নরনারীর প্রেমকূজনের কত কী থাকতে পারে, অন্তর্দ্বন্দ্বের কত আবিলতা স্থান পেতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রিক পীড়ন বা শোষন নয়। তার উল্লেখ মাত্রেই সাহিত্যের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে ম্রিয়মান হন ভদ্র সমালোচকেরা!

অথচ মৃত্যুর স্বীকৃতিতে নাটকের যবনিকা পড়েনি। সন্তানের জন্য মায়ের উৎকণ্ঠায় নাটকের শেষ। লেখকের ভাষাতেই বিষয়টি উপস্থিত করা যাক্।

যে অনুক্ষণ রঙ্গ-তামাসা করত, সেই আদুরী মঞ্চে প্রবেশ করল, রঙ্গ-তামাসার জন্য নয়, কঠিন খবর দিতে।

আদুরী। বিপিন ডরয়ে উঠচে, বড় হালদার্ণি তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরিন্ধ্রী। তুই সেইখান থেকে ডাকতে পারিস্ নি, একা রেখে এইচিস্।

[আদুরীর সহিত বেগে প্রস্থান]

মৃত স্বামীর দেহ স্পর্শ করে এতক্ষণ কাঁদছিলেন—সব পড়ে থাকল, জননী ছুটলেন সন্তানের ভবিষ্যত ভেবে।

কৈ মৃত্যুর সর্বাতিশয়তায় ত নাটক শেষ হোল না! "উপসংহার মৃত্যুর ঘনঘটা ট্রাজেডিকে অবাস্তর করিয়া দিয়াছে"—সমালোচকের এই উক্তি সংশোধনসাপেক্ষ। মৃত্যুর ঘনঘটার মধ্যেই জীবনের অপরাজেয় শিখা দপ্‌দপ করে জ্বলছিল।

তুচ্ছ দুইটি ছত্র! কিন্তু কী প্রবল জীবন-অনুরাগের শিখা!

রামগতি ন্যায়রত্ন ও ডক্‌টর গুহঠাকুরতার অভিযোগ একই পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছে—"নীলদর্পণ…করুণরস পূর্ণ হইলেও ইহা যে নাটকাংশে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। সকল নাটকের সকল অংশই অভিনয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উপর মুষ্ট্যাঘাত, উড়ানি-পাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড সকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারে না। ইংরেজি নাটকে এ সকল সম্পূর্ণরূপে দোষাবহ হয় না বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ড সকল রঙ্গ-স্থলে দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়া, নেপথ্য সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটকরীতির অনুসরণ করাই কর্তব্য।"[১৪]

ডকটর গুহঠাকুরতা যে গর্ভাঙ্কগুলি বাতিল করার সুপারিশ করেছেন, সে গর্ভাঙ্কগুলিতেই ন্যায়রত্ন মহাশয় উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে।

বহু বৎসর পরে ডক্‌টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্যও ন্যায়রত্নের যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন।

"কৃষকদিগের প্রতি সহানুভূতি এবং নীলকরদিগের প্রতি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া লেখক তাঁহার নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি দৃশ্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন, যাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। শুধু রুচি ও নীতির দিক দিয়াই যে এই দৃশ্যগুলি গর্হিত তাহা নহে, ইহাদের অভিনয়-কার্য ও ব্যবহারও অসম্ভব। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পঞ্চম অঙ্কে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। উহাদের মধ্যে যথাক্রমে রোগ সাহেব কর্তৃক ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির চেষ্টা, জেলখানায় উড়ানি-পাকান দড়িতে দোদুল্যমান গোলোকের মৃতদেহ, উন্মাদিনী সাবিত্রী কর্তৃক সরলতার গলায় পা দিয়া দাঁড়াইয়া হত্যা ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে। এই দৃশ্যগুলি নাটক হইতে পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদের বক্তব্য বিষয় অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।"[১৫]

সমালোচকেরা ভুলে যাচ্ছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত সংশোধন মেনে নিলে আমরা নীলদর্পণ পেতাম না।

নাটকে মৃত্যু কোথাও কম আছে কি? মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে পূর্ণচন্দ্র বসু সেক্সপীয়ারের নাটকে খুনের এক তালিকা দিয়েছিলেন। এই খুনের আধিক্য থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে নাট্যকার হিসাবে

সেক্সপীয়র খুব উন্নতস্তরের শিল্পী নন এবং তাঁর আদর্শ ভারতীয়দের কাছে গ্রহণ-যোগ্যও নয়। এ সমালোচনা শিল্পের সমালোচনা নয়, তা আমরা জানি। হ্যামলেটের সূচনা মৃত্যুতে, শেষ একাধিক মৃত্যুতে। ওথেলো নাটকের উপসংহারে একসঙ্গে একজোড়া মৃত্যু আছে। ম্যাকবেথ যাত্রা শুরু করেছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, পরিণামেও একাধিক মৃত্যু। মৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ঐ সব নাটকের ট্রাজেডিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি। তবে সমালোচকেরা ঐসব নাটককে সার্থক ট্রাজেডি কেন বলেন? শুধু কি নায়কচরিত্রের জন্য?

নীলদর্পণের আসল নায়ক হোল স্বরপুর পল্লী অর্থাৎ ঐ গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা। অথচ একটিমাত্র পরিবারের কাহিনী তিনি বেছে নিয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের 'mass-drama'-র সঙ্গে তার মিল আছে।

নীলদর্পণ ও গণনাট্য

অনেকের বিশ্বাস, গণনাট্য 'mass-drama' ধারণা খুবই সাম্প্রতিক ব্যাপার। ছড়ায়-পদ্যে, গাথায়-কাব্যে যদি সাময়িক বিক্ষোভ, ক্রোধ বা প্রতিশোধ-স্পৃহা ভাষা পেতে, পাবে, তবে নাটকে কেন পাবে না? অত্যাচারিদের ক্ষোভ নাটকের মধ্য দিয়ে পূর্বযুগেও প্রকাশ পেয়েছে। বিখ্যাত স্পেনীয় নাট্যকার Lope De Vega (পুরোনাম Lope Felix De Vega Carpio, 1562-1635) লিখিত একটি নাটক আছে Fuente Ovejuna.[১৬] এটি একটি গাঁয়ের নাম—অর্থ হোল মৌচাক। নিশ্চয়ই আমাদের সোনার গাঁ বা মধুপুরের মত সোহাগের নাম। ঐ গ্রামের রাজার প্রতিনিধি হোল Commendador। সে প্রবল অত্যাচারী; গাঁয়ের প্রায় সব মেয়েকেই উপভোগ করেছে; অন্তত উপভোগ করার তার খুবই ইচ্ছা। ঐ গাঁয়ের এক যুবা, তার নাম Frondoso; আর এক তরুণী, Laurencia তার নাম; তারা পরস্পরকে ভালবাসে। যেদিন তাদের বিয়ে হতে চলেছে, সেদিন ঐ পাপিষ্ঠের দলবল লরেন্সিয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। লরেন্সিয়াকে কাছে পেয়ে Commendador বললে, "now we are alone in these solitary fields where no one can help you" লরেন্সিয়া কিছুতেই রাজি হয় না। ঐ নরাধম জানাল ইতিপূর্বে কোন্ কোন্ মেয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এমন সময় ফ্রনডোসো এসে মেয়েটিকে উদ্ধার করল।

Commendador এখানেই থামল না; সে তারপর Jacinto নাম্নী একটি মেয়ের সুনাম নষ্ট করল। সমস্ত গ্রাম তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। "Jacinto,

your great injury will be our guide"—এই হোল তাদের শপথ। এক দিন তারা সমবেত ভাবে Commendador-কে হত্যা করল। রাজার কানে এই খবর গেল; তিনি তথ্যানুসন্ধানের জন্য একজন বিচারপতিকে পাঠালেন মেৌগ্রামে। তিনি এসে রাজাকে রিপোর্ট দিলেন এই মর্মে:

"I went to Fuente Ovejuna, as you commended, and carried my assignment with special care and diligence. After one investigation, I cannot produce a single written page of evidence for to my questions, "Who killed the Commendador ?" The people answered with one accord, "Fuente Ovejuna did it." Three hundred persons were put to torture, quite ruthlessly, and I assure you, sire, that I could get no more out of them than this. Even children, only ten years old, were put to the rack, but to no avail—neither did flatteries nor deceits do the least good. And since it is hopeless to reach any conclusion either you must pardon them or kill the entire village. And now the whole Town has come to corroborate in person what they have told me. You will be able to find out from them."

রাজা গ্রামবাসীদের রাজসভায় আসতে আদেশ দিলেন। তাদের প্রতিনিধি Eteban এসে বললেন, 'রাজা, মেৌগ্রামের অধিবাসীরা তোমার সেবা করতে চায়। তারা Commendador-এর অত্যাচারে জর্জরিত। দয়াধর্মহীন ঐ পাষণ্ড তাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করেছে, তাদের মেয়েদের মর্যাদা অপহরণ করেছে।

Eteban বলল, 'Sir, we want to be your vassals. You are our King and in your defence we have borne arms. We trust in your clemency and hope that you believe in our innocence."

নীলদর্পণ নাটকে বিন্দুমাধব বলেছে "মহাশয় কমিশনারকে বিশেষ জানেন না তাহাই একথা বলিতেছেন। কমিশনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতিআকাঙ্ক্ষী।"

নীলদর্পণের জনক মিত্রমহাশয় বাকিটুকু বলেছেন, "দাসীদ্বারা সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেওয়া অবৈধ বিবেচনায় দয়াশীলা প্রজাজননী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রজাদিগকে স্বক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছেন।"

উভয় নাটকের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এক প্রকার ; উভয় লেখকই মূল শাসকের প্রতি আস্থাসম্পন্ন। অথচ এই আস্থা সত্ত্বেও নাটকদ্বয়ের কোনটিই রাজশক্তির প্রশস্তিসূচক নাটক নয়। সে-যুগের সঙ্কীর্ণ রাজনীতিবোধ নাটকদ্বয়ের বৈপ্লবিক ভূমিকা খর্ব করতে পারে নি। লোপ দ্য বেগার মতই দীনবন্ধু বাংলা নাটকের চৌহদ্দি বাড়িয়ে দিলেন নাটকের বিষয়বস্তুতে, নাটকের রচনারীতিতে। "There are writers who simply set down what happend. I'm one of them. My material is intelligible"[১৭] ব্রেশ্‌টের এই উক্তি নবীন।

নাট্যক্ষেত্রে দীনবন্ধুর প্রয়োগ হোল বহু পুরাতন।

শুধু ক্রোধ ও রোষের আগুনে নাটক ঝলসিত হয় এবং হাসির রৌদ্রো-জ্জ্বলতায় তাকে উষ্ণ না করলে তার কলি চোখ মেলে না। শুধু ক্রোধে 'চাকর দর্পণ' প্রতিবাদী হয়েছে, কিন্তু নাটক হয় নি। 'নীলদর্পণের' সমস্ত দুঃখের মধ্যে একটি হাসির পলেস্তারা আছে।

প্রথম রাইয়ত। কুঁদির মুখ বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—জজ সাহেব মোর বুকি দেড়েয়ে উটেলো—হ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়চে—গোড়ার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস নে।

উক্তিগুলি বেদনাপীড়িত ব্যথাহত দরিদ্র মানুষের উক্তি। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে যে সারল্য আছে, তা হাসিরও কারণ হয়। এইভাবে চোখের জল আর ঠোঁটের হাসি মাখামাখি হয়ে গেছে।

যখন রোগ লাথি মারছে, তখন তৃতীয় রাইয়তের কান্না মর্মান্তিক। কিন্তু সে-কান্নারও একটি হাস্যকর দিক থাকে।

"বউ তুই কনে রে, মোরে খুন করে ফ্যালালে, মা রে, বউ রে মা রে, ফেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে চিত হইয়া পতন)।"

চতুর্থ রাইয়তের উক্তি ত আরও সুন্দর।

"হা! মোর বাড়ি যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জান্‌তি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা, বস

মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্‌লাম ? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করেলো তাইতি বস মশার কাছে মিচ্‌রি নিতি অ্যাকবার স্বরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রূপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

শুধু নিজের উৎকণ্ঠার কথা প্রকাশ করতে চেয়েছিল, আর তার সঙ্গে একটু সৎলোকের মহিমা কীর্তন; কিন্তু বাচনিক বস্তু তার উদ্দেশ্যকে ফাঁকি দিয়ে অনেকখানি হাস্যরস সৃষ্টি করল। বিশ্ব-সাহিত্যে একমাত্র সেক্সপীয়ার আর ডিকেন্স ব্যতীত এত প্রকার বিরোধী রসের মিশ্রণ একত্রে আর কেউ ঘটাতে পেরেছেন বলে আমরা জানি না। সেক্সপীয়রের কবরখনকগণ, আর ডিকেন্সের সামুয়েল ওয়েলারের পাশে এদের স্থান চিরকালের জন্য সংরক্ষিত থাকল।

দীনবন্ধুর বিষাদান্তক নাটকে মানুষের বিবিধ রূপ স্থান পেল সৎ-অসৎ, অত্যাচারী-অত্যাচারিত, ভদ্র-ইতর। একমাত্র অত্যাচারী গোষ্ঠীর চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি কোন মানবিক বোধ দিতে পারেন নি; কিন্তু তার জন্য তাঁর কত 'apology'—

সাবিত্রী। নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আর বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল। ১।৪

তোরাপ। ভবনীপুরীর সাহেব তো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা কবো, ঘোড়া চড়ে যাবো। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মত হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নটতো না। ২।১

নবীন: কোন ম্যাজিষ্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এই আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন তবে কি রাইয়তের পাকা ধানে মই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? ৩।২

উদাহরণ আরও সংগ্রহ করা যায়; কিন্তু প্রয়োজন নেই। ইংরেজ শাসনের ন্যায়পরতায় তাঁর আস্থা আছে বলে তিনি কেবল এই কৈফিয়ৎ দেন নি। আসলে তাঁর মানবপ্রেম সর্বব্যাপী, পাত্র-পাত্রী বিচার করে না। নাটকে অমরনগরের ম্যাজিষ্ট্রেট নেই, তার নাটকীয় উপযোগিতাও নেই। সেই চরিত্রকে নেপথ্যে রেখে তবু তিনি ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। পদী ময়রাণীর প্রসঙ্গ সবাই বলেছেন;

ডক্টর ভট্টচার্য্য তার বংশলতিকা খুঁজতে মঙ্গলকাব্যে গেছেন। জমিদার-শাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এই ধরণের চরিত্র বাস্তব চরিত্র, গ্রন্থের সিন্ধুক থেকে তার জন্মপত্র বের করতে হয়না। পদী নরকের দূতী, কিন্তু সে মানবী, দানবী নয়।

—সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কমযে জম্‌য়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদের নীল হয। শ্যামনগরের মুনসীবে ১০ খান জমি ছাড়াবার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোবা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" বড সায়েব পোড়ার মুখো পোড়ার মুখ পুড়েয়ে বসে রলো। ২।৩

— উপপতি করিছি বলে কি তাতে আমাব শরীবে দয়া নেই। ২।৩

—ওমা কি লজ্জা। বড বাবুকে মুখখানা দেখলাম। ২।৩

—আমার ধর্মও গেছে, জাতও গেছে। ৩।৩

গোপীনাথ নীলকুঠির দেওয়ান। নীলের দাদন বাড়াবাব জন্য সে কোন কসুর করেনি। যদিও সে জাতিতে কায়স্থ, কিন্ত কার্যে ক্যাওট। মোল্লাদেব ধান ভেঙ্গে সে নীল চাষ করেছে, গোলোক বসুর সাতপুরুষের লাখেবাজ বাগান ও রাজাব আমলেব গাঁতি বের কবে নিতে সে যে সব অ কাজ কবেছে, তা ক্যাওট কি কোন চামারেব পক্ষেও সম্ভব হোত না। নীলকুঠির কাজ কবতে গিযে সে ভয় কাকে বলে জানে না, যখন এ পদবীতে পদার্পণ কবেছে, তখন ভয লজ্জা-সরম, মান মর্য্যাদার সে মাথা খেয়েছে, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা, ঘব জ্বালান তাব অঙ্গেব আভরণ হযেছে, জেলেব ভয়েও সে ভীত নয। তার দৃঢ বিশ্বাস পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওযাতে চাসালোকেব দৌরাত্ম্য বেড়েছে। কিন্তু তবু নবীনমাধবকে যখন উড অপমান করছে, তখন সে বলেছে,

—নবীনবাবু, বাড়াবাড়ি কাম কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীনবাবুর প্রতি সে সম্ভ্রমের সঙ্গে ব্যবহার কবেছে। তার স্বগত-উক্তি—

বাড়া ভাতে ছাই বাড়া ভাত ছাই।

ধবেছে নীলেব যমে আব রক্ষে নাই।" ১।২

এ উক্তি নিশ্ছিদ্র সয়তানেব জোবানবন্দী নয।

—বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও খাওযায। ২।২

আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে মিথ্যা মোকদ্দমা কবে মানী মানুষটার নষ্ট করলাম। নবীনেব শিরঃপীড়া আর নবীনেব মাব এই অন্তিম দশা শুনে আমি বড় ক্লেশ পাইযাছি। ৫।১

পঞ্চমাঙ্কে ১ম দৃশ্যে উড সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তায় গোপীনাথের প্রকৃত রূপ পরিষ্কার ধরা পড়েছে। নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনেই সে নীলকরদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। উড সাহেবই গোপীনাথকে ঠিক চিনতে পেরেছিল—কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সব্বনাশ কত্তিস ডেভিলিষ নিগার।

গোপীনাথের আত্মস্বরূপ নির্ণয়ও নির্ভুল—"সাত শত শকুন মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয় নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করো?" গোপীনাথ দীনবন্ধুর কলম থেকেই কেবল বেরুতে পারে, কারণ তাঁর তুলি শত্রু-মিত্রের ভেদজ্ঞান করে রঙ ব্যবহার করে না।

তিনি এখানে 'পার্টিজন' হন নি, দারুণ সতর্ক অথচ মমত্বময় শিল্পী দীনবন্ধু।

সহানুভূতির কথা থেকেও বড়ো হোল তাদের স্বীকৃতি দান। তোরাপ, রাইচরণ, রাইয়তগণ, বিশেষ করে তৃতীয় রাইয়ত নিছক চরিত্র-সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়নি; বরং ওরা আছে বলেই 'নীলদর্পণনাটক' সাহিত্য হয়েছে। এদের জুড়ি শুধু মিলবে ডিকেন্স বা হার্ডির উপন্যাসে, সেক্সপীয়ার ও সিন্‌জের নাটকে।

দীনবন্ধুর নাটক সম্বন্ধে বড় বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার সংলাপ নিয়ে। সবাই বলেছেন এই নাটকে দুইজাতের সংলাপ আছে। কিন্তু সংলাপের চারটি 'থাক' আমাদের চোখে পড়ল।

১. কবিরাজ-পণ্ডিতগণ;

২. গোলোক বসু, নবীন-বিন্দুমাধব;

৩. সাবিত্রী, সাধুচরণ ও গোপীনাথ;

৪. তোরাপ, রাইচরণ, রাইয়তগণ ও আদুরী।

শুধু চতুর্থ শ্রেণীর ভাষাকে স্বাভাবিক বললে চলবে না। সংলাপ সাধু থেকে ক্রমশ অসাধু বা আঞ্চলিক উপভাষাকে আশ্রয় করেছে। সামাজিক বিন্যাসের মতই এই ভাষার স্তরভেদ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। তখনকার সাময়িক পত্রে, নানাবিধ গ্রন্থে ভদ্র ব্যক্তিদের ভাষণে প্রথম 'থাকে'র ভাষারই আশ্রয় নেওয়া হোত। ডক্টর সুশীলকুমার দে এই বিতর্কের সদুত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রচলিত প্রথা ও কালের প্রভাবই এখানে কার্যকর হয়েছে। ভদ্র চরিত্রের সংলাপে যে আতিশয্য আছে, তার কারণও সমসাময়িক যুগের মধ্যে রয়েছে। সে যুগের যাত্রায়-নাটকে-পাঁচালীতে-কবিগানে অতিশয়োক্তির প্লাবন দেখা যেত। কথা বলতে তখন লোকে ভালবাসত; নাটক হোল শব্দ-বয়নের আসর।

গোলোক বসু, নবীনমাধব, সরলতা, সৈরিন্ধ্রী—সকলেই সুযোগ পেলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন, অনেকটা যেন কথকতার রীতি। বিশেষ করে বিন্দুমাধব। তিনি যেন নবীন যুগের কথক ঠাকুর। বঙ্কিমবন্ধু ও গুপ্তশিষ্য দীনবন্ধু ব্রাহ্মসভা, মেয়ে ইস্কুল, মঙ্গলসূচক সভাদি সম্বন্ধে খুবই কৌতূহলী; এবং এসব বিষয়ে সরবে কথকতায় নেমেছেন।

দীনবন্ধুর নাটকের ভাষা ও চরিত্র পৃথক নয়; চরিত্রগুলির যেমন নানা 'থাক' আছে, ভাষারও নানা থাক আছে। সমাজে শ্রেণীবৈষম্য বিলুপ্ত হলেও ভাষার এই 'থাক' বিলুপ্ত কি কাদাচ হবে?

চরিত্র জীবন্ত করে দীনবন্ধু এঁকেছেন, আর সেই সব চরিত্রের দেহে রক্ত চলাচল অব্যাহত রেখেছে ভাষার এই জীবন্ত ভাব। দীনবন্ধু তাঁর নাটকের ভাষা তৈরি করতে প্রবাদ-প্রবচন, শ্লীল-অশ্লীল নানা আঞ্চলিক শব্দ, এমন কি নানা বিকৃত শব্দও ব্যবহার করেছেন। এক ক্রিয়াপদেরই বা কত বিচিত্র ঠাট। অভিধান থেকে তারা আমন্ত্রিত নয়। আমন্ত্রিত হয়েছে লোক-ব্যবহার থেকে। কখনও-কখনও বিলুপ্ত ও বিস্মৃতপ্রায় শব্দ তিনি আমন্ত্রণ করেছেন।

অলংকারের ত তিনি নানান্ আশ্চর্যজনক ব্যবহার দেখিয়েছেন। স্বাভাবিক অলঙ্কারের পাশাপাশি বিদ্‌ঘুটে বা ভ্রান্ত অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করতে ইতস্তত করেন নি। 'বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী' অলঙ্কারটি সংস্কৃতপণ্ডিতদের আর্যপ্রয়োগ নয়, এ হোল 'চার্ষ' প্রয়োগ অর্থাৎ চাষীর প্রয়োগ।

সাধুচরণ গোলোক বসু নয়। তার মুখে সাধুভাষার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে। কুঠিয়ালের নোকর তাকে ভর্ৎসনা করেছে, সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ। আমরা কিন্তু সাধুচরণকে এভাষা পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিতে পারি না, তাহলে শুধু বঙ্কিম-বিশ্লেষিত ছেঁড়া আতুরী, কাটা তোরাপ নয়, তার অধিক এক মৃত সাধুচরণকে পেতাম।

নাটকের অনেক কৃত্রিম রীতিনীতি দীনবন্ধু তুলে দিচ্ছেন। আগের যুগে চরিত্রগুলিকে মঞ্চে আনবার পূর্বে কত আড়ম্বর—কখনও প্রারম্ভিক ঘোষণা, না হয় গান, কখনও মঞ্চ থেকে সবাইকে প্রস্থান করতে হোত নায়কের মঞ্চাবতরণের জন্য! দীনবন্ধুর নাটকের পাত্রপাত্রী যেমন সাধারণ, তাদের চলাফেরাও তেমনি সাধারণ ঘটনা। তার জন্য কোন প্রবেশকের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মঞ্চ আর বাস্তব সংসারের মধ্যে এতদিন যে বৈপরীত্য টিকে ছিল, তার নিরসন হয়েছে। নাটকের গণতন্ত্রীকরণ ত এই! এ নাটক তাই

কালজয়ী, যেমন কালজয়ী বাংলার মানুষ ও তার প্রকৃতি। রাজেন্দ্রলাল এর মর্ম উপলব্ধি ঠিকই করেছিলেন, "নীলদর্পণ বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাস লেখক-দিগের উপজীব্য হইয়াছে। যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে বঙ্গভাষা পঠিত ও কথিত হইবে, ততকাল নীলদর্পণ সম্মানে পরিগৃহীত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।"

নবীন তপস্বিনী

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩)। তিনি শিক্ষিত সমাজের নাট্যকার, এটা সমঝে দেবার জন্যই যেন কলম ধরলেন! এখন থেকে তিনি শাস্ত্রসঙ্গত নাট্যকার। এ নাটকে মুখ্য কাহিনী আছে, আছে উপকাহিনী। নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গকে কেউ কেউ উপকাহিনী মর্য্যাদা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানে এই রীতি আদৃত নয়। নবীন তপস্বিনীতে উপকাহিনী কোনটি তা বলে দেবার প্রয়োজন নেই।

নবীন তপস্বিনীর কাহিনী বাস্তব সংসারের সঙ্গে তত যুক্ত নয়। রাজরাজড়া এখানে এসেছে, কিন্তু তাদের আচরণ তত রাজন্যসুলভ নয়। মনে হয় রূপকথার গল্পের ছাঁদে তিনি তাঁর যুগের কথা বলতে চেয়েছিলেন। বহু বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর এই নাটক। বিষয় তাঁর সময়কার বহু-আলোচিত বিষয়; বিদ্যাসাগরের যুগে এবিষয় সব থেকে আধুনিক, সন্দেহ কি।

বিজয় বসন্ত, ধ্রুবকাহিনী—এসব প্রাচীন কথা তাঁর নাটকের বিষয় নির্বাচনে পরোক্ষ প্রভাব ফেলতে পারে। "রত্নাবলী প্রভৃতি প্রকাশিত নাটকে সকলে যে প্রকার স্ত্রৈন, অল্পবুদ্ধি রাজা, উদরম্ভারি বিদূষক, দুঃখে নিমগ্ন নায়িকা প্রভৃতি ব্যক্তির নায়কত্ব হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ সকল লক্ষণ দেখা যায়।"[১৮]

বিজয় আর কামিনী এ নাটকের নায়ক-নায়িকা, তাদের ভালবাসা পুঁথি-অনুমোদিত ভালোবাসা; তাই একে 'প্রণয়' বলাই যুক্তিযুক্ত। আর এই প্রণয়কে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য পাঁচটি অঙ্কের প্রয়োজন হয়েছে। রাজা তার পরিত্যক্তা বা মৃতা-স্ত্রীকে ফিরে পেলেন, সেই সঙ্গে পুত্র ও পুত্রবধূ। এই গল্পের গম্ভীর সুরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে মালতী আর জলধরের রঙ্গ কাহিনী। এই কাহিনীতে বলা হোল পবিত্র প্রণয়ের বিরোধী কথা, রিরংসাবৃত্তির কথা। নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল একটা বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে মূল কাহিনীর ভাবাবেগকে আরও ঝাঁকিয়ে দেওয়া। কিন্তু মাঝপথে গিয়ে লেখক উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন; এই উপকাহিনীর গল্পরসে (রঙ্গরসও বটে) নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। ফলে উপকাহিনী তার উপস্থিতির সার্থকতা হারিয়ে

ফেলেছে। গম্ভীর বিষয়ের প্রকোষ্ঠে হাস্যকর বিষয়ের প্রবেশ-নিয়ন্ত্রণের আমরা অপক্ষপাতী নই; কিন্তু পরিমিতিবোধ ও সামঞ্জস্যবোধ চাই। এ নাটকে সামঞ্জস্যবোধ ব্যাহত হয়েছে। 'The Merry Wives of Windsor'-এর প্রসঙ্গ সবাই বলেছেন; কিন্তু সেক্সপীয়ারের ঐ নাটকের মেজাজ বড় হাল্‌কা মেজাজ। সেই হাল্‌কা মেজাজ 'নবীন তপস্বিনী'র গুরু মেজাজে এসে উপসর্গ সৃষ্টি করেছে, আত্মোৎসর্গ করেনি। জলধর Falstaff নয়, হবার যোগ্যতাও নেই। শুধু ঘটনায় চরিত্র সৃষ্টি হয় না—হয় দৃশ্য তৈরি।

টমাস অটওয়ে লিখিত 'ভেনিস প্রিজার্ভড' (Venice Preserved) নাটকে এ্যাকুলিনা নাম্নী এক বেশ্যার প্রতি এ্যাণ্টনিও আসক্ত হয়ে কত কীই না করছিল। কখনও বৃষভ, কখনও বা কুকুরের অভিনয় করতে হয়েছিল সেই বেচারীকে! তার প্রেমিকা তাকে বেত্রাঘাত করবে, আর প্রতিদানে সে কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করবে। (Act III, Sc III) অবৈধ প্রেমের এমনই মাহাত্ম্য! জলধর কেঁউ কেঁউ করেছে, কিন্তু বেশ্যাকে ভালবেসে নয়, পরস্ত্রীকে ভালবেসে। এই পরস্ত্রীকে ফুসলানোর চেষ্টায় যে ঝুঁকি আছে যে সামাজিক বিপত্তি আছে, নাট্যকার সেসব বিষয়ে নীরব থেকেছেন। ফলে এই অংশটি শুধু কৌতুকের হয়ে জীবনের সাদৃশ্য হারিয়েছে। ইংরেজিনবীশ সমালোচক বিপরীত কথা বলেন, "Navin Tapaswini comes to life only in the comic scenes where Jaladhar based on Shakespeare's Falstaff appears"[১৯] আসলে দীনবন্ধু থেকে সেক্সপীয়ার এই সমালোচকের বেশি জানা। তাই দীনবন্ধুর সামগ্রিক নাট্যরচনা রীতি সম্বন্ধে লিখলেন, "The plots are muddled, their characters are unreal, their dialogue is lifeless and unnatural."[২০]

নবীন তপস্বিনী নাটকে দীনবন্ধু পথ-পরিবর্তন করেছেন। বাস্তবজীবন আর বাস্তব ভাষা ত্যাগ করে তিনি কুলীন নাট্যকার হতে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "নবীন তপস্বিনীর ছোটরাণীর বিবরণ প্রকৃত।" বিবরণ প্রকৃত হলেই সাহিত্য প্রকৃতস্থ হয় না।

এই নাটকে সমসাময়িক যুগের কথা নানাভাবে আছে, আর চলতি বুলি বা লৌকিক ভাষা প্রচুর আছে। কিন্তু তবু এ নাটক বাস্তব নাটক নয়। যুগের মুখোমুখি না হয়ে পাশ কাটাবার ফলে নাটকের গড়ন রূপকথার মত হয়েছে।

এই নাটকের দ্বিচারিতা সংশোধনের জন্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র উৎকন্ঠিত হন। উপকাহিনীর প্রশংসা অনেকেই করেছেন।[২১] তিনিও করেছেন। তবে তাঁর একটি আলাদা প্রস্তাব ছিল!

"তিনি তাহা পৃথক করিয়া একটি প্রহসন করিলে অবিমিশ্রিত প্রশংসার ভাজন হইতেন।" (রহস্য সন্দর্ভ, ১২৯০, ১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ খণ্ড)। আমাদের বিশ্বাস, এই পরিবর্তনেও নাটক রক্ষা পেত না।

এ নাটক রচনায় যে তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটেনি, তা নয়। হিন্দু প্যাট্রিয়ট বলেছিল, এই নাটকে প্রকাশ পেয়েছে দীনবন্ধুর "inexhaustible fertility of resources."[২২] আমরা তা অস্বীকার করি না। কিন্তু সে সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও 'নাট্যকে' নাটক লিখতে গিয়ে দীনবন্ধু বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাঁর বিজয়-কামিনীর প্রণয় স্বাভাবিক প্রণয় নয়, ঐ যুগে তার কোন নজির ছিল না। তাঁর রাজা ও তপস্বিনী সবই যাদুঘরের চরিত্র; মালতী-মল্লিকারাও মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যের বিনোদিনী সকল।

যা জীবনে নেই, সাহিত্যে তা দিতে গিয়ে তিনি প্রতারিত। অথচ নাটকের উপাদান কোথায় নিহিত এ বিষয়ে প্রথম নাটকেই তিনি তাঁর যথার্থ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

লীলাবতী

'লীলাবতী' (১৮৬৭) 'নবীন তপস্বিনী'র পথ ধরে এসেছে। এই নাটকও দীনবন্ধু গম্ভীর রীতিতে লেখার চেষ্টা করেছেন। এ চেষ্টা তাঁর প্রতিভার পরিপন্থী একথা আমরা বলি না; যিনি 'নীলদর্পণ' লিখেছেন; তাঁর সম্পর্কে একথা বলা তথ্যনিষ্ঠ নয়।

লীলাবতী ও নবীনতপস্বিনীতে সেক্সপীয়রের কৌশল (conceits) ব্যবহৃত হয়েছে।

ছদ্মবেশ ধারণ করা এবং পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করা রেনেশাঁসের নাটকের একটা বহু ব্যবহৃত কৌশল; অনেকের মতে ইতালী ঘুরে এই রীতি এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই রীতি স্পেনে ক্যালদেরণ (Pedro Calderon de la Barca, 1600 – 1681) প্রচুর ব্যবহার করতেন। তাছাড়া পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি, অতি-রিরংসাবৃত্তির চর্চা, নানাবিধ লোমহর্ষক ঘটনার সন্নিবেশ, কাহিনীর কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার জন্য নানা ফন্দিফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ, সর্বোপরি বাক্য ও শব্দের

অমিত খেলা—এসবই রেনেসাঁসীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য। দীনবন্ধু এক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মগুলি মেনে নিয়ে আধুনিক শিক্ষিত মনের রসপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য কলম ধরেছেন; দেবতার বিষয় নয়, এমন কি ঐতিহাসিক মহাপুরুষের জীবনকাহিনী নয়, উনিশ শতকের পুরাতনপন্থী ও নব্যপন্থীদের দ্বন্দ্বকে তিনি নাটকের কথাবস্তু করেছেন।

হরবিলাস হলেন এই নাটকের মুখ্যচরিত্র, তিনি হলেন লীলাবতীর পিতা; লীলাবতীকে তিনি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও নদেরচাঁদের সঙ্গে বিবাহ দিতে চান, যদিও তিনি জানেন শিক্ষায় ও চরিত্রগুণে সে লীলাবতীর পাশে দাঁড়াবার যোগ্য নয়। কিন্তু তবু যে তিনি তাকে পাত্র হিসাবে বিবেচনা করলেন, তার কারণ নদের চাঁদ খুব বড় কুলীন। কৌলীন্য প্রথার যিনি উৎসাহী সমর্থক, সেই হরবিলাসের ব্যক্তিগত চরিত্রও নিন্দার অতীত নয়। তিনি তাঁর এক দাসীর গর্ভে চাঁপা নামে এক কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। আর এই চাঁপাকে আপন স্ত্রী ভ্রমে আলিঙ্গন করে লজ্জায় ও অনুতাপে তাঁর পুত্র অরবিন্দ গৃহত্যাগ করে।

ললিতকে তিনিই মানুষ করেছিলেন, লীলাবতীর সঙ্গে নদের চাঁদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হলে ললিত গৃহত্যাগ করে। এই সময় হরবিলাস সংবাদ পেলেন যে, অরবিন্দ জীবিত আছে। একদিন যোগজীবন নামে এক সন্ন্যাসী এসে নিজেকে অরবিন্দ বলে পরিচয় দিল। নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে অরবিন্দ বলে গৃহীত হোলে; স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনীও তাকে স্বামী বলে গ্রহণ করল।

এদিকে ললিতের সঙ্গে কাশীতে প্রকৃত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হোল। ললিত তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল, ঘরে ফিরে দেখল সেখানে আর এক অরবিন্দ বিরাজমান। যোগজীবন অরবিন্দকে চিনতে পারল। উভয়ে পূর্ব-পরিচিত। ক্ষীরোদবাসিনী যোগজীবনকে স্বামী ভেবে তিন চারদিন বসবাস করেছেন। তাকে নিয়ে বিপদ দেখা দিল। সে কি সতীত্ব ভ্রষ্ট হয়েছে? তখন যোগজীবন আপন স্বরূপ প্রকাশ করল; সে হোল চাঁপা। তখন ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর মিলনের পক্ষে কোন বাধা থাকল না। কিন্তু নাট্যকার নদের চাঁদের মামার জীবনের জটও ছাড়িয়ে দিলেন। ফলে জোড়ায় জোড়ায় মিলন হোল।

একটি আখ্যায়িকা বলতে বসে নাট্যকার আরও অনেকের বিবরণ দিয়েছেন। অযথা জটিলতা সৃষ্টি করে নাটকের কেন্দ্রীয় বস্তুর গুরুত্ব হ্রাস করেছেন। এতগুলি নরনারীর ছদ্মবেশেরও কোন নাটকীয় সার্থকতা নেই।

সর্বোপরি বাংলা দেশের সেকালের সমাজজীবনে এই ধরনের ছদ্মবেশীদের গৃহ-প্রত্যাগমনের আদৌ সুযোগ ছিল কিনা, তাও ভেবে দেখেন নি। ফলে সে-যুগের বহু প্রসঙ্গ থাকা সত্ত্বেও নাটক প্রাসঙ্গিক হয়নি।

"দীনবন্ধু ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার অদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।"[২৩]

প্রশ্নটিকে বিষয়বস্তুর ঔচিত্যের মধ্যে নিবদ্ধ রাখলে চলবে না। নাটকের গঠনপরিকল্পনার মধ্যে এগুলি যথাযথ বিন্যস্ত হয়েছে কিনা তাও দেখতে হবে। চতুর্থ অঙ্ক থেকেই নাটকের গল্প নাটকের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে গেছে। তখন আর নাট্যকারের ধৈর্য ললিত-লীলাবতীর সম্পর্কটি বিচার করে দেখার জন্য নেই। চাঁপার সমস্যা, যোগজীবনের সমস্যা, ভোলানাথবাবুর সমস্যা. অরবিন্দের সমস্যা— সব এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ললিত-লীলাবতীর সমস্যাটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে যখন সব সমস্যার সমাধান হোল, তখন আমাদের মনে হোল নাটক কেন্দ্রচ্যুত হয়েছে। নাটকের সূচনায় নব্যপন্থী ও পুরাতন-পন্থীদের দ্বন্দ্ব ছিল। একদলের মুখে শুনতে পেয়েছি পশ্বাবলী, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ কাব্য, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, ধর্মনীতি, সুশীলার উপাখ্যান, রহস্যসন্দর্ভ। আর একদল বলেছে বিদ্যাসুন্দরের কথা, গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের কথা। একদল বলেছে ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্মমন্দির, ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও রাজনারায়ণবাবুর কথা! আর একদল বলেছে কৌলীন্য প্রথার কথা, খেমটাওয়ালীর কথা, মুক্তিমণ্ডপের কথা, গাঁজা-চরসের কথা।

এই কারণে যে-যুগের অন্যতম উদারনীতিক বলেছেন, "Dinobondhu Mitra was in those days one of the most favourite of our dramatists. Dinobondhu's dramas were instinct with a lofty social idealism and a high standard of ethical conduct." এই কারণে ঐ লেখক বলেছেন, "His NabinTapaswini really presented the Brahma ideal of social and domestic life in fascinating colours."[২৫]

সমাজের তীব্রতম দ্বন্দ্ব থেকেই নাটকের কথাবস্তু দীনবন্ধু বেছে নিয়েছিলেন; কিন্তু নাটকের কেন্দ্রীয় সংঘাত সেখানে তিষ্ঠুতে পারল না। এখানেই এই নাটকের পরাজয়। নীলদর্পণ থেকে দীনবন্ধু এখানে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন;

অগ্রসর হতে গিয়েই তিনি পশ্চাদ্‌পসরণ করলেন। নাটকের বক্তব্যের অগ্রগতি নাট্যকারের অগ্রগতি নয়।

অথচ এই নাটকে লেখকের সংলাপ রচনা শক্তি কত উন্নত হয়েছে! সকলেই একই মধ্যবিত্ত সমাজের লোক বলে তাদের ভাষার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু শিক্ষাসহবত অনুসারে সংলাপের ঝোঁক ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়েছে। নদের চাঁদ আর ললিত একই জাতের লোক, উভয়েই ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত। কিন্তু উভয়ে এক প্রকার ভাষায় কথা বলেনি। ললিতের ভাষা শিক্ষিত মার্জিত রুচির ভাষা, আর নদের চাঁদের ভাষা অশিক্ষিত রুচিহীন যুবকের জোবান। সেই ভাষার যা শক্তি, তা হোল রুচিহীনের বে-আব্রু উচ্চ ঘোষণার। এই ইতর ব্যক্তির বাক্য থেকে তার অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত অনুমান করা যায়।

নদের চাঁদ ও শ্রীনাথ একই রকম শিক্ষাদীক্ষার লোক; কিন্তু ইতর কথায় নয়, শেষোক্ত ব্যক্তিটি শব্দের বিকৃতির মধ্য দিয়ে আপনার রঙ্গপ্রিয়তার নজির রেখেছে। এই নাটকে ভাষা বক্তৃতাধর্মিতা ত্যাগ করেছে; অথচ সুনীতির প্রশ্নে বক্তৃতা-ধর্মিতার প্রশ্রয় দিলে আমরা আশ্চর্য হতাম না। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রীরামপুরের নদেরচাঁদের শয়নগৃহে হেমচাঁদ ও শারদা-সুন্দরীর কথোপকথন কত সরল, প্রয়োজনানুরূপ এবং লক্ষ্যমুখী! নদের চাঁদ প্রবেশ করার পর শারদাসুন্দরী স্বভাবতই খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল না। নদের চাঁদ যখন প্রবেশ করলে হেমচাঁদ বলল, 'বৌ চিন্তে পার।'

ছোট্ট 'পারি' শব্দটি বলতেই তার মাথা কাটা যাচ্ছিল পরপুরুষের সম্মুখে। কিন্তু বর্বর নদেরচাঁদ যখন বলল, "এক বিয়ন না দিলে লজ্জা যায় না," তখন শারদাসুন্দরী হেমচাঁদের প্রতি মৃদুস্বরে বলল, "ছেলেদের আসবার সময় হলো, আমি ময়দা মাখিগে।"

এই সংলাপের কোন তুলনা নেই। বর্বর পুরুষের দৃষ্টি থেকে কি করে অব্যাহতি লাভ করা যায়, সেই ইচ্ছার সঙ্গে মিশেছে তার শালীনতাবোধ। দীনবন্ধু নাটকের সংলাপের ধর্ম ঠিকই ধরেছেন, 'লীলাবতী'তে এসে নাটকের সংলাপ আরও শাণিত, উজ্জ্বল, ও সুনিশ্চিত হয়েছে। তাঁর বহুদর্শিতা নাটকে তাঁকে বহুভাবে সহায়তা করেছে। এমন কি, উড়িয়া গান ও সংলাপ তিনি ব্যবহার করেছেন রঙ্গরসের জন্য নয়, নাটকেরই প্রয়োজনে। এ নাটক যে তিনি "প্রভূত আয়াসসহকারে" লিখেছেন, এ দাবী অস্বীকার করা যায় না।

অক্ষয় সরকার মহাশয় একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেছেন ; কাহিনীটি আমাদের প্রয়োজনে লাগছে।

"বঙ্কিমবাবুতে আমাতে লীলাবতী একরূপ পরিবর্তন করি। নাটকে ভোলা-নাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগানো আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিমবাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving scene প্রলাপদৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুকরাটুকরা পরিবর্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধুবাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, এক একটা শব্দ কাটা হইয়াছে আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে।"[২৬] দীনবন্ধুর নাটকে সংলাপের একটা অংশ সর্বদাই পদ্যের জন্য সংরক্ষিত থাকত। নীলদর্পণে আছে, নবীন তপস্বিনীতে আছে, এখানেও আছে। পেশাদারী মঞ্চে অভিনয়ের সময় 'লীলাবতী' পদ্য-অনুরাগে অমৃতবাজার পত্রিকা আপত্তি জানিয়েছিল। ললিতা-লীলাবতীর প্রণয়দৃশ্যে পদ্য-সংলাপ বিরক্তিকর বলে দর্শকেরাও মন্তব্য করেছিল।

মধ্যস্থ পত্রিকাতেও বলা হয়েছিল "নাট্যোল্লিখিত কতকগুলিন কবিতা; বোধ হয়, অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত, কারণ অনেকে কবিতার প্রাচুর্যবশতঃ বিরক্ত হইয়াছিলেন।"[২৭]

দীনবন্ধুর চতুর্থ গম্ভীর নাটক হোল 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। এটি তাঁর সর্বশেষ রচনা ;

'কমলে কামিনী' নাটকটি দীনবন্ধুর অন্যতম বিভ্রান্ত রচনা ; এই নাটকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে নাটকের গঠনরীতির কোন মিল নেই। চরিত্রগুলিও তেমনি লক্ষ্যহীন যাযাবরের মত। শিখণ্ডিবাহন না যোদ্ধা, না প্রেমিক! রণকল্যাণী না বর্মি, না বাঙ্গালী! শৈবলিনী না রক্ষিতা, না সাধ্বী! বক্কেশ্বর না ভাঁড়, না সৈনিক!

এ নাটকের সব থেকে বড় বিভ্রাট ঘটেছে নাটকের অকুস্থল নির্বাচনে। কাছাড়, মণিপুর, ব্রহ্ম—সবই যদি বাঙ্গালা দেশ হয়, তাহলে মল্লভূমি বা বর্ধমান বা রাজশাহী ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কি প্রয়োজন ছিল?

এই নাটকে নাট্যকার বর্তমান যুগ, বা অতীত বা মধ্যযুগ কোনটাই ধরবার চেষ্টা করেন নি।

এই নাটক লেখকের অসুস্থ দেহের রচনা ; "যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্ন শয্যায়।"[২৮] নাট্যকার মাজাঘসা করার অবকাশ পাননি।

'কমলে কামিনী' যখন প্রকাশিত হয়, তখন পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ আসর জাঁকিয়ে বসেছে। ঐ মঞ্চের প্রতি নজর রেখেই হয়ত তিনি এই নাটকে উত্তেজনার পরিমান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ন্যাশান্যাল থিয়েটারের জাতীয়তাবাদী উচ্ছ্বাস তখনও প্রবাহিত হয় নি; তাই এ নাটকের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রণয়বাসনার চরিতার্থতা। কিন্তু এই নাটক যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, তার সঙ্গে প্রণয়বাসনার আধিপত্য খাপ খায় না। একাধিক রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষি শেষ পর্যন্ত মীমাংসিত হোল শিখণ্ডিবাহন ও রণকল্যাণীর যুগলে সিংহাসন-আরোহনে এবং মকরকেতনের রাজছত্র ধরে দণ্ডায়মান হওয়ায়।

দীনবন্ধুর এই ব্যর্থতা আরও বেশি প্রকটিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভারের পাশে। দুর্গেশনন্দিনী থেকে বিষবৃক্ষ উপন্যাস এই সময়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। কাজেই গম্ভীর অথচ ভাবোদ্দীপ্ত রচনা বাঙ্গালী পাঠকের আয়ত্তের মধ্যে এসে গেছে। তখনও এগুলি নাট্যরূপান্তরিত হয়নি, কিন্তু এগুলির সাহিত্যাস্বাদ থেকে পাঠক বঞ্চিত নয়। হিন্দু প্যাট্রিয়টের সম্পাদক যখন এই প্রকার লেখেন, তখন তা যথার্থ বলেই গ্রহণ করতে হয়:

> "In one word Babu Dinabandhu writes for the present generation, Babu Bankim Chandra for ages and generations to come.
> It is unfortunate that our author has attempted to describe the greatness of kings and heroism of our warriors. This is not his line, and he has signally failed."[২৯]

কমেডি ও প্রহসন

'নীলদর্পণ' নাটক পড়েই বোঝা গিয়েছিল যে দীনবন্ধুর অধিকারে আছে শ্রেষ্ঠ কমেডি-লেখকের গুণাবলী। তাঁর তোরাপ, রাইচরণ, রাইয়তগণ, আদুরী, গোপীনাথ-সকলেই কমেডির জগতে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে।

বাঙ্গালী সমাজে যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব চলছিল তার শুধু বেদনার দিক নয়, তার একটা কৌতুকের দিকও আছে। মাইকেল যে দ্বন্দ্ব অবলম্বন করে রাবণকে সৃষ্টি করেছেন, সেই দ্বন্দ্ব থেকেই নবকুমারের সৃষ্টি। মাইকেল ব্যঙ্গের ব্যবহারে রঙ্গরস সৃষ্টি করেছেন, দীনবন্ধু ভিন্ন ভাবে। ব্যঙ্গ তাঁর কোন কোন নাটকে সূচনা-অংশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত কৌতুক রসই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

যুগের জটিল দ্বন্দ্ব ও জ্বালাকে কৌতুকের শুভ্র হাসি দিয়ে দীনবন্ধু হালকা করে দিয়েছেন।

রঙ্গনাট্যের আঙ্গিনায় দীনবন্ধুর প্রবেশের পূর্বে বাংলা দেশে রঙতামাসার অভাব ছিল না। নক্সা ও সঙ ছিল তখন খুব প্রচলিত। বরং গম্ভীর বিষয়ের উপভোগ ক্ষমতারই তখন সাক্ষাৎ মিলত না। নববাবু বিলাস, নববিবি বিলাস নক্সাজাতীয় আদি রচনা; বিদ্যাসুন্দরের রঙ্গরসের সঙ্গে তার মিল আছে, অমিলও আছে। ঐ দুটি রচনায় আধুনিক যুগের সমালোচক-বৃত্তির ছাপ আছে।

পরবর্তীকালে নক্সাজাতীয় রচনা অন্যান্য রূপকল্প ছেড়ে উপন্যাসে উদ্‌গতি লাভ করল। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি রচনায় নক্সার উন্নততর রূপ প্রকাশ পেল; 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'কলিকৌতুক নাটক' প্রভৃতি রচনায় সঙ-এর উন্নততর রূপ প্রকাশ পেল।

আধুনিক রঙ্গনাট্য একটু ভিন্ন পরিবেশের সৃষ্টি; শুধু উৎসব বা পূজাপার্বণ অবলম্বনে এগুলি রচিত হতে পারে না। পূর্বতন সঙ জাতীয় রচনার লেজুড়বৃত্তি এগুলি পরিহার করেছে। এই নতুন রঙ্গনাট্যের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত মঞ্চ, সংগঠিত সমাজ ও রুচিসম্পন্ন সহনশীল দর্শকগোষ্ঠীর প্রয়োজন। সমালোচক ও সমালোচিত ব্যক্তি, উপহাসক ও উপহসিত ব্যক্তি যাতে পাশাপাশি বসে নাটক উপভোগ করতে পারে, এমন মনোভাবের সাক্ষাত মেলা চাই।

কমেডি রচনার প্রথম যুগে আমরা দেখেছি দর্শকদের মধ্যে ঐ জাতীয় রসবোধ (sense of humour) ছিল না; তাই মাইকেলের প্রহসনদ্বয় বেলগাছিয়া মঞ্চের স্নেহলাভে বঞ্চিত হোল।

বিয়ে পাগলা বুড়ো

'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন। এই গ্রন্থ রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয় সঙ্কট' প্রহসন তিনটির পূর্বে রচিত।

স্থূল বাহ্যজীবনকে প্রাধান্য দিয়ে দীনবন্ধু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' লিখতে শুরু করেছিলেন; কিছু দূর গিয়ে তিনি আচরণ বা আবরণ ছেড়ে ব্যক্তিস্বরূপটি ধরবার প্রয়াসী হয়েছেন। তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকে দীনবন্ধু কোন এক বৃদ্ধের যৌনক্ষুধার বাড়াবাড়ি নিয়ে পরিহাস করতে গিয়েছিলেন; পরে ঐ

মন্দভাগ্য বৃদ্ধের অসহায়তায় সমালোচকের যষ্ঠি ছুঁড়ে ফেলে সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন।

দুই অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকে মোট ছয়টি দৃশ্য আছে। দুইটি দৃশ্য বাদে রাজীব মুখোপাধ্যায়ের গৃহে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সমগ্র নাটকের সময়সীমা দুই একদিনের মধ্যে আবদ্ধ। এদিক থেকে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটকের গঠন-প্রণালীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। নাটকের ঘটনা প্রথম থেকে পরিণতির দিকে চলেছে; শুধু সর্প দংশনের অভিনয়-অংশে অনাবশ্যক হাস্যরস সৃষ্টিব প্রবণতা দেখা যায়। মাইকেলের মতই প্রয়োজন-অতিরিক্ত ঘটনার আমদানী আব তিনি করেননি।

রাজীব ছিল তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র; সে পুরাতনপন্থী। স্কুল কলেজী শিক্ষার বিরোধী, বিধবা বিবাহের বিরোধী, ঘুষ নেওয়া বা উপরি পাওনাকে সে দূষনীয় মনে করে না। আদি রসসমৃদ্ধ কবিতার সে সমজদার, নিজে ষাট বৎসব বয়সে উপনীত, তবু পুনরায় বিবাহ করার জন্য লোলুপ। কিন্তু ১৫ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যার বিবাহ দানে অসম্মত। এই জাতীয় চরিত্র দীনবন্ধুর ন্যায় নব্যপন্থীর কাছে সঙ্গত কারণেই উপহাসাস্পদ হবে। কিন্তু ব্যঙ্গ দিয়ে শুরু করলেও দীনবন্ধু শেষ পর্যন্ত কৌতুকের কূলে নোঙর ফেলেছেন। আসলে দীনবন্ধু চারিত্রিকভাবেই ছিলেন পরবিদ্বেষঅপারগ।

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কোন কোন অংশে বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন গ্রাম্য বালকদের দিয়ে রাজীবের সঙ্গে রঙ্গরস অবতারনাকে সমর্থন করেন নি। "ঐ ছেলেগুলি বাসরে শালী শালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেইরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পাবে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।[৩০] Hindu Patriot-এব সমালোচনাও প্রায় এই জাতীয়। তাঁরা বলেছেন, নাটকের প্লট প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া হলেও বুড়োকে ঝাঁটার বাড়ি মারাটা যুক্তিসঙ্গত হয়নি; আর স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে রঙ্গরসসৃষ্টি সম্বন্ধে বলেছেন, "morally improbable and has no existence in real life."[৩১]

অথচ সে যুগেই রহস্যসন্দর্ভের মনস্বী সম্পাদক এই গ্রন্থে কুরুচির কোন পরিচয় পান নি: বাসরঘরের বিষয়টিকে তিনি অশ্লীল বলেন নি, সংক্ষিপ্ত করতে বলেছিলেন। "অনেকের একটা ভ্রম আছে যে, অশ্লীলতা হাস্যের প্রণোদক

এবং সেই ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া প্রায় প্রহসন মাত্রেই অশ্লীলতা প্রচুররূপে নিবিষ্ট করেন। তন্নিমিত্তই প্রহসন নাম শ্রবণ মাত্রে অনেকে বিরক্ত হইয়া থাকেন। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে মিত্রবাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তৈঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা একবার মাত্রও করেন নাই; অথচ তাঁহার রচনা বিশিষ্ট হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে সন্দেহ নাই।[৩২] সে যুগের নব্যশিক্ষিত সমাজ বিশেষভাবে রুচিপরায়ণ ছিল; বা ঐ সমাজ এক ভিন্ন রুচিবোধ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এই নব্য সমাজে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সাময়িক পত্রিকার সাক্ষ্য উদ্ধার করা গেল:

"Baboo Dinabundhoo Mitter, has favoured us with a copy of his new comedy, which we should have noticed three months earlier but that the book was undergoing a wide tour amongst friends, relatives and acquaintances, from which we have at last succeeded with difficulty in rescuing it. This fact ought perhaps to suffice for a criticism on the work, as it undoubtedly is the best and truest criticism on it."[৩৩]

সধবার একাদশী

দীনবন্ধুর কারুণ্য মিশ্রিত কৌতুক রসের চরম স্ফূর্তি ঘটে 'সধবার একাদশী' নাটকে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো আর সধবার একাদশী একই সময়ের রচনা; দুইগ্রন্থে একই প্রকার শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র বিষয়বস্তুতে পাই পর-সমালোচনা. 'সধবার একাদশী'র বিষয়বস্তুতে পাই আত্ম-সমালোচনা। হিন্দু কলেজের ছাত্র, কৃষ্ণনগরে দীর্ঘকাল বসবাসকারী (এই সময়ে কৃষ্ণনগরে উন্নতিকামী ব্যক্তিদের অনেকেই বসবাস করতেন—রামলোচন ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, মাধবচন্দ্র মল্লিক। আর রামতনু লাহিড়ীর ত জন্মভূমি) দীনবন্ধু সে-যুগের সর্ববিধ আধুনিক প্রবণতার সঙ্গে একাত্ম ছিলেন। 'সধবার একাদশী' নাটকের সূচনা হচ্ছে—কাঁকুরগাছা নকুড়েশ্বরের উদ্যানে; প্রথম সংলাপটি হোল এই—

নকু। ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে।

নিম। পানায়, খায় না।

অর্থাৎ তখনও পাঁড় মাতাল হয়নি অটল।

নাটক শেষ হয়েছে কাঁশারী পাড়ায় অটলবিহারীর বৈঠকখানায়। বাগান বাড়ি থেকে ভদ্রাসনে পানপাত্র এসে হাজির হয়েছে। অটল আজ বলছে, "যে মার খেইচি, অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না-।" ৩৩

নাটক ক্ষণকালের জন্যও তার নিশানা ত্যাগ করেনি। নাটকে কোন সংশোধনের ইশারা নেই—কারণ নাট্যকার জানতেন এই জাতীয় নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, শিক্ষা দান করা নয়। সে কাজ সংস্কারকের। এই প্রকার নাটকে তবে কি সংশোধনের কোন ইচ্ছা থাকে না? থাকে। "Society punishes by laughter the individual's deviation from social norms."

"It is useless to hide the fact that the majority of educated native gentelmen are deeply in the books of Payne & co., more deeply in their books than in those of Great Eastern Hotel Company Limited. We have come to that pass that one must wonder like Diogenes with a lamp in broad day, to discover the educated or even half educated native who does not drink······ The revolution in not confined to Calcutta. In the mofussil the Anglicised Bengalee has made numerous proselytes. Fashion supports the vice to an incredible extent, and the leaders of the people are therefore answersable for it in a greater degree—than either English schools or the English Abkary. They are directly reponsible for a state induced by their own vicious example in many, and supported by their supine indifference in a few cases."৩৪

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে সুরাপান নিবারনী সমিতিও গঠিত হয়েছে। তবে এই আন্দোলন আশানুরূপ সাড়া তোলেনি। সকল প্রতিভাবান সাহিত্যিকই অত্যধিক মদ্যপানের বিষময় ফল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন—তাঁদের সাহিত্যে তার চিহ্ন আছে।

শুধু ইয়ং বেঙ্গলদের দোষ দিয়ে লাভ নেই; সমাজে সর্ব শ্রেণীর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে সেযুগে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল—মদ্যপানও একটা প্রতিবাদ। "Universal scepticism has displaced

a faith in Hindoo superstition in the minds of the educated. It is impossible to obtain an earnest hearing from them on any serious subject."[৩৫] ইয়ংবেঙ্গলের এটি বাস্তব চিত্র নয়।

সমসাময়িক যুগের বহুআলোচিত বিষয় নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেছেন; তাঁর নাটকে সুরাপান নিবারনী সমিতির প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। নাটকের বিষয় তাঁর কাছে প্রাধান্য পায়নি, নীতি শাস্ত্রও তাঁর আলোচ্য নয়। তিনি এখানে তুলে ধরেছেন পরিপূর্ণ জীবন; তার লোভ, তার মিথ্যাচার, তার ভণ্ডামি, তার ধূর্ততা। তিনি প্রশংসা করেন নি, নিন্দাও করেন নি, শুধু তাদের উত্থাপিত করেছেন। তাঁর যুগের দর্শকদের তিনি সংশোধিত করতে চাননি, তিনি চেয়েছেন আমোদিত করতে। এক কথায় তাঁর লক্ষ্য ছিল নাটক রচনা করা।

মদ্যপান বিরোধী প্রচার থেকে তাই দীনবন্ধু সরে গেছেন; তিনি দেখিয়েছেন এক প্রতিভাবান, যথার্থ জ্ঞানী ও যোগ্যলোক—না পারিবারিক জীবনে, না সামাজিক জীবনে কোনরূপ স্বীকৃতি পেল; সে তার মরজগতের ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য মদ্য পানকেই সম্বল করেছে। এই ব্যর্থ নিস্ফল নৈরাশ্য-পীড়িত শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বিধাশূন্য উচ্চহাসিই এই নাটকের প্রাণ।

সধবার একাদশী তাই যেমন দারুনভাবে সমসাময়িক, তেমনি কালাতীত।

১. আমি তোমার নিন্দা কত্তেম-তুমি জাত মান না, ব্রহ্মসভায় যাও, আপনিও দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখচি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিসপেন্সারি করবের সুযোগ কর! ১।২

২. আমি যখন মদ খেতেম কারো ভয় করে খেতেম না, সুরাপান নিবারণী সভার প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর ক'রে আমি মদ একেবারে ছেড়ে দিইচি। ১।২

৩. কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কালেজে পাঁচ বচ্ছোর চাল্লিস টাকা করে জলপানি পেয়েছেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজিটোলের ভট্‌চাযি্য হয়ে বেরয়েচে। এরা কি মাগকে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাকতে থাকে। ২।১

সেদিনকার মধ্যবিত্তদের স্বপ্ন হোল—

> তুমি ধর্মকর্ম করবে, এডুকেশান কমিটির মেম্বর হবে, অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের কাউন্সেলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতিব চেষ্টা করবে, দুঃখীদের প্রতিপালন করবে। ১।২

সেই স্বপ্ন নিমচাঁদের কাছে শুধু স্বপ্নই।

> বাবা স্নকতলার জোবে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হও নি। তোমার কলেজের একটাকে দেখাও দেখি আমাব মত ইংবিজি জানে —I read English, write English, talk English, speechify in Engli›h, think in English, dream in English. ২।২

কারণ নিমচাঁদ তিক্ত অভিজ্ঞাতার বিনিময়ে জেনেছে :–

> জানি, কলিকাতায় লোকে গুণ দেখে না ; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুকলি কচ্চিনে কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে-গদভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা, হস্তিমুর্খ অটল-ছাগলেব বিবাহ হয়েছে, আব অধিক কি আপনার পরিচয় দেব। জননি, আমি যেমন ভীম, বোতল চারুহাসিনী আমার তেমন হিড়িম্বা ৩।১

নিমচাঁদ সে যুগেব ব্যর্থ শিক্ষিত মধ্যবিত্তেব প্রতিনিধি। "Comedy contains potential tragedy within itself"-সমালোচকের এই উক্তির সার্থকতা দেখা যাচ্ছে 'সধাবাব একাদশী'তে। মেরেডিথ রঙ্গরস আর কমেডিকে সমার্থক বলে ভেবেছিলেন, সেই ভাবনাব জের আজও চলেছে। বিশেষ কবে বাংলা সাহিত্যে কমেডিব সঙ্গে জেলে পাড়ার সঙ বা 'রামলীলা'র সঙের ভেদ আজও কল্পনা করতে পারেন না কেউ কেউ।

আর্থার কোয়সলার একবার বলেছিলেন বোকাচ্চিওর গল্পগুলি ঘুরিয়ে নিলে ট্রাজেডি হয়ে পডে। শুধু আবেগের ঝোঁকটা বদলে দিলেই সব ট্রাজেডিকেই কমেডিতে রূপান্তরিত করা যায়। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, "Oedipus Rex can be made to appear as a prize fool who kills his father and marries his mother, all by mistake." **This tragedy is turned into a French farce without alterning its cognitive layout."[৩৬]

ফরাসীদের মত হিম্মত সকলের থাকবে, আশা করা যায় না। কিন্তু এ কথাটি পরিষ্কার হয়েছে যে ট্রাজেডি আর কমেডির পার্থক্য বিষয়ের পার্থক্য নয়—মেজাজের পার্থক্য।

'সধবার একাদশী'র নিমেদত্ত তারই উদাহরণ। বাংলার জল বায়ু থেকে, বাংলার নরম মাটি থেকে অফুরন্ত শক্তির উদ্ভব সম্ভব ছিল ; কিন্তু বাংলার পর-মুখাপেক্ষী রাষ্ট্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজিক কাঠামোতে তা প্রত্যাখ্যাত। তাই ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হোল সীমিত। প্লাটাসের মত শুধু হাসিয়েই তিনি ক্ষান্ত নন, টেরেন্সের মত ভাবুকের ভাবনাকেও উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাই তাঁর নাটকে ঘটনা পরিকল্পিত হয় নি, উৎকলিত হয়েছে। বাস্তব জীবনের নির্বাচিত অংশ তুলে নেওয়া হয়েছে। নীলদর্পণে ও বিয়ে পাগলা বুড়ো নাটকে হাস্যরস এসেছিল হিউমার থেকে, এখানে 'wit'। এখানে কুশী-লবেরা শিক্ষিত ও শহুরে। wit শহর সংস্কৃতির দায়ভাগ ; বৈদগ্ধ্যের আত্মীয়।

তিন অঙ্কে ও ছয়টি গর্ভাঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ ; ঘটনাস্থল কলকাতা শহর—চীৎপুর কাশাবিপাড়া ও কাঁকুড়গাছা অর্থাৎ উত্তর কলকাতার এক সঙ্কীর্ণ অঞ্চল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ সামাজিক নাটকের বিচরণ-ক্ষেত্র হবে এই অঞ্চলটি। ঘটনাকালও দীর্ঘায়িত নয়। প্রথম অঙ্ক একটি দিনের ঘটনা ; দ্বিতীয় অঙ্কও একটি দিনের ঘটনা। তারপর দুই একদিন কেটে যাবে। তৃতীয় অঙ্ক তিনটি গর্ভাঙ্ক সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে ঘটে গেছে। এ ব্যাপারে মাইকেল তাঁর আদর্শ হিসাবে কাজ করেছেন।

নাট্যকার দেখাচ্ছেন বিশেষ বিশেষ সমাজের মধ্যে সৎ লোকই কেবল থাকে না, ভণ্ডও থাকে। ভণ্ডামিই মানুষের সব থেকে বড় শত্রু! এবং তার বিরুদ্ধেই নিমে দত্তের প্রধান আক্রমন—

১. আমি জানি হিন্দুরা যেমন প্রজুডিস বশতঃ মদ খায় না, তেমনি অনেক হাকিম প্রেজুডিস বশতঃ ঘুস খায় না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমার প্রেজুডিস গিয়েছে, কেবল অর্ধচন্দ্রের ভয়েতে ঘুস খাও না—তুমি সাধুপুরুষ, প্রেজুডিস ছেড়ে দিয়ে বেশ করেছ।

২. দূর ব্যাটা ঘটিরাম-তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে-যখন ব্রাহ্মধর্মের সূত্র হচ্ছে "একমেবাদ্বিতীয়ং", তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করিচিস কি না বলতে কতক্ষণ লাগে?

৩. কমিটির হাতে দিও না, দিও না, দিও না, বহবারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে পড়বে। নিমে দত্ত শুধু অপরের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত নয়; কাঞ্চন গোকুলবাবুর বৈঠকখানায় গিয়েছিল বলে অটলের ভীষণ অভিমান; এই অপমানের শোধ নেবার জন্য ঠিক করল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে সে জোগাড় করবে। 'Positive virtue' নিমে দত্তের কিছু কিছু আছে। অটল যখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে অপহরণ করার মতলব করল, তখন সে সমর্থন করে নি।

"গৃহস্থের মেয়ে বার করার মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকলো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাবকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও।"

যেদিন ঐ জঘন্য কাজটি সম্পন্ন হবে, সেদিন নিমে দত্ত মদ খেতে উৎসাহ বোধ করে নি। —"তোর আজ মদ খেতে এত অরুচি হয়েছে কেন?"

অটল এক হিজড়া নিয়োগ করে গোকুলবাবুর স্ত্রীকে অপহরণ করতে নির্দেশ দিল; হিজড়া ভুল করে অটলের স্ত্রী কুমুদিনীকেই তুলে আনল। কাকা রামধন রায় যখন মারমুখো হয়ে ছুটে এলেন, তখন অটল সব দোষ নিমচাঁদের কাঁধে চাপিয়ে দিল।

নিমচাঁদের উত্তর নিমচাঁদের উপযুক্ত—'তোর কথায় রাগ কল্যে মূর্খতার সম্মান করা হয়।' নাটক যখন শেষ হোল, তখন রামধন বাবু ফিরে এসে কি দণ্ডবিধান করবেন, জীবনচন্দ্রই বা এসে কি বলবেন, তার জন্য নাট্যকার অপেক্ষা করেন নি। অটলের মূর্খামির ত পুরো ছবি দেওয়া হোল; আর নিমচাঁদের মত প্রতিভাবান ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের বিবরণও অসমাপ্ত থাকল না। নাট্যকার পাপীর দণ্ডবিধানের জন্য আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখেন নি। নিমচাঁদের মতামতই এই নাটকের মুখ্য আকর্ষণ—"His world is one that arises from opinions. The opinion of his characters constitute their faces"[৩৭]. নিমচাঁদ হোল রাবণ ও অজয়কুমারের উল্টা পিঠ; যা চোখের জলে বলা যায়, তাই অট্টহাসিতে বিকীর্ণ হোল।

নাটকে নিমে দত্ত নায়ক হয়েও নায়ক নয়; গল্পকে সে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না, টেনে নিয়ে চলেছে অটল। অথচ সমগ্র প্লটের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে; নানা ঘটনার ওপর তারই মন্তব্য আমাদের উল্লসিত ও উচ্চকিত করে। কিন্তু তার প্রসঙ্গকে আর স্ফীত করা চলে না, তার জীবনের সমস্ত কার্যকারণ

বিশ্লেষিত করা চলে না; তাহলে হাসির রৌদ্রচ্ছটা চোখের জলের প্লাবনে আবৃত হয়ে যাবে। "অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"

সধবার একাদশী নাটকের সার্থক কমেডি হবার পক্ষে কোন বাধা নেই, কারণ এখানে শুধু চরিত্রেরই ভিড। নিমচাঁদ, অটল, গোকুল, জীবনচন্দ্র রামমাণিক্য, কেনারাম, ভোলানাথবাবু—সকলেই এক একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি। এমন কি কাঞ্চন, কুমুদিনী ও গিন্নিরও বিশিষ্টতা আছে। চরিত্রগুলির কোনটিই অতীব বর্ণিত নয়।

নিমে দত্তের গৃহে স্ত্রী ছিল, কিন্তু সে কুৎসিৎ; তাই গৃহ তার কাছে অনাকর্ষনীয়। নিমচাঁদ মধুসূদন নয়, আবার মধুসূদনও বটে। সে উনিশ শতকের ভাগ্যহত পুরুষের প্রতিনিধি। তার বক্তৃতায় মাঝে মাঝে মাইকেলের উক্তির প্রতিধ্বনি শুনে সে-যুগে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় তারক বিশ্বাস মহাশয় লিখে-ছিলেন, নিমে দত্ত হলেন মধুসূদন আর কাঞ্চন হোল স্বর্ণ-বাইজী। এই অনুমান ভ্রান্ত, তা স্বয়ং নাট্যকারই বলেছিলেন। মধু কখনও নিম হয়!

"দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা। হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে। কবির সহধর্মিণী নহে।

* * * *

. যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র।"[৩৮]

নিমে দত্ত কি ঈশ্বর গুপ্তের এই বিশিষ্টতা হরণ করে হাজির হয়েছে?

বস্তুত সাহিত্যের ব্যক্তি বাস্তবের ব্যক্তির হুবহু রূপায়ণ নয়। সে বহুর রূপ আত্মস্থ করে অনন্যরূপী।

নাটকের নায়ক-নির্বাচনে দ্বিধার ভাব থাকায় এমন বহু দৃশ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে অটলের কোন ভূমিকা নেই। এই কারণে ঐ সব দৃশ্যের উপযোগিতা অনেকে স্বীকার করেন নি। "উপলক্ষ গল্পেরও আরম্ভ কি শেষের বিশেষ নির্দেশ নাই। পরন্তু তাহার যে কোন স্থান পাঠ করা যায় তাহাই সম্পূর্ণ আমোদজনক বোধ হয়।"[৩৯] সম্ভবত সমালোচকের মনোযোগ নিমে দত্তের প্রতি নয়, অটলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল; এই কারণে অটলহীন দৃশ্যের কার্যকারিতা তিনি স্বীকার করতে পারেন নি। আসলে এই

নাটক যে সুরাপান নিবারণী সভার প্রচারপত্র নয়, এটা তখন অনেকে স্বীকার করতে চান নি। শোনা যায় যে, স্বয়ং প্যারীচরণ সরকার মহাশয় নাট্যকারকে বলেছিলেন যে, আপনার নাটক প্রকাশিত হওয়ায় আমার এই সভা গঠনের আর আবশ্যকতা নেই।

জামাইবারিক

জামাইবারিক নাটক সম্পূর্ণত অতিকথনে পূর্ণ। জামাইবারিক তাই কমেডি নয়. যদিও এই নাটকের শেষ মিলনাত্মক। জামাইবারিক হোল 'ফার্স' প্রহসন—চরিত্রগুলি চড়া রঙে আঁকা, ঘটনাগুলি নানা মজাদার অনুষ্ঠানে পূর্ণ, সংলাপ অনেক ক্ষেত্রেই চতুর বাক্যের বিনিময়।

"সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট সঙ্ঘটন, ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধণ প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন কবিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য।" (বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব —রামগতি ন্যায়রত্ন, পৃষ্ঠা—২৭২) সমালোচকমহাশয়ের প্রহসনের এই প্রকৃতি বিশ্লেষণ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তিনি প্রহসন ও কমেডিব মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি। ড্রাইডেনের সেই বিখ্যাত বিশ্লেষণ আজও সত্য: "Comedy present us with the imperfections of human nature Farce entertains us what is monstrous and chimerical."[৪০] কলকাতারই কোন ধনাঢ্য কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের ঘরজামাই রাখার হাস্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে রচিত এই নাটক।

সে-যুগের আর এক ধনী পরিবারের বালক কিভাবে জামাইবারিক পড়েছিলেন, তার এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দেওয়া গেল: "দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূরসম্পকীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সেই বই তিনি বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে জানাইলাম এ বই আমি পডিবই।"[৪১] এই বই সত্যিই তিনি পড়েছিলেন এবং তার এক হাস্যোজ্জ্বল বিবরণও আমাদের দিয়েছেন। "বই পড়া হইল। তাহার পর চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া

চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভৎর্সনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতে ছিলেন—আমারও সে দশা।" এ হাসির বিনিময় হেতু কি? হয়ত বা তাঁদেরই পরিবারের একটা কৌতুককর দিকের উদ্ঘাটন হয়েছে। "His Jamai Baric or the Son-in-law's Barrack was a burning satire on the practice of some of the richer families in Calcutta, who refused to allow their daughters to go to their husbands' homes and families but had their sons-in-law domesticated in their own homes as more or less dependent on their wives".[৪২]

জামাইবারিকে অন্যান্য হাস্যকর চিত্রের তলায় অভয়কুমার কামিনীর গল্প চাপা পড়ে গেছে। বিশেষ করে পদ্মলোচনের কাহিনী অতি স্ফীত হয়ে আধিপত্য করেছে। পদ্মলোচনের কাহিনীতে আছে বহুবিবাহের বেদনা।

"জামাইদিগের অতদূর দুরবস্থা, দুই পত্নী কর্তৃক পদ্মলোচনের শরীর ভাগ করিয়া লওয়া ও একের ভাগে পতিত স্বামীর অঙ্গে অন্যের আঘাতাদি করা, রাত্রিকালে স্বামী ভ্রমে চোরকে ধরিয়া দুই সতীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার করা প্রভৃতি কার্যগুলি নিতান্ত অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে—" (রামগতি ন্যায়রত্ন; পৃঃ ২৭২)। সমালোচকের অভিপ্রায় যাই থাক, তিনি এই ঘটনাগুলির অতিকথন ত্রুটি ঠিকই অনুধাবন করেছেন। কিন্তু প্রহসন ত অতিকথনের সাহিত্য। এবং প্রহসনের ঘটনাবলীও তত দৃঢ়-সংবদ্ধ হয় না। প্রহসনের চরিত্রগুলিতে থাকে বাড়াবাড়ি, রঙের প্রলেপ হয় আত্যন্তিক; তাই বাস্তবের সঙ্গে প্রহসনের সম্পর্ক ক্ষীণতর। তবু দীনবন্ধু তথাকথিত প্রহসনের মত বোবা, খোঁড়া, ট্যারা প্রভৃতি শারীরিক বিকৃতি বিশিষ্ট দুর্ভাগাদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেন নি। তিনি কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহের অভিশাপে দুর্দশাগ্রস্ত এক দল অপ্রকৃতস্থ নরনারীর জীবন-যন্ত্রণার ওপর কৌতুকের কুঙ্কুম ফাটিয়েছেন।

জামাইবারিক 'সধবার একাদশী' থেকে পৃথক আঙ্গিকে রচিত। এখানে হাস্যরস ফুটেছে নতুন নতুন 'সিচুয়েশন' বা ঘটনা-সংস্থান থেকে; তির্যক উক্তি-প্রত্যুক্তি থেকে নয়। কৌতুক অনেক ক্ষেত্রে এতই দুর্বার হয়ে উঠেছে যে, সে-যুগের সমালোচকেরা তা বরদাস্ত করতে পারেন নি।

"There are some very graphic and powerful descriptions in this work, and there is a vein of comic humour running throughout the piece.

But the humour, we are sorry to say, is at times of an offensive kind, and it is here we blame the author."[৩৪]

বাস্তব তাঁর সহচর; যখন সেই বাস্তব অমিতাচারী হয়, তখনই তাঁর নাটকের দুর্গতি। বিচলিত ভূমিতে তাঁর পদস্খলন নৈসর্গিক ঘটনার মতই স্বাভাবিক। দীনবন্ধু সেক্সপীয়ার পড়েছিলেন, আরও অনেক বিদেশী ও দেশী সাহিত্য পড়েছেন। পঠিত সাহিত্য তাঁর চিত্তকে সমৃদ্ধ করেছে; কিন্তু নাটকে যেখানে তিনি সার্থক, সেখানে ধারকরা বিদ্যা তাঁর সহযোগী নয়। তাঁর জীবনই তার সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংগঠক।

নাটক তাঁর হাতে পুরো 'drama' হয়ে উঠল; গান নয়, সংলাপ তাঁর নাটকের প্রাণ। মাইকেলে যে পথে নিশ্চিত যাত্রা ছিল, দীনবন্ধু সে পথে অনেকখানি এগিয়েছেন। তিনি কোন পোষ্টা বা উৎসাহদাতার উৎসাহে নাটক লেখেন নি। তাই তাঁর নাটক অভিজাত সমাজের হাততালি উপেক্ষা করে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। নবীন তপস্বিনী বা কমলে কামিনী তাঁর নাট্যকার-জীবনের প্রধান দিক তুলে ধরে না।

একদিন তাঁর নাটক যেমন অভিজাত সমাজের চৌকাঠ লঙ্ঘন করেছিল, তেমনি আর একদিন তাঁর নাটক সৌখীনতার দেউড়িও উতরে গেল। "মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেইজন্য আপনাকে রঙ্গালয়স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"[৪৪] এই নমস্কার অনৈতিহাসিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নয়।

মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২)

মনোমোহন বসুর সাহিত্য-জীবন শুরু হয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্নেহচ্ছায়ায়; সংবাদ প্রভাকরে তিনি পদ্য লিখতেন; এ ছাড়া হাফ-আখড়াই, কবি, পাঁচালী প্রভৃতি সঙ্গীতশাখার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

মনোমোহন বসুর ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা মোটামুটি মন্দ ছিল না; তিনি হেয়ার স্কুল ও জেনারেল এ্যাসেম্‌বলি ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। বাল্যে তিনি টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন।

মনোমোহন বসুর সাহিত্যজীবনের দুইটি স্তর দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে তিনি শুধু কবিসঙ্গীত, পদ্য, ও পাঁচালী রচনা করছেন ; এই সময়ে তাঁর উপর গুপ্তকবির প্রভাব সর্বাত্মক। দ্বিতীয় স্তরের উদ্ভব দেখতে পাই হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠার পর। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার অনুষ্ঠানপত্র (Prospectus) প্রকাশিত হবার পর বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয়তাবোধ একটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করল। এই সময়ে মনোমোহন বসুর নাট্যপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটে ; এর পূর্বে তিনি 'সঙ' জাতীয় রচনা লিখেছেন। (দ্রষ্টব্য মনোমোহন গীতাবলী—১৮৮৭)।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাফল্যে কলকাতা শহরে একটা প্রবল নাট্যোৎসাহ দেখা যায়। ঠাকুর-দেব-সিংহ-বাবুদের মত প্রধান প্রধান জমিদার গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা যেখানে নেই, সেখানেও নাট্যাভিনয় সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিভিন্ন পল্লীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নাটক-অভিনয়ে উৎসাহ দেখাতে থাকেন।

এই রকম এক নাট্যশালার জন্যই মনোমোহন বসু নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বলদেব ধর ও চুণিলাল বসুর উদ্যোগে বহুবাজারে একটি নাট্য সমাজ স্থাপিত হয়। এঁরা দুজন পাথুরেঘাটা নাট্যশালার অভিনেতা ছিলেন[৪৪]। পাথুরেঘাটা নাট্যশালা ছিল শৌখীনতার দিশারী, নবীনতার তত দিশারী নয়। ধর ও বসু মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চের নবীনতার প্রতি তত উৎকণ্ঠা ছিল না। এই নাট্যশালার দ্বারোদ্‌ঘাটিত হয় মনোমোহন বসুর 'সতীনাটক' (১৮৬৮ ফেব্রুয়ারী) নিয়ে। এই নাট্যশালা 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়' নামে পরিবর্তিত হয় ; এবং স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। এখানেও মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' ও 'হরিশ্চন্দ্রনাটক' অভিনীত হয়। 'বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়' মধ্যবিত্ত যুবকদের উৎসাহে গঠিত হয়। এবং এঁরা শিক্ষাদীক্ষায় 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তার অর্থ এই নয় এঁরা পুরাতনপন্থী ছিলেন। এক পত্রলেখক বলছেন, "অভিনয়ের বিষয়বস্তু খুব করুণ হওয়াতে অনেকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই।"[৪৬] করুণ রস তখন নবীন নাট্যবোধের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছেন, "এই নাট্য সমাজের জন্য বিখ্যাত নাট্যকার মনোমোহন বসু নাটক লিখিয়া দিতেন।"[৪৭] বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়ের সঙ্গতি ও নাট্যাদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তিনি নাটক রচনা করেছেন।

এই নাট্যশালার মঞ্চ সুদৃশ্য; পত্র লেখকের মতে, "অর্থ ব্যয়ের দ্বারা নাট্যশালাটিকে যত সুন্দর করা যাইতে পারে, তাহা করা হইয়াছিল এবং দৃশ্যপটগুলিও প্রয়োজনানুযায়ী হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ দর্শকগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, অভিনেতারা উপযুক্ত ও সুরুচিসম্পন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন।"[৪৮] যাত্রার সঙ্গে এই নাট্যাভিনয়ের পার্থক্য ছিল; কারণ দৃশ্যপটসম্বলিত মঞ্চেই এই সব নাটক মঞ্চস্থ হোত। এর ফলে অভিনয়ের রীতি এবং নাটকের রচনারীতিও পৃথক হতে বাধ্য। কোন নাটক সঙ্গীতের সংখ্যাধিক্য বশতঃ গীতাভিনয় রূপে পরিগণিত হয় না। মনোমোহন বসুর নাটকে সংলাপ ও সঙ্গীত প্রায় সমান মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু তার ফলে এগুলি গীতাভিনয় হয়ে ওঠে নি! কেউ কেউ বলেন, মনোমোহন বসুর অনেকগুলি নাটক যাত্রা-পালারূপে অভিনীত হোত। মধুসূদনের নাটকও কি যাত্রায় রূপান্তরিত হয় নি? 'পদ্মাবতী গীতাভিনয়' চমৎকার সমাদৃত হয়েছিল। মনোমোহন বসুর নাটকও তেমনি যাত্রায় রূপান্তরিত।

"কয়েক মাস অতীত হইল, কোনও স্থলে উপর্য্যুপরি দুইদিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। একদিন রামাভিষেক নাটকের যাত্রা—অপরদিন সতী নাটকের যাত্রা। ..উক্ত উভয় নাটকেরই রঙ্গস্থলে অভিনয় পূর্বে দেখিয়াছিলাম। বর্ণ্যমান যাত্রাতেও অবিকল সেইরূপ অভিনয়ই দেখিলাম, বৈলক্ষণ্যের মধ্যে এই যে, এ যাত্রা স্থলে সজ্জিত রঙ্গভূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু এই গীতগুলি নাটক রচয়িতার স্বরচিত নহে, যাত্রাকারকেরা স্ব কার্যের সুবিধার জন্য আপনারা রচনা করিয়া লইয়াছেন; এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সেগুলির ভালরূপে মিশ খায় নাই। তদ্ভিন্ন তাহা সংখ্যাতেও অল্প। এই হেতু গীতপ্রিয় যাত্রা-শ্রোতৃগণের পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই।"[৪৯]

এই কারণে স্বয়ং বসু মহাশয় তাঁর হরিশ্চন্দ্র নাটককে গীতাভিনয়ে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন। "আমার অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যত কেন হউক না, ফলত যে কয়টি গান হইবে, সেই কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ; আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া এবং গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"[৫০]

গীতাভিনয় ও নাটকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানে তিনি ছিলেন উৎসাহী; তিনি ছিলেন যথার্থ 'মধ্যস্থ'। তিনি বিকাশমান বাংলা নাটককে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই চাওয়াটা শ্রদ্ধেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি সমসাময়িক যুগের ইচ্ছাটা ধরতে পারেন নি। তিনি সাময়িক পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, হিন্দু মেলার উৎসাহী সংগঠক ছিলেন; কিন্তু নাটকে জাতীয় ঐতিহ্য নবীন জীবনবোধের সঙ্গে কী ভাবে সংবদ্ধ হবে, তা তিনি নির্ণয় করতে পারেন নি।

তাঁর গম্ভীর নাটক দুই-জাতের; পুরাণ-আশ্রিত ও সমসাময়িক সমাজ-আশ্রিত।

বস্তুত তিনি পুরাণ প্রসঙ্গে সমসাময়িকতা এনেছেন, আর সমসাময়িক সমাজ প্রসঙ্গে পুরাণ এনেছেন। অথচ সমসাময়িকতা আর নবীনতা এক নয়।

তাঁর প্রহসন জাতীয় রচনায় রয়েছে নবীনত্বকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ। অথচ যে হিন্দু মেলার তিনি উৎসাহী সমর্থক, তার সদস্যদের অনেকেই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে পড়লেন; তিনি তাঁদের মত ও পথ অনুধাবন করতে উদ্যোগী হলেন না। মাইকেল—রাজনারায়ণ—দ্বিজেন্দ্রনাথ—কেশবচন্দ্র সেনের যুগে ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গীর অনুবর্তন এক মূঢ় অন্ধত্বের নিদর্শন।

রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭)

মনোমোহন বসুর প্রথম নাটক হোল 'রামাভিষেক নাটক বা রামের অধিবাস বা বনবাস।' বহুবাজার নাট্য সমাজের জন্য এই নাটক রচিত হয়। শর্মিষ্ঠা রচনার পর এই প্রথম মৌলিক পুরাণ-আশ্রিত নাটক। এই নাটকটি পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। প্রস্তাবনায় নট-নটী আছে এবং নাট্যকার নাটকের ভাববস্তু সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। নবীন যুগের রসবোধ ও রুচিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাট্যকার নাট্যবিষয় সংগ্রহ করেছেন। "নব্য বাবুরা শান্তিরস শ্রবণ আর শান্তিজল গ্রহণ, দুটোকেই সমান ভেবেছেন।"

"এখন তাঁদের (নব্যবাবুদের) কাব্য ও সঙ্গীতাস্বাদ-শক্তি বিশুদ্ধ হওয়াতে এদেশে জঘন্য যাত্রার পরিবর্তে পুনর্বার নাট্যাভিনয় উদয় হচ্ছে। তাঁরা চান—অভিনয়ের নায়ক নায়িকার নির্মল চরিত্র হবে। সুতরাং সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, দান্ত, ধীর, এমন কোন বীরপুরুষের সম্পর্কে করুণ রসের কোনো একটা

অভিনয় যদি দেখাতে পারা যায়, তবে নির্বিবাদে যেমন সর্বমনোরঞ্জন হবে, এমন আর কিছুতেই নয়।" (—প্রস্তাবনা)[৫১]

নাটকটি আসলে পুরাণ-অবলম্বনে রচিত নয়; কখনও দাশরথী রায় এবং কখনও কৃত্তিবাস এই নাটকের বিষয় ও ভাব সরবরাহ করলেও একেবারে তাঁর কালের বাংলা দেশের সামাজিক রীতিনীতি ও সমস্যাবলী এই রাম-কাহিনীর মধ্যে তিনি আমদানী করেছেন,—কৌশল্যা দেবী পুত্রের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেছেন, দশরথের মন্ত্রী দশরথের দুর্দশা দেখে বহুবিবাহ প্রথার কুফল বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এছাড়া সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে।

দ্বিতীয় চাষা। আর কি বল্লে! ঐ যে পুণ্যে পুণ্যে বলছে রে! রাজার ব্যাটা রামচন্দ'র কাল,—আবার এট্টা পুণ্যে করবে তাই মোদের জানাচ্চে। তা যদি রাজা একবার আবার রাজার ব্যাটা একবার করে পুণ্যে করে, তবেই তো মোরা গ্যালাম। দু জায়গায় খাজনা দে কোন্ চাষার পো চাষা ফসল করি উটতি পারে? মোদের দু'-লায় পা দেওয়া হলো আর কি—এইবারই ভরাডুবি কর্বে। (১।১)

রামচন্দ্রের মুখে একই রকম দুর্ভাবনার কথা শোনা গেছে।

কৃষক যখন কাতর শ্রমে
নিদাঘ-তপন মস্তকে ভ্রমে
স্বেদ জলে সিক্ত হয়ে ক্ষেত হতে আসে;
কে তারে শীতল করে মধুর সম্ভাষে?

রামচন্দ্র শুধু বাঙ্গালী হন নি; তিনি রাজচক্রবর্তী নন, তিনি নিতান্তই এক গ্রাম্য জমিদার এখানে।

রামচন্দ্রের অভিষেক প্রস্তাবে নাটকের সূত্রপাত; আর দশরথের মৃত্যুতে নাটকের শেষ।

রামাভিষেক নাটকে রামের অধিবাস ও বনগমন দুইটি বিষয় একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে; ফলে নাটকের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলে সে যুগে সমালোচনা হয়েছিল। জনৈক সমালোচকের মতে রামাভিষেকের সঙ্গে তামিল নাটক আরিচন্দ্রের (Arichandra) সাদৃশ্য আছে। ঐ নাটক তখন ইংরাজিতে অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ নাটকে নায়কের একটি সত্য পালনের কথা আছে, এখানে দুইটি। উক্ত সমালোচকের মতে "This difference, we think,

rather hurts the artistic unity of the play, if it heightens its moral interest.······There is a want of dramatic consistency in the characters."[৫২]

নাট্যকার নাটকে গান, পদ্য ও গদ্য-সংলাপ ব্যবহারে নিরঙ্কুশ থেকেছেন। গানের সংখ্যা নয়; পয়ার ও ত্রিপদীর সংখ্যা পাঁচ। পরবর্তী নাটকে পয়ার ত্রিপদী লোপ পাবে, গানের সংখ্যা বাড়বে। নাটকের ঘটনায় কোন আড়ম্বর ও জটিলতা নেই; এ ক্ষেত্রেও পাঁচালীর আদর্শ অটুট রয়েছে। 'সতী নাটকটি'ও (১৮৭৩) ছিল বিয়োগান্তক; দক্ষদুহিতা পিতার মুখে শিব-নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন, এই হোল নাটকের কাহিনী। এবং কাহিনী অনাড়ম্বরভাবে বলা হয়েছে।[৫৩] এই কাহিনীও তিনি প্লটের আকারে গড়ে তোলেন নি; গল্প বলে গেছেন—পাঁচালীকারের মত। সতী নাটকেও প্রস্তাবনা-অংশে নট-নটী আছে। নাটক ১ম সংস্করণে বিয়োগান্তক ছিল; দ্বিতীয় সংস্করণে একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়। পরিশিষ্টে হরপার্বতীর মিলন সংঘটিত হয়েছে। উন্নততর নাট্যনৈপুণ্যের অন্য কোন চিহ্ন নেই, এক শাস্তে পাগলার ভূমিকা ব্যতীত। নাটকে গানের সংখ্যা দশ। সংলাপে পৌরাণিকতা বজায় নেই। সাধারণ ঘর-সংসারের বিবরণসুধা আমাদের পান করতে হয়েছে। দক্ষ ও প্রসূতি বাঙ্গালী জনক-জননী মাত্র।

'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫) একই প্রকার পৌরাণিক নাটক; শুধু এই নাটকে একটা বাড়্তি গল্প আছে। সে হচ্ছে বিশ্বামিত্র-নিযুক্ত নাগেশ্বরের শাসন-ঘটিত অনাচারের গল্প। এই গল্পাংশে নাট্যকার তাঁর যুগের রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া অনেকটা প্রতিফলিত করেছেন। প্রথম নাটকে ছিল বৈষয়িক প্রশ্ন, এই নাটকে এল রাজনৈতিক প্রশ্ন। বোঝা যাচ্ছে হিন্দুমেলার প্রভাব আরও গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

১. মন্ত্রী। যে প্রতিনিধি যে ভূভাগের নিমিত্ত মনোনীত হতেন, সে দেশের অধিকাংশ প্রজারা যদি তাঁকে না চাইত, তবে আমাদের মহারাজা তাঁকে (আপনার পরম বন্ধু হলেও) আর তথাকার জন্য নিয়োগপত্র দিতেন না। কিম্বা তাঁরে সে পদে আর রাখতেন না!

বিশ্বামিত্র। সে ব্যক্তি নির্দোষী হলেও এরূপ কত্তেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ; কেন না মহারাজ বলতেন, যখন দেশের অধিকাংশ এতদূর অনিচ্ছুক বা প্রতিকূল, তখন আমাদের চক্ষে এ ব্যক্তি

নির্দোষ হলেও সে অঞ্চলের পক্ষে অবশ্যই অযোগ্য। মহারাজার সংস্কার আছে যে, রাজা প্রজাতে পিতাপুত্র সম্বন্ধ; রাজা যদি স্নেহ আর ন্যায়পূর্বক শাসন করেন, তবে শাসিত দেশের লোক আপনা হতেই অবশ্য তাঁর বশীভূত—অবশ্যই তাঁর অনুগত—অবশ্যই তাঁর পদমর্য্যাদা সমর্থনার্থ লালায়িত হয়; সুতরাং প্রকৃতিপুঞ্জ যার প্রতিকূল বা বিদ্বেষী, সে ব্যক্তি কখনই যোগ্য রাজা বা যোগ্য শাসনকর্তা নয়। শুদ্ধ নিরপেক্ষভাবে রাজনীতি পালন কর্ল্যেই সুশাসক হয় না; প্রজার প্রতি বাৎসল্য বিরহিত হলে সোনার শাসনও সেই সময় কুশাসনের আকার ধারণ করে। ২।২

২. দে কর, দে কর, রব নিরন্তর
করের দায় অঙ্গ জরজর!
বাড়ি ঘর আলো শান্তিজল ঘর
স্থল পথে আর সেতুর উপর
জলে গেলে তটা ধরে রাজচর
শূন্য বই গতি নাই আরো।
গো অশ্ব শকট-কর বহুতর
পশু, নর, কারো নাহিক নিস্তার!
নীচ কর্মে খাটে তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এম্নি রাজেশ্বর!
লবণটুকু খাবো, তাতেও লাগে কর!
কত আর কব মুনিবর?
মাদকতা-কর ছলে দেশময়,
মদ্যের বিপণি, নিত্য বৃদ্ধি হয়,
সে গরলে দগ্ধ ভারত নিশ্চয়।
হাহাকার রব নিরন্তর। ৫।১

৩. মন্ত্রী। অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকে অত নিগূঢ় তত্ত্ব বোঝে না, সুতরাং কর মাত্রকেই ভয়ঙ্কর আর পীড়াকর জ্ঞান করে। কিন্তু প্রভু ইটি সত্য, যে যদি অমিতব্যয়িতা আর বিদেশীয় কর্মচারী নিয়োগ জন্য অতিরিক্ত ব্যয় না হ'তো, তবে প্রজাগণকে এত অসম্ভব করভার বহন কর্ত্তে হ'তো না। বিশেষতঃ, সংগৃহীত কর যদি এদেশেই

সব ব্যয়িত হ'তো, তবু এত অসহনীয় হয়ে উঠতো না—তাহলে যেমন সরোবরের এক ঘাটের জল অন্য ঘাটে ঢেলে দিলে জলরাশির হ্রাস হয় না তেমনি প্রজাদের এক সূত্রে লয়ে অন্য সূত্রে তাদের ধন তাদিগকেই প্রত্যার্পণ করা হ'তো। ৫।১

৪. দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ।

শেষোক্ত গানটিতে বাংলার সর্বশ্রেণীর বৃত্তিজীবীর দুঃখদুর্দশার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণের জবানীতে আধুনিক বাঙ্গালীর আরজি পেশ করা হয়েছে। ফলে নাটক না পৌরাণিক, না আধুনিক মূর্তি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নাটকে যা রূপকে বা প্রতীকে এসেছে, এখানে তা সোজাসুজি এসে পড়ায় এগুলির সম্ভাব্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র নাটক ছয় অঙ্কে ৮টি দৃশ্যে সম্পূর্ণ; এই অঙ্ক বিভাগ ঘটনার বিভাগ অনুযায়ী হয়েছে। এই নাটকে আটটি গান আছে, সব কয়টি গানই নেপথ্য থেকে গীত হয়েছে। কোন কোন গান ঘটিত ঘটনার উপর মন্তব্য, কোন কোন গান বা সম্ভাবিত ঘটনার পূর্বাভাস; আবার কোন কোন গান পাত্রপাত্রীর মানসিক সংকটের টীকা।

কোন গানই নাটকের কুশীলবের মুখে প্রযুক্ত হয়নি।

মনোমোহনের চতুর্থ পৌরাণিক নাটক হোল 'পার্থপরাজয় নাটক' (১৮৮১)। এই নাটকে বভ্রুবাহনের বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। সমসাময়িক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নি। সতীনাটকে যেমন, এই নাটকেও তেমনি বারোটি গান আছে। পরিশিষ্টে আরও সতেরটি গান আছে। এখানেও অধিকাংশ গীত নেপথ্যে গীত হয়েছে। পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটকের ভাষায় কিছুটা গাম্ভীর্য আছে; পুরাণ-উচিত পরিবেশ সৃষ্টিরও কিছু-কিছু চেষ্টা দেখা যায়।

বভ্রুবাহন। তবে আর বচনের পরিচয় কেন? বাণমুখেই পরিচিত হব! এখন পরিচয় নয়—সেই বাণাগ্নিতে খাণ্ডবদাহনের গৌরবাগ্নি আজ নিষ্প্রভ, সুভদ্রাহরণের দর্প আজ চূর্ণীকৃত; মৎস্য লক্ষ্যভেদ আর লক্ষ ভূপালের জয়জনিত গর্ব আজ খর্ব; উত্তর গোগৃহের অদ্ভুত কীর্তি আজ বিপর্যস্ত; কুরুক্ষেত্রের সমরে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ঘাতকের অহঙ্কার আজ বিদূরিত; অক্ষয়তূণকে আজ শূন্য; বিজয় গাণ্ডীবকে আজ ছিন্ন; অগ্নিদত্ত কপিধ্বজকে তুলার ন্যায়

উড্ডীয়মান—অধিক কি পাণ্ডু গৌরবাভিমান আজ সম্পূর্ণ নির্বাণ করে অর্জুন-ঔরসে আমার জন্ম কিনা ত্রিলোক সমক্ষে ভালরূপেই দেখাব। [সদলে প্রস্থান] ৩।১[৫৪]

কথোপকথনের এই নাট্যিক কুশলতা পূর্বে দেখা যায় নি। কোন চরিত্র বা ঘটনা নাট্যকারের কল্পনা থেকে উদ্ভূত হয় নি, সর্বত্রই পুরাণের কথাকে অঙ্কে ও দৃশ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

'রাসলীলা নাটক' (১৮৮৯) সঙ্গীতবহুল নাটক অথচ অপেরা নয়। এ ছাড়া 'সতীর অভিমান' নামে আর একখানি নাটক লিখেছিলেন, তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। হরচন্দ্র দেব লিখিত 'যত্নবংশধ্বংস' (১৮৭৮) নাটকের তিনি গান লিখে দিয়েছিলেন। গান বাঁধনদার হিসাবে সে-যুগে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।

সামাজিক নাটক

পৌরাণিক নাটক রচনার পাশাপাশি তিনি সমসাময়িক জীবন অবলম্বন করে নাটক লিখেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে যেমন বিবিধ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আছে, তাঁর সামাজিক নাটকে তেমনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সযত্নে পরিত্যক্ত।

এখানে তিনি শুধু সামাজিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

তাঁর 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) তাঁর দ্বিতীয় নাটক; সমাজের বহুবিবাহ প্রথার কুফল এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। রামনারায়ণের 'নব নাটক' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী' নাটকের প্রভাব এই নাটকের উপর পড়েছে।

নাটকের নায়ক হলেন শান্তবাবু। তিনি হলেন আদর্শ চরিত্র—তিনি যথার্থই শান্তশীল, কিন্তু একবার ক্রুদ্ধ হলে আর কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কাজলা হোল খল চরিত্র; তার মধ্যেও কোন জটিলতা নেই। মহামায়া বা সরলাও একই প্রকার; অর্থাৎ সমগ্র নাটক কতকগুলি টাইপ চরিত্রে পূর্ণ।

নাটকে প্রস্তাবনা আছে। নটের মুখে বসেছে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়—

"পরিণয়" এই বাক্য অতি সুধাময়।
"বহু" সঙ্গ যোগে কিন্তু বিষময় হয়॥
সুখদ্রোহী বহুরিক্ত রাক্ষস দুর্বার,
সঙ্গে লয়ে হিংসা, রাগ, বিরাগ, কলহ,
কুমন্ত্রনা, পক্ষপাত, ঘৃণা, হত্যা আদি
সোনার সংসার কত দিল ছারখার।

নাটক পাঁচ অঙ্কে তেরটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ; তেরটি দৃশ্যে পনেরটি গান আছে। এ ছাড়া একাধিক কবিতা আছে। বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গ আছে (১।২), গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার গান আছে (১।৩), ঝুমুরগান আছে (১।৩)।

এই নাটক থেকেই লেখকের ব্রাহ্মবিদ্বেষ প্রকাশ পেতে থাকে।

"যাবো না কোথায় যাবো—বেম্মোপাড়ায় যাব বুঝি? হা হা হা।" ১।৩

নাটকের উপসংহারে একটি গান আছে—

নহে ধন ফুল বশে এ বিবাহ বংশ আশে
সমভাবে দুই নারী রাখিল
তথাপি দ্বিগুণ বিধি শাস্তি দিয়ে নানাবিধি
ধর্ম বলে শেষে বাঁচাইল।[৫৫]

এই নাটকের গঠন-পরিকল্পনার উপর তাই রামনারায়ণের যথেষ্ট প্রভাব আছে। আধুনিক কালের কথা নতুন নয়, পুরাতন আঙ্গিকে পরিবেশন করা হয়েছে।

তাঁর দ্বিতীয় সামাজিক নাটক হোল 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০)। তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯) নাটক পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গেছে। এই নাটকেও তিনি না নাট্যকৌশলে, না বিষয়বস্তুতে কোনপ্রকার অগ্রগতির পরিচয় দেখিয়েছেন। নাটকে কোন কেন্দ্রীয় ভাববস্তু নেই। নাটকের ঘটনা নানা লতাতন্তু ছাড়িয়ে জটিল হয়েছে। প্রস্তাবনা নেই, কিন্তু ভরতবাক্য আছে; পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। ঘটনার এক একটি পরিচ্ছেদে নাটকের এক একটি অংশ বিভক্ত হয়েছে। চরিত্রগুলি পূর্বতন নাটকে সৃষ্ট চরিত্রের মতই; এদের মধ্যে কোন গভীরতা নেই। নানা সামাজিক ব্যাধির যেন এক একজন প্রতিনিধি। নাট্যকার সমাজ সংস্কার চান, না নাটক লিখতে চান, গ্রন্থ থেকে তা বোঝা মুসকিল।

নাট্যকারের ব্রাহ্মবিদ্বেষ এই নাটকে আরও প্রকট—

> এইবার এই যে ব্রাহ্মদলে মিশিছি, দেখোদেখি এখন ঠিক চোস্ত থাকি কিনা! ইরির মধ্যেই—আচার্যমশার প্রিয় হতে পেরেছি, আর তাদের অনেকের সঙ্গে ভাব করে নিইছি! আহা, তারা কি সরল, ব্রাহ্মিকা ভগ্নীরাও খুব মেলক মেশক।

মহাকালী। ওগো বুঝিছি গো বুঝিছি, সেই ভগ্নীদের লোভই তোমার আসল কথা। ১।৪

—চল গোপনে তোমায় কলকাতায় নিয়ে যাই, পবিত্র আশ্রমে রেখে ব্রাহ্মিকা করি তখন বিধবা ঘুচে আবার সধবা হয়ে পরম পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করে পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে। ২।১

এই ব্রাহ্মবিদ্বেষই চরম আকার ধারণ করল 'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামক (১৮৭৫) প্রহসনে। অমৃতলাল বসুর দৃষ্টি-সঙ্কীর্ণতার পূর্বতন নজির এখানে থাকল। এই প্রহসনে কেউ কেউ পূর্ববঙ্গ-স্থিত ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনার কথা বলেছেন।[৫৬] সম্ভবত এ খবর যথার্থ নয়। এই প্রহসনে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে রামমোহন কাশ্যপের অবতার; তিনি আদিসমাজ নামক খগকুল আর ভারতসমাজ নামক মহানাগকুলের মূল। প্রধানত নববিধান সমাজের স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি উন্নতিকামী কর্মসূচীর নিন্দা করে এই নাটক রচিত হয়েছে।

সমালোচনার হেতু সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আছে, কিন্তু সে সমালোচনার মধ্যে অবিমিশ্র কুৎসা থাকলে তা সাহিত্য হতে পারে না। বিদ্বেষপ্রসূত রচনা উচ্চ শ্রেণীর 'Satire'-এর জন্ম দিতে পারে; এ্যারিস্টোফেনিস থেকে বার্নাড শ পর্যন্ত তার বহু উদাহরণ। কিন্তু সেক্ষেত্রেও শিল্পীকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-পরায়ণতা থেকে বিশ্লিষ্ট হতে হয়। মনোমোহন বসুর বিদ্রূপে শিল্পীর ক্রোধ প্রকাশ পায়নি, ব্যক্তির ক্রোধ বিস্ফারিত হয়েছে। মনোমোহন বসু শেষ পর্যন্ত নাটকরচয়িতা, কিন্তু নাট্যকার নন। কারণ তিনি না পূর্বতন আঙ্গিক, (যা যাত্রার অনুগত), না নতুন আঙ্গিক (যার সূচনা মাইকেল থেকে)—কোনটিই অনুসরণ করতে পেরেছেন। সাহিত্যে সাঙ্গীকরণ আছে, মধ্যস্থতা নেই। তিনি 'মধ্যস্থ' হতে গিয়ে নাটক ও পাঁচালীর মধ্যস্থ থেকেছেন। তিনি সমসাময়িক জীবনের নানা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন; সেই আন্দোলনের গভীরে কী নাটকীয় উপাদান আছে, তা তিনি ভেবে দেখেন নি। আন্দোলনকেই তিনি নাটকের প্রকৃষ্ট উপাদান মনে করেছেন। এবং সমসাময়িকতা আর আধুনিকতা যে এক নয়, এই বোধ তাঁর অধিগত ছিল না।

নাটক সংলাপ-কেন্দ্রিক; কিন্তু সঙ্গীতও মাঝে মাঝে তার সহযোগী হতে পারে। তিনি তাঁর নাটকে সংলাপ ও সঙ্গীতকে তুল্যমান দিয়েছেন। সংলাপের উপর তাঁর তত নির্ভরতা ছিল না; তাই তাঁর সংলাপ কেবল বিবৃতিধর্মী; গল্পের সূত্রটি ধরে থেকেছে। নাট্যান্বিত হয়নি বলেই তাঁর ভাষা বিষয়বস্তুর সান্নিধ্যে রূপপরিবর্তন করে না। নাটকের ভাষা হবে বহুরূপী, ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন,

বিষয়ভেদে বিচিত্র। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটক ও সামাজিক নাটকের পাত্রপাত্রী একই শব্দাবলী উচ্চারণ করেছে। এক কালের ভাষা দুইকালের লোক উচ্চারণ করেছে।

তাঁর নাটক বিবৃতিধর্মী বলে নাটকের ঘটনার কোন ওঠানামা নেই, কোথাও পৌঁছুবার জন্য ব্যস্ততা নেই; আর পৌঁছে গেলেও অবতরণের জন্য উৎকণ্ঠিত নয়। নাটকের গল্প গল্পই থেকে যাচ্ছে—প্লট হয়ে উঠছে না। কারণ প্লট পূর্ব-পরিকল্পিত। তেমনি চরিত্রও গড়ে ওঠেনি, হয়ে ওঠেনি, শুধু হাজিরা দিয়েছে। তাঁর নাটকে কৌতুক রস বা হাস্যরস স্থানবিশেষে ঝলকে ওঠে। চরিত্র-বিশেষের কাঁধের উপরে ভর করে দীনবন্ধুর নাটকের মত সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে না। এই কারণে মনোমোহন বসুকে বিদূষকজাতীয় চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। তিনি শাস্তে পাগলার চরিত্র সৃষ্টি করে বিদূষকের সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তির সমন্বয় ঘটালেন। পরবর্তীকালে জনা নাটকের বিদূষক, সাজাহানের দিলদারের উপক্রমণিকা হয়ে গেল। এটি তাঁর কৃতিত্ব।

ভাবতে অবাক লাগে সে-যুগের মনস্বী সমালোচক রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন,—"মনোমোহন বসুর অন্তর্জগৎ বর্ণনাতে যেমন পারগতা আছে, বাহ্যজগৎ বর্ণনাতে তেমনই পারগতা আছে।"[৫৭]

তাঁর পৌরাণিক নাটকের উপসংহার অধিকাংশই বিষাদাস্তক, আর সামাজিক নাটকের মিলনান্তক। অতীত ঘটনার বিষাদময়তা দেখতে তাঁর শংকা ছিলনা, কিন্তু সমসাময়িক যুগের কাহিনীর বিষাদান্ত পরিণতি তিনি পরিহার করেছেন। এক্ষেত্রেও তাঁর এক মধ্যস্থতার পরিচয় পাওয়া যায়।

> "আমি কোনো পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় কি বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতে আসি নাই; আমি আমোদজনক নীতি প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে আসিয়াছি যে,—স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম! কিন্তু একটু মন্থর গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপ কর; সমযাত্রীদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গীহারা কেন হও।"[৫৮]

লেখক শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন কিনা সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। সময়ে সময়ে মন্থর গতিতে চলা বিজ্ঞের কাজ

হতে পারে, কিন্তু শিল্পীর কাজ নয়। অন্তত বাংলা নাটক তাঁর মধ্যাহ্ন ভূমিকার জন্য পিছনে হটেছে, এবং ভবিষ্যতের পশ্চাদপসরণের ভূমি তৈরী করে রেখেছে।

পাদটীকা

১. দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র।
২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ ; পৃ—১৪৪-১৪৫
৩. দীনবন্ধুর জীবনী ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র।
৪. ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র।
৫. ঐ।
৬. ভারত সংস্কারক—২৩ কার্তিক, ১২৮০
৭. বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত প্রাগুক্ত প্রবন্ধ।
৮. বা. সা. ই.—সু. সে। ২য় খণ্ড।
৯. The Bengal Drama—P. Guha Thakurta.
১০. বা. সা. ই—সু. সে. পৃ—১০
১১. বা. না. ই.—অ. কু. ঘো. পৃ—৩৩২
১২. B. D.—P. Guha Thakurta,
১৩. On Theatre—Brecht. P—37
১৪. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ—২৬৬-২৬৭।
১৫. বা. না. সা. ই.—আ. ভ. পৃ—২২৪
১৬. Selected Plays—Lope De Vaga
১৭. On Theatre—Brecht. P—15
১৮. রহস্য সন্দর্ভ,১২৯০ সংবৎ, ১ম পর্ব, ৬ষ্ঠ খণ্ড।
১৯. Bengali Literature—J. C. Ghosh. 194. P—150.
২০. ঐ।
২১. সোমপ্রকাশ, ১২৭০, ৩০ ভাদ্র।
২২. Hindoo Patriot, 1863.
২৩. প্রাগুক্ত প্রবন্ধ—বঙ্কিম

২৪. Memoirs of My Life and Times—Bipin Chandra Pal. P. 300.

২৫. ঐ।

২৬. পিতাপুত্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। বঙ্গভাষার লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

২৭. মধ্যস্থ, ১৬ আষাঢ়, ১২৭৯।

২৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—দীনবন্ধু মিত্র

২৯. Hindoo Patriot, 24 Sept, 1875.

৩০. বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব-রামগতি ন্যায়রত্ন। পৃ-২৭১।

৩১. Hindoo Patriot, 23 April, 1866.

৩২. রহস্যসন্দভ, ৩য় খণ্ড, ৩য় পর্ব।

৩৩. Bengalee, 21 July, 1866.

৩৪. ঐ, Dec, 1863.

৩৫. ঐ।

৩৬. Insight and Outlook-Arther Koestler, P. 241।

৩৭. প্রাগুক্ত—Brecht. P. 11.

৩৮. পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ।

৩৯. রহস্যসন্দর্ভ, ৩য় পর্ব, ৩৫ খণ্ড।

৪০. Evening's Love—Preface—Dryden. 1668.

৪১. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।

৪২. Memoirs of My Life and Times—Bipin Chandra Pal. P. 301.

৪৩. Hindoo Patriot, 1 April, 1872.

৪৪. শাস্তি কি শান্তি—ভূমিকা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৪৫. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ—৬৩।

৪৬. ঐ, পৃ—৬৪।

৪৭. ঐ, পৃ—৬৪।

৪৮. ঐ, পৃ—৬৪।

৪৯. কুপিতকৌশিক নাটক, ১৮৭৮—বিজ্ঞাপন।

৫০. জাতীয় নাট্যশালার প্রথম সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, ১৮৭৩।

৫১. রামাভিষেক নাটক—প্রস্তাবনা—৫ম মুদ্রণ।

৫২. Hindoo Patriot—8 July, 1867.

৫৩. সাধারণী, ২৫শে ফাল্গুন, ১২৮০।

৫৪. পার্থ পরাজয় নাটক—১ম সংস্করণ, ১৮৮১।

৫৫. প্রণয় পরীক্ষা নাটক—১ম সং—১৮৬৯।

৫৬. বা সা. ই.—২য় খণ্ড—সু. সে. পৃ—৮১।

৫৭. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু। পৃ-৫১।

৫৮. মধ্যস্থ, ১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ, ১৩ এপ্রিল, ১৮৭২

পেশাদারী মঞ্চের প্রথম যুগ ও বাংলা নাটক

কলকাতায় উনিশ শতকের ষাট দশকে নাট্যানুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে ; আর ক্রমশঃ সেই নাট্যোৎসাহ মধ্যবিত্ত যুবকদের সাধারণ আঙ্গিনায় চলে আসে।

নাট্যাভিনয় যত জনপ্রিয় হতে থাকে এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবক যত বেশি সংখ্যায় এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে থাকে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের দাবী ততই সোচ্চার হয়ে ওঠে।[১] শৌখীনমঞ্চের অভিনয়ে আমন্ত্রিতদের প্রবেশাধিকার থাকত না। পোষ্টার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরাই প্রেক্ষাগৃহ দখল করে বসতেন। 'বেণীসংহার নাটক' অভিনয়ের দিন থেকেই সাধারণ দর্শকদের অভিযোগ সংবাদপত্রে ভাষা পাচ্ছে। ১৮৬০ সালেই এই কারণে পেশাদারী বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। আহিরীটোলা নিবাসী রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'The Calcutta Public Theatre' নামে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপনেব উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠানপত্র (prospectus) প্রচার করেন। কিন্তু তখন সে প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal"-এর অনুষ্ঠানপত্রে জাতীয় নাটকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।[২] পরবর্তীকালে তাঁরই মন্ত্রশিষ্য নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের পরামর্শে ও প্রেরণায় বাগবাজারের একটি সখের দল সত্য-সত্যই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে বসলো। তাদের দলের নামও হোল 'ন্যাশনাল থিয়েটার।'

এই সময়ে একটা 'নাটুকে' হুজ্জত দেশে ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছিল। হিন্দু প্যাট্রিয়টের মতে 'Last year (1871) native Theatricals were few but the Jatra-Theatricals increased so much that they came to be regarded as a nuisance."[৩]

তাই রহস্য সন্দর্ভ রহস্যভরে লিখলেন, "প্রায় প্রত্যেক গলিতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্মা লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত

হইয়াছে।”[৪] নাটক লেখার প্রসঙ্গ পরে বলা যাবে; নাট্য-অভিনয়ে শুধু কলকাতায় নয়, মফঃস্বলেও প্রবল উৎসাহে দেখা দিয়েছিল। চুঁচুড়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও বরিশালের মত বড় বড় শহরে নয়, জনাই, আগড়পাড়া, তমলুক ও রাডুলির মত ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চলেও নাট্য-অভিনয়ের প্লাবন দেখা দিয়েছিল। নানা নাট্য-অনুষ্ঠান থেকেই ধীরে ধীরে পেশাদারী মঞ্চ গড়ে উঠল। মধ্যবিত্তদের নাট্য-উৎসাহ একটি কি দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে স্তিমিত হয়ে পড়ত।

এই রকম একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েই বাগবাজারের সখের নাটুকে দল বাংলা রঙ্গমঞ্চের জন্মান্তর ঘটাল।

বাগবাজারের সখের নাট্যশালা 'সখের' জন্যই নাটক মঞ্চস্থ করতে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু অর্থাভাবের জন্য তাদের সখ বিসর্জন দিতে রাজি হোল না, বরং তারা সৌখীনতাই বর্জন করল। 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'-এর নাম কিছুদিন পরে হোল শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। এই নাট্যসমাজ ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজারে বিখ্যাত জুয়াড়ীজমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদারের গৃহে 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর—এই দলের নেতা ছিলেন। এঁদের অভিনীত দ্বিতীয় নাটক হোল দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের লীলাবতী। সধবার একাদশী ও লীলাবতী অভিনয়কালে স্বয়ং নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে 'লীলাবতী' অভিনীত হয়। অনেকেই টিকিটের জন্য উমেদারী করেছিলেন। তখন এই দলের কেউ কেউ ভাবলেন টিকিট বিক্রয় করে অভিনয় করলে কেমন হয়!

"লীলাবতীর অভিনয়ের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাগবাজারের দল যখন দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের জন্য মহলা দিতে শুরু করেন, তখন এই প্রস্তাব করিবার কথা উঠিল এবং ইহাও বলা হইল যে, এই নূতন নাট্যশালার 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামকরণ করা হউক।"[৫] থিয়েটারের এই নামকরণ করেছিলেন নবগোপাল মিত্র, যিনি স্বয়ং 'ন্যাশন্যাল মিত্র' নামে অভিহিত হতেন।

চীৎপুরে ঘড়িওলা বাড়ি, অর্থাৎ মধুসূদন সান্যালের অট্টালিকার বহির্বাটির উঠানে এই নাট্যশালার শুভ উদ্বোধন হোল ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। শ্যামবাজার নাট্যসমাজের সকল সদস্যই এই নতুন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, শুধু গিরিশচন্দ্র নন। পেশাদারী মঞ্চ স্থাপনে তাঁর আপত্তি ছিল। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নিজেদের মঞ্চ তৈরী করেছিল, ধর্মদাস স্বয়ং ছিলেন মঞ্চাধ্যক্ষ; এই

মঞ্চ এবং অভিনেতৃবর্গের সাজসজ্জা ছিল নিতান্তই সাধারণ। এই কারণে গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সঙ্গে প্রথমে আনুকূল্য করলেন না।

"কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাশন্যাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল।"[৬]

গিরিশচন্দ্রের হিসাবে ভুল হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্র এই নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের সাধুবাদ দিল। অমৃতবাজার পত্রিকায় এই জাতীয় রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষিত হয়।

> "এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলেব দায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রমাদ নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। * * * * *
> মাছের তেলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। ... ... শুনিলাম এই ন্যাশনাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই।"[৭]

সৌখীন রঙ্গমঞ্চের দোষত্রুটি সম্বন্ধে বেশ কিছুদিন ধরেই আন্দোলন চলছিল। ১৮৬৭ সনে ২রা নভেম্বব কয়লাহাটায় অভিনীত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের মুখবন্ধে বলা হয়েছিল, "কয়লাহাটা বঙ্গনাট্যালয়ের অধ্যক্ষবৃন্দ অভিনয়ার্থে দেশাচার-সংশোধন বিষয়ক একখানি প্রহসন প্রস্তুত করিতে বলায়, সুরা-সেবন, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা, অপব্যয় ও অল্পবয়স্ক বালকগণ নাটকাভিনয়ে অধ্যয়নে বঞ্চিত হওয়া, ইত্যাদি কয়েকটি প্রস্তাবে এই 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন খানি প্রস্তুত করিলাম।" এই প্রহসন খানি পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষদের সমালোচনার্থে রচিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য যাই হোক, এই সমালোচনার ভিতরে সত্যের ভাগ কিছু ছিল বইকি।

১৮৬৮ সনে আগস্ট মাসে 'নব প্রবন্ধে' প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অতএব সাধারণ রঙ্গমঞ্চ একটা বহুদিনের ইচ্ছাপূরণ।

প্রথম যুগে বাংলা দেশের সর্বশ্রেণীর লোক ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিয়েছেন। সুলভ সমাচার পত্রিকায় লেখা হোল :

"সভ্যতা যতই বৃদ্ধি হইবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মঙ্গল-জনক নির্দোষ আমোদ সকলেরও সৃষ্টি হইবে। আমাদের দেশে এরূপ সোসাইটি পূর্বে কখন ছিল না।"[৮]

পরবর্তীকালে এই ব্রাহ্মপত্রিকা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে অবিরত আক্রমণ চালাবে ; এমন কি, সরকারী কালা কানুনের সমর্থন জানাবে।

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সমর্থক ও ঠাকুরবাড়ীর আস্থাভাজন নবগোপাল মিত্র মহাশয় তাঁর পত্রিকা **'National Paper'**-এ লিখেছেন—**"The event is of national importance."**[৯]

এমনকি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বয়ং একদা 'নীলদর্পণ' অভিনয় দেখতে নাট্যশালায় গিয়েছিলেন। তিনি অভিনয় দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীও প্রায়ই অভিনয় দেখতে যেতেন ; তবে এই সময়ই ব্রাহ্মদের শুচিবায়ুগ্রস্ততার কিছু কিছু বিস্ফোরণ দেখা দিতে থাকে। জামাইবারিক অভিনয় দর্শনে ভদ্রমহিলাদের আমন্ত্রণ জানান হলে, ন্যাশনাল পেপার এ বিষয়ে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে বল্লেন যে, দর্শকদের রুচি ও শালীনতাবোধ যথেষ্ট জাগ্রত না হলে মেয়েদের আহবান করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় নববিধান সমাজের কর্তৃত্বাধীন ছিল ; এ পত্রিকাতেও একটি পত্রে মেয়েদের আহবান করায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। সুনীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন ঐ পত্রে জোরের সঙ্গে উত্থাপন করা হয়।[১০]

ন্যাশনাল থিয়েটারে গ্রন্থনির্বাচন সম্বন্ধে সুলভ সমাচারে এবং ন্যাশনাল পেপারে আপত্তি জানান হোল। অন্য পত্রিকাতেও একই প্রকার আপত্তি প্রকাশ পেল : "ভবিষ্যতে পুস্তক নির্বাচনে একটু সুরুচির পরিচয় দিবেন। এই আমাদিগের ইচ্ছা। সধবার একাদশীকে বিষকুম্ভপয়োমুখ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[১১] মত যারই হোক, পত্রিকাগুলির নীতিবিষয়ক মতান্ধতা লক্ষ্য করবার বিষয়।

পরবর্তীকালে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের বৈরী বা অসহযোগী মনোভাব বঙ্গীয় নাট্যশালার পক্ষে হিতকর হয় নি।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত নাটকের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

এঁরা প্রথম যে নাটক মঞ্চস্থ করেন, তা হোল 'নীলদর্পণ'। নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করার সময় ঐ নাটকের অংশ বিশেষ, যা ইংরেজদের পক্ষে মানহানিকর, তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। আদালতের দৃশ্য বাতিল করা হয়েছিল (চতুর্থ অঙ্কে ১ম গর্ভাঙ্ক)। ২০শে ডিসেম্বর ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে নীলদর্পণের অভিনয় বন্ধ করে দেবার জন্য আবদার করা হয়। তখন নাট্যশালার সেক্রেটারী এই সংবাদটি পরিবেশন করেন। (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৭২)। ২০শে ডিসেম্বর দ্বিতীয় অভিনয়রাত্রে মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে জনৈক কর্মকর্তা জানালেন যে, কারো প্রতি দ্বেষ বশতঃ বা কোনো সম্প্রদায়ের উদ্দেশে গ্লানি সৃষ্টি করার জন্য অভিনয় সম্পাদিত হচ্ছে না।

নাটকের পরিবর্তন এইখানে এসে থামে নি, শুধু রাজনৈতিক নয়, নাট্যশৈলীগত পরিবর্তন আছে। তখনকার রুচির প্রতি আনুগত্য জানিয়ে নীলদর্পণ নাটকে প্রস্তাবনা সংযুক্ত করা হয়েছিল:

"অভিনয়ের পূর্বে প্রথম নট রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়া একটি সঙ্গীত তাঁহাদের জাতীয় নাট্যালয়ের উদ্দেশ্য ও মর্ম দর্শকমণ্ডলীর বোধগম্য দিলেন।

(এডুকেশন গেজেট, ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭২)

'প্রস্তাবনা' জাতীয় কোন বস্তু নীলদর্পণে ছিল না; একমাত্র চাষীর কণ্ঠ নিঃসৃত একটি নেপথ্য সঙ্গীত ব্যতীত কোন গানেও ছিল না। নাটকের মধ্যে বহু গান ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল: "...আমাদের আরও নিবেদন যে সকল সংগীতগুলি গীত হইবে, তাহা যেন কার্যবিবরণের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত থাকে, কারণ তাহা হইলে দর্শকমণ্ডলীর গ্রহণের কিছু সুবিধা হয়।" (ঐ)

শুধু 'নীলদর্পণে' নয়, 'জামাই বারিক' অভিনয়েও এইজাতীয় পরিবর্তন করা হয়েছিল—

"আর একটি ভুল, দুই সতিনীর ঝগড়ার পর পদ্মলোচনের বগলার অঞ্চল ধরিয়া ঠাট্টার সঙ্গে নৃত্য ও গীত করা। পদ্মলোচনের পূর্বেকার চরিত্রের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছিল।"[১২]

'সধবার একাদশীর' অভিনয়কালে প্রস্তাবনায় নট-নটী ব্যবহার করা হয়। "নটী না সাজে না রূপে না গাওয়ায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলে।" [১৩]

নাট্যকার নাটক রচনা করে থাকেন · প্রয়োগকর্তা তাকে মঞ্চোপযোগী করেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই দুইটি বিপদ সঙ্গে নিয়ে চলল। একটি এল বাইরে থেকে, আর একটির জন্ম ভিতর থেকে। ব্রাহ্মসমাজের দুই গোষ্ঠীই নীতিবাগীশতার কালি ছিটিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের গাত্র মসীলিপ্ত করতে চাইবে। ভিতরের বিপদ হোল, নাটক সম্বন্ধে মঞ্চাধ্যক্ষদের কোন সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল না। তাই তাঁরা দর্শকরুচির প্রতিই সর্বদা অতি-মনোযোগী হয়েছেন।

নাটকের কথা, শিল্পের কথা চাপা পড়ে গেল; সামাজিক জিজ্ঞাসা তখন প্রাধান্য পেল। এর জন্য দায়ী বাঙ্গলাদেশের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত।

রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করেছেন।

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় 'উদ্দীপনা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল:

এই যে সমস্ত বঙ্গজাতি টপ্পা গানপ্রিয়, তাহাতে কি বুঝায়? বুঝায় এদেশে এখনও উদ্দীপনার বীজও অঙ্কুরিত হয় নাই; আপনার কথা আপনি বলিয়াই আমরা ক্ষান্ত, তাই যথেষ্ট; এবং তাহাতেই আমাদের চরিতার্থতা।[১৪]

এই কথাগুলিই আরও সুস্পষ্টভাবে বললেন 'সাধারণী' পত্রিকার লেখক:

"......যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে।"[১৬] এই সামাজিক পরিবেশে ন্যাশনাল থিয়েটারের সৃষ্টি হোল।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় নাটক রচনার সুযোগ উপস্থিত হোল। "এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেই, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই একখানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।"[১৭] দীনবন্ধু মিত্র ও মধুসূদন দত্তই ছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রধান অবলম্বন। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অনুরোধে মাইকেল কেবল 'মায়াকানন' রচনা করেছিলেন, আর সব নাটক সৌখীন সমাজের জন্য রচিত। দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী' পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটি বিশেষ যুগ; ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে 'Dramatic Performance Control Bill' কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়; ঐ বৎসরের শেষ দিকে ঐ বিলটি আইনে পরিণত হয়। হিন্দুমেলার প্রভাবে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে

যে জাতীয়তার প্লাবন দেখা দিয়েছিল, তার অবসান হোল। জাতীয়তাবোধের স্ফুরণ পথ অবরুদ্ধ হলে অন্য ভাব-সম্বলিত নাটকের প্রতিপত্তি বাড়বে।

১৮৭২ সাল থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত যা কিছু নাট্যবস্তু মঞ্চে অভিনীত হয়েছে, তার সবই নাটকের পর্যায়ে পড়ে না। নাট্যশালা আর নাটক এক নয়। "The entire fiield of opera has no concern with drama."[১৭]

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রথম বৎসরের বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে যে, মাইকেল ও দীনবন্ধু রচিত নাটকের পাশাপাশি কুবজার কুঘটন, নব বিদ্যালয়, মুস্তফী সাহেব কা পাকা তামাসা, পরীস্থান, ভারতমাতা, বিলাতী-বাবু, মডেল স্কুল, সাবসক্রিপসন বুক, প্রাইভেট থিয়েটার গ্রীন রুম, ডিসপেনসারী, ভাবত সঙ্গীত প্রভৃতি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই রঙ্‌দার উপনাটক। দর্শক মনোরঞ্জনই এগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য, আর দর্শকচরিত্র যে কি প্রকার ছিল, গিরিশচন্দ্রের ছড়া থেকেই তা অনুমান করা যায়। "স্থান মাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার।" সাধারণ মানুষের আনাগোনায় নাটকের বিষয়বস্তু থেকে শুরু করে নাটকের অভিনয়রীতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে লাগল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কয়েকটি সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবকের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্যবিত্তদের গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণ ক্ষণস্থায়ী, তাই অচিরকালের মধ্যেই ন্যাশনাল থিয়েটার দ্বিধা বিভক্ত হোল। এ ছাড়া নতুন থিয়েটার, বেঙ্গল থিয়েটারের জন্ম হোল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অগাস্ট বেঙ্গল থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন হয়; এই মঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনেত্রী আমদানী হোল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারেও অভিনেত্রীদের আবির্ভাব হোল।

ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম এক বৎসর জাতীয় ভাবাপন্ন সর্বস্তরেব মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু নারী-অভিনেত্রীর আবির্ভাবে ব্রাহ্মদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলল। ইণ্ডিয়ান মিরর, সুলভ সমাচার, ভারত-সংস্কারক প্রভৃতি পত্রিকায় বিরূপ মন্তব্য স্থান পেতে লাগল। সেই সময়কার একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও কর্মবীর বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—"This opposition came almost exclusively from the Brahmo Samaj which represented a powerful puritan móvement in those days"[১৮]. তবে সব ব্রাহ্মই এই প্রকার আচরণ করতেন না। "The Brahmos as a class considered it sinful to attend the performances of these public women. Sundarimohon, however, did not accept this Brahmic

interdiction. He freely went to the two theatres that, we had then in Calcutta……Instead of condemning this new development in the Bengali Stage as immoral we really welcomed it as an opening an honourable occupation for the class of women from whom our actresses were being drawn".

Those were the days of social reform and political freedom, and stage fully represented these intellectual and moral currents flowing over the educated Bengali community It was indirectly doing very great work to which the Brahmo Samaj has consecrated itself. The members of our mess. including Sundarimohon, were frequent visitors to the Bengal Theatre and National Theatre".[১৯]

এইভাবে জন্মের কিছুকাল পরেই বাংলা রঙ্গমঞ্চ সমাজের একটি বড় অংশের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়।

বৃটেনেও অভিনেত্রীর মঞ্চাবতরণে দর্শক-সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অধ্যাপক নিকল-এর মতে পিউরিট্যান মনোভাবই এর জন্য দায়ী।

কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের বিরূপতার কারণ যেমন নৈতিক, তেমনি রাজনৈতিক।

"দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার আসন্ন সহচরেরা তখনও অনুভব করেন নাই। তাঁদের বাধিয়াছিল প্রচলিত হিন্দুধর্মের অসত্য এবং হিন্দু সমাজের জাতিভেদের বেদনা। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি করা ও ধর্ম সাধনেই তাঁহারা ব্যস্ত হইয়াছিলেন। বিদেশী শাসনের বিরাট অন্যায় ও অবিচারের অনুভূতি তাঁহাদের তখন ভাল করিয়া জাগে নাই। কেশবচন্দ্র রবিবাসরীয় সামাজিক ব্রহ্মোপসনার সময় সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু স্বদেশের জন্য বিশেষভাবে কোন প্রার্থনা করিতেন না।"[২০]

জাতীয়তা ও জাতীয় সংস্কৃতির কথা সদা উচ্চারিত হলেও ব্রাহ্ম পত্রিকার অনেকগুলি মূলত ছিল রাজভক্ত। পেশাদারী বঙ্গমঞ্চে বৃটিশ রাজশক্তির ও রাজভক্তদের সমালোচনায় তাই তাঁরা অতিশয় কুপিত হলেন।

১৮৭২-৭৬ সাল এই চারি বৎসর বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনিতে মুখর; এই যুগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর অভ্যুত্থানের যুগ। বাংলা নাট্যমঞ্চেরও এটি একটি বিশেষ পর্ব; এই বিশেষ পর্বের প্রধান

নাট্যকার হলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশিরকুমার ঘোষ, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, হরলাল রায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র গুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ দাস। অষ্টরথী ছাড়া আর একজন সাহিত্যরথীর নাম এ-যুগের নাট্যমঞ্চের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। বঙ্গীয় নাট্যশালার এই বিশেষ পর্বে নাটকের চাহিদা পূরণে সর্বাধিক সহায়তা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ নাট্যে রূপান্তরিত হয়ে দর্শকদের তৃপ্তিসাধন করেছে। এবং অনেক নাট্যযশঃলিপ্সুর নাটক-রচনার উপকরণাদি সরবরাহ করেছে। তৎকালীন নাটকের কথাবস্তু ও নাটকের কলাকৌশল (conceits) নির্বাচনে এই 'রূপান্তরিত' উপন্যাসগুলির প্রভূত প্রভাব ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠাকালে কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না; ঐ মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সময় তিনি কলকাতায় উপস্থিত হন। এবং এই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করে মেলায় পাঠ করেছিলেন। সেই কবিতাটির নাম 'উদ্বোধন'। তাঁর 'গম্ভীর' নাটকের একটা প্রধান সুর ঐ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। নাটক তিনি নানান্ জাতের লিখেছেন—গম্ভীর-নাটক, প্রহসন, কমেডি এবং অপেরা।

"হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ, ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বব্যথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"[২১] এরই ফলে রচিত হোল 'পুরুবিক্রম নাটক'। প্রথমে 'বিদ্বজ্জন সমাগমে' নাটকটি পঠিত হয়। এবং খবর পেয়ে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কর্মকর্তারা নাটকটি হস্তগত করেন।[২২]

সেকেন্দার সাহের সঙ্গে পুরুর যে সঘর্ষ হয়, সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকের আখ্যানভাগ গঠন করেছেন। এই বিষয়বস্তুর প্রতি সর্বপ্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রাজনারায়ণ বসু তাঁর "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক বিখ্যাত বক্তৃতায়। "এই নাম (হিন্দুনাম) উচ্চারণ করিলে মহাত্মা পুরুরবাকে স্মরণ হয়, তিনি এলেকজণ্ডরের নিকট শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজণ্ডর "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব "এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, এক রাজা অন্য রাজার প্রতি

যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবেন।"[২৩] ইতিহাসের অংশকে ছাপিয়ে গেছে নাটকের কাল্পনিক অংশ। কাল্পনিক অংশে কুল্লু পর্বতের রাণী ঐলবিলার ও তক্ষশীলভগিনী অম্বলিকার দুইটি মুখ্য ভূমিকা। এঁদের মধ্যে প্রথমা হলেন দেশপ্রেমিকদের প্রেরণাদাত্রী, দ্বিতীয়া হলেন শত্রুর সহযোগিনী। এই অম্বালিকার চক্রান্তের ফলেই পুরুর সঙ্গে ঐলবিলার ভুল বোঝাবোঝি হয়; পরে স্বয়ং অম্বালিকাই সেই অন্যায়ের সংশোধন করেছিল। পুরুকে নাট্যকার বীর করেছেন—সে বীর বাক্যের ও আচরণের বীর, কিন্তু ভাবুকতার নয়; তাই তার সমগ্র আচরণই পুত্তলিকার আচরণ, পুরুষোচিত আচরণ নয়। বঙ্গদর্শন পত্রিকায় এই নাটকের উপন্যাস-অংশের প্রশংসা ছিল, কিন্তু নাটকের বড় প্রশংসা ছিল না।

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নাটকে তাদৃশ বৈচিত্র্য নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন, তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্য বিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। যেন সকল কথাতেই গুজরত ও মারফৎ লেখা আছে বলিয়া বোধ হয়, আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই সকল কথাগুলি ছাপাইয়াছে, আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল না কেন? গ্রন্থের মর্মভেদকতার অভাবে আমাদের দুঃখ হইয়াছে।[২৪] আর একখানি পত্রিকাতেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়, "গ্রন্থকর্তা কেবল স্বদেশানুরাগের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন, মানবহৃদয়সিন্ধুর মধ্যে ডুবিতে অধিকক্ষণ সময় দেন নাই।"[২৫]

"আমি তাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে রাজকুমার যবনাদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রদর্শন করিবেন আমি তারই পাণিগ্রহণ করব।"[২৬] ১।১

এই অসমসাহসিক সঙ্কল্প জেনে সে-যুগের দর্শকসমাজ নিশ্চয়ই গম্ভীরভাবেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, এটা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আজ হিন্দু মেলার উত্তেজনা প্রশমিত; আজ এ সব উক্তি অগ্নি-নির্বাপিত শুধু ধূম-উদ্‌গীরণক্ষম শলাকার মত পড়ে আছে।

পুরু ও সেকেন্দার শাহের দ্বৈত সংগ্রামে পুরুকেই অধিকতর বীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক ইসারা কিছু কিছু থাকতে

পারে। কিন্তু আহত অবস্থায় পুরু যেভাবে তক্ষশীলকে তরবারির এক কোপে হত্যা করে ফেলল, তা সত্যই বিস্ময়কর! ঐলবিলার ভাষণগুলি রাজনারায়ণ বসু বা মনোমোহন বসু বা নবগোপাল মিত্রের ভাষণের অনুরূপ। ফলে নাট্যমঞ্চ থেকে-থেকে বক্তৃতামঞ্চ বলে বিভ্রম ঘটায়।

এই নাটক সে-যুগে প্রশংসিত হয়েছিল; প্রশংসার অন্যতম কারণ এ নাটকের উন্নতরুচি। অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনায় এ নাটকের সংলাপ মার্জিত বা অশ্লীলতামুক্ত। জনৈক সমালোচক এ নাটকে গ্রীক নাট্যরীতির প্রতিফলন দেখেছেন; তাঁর মতে "এতদিনে বঙ্গভাষায় একখানি প্রকৃত নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। * * তাঁহার প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষার সমুদায় পূর্ব নাট্যকারকে পরাভূত করিয়াছেন।"[২৭]

এ নাটকে কোন উপকাহিনী নেই, নাটকের সমগ্র ঘটনা একটা লক্ষ্যের পানে ছুটে চলেছে। হাস্যরস নেই নাটকে; এ নাটকের সুর হোল দেশপ্রেমের সুর। কাজেই নাটক কোন ক্ষেত্রেই দ্বিধান্বিত নয়। সমালোচক লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রবর্তী গ্রীক নাট্যাদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে যুনানী নাট্যপ্রণালী হোল নিয়মাত্মক প্রণালী।[২৮] "রস সম্বন্ধে যুনানী কবিগণ অনেক সতর্কতা ও নিপুনতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা কোন নাটকেই এক বা দুইটি রসের অধিক অবতারণা করেন নাই। গম্ভীর নাট্যব্যাপার মধ্যে অনর্থক বিদূষকের বিরক্তিজনক রসিকতা নিবিষ্ট করিয়া কুত্রাপি রসভঙ্গ করেন নাই। * * সুপ্রসিদ্ধ পুরুবিক্রম নাটকে যুনানী প্রণালী কিয়দংশে অবলম্বিত হইয়াছে।"[২৯] সমালোচক স্বয়ং ছিলেন একজন নাট্যকার।

পুরুবিক্রম নাটকে স্বাদেশিকতার বক্তৃতাবিলাস বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সরোজিনী নাটকে যেন পূর্বোক্ত নাটকের এক সমালোচনা পাচ্ছি—"মহাশয়, কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কার্য হয় না।"

অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন, "সাধারণ কথোপকথন নাটক নয়, এই প্রকার কথোপকথন অন্য হিসাবে যতই মনোরম হউক না কেন নাটকের হিসাবে আদৌ ফলপ্রদ নহে। প্রধান পাত্রদিগের পরস্পরের মনে কোন প্রকার বিকার উৎপাদন করাই নাটকের প্রধান কার্য এবং মানসিক বিকারের সমষ্টিই মনুষ্যের প্রকৃত জীবন।"[৩০]

যে-মনোভাব নিয়ে সঞ্জীবনী সভা গঠন করেছিলেন, 'সার্বভৌম মিলনোপযোগী পোশাক' পরিধান করেছিলেন, লাভলোকসানের হিসাব না করে দেশলাইয়ের

কল বানাতে গিয়েছিলেন, কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জাহাজের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই একই মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়ে জাতীয়তাবাদী নাটক রচনায় প্রণোদিত হয়েছিলেন। তখন সম্ভাব্যতার সীমান্ত উপক্রত হবারই যুগ।

সরোজিনী নাটকের প্রেক্ষাপট ভিন্নতর ; এ ভারতবর্ষ তুর্কী-বিজয়-পরবর্তী ভারতবর্ষ। এই নাটকে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গ মাথা চাড়া দিল।

১৮৭২ সালে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তারা জাতীয় সভা স্থাপন করেন।[৩১]

হিন্দুমেলার স্বাক্ষরকারীদের মধ্য থেকে যে সভা উদ্ভূত হোল তাকে জাতীয় সভা নামে অভিহিত কবায় কেউ কেউ আপত্তি জানান। ন্যাশনাল পেপার তার জবাবে লিখল: "We donot understand why our correspondent takes exception to the Hindoos who certainly form a nation by themselves, and as such a society established by them can properly be called a National Society.[৩২]

নাটকে ও প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

মেবাররাজ লক্ষ্মণ সিংহ স্বীয়কন্যা সরোজিনীকে বলি দিয়ে মাতৃভূমি রক্ষার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন ; শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কল্প পরিপূরিত হোল না। কিন্তু সরোজিনীকে অন্যান্য পুরনারীদের সঙ্গে আত্মোৎসর্গ করে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করতে হোল। দিল্লীর বিধর্মী স্থলতান আলাউদ্দীন চিতোর দখল করলেন, কিন্তু সে চিতোর তখন প্রেতপুরী।

নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব নয়, মূল দ্বন্দ্ব রাজার হৃদয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। একদিকে পিতা আর একদিকে রাজা—এই দুই সত্তা ঐ মঞ্চে লড়াই করেছে। রাজার কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে পিতার স্নেহকাতরতার দ্বৈরথ সমরে জয়ী হয়েছে পিতার স্নেহকাতর হৃদয়। কিন্তু সরোজিনীর ক্ষেত্রে প্রেম নয়, কর্তব্যবুদ্ধি জয়ী হয়েছে। এর পাশাপাশি টুকরো টুকরো দ্বন্দ্বও আছে। এই নাটকে দৈবঘটনা বা নিয়তির একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এখানে নিয়তির প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসেব মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে -বিজয় সিংহ ও রণধীর সিংহ একই পুরীর অধিবাসী হয়েও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলোকের নাগরিক। সব কয়টি দ্বন্দ্ব সংহত হয়নি বলে নাট্যসিদ্ধি অপচয়ের হাত এড়াতে পারে নি।

এই নাটকে একটি প্রখ্যাত গ্রীক নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেছেন। রাসিন-অনূদিত 'ইফিগেনিয়া এ্যাট আউলিস' জ্যোতিরিন্দ্র

নাথ অবশ্যই পড়েছিলেন। মূল নাটকে যাই থাক, রাসিন নাটকের দ্বন্দ্ব এনে দাঁড় করিয়েছিলেন স্নেহ আর কর্তব্যের দ্বন্দ্বে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে কর্তব্যবোধ, মানুষের মর্যাদাবোধ। এখানে ইউরিপিদিস অপেক্ষা রাসিনের দৃষ্টিভঙ্গীই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নাটকের শেষাংশে তিনি রাসিনের কাছ থেকেও বিদায় গ্রহণ করেছেন। আশ্রয় নিয়েছেন প্রচলিত ইতিহাসের বক্ষোপুটে।

নাটকের চরিত্রগুলি গ্রীসীয় ক্লাসিক ঔচিত্যবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে অষ্টাদশ শতকীয় 'মেলোড্রামা'র চাতুরী অনুকরণ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ ভৈরবাচার্যের কথা বলা যাক। ভৈরবাচার্যকে কেউ 'ভিলেন' বা খলচরিত্র ভিন্ন অন্য কোন ভূমিকায় দেখার প্রত্যাশা করে নি; কিন্তু নাট্যকার তার প্রতিও প্রসন্নতা দেখিয়েছেন—সাহিত্যিক সুবিচার (Poetic justice) তার মস্তকেও বর্ষিত হয়েছে। নাটক তার পূর্বসূত্র বা সুতিকা-গৃহ ভুলে গেছে। গ্রীক নাট্যাধারে অষ্টাদশ শতকীয় বৃটিশ নাট্যছলার প্রবেশাধিকার ঘটল।

"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে আমাকে—সব গেল সব গেল সব গেল—ছাড় আমাকে বলছি —"

ভৈরবাচার্যের এই আর্তনাদ দর্শক-হৃদয়কে অভিভূত করে। ছদ্মবেশী বিধর্মী কুচক্রী মহম্মদ আলি ক্ষণিকের জন্য হলেও 'বিসর্জনের' রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করল। কিন্তু প্রথম থেকে কি আমরা এই প্রকার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিলাম? নিয়তি-শাসিত কথাবস্তুতে আমরা এই প্রকার পরিবর্তনমুখী চরিত্র প্রত্যাশা করি না। যেমন করি না উপকাহিনীর উপস্থিতি। নাট্যকার কাহিনীর অনেকখানি 'ইফিগেনিয়া এ্যাট আউলিস' থেকে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু ইউরিপিদিসের নাট্য-আদর্শ তিনি গ্রহণ করেননি। ইউরিপিদিসে ভবিষ্যদবাণীর মধ্যে কোন শঠতা ছিল না।

রাজা আগামেম্‌নন মিথ্যা কথা বলে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর পত্নীকে; কন্যাকে বিয়ে দেবেন বলে এনেছিলেন। কিন্তু কন্যার আগমন-মুহূর্ত যত নিকটবর্তী হতে লাগল, আগামেম্‌নন ততই সংকটে জড়িয়ে পড়লেন। মেয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতকারের দৃশ্যের বর্ণনা অনন্য :

Iphigenia. Hail! Well hast thou gone, father, bringing me.

Agamemnon. (Starts) Well?—Child, I know not how to answer this.

Iphi. Ha !

So glad to see me—yet what troubled look !

Aga. On Kings and Captains weigheth many a care.

Iphi. This hour be mine—this one ! Yeild not to care.

Aga. Yea, I am all thine now ; my thoughts stray not.

Iphi. Unknit thy brow then ; let love melt thine eye.

Aga. Lo, child, I joy—as I joy, seeing thee.

Iphi. And yet, and yet—thine eyes are welling tears.

Aga. Yea, for the absence yet to come is long.

Iphi. I know not, know not, dear my sire, thy meaning ;

Aga. Thy wise discernment stirs my grief the more.

Iphi. So I may please thee, folly will I talk.[২৪]

অন্তর্দ্বন্দ্বে লক্ষ্মণ সিংহও জর্জরিত হয়েছেন।

লক্ষ্মণ সিংহ। (স্বগত) হায় হায়! কি কাজ কল্লেম, সুরদাসকে দিয়ে কেন পত্রখানি পাঠিয়ে দিলেম চিতোর তো এখান থেকে বেশি দূর নয়. ততক্ষণ বোধ করি, সুরদাস সেখানে পোঁচেছে। বোধ হয়, এতক্ষণে তারা সেখান থেকে ছেড়েছে। কেন আমি রণধীর সিংহের কথায় ভুলে গেলেম। রণধীর সিংহ যে কি কুহক জানে তার কথায় আমি একেবারে বশীভূত হয়ে পড়ি। ১।২

কিন্তু লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে সরোজিনীর সাক্ষাতকারেব দৃশ্য এই দ্বন্দ্ব অন্য উপঘাতের জন্য নিরঙ্কুশ হতে পারে নি।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ! আমি আর বাছার দিকে চাইতে পাচ্ছিনে।

সরোজিনী। পিতঃ! মুসলমানদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ হবে?

লক্ষ্মণ। বৎসে, আমি তোমার পিতার নামের যোগ্য নই। আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান পিতা হলে তোমার উপযুক্ত হত।

সরো। পিতঃ! ও কি কথা? আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কে আছে? আপনার কিসের অভাব? আপনার ন্যায় মান-মর্যাদা আর কোন রাজার আছে?

লক্ষ্মণ। (স্বগত) আহা! এই সরলা বালা কিছুই জানে না-পিতা যে তোর কৃতান্ত, তা তুই এখনো টের পাস নি।

সরো। আপনি কি ভাবছেন? মধ্যে মধ্যে ওরূপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছেন কেন? আমি কি কোন অপরাধ করেছি? আপনার বিনা আদেশে আমার কি এখানে আসা হয়েছে? তবে কেন ওরূপভাবে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন?

লক্ষ্মণ। না বৎসে! তোমরা কোনো অপরাধ হয় নি। এখানে যুদ্ধ সজ্জার জন্য নানা ভাবনা নাকি ভাবতে হচ্ছে, তাতেই বোধ হয় তুমি আমায় অমন দেখছ।

সরো। এ তো সেরকম ভাবনা বলে বোধ হয় না। আপনাকে দেখলে বোধ হয় যেন অন্তরের মধ্যে আপনার কি একটা ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হয়েছে। পিতঃ, বলুন কি হয়েছে? এরকম ভাব তো, আপনার কখনোই দেখিনি।

লক্ষ্মণ। হা বৎসে!

সরো। আপনি কেন অমন করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন? বলুন, কি হয়েছে?

লক্ষ্মণ। বৎসে! আর কি বলব—মুসলমানেরা—

সরো। মা চতুর্ভুজা! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত করো।

লক্ষ্মণ। বৎসে! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অনেক অশ্রুপাত করতে হবে—হৃদয়ের রক্ত পর্যন্ত শুষ্ক করতে হবে। ২।২

গ্রীক নাটকের কলেবরে হিন্দু মেলার উদ্যোক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ঢুকে পড়লে যা হবার, তাই হয়েছে।

স্বাদেশিকতা, মুসলমান-বিদ্বেষ—সবই ঐ যুগের রাজনৈতিক চিন্তার ইঙ্গিতে এখানে এসে হানা দিয়েছে। ভৈরবাচার্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে মঞ্চের দিকে দর্শকরা সে-যুগে যে ধাবমান হতেন, তা শুধু মুসলমান বিদ্বেষে চালিত হয়ে; অন্য কোন কারণে নয়। গ্রীক নাটকের সংহতি এখানে বিনষ্ট হয়েছে; এ নাটক বহুধাবিস্তৃত। এর বেদনাও তরলীকৃত হয়েছে; এলিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরিপিদিসের নাটকের উপসংহার ভিন্নপ্রকার। কোরাস বলছে—

Pass Atreus' Scion, to Phrygia's land with joy,
And with joy from the battle-toil came,
Bearing the glorious spoil of Troy.

পুরোহিত যখন ছুরি তুলে নিল ইফিগেনিয়াকে হত্যা করার জন্য, তখন অলৌকিক উপায়ে সেখানে এল একটি হরিণী। আর সরোজিনী নাটকে পুরোহিতের ছুরির মুখে পড়ল রোশেনারা, আবার রোশেনারার তারই আপন নিরুদ্দিষ্টা কন্যা! 'মেলোড্রামা' আর কাকে বলে!

কোথায় গ্রীক ট্রাজেডি আর কোথায় অষ্টাদশ শতকীয় বৃটিশ মঞ্চের মেলোড্রামা! এর জন্য নাট্যকার একান্ত দায়ী নন, দায়ী সে-যুগের বাঙ্গালীর নাট্যরুচি।

তবু সরোজিনী নাটকে লেখকের পথ পরিবর্তনের চিহ্ন স্পষ্ট। পুরুবিক্রম নাটকে বীরত্ব ও সাহসিকতা কেবল কথার খতিয়ান হবার প্রধান কারণ, ঐ নাটকে কোন চরিত্রই (কেবল তক্ষশীল ব্যতীত) সাংসারিক জীব নয়। ঐলবিলা ইনিডের সেই গর্বিতা রাণী দিদোর মত একেশ্বরী, যার নজির ভারতীয় সমাজ-জীবনে কোন দিন ছিল না। সরোজিনী প্রত্যক্ষ সংসারের নানা সম্পর্ক নিয়ে অনেক বেশি বাস্তব। সে শুধু দেশপ্রেমিকা নয়, সে কারও কন্যা, কারও দয়িতা। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সৃষ্ট পরবর্তী নারী চরিত্রগুলির সে হোল নিশ্চিত অগ্রজা। পরবর্তী নাটকে নারীদেরই প্রাধান্য, শুধু নামকরণে নয়, ঘটনা-উপস্থাপনাতেও। এই নারী-প্রাধান্যের ফলেই নাট্যকার হিন্দুমেলার দায়ভাগ থেকে সরে আসতে সক্ষম হবেন; নারী-প্রাধান্যের ফলে মুসলমান বিদ্বেষ পরিত্যক্ত হবে। কারণ নারী মান্য করে হৃদয়ের শাসন, সমাজের রক্তচক্ষুকে নয়।

ইংলণ্ডকে সম্বোধন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লিখেছেন,

"একবার স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহার করায়ত্ত হইল, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয়লাভ করিলেন? আমরা দাসত্ব-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিয়াছেন।"[৩৩]
দ্বিজাতিতত্ত্ব কে সৃষ্টি করল, আশা করি তার কিছু ইতিহাস এখানে জানা যাবে। এখানে যেটুকু ইতিহাস উত্থাপন করা হয়েছে, তার মূল্য যাচাই করার প্রয়োজন নেই, শুধু মনোভাবটি লক্ষ্য করার মত। হিন্দুমেলার এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শীঘ্রই বেরিয়ে এলেন। 'অশ্রুমতী' ও 'স্বপ্নময়ী' নাটকদ্বয় হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্তেজিত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে মানবমৈত্রীর

মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, গেয়েছে প্রকৃত মানবতাবাদের জয়গাথা, সেখানে হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের যথাযোগ্য স্থান আছে।

'অশ্রুমতী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক; এ নাটকও বিয়োগান্তক। মৃত্যুতে নয়, নায়িকার যোগিনীরূপ ধারণে নাটকের অবসান হয়েছে।

"নাটকের বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুলির মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের সমতা রক্ষিত হওয়া চাই; বিন্দুগুলি—অর্থাৎ মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হওয়া চাই, নাটকে বহু ব্যাপার থাকা সঙ্গত নহে, এবং বীজ অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকৃতিসকল মূল-কারণের যাহাতে সংহার না হয়, তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।" ৩৪ অশ্রুমতী নাটক পড়ে মনে হয় যেন লেখক এই সব নীতির প্রতি তত মনোনিবেশ করতে পারেন নি। আমাদের মনে হয়, নাট্যকার তখনও হিন্দুমেলার ভাবাদর্শের আনুগত্য পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেন নি। তাই নাটকে রাণা প্রতাপ সিংহের অংশ অতীব স্ফীতিলাভ করেছে; শ্রদ্ধার কুসুম শিল্পের কাননে শোভন হয় না। নাটকের কেন্দ্রীয় নাট্যবস্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে অশ্রুমতী ও সেলিমের জীবনসংঘাতে। অশ্রুমতীকে লেখক ভীলদের মধ্যে লালিত-পালিত করেছেন; তাই সে জানে না—কে হিন্দু, কে মুসলমান!

"তুমি ভাই এতদিন ভীলদের মধ্যে ছিলে কে মুসলমান, কে রাজপুত, তাই তুমি জানো না।" ৩।১

নাট্যকাব অনেকটা 'The Tempest'-এর মিরাণ্ডার মত কবে তাকে গড়ে তুলেছেন। তবে নাটকের ঘটনা যত অগ্রসর হচ্ছে, ততই 'Othello' নাটকেব নাটকীয় কৌশল বিশ্বস্তভাবে অবলম্বিত হয়েছে। ফরিদ খাঁকে দিয়ে মিথ্যা চিঠি তৈরী করা হোল, পৃথ্বীরাজকে এ ব্যাপারে ব্যবহার করা হোল। ফরিদ খাঁ যেন ইয়াগো। আর সেলিম যেন ওথেলো। অবশ্য অশ্রুমতীও ওফেলিয়ার অনুরূপ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুধু ছুরির খোঁচা খেয়ে তার ফাঁড়া কেটে যায়। নাটকটি পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ; ৩৫টি দৃশ্যে শেষ। অথচ কেন্দ্রীয় ঘটনাকে বিঘ্নশূন্য করলে এই নাটক অনেক সংহত হোত। প্রথম অঙ্ক অনায়াসে বাদ দেওয়া যেত; এবং চতুর্থ অঙ্কের ষোড়শ গর্ভাঙ্কেই নাটকের যবনিকা পড়তে পারত। কারণ ঐ দৃশ্যে শক্ত সিংহ অশ্রুমতীকে নিয়ে চলে গেছে; ফরিদ খাঁর সমুচিত শাস্তি হয়েছে, সেলিমের হাতে নিহত হয়েছে। এখন নিশ্চিদ্র বিরহ-বেদনা সেলিম আর অশ্রুমতীর

ভুবন জুড়ে থাকবে। কিন্তু নাটক এভাবে শেষ হয়নি। জাতীয়তার মুখ চেয়ে তাই সূচনা ও উপসংহার প্রলম্বিত হয়েছে। হায়, এত করেও তিনি সমালোচকের দণ্ড থেকে নিস্তার পাননি! গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশে এই নাটকের অনুবাদ পড়ে বা অভিনয় দেখে তথাকথিত জাতীয়তাবাদীরা আপত্তি জানিয়েছিলেন। নট-গিরিশচন্দ্র ঘোষ ত প্রতাপ-কন্যাকে মুসলমানপ্রেমিকা রূপে দেখে অভিনয়ের পূর্বে গ্রীনরুম থেকেই চম্পট দিয়েছিলেন।[৩৫] অশ্রুমতীর ৮ম সংস্করণে তাই নাট্যকার লিখলেন :

"যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপ সিংহের শুভ্রযশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি।"

এ যত্ন হিন্দুমেলার ভাবধারাপুষ্ট লেখকের যত্ন; এবং তা নাটকের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়েরই হেতু। এ নাটক একাধারে হিন্দুমেলার আনুগত্য ও অস্বীকৃতি।

অশ্রুমতী। হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানি নে। আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি। (৪।৮)

অস্বীকৃতি এই কারণে, এই নাটকে জাতি-বিদ্বেষের অবসান সূচিত হচ্ছে, এই নাটকে নায়ক-নায়িকা বাক্যের দাস নয়, তারা হৃদয়বৃত্তির দাস। নাটক বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যাবর্তন করছে। নাটকের গানগুলি তাই সমবেত জাতীয়-সঙ্গীত না হয়ে, হয়েছে ব্যক্তির হৃদয়-সঙ্গীত।

'স্বপ্নময়ী নাটক' শোভা সিংহের বিদ্রোহ নিয়ে রচিত। বর্ধমান-দুহিতার যে বিবরণ ইতিহাসে আছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাকে নাটকে স্থান দেন নি। তিনি অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র মনোরমার আদলে স্বপ্নময়ীকে গড়ে তুলেছেন। স্বপ্নময়ী সংঘর্ষসঙ্কুল জাতীয়তাবাদমূলক নাটকের এক নায়িকা, কিন্তু সে হোল নিতান্তই এক খেয়ালী বনচারিণী। এই বালিকা জ্যোতিরিন্দ্র অনুজের রুদ্রচণ্ড, কবিকাহিনী বা প্রকৃতির প্রতিশোধের চৌহদ্দি রচনা করেছে। স্বপ্নময়ী নাটকে নাট্যকারের রোম্যানটিকতা চরম স্ফূর্তি পেয়েছে. যেহেতু এই নাটকেই আবার বাস্তবভিত্তিক দৃশ্যের সংখ্যা অধিক।

কৃষ্ণরাম রায়ের রাজসভার দৃশ্য খুবই বাস্তবসম্মত হয়েছে; এ ছাড়া শুভ সিংহের দর্শনার্থী জনতার দৃশ্যও বাস্তবানুগ। অনেকটা 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জনে'র জনতার অনুরূপ।

শুভ সিংহের চরিত্র অভিনব। শুভ সিংহ এক 'Double personality'; সে ভণ্ড, সে সৎ। শেষ মুহূর্তে সে তার ভণ্ডামির মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"শোনো জগৎ রায়, আমি দেবতা নই—আমি সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টাক্ষরে বলছি, আমি দেবতা নই, আমি বিদ্রোহী শুভ সিংহ-একজন সামান্য তালুকদার। আমার ললাটে এই যে একটা কৃত্রিম নেত্র জ্বলছে, যা দেখে তোরা সবাই আমায় দেবতা বলে ভয় করতিস এই দেখ, সে কি জিনিস (বাগ্‌দিদের নিকট নিক্ষেপ) সুরজমল, আজ হতে আমি বিদ্রোহী শুভ সিংহ, আর আমি দেবতা নই, আমার সেই কপটতার কলঙ্ক, আমার ললাটের এই উজ্জ্বল কলঙ্ক, ঐ দেখ, আমি অপনীত করলেম।" ৫।৪

শুভ সিংহ রাজাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টিত হোল, সুরজমলকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হত্যা করল। কিন্তু প্রাসাদের এক অংশ ভেঙ্গে রাজার মস্তকে পড়ল, রাজা নিহত হলেন। স্বপ্নময়ীর চোখে তখন আর শুভ সিংহ দেবতা নয়, পিশাচ মাত্র। শুভ সিংহের সমস্ত মর্য্যাদালুপ্ত, সে আত্মহত্যা করল। উন্মাদিনী স্বপ্নময়ী নিরুদ্দিষ্টা হোল।

ইতিহাসকে তিনি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু ইতিহাসকে তিনি মান্য করেন নি। তাই স্বপ্নময়ীর হাতে শুভ সিংহের জীবন দীপ নিভল না। মরে শুভ সিংহ মরবার যোগ্য হয়েছে। নাটকে শুভ সিংহ-সুরজমলদের পাশাপাশি আছে রহিম খাঁ। রহিম খাঁ, তার স্ত্রী জেহেনা, জগৎ রায় ও সুমতি মিলে নাটকের আর একটি কাহিনী উপস্থিত করেছে। অথচ তারা কোন পাল্টা বক্তব্য রাখেনি। শুধু উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছে। এইভাবে উপকাহিনী প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সংকীর্ণ হয়ে গেল।

পুরুবিক্রম থেকে স্বপ্নময়ী—নায়িকা-ভাবনায় নাট্যকার অনেকটা পথ অতিক্রম করে এসেছেন। ঐলবিলা ছিল প্রথমে দেশপ্রেমিকা, শেষেও দেশ-প্রেমিকা। সরোজিনীও দেশের জন্য জীবন বলি দিতে চেয়েছে, দিয়েছেও বটে। কিন্তু সরোজিনী ভালবাসা দিয়ে উত্তেজনার গোলাবারুদ তৈরি করেনি। অশ্রুমতী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরিচিত নয়, সে জানে সহজ-ধর্ম, যে ধর্ম হৃদয়ের ধর্ম। স্বপ্নময়ী 'অশ্রুমতী'র মেজাজে লেখা নাটক, এবং অপেক্ষাকৃত উদ্দেশ্যপ্রধান নাটকের যুগে জন্মে উদ্দেশ্য ভুলে গেছে। স্বপ্নময়ী থেকে 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর দূরত্ব খুব বেশি নয়।

নাটকে তিনি একটি নির্দিষ্ট কথাবস্তু দিলেও লক্ষ্য ও ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। সরোজিনী, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী—সর্বত্রই মুখ্যকাহিনী উপকাহিনীর খবরদারীতে বিব্রত।

অঙ্ক ও গর্ভাংক বিভাগে তিনি মাইকেল-অনুসারী; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের মুখ চেয়ে একটি ভরতবাক্য-সম্বলিত দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পুরুবিক্রম নাটকের শেষ দৃশ্যটির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সরোজিনী, অশ্রুমতী স্বপ্নময়ীর শেষে একটি কোডাঙ্ক জুড়ে দেওয়ার কোন নাটকীয় সার্থকতা নেই। সরোজিনী নাটকে রামদাসের গান, অশ্রুমতী নাটকে অশ্রুমতীর গান, স্বপ্নময়ী নাটকে জগৎরায়-সুমতির গান—নাটক-অন্তে নাটক করার প্রয়াস।

সংলাপের উপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রধান নিভরতা; কিন্তু তবু তিনি গান ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়েব নাটকে ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলি যে কেউ গাইতে পারে। কুশীলবেরা যখন গান গেয়েছে, তখন মনে হয়েছে অন্যের গান তারা গাইছে। কিন্তু ব্যক্তিগত গান পরবর্তী নাটকে দেখা দিয়েছে—অশ্রুমতী ও স্বপ্নময়ীতে। যেগুলি বারোয়ারী গান, সেগুলির ভাষা তবু নতুন, কিন্তু ব্যক্তিগত গান পুরানা আঙ্গিকে রচিত। এগুলি নিধুবাবুব গীতের চর্বিত চর্বণ। পরে জ্যোতিরিন্দ্র-নাটকের এই ত্রুটি সংশোধণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। এখন থেকে গান আর নাটকের ওপর প্রযুক্ত হয়নি, নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'স্বপ্নময়ী'ব গান অন্য নাটকে কি স্থান পেতে পারে?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে কোন বিদূষক চরিত্র সৃষ্টি করেন নি; তাঁর 'সিরিয়াস' নাটকে হাস্যরসও সামান্য মাত্র। অশ্রুমতীতে ভীলদের কথাবার্তায়, স্বপ্নময়ীতে পূজার্থী নরনারী ও গ্রামবাসীদেব বাক্যালাপে হাস্যরসের স্ফুরণ ঘটেছে। হাস্যরস তাঁর গম্ভীর নাটকে বড় একটা স্থান পায়নি, সম্ভবতঃ রাসিনের মত নাট্যকার তাঁর আদর্শ, ফলে এই প্রকার ঘটেছে।

তাঁর গম্ভীর নাটক খুবই গম্ভীর, প্রেম ও কর্তব্যের বিরোধে কর্তব্যের কণ্ঠেই তিনি মাল্যদান করেছেন—একাজেও রাসিন তাঁর পথচালক। অথচ বিষয় গম্ভীর হলেও বিষয়ের গাঢ়তর ও নিবিড়তর আকার তিনি দেননি; তাই তাঁর হাতে দুঃসহ ট্রাজেডিও মেলোড্রামার ভাবালুতায় উদ্‌ভ্রান্ত। উত্তেজিত পরিবেশে পরিমিতিবোধ পলাতক হয়েছে।

কমেডি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার প্রথম নাটক রচনা করেছিলেন ১৮৭২ সনে; সেটি প্রহসন। নাট্য-আবহাওয়া তাঁদের গৃহে জমজমাট ছিল, ১৮৬৬ সনে জোড়াসাঁকো মঞ্চে সমারোহের সঙ্গে নবনাটক অভিনীত হয়, তখন তিনি সে নাটক দেখেছিলেন। তারপর কিছুকাল তিনি বোম্বাইতে মেজদাদার সঙ্গে বসবাস করেন। ১৮৬৮ সনে তিনি কলকাতায় ফিরলেন। ১৮৬৯ সনে তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মত বিবোধেব দরুন কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন, এবং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। "কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডে ইংরেজদের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, মিডল ক্লাস ইংলিশ হোম-এর ন্যায় ইনষ্টিটিউশান পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল, কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন সময়ে আহাব, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া শৃঙ্খলামতো কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এইভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন।"[৩৬]

ভারত আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে উন্নতিকামী ব্রাহ্মদের মধ্যে একদল স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নে অধিকতর অগ্রসর হতে চাইলেন। এই আন্দোলনের ইতিহাস শাস্ত্রীমহাশয়েব মুখ থেকে শোনা যাক। "১৮৭২ সালে আমার বন্ধু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, অন্নদাচরণ খাস্তগিব প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম কেশববাবুকে বলিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পবিবারস্থ মহিলাদিগকে লইয়া পরদার বাহিরে বসিতে চান। কেবল একথা যে বলিলেন তাহা নহে, একটা কিছু স্থির হইতে না হইতে একদা অন্নদাচরণ খাস্তগির ও দুর্গামোহন দাশ স্বীয় স্বীয় পত্নী ও কন্যা সহ পরদার বাহিরে সাধারণ উপাসকদিগের মধ্যে গিয়া বসিলেন। ··কেশববাবু বিপদে পড়িলেন।"[৩৭] আসলে কেশববাবু নব্য ব্যবস্থার জন্য দায়ী নন; তবু আদি ব্রাহ্মসমাজের নবীন সম্পাদক এই আন্দোলন উপলক্ষ্য করে কেশবচন্দ্রকে অভিযুক্ত করে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামে প্রহসন লিখলেন। নিতান্ত বিদ্বেষবশতই যে তিনি এই নাটিকা রচনা করেছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) বিলাত হইতে ফিরিয়া আমাদের পরিবারের যখন আমূল পরিবর্তনের বন্যা বহাইয়া দিলেন, তখন আমার মতেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তখন হইতে আর আমি অবরোধপ্রথার সমর্থক নহি, এবং ক্রমে ক্রমে একজন সেরা নব্যপন্থী হইয়া উঠিলাম। ইহার কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর কটাক্ষপাত করিয়া আমি 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' লিখিয়াছিলাম বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্যই 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র দ্বিতীয় সংস্করণ আর আমি ছাপাই নাই।"[৩৮]

স্মৃতির ওপর নির্ভর করায় অনেক ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সত্যেন্দ্র নাথ ১৮৬৪ সনে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন; এবং বোম্বাইতে সাবজজ নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ সনেই তিনি অবরোধবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। "২৭ এ ডিসেম্বর (১৮৬৬) বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বাটিতে যে মজলিশ হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্তবাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদের জাতীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া উক্ত মন্দিরে গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে কোন হিন্দুনারী গবর্ণমেণ্ট হাউসে যান নাই। তাহার অন্য রকম সভ্য পরিচ্ছেদ পরিধানপূর্বক গমন করিলেই ভাল হইত।"[৩৯]

এই মজলিশেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। "তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি ত ঘরের বৌকে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।"[৪০]

সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সৃষ্ট স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে এই নাটিকা রচিত হয়নি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় 'কমেডি অব ম্যানার্সে'র আদর্শে রচিত। কিম্ভূতকিমাকার ঘটনা তৈরি করে চল্‌তি কালের সামাজিক আচার-ব্যবহারের অসঙ্গতি ফুটিয়ে তোলাই এই জাতীয় নাটকের উদ্দেশ্য। 'কমেডি অফ ম্যানার্সে' আদিযুগের কমেডির অনেক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে। এ্যারিষ্টফেনিসে আতিশয্য আছে, মিনাণ্ডার-টেরেন্সেও আতিশয্য আছে। আসলে যুগের অসঙ্গতি নিবারণই ছিল এঁদের উদ্দেশ্য। মেরেডিথের ভাষায় বাস্তববুদ্ধির তরবারি দিয়ে (Sword of commonsense) অতিশয়তার দুর্গ ভেঙ্গে ফেলা। সেক্সপীয়রের কমেডির সেই রোম্যানটিক সুর এখানে নেই, তদপরিবর্তে আছে বিচারশীল মনোভাব।

পেরুরাম হোল এক বেকার যুবক: বাড়িওলার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত এক নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে তার হোল ফ্যাসাদ। সেখানে

গিয়ে পড়বি ত পড়, একেবারে পাওনাদার ব্যাটার সম্মুখে। পাওনাদার পেরুরামের প্রতি কটমট করে তাকাতেই সিঁড়ি দিয়ে তড়তড় করে নেমে এক দৌড় লাগাল পেরুরাম। পালাবার পথে মিরজাপুরে স্যানজার গির্জার কাছে দেখল সারি সারি পালকি ; একটিতে সে ঢুকে বসল ; বেয়ারাগুলি সাড়া পেয়ে পালকী কাঁধে করে লাগাল ছুট। এক ছুটে এসে পৌঁছাল পূর্ণবাবুর উঠোনে। এবং পূর্ণবাবুর বাড়িতে স্ত্রী-স্বাধীনতার কি হাল হতে পারে পেরুরামের দে'লতে তা আমরা জানতে পারব। নাটক এখান থেকেই শুরু হোল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের ঘটনাবিন্যাস বেশ কৌশলপূর্ণ! এমন কি, মাইকেলের প্রহসনদ্বয় অপেক্ষাও চাতুর্যময়। রুশ নাট্যরসিক লেবেডফের 'সঙবদল' পালার গঠনরীতির সঙ্গেই এর মিল আছে। কাহিনীর মধ্যে একটা কৌতূহল (Suspense) সর্বক্ষণই বজায় আছে।

কাহিনীর মধ্যে বাস্তবের বিকৃতি বা অতি-স্ফীতি আছে—বিধুমুখীরা তখনও বাস্তব সত্য নয়। শুধু আভাষিত হচ্ছে। ভোলা ভৃত্যের আচরণ এদেশের পক্ষে সুলভ নয়, কিছুটা বিদেশী সাহিত্যের 'Page boy—'এর অনুকরণে আঁকা। এ নাটকের ভৃত্যের একটা মুখ্য ভূমিকা আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বিদ্রূপ করতে ; সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকায় এই নাটিকা প্রশংসিত হয়—প্রশংসাব মূলে কতটা সাহিত্য-রসগ্রাহীতা আর কতটা ব্রাহ্মবিদ্বেষ বর্তমান ছিল, তা অনুমানসাপেক্ষ।[৪১]

তাঁর দ্বিতীয় প্রহসন-ধর্মী নাটক হোল 'অলীকবাবু'। এই নাটক প্রথম অভিনীত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। 'কিঞ্চিৎ জলযোগে'র মতই এ নাটকের গ্রন্থনা মাইকেলের নাটক থেকে পৃথক। মলিয়ের ও শেরিডান এই নাটকের আদর্শ। 'অলীকবাবু' নাটকের পিছনে স্পষ্টত বিদেশী আদর্শ কাজ করেছে। মলিয়ের-রচিত 'The Romantic Ladies' ও শেরিডানের 'The Rivals' নাটকদ্বয়ের গল্প, চরিত্র, ও সংলাপের অনুসরণ আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও নাটকের মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। শেরিডানের মত তিনিও বলতে পারেন, 'for as my **first wish in attempting a play was to avoid every attempt of plagiary."**[৪২] নানা সময়ে গঠিত নানা নাটকের বিবিধ কলাকৌশল তাঁকে প্রভাবিত করেছে, সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে শেরিডানের স্বীকৃতি উদ্ধৃতিযোগ্যঃ **"Faded ideas float in the fancy like half-forgotten dreams; and the imagination in its fullest enjoyments becomes**

suspicious of its offspring, and doubts whather it has created or adopted".[৪২]

অলীকবাবুর কলাকৌশল পৃথক। "ইহার উদ্দেশ্য কেবল খাঁটি আমোদ। গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ইহার ভিতর একটা সুস্থ, সবল, উজ্জ্বল, বালক-সুলভ অট্টহাস্য শুনিতে পাওয়া যায়। কেবল হাসি-নিছক বিশুদ্ধ হাসি। কল্পনা উদ্ভট হইলেও সুস্থ অবিকৃত বালক হৃদয়ের কল্পনা।"[৪৩] নাট্যকার এ্যারিষ্টোফেনিসের সঙ্গে যাত্রা সুরু করে কখন যেন মলিয়েরের দলে ভিড়ে গেছেন।

অলীকবাবু কোন ব্যক্তি বিশেষ নয়। সে আমাদের অনেকেরই এক জাতের বাড়াবাড়ির জিম্মাদার। নায়িকা-হেমাঙ্গিনী শেরিডানের লিডিয়া লাংগুইসের সহচারিনী, তার উদ্ভট রোম্যাণ্টিকতা বাস্তব পরিপন্থী নয়, হয়ত পুরো বাস্তব-অনুমোদিত নয়। লেখক ইচ্ছে করেই একটু বাড়িয়ে নিয়েছেন। এই বাড়তি অনুপান ব্যবহারের অনুমতি দিতে হবে। বঙ্কিম-উপন্যাসের যেটুকু প্যারডি আছে, তাব উদ্দেশ্য হৃদয়রঞ্জন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। শেবিডানে জেন অষ্টিনের প্যারডি অসূয়া-জাত নয়, নিছকই মজাদার রহস্যালাপ।

নাটকে গল্পাংশের এই বিভ্রান্তি মেনে নিলে আর সবকিছুই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। ঘটনা একটির পর একটি ঘটেছে, পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে। অর্থাৎ নাট্যকার ঘটনাকে অনুসবণ করেন নি, ঘটনা তাঁকে অনুসরণ করেছে।

এ নাটকে ভৃত্যের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। গদাধর যা যা চমৎকারিত্ব দেখাচ্ছে, তার সব কয়টির জন্যই নাট্যকাবেব প্রস্তুতি ছিল।

গম্ভীর নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেব প্লটের গাঁথুনি এতটা পবিকল্পনাসম্মত ছিল না। পুরুবিক্রম, সবোজিনী, অশ্রুমতী—সব কয়টি নাটকে নাট্যকাব সূচনায় যা বলেছেন, উপসংসারে তার সদুত্তব দিতে পারেন নি।

'কিঞ্চিৎ জলযোগে' প্লট-গাঁথুনি প্রশংসনীয়, কিন্তু সংলাপ তত উজ্জ্বল নয়। তুলনায় 'অলীক বাবুর' সংলাপ অতীব উজ্জ্বল, যথার্থ তির্যক। রঙ্গরস সৃষ্টির জন্য লেখককে যেমন নব নব ঘটনার উন্মেষ ঘটাতে হয়েছে, তার সঙ্গে সমান তালে ভাষারও নানা বেশ পরাতে হয়েছে। অলীকবাবুর ভাষা, হেমাঙ্গিনীর ভাষা, গদাধরের ভাষা ও সত্যসিন্ধুবাবুর ভাষা নানা ধ্বনিতে আওয়াজ তুলেছে। শুধু ব্যক্তিভেদে নয়, অবস্থাভেদে বা ঘটনাভেদে ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে। অলীকবাবুর ভাষায়, গদাধরের ভাষায় এই বর্ণ-বহুরূপিতা লক্ষ্য করা যায়। যে ডালে বসেছে, সরীসৃপ সেই ডালের রঙ দেহস্থ করেছে।

নাট্যকার নাটকের শেষ ধাপে মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-প্রহসনের রীতি অনুসরণ করেছেন। সেকালের সংস্কারবাদী নাট্যকারদের মত কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে তিনি নাটক লেখেন নি। তবু কিছু নীতি-শিক্ষা না দিয়ে তিনি ক্ষান্ত হলেন না—

"মশায়, আমার ঘাট হয়েছে—আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, এমন কর্ম আর কখনো করব না।"

নাকে খৎ নাট্যকার নিজে হাতে না দিলেই পারতেন। অনিবার্যভাবে Tartuffe-এর উপসংহার মনে পড়ে। নাট্যকার যা উহ্য রাখেন, দর্শক তা পূরণ করে নেয়। এ ব্যাপারে পুরোনা মতে আমরা এখনও বিশ্বাস রাখি—

"Comedy is not so much obliged to the punishment of faults which it represents as Tragedy."[৪৪]

মাইকেল অবশ্য বুড়ো শালিকের আঙ্গিক অন্যত্র ব্যবহার করেন নি, তাঁর নবকুমারই অন্য উপসংহারে অভিনন্দিত হয়েছে। প্রায়শ্চিত্তের জন্য দর্শকদের তিনি দাঁড় করিয়ে রাখেন নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহ ছিল সংস্কারবাদী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র, আর রামনারায়ণের 'নবনাটকে'র অভিনয়-মঞ্চ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্ভবত এই দুইটি প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

তাঁর তৃতীয় প্রহসন হোল 'হিতে বিপরীত' (১৯০৩), এ গ্রন্থ 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো'র প্রাঞ্জলতর সংস্করণ। সংস্করণান্তরে নাট্যগৌরব বৃদ্ধি পায়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গম্ভীর-নাটকে সে যুগের মুখ্য প্রবণতা থেকে সরে আসছিলেন, আর প্রহসনে তার কাছে এগিয়ে চলেছেন। একদিকে আত্মরক্ষার চেষ্টা, আর এক দিকে আত্মসমর্পণের উদ্যোগ। নাট্যকার-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যক্তি-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতই বে-হিসাবী, অপরিণামদর্শী, ও তাই আত্ম-হননকারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মানময়ী (১৮৮০) বসন্তলীলা, (১৯০০) ধ্যানভঙ্গ (১৯০০) হোল নাটক-পূর্ব নাটক। এ গীতিনাট্যগুলি প্রাচীন ঝুমুর ও নাটগীতির আধুনিক রূপ; ইতালীয় অপেরা নানা দেশ ঘুরে বাংলায় এসে দেখা দিয়েছিল। এগুলির সঙ্গে তার কোন যোগ আবিষ্কার না করাই ভাল। এগুলি নাট্যশালার ইতিহাসে স্থান পাবার অধিকারী, কিন্তু নাটকের ইতিহাসে নয়।

শিশিরকুমার ঘোষ

সাংবাদিক শিশিরকুমার ঘোষ মানবদরদী ব্যক্তি ছিলেন, গরীব প্রজার সমর্থনে সে-যুগে তিনি খুবই উচ্চভাষী ছিলেন। আবার দেশের সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও তিনি লেখনী চালনা করতেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় তাঁর উৎসাহ ছিল; নিজে বাগবাজারের অধিবাসী, উদ্যোক্তাদের অনেকেই তাঁর পরিচিত ও অনুরাগী। একবার ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যও হয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় ঐ মঞ্চের অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ বেরুত। অনেক সময় দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে সংশোধনের উপায় বাতলান হোত।

ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি একখানা নাটক লিখলেন, নাম 'নয়শো রুপেয়া।' সাতুলাল নামক এক গাঁজাখোর এই নাটকের নায়ক, সাতুলালের চালচুলো নেই, গাঁজাখোর; কিন্তু সে সদ্বিবেচক, সহৃদয় ও পরোপকারী। সাতুলাল দীনবন্ধুর নিমচাঁদের আদর্শে কল্পিত। পরবর্তীকালে গিরিশ ঘোষের একাধিক নাটকের উন্‌পাঁজুড়ে বকাটে অথচ সহৃদয় চরিত্রের আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে।[৪৫] বঙ্গদর্শনে এই নাটকের এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচক এই নাটকে মানবহৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতময় পরিবর্তনের কোন চিত্র দেখতে পান নি। তিনি বলেছেন হ্যামলেট, ম্যাকবেথ এবং ওথেলো নাটকেব পাশে কোন বাংলা নাটক স্থান পেতে পারে না। তবু নাটকটি প্রশংসিত হয়েছে, নাটকের ভাষার সারল্যের জন্য। শব্দাড়ম্বর ও অলঙ্কারাড়ম্বর পবিত্যক্ত হযেছে, প্রচলিত বাংলা নাটকে দুইটি দোষ উৎকট আকারে দেখা দিয়েছিল। "তাঁহারা যাহাই করুন না কেন—আমরা তাঁদের কথোপকথনে জালাতন হইয়াছি।'[৪৬]

শিশিরকুমার এর পর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের নিয়ন্ত্রন-অধিকার নিয়ে যে বিতর্ক হয়, তার উপর ভিত্তি করে লেখেন 'বাজারের লড়াই' (১৮৭৪) নামক প্রহসন। পরবর্তী-কালে অমৃতলাল বসু রচিত 'সাবাস আটাশ' প্রভৃতি প্রহসন একই জাতীয় রচনা। শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে বেশি দিন সম্পর্ক রাখতে পারেন নি, ইণ্ডিয়া লীগ ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনা কাজে নিজেকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মে বিশেষ অনুরক্ত হওয়ায় তাঁর সাহিত্যসাধনা গৌরাঙ্গলীলার অমৃতময় কাহিনী বর্ণনাতেই মগ্ন হয়। এই সময়ে পঞ্চঅঙ্কবিশিষ্ট চৈতন্য-লীলা নাটক রচনা করেন। এ নাটক মঞ্চস্থ হয় নি।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী

রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় তদকালের প্রধান নাট্যকারদের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর নামোল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সে-যুগে পেশাদারী মঞ্চের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন; তাঁর চারখানি নাটকই গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়েছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'নন্দবংশোচ্ছেদ' (১৮৭৩) সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের ছায়া-অবলম্বনে রচিত। 'নন্দবংশোচ্ছেদ' লিখে চক্রবর্তীমহাশয় অবশ্য মাইকেল থেকে ভিন্ন প্রকার ট্রাজেডি রচনা করেছিলেন। এখানে নিয়তি ঘটনার নিয়ামক হয়নি; পাপের দণ্ড বিধান করা হয়েছে। এই কারণে 'ভারত সংস্কারকে'র নীতি-বাগীশ সমালোচক লক্ষ্মীনারায়ণকে মাইকেল অপেক্ষা উঁচু স্থান দিয়েছিলেন।[৪৭]

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী 'নন্দবংশোচ্ছেদ'কে বলেছেন 'ঔপন্যাসিক নাটক', ঐতিহাসিক নাটক নয়। এ নাটকে প্রণয় আছে, মৃত্যু আছে, বিষপান, যুদ্ধ-বিগ্রহও আছে। চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ বারবার উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু নাটকে তাঁর শারীরিক উপস্থিতি নেই।

নন্দের ধারণা যে, তার পিতা এক ঘৃণ্য চক্রান্তের ফলে নিহত হয়েছে, সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংবাদ মিথ্যা। শশিপ্রভাকে নন্দ একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে; ফলে পরস্পরের প্রণয়। এদিকে বিজয়বল্লভের পরামর্শে শকার তার মেয়েকে দিয়ে চিঠি লিখিযে নিল যে, নন্দ যেন শশিপ্রভার প্রত্যাশী না হয়। নন্দ তাই ধারণা করল যে, নারী জাতিই এই প্রকার বিশ্বাস-ঘাতিনী। মাকে দেখেছে, এখন শশীপ্রভাকে দেখল। রাজা গেল; খুল্লতাত সর্বার্থসিদ্ধি আর মন্ত্রীর পরামর্শে বিচক্ষণা নন্দের পিতাকে বিষ খাইয়ে ছিল

শেষ পর্য্যন্ত সর্বার্থসিদ্ধি ও বিচক্ষণাকে নির্বাসিত করল নন্দ। শশিপ্রভার সঙ্গে তার বিবাহ হোল; কিন্তু সর্বার্থসিদ্ধির পক্ষীয় শকটার পুত্র বিজয়বল্লভের হস্তে তার মৃত্যু ঘটল; শশিপ্রভাও কি আর বেঁচে থাকতে পারে? সে মৃত নন্দের পায়ের কাছে পড়ে মারা গেল। এইভাবে পাঁচ অঙ্কের নাটক সম্পূর্ণ হোল।

তাঁর অপর ইতিহাস-ভিত্তিক নাটক সেরাজুদ্দৌলা (১৮৭৬) পাঁচ অঙ্কের নাটক; তবে ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য যোগ আছে।

তৃতীয় নাটক হোল কুলীনকন্যা অথবা কমলিনী (১৮৭০); সে যুগে এ নাটক প্রশংসা অর্জন করেছিল। সম্ভবত কৌলীন্যপ্রথার বিরোধী বলেই এই প্রশংসাবাদ।

কুলীনকন্যা নাটকের ভূমিকায় নন্দবংশোচ্ছেদ নাটকের প্রতি সমালোচকদের প্রসন্নতা'য় লেখক আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

ফটিক নামে এক গ্রাম্য যুবা জয়রাম মুখুজ্জের কন্যা কমলিনীকে করায়ত্ত করতে চায়। কিন্তু দিননাথকে কমলিনী ভালবাসে। কিন্তু জয়রাম দিননাথের সঙ্গে কন্যার বিবাহদানে অনিচ্ছুক; তাঁর কথা হোল, "একটা কন্যার সামান্য ঐহিক সুখের জন্য আমি কৌলীন্য মর্য্যাদায় খাট হব? প্রাণ থাকতে তা কিছুতেই হবে না।" (২।৩)

দিননাথ জয়রামবাবুর বন্ধুর পুত্র; মাতৃপিতৃহীন বলে জয়রামবাবুর গৃহে লালিত। সে আইন পড়ে। ফটিকচন্দ্র কমলের আশা ছাড়ে না। সে নানাপ্রকার ফন্দিফিকির আঁটছে; এ ব্যাপারে জয়রামবাবুর পুত্র নিমাই তার সহযোগী।

কমলিনীর বিবাহের কথাবার্তা নানাস্থানে চলবে। দিননাথ হতাশ হয়ে পড়ে; সে কালীপুরে গঙ্গার ঘাটে আত্মবিসর্জন দিতে উদ্যত হয়। বন্ধু তারানাথ তাতে বাধাদান করল।

"দিননাথ, তোমাকে ডাকছে"—এই মিথ্যা কথা বলে চিন্তা নাম্নী এক স্ত্রীলোকের সহায়তায় ফটিক কমলিনীকে বের করে নিয়ে আসে, পাল্কী করে নিয়ে যায় ভৈরবপুর কালীবাড়িতে। আর রটিয়ে দিল যে, দিননাথ কমলকে খুন করেছে। অপহৃতা কমল উন্মাদিনী হয়ে গেল। একদিন ফটিক তার ওপর অধিকার স্থাপন করতে গেল, তখন কমল খাঁড়া নিয়ে তাকে তাড়া করল।

এদিকে তারানাথের সঙ্গে কমলিনীর দেখা হোল; তারানাথ কমলিনীকে তার গৃহে নিয়ে এল। কমলিনী-তারানাথের গৃহে আছে। ওদিকে দিননাথও প্রকৃতস্থ নেই; সে নিজেকে দুষ্মন্ত মনে করে। কাউকে প্রিয়ম্বদা বলে সম্বোধন করছে; গরুকে পর্যন্ত মৃগশিশু বলে সম্বোধন করছে।

জয়রামবাবু ও তাঁর স্ত্রী এত ঘটনার পর বুঝতে পারলে—

"কৌলীন্যে সহিত আমাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ আছে বলুন দেখি!" (৪।১)

"আমি পিতা হয়ে সন্তান হত্যা করেছি।" (৪।১) যাক, যার শেষে ভালো তার সব ভালো। কমলিনী দিননাথের মিলন হোল। আর নাটকের শেষে আত্মজিজ্ঞাসায় চঞ্চল দিননাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করল। এই নাটকের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'র কাহিনী-অংশের খুবই

সাদৃশ্য আছে। আর নাট্যীয় কৌশলের জন্য 'বিধবাবিবাহ নাটকে'র সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি।

চক্রান্ত, উন্মাদ হওয়া—এই সব নাট্যীয় ছলাকলা বিধবাবিবাহনাটকে প্রথম প্রয়োগ করা হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ কৌলীন্য প্রথার কুফল দেখাতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে তিনি সফল হয়েছেন। তবে নাট্যচিন্তায় তিনি নতুন কিছু সংযোজিত করতে সক্ষম হন নি। সে যুগে অবশ্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন, 'ভারত সংস্কারক' তাঁর কুলীনকন্যার প্রশংসা করতে গিয়ে ড্রাইডেন, হ্যাজলিট প্রভৃতির মতামত উল্লেখ করেন।[৪৭]

সুলভ সমাচারেও প্রশংসাব্যঞ্জক সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এই নাটক দর্শনে ও পাঠে "বিশুদ্ধ আমোদ ও সুকীর্তি লাভ করা যায়।" নাটকের নাট্যগত যোগ্যতা বিচারের বিষয় নয়। বঙ্গদর্শন আবার উল্টা দিকে থেকে সমালোচনা করে, "এই নাটকের উপন্যাস পৌরাণিকী ঘটনামূলক নহে। কুলীনকন্যা কমলিনী আধুনিকী, গল্পটিও সুতরাং আধুনিক। গল্পটি শুধু আধুনিক নহে, হাওড়ার ঈশ্বর নাপিতের মোকদ্দমা মূলক।

আমরা গ্রন্থকারকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় কুমারীরা কি কমলিনীকে আদর্শ করিয়া নীতিশিক্ষা করিবে? নায়ক বঙ্গীয় যুবকগণের আদর্শ নহে, কমলিনী কুমারীবর্গের অনুকরণীয়া নহে। নাটকখানিতে বিলাতী সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়াছে, নাটকখানি ভাল নহে।"[৪৯] যে পত্রিকার সম্পাদক 'বিষবৃক্ষ' লিখেছেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখেছেন, তিনি কমলিনীর পছন্দমত স্বামী নির্বাচণ পছন্দ করেন নি। প্রশংসা ও অ-প্রশংসা দুই-ই এলো নাট্য-বহির্ভূত জিজ্ঞাসা থেকে।

ঈশ্বর নাপিতের প্রসঙ্গ নিয়ে কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'নাপিতেশ্বর' (১২৮০) নাটক লিখেছিলেন। ১৮৭৩ সালে তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি গৃহস্থ কন্যা এলোকেশীর উপর অত্যাচার করলে তার স্বামী নবীনচন্দ্র স্ত্রীকে হত্যা করে। বিচারে নবীন ও মাধবগিরি দণ্ডিত হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করে ১৮৭৩ সালে 'মোহান্তের এই কি কাজ'[৫০] নামে এক নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়, এবং প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এর পর সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করার একটা হিড়িক পড়ে যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ সেই উত্তেজক সাহিত্য সৃষ্টির প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী আনন্দ কানন (১৮৭৪) নাম ছোট্ট একটি পদ্যময় নাটক লিখেছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল অপেরা রচনা করা। মাইকেলের 'মায়া কাননে'র প্রকাশনার পর 'কানন' নাম-ধারী বহু নাটকই আত্মপ্রকাশ করে।

হরলাল রায়

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর মধ্যে এযুগের প্রবল ভাববাদ তত পরিস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়নি; তিনি কখনও সেক্সপীয়ার, কখনও সমসাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ মোকদ্দমার প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি ব্যগ্র হয়েছেন। এযুগের প্রবল ভাবাদর্শ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর হরলাল রায়ের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা বেশি পরিস্ফুটিত হয়েছিল।

হরলাল সম্পূর্ণভাবে ছিলেন পেশাদারী থিয়েটারের নাট্যকার। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন হেয়ার স্কুলের শিক্ষক। তাঁর 'হেমলতা' নাটক ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

নাটকের গল্পাংশ কাল্পনিক, যদিও মধ্যযুগের রাজপুতানার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। হিন্দু মেলার ভাবসম্পদ এই নাটকের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

হেমলতা হোল এই নাটকের নায়িকা; সে চিতোরের রাজা বিক্রম সিংহের কন্যা। আর তার প্রণয়ী হোল সত্যসখা, সে উদয়পুরের মৃত রাজা প্রতাপ সিংহের ও রাণী কমলাদেবীর পুত্র। কিন্তু তার পরিচয় বর্তমানে অজ্ঞাত।

হেমলতার সঙ্গী সত্যসখা সম্বন্ধে বলেছে—

"বীরের আকৃতি, বীরের প্রকৃতি, যেন মূর্তিমান বীরত্ব।"(১।১)

মনোহর হোল কুচক্রী, সে ষড়যন্ত্র জাল পাতল। "বলেতে অসাধ্য যাহা সাধ্য শঠতায়। শত শত নমস্কার শঠতা তোমায়।" একদিন উদ্যানে রাজা পরিভ্রমণ করেছেন। এমন সময় রাজাকে হত্যা করার চেষ্টা করল মনোহর-নিয়োজিত এক রক্ষক; সত্যসখার হাতে সেই আততায়ী মারা পড়ল। মিথ্যা সন্দেহে সত্যসখার বিচার হোল;

সত্যসখার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ শুনে হেমলতা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল। এদিকে তেজসিংহ এসে চিতোর দখল করল। তেজসিংহ হেমলতার পাণিপ্রার্থী হোল।

সিন্ধু দেশ থেকে এক দূত এসেছে বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে। সত্যসখার সঙ্গে আর মিলনের কোন সম্ভাবনা নেই ভেবে হিমলতা বিষের পাত্র হাতে করেছে,

এমন সময় নেপথ্যে 'আল্লা হো' ধ্বনি উঠল। হাত থেকে বিষের পাত্র পড়ে গেল। তখন হেমলতা শূন্য পাত্র লেহন করতে লাগল।

সব কিছুর মীমাংসা হোল সত্যসখার বীরত্বে ও সাহসিকতায়। "মা, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষ বলছেন শীঘ্র যাও বিলম্ব করিও না। এই স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারতসন্তান প্রাণত্যাগ করুক।"(৪।২) সে যবনদের পরাজিত করল, যবনদের পরাজিত করার পর সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে গেল, চলে গেল শ্মশানে। সেখানে সে যোগী হয়ে বসল। হেমলতাও সেখানে যোগিনী বেশে দেখা দিল। সেখানেই জানা গেল সত্যসখা সামান্য সৈনিক নয়, সে কমলাদেবীর পুত্র, অর্থাৎ তেজসিংহের উত্তরাধিকারী। শ্মশানেই মিলন হোল।

হেমলতার আখ্যান-অংশ ও নাট্যীয় কৌশলগুলি দীনবন্ধু থেকে গৃহীত—শুধু কিছু কিছু নতুন প্রবণতা সংযুক্ত হয়েছে। নতুন প্রবণতা হোল হিন্দু জাতীয়তাবাদ। দীনবন্ধু নিছকই রোম্যানটিক নাটক লিখেছিলেন। হেমলতা নাটকে ঘটনার আধিক্য আছে; সে যুগের সমালোচনার ভাষায় 'নাটকের উপন্যাস' বড় জটিল হয়েছে। তবে এই জটিল ঘটনার সব কয়টি বাঁকই পূর্ব-পরিচিত। এ নাটক সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের মূল্যায়ন সঠিক: "ইহা নাটক না হইয়াও অভিনয়যোগ্য।"[৪২] হরলাল রায়ের দ্বিতীয় রচনা হোল শত্রুসংহার নাটক (১৮৭৫)। এটি ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের অনুসরণ, অনুবাদ নয়। এ নাটকে কোন নান্দী নেই, নট-নটী, সূত্রধার নেই। ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক সম্পূর্ণ নতুন; ভট্টনারায়ণকে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে অনুসরণ করা হয়েছে। ভাষা কিছু সংস্কৃতধর্মী অন্তত রামনারায়ণ থেকে সাধুতর। হরলাল রায়ের তৃতীয় নাটক হোল 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪)। এ নাটকেও বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

বঙ্গাধিপতি হলেন লাক্ষণ্য সেন, তিনি অতিশয় বৃদ্ধ—'শরীর আত্মার বাসের অযোগ্য হয়েছে।'(১।১) মহেন্দ্র হোল প্রধান মন্ত্রী; সে যখন প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হয়, তখন শৃগাল ডেকে উঠেছিল। লাক্ষণ্য সেনের ভাইপো বিরাট সেন শিকার করতে গিয়েছিল, সেখানে মুসলমান চরের সাক্ষাত পেল। তারা জানাল যে, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজ খবর নিতে এসেছে। কিন্তু তাদের প্রকৃত মতলব ভিন্ন। মহেন্দ্রের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে।

এক অত্যুচ্চ শিখরে উঠেছি, আর একটি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সম্মুখে। কিন্তু সে শৃঙ্গে আরোহন করতে গেলে একটি স্রোত পার হতে হয়—স্রোতের অধিক, ভীষণ জলপ্রপাত।"(১২)

মহেন্দ্রের সহযোগী হোল গোপাল; তাকে পাঠান হোল বক্তিয়ারের কাছে দূত হিসাবে দেশ-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণের জন্য। মহেন্দ্র জানে সে অকূলে ঝাঁপ দিয়েছে; তাই তার হৃদয়ে নানা শংকা।

তুর্কিরা এল, একি আমার পক্ষে অমঙ্গল? না মঙ্গল? আমারই পথ পরিষ্কার করে দিল। ভাগ্য সদয় হলে বিপদ হতেও মঙ্গল হয়।

দূরাকাঙ্ক্ষা, আমি তোমার কাছে আত্মাকে উৎসর্গ করলেন। শান্তি, তোমায় বিদায় দিলেম। গৌরব, তোমার আশা ছাড়লেম। তথাপি বলতে পারিনে সৌভাগ্য উদয় হল কিনা।(১৩)

বক্তিয়ার খিলজী মহেন্দ্রের মতলব জানতে পারল; বক্তিয়ার পররাজ্য দখল করতে এসেছে; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের প্রশংসা করে না, যদিও তাদের সাহায্য গ্রহণ করে। তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা তুঙ্গ স্পর্শ করল; রাজা লাক্ষণ্য সেন যুদ্ধ করতে অসম্মতি জানালেন। বিরাট যেন যুদ্ধ ছাড়া আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক! হরিপ্রসাদ তাঁর সহযোগী।

"বঙ্গরাজ্যে পুরুষ আছে, বাপের বেটাও আছে। তারা যুদ্ধ করবে।"

তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে বক্তিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করল। লাক্ষণ্যসেন পলায়ন করলেন। বক্তিয়ার রাজপুরীতে প্রবেশ করে মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল।

মহেন্দ্র। একি জনাব?

বক্তিয়ার। যে গাছ স্বহস্তে পুতেছ তারই ফল এই। (৩।২)

ওদিকে মোরাদ খিলজী মহেন্দ্রের স্ত্রী সৌদামিনীর প্রতি অত্যাচার করতে গেল। সৌদামিনী কালীনৃত্য করে সে আক্রমণ ঠেকাল—

তোমার পদভরে টলমল ত্রিভুবন মা
জয় কালি জয় কালি জয় কালি মা।

বক্তিয়ার খিলজী হিন্দু রমণীর সতীত্বের প্রশংসা করল। বক্তিয়ার কিন্তু এখনও নবদ্বীপ নগরী দখল করতে পারেনি। রাজপথে লড়াই চলছে। মহেন্দ্রকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হোল; কিন্তু মহেন্দ্র অসম্মত হোল।

বিরাটসেন দেশাত্মবোধক বক্তৃতা দিয়ে নবদ্বীপবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছে। যুদ্ধে বিরাট সেন আহত হবে। তখন বক্তিয়ারের সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটবে।

বিরাট। তুমি কে যে তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে বিদ্রোহ হবে?

বক্তিয়ার। আমি বাঙলার শাসনকর্তা।

বিরাট। না তুমি দেশের স্বাধীনতাপহারক অর্থাৎ দস্যুশ্রেষ্ঠ।

বক্তিয়ার খিলজী বিজয়ী; কিন্তু বীরের সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনা। বিরাটসেন তার কাছ থেকে জানতে পারল যে মহেন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার জন্যই "বঙ্গের সুখাবসান হোল।"

আহত বিরাট মারা গেল। মহেন্দ্র গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল; তার স্ত্রী পূর্বেই উন্মত্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছে।

এই নাটকের গল্পাংশ 'মৃণালিনী'র আখ্যায়িকার ছকে ফেলা। মৃণালিনীর মাধবাচার্য এখানে গোবিন্দ ভট্টাচার্য, পশুপতি ও হেমচন্দ্র হয়েছেন মহেন্দ্র ও বিরাট সেন।

'বঙ্গের সুখাবসান' নাটক আধুনিক রীতিতে লেখা; গল্পাংশে সে-যুগের বিশেষ বক্তব্য অত্যন্ত চড়া সুর পেয়েছে; এবং চরিত্রগুলিও একেবারে ফরমাইজ মত। তাহলে অপ্রয়োজনীয় সঙ্গীত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি; এমন কি হাস্যরস সৃষ্টির জন্যও ইতর কলাকৌশল ব্যবহার করেন নি নাট্যকার। নাটকে গান না থাকার জন্য সে যুগে তাঁকে সমালোচিত হতে হয়েছিল। 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় ১২৮১ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় এই নাটকে গান না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। এবং সতী নাটকের ভূমিকা উদ্ধৃত করে লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। গান একেবারে নেই, একথা ঠিক নয়। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গয়ারামের কুটীরে রামের বনবাস বিষয়ে একটি গান বসান হয়েছে। নাটকের কথাবস্তু তখন যে স্তরে পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে এই বিশেষ গানের সঙ্গতি আছে। আব একটি গান আছে সৌদামিনীর কালীনৃত্যের সময়ে।

তবে একথা ঠিক হরলাল রায় নাটকে গান পরিহার করতেন; তাঁর নাট্যদৃষ্টি ছিল আধুনিক।

হরলাল রায় সেক্সপীয়ার-অনুকরণ করেছেন। তাঁর "রুদ্রপাল" ম্যাকবেথ অবলম্বনে রচিত। অবলম্বন সেক্সপীয়ার হলেও এখানেও হিন্দু মেলার হস্তাবলেপ আছে। যবনরাজ সন্ধি প্রার্থনা করেছেন—মুসলানদের প্রসঙ্গ আছে। হিন্দুয়ানীর জয় ঘোষণা হয়েছে। সূর্যপাল হলেন পঞ্চনদের রাজা; তাঁর অন্যতম সেনাধ্যক্ষ হোল রুদ্রপাল। চতুরিকা হোল তাঁর স্ত্রী। নাট্যকার সূচনায় এইটুকু বাড়তি অংশ দিয়েছেন; পরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে মূল নাটক অনুসরণ করেছেন।

পাঁচ অঙ্কের নাটকের দৃশ্য সংখ্যা রদবদল করেছেন; ১ম অঙ্কে ৭টি দৃশ্যই রেখেছেন; চতুর্থ অঙ্কে একটি দৃশ্য এবং পঞ্চম্ অঙ্কে দুইটি দৃশ্য কমিয়েছেন। witchদের তিনি ভৈরবী করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

Act II/Scene II.

Enter Macbeth

Macbeth. I have done the deed. Didst thou not hear a noise !

Lady Mac. I heard the owl scream and the crickets cry. Did not you speak ?

M. When ?

Lady M. Now.

M. As I descended.

Lady M. Ay.

Mac. Hark !

Who lies in the second chamber ?

দ্বিতীয় অঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক

[রক্তমাখা তরবারি হস্তে রুদ্রপালের প্রবেশ]

রুদ্র। করেছি, কোনও শব্দ শোননি ?

চতু। পেঁচার ডাক আর বাতাসের শব্দ। তুমি কথা কইলে না ?

রুদ্র। কখন ?

চতু। এই এখন।

রুদ্র। যখন নেমে আসি ?

চতু। হাঁ।

রুদ্র। ঐ শোনো—ও পাশের ঘরে শুয়ে কে—

সেক্সপীয়রের অনুবাদে সেক্সপীয়র হাজির নেই। শুধু গল্পরসই এ-অনুবাদে ধরা পড়েছে।

হরলাল রায় অভিজ্ঞান শকুন্তল অবলম্বনে কনকপদ্ম (১৮৭৫) রচনা করেছিলেন। এ নাটকও অন্যান্য নাটকের মত পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। কনকপদ্ম মধ্যস্থ পত্রিকায় প্রশংসিত হয়েছিল।[৪২]

'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'-এর লেখক হরলালের নিন্দা করেছেন; সম্ভবত হরলালের ইংরেজীধর্মী বাক্য গঠনপ্রণালী সেকালে সমালোচনার বস্তু ছিল।

ঐ জাতীয় কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধার করা গেল।

হেমলতা :

বীরের আকৃতি, বীরের প্রকৃতি, যেন মূর্তিমান বীরত্ব। (১।১)

ধর্ম নাম মাত্র ; মূর্খেরা তার বশবর্তী হয়ে বিপদে পড়ে ; চতুর লোকে তা উল্লঙ্ঘন করে সম্পদলাভ করেন। (১।২)

শিলা বৃষ্টি শুধু লতায় নয়। বড গাছকেও আহত করেছে। (২।১)

বাক্যের দ্বারা কার্যের কালী ঢাকা পড়লো। (২।৫)

আমার লজ্জার প্রতিমা রাজসভায় কি জন্য ? (২।৫)

ইহাতে অযথার্থ্যের আঁশ মাত্র নেই। (৪।৪)

আমি এসেছি অপরিচিত, যদি বেঁচে থাকি যাবও অপরিচিত। (৪।৪)

বঙ্গের সুখাবসান

মূর্খ যেখানে কিছুই দেখে না, সুবোধ ব্যক্তি যেখানে সহস্র পন্থা আবিষ্কার করে। (১।২)

ধরতে গেলেন, স্পর্শ করলেন, আর নাই। আমার প্রতিজ্ঞা চলে গেল, স্পর্শমাত্রেই চলে গেল। (২।১)

ভাগ্য সদয় হলে বিপদ হতেও মঙ্গল হয়। (২।৩)

তোমার বাক্য আমার অশ্রু আকর্ষণ করছে। (৫।১)

শত্রুসংহার, রুদ্রপাল ও কনক পদ্ম তাঁর অনুবাদমূলক নাটক ; সুতরাং ঐসব নাটক থেকে উদাহরণ দেওয়া হোল না।

এই ইংরিজি বাক্‌ভঙ্গিই 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'-এর লেখকের উষ্মার কারণ হয়েছিল। "পটলডাঙ্গার শিক্ষক উপর্যুপরি চারিখান অসার নীরস কর্ণোৎপীড়ক নাটক রচনা করিয়াছেন।"[৫৩]

হরলাল রায়ের নাটকে যুগের স্বদেশ-চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ ছিল। এবং এই কারণে শাসক মহলে তাঁর অখ্যাতি ছিল।

"১৮৭৫ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে আমি তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গভর্ণর স্তার রিচার্ড টেম্পল দ্বারা বেলভিডিয়ার ভবনে সান্ধ্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হই। ঐ সম্মিলনে সকল প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থাকারদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সকল গ্রন্থকর্তা অপেক্ষা মনোমোহন বসু ছোটলাট সাহেবের নিকট অধিক আদর প্রাপ্ত হইলেন। .....হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষক হরলাল রায়ের প্রণীত 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকের কথা পাড়িয়া ছোটলাট তাঁহাকে উপহাস

করিতে লাগিলেন। সেই নাটকে হরলালবাবু কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা স্পৃহা প্রকাশ করাতে ছোটলাট সাহেবের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন।"৫৪

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধাব নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের অনুজ; তিনি নিজেও ন্যাশনাল থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা ছিলেন। নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় রজনীতে তিনি বিন্দুমাধবের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর দুইখানি নাটিকা 'ভারত মাতা' (১৮৭৩) ও 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। এবং হিন্দু মেলায় প্রদর্শিত হয়। 'ভারতমাতা' নবগোপাল মিত্রের এক ইংরাজি রূপক অবলম্বনে রচিত। ন্যাশনাল পেপারে এই রূপকটি প্রকাশিত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাবার কথা আছে নাটকে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার জন্য যে দেশী painting-এর ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতেও এই প্রসঙ্গ ছিল।

"মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানিয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—উল্টে রাখ উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করাইয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি করাইয়াছ? ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল।৫৫

ছবিখানা উল্টে দিলেই সত্য চাপা থাকে না। হিন্দু মেলায় পঠণার্থ রচিত একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা গেল,

"আসুন আমরা এই প্রস্তাবিত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষীয় মেলায় একত্র মিলিত হইয়া একতানে সমস্বরে একবার ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের অপহৃত স্বত্ব যাজ্ঞা করি। ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত ক্রন্দন কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবে না।"৫৬

ভারত মাতা হোল 'মাস্ক' জাতীয় রচনা; এ হোল নাটক-পূর্ব নাটক। অনেকটা অসমীয়া সাহিত্যের অংকীয়ানাট বা পুরুলিয়ার লোক-নৃত্যের মত। অভিনয়ে অঙ্গ-ভঙ্গী ও সঙ্গীতই প্রধান, সংলাপের স্থান গৌণ।

কিরণচন্দ্রের দ্বিতীয় রচনা 'ভারতে যবন' (১৮৭৬) একই প্রকার রচনা। এগুলি জাতীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ভাষা দিয়েছে; নাট্যসাহিত্যের বিকাশে বা শ্রীবৃদ্ধিতে কোন ভূমিকা পালন করেনি।

প্রমথনাথ মিত্র

প্রমথনাথ মিত্রও (১৮৫৬—১৮৮৩) ছিলেন নাট্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত, তিনি ছিলেন বীণা রঙ্গমঞ্চের কর্ণধার কবি-নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের বন্ধু।

প্রমথনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের রোম্যানটিকতাকে মূলধন করে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথম নাটকে 'নগনলিনী'তে শুধুই প্রেম ও পরিণয়ের প্রসঙ্গ। এক রাজপুতরাজার মেয়ে হোল ইন্দুমতী; তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় জেরুয়া পর্বতের রাজা সুখনাফো। ইন্দুমতী ভালবাসে সমরেন্দ্র সিংহকে, সমরেন্দ্র সিংহ আলাউদ্দীনের হিন্দু সেনাপতি। তার পর নানা কাঠখড় পুড়িয়ে লেখক নায়ক-নায়িকার মিলন সাধন করলেন। এই নাটকের আখ্যায়িকা শশিচন্দ্র দত্তের 'Stray Leaves'-এর একটি গল্প থেকে নেওয়া। নাটকের কাহিনীবিন্যাসে মনোমোহন বসুব প্রণয়পরীক্ষার প্রভাব আছে।[৫০] প্রমথনাথের দ্বিতীয় নাটক হোল জয়পাল (১৮৭৬)।

জয়পাল যবনদের হাতে পরাজিত হয়েছিল, এই হোল কাহিনী। জয়পালেব কন্যার নাম হোল স্বর্ণকুন্তলা; সে ভালবাসত বিজয়কেতুকে। কিন্তু বিজয়কেতু হোল জয়পালের মৃত ভ্রাতা বীবপালের কন্যা, ছদ্মবেশিনী বিজয়া। রাজা জয়পালের ইচ্ছা স্বর্ণকুন্তলা তাঁব বর্ষীয়ান সেনাপতি সমবেন্দ্রসিংহকে বিবাহ করে। কিন্তু তা হবার নয়। সুলতান মামুদের আক্রমনে সব সমস্যাব মীমাংসা হয়ে গেল। সংগ্রাম সিংহ, বিজয়কেতু ওরফে বিজয় সকলে মারা গেল। বিজয়কেতু পুরুষ নয় জেনে স্বর্ণকুন্তলার মন খারাপ হয়ে গেল। পরে জয়পাল ও তার পত্নী আত্মাহুতি দিলে স্বর্ণকুন্তলা আত্মাহুতি দেবে। মরবার সময় তাব যে উক্তি তাতে নতুনত্ব আছে—

> মানবগুলো পতঙ্গ, আলো দেখছে, আর ঝুপ ঝুপ করে পড়ছে। হা হা হা বেশ আলো; ঐ সুশীতল অগ্নি-সরোবব হতে আমি একবার স্নান করে আসি। [চিতাগ্নির মধ্যে পতন]

'নগনলিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গর্বভরে লিখেছিলেন—"পাঠকগণ, নগনলিনী নাটক মধ্যে 'জয় ভারতের জয় নাই', 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই, 'হায় স্বাধীনতা!' নাই, ফোর্ট উইলিয়াম নাই, পিস্তল, বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই; ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্যের বিষয়!" সেই নাট্যকার যখন 'জয়পাল' লিখলেন, তখন আমরা কিন্তু 'বড় আশ্চর্যের বিষয়' বলতে পারি না; কারণ ঐ যুগের সর্বাত্মক প্রভাব

ছিল একটি মাত্র ভাবাদর্শের। লেখক সেখানে আত্মসমর্পণ করে অন্যায় করেন নি।

জয়পাল নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝখান পর্যন্ত শুধু প্রণয়সমস্যা। কিন্তু মামুদের আক্রমণ শুরু হতেই নাটকের সুর বদলে গেল। ৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে নন্দন কাননের দৃশ্যে অপ্সরীদের মুখেই ভারতগৌরব গান শোনা গেল। স্বর্গে ভারত-রাজলক্ষ্মীকে সবাই প্রণাম করল। ৪র্থ অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে সংগ্রাম সিংহ উদ্দীপনা সঞ্চার করছে 'জয় ভারতের জয়! ভারত স্বাধীন' এইসব ধ্বনি দিয়ে। ৫ম অঙ্ক ১ম দৃশ্যে স্বর্ণকুন্তলা তরবারি হাতে নৃত্য করতে করতে যবনদের আক্রমণ করল। গান গাইল—

আয় আয় আয় রে যবন
একে একে সবে দে যা জীবন
পূজব মায়ের রাঙা চরণ,
ম্লেচ্ছ রক্তে মন সাধে।

অনন্ত পাল (৫।৩) নাটকের শেষ দৃশ্যে আবার উদ্দীপনা সঞ্চার করবেন, ভারতগৌরব গাথা গাইবেন।

অতএব প্রমথনাথের মত রোম্যানটিক নাট্যকারও দেশপ্রেমিক বা যবন-বিরোধী নাট্যকার হয়ে উঠলেন। তবে নাটক হিসাবে এগুলির মূল্য কতটুকু, তা আলোচনা না করাই ভালো।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত

প্রমথনাথ মিত্রের মত আর এক নাট্যকার হলেন উমেশচন্দ্র গুপ্ত। তিনি শুরু করেছিলেন রোম্যানটিক নাটক নিয়ে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নাটকগুলি ইতিহাস অবলম্বনে সে-যুগের হিন্দু মেলার ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। নাটক হিসাবে এগুলির কোন মূল্য নাই। তাঁর 'হেমনলিনী' নাটক রোমিও জুলিয়েটের আখ্যায়িকা অনুসরণ করেছে। তবে পিতা যশোবন্ত সিংহ শেষ দৃশ্যে যেভাবে উন্মত্তবৎ আচরণ করেছে, তার সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর ভীম সিংহের আচরণের সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় নাটক বীরবালা (১৮৭৫) তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক; 'পুরুবিক্রমে'র মত এর আখ্যায়িকা গ্রীক-ভারত-সংঘর্ষ। সেলুকসের সঙ্গ চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষকে অবলম্বন করে নাটক লেখা; সেল্যুকস হয়েছেন শিলবক্ষ; তাঁর এক কন্যা আছে। তার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ হবে। চন্দ্রগুপ্তের মায়ের

নাম হোল দিগম্বরী। বীরবালা প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের প্রকৃতি-লতাপাতা-ফুল ভালবেসে ফেলেছে। পিতা শিলবক্ষ আহত হলে সে নিজেই তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে চাইল; কিন্তু নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চন্দ্রগুপ্ত অনিচ্ছা জানালে সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ল।

চন্দ্রগুপ্তের মুখে নাট্যকার ভারত গৌরবকথা বসিয়েছেন। একটি গানও আছে—"বিজয় নিশান উড়াও ভারতে।" তৃতীয় নাটক হোল মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৬)। শিবাজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজীর ব্যর্থতা এই নাটকে দেখান হয়েছে। নাটক হিসাবে তাঁর কোন গ্রন্থেরই কোন মূল্য নেই।

উপেন্দ্রনাথ দাস

এ ব্যাপারে সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ দাস (১২৫৫—১৩০২)। তখনকার উগ্র জাতীয়তাবাদ তাঁর হাতে পড়ে ইতিহাসের সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগে প্ররোচিত হোল; শুরু করল বাস্তব বাংলার কঠিন মাটিতে পদচারণা। তাঁর নাটকে সব ঘটনাই ঘটেছে উনিশ শতকের সত্তর দশকে, দূর বা নিকট মধ্যযুগে নয়, সব ঘটনা ঘটেছে কলকাতায় বা চুঁচুড়ায়, চিতোরে নয়, মগধে নয়, বা নবদ্বীপে নয়।

মনে পড়ে হেয়ার স্কুলের শিক্ষকের কথা। 'বঙ্গের সুখাবসানে' তিনি স্বাধীনতা ও স্বদেশপ্রীতির কথা বলেছেন। তাই লাট সাহেবের কাছে আপ্যায়নের স্থলে তাঁর ভাগ্যে জুটল উপহাস।

উপেন্দ্রনাথ ঘটনাকে মধ্যযুগ থেকে টেনে আনলেন হাবিল কলকাতায়, তাঁর বক্তিয়ার হোল ম্যাকক্রণ্ডেল, তাঁর বিরাট সেন হয়েছেন শরৎকুমার। আর তাতেই আর উপহাস নয়, নেমে এল দমননীতির খড়্গ। উপেন্দ্রনাথ বৃটিশ শাসনের সদাশয়তার আব্রু ফাঁসিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর বাপের বয়ে-যাওয়া ছেলে; বাপের বয়ে-যাওয়া আর এক ছেলে বাংলাকাব্য ও নাটকে অক্ষয় কীর্তির অধিকারী। সে শক্তি ও সাধনা উপেন্দ্রনাথের ছিল না। বয়ে-যাওয়া ছেলেকে মানুষ করার জন্য তাঁকে বিলেতে পাঠানো হোল 'ব্যারিষ্টার' হবার জন্য। সে-যুগের সফলতার দৌড়! সত্তর দশকের পূর্বেই উপেন্দ্রনাথ নব্য যুবকদলের একজন নেতা ছিলেন; "হাইকোর্টের উকীলবাবু শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস তখন কলিকাতায় যুবক রিফর্মারদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।"[৫৮]

প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হলে (১৮৬৮) উপেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন এক বিধবা মহিলাকে। সে বিবাহ ছিল বড়ই রোম্যানটিক। একবার মাদ্রাজ পর্যন্ত তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ফিরে এসে ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল লীগ নামে একটি সভা স্থাপন করে নিজেই তাঁর সভাপতি হয়ে বসেন। পরে ১৮৭৫ সালে নবেম্বর মাসে তিনি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ডিরেক্টার রূপে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তাঁব 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক প্রকাশিত হয়েছে; ১৮৭৫ সনে ১৫ই আগষ্ট বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে প্রথমে 'সুরেন্দ্র-বিনোদনী', পরে 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

উপেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন; তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। যখন ব্রাহ্ম বিবাহ বিল নিয়ে আন্দোলন চলছিল, তখন তিনি কয়েকজন যুবকসহ ষ্টিফেন সাহেবের কাছে দরবার করেছিলেন। "এমন সময়ে বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ কতকগুলি সংশয়বাদী ষ্টিফেন সাহেবের কাছে এইরূপ আবেদন করিলেন যে, সংশয়বাদীরা যদি কোন ধর্মের সঙ্গে সংশ্রব না রাখিয়া বিবাহ করেন তাহা হইলে সে বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমত আর একটি আইন করা উচিত।"[৫৯]

তিনিই প্রথম অভিনেত্রীব বিবাহ দেন; বেঙ্গল থিয়েটারের গোলাপ-কামিনীর সঙ্গে গোষ্ঠবিহারী দত্তের বিবাহ হয়। গোষ্ঠবিহারী নিজেও একজন অভিনেতা ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে বিলাত গেলে ইনিও জাহাজের খালাশী হয়ে বিলাত চলে যান।

উপেন্দ্রনাথ অস্থির, নতুনত্ব-অভিলাসী ও কর্মচঞ্চল ব্যক্তি ছিলেন।

তদকালের বিচক্ষণ সাংবাদিকেবা উপেন্দ্রনাথকে অপরিণামদর্শী যুবক বলে ভৎর্সনা করেছেন। উপেন্দ্রনাথ মাইকেল মধুসূদনের ক্ষুদ্র সংস্করণ, মানসিকতায় ও জীবনচর্যায়। প্রভেদ শুধু শক্তির তারতম্যে।

উপেন্দ্রনাথ চিন্তায় ছিলেন সংস্কারবর্জিত, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলী অবিমৃষ্য-কারিতা তাঁর ছিল না। "উপেন্দ্রনাথ সুরাপান করিতেন না, সুরা দূরে থাক, চুরুট পর্যন্ত কখনও খাইতে দেখি নাই।"[৬০] অভিনেত্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন; কিন্তু অন্যান্য মঞ্চাধ্যক্ষদের মত তিনি অভিনেত্রীব গৃহে গিয়ে সন্ধ্যাযাপন করতেন না।

মোটের উপর পেশাদারী মঞ্চে তিনি যোগদান করেছিলেন একটা আদর্শবাদের তাড়নায়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর

আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা রঙ্গমঞ্চই সরবে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল, এ কথা বলেছেন স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল।[৬০]

"পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই দুইখানি নাটকের (শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী) অভিনয়ে আমাদের জাত্যাভিমান কতটা পরিমাণে যে জাগিয়াছিল তাহার ঠিক ওজন করা কঠিন।"[৬১]

শরৎ-সরোজিনী

উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটক হোল শরৎ-সরোজিনী (১৮৭৪)। দুর্গাদাস দাস এই ছদ্মনামে তিনি এই নাটক প্রকাশিত করেন।

"শরৎ-সরোজিনী সময়চিত্রের একদেশ মাত্র। তাহাও তুলিকা বিন্যাস দোষে অসম—কোনস্থল বা হীনপ্রভ, কোনও স্থান বা অতিরঞ্জিত। অধিক কিছু বলিতে চাহি না—চিত্রকর মৃত, কিন্তু আলেখ্যটি সূর্যালোকে আনীত না হইলেই ভাল হইত। প্রথম তৃতীয়াংশ একেবারে নীরস, অবশিষ্ট অশ্লীলতাদি কলঙ্ক পরিস্ফুট। রসবিগর্হিত রাজনিন্দারও অসদ্ভাব নাই। আমার বিবেচনায় 'শরৎ সরোজিনী' অতি উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে—এক বা অর্ধ পৃষ্ঠা মাত্র পাঠ করিয়া অক্লেশে ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারা যায়। সর্বত্র সমভূমি।"—বিজ্ঞাপন। এইভাবে উপেন্দ্রনাথ নিজের লেখা নিয়ে নিজেই করেছেন কৌতুক। ছয় অঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটক।

শ্রীনাথবাবুর বাড়ি থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষের বিজ্ঞানসভা। নাটকের সূচনা হোল এই সভা নিয়ে রহস্যালাপ করে। তাঁর নাটক যে ভিন্ন শ্রেণীর নাটক, একথা সূচনাতেই বলে নিলেন উপেন্দ্রনাথ।

"আমাদের নাটক-লেখকরা আর অভিনেতারা এক প্রণয় নিয়েই ব্যস্ত। তাঁদের আদিতে প্রণয়, মধ্যে প্রণয়, অন্তে প্রণয়। পচা পুরান পদ্ধতিতে অভিনয়মঞ্চে আজকাল প্রণয়ের শ্রাদ্ধ করা হয়, তাতে কি উপকার দর্শে? সেই কোকিল, সেই চন্দ্র, সেই রতিপতি, সেই পঞ্চশর, সেই বসন্তকাল, সেই মলয় পবন—আর যার নাম শুনলে গায়ে জ্বর আসে সেই মানভঞ্জন। বন্ধুবর নবগোপালবাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল, বলতে হাসি পায়, তিনি বলেন কি, যে আজকাল কি অভিনয় হয়, না—'বিধুমুখি, তোমার মুখ-চন্দ্র দেখে আমার মন-পুষ্প প্রস্ফুটিত হল।"[৬২]

নায়ক হলেন শরৎকুমার, তিনি উচ্চশিক্ষিত যুবা। দেশোদ্ধার করাই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে প্রণয় মানুষের প্রধান মনোবৃত্তি নয়। "পশুদের হতে পারে, মানুষের নয়—অন্তত হওয়া উচিত নয়। আর তাই যেন হল, প্রণয়মত্ত হবার এই কি সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্রি শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হচ্ছে না? শরীর উন্মত্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা। অন্য অভিলাষ।" (শরৎ ১।১)

"আমাদের শিক্ষিত যুবকদের যত্ন, অধ্যবসায়, তেজ, দেশহিতৈষিতা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেই একেবারে অন্তর্ধান হয় কেন? এক প্রণয়ই সব গ্রাস করে। প্রণয়ই আমাদের দেশের সর্বনাশ করলে।" (৩।১)

সে যুগের নাম-করা পত্রিকার সমালোচনার প্রতিধ্বনি এটা—"আদি রসে দেশ প্লাবিত হইয়াছে এবং ইহাতেই সমুদায় উৎসন্ন যাইতেছে। আজ আদিরস বিষতুল্য বোধ হয়। ভারতবাসির মুখে হাসি দেখিলে আমাদের কান্না পায়। এখন আমাদের হাসির সময় নয়, রসিকতার সময় নয়, এখন আমাদের কালাশৌচ ঘটিয়াছে।"৬৩

শরৎকুমারের এক ভগ্নী আছে, আর আছে এক আশ্রিতা তরুণী। সে শরৎকে ভালবাসে। কিন্তু শরৎ সে ভালবাসার প্রশ্রয় দেয় না।

নাটকে কেন্দ্রীয় ঘটনা শরৎ-সরোজিনীর ঘটনা; কিন্তু নাটকে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে শরৎকুমারের ভগ্নী সুকুমারীকে নিয়ে। তাকে মতিলাল নামে এক পাষণ্ড কামনা করে। মতিলাল ভাইকে হত্যা করে সম্পত্তি দখল করেছে, তার সঙ্গে দখল করেছে ভ্রাতৃবধূকে। কিন্তু কিছুকাল উপভোগের পর বিস্বাদ লাগছে ভুবনমোহিনীকে; সে চায় সুকুমারীকে দখল করতে। মতিলাল ডাকাত পাঠিয়ে সুকুমারীকে দখল করতে গেল। দুইটি পিস্তল নিয়ে শরৎ দেশী ডাকাতদের হটিয়ে দিল; একজন গোরা ডাকাতকে মেরে ফেলল। কিন্তু দ্বিতীয় গোরা ডাকাত শরৎকে কাবু করে ফেলল; শরতের মৃত্যু সুনিশ্চিত, তখন সরোজিনী শরতের পিস্তল দিয়ে দ্বিতীয় গোরা দস্যুকে হত্যা করল। কাহিনী এইভাবে ক্রমাগত একটির পর একটি উত্তেজক ঘটনার উপর ভর করে এগিয়ে চলল; শেষ পর্যন্ত সুকুমারী ও বিনয়ের বিয়ে হবে; মতিলাল তার কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। যে ভ্রাতৃবধূর ধর্ম সে নাশ করেছিল, তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। শরৎ-সরোজিনীর মিলন হবে। শরৎ উপেন্দ্রনাথের আদর্শবাদের অনেকখানি

প্রতিনিধিত্ব করেছে। শরৎ কমটেভক্ত। এক বিতর্ক-সভায় শরৎকে কমটে (Comte) প্রসঙ্গ উচ্চারণ করায় সভাপতির গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল।

"কিন্তু আমি শরৎবাবুকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তিনি যেন আর কখন সভার মধ্যে কমটের ন্যায় ঘোর নাস্তিকদের নাম না করেন। নাস্তিকের নাম উচ্চারণে পাপ, শ্রবণে পাপ।" ৩।৪

খুনখারাপি-রাহাজানি-চক্রান্ত প্রভৃতির ফলে নাটক অনেকখানি গোয়েন্দা-গল্পের মত রোমাঞ্চকর হয়েছে।

রাজমহলে একদল মুসলমান চক্রান্তকারীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়। তারা ভারতবর্ষে মুসলমান-আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাবে; মুসলমান-ইংরেজ রাজত্বের তুলনামূলক বিচার হোল সেখানে। এখানে উপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের অনুরূপ।

শরৎ-বিনয় ও সুকুমারী-সরোজিনী-হোল সেকালের আদর্শ চরিত্র। রমা-সুন্দরী তাই বলেছেন, "বাবা লোকে বলে না মলে স্বর্গ দেখা যায় না। কিন্তু, বাবা, যার এমন দুই ছেলে আর দুই মেয়ে আছে, তার এইখানেই স্বর্গ।" তদুত্তরে শরৎকুমারের দেওয়ান ভগবানচন্দ্র বললেন—স্বর্গ না হোক, পরীস্থান দেখুন।

হিন্দু মেলার যুগে পরীস্থানেও ভারত-চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। পরীরা নৃত্য সহযোগে গাইল,

"তোমাদের নিজদোষে, আছ সবে, পরবশ ও হীনবল, অপযশে ত্রিজগতে পূরিল। নরনারী পরস্পরে ভারত উদ্ধার তরে। উদ্যোগী হও যত্ন ভরে, হও না তায় শিথিল॥" সে যুগের সৌখীন জাতীয়তাবাদ বড় চড়া সুরে আত্মপ্রকাশ করেছে এই নাটকে। তাই বান্ধবে বলা হোল, "বাঙ্গালায় নীলদর্পণ ভিন্ন আর কোন নাটকে এইরূপ রুদ্র বর্ণনা আছে কিনা, আমরা জ্ঞাত নহি।" ঠিক এই প্রকার সুর বেজেছে সোমপ্রকাশের সমালোচনায়—

"উপেন্দ্রনাথের প্রণীত নাটকের একটি বিশেষ গুণ এই স্বগ্রন্থে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্যাদির রসের সমাবেশ করিয়া পাঠকগণকে বিশুদ্ধ আনন্দ সুখে আনন্দিত করা তাঁহার নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে।"

নাটকের বিষয়বস্তু উপেন্দ্রনাথ বদলে দিলেন। বিধবাবিবাহ নাটকে সমাজ প্রসঙ্গ ছিল, নয়শো রূপেয়া, কমলিনী বা কুলীন কন্যা, লীলাবতী, মোহন্তের এই কি কাজ প্রভৃতি মঞ্চ-অভিনীত নাটকে সমাজপ্রসঙ্গ ছিল, কিন্তু এই সব নাটকের সমাজ-প্রসঙ্গ পারিবারিক বা ব্যক্তিক অন্যায়অবিচারের কথা বলেছে।

রাজনৈতিক প্রশ্ন সযত্নে পরিহার করেছে; এ যেন কেশবচন্দ্র সেনের সংস্কারবাদী আন্দোলনের নাট্যরূপ। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ নাটকের এই সংকীর্ণ সমাজবোধের অবসান ঘটালেন। নাটকের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হোল।

অবশ্যই উপেন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের আঙ্গিকে নাটক লেখেন নি; অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকলে নাটক হয়, একথা কেউ সে-যুগে বিশ্বাস করতেন না। শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র-বিনোদিনী—উভয় নাটকেই জার্মান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে; সেখানে ঘটনার প্রাবল্যই বড় কথা। জার্মানীর 'Sturm und Drang' আন্দোলনে যে সব চড়া সুরের কলাকৌশল অবলম্বিত হোত, উপেন্দ্রনাথ নাটকের অবয়বে ও ভাষায় সেই একই প্রকার আতিশয্যময়তা আমদানী করেছেন। তাঁর নাটক হোল বক্তব্য-প্রধান, জার্মান আদর্শবাদের মত তিনিও হিন্দু মেলার জাতবৈরের উত্তাপে নাটকের শরীর তপ্ত করে নিয়েছেন। শিলারের (১৭৫৯- '৮০৫) Die Rauber (১৭৮১), নাটকের ঘটনা-বাহুল্যের সঙ্গে তাঁর নাটকদ্বয়ের মিল আছে।[৬৪] বোহিমিয়ার অরণ্যে আত্মগোপন করে অভিজাতবংশীয় তরুণ যুবক ও ছাত্রেরা দেশ ও দশের হিতসাধন করতে চেয়েছিল। তাদের নেতা কার্ল মুর গরীবের উপকার করার জন্য চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনেও পিছপা হননি। উপেন্দ্রনাথের নাটকের নায়কেরা একইপ্রকার আদর্শবাদী ও দেশহিতৈষী হওয়া সত্ত্বেও এতটা রোম্যানটিক হতে পারেনি। উপেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থার মূল্য দিয়েছেন। তাঁর নাটকের নাটকীয় উত্তেজনা বেড়েছে ইংরেজ ও বাঙালীর সংঘর্ষে। এক্ষেত্রে তিনি নাট্যীয় সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। বোধ হয় নীলদর্পণনাটক তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সে-যুগের সমালোচকেরা নাটকের এই ভিন্ন প্রকার রীতি সমর্থন করতে পারেন নি। সেক্সপীয়ার-পড়া সমালোচকেরা অন্তর্দ্বন্দ্বই নাটকের একমাত্র উপজীব্য বলে মনে করতেন। সাধারণীসম্পাদক শরৎ-সরোজিনী সমালোচনাচ্ছলে বলেছিলেন "উপন্যাসাদি নাটকের দেহ বটে, তাহার প্রাণ নহে। নাটকের প্রাণ অন্তর্বেদ (passions)। অন্তরপ্রকৃতির দ্বারা অন্তরপ্রকৃতি কিরূপ চালিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই নাটককারের প্রধান কার্য।"[৫৭] 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐ নাটকের "বীররস উদ্ভাবন" প্রয়াসের প্রশংসা করা হয়।[৫৮] সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের নাটীয় সংঘাত কেন্দ্রীভূত হয়েছে সুরেন্দ্র ও লম্পট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেলের পারস্পরিক সংঘর্ষে। এখানেই

জাতিবৈরের সূচনা। সুরেন্দ্রের ভগিনী বিরাজমোহিনীর উপর সাহেব জঘন্য অত্যাচার করতে উদ্যত হয়। তারপরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সাহেব নিহত হোল; বিরাজমোহিনীর উদ্ধার হোল। শেষ পর্যন্ত প্রথম নাটকের মত এখানেও জোড়ায়-জোড়ায় মিলন হোল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর মিলন হোল, মিলন হোল হরিপ্রিয়ের সঙ্গে বিরাজমোহিনীর। নাটকে লেখক উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙ্গালী তরুণতরুণীব আদর্শ চিত্র দিয়েছেন। বিপরীত পক্ষে অত্যাচারী ইংরেজ আমলাগোমস্তার চিত্রও অবাস্তব নয়। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কাহিনী সত্য।

দুইটি নাটকেই নাট্যকার ঘটনার মধ্যে একটা দারুণ গতি সঞ্চার করেছেন: পূর্বে অনেক ক্ষেত্রে নাটককে শব্দের খেলা মাত্র মনে হোত। বঙ্গদর্শনেব সম্পাদক লিখেছিলেন, "যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত এবং অভিনয়োপযোগী তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এদেশের লোকেব সাধারণত উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে।"[৫৯] পরিবর্তে তাঁব নাটকে পেলাম ঘটনার প্লাবন। বাংলা নাটকেব তিনি হলেন 'পাঁচকড়ি দে'। খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু অর্থ নয়।

উপেন্দ্রনাথের নাটক ও জাতীয়তাবাদী সমাজ

এতকাল সকলেই জাতীয়তাবাদী ছিলেন; কিন্তু সুরেন্দ্র-বিনোদিনী মামলা চলাকালে দেখা গেল যে, ইংরেজ সরকারের সঙ্গে মৃদুতম সংঘর্ষের সম্ভাবনাতেই তাঁরা কত বিচলিত হয়ে পড়েন!

সাধারণী (১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন) 'অসাড় বাঙ্গালি' প্রবন্ধে লিখছিলেন, "নাট্যমন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও বাঙ্গালিদিগের অসাড়তা দূরীভূত হইতে পারে।"[৬৫]

অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে গেল, তখন অবশ্য লিখলেন, "ভারতের গলদেশে আর একটি পাশ অর্পিত হইল।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখলেন, "নৃত্যগীত তামাসা, যাত্রা, পাঁচালী, নাটকাভিনয়ের সময় ভারতে উপস্থিত হয় নাই, এমন সময় এরূপ আমোদআহ্লাদ মত্ততার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।"[৬৬]

ভারত-সংস্কারক আদিরসপূর্ণ নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তুফান তুলে বলেছিলেন, "এখন আমাদের কালাশৌচ ঘটিয়াছে।"[৬৭] শরৎ-সরোজিনী—নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "গ্রন্থখানি নাটকাকারে না

লিখিলেই ভাল হইত।"[৬৮] কিন্তু অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থন করতে গিয়ে এই সব সদিচ্ছা ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করেছেন।

"এখন ইংরাজ রাজ্যে বাস করিয়া অভিনয় স্থলে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করা হইবে, যুবরাজকে জঘন্যভাবে প্রদর্শন করা হইবে, গভর্ণমেণ্টের কথা দূরে থাকুক, ভদ্ররুচিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিরই ইহা সহ্য হইতে পারে না। বঙ্গ নাট্যসমাজের অধিনায়ক হইতে গিয়া যাঁহারা নাট্য সমাজকে এইরূপে ঘৃণিত, অপমানিত ও দণ্ডার্হ করিলেন, তাঁহারা বাস্তবিক সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। যাহা হউক রাজবিধি দ্বারা নাট্যশালার উন্নতি কথঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইলেও আমরা ইহা আপাততঃ দেশের পক্ষে কল্যাণকর জ্ঞান করিব।"[৬৯]

অবশ্য এই যুগে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত সমাজের একটা বড অংশ এই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন। ভবানীপুরে বিলের বিরুদ্ধে জনসভা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রস্তাবে বলল, এ ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক বিচার ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।

আইন পাশ হয়ে গেল। উপেন্দ্রনাথ বিলেত চলে গেলেন। ফিরে এসে, প্রায় বারো বৎসর পরে, আর একটি নাটক লিখেছিলেন। সে নাটক ইংরিজির অনুকরণ। তাঁর স্বকাল ও স্বদেশ সেখানে অনুপস্থিত! অভিনয় নিয়ন্ত্রণ-আইন প্রত্যক্ষত তাঁর নিয়ন্ত্রণের জন্যই যেন বিধিবদ্ধ হয়েছিল।

অন্যান্য নাট্যকার

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আর যে সব নাটক এযুগে মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের হামির, ব্রজেন্দ্রকুমার বাগের প্রকৃত বন্ধু, শ্রীনাথ চৌধুরীর আমি তো উন্মাদিনী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতী কি কলাঙ্কিনী ও গুইকোয়ার নাটক ও পারিজাতহরণ, চন্দ্রকালী ঘোষের কুসুমকুমারী, মণিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মণিমালিনী, প্রবোধচন্দ্র মজুমদারের সাক্ষাৎ-দর্পণ, মহেন্দ্রলাল বসুর পদ্মিনী, ভুবনমোহন সরকারের ডাক্তারবাবু নাটক, সত্যকৃষ্ণ বসুর কর্ণাটকুমার, তারিণীচরণ পালের ভীমসিংহ, গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'একেই বলে বাঙ্গালি সাহেব?' মদনমোহন মিত্রের 'মনোরমা' উল্লেখযোগ্য।

এগুলির মধ্যে 'কর্ণাটকুমার' রোম্যানটিক ড্রামা; এ নাটকে রামাভিষেক ও সতী নাটকের প্রভাব ছিল।[৭০] নায়ক রঞ্জন নানা বিপাকের মধ্য দিয়ে

শেষ পর্যন্ত তার পছন্দ-করা উজ্জয়িনীর রাজকুমারী প্রমদার পাণি গ্রহণে সক্ষম হোল। মণিমালিনীও একই জাতীয়। দুই নাটকের কাহিনী অনেকটা রূপকথার গল্পের মত। মণিমালিনী অধিকতর থিয়েটারী আয়েষা, সে আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখে নয়, পিতার সম্মুখেই প্রণয়ীর নাম বলল।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতী কি কলঙ্কিনী বা পারিজাতহরণ প্রকৃত পক্ষে গোবিন্দ অধিকারীর পালার মত। সতী কি কলঙ্কিনী তিন অঙ্কে সম্পূর্ণ, ১ম অঙ্কে রাধা-কৃষ্ণ মিলন, ২য় অঙ্কে আয়ন এলে কৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ, তৃতীয় অঙ্কে কৃষ্ণ অসুস্থ হলে শ্রীমতীর সতীত্ব প্রমাণ।

এই কাহিনী ঝুমুর-সঙ্গীত থেকে চলে আসছে। ভাষাও তথৈবচ—ঢপ্-কীর্তন, কবি-সঙ্গীতের বিশিষ্ট ভাষা এবং অলঙ্কারের এখানে প্রতিপত্তি—

কিসে বল সখী প্রবোধিব মন।
সে বিনে প্রাণ, করে কেমন॥
জাগে রূপ সদা যার, মম হৃদয় মাঝার।
ছাড়ি তারে কিসে, রাখি জীবন।

গদ্য-সংলাপেও কোন উন্নত গুণপনা নেই:

"বাবা বৌয়ের এমন বুকের পাটা তো কখন দেখিনি-ছি-ছি-ছি, কুল-বধূর কি এই কাম, কালামুখীর জ্বালায় লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার—রাত দিন কৃষ্ণের সঙ্গে বনে বনে ফিরচে, ঘরে একদণ্ড থাকতে মন যায় না। ভাল কথা বলতে গেলে তেড়ে মারতে আসে—কলঙ্কিনীর জন্যে যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়।"

পারিজাতহরণও একই আঙ্গিকে লেখা। পারিজাতহরণে ৩৬টি গান আর ৩৫টি নাচ স্থান পেয়েছে। নাটক আর কোথায়! তাঁর গুইকোয়ার নাটকে সমসাময়িকতা আছে। নাটকীয়তা নেই।

সামাজিক দর্পণ কয়েকখানি আছে; সবগুলি মাইকেল-দীনবন্ধুর চর্বিত চর্বণ। 'মনোরমা' হোল মাতলামির গল্প; 'আমি তো উন্মাদিনী' নাটকেও একই প্রকার মাতাল ও লম্পটের কাহিনী বলা হয়েছে। 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকও তাই। "যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচারব্যবহার বর্তমান বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত আছে, এই 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকে তাহাই সাধ্য অনুসারে ব্যক্ত করিলাম।" 'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব' সাক্ষাৎ-দর্পণের মতই আধুনিক যুবকদের বিরুদ্ধ সমালোচনায় মুখর; ব্রাহ্মবিদ্বেষও আছে। ষষ্ঠ

অঙ্কে রাণাপ্রতাপ প্রসঙ্গ আছে, এবং নাটক হঠাৎ 'সিরিয়াস' হয়ে উঠল এবং নাটকের যবনিকা নেমে এল—

জাগ জাগ প্রিয় দেশবাসিগণ।
বিস্তীর্ণ ভারতে, যথা আছে যে জন,
কর স্বদেশেবি দুঃখেরি মোচন।

যুগ-ভাবনার প্রভাবে রসিকতাও গম্ভীরতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আর সেই স্বদেশ-হিতৈষণাব সুর সব কয়টি ইতিহাস বা মধ্যযুগ-ভিত্তিক নাটকে স্পষ্ট। সুরেন্দ্র মজুমদারের 'হামীব' নাটকে পদ্মিনীর গান গেয়ে-গেয়ে উদ্দীপনা সঞ্চারের কথা আছে। 'হামীর' নাটক থিয়েটারী ভাষায় লেখা নয়। একটি মাত্র সংলাপ আমরা তুলে ধরছি—

> আঃ নীরস বিষয় নিয়েই লোকে দিবা রাত্রি ব্যস্ত, দিবা রাত্রির ভাব একবারও লক্ষ্য করে না। এক দিবা রাত্রির মধ্যে জগৎ সংসারে যে কত নূতন নূতন ভাবের পরিবর্তন হচ্ছে, মন সংযোগ করে দেখলে অন্তরে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। দেখ দেখি, এই সন্ধ্যা সময়ের কেমন মধুর ভাব। গগন মণ্ডলের নীলিমা কেমন স্বচ্ছ,—কেমন স্নিগ্ধ। পশ্চিম দিকে প্রদোষেব তাবা প্রকাশ পাবার চেষ্টায় কেমন সজীব ভাবে নিমেষ উন্মেষেব অভিনয় দেখাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, কেমন, যেন শ্যামল সন্ধ্যা ছায়াপটে সর্বাঙ্গ ঢেকে একটি মাত্র চক্ষু বিকশিত করে সস্নিগ্ধভাবে দেখছেন যে, সূর্য অস্তগত হলেন কিনা। সন্ধ্যা সময়ের প্রতি নিমেষেই জগতে যামিনীর আধিপত্য পর পর প্রগাঢ় বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, দেখ পর্বতেব শিরোভাগ ক্রমশই ধূমপুঞ্জের ন্যায় দেখাচ্ছে, তরুপত্রের অবকাশ সমূহ আর লক্ষ্য হয় না, বস্তু সকলের মধ্যে আর সে পৃথক ভাব নাই; সকলই পরস্পব বিজড়িত বিঘোব-বিলুপ্ত হয়ে আসছে। ছিদ্রতল নৌকা যেমন ক্রমে ক্রমে জলপূর্ণ হয়ে যেমন মগ্নমান হয়,—ক্রমে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীও সেইভাবে অনুভূত হচ্ছে। দিঙমণ্ডল ক্রমশই নিষ্প্রভ, নীরব, দিবাভাগের কোলাহলপূর্ণ প্রভাময়ী সে পৃথিবী এখন কোথায়! (৩।১)

এ-ভাষা নাটকের ভাষা নয়, এ-বর্ণনাও নাটকের বর্ণনা নয়। উপন্যাসের আঙ্গিকে নাটক রচনার দৃষ্টান্ত এটি।

ব্রজেন্দ্রকুমারের 'প্রকৃত বন্ধু'র ভূমিকায় বলা হয়েছে, "নাটক বা কাব্য লিখিতে যে কয়েকটি বৃত্তির আবশ্যক হয়, তন্মধ্যে স্বাধীনতা বৃত্তিই সর্ব প্রধান, তাহাই যখন ভারতে নাই, তখন কোনক্রমেই "সর্বাঙ্গ সুন্দর" নাটকের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।·····যখন কোন একটি বিষয়ের কল্পনাময়ী মূর্তি মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বর্ণনা করিতে লেখনীকে হস্তে ধারণ করা যায়, তখনই পরাধীনতার ভীষণ মূর্তি আসিয়া লেখনীকে বলপূর্বক নিরস্ত করে, — সুতরাং হৃদয় হইতে সকল ভাব তিরোহিত হইয়া হ-য-ব-র-ল হইয়া পড়ে।" (ভূমিকা)। কোন এক অজানা দেশের রাজার গল্প নিয়ে নাটক, আসলে এটিও এক বুড়োখোকাদের রূপকথা। নাটকের শেষে ভারতভূমির জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস আছে। বেদ-উপনিষদের জন্য ভক্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

রূপকথা নয়, বা কাল্পনিক কাহিনী নয়, ইতিহাসের উপর নির্ভর করে মহেন্দ্রলাল বসু চিতোর রাজসতী বা পদ্মিনী রচনা করেছিলেন। এ নাটকে সরোজিনী ও কৃষ্ণকুমারীর নাট্যরীতি অনুসৃত হয়েছে।

তবে বাস্তববোধের চরম অভাব দেখা গেছে; দিল্লীর সুলতানকে প্রায় বাগবাজারের সাধারণ বাড়িওলা করে ফেলেছেন নাট্যকার। আলাউদ্দীন তাঁর কাদম্বিনী নাম্নী এক হিন্দু বেগমকে 'কাদু' বলে সম্বোধন করছেন। হিন্দুয়ানীর গৌরব প্রসঙ্গ আছে।

আলাউদ্দীন। দূর মূর্খ পৃথিবীতে কি সতী আছে?

রাজা। পামর, তোদের মুসলমান জাতির মধ্যে না থাকতে পারে। পদ্মিনী আমার সতীত্বের আদর্শ স্বরূপ।

সাম্প্রদায়িকতা আর কত নীচে নামবে! হিন্দু মেলার দুইটি বিখ্যাত গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান', এবং 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' ৫ম অঙ্কের ২য় ও ৩য় দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি রাজার মুখে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র সেই বিখ্যাত পংক্তিগুলি বসান হয়েছে, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"; কোন কোন নাটকে দেশপ্রেম ও নারীপ্রেম এক সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

'রূপান্তরিত' নাটক

এই যুগে মৌলিক নাটক, ও অনুবাদ নাটকের পাশাপাশি 'রূপান্তরিত' নাটকের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসের প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত সমাজ এক নতুন সাহিত্যের স্বাদ পেল।

পাঠে যে আনন্দ হয়েছে, সেই আনন্দ মঞ্চে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন সে-যুগের শিক্ষিত সমাজ। তার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ নাট্যে রূপান্তরিত হোল।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ব্যতীত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' নাট্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। কয়েকখানি বিখ্যাত কাব্যও নাটকের আকার লাভ করেছিল—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৃত্রসংহার কাব্য, নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ।

সে-যুগের জনপ্রিয় উপন্যাসে ও কাব্যে বর্ণিত চরিত্রের প্রসঙ্গ লোকের মুখে মুখে ফিরত; লোকে চাইত ঐ সব চরিত্রকে জীবন্তরূপে দেখতে। এবং সে-চাওয়ার প্রতিফলন ঘটেছিল মঞ্চে। পেশাদারী মঞ্চের প্রথম পর্বে দীনবন্ধু ও মাইকেলকে মূলধন করা হয়েছিল। অভিনেতৃদল অভিজ্ঞতাহীন, মঞ্চ ঐশ্বর্যহীন, নাট্যসাহিত্য অর্বাচীন ও সংখ্যাল্প; সে-ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস ও কাব্যের শরণাপন্ন হওয়াটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়।

"এর চেয়েও মুস্কিল হল নাটকের অভাব, মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন, রামনারায়ণ প্রভৃতির যে সব নাটক তখন সাধারণের আদরের ছিল তা সবই আমরা অভিনয় করে ফেলেছি।"[৭১]

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কপালকুণ্ডলা নাট্যে রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়। তারপর মৃণালিনী ও অন্যান্য উপন্যাস রূপান্তরিত হয়।

ইংলণ্ডেও অষ্টাদশ শতকে উপন্যাস নাট্যরূপান্তরলাভ করতে থাকে। তখন ছিল স্যামুয়েল রিচার্ডসনের জনপ্রিয়তার যুগ। ১৭৪১ সালে নবেম্বর মাসে পামেলা উপন্যাস নাট্যায়িত হোল; স্বয়ং ডেভিড গ্যারিক প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হোলেন; তারপর রিচার্ডসনের আরও অনেক উপন্যাস এই রূপান্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী যুগে ডিকেন্স এবং ওয়াল্টার স্কট মঞ্চের দাক্ষিণ্য বেশি লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশে শরৎচন্দ্র, অনুরূপা দেবী সর্বাধিক মঞ্চ-সহানুভূতি লাভ করেছেন। নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

কী নাটকে, কী উপন্যাসে প্লট অত্যাবশ্যক। কিন্তু নাটকের প্লট সংহত (condensed) প্লট, নিতান্ত গল্প নয়; নাটকের প্লটে কালের সীমা ডানাছাঁটা, স্থানের সীমাও সংকীর্ণ।

ঔপন্যাসিক রয়ে-সয়ে চলতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারকে দ্রুত চলতে হবে, তাঁর বক্তব্য বলতে হবে দ্রুত। মঞ্চের ক্ষুদ্র পরিসরে এবং মাত্র দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে

স্থান ও কালকে ভেঙে-চুরে দলা পাকিয়ে দিলে চলবে না! দর্শকের বিশ্বাস-যোগ্যতার উপর জুলুম করা চলবে না।

কপালকুণ্ডলাই সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় এই নাট্যরূপের একটি বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। কাপালিকের মুখে দুইটি গান দেওয়া হয়েছিল, পূজার স্থানে নবকুমারকে নিয়ে যাবার সময় কাপালিক গাইল—

নর-রুধির তৃষাতুর নেহার ভূমি দূরে।

এ-ছাড়া ছিল একটি কালীস্তব। নবকুমারের সঙ্গে কাপালিক প্রথম সাক্ষাতেই বাংলায় কথা বলেছিল। বঙ্কিম এখানে যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন, তা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

কাপালিকের মুখে কপালকুণ্ডলার উদ্দেশে যে সব সম্বোধন আছে, তাও বেমানান। "বোকা, পাগলি মেয়ে"-এসব সম্বোধন তার মুখেই মানায় যে, পিতার ন্যায় স্নেহ করে। কিন্তু কাপালিকের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। অধিকারীর পার্শ্বে একজন শিষ্য আমদানী করা হয়েছে; যে জনবিরলতা এই কাহিনীর অবতারণার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, তাও এইভাবে বাতিল করা হয়েছে। নবকুমার যখন গৃহে প্রত্যাগমন করল, সেখানে সেই সময় একটি মাতালকে হাজির করা হয়েছে। নিছক হাস্যরস সৃষ্টিই রূপান্তরকারীর উদ্দেশ্য। যেখানে তিনি নতুন, সেখানেই তিনি উপন্যাসের ভাবমূর্তিকে ক্লিষ্ট করেছেন। যেখানে অনুগত, সেখানে তিনি উপন্যাসের আক্ষরিক অনুসরণ করেছেন।

"উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে যে রেখাটি সম্পাত হইয়াছে, অতি সুস্পষ্ট। সেই রেখাটি যাঁহারা না দেখিতে পাইয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে এতদুভয়ের প্রভেদ জ্ঞান নাই। এই প্রভেদজ্ঞান না থাকিলে উপন্যাসকে কখনও নাটকে পরিণত করা যায় না। কপালকুণ্ডলা যেরূপ নাট্যাকারে পরিণত করা হইয়াছিল, তাহাতে এই প্রভেদজ্ঞান তত লক্ষিত হয় নাই।"[৭২]

ফলে দর্শকদের অভিজ্ঞতা হোল যে, তাঁরা শুধুই যেন বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস মঞ্চে দেখতে এসেছেন। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা কি মনোরম হয়েছিল? "এজন্য অভিনয়কালে আমাদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, আমরা যেন বঙ্কিমবাবুরই কপালকুণ্ডলা সম্মুখে দৃশ্যমান দেখিতেছি। কিন্তু তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয়। সে উপন্যাসে যে সম্পূর্ণতা আছে, যে সৌন্দর্য আছে, নাটকে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল। মতিবিবি এবং কাপালিককে আমরা চিনিতে পারি নাই।"[৭৩]

'ভারত-সংস্কারকে'র বিজ্ঞ সমালোচক প্রশ্নটি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

"নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন ভাবগুলি নির্বাচন করিয়া লইলেই বুঝি নাটক প্রস্তুত হইল। উপন্যাসের যে সমস্ত কথাবার্তা থাকে, নাটকে তাহা আবশ্যক না হইতে পারে। উপন্যাসকে নাটক রূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পর্যালোচনা চাই।"[৭৪]

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্য নাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু চারিটি পৃথক্ পৃথক্ অংশে—১। মেঘনাদবধ, ২। লক্ষ্মণের শক্তিশেল, ৩। রামচন্দ্রের প্রেতপুরী দর্শন; ৪। প্রমীলার চিতারোহণ।

সাত অঙ্কে নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে; মাঝে মাঝে গান আছে। তা না হলে গোটা কাব্যের বিভিন্ন সর্গ (নয় সর্গ) টুকরো টুকরো দৃশ্যে সাজিয়ে সাতটি অঙ্ক তৈরি করেছেন। যেমন প্রথম সর্গ থেকেই লেখক চারিটি দৃশ্য তৈরি করেছেন।

দৃশ্যগুলি ছোট ছোট হওয়ায় ঘন ঘন পট-পরিবর্তন করতে হয়েছে; ফলে সংহতি নষ্ট হয়েছে। কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী ফুটিয়ে তোলার উদ্যম না থাকায় লেখক বহু ঘটনার সন্নিবেশ করেছেন। মহাকাব্যের পিছনে ছুটতে গিয়ে নাট্যকার পাঁচ অঙ্কেও কূল পান নি। সপ্তঅঙ্কবিশিষ্ট এই নাটক গিরিশচন্দ্রের কলমেও অভিনব; দৃশ্যের সংখ্যা অনেক বেশি। যেমন প্রথম অঙ্কে চার, দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচ, তৃতীয় অঙ্কে আটটি দৃশ্য।

সম্ভবত দৃশ্যসজ্জা-বিজড়িত আধুনিক নাট্যশালা অপেক্ষা এ নাটক যাত্রার আসরে অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারত। বা সংস্কৃত নাটকোচিত মঞ্চ-নির্দেশ অনুযায়ী অভিনীত হলেও প্রতি দৃশ্যান্তরে পট-পরিবর্তনের দরকার পড়ত না। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' বা নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' নাট্যরূপান্তরে একই বিপত্তি। নাট্যকার আর মহাকবি একজাতীয় রূপকার নন। সেক্সপীয়ার ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় একথা স্মরণ রেখেছিলেন; তাঁর 'Historical plays' তাই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে নাট্যীয় অংশ খুঁজে বের করে 'ক্ষুদ্র' ঘটনায় সন্তুষ্ট থেকেছে। উপন্যাস, মহাকাব্য ও নাটক—তিনটিই পৃথকধর্মী সাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এগুলি বিকশিত হতে থাকে; এবং তাদের চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য তখনই স্পষ্ট। কিন্তু বাংলা রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারেরা দর্শকরুচির অনুমোদনে তিনটি শাখাকে এক করে দেখিয়েছেন।

এ-যুগের নাট্যকৌতুহল ও নাট্যচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পেশাদারী মঞ্চে সমাদৃত হোল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব এই মঞ্চের প্রতি অনুকূল ছিল বলে মনে হয় না।

সাধারণভাবে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর কৌতুহল অত্যন্ত তীব্র ছিল। সেক্সপীয়ার তাঁর প্রিয় নাট্যকার; কালিদাস ত তাঁর নিত্যসঙ্গী। দেসদিমোনা ও শকুন্তলা প্রবন্ধে তুলনায় দেসদিমোনা অধিকতর মূল্য পেয়েছে। শুধু কি চরিত্রগুণে?[৭৫]

নাটকের মূল সূত্রগুলি তাঁর অধিগত ছিল; তাঁর বিশ্লেষণে মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর না থাকতে পারে, কিন্তু স্পষ্টতা ছিল। 'উত্তর-চরিত'[৭৬] প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উদ্দেশ্য হোল ভিন্নপ্রকার। সেখানে উদ্দেশ্য হোল কাব্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করল, তাই উপাখ্যান-কাব্যের লেখকেরা প্রতীয়মান কবতে চান। কিন্তু সেই সব কাজ করবার সময় কে কি ভাবল, তা স্পষ্টীকৃত করবার প্রয়োজন উপন্যাসের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই জরুরী। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে উত্তর-চরিতে বর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নেই।

নাটকের মূলসূত্র বঙ্কিম সেক্সপীয়ার পাঠান্তে রচনা করেছেন। তাই ম্যাকবেথের সঙ্গে উত্তর-চরিতের গঠনরীতির তুলনা করেছেন। উত্তর-চরিত নাটকের তৃতীয়াঙ্কের 'সারমর্ম' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্যের কোন হানি হয় না সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে।"[৭৭]

'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে মহাকাব্য নাটক ও গীতিকাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা বঙ্কিম সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মহাকাব্যে বক্তব্য ও অবক্তব্য উভয়ই কবির আয়ত্ত; নাটকে তা নয়। "অনেক নাটককর্তা তাহা বুঝেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত ও বাগাড়ম্বরবিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ঘাটন করিতে হইবে;

নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য বক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অবক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার। ভবভূতি বক্তব্য এবং অবক্তব্য উভয়ই স্বকৃত নাটকমধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন।"

দেসদিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপ, আর সীতা বিসর্জনের পর রামচন্দ্রের বিলাপ—এই দুইটিকে তুলনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "সেক্সপীয়ার এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই, যাহা তৎকালীন কার্যার্থ বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না, বক্তব্যের অতিরিক্ত তিনি এক রেখাও যান নাই।"

অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুজ্ঞা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরের কালে অনবরতই লঙ্ঘন করা হয়েছে। ভ্রমরের মৃত্যুশয্যায় উপন্যাসের গোবিন্দলাল নীরব ছিল; কিন্তু নাটকের গোবিন্দলাল বলে উঠল, "আমার কালো ভ্রমর, আমার সুন্দর ভ্রমর।"[৭৮] অথচ গোবিন্দলালের জীবনে এই প্রকার সম্বোধনের সুযোগ আর আসতে পারে না।

সেই ভীষণ কাপালিকের মুখেও গান দিতে হয়েছে। বাংলা নাটকের কথাবস্তু একটা অপ্রাকৃত অবাস্তব ভূখণ্ডে পদচারণা করছিল; দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী ও কপালকুণ্ডলার লেখক বঙ্কিম সেটা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই কমলাকান্তের পত্রে 'কি লিখিব' নামক ১ম সংখ্যক পত্রে এই নাট্যবিষয়কে বিদ্রূপ করেছেন। "খোসনবীশপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে, নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন,—তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীম সিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্ক শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি 'হা হতোস্মি' করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্য ভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং শপথ পূর্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা 'হা সখি!' এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন—নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।"[৭৯]

তৃতীয় সংখ্যক পত্রে, দ্বিরেফরাজের ঘ্যানঘ্যানানিতে, বাংলা নাটকের থিয়েটারী ভাষা বিষয়ে পরিহাস করেছেন—

"আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম—তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম, হে ভৃঙ্গ, হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গ-বিক্ষেপকারিন !"[৮০]

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের এই কৃত্রিমতা সম্ভবত তাঁর বিরূপতার কারণ। ব্যক্তিগত ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত করা উচিত হবে না। [দ্রষ্টব্য—ভারতীয় নাট্যমঞ্চ-হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ড-পৃ-১২০-১২১]

'লোকরহস্য' গ্রন্থে 'বাবু' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরেজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র, এবং তীর্থ—'ন্যাশান্যাল থিয়েটার', তিনিই বাবু।" পেশাদারী মঞ্চ শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকেব ভৎর্সনার লক্ষ্যস্থল।

বাংলা সাহিত্যে প্রহসন নামে যা অজস্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার সমালোচনায় বঙ্কিম খুবই নির্দয়।

"আধুনিক নাটকলেখকদিগের মধ্যে অধিকাংশ, এবং হুতোম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে, এই শ্রেণীর রসিক। বসিকতা করিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত অস্থির ; দন্ত সর্বদাই বহিষ্কৃত ; অঙ্গ-ভঙ্গীর বিরাম নাই ; চক্ষুব নানা রূপ বিকৃতি ; কিন্তু রসিকতার উপকরণেব মধ্যে কতকগুলি নীরস, অসংলগ্ন, অর্থশূন্য, ইতর কথা , তাঁহাদের গ্রন্থে একটু তাড়িখানার গন্ধ থাকে।[৮১]

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গনাটকের ভিত্তি কোথায়, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। "Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে mistakc ব্যঙ্গের যোগ্য * * mistake যেমন ব্যঙ্গের যোগ্য, follyও তদ্রূপ। এই নাটকে বিধুমুখী বা পূর্ণচন্দ্র বা পেরুরামের চিত্রে যে ব্যঙ্গ দেখা যায়, তাহা ঐ রূপ অসঙ্গত কার্য বা ভাবের উপরে লক্ষিত, সুতরাং নিন্দনীয় নহে। পরন্তু এই প্রহসনের আদ্যোপান্ত পাঠ বা অভিনয় দর্শন প্রীতিকর ; ইহা সামান্য প্রশংসা নহে ; কেননা অন্যান্য বাঙ্গালা নাটক প্রহসনে প্রায় তাহা অসহ্য কষ্টকর।"[৮২]

'নয়শো রূপেয়া'র সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই বললেন, "বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত নাটক একখানিও নাই।" তাঁর আদর্শ হোল সেক্সপীয়ার ; তিনি লিখলেন, "যে গুণ থাকাতে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি জগতের মধ্যে মনুষ্যের অসামান্য কার্যরূপে পরিগণিত হইতেছে, সে গুণ বাঙ্গালা কোন নাটকেই নাই।"[৮৩]

উক্ত সমালোচনায় তিনি বাঙ্গলা নাটকের প্রধান দুইটি ত্রুটি, শব্দাড়ম্বর ও অলঙ্কারআড়ম্বর, পরিত্যাগের জন্য নয়শো রূপেয়ার গ্রন্থকারকে প্রশংসা করেন যদিও তিনি উক্ত লেখকের রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি নাটকের মূল নীতি ব্যাখ্যা করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীতি থেকে যাঁরা বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁদের সমালোচনা করেছেন।

'পল্লীগ্রাম দর্পণ' নাটকের সমালোচনায় বঙ্গদর্শনে বলা হলো, "গ্রন্থের প্রশংসাবাদ কল্পে আমরা এই বলিতে পারি, যে গ্রন্থকার পল্লী গ্রামের দুরবস্থা বর্ণনের জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ। এটি আমাদের মনের কথা, বিদ্রূপের কথা নহে।"[৮৪] শ্রাবণ সংখ্যায় স্বর্ণলতা নাটকের একটি তীব্র সমালোচনা বের হোল। "মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি গূঢ়তত্ত্ব আছে, তাহা আধ্যাত্মিক দর্শনের অপ্রাপ্য, বিজ্ঞানের অপ্রাপ্য, তাহা কেবল কবিই দেখিতে পান। তাহার প্রকটনই নাটকের উদ্দেশ্য, সেই জন্য নাটকের সৃষ্টি। বঙ্গদেশে নাটকের সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়াছে—মোহান্তের মোকদ্দমা, নাপিতের মোকদ্দমা, কুলীনের বহুবিবাহ, কি মজার শনিবার ইত্যাদি বিষয়ের প্রকটনার্থ বঙ্গীয় নাটক লিখিত হয়, কতকগুলি নাটককারের উদ্দেশ্যে 'সসিয়েল রিফরমেশান'। (১২৮১, শ্রাবণ) এই কারণে কুলীনকন্যা নাটক বঙ্গদর্শনে প্রশংসিত হয় নি। (১২৮১, ভাদ্র) শুধু সামাজিক নাটক নয়, পৌরাণিক নাটক রচনায় যে কৃত্রিমতা ছিল, তার বিরুদ্ধেও লেখনী পরিচালিত।

"সম্প্রতি আর একখানি 'বামোদ্বাহ' নাটক উপস্থিত। ত্রুটি কি? ইহাতে কপালে করাঘাত আছে, চরণ স্পর্শ আছে, ভূমিশয্যা আছে, বিষবিন্দু আছে, হৃদয়বল্লভ আছে, চাতকিণী আছে, কাদম্বিনী আছে, নীলমণি আছে, নাই কি? যদি কিছুর অভাব থাকে, তবে এক 'আসার আশায়' তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে।"[৮৫] তারাবাই, গৌড়েশ্বর নাটক, ভারতে যবন প্রভৃতি নাটক সমালোচনা করার পর বঙ্গদর্শনসম্পাদক ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে লিখলেন—

"আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির তুলনা নাই, এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে ৫০২ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; ·· ···বঙ্গদর্শনে যাহাতে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর না প্রকাশ হয় এমত চেষ্টা করিব।"[৮৬] বঙ্কিমশিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত

'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকাতেও নাট্যবিষয়ে প্রচুর কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণী পত্রিকার একখানি পত্রে সে যুগের অতি-নাট্যপ্রীতির নিন্দা করা হয়েছে; "অভিনয়ের বাড়াবাড়ি দেখিয়া কতকগুলি কর্মশূন্য লোক যেন কদর্য নাটকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করেন।"[৮৭]

আর একখানি পত্রে পত্রলেখক লিখেছেন যে, পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণী সভার মত নাটক প্রকাশ-নিবারণী সভা স্থাপন করা উচিত।

নাটক প্রসঙ্গ খুবই গুরুত্ব পেয়েছে; একত্রে ছয়খানি নাটক সমালোচনা করতে গিয়ে নাটক কাকে বলে সে প্রশ্ন আলোচনা করা হোল। "উপন্যাসাদি নাটকের দেহ বটে, তাহার প্রাণ নহে। নাটকের প্রাণ অন্তর্বেদ (Passion), যে-মন লইয়া আমরা মনুষ্য নামের এত গৌরব করিয়া থাকি, সেই মনের ঘাত-প্রতিঘাত প্রদর্শনই নাটককারগণের উদ্দেশ্য।" প্রবন্ধকার নাটকের ভাষা, নাটকের উপন্যাস (Theme), নাটকের রস, নাটকের গান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৮৯]

বস্তুত বঙ্কিম-মতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। ভূরি ভূরি নাটক প্রকাশনায় সাধারণী পত্রিকাতেও শংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

"নাটক অতি ভয়ানক পদার্থ। যেরূপ পুরাণ সংহিতা কি মহাকাব্য সেইরূপ নাটকও সকলের স্পৃশ্য নহে। এস্কাইলাস, শেক্ষপিয়ের, ভবভূতি ও কালিদাস ও তাঁহাদের মত লোকই নাটক লিখিতে পারেন, এ সকল আপনার আমার কর্ম নহে।"

এ সমালোচনার ভাষার 'ভয়ানক'ত্বে আমরা শংকিত হতে পারি, তবে সে যুগের সকলের সমালোচনার ভাষা এ প্রকার নয় জেনে আশ্বস্ত হতে পারি।

"যেমন বালকের শিক্ষামন্দির পাঠশালা, কলেজ স্কুল, তেমনি যুবকের শিক্ষামন্দির রঙ্গভূমি; পাঠশালায় যেমন জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে, রঙ্গভূমিতে তেমনি স্নেহের শিক্ষা, প্রণয়ের শিক্ষা, দয়ার শিক্ষা, উৎসাহের শিক্ষা,—ঘৃণার শিক্ষা, রাগের শিক্ষা হইয়া থাকে।

এখন যে সকল নাটক হইয়া থাকে, তাহাতে এরূপ কিছু শিক্ষা থাকে? বোধ হয় ক্ষণিক আমোদ ব্যতীত সেগুলিতে আর কিছুই পাওয়া যায় না; বঙ্গদেশের অভিনয়-সমাজ সকলের অত্যন্ত হীনাবস্থা।"[৯০]

বঙ্গদর্শন, সাধারণী ও নবজীবনের মত মধ্যস্থ, ভারতসংস্কারক, সুলভ সমাচার প্রভৃতি পত্রিকাতেও নাটক সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। কিন্তু এগুলিতে

ভারতীয়ত্ব বোধ অতিশয় উগ্র, তাই নাটকে বিদেশী ভাব অনুসন্ধানে অনেকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বঙ্গদর্শনের দর্শন বিষয়ক ব্যাখ্যার শুধু তাঁরা বিরোধিতা করেননি, তাঁরা কপালকুণ্ডলার মত উপন্যাসের মধ্যেও দূষিত ভাবের সন্ধান পেয়েছেন।

"কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে একটি দূষিত উপদেশ প্রচ্ছন্ন আছে।··· কিন্তু আমাদিগের নাটককারও এ বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই।"[৯১]

অর্থাৎ বিদেশী ট্রাজেডিতত্ত্ব সম্বন্ধেই তাঁদের ঘৃণা; তাই কৃষ্ণকুমারী নাটকের সঙ্গে তুলনা করে নন্দবংশোচ্ছেদকে উন্নত রুচির নাটক বলা হোল। "কৃষ্ণকুমারীর নৈতিক উপদেশ অস্বাভাবিক বিকৃত ভাবাপন্ন।"[৯২]

আক্রমন শুধু ট্রাজেডি বিষয়ে নয়, কমেডি প্রসঙ্গেও। সেখানে নীতিবাগীশতার চরম পরিচয় দেওয়া হোল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে সধবার একাদশী অভিনয় হচ্ছে জেনে তাঁরা লিখলেন, "ভবিষ্যতে পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে গ্রেট ন্য.শনাল থিয়েটাব একটু সুরুচির পরিচয় দিবেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা। সধবার একাদশীকে বিষকুম্ভ পয়োমুখ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[৯৩] এই সুনীতির জন্য কুলীনকন্যা নাটক ও পুরুবিক্রম নাটক তাঁদের প্রশংসা পায়।[৯৪]

যেটুকু সমর্থন এতদিন পর্যন্ত টিকে ছিল, অভিনেত্রীর মঞ্চাবতরণে তাও নষ্ট হয়ে গেল। "নাটকগুলি ভদ্ররুচি সহকারে সংরক্ষিত হইলে এবং স্ত্রীলোকের অংশ ভদ্রাঙ্গন দ্বারা অভিনীত হইতে আরম্ভ হইলে এ উদ্দেশ্যসিদ্ধ হইতে পারে। এ দেশে এখনো আমরা সেইদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি।"[৯৬]

"এই পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানের। আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।"[৯৭]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও নাটক প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। "নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহাতে নাটকের পুস্তক খুলিতেই ঘৃণা করে।"[৯৮] ঐ পত্রিকায় বলা হোল: "রঙ্গভূমি জন সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য এই যে, ইহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরা উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভূমির নিকট আমরা কত আদর্শ চরিত্র সাধুর জন্য ঋণী···রঙ্গভূমি আমোদ এতদ্দেশে নূতন প্রবর্তিত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে ইহা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন।

এখনকার অধিকাংশ নাটকই কুরুচিকৃত, সেই সমস্ত নাটক পুনঃপুন অভ্যাস করিয়া বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইতেছে।

নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার; ইহা একটি বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য, তাহাই অতিযত্নে ব্যবহার্য হইতেছে।"[৯৭] The Indian Mirror প্রভৃতি পত্রিকাতেও বিরুদ্ধ মন্তব্য থাকত। কিন্তু সকলকে ছাপিয়ে গেল Indian Daily News; ঐ পত্রিকায় লেখা হোল—"Satisfaction will not be fully realised as long as the walls of the pavillion of this infamous Company are not levelled to the ground, its furniture confiscated and sold under the hammer of the State. That this Theatre has by the introduction of harlots on the stage become the hotbed of immorality and cor uption none can deny".[৯৮] তার দেওয়াল অবশ্য গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় নি, আসবাবপত্রও নীলাম করে নেওয়া হয়নি; শুধু মঞ্চের স্বাধীনতা হরণ করা হোল।

পরপদানত দেশে নাটকের দুই শত্রু—পিউরিটান উন্নাসিকতা আর বিদেশী শাসন। একটি অপরটির আশ্রয়ে টিকে থাকে, ও সমৃদ্ধ হয়।

উপন্যাস ও কাব্য ঘরে পড়বার সাহিত্য, ব্যক্তিগত রুচি সেখানে প্রধান। নাটক দশজনের সঙ্গে বসে দেখবার প্রমোদকলা। সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে সামাজিক রুচি। এই সামাজিক রুচিকে সুস্থ সুন্দর ও ভবিষ্যতমুখী করার পথে প্রধান বাধা হোল বিদেশী শাসন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নাটকের ক্ষেত্রে যে কালা কানুন প্রবর্তিত হোল, প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ তার প্রভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা নাটকে স্বদেশ ও স্বকাল-ভাবনা স্থান পাবে না। যদিও সেই সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি আরও বাড়ছে, শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে রঙ্গমঞ্চেরও সংখ্যা, কিন্তু সে অনুপাতে নাটক গড়ে উঠছে না।

এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই, বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের একটা বড অংশ ছিলেন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্ম-প্রভাবিত। সামাজিক প্রশ্নে তাঁরাই ছিলেন প্রগতিশীল ও রুচিনিষ্ঠ। এই সমাজের সঙ্গে নাট্যশালার সম্পর্কচ্ছেদ নাট্যশালা ও নাটক দুয়ের পক্ষেই অকল্যাণকর হয়েছে।

উপরন্তু নাট্যনিয়ন্ত্রণআইনের ফলে নাট্যবিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পরাধীন জাতির প্রধান ইচ্ছার কোন বিলসন বাংলা নাটকে সহজে স্থান পেল না। রাজরোষ ও ব্যবসায়বুদ্ধি নাটকের সুস্থ বিকাশে বাধাদান করেছে।

১৮৭৬ সালের পূর্বে বাংলা নাটকের একটা বড় অংশ ছিল দেশপ্রেম-প্রভাবিত ; কিন্তু ১৮৭৬ সালের পর বাংলা নাটক ঈশ্বর-প্রেমে নিমীলিত নেত্র হোল—অবশ্য রঙ্গমঞ্চের হাজার শক্তি বিশিষ্ট গ্যাসের আলোর সম্মুখে। এই যুগের বাংলা নাটক হয় ধর্মমুখী, না হয় রঙ্গতামাসামুখী ; আনন্দ যখন প্রমোদের প্রতিশব্দ হয়, তখন তার জাতিচ্যুতি ঘটে। ধর্মবুদ্ধি বা প্রমোদবুদ্ধি-প্রণোদিত নাটকে অলৌকিকতা ও উদ্ভট কল্পনার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব থাকে।

রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের শ্রীবৃদ্ধি যৌথ উদ্যোগের উপর নিভরশীল। বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটকের মধ্যে যৌথ উদ্যম আদৌ অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু সরকারী শাসন ও ভারতীয় সমাজেব সামন্ততন্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এই যৌথ উদ্যোগ সুষ্ঠু পথে পরিচালিত হয়নি।

যেখানে একক প্রয়াসের সুযোগ অবারিত, সেখানে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে লাগল। উপন্যাস ও গীতিকবিতা ব্যক্তি-নিভর শিল্পকলা। ভারতীয় সমাজে যে পবিমাণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্ফুরণ ঘটতে থাকল, বাংলা গীতিকাব্য ও উপন্যাস সেই পরিমাণে উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে লাগল। কালক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবলতম ও মহত্তম উৎসারণ ঘটল গীতিকবিতায় ; নাটকে নয়।

একক উদ্যোগে না নাটক, না নাট্যশালা সমৃদ্ধিলাভ করে।

পাদটীকা

১. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখেছিল—

With all its excellencies the Biddhot Shahinee Theatre is a private establishment, though its very existence is a sign of the times This attempt to cultivate drama is justly praise-worthy but what we would like to have is a public institution of the kind of a permanent character. (3 Dec, 1857)

বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় দেখে অনুরূপ মন্তব্য করা হয়—"**Should the drama ever again flourish in India posterity will not forget those noble gentlemen, the earliest friends of our rising National Theatre. (Sermistha—Advertisement—M. S. D.)**

পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার সাফল্যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট লিখল—"**This theatre has risen to the rank of a National Theatre." (12 feb, 1872)**

'Public Theatre' ও 'National Theatre' শব্দদুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২. "শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে জাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অতএব বর্তমান সভার তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনাবশ্যক। বোম্বাইএর পারসিকদিগের ন্যায় ইঁহারা কেবল ইংরাজী নাটকের অভিনয় করেন না, কিন্তু ইঁহারা ইংরাজী প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্য এ বিষয়ে যেমন আমরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া উন্নতিলাভ করিয়াছি অন্যান্য বিষয়েও সেরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য।" (উমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত—)

৩. Hindu Patriot—1 Jan, 1872 (Retrospect of 1871)

৪. রহস্যসন্দর্ভ, ১২৯৩ সংবৎ, ৪৬ খণ্ড, পৃ—১৫৯

৫. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ-৮৯

৬. ঐ পৃ—৯০

৭. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৭২।

৮. সুলভ সমাচার, ১০ ডিসেম্বর, ১৮৭২।

৯. Hindu Patriot, 11 Dec, 1872.

১০. The Indian Mirror, 19 Dec, 1872.

১১. ভারত সংস্কারক, ২২ চৈত্র, ১২৮০.

১২. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭২.

১৩. ঐ, ২ জানুয়ারী, ১৮৭৩

১৪. বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৯। ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা।

১৫. সাধারণী, ১১ কার্তিক, ১২৮০

১৬. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৭২।

১৭. The Theatre and the Dramatic Theory—Allardyce Nicol. George G. Harrap & Co Ltd. London. 1962, Page-12

১৮. Memoirs of My Life and Times—Bipin chandra Pal. P—251.

১৯. ঐ, Page—301.

২০. সত্তর বৎসর—বিপিনচন্দ্র পাল। পৃষ্ঠা—২২০-২২১.

২১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ—১৪১

২৫. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা-বসুমতী—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে উদ্ধৃত।

২৬. হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা—রাজনারায়ণ বসু। ১৭৯৪ শকাব্দ। কলিকাতা জাতীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

২৭. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮১.

২৮. মধ্যস্থ, শ্রাবণ, ১২৮০.

২৯. যুনানী নাট্যপ্রণালী—লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। আর্যদর্শন, পৌষ, ১২৮৩

৩০. প্রবন্ধমঞ্জরী—ভারতের নাট্যকলা ও রচনাপদ্ধতি—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। পৃ—৩৬১।

৩১. মধ্যস্থ, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৭৯।

৩২. National Paper, 4 Dec, 1872

৩৩. প্রবন্ধমঞ্জরী, ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা—জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর। পৃ— ৭৬—৭৭.

৩৪. ঐ পৃ—৮১।

৩৫. বিনোদিনী দাসীর স্মৃতিকথা: "দুই এক অঙ্কের পর তিনি চলিয়া যান, কিন্তু এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইবার কারণ কেহ নির্ধারণ করিতে পারে না।" কয়েকজন খুঁজিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলে বলেন, "আমি যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে প্রতাপ সিংহের কন্যা আকবরপুত্র সেলিমের অনুরাগিনী, তবে কি এরূপ অভিনয়ের সম্মতি দিই।" (প্রথম সংস্করণ, পৃ—১২)

৩৬. আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ সংস্করণ। পৃ—১০৮।

৩৭. ঐ পৃ—১১৪.

৩৮. জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—পৃ—১৫১.

৩৯. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জানুয়ারী ১৮৬৭

৪০. আমার বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতাণিক সংস্করণ, পৃ—৪

৪১. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮১.

৪২. The Rivals—Preface—Richard Brinsley Sheridan. Macmillan & Co Ltd London.

৪৩. সাহিত্য, চৈত্র, ১৩০৬।

৪৪. Essays—Comedy, Farce and Tragedy—John Dryden. Everyman's Library. J. M. Dent & Co Ltd. 1954 Page—83.

৪৫. নয়শো রূপেয়া, সাহিত্য—বৈশাখ, ১৩০৫

৪৬. বঙ্গদর্শন, বৈশাখ,১২৮০.

৪৭. ভারত সংস্কারক, ১৫ চৈত্র, ১২৮০.

৪৮. ঐ।

৪৮ক. সুলভ সমাচার, চৈত্র, ১২৮০।

৪৯. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮১।

৫০. মোহান্তের এই কি কাজ—নাটকের লেখক ছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। 'রূপ ও রঙ্গ' পত্রিকায় ১৩৩১ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এই নাটকের লেখক হিসাবে গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম বলা হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় লিখিত নাটকের বিষয়বস্তু এক হলেও নাম ছিল পৃথক্।

৫১. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৮১

৫২. মধ্যস্থ, ভাদ্র, ১২৮১

৫৩. সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়—২য় সংস্করণ, পৃ—২৭।

৫৪. আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু। পৃ—১৬৩-১৬৪।

৫৫. পুরাতন প্রসঙ্গ—২য় পর্যায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচারণা—বিপিন বিহারী গুপ্ত। পৃ—২০৬-২০৭।

৫৬. আর্যদর্শন, মাঘ, ১২৮৩।

৫৭. মধ্যস্থ, আশ্বিন, ১২৮০।

৫৮. আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ—৮১।

৫৯. আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু। পৃ—১৩৯-১৪০।

৬০. Memoirs of My Life and Times—Pal. Page—251.

৬১. সত্তর বৎসর—পৃ—২০৪।

৬২. ভূমিকা, শরৎ-সরোজিনী—৺দুর্গাদাস দাস।

৬৩. ভারত সংস্কারক, ২৯ ভাদ্র, ১২৮০.

৬৪. Collected Plays of Schiller.

৬৫. সাধারণী, ১৬ ফাল্গুন, ১২৮১.

৬৬. ঐ চৈত্র, ১২৮১।

৬৭. ভারত সংস্কারক, ফাল্গুন, ১২৮০

৬৮. " ১৮ পৌষ, ১২৮১।

৬৯. " "

৭০. " ২৫ অগ্রহায়ণ, ১২৮২।

৭১. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা—ব. না. ই. পৃ—২২৬
৭২. ভারত সংস্কারক, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪
৭৩. ঐ।
৭৪. ঐ।
৭৫. বঙ্কিম রচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ।
৭৬. ঐ, উত্তরচরিত।
৭৭. ঐ
৭৮. ঐ
৭৯. ঐ
৮০. ঐ
৮১. বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১২৭৯
৮২. " চৈত্র, ১২৭৯।
৮৩. " বৈশাখ, ১২৮৩।
৮৪ " জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১।
৮৫. " শ্রাবণ, ১২৮১।
৮৬. " মাঘ, ১২৮১।
৮৭. সাধারণী, চৈত্র, ১২৮১।
৮৮. সাধারণী, কার্তিক, ১২৮১।
৮৯. ঐ, পৌষ, ১২৮১।
৯০. " ১৬ ফাল্গুন, ১২৮০।
৯১. ভারত সংস্কারক, ২০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪।
৯২. " ২৫ মাঘ, ১২৮০।
৯৩. ঐ, চৈত্র, ১২৮০।
৯৪. ঐ, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৬ শ্রাবণ, ১২৮১।
৯৫. সুলভ সমাচার, ১লা বৈশাখ, ১২৮১।
৯৬. ভারত সংস্কারক, ১৭ আশ্বিন, ১২৮১।
৯৭. " ১৬ অগাষ্ট, ১৮৭৩।
৯৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। আষাঢ়, ১৭৯৭।
৯৯. ঐ পৌষ—রঙ্গভূমি, ১৭৯৭।
১০০. **Indian Daily News—17 March, 1773.**

গিরিশচন্দ্র : মঞ্চ ও নাটকের বিভ্রান্ত সহযোগিতা

গিরিশচন্দ্র নাটক রচনা আরম্ভ করেন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ থেকে বাংলার সমাজ-জীবনে পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০ সাল—এই দশ বৎসর হিন্দুসমাজে পুনরভ্যুত্থানবাদ ও সামাজিক পশ্চাদপসারণ-নীতি দেখা দিতে থাকে।

সমাজ-জিজ্ঞাসার এই দিক পবিবর্তনের প্রধান কারিগর তিনজন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শশধব তর্কচূড়ামণি, ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের যুগ পার হয়ে 'প্রচাবে' এসে পৌঁছেছেন, 'প্রচার' নব্যহিন্দু ধর্মমত প্রচাবের মুখপত্র হয়ে ওঠে।

শশধর তর্কচূড়ামণির মতামত গুরুত্বসহ প্রকাশিত হোত বঙ্গবাসী পত্রিকায়; তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মেব বৈজ্ঞানিক (?) ব্যাখ্যা দিতেন। তৃতীয় ব্যক্তি হলেন 'নবজীবনে'র সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। তিনি যুক্তিপথে না গিয়ে ভক্তিপথে চলতে চাইলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল এই যুগ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"1880 to 1890 was marked by a strong current of revival and social reaction which positively set back the movement of progress not only in Bengal but all over India."[১]

বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূডামণি ও অক্ষয়চন্দ্র সবকারেব মতামতের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, "Bankim Chandra followed more or less in the footsteps of our old Mimansakas, like Jaiminee, for instance, or more correctly like Badarayana in his Brahmo Sutras, Aukshay Chandra followed the Bhaktivada schools and laid greater emphasis on the direct realisation of saints and seers both ancient and modern."[২]

এই নব্যহিন্দুয়ানী আন্দোলনের পিছনে পাশ্চাত্ত্য উৎসাহ খুব কম ছিল না। কর্ণেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কী মাদ্রাজে ও কলকাতায় 'থিয়সফিষ্ট' আন্দোলন সৃষ্টি করেন।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের জন্য যে ডাক দিয়েছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ আজ তা প্রত্যাখ্যান করল। যে বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে বিদ্যাসাগর তাঁর কালের নব্য শিক্ষিতদের সমর্থন পেয়েছিলেন, আজকার নব্যশিক্ষিতদের একাংশ তার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সাবিত্রী লাইব্রেরী কক্ষে অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিধবাবিবাহের বিপক্ষে বক্তৃতা দিলেন ; বঙ্গবাসী পত্রিকা স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে কলম চালনা করতে লাগল, অথচ একদিন ছিল, যখন রাজা রাধাকান্ত দেব পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখক ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের জয়গান গাইলেন।

এই পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও দেখা দিচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে একদল যুক্তি অপেক্ষা ভক্তি, সমাজসেবার পরিবর্তে কীর্তনাদি অধিকতর গ্রাহ্য করলেন। এমন কি, যাঁরা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরাও ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে পড়ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায় "Even Shivanath Shastri had commenced slowly and imperceptibly to shed his earlier rationalism."৩

ভাগ্যের এমনই পরিহাস শিবনাথ শাস্ত্রীর সমালোচক বিপিনচন্দ্র একদিন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ও ভক্তিবাদের উৎসাহী প্রচারক হয়ে পড়েছিলেন ; দেশবন্ধু দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকার স্তম্ভস্বরূপ হয়েছিলেন।

এই পিছু-হটার যুগে বঙ্গীয় নাট্যশালায় যুক্তির বদলে ভক্তি, সামাজিক পরিবর্তনের পরিবর্তে প্রথা-আনুগত্য, বাস্তব জীবনের পরিবর্তে পুরাণ ও রূপকথা, আধুনিক কাল অপেক্ষা পৌরাণিক যুগ বা মধ্য যুগ, দেশপ্রেম অপেক্ষা জাতিগত বা বর্ণগত মাহাত্ম্য-কীর্তন প্রাধান্য পেতে লাগল।

"While Bankimchandra's Prachar and Aukshay Babu's Nabajiban tried to combat Brahmo rationalism by argument, the Bengalee stage sought to kill the social idealism of it by satire and ridicule. The readers of Prachar and Nabajiban could be counted only in three figures, but those who crowded the Calcutta Theatres week after week numbered thousands. They were hardly an educated or discriminating audience. They enjoyed

the vulgar ribaldries of the actors and actresses who represented Brahmo men and women on the stage. All this created a very violent antagonism to the Brahmo Samaj about the time."[৪]

গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল এই যুগের নাট্যশালার সর্বাধিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন নাট্যকার, এ'দের নাটকেব বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে বিপিনচন্দ্রের মূল্যায়নের সার্থকতা প্রতীত হবে।

ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, সমসাময়িক বাংলা কাব্যে তাব প্রতিধ্বনি থাকল, (দ্রষ্টব্য—হেমচন্দ্র রচনাবলী), কিন্তু বাংলা নাটকে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এমন কি, মনোমোহন বসু পুরাণেব ছায়াতলে তাঁর যুগের বিশেষ বিশেষ ইচ্ছার যেমন প্রতিফলন ঘটাতেন, এ-যুগের নাট্যকাবগণ সেটুকু ঔৎসুক্যও দেখালেন না। তাঁদের পুরাণ হোল অধিকতর পৌরাণিক, অর্থাৎ সমসাময়িকতাশূন্য। দেশ তখন ইলবার্ট বিলের প্রতিক্রিয়ায় টগবগ করে ফুটছে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হাজার হাজার লোক বিক্ষোভ জানাচ্ছে,[৪] তখন আমাদের নাট্যশালায় অভিনীত হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ, সতী-কি-কলঙ্কিণী, সীতার বিবাহ। কোনটি স্টারে, কোনটি বা ন্যাশনাল থিয়েটারে।

ইতিহাসের এই বিশেষ পর্বেই গিরিশচন্দ্র নাটক বচনায় অগ্রসর হলেন। নট হিসাবে মঞ্চের সঙ্গে তিনি পূর্ব থেকেই যুক্ত, নাট্যকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব বিলম্বে ঘটে। অমৃতলাল বসুর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে নিতান্ত দায়ে পড়েই তিনি নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ কবেছিলেন।[৬]

গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে বাংলা মঞ্চের প্রধান নাট্যকার ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে তিনি নাট্যরচনা ছেড়ে দেন। তাঁর মতে যোগ্যতর ব্যক্তির হাতেই দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল।[৭] গিরিশচন্দ্র নাটক লিখতে শুরু করলেন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে। ঐ বৎসর তাঁব 'অকাল বোধন' প্রকাশিত হয়। ১২৮৪—১০৮৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে তাঁর রচিত কয়েকখানি গীতিনাটক ও 'রূপান্তরিত' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এগুলির মঞ্চ-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি পুরো নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করলেন। 'রাবণ বধ' থেকেই তাঁর যথার্থ নাট্যকারজীবনের সূত্রপাত। তবে ১২৯০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেও তখন পর্যন্ত তাঁকে নব্যহিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়

না। ১২৯০ বঙ্গাব্দে চৈতন্যলীলা প্রকাশিত হয়। ঐ সময় থেকে তিনি নব্যহিন্দুবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হয়ে উঠলেন। তাই ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দ তাঁর নাট্যকার জীবনের প্রথম পর্ব; ১২৯০ থেকে ১৩১০ বঙ্গাব্দ তাঁর নাট্যকার জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। এবং তৃতীয় পর্বের শুরু হয়েছে ১৩১১ বঙ্গাব্দ থেকে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে তাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। প্রথম পর্বে সরকারী রোষ এড়িয়ে নাট্যমঞ্চকে পুষ্ট করতে তিনি পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; দ্বিতীয় পর্বে তিনি নাটক লিখে নব্যহিন্দু ভাবধারাকে পুষ্ট করেছেন। তৃতীয় পর্বে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময়ে সঙ্কীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদ পরিহার করে তিনি স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এই যুগে কোন গভীর বা মৌলিক প্রশ্ন না তুলেও তিনি কিছু কিছু সমাজসংস্কারমূলক নাটক লিখেছিলেন।

সমসাময়িক সমালোচনা ও গিরিশ-সাহিত্য

তাঁর প্রথম নাট্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে ১২৮৪ বঙ্গাব্দে; আর সর্বশেষ নাটক প্রচারিত হয়েছে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। বাংলা নাটকের দীর্ঘ একটা যুগ তিনি আচ্ছন্ন করে আছেন। এই যুগে অমৃতলাল, অতুলকৃষ্ণ, অমরেন্দ্রনাথ এমন কি, দ্বিজেন্দ্রলালের এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু প্রভুত্ব করেছে তাঁরই নাটক ও নাট্যচিন্তা। অতএব সে যুগে তাঁর নাটক সম্বন্ধে সমস্ত পত্র-পত্রিকাতেই মন্তব্য থাকত। ব্রাহ্মদের পরিচালিত পত্রিকা ভারতী ও নব্যভারতে তাঁর নাটক সমালোচিত হয়েছে। আবার 'আর্যামি'র আত্ম-স্তুরিতায় যে সব পত্রিকা মুখর, সে সব পত্রিকাতেও তাঁর নাটক সমালোচিত।

এই সমস্ত পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করা হয়েছে—মন্তব্যগুলি আলোচনাযোগ্য। ১২৮৭ বঙ্গাব্দে মাঘ সংখ্যায় ভারতী পত্রিকায় 'রাবণবধ' ও 'অভিমন্যুবধ' নাটকদ্বয়ের সমালোচনা বের হোল। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এক বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল; সেই সমালোচনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাবণবধ নাটক সমালোচিত হয়। মাইকেল লক্ষ্মণ চরিত্রের 'অবমাননা' করেছিলেন। তাই প্রবন্ধকারের মতে "সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যু বধ, আর কি তাঁহার রাবণবধ—এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে।" গিরিশচন্দ্রকে এই প্রবন্ধে 'প্রকৃত কবি' ও 'প্রকৃত ভাবুক' বলা হোল। তবে

রাবণ বধ নাটকে হনুমান কর্তৃক মৃত্যুবাণ আনয়নের ঘটনাকে সমালোচনা করা হয়।[৮]

সর্বাপেক্ষা প্রশংসা লাভ করে গিরিশের ছন্দ—'আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতাও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে।"[৯] এই সমালোচনা অবিমিশ্র প্রশংসাসূচক নয়। কেউ কেউ এই সমালোচনা রবীন্দ্র-সমালোচনা বলে সাব্যস্ত করেছেন।[৫৯] সে অনুমান সম্ভবত ঠিক নয়।[১০] যদি ঠিক হোত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে মাইকেল-ছন্দ পরিত্যাগ করে গিবিশ-ছন্দেই ছন্দিত হতেন। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে 'আনন্দ রহো', 'সীতার বনবাস', ও 'লক্ষ্মণ বর্জন' সমালোচিত হোল।[১১]

'আনন্দরহো' সম্বন্ধে বলা হোল, "এমন মাথা-মুণ্ডু বিরহিত নাটক আমরা কখন দেখি নাই। ইহার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে অর্থ, না আছে ভাব, না আছে একটা পরিষ্কার উপন্যাস। লেখকের কল্পনা, লাগাম খুলিয়া লইয়া, এই ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর ঘোড়দৌড় করাইয়াছেন। গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এইরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি না।"

'সীতার বনবাস' ও 'লক্ষ্মণ বর্জন' মোটামুটি প্রশংসিত হয়; কিন্তু বলা হোল, "লক্ষ্মণবর্জন বিষয়টি অতি মহান, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কিনা সন্দেহ।"[১২] নাটক যে পৃথক সাহিত্য-শাখা সমালোচক তা স্মরণে রেখেছেন; কিন্তু প্রশংসা করেছেন নাটকের বক্তব্য বা আদর্শপ্রবণতার জন্য। "রামের সমস্ত কার্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটি অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটি অক্ষর—প্রেম। রাম ও লক্ষ্মণ হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চ শ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।"

ভারতীর সমালোচনার এই সুরের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-স্মৃতির প্রতিবেদনের মিল আছে। পরবর্তীকালে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয়েছে; সে অবশ্য ১৩০২ সনের কথা। 'ভারতী' ঠাকুরপরিবার-পরিচালিত পত্রিকা হলেও সঞ্জীবনীর ন্যায় থিয়েটার-বিদ্বেষী পত্রিকা নয়। আর্ট ও ধর্মনীতি তারা পৃথক করে দেখতে চাইতেন।[১৩] "আধুনিক অভিনয়ে ধর্ম ব্যাপারটায় একটু বেশী বাড়াবাড়ি হইয়াছে।

কি বিল্বমঙ্গলে কি করমেতিবাই সব জায়গায়ই শ্রীকৃষ্ণ বেচারির এক সময়ে না এক সময়ে দর্শকদিগের সম্মুখে একবার দেখা দিয়া লইতেই হয়! অভিনেতা বা অভিনেত্রীগণের অথবা দর্শকদিগের মধ্যে কাহারো, (স্ত্রী দর্শক ভিন্ন অবশ্য) যে শ্রীকৃষ্ণে অচলাভক্তি আছে তাহাও বোধ হয় না। তথাপি যে শ্রীকৃষ্ণকে একবার চাই-ই, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার ব্যাপার একটু রসাল প্রেম সংঘটিত, আর এইরূপ প্রেম বঙ্গীয় দর্শকের নিতান্তই প্রিয়।

থিয়েটারে কেহ ধর্ম আলোচনা করিতে যায় না, আমোদ করিতে যায়, থিয়েটার ধর্মমন্দির নহে, একথা সত্য। থিয়েটারে কৃষ্ণ ও রাধিকা যেরূপ কথোপকথন করেন, তাহাতে যেন তাঁহারাই দুইপ্রেমিক নাগর ও নাগরিকা। কত হাসি, কত তামাসা, কত দাঁড়াইবার ভঙ্গিমা, কত কটাক্ষ, কত বাক্য হানাহানি। ইহাতে তাঁহাদের পবিত্র ভাব চলিয়া যায়। তাঁহারা যেন দেবদেবী নহেন ও তাঁহাদের প্রেম যেন স্বর্গীয় আত্মার সম্মিলন নহে। যেন সে হীন মনুষ্যেরই মত লালসার বস্তু; শুধু "চাহনি চুম্বন", শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির পদার্থ। ধার্মিক বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণ ও রাধিকার ধারণা যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমার এইরূপ কৃষ্ণের লম্পটবৎ ও রাধিকার বারনারীবৎ অভিনয়ে আপত্তি নাই। কিন্তু আমার কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক উচ্চতর ধারণা আছে।" এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গে যে সব কঠোর উক্তি করা হয়েছে, তার লক্ষ্য সবটুকুই অভিনয় সম্বন্ধে হতে পারে না; মূল নাট্যবস্তুতে তার ইসারা না থাকলে অভিনয়ে তার এতটা স্ফীত রূপায়ন সম্ভব ছিল না।

আর্যদর্শন পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রচারনা চলত; আর্যদর্শন সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন উৎসাহী সমর্থক। এই পত্রিকায় গিরিশচন্দ্রের নাটক সমালোচিত হয়। "অভিমন্যু বধ ও রঙ্গভূমি" নামে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৌশল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়[১৪]। বলা বাহুল্য, সে সমালোচনা গুণমুগ্ধের সমালোচনা নয়, স্পষ্টভাষী সমালোচকের নির্মম মূল্যায়ন। "পুস্তকখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু গর্ভাংক ২৮টি ২৮ বার পটপরিবর্তন; আর মাঝে মাঝে পুতুলোর নাচ। কেবল কুরু পাণ্ডবে কুলায় নাই। কবি-কল্পনা পিশাচ, পিশাচী, ঋষি, গণৎকার প্রভৃতি কত কি আনিয়া জুটাইয়াছেন। ...বাস্তবিক নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনেরও স্বভাব সুচিত্রিত হয় নাই। প্রকৃত নাটক পুস্তকখানিতে অতি বিরল। অধিক কথা কি, আমরা

গিরিশবাবুর রচিত "অভিমন্যু বধ" আদ্যোপান্তপাঠ করিয়াছি, তাহার অভিনয়ও দেখিয়াছি; কিন্তু এতাদশ শোকপূর্ণ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া অভিনীত দেখিয়া আমাদের পোড়াচক্ষে এক বিন্দুও জল আসে নাই। অনেকবার ভাবিয়াছি যে হয়ত আমরা নিতান্ত হৃদয়হীন; তাই হৃদয়ের ছন্দ বুঝিতে পারিলাম না। হয়ত আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি ততদূর উন্নত নয় বলিয়া এতাদৃশ উচ্চদরের কবিত্ব বুঝিতে পারিলাম না। আহা, যেন তাহাই হয়, আমাদের ভ্রম সাব্যস্ত হয়। নহিলে, বাংলা সাহিত্যের যে শোচনীয় দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মনে করিলেও কষ্টবোধ হয়।

* * *

আমরা গিরিশবাবুর প্রণীত পুস্তকাদিতে দেখিতে পাই, তিনি কিছু অদ্ভুত ও অলৌকিক কল্পনা ভালবাসেন। ম্যাকবেথে যেমন ডাইনেরা আছে, তিনি সেইরূপ কল্পনা ভালবাসেন; তিনি সকল প্রশ্নেই ডাইন, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, রাক্ষস, রাক্ষসী, ভূত, প্রেত, দৈত্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অবতারণা করিয়া থাকেন। তাঁহার গ্রন্থাদিতে কবিত্ব ও নাটকত্ব যত না থাকে, কেবল অদৃশ্য দৃশ্যে পরিপূর্ণ। তিনি সং সাজাইতে এবং অভিনয়ে সং আনিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তিনি এরূপ ব্যক্তিগণের অবতারণার জন্য গ্রন্থ মধ্যে স্থান খুঁজিয়া লয়েন; অবসর করিয়া লয়েন। এখনকার রঙ্গভূমি যেমন স্কুলের ছাত্রে পরিপূর্ণ, গিরিশবাবুও তেমনি তাহা বুঝিয়া নাটক লেখেন। নাটক মধ্যে কেবল সং দেন, সুতরাং বাহবা ও হাততালীর ধুম পড়িয়া যায়। প্রাচীন-পক্ষীয়গণ যদি কেহ অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহারা হাসিয়া উঠিয়া আসেন; মনে মনে কহেন, যেমন শ্রোতা তেমনি কবি জুটিয়াছে।

এক্ষণে আমাদের রঙ্গভূমি এত অশ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছে। নাটকগুলি ছেলে-ভুলান বহি, অদ্ভুত রসে পরিপূরিত হইয়া কল্পনাকে আকৃষ্ট করে, অভিনয় ছেলে-ভুলান কীর্তন মাত্র।"

'অভিমন্যু বধ' বা 'সীতার বনবাস' সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করেছেন সমালোচক; এটি তত উল্লেখনীয় নয়। উল্লেখনীয় হোল নাট্যকার গিরিশ কী রীতি অবলম্বন করে দর্শক মনোরঞ্জনে তৎপর হতেন—সেই প্রসঙ্গটি সমালোচক অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন। সমালোচক ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত নন। কাজেই নাট্যশালা ও নাটক সম্বন্ধে তিনি 'অন্ধ' বিদ্বেষ দ্বারা চালিত হয়ে গিরিশ-সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি

'নব্যভারত' পত্রিকায় 'রূপ সনাতন' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে একই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[১৫] "রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের প্রকাশ প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় এই নাটকখানি মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাহি না। গ্রন্থখানি নাট্যাংশে তত উৎকৃষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, বোধ হয়, গ্রন্থকর্তাকে বাধ্য হইয়া অনেক সময়ে অনেক আশ্চর্য ঘটনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" নব্যভারত-এর সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন। কিন্তু তীব্র ব্রাহ্মবিদ্বেষী পত্রিকায়ও প্রশংসা ধ্বনিত হয়নি। উদাহরণ দিচ্ছি, "গত ১১ই শ্রাবণ ষ্টার থিয়েটারে 'চণ্ড' নামক এক নূতন নাটকের অভিনয় হয়। এ অভিনয়ে উহাদের সেই 'যদৃচ্ছা' ভাবটার যেন বড়ই বাড়াবাড়ি। কি যে নাটক হইয়াছে—'চণ্ড' না 'মুণ্ড'—তাহার কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না। ⋯নাটকের একটা চরিত্রও সুপরিস্ফুট নহে, স্বাভাবিক নহে, শিক্ষাপ্রদ নহে।"[১৬]

সাহিত্যসম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ভিন্ন মতালম্বী ছিলেন। সাহিত্যের নানা প্রশ্নে এই পত্রিকা বহুক্ষেত্রেই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকের উপর এই পত্রিকায় যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্ম-সম্পাদিত পত্রিকার টীকা-টিপ্পনীর সঙ্গে বিশেষ প্রতিকূলতা করেনি।

১২৯৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যায় 'নাটক ও তদ্বিষয়ক বিবরণে' প্রবন্ধকার লিখছেন, "শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত অনেক নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। তাঁহার কোন কোন নাটক পড়িয়াও দেখিয়াছি।" প্রবন্ধকারের মতে কেবল বারাঙ্গনা চরিত্র চিত্রণে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন বলিয়া চিরকালই তাঁহার নটীর সহিত কারবার করিতে হইয়াছে। এখানে নটী মাত্রেই বারবণিতা, সুতরাং, তাঁহার যেটুকু কল্পনাশক্তি আছে, সেইটুকুর বলে, তাঁহার প্রণীত বারবণিতা চরিত্র এত সুন্দর দেখায়, এত প্রকৃত বোধ হয়, এত জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ভ্রম হয়।"[১৭]

নিঃসন্দেহে এ সমালোচনায় গিরিশ-প্রতিভার কোন বিরাট রূপ পরিস্ফুট হয় না।

'জনা' নাটক সম্বন্ধে হাল আমলের সমালোচকেরা যে প্রকার প্রশংসামুখর, সাহিত্যসম্পাদক আদৌ সে প্রকার নন। ১৩০১ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বলা হোল, "সাহিত্য হিসাবে জনার উপযোগিতা এত অল্প যে, সাহিত্য পত্রে তাহার উল্লেখ না করিলেও ক্ষতি হইত না।"[১৮]

১৩০৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্রের নাম উল্লেখ না করে বলা হোল—"এখন কেবল থিয়েটারের অধিনেতা, আচার্য, অধ্যক্ষ, একটর ও ম্যানেজারেরই নাটক লিখেন না, থিয়েটারের বাজারসরকার ও বিজ্ঞাপনবরদারেরাও নাটক লিখিয়া থাকেন…।" পরিশেষে প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত উদ্ধৃত করেন "বাংলা ভাষায় নাটক নাই।"[১৯]

১৩১১ সনে আষাঢ় সংখ্যায় গ্রন্থকারের নাম ও গ্রন্থ উল্লেখ করেই প্রবন্ধ রচনা করা হোল ; বলা বাহুল্য সে প্রবন্ধ স্তুতিমূলক নয়।

"সন্ধ্যার পর চুনীবাবুর সহিত মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা খানেক কাটাইলাম। অভিনয়ের বিষয়, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের নূতন নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস"। বসিয়া বসিয়া দুইটা অঙ্ক অভিনীত হইতে দেখিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যও তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। গিরিশবাবুর পৌরাণিক ও ঈশ্বরভক্তিমূলক নাটকগুলি মন্দ হইত না। নাটকত্ব তেমন থাক বা নাই থাক, সেগুলি তবু দেখিতে পারা যায়। আর দেখিয়া প্রাণের ভিতর উচ্ছ্বাসও অনুভূত হয়। …অদ্যকার অভিনীত নাটকের ভিতর কীচকের মুখে এমন কতকগুলো কথা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা প্রকাশ্য রঙ্গস্থলে কোন মতেই মার্জনীয় নহে। আর কীচক তাহার ভগিনী বিরাটমহিষীর সমক্ষে যেরূপ তাহার কামতৃষ্ণা বর্ণিত করিল, তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। রঙ্গালয়ে অনেক ভদ্রমহিলার সমাগম হইয়া থাকে ; অন্ততঃ তাঁহাদের মুখ চাহিয়াও গিরিশবাবুর এই সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।"[২০]

গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। সমালোচক লিখলেন, "চোখের বালি উপন্যাসে নাটকত্ব কোথায় বলিতে পারি না।" প্রকৃত ত্রুটি উপন্যাসে, না নাট্য-রূপান্তরে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। ২৪শে পৌষ ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'মলিনা-বিকাশ' ও 'বাবু' নাটকদ্বয়ের অভিনয় বর্ণিত হোল। সমালোচক বড় রূঢ়ভাষী ; তিনি বললেন, 'সবই কুরঞ্জিত ও অতিরঞ্জিত। মন্তব্য এখানে শেষ নয় ; বলা হোল, "সব ছাইভস্মের পশার।"[২১]

'চিকিৎসাতত্ত্ব ও সমীরণ' পত্রিকার ১ম খণ্ড তৃতীয় সংখ্যায় (১৩০১) জনা নাটকের এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে জনা নাটকের আখ্যানবস্তুর পৌরাণিকতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে বলা হোল, "আমাদের মতে কাশীদাসের জনাই প্রকৃত জনা।"[২২]

সমালোচকের মতে, পরী দৈত্য দানব দিয়ে এই নাটক রচনা করার ফলে এই নাটক একটি 'হযবরল নাটকে' পরিণত হয়েছে। "নাটক আমাদের দেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।" উপসংহারে রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে বলা হোল, "তাঁহারা যে আপনাদের মধ্যে একটা গণ্ডি কাটিয়া তাহার বাহিরে আর যাইবেন না এমনই সংকল্প করিয়াছেন ইহা বড়ই ভুল।"

১৩০৩ বঙ্গাব্দে 'মুকুলমুঞ্জরা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে আরও কঠিন মন্তব্য করা হোল : যিনি রাজা তিনি 'মাগী', "ব্যাটা" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন তাঁর কন্যা সখিকে 'দূর মড়া' বলেন...।

বলি, এরূপ সম্বোধন রাজা, জমীদার দূরে থাক, কোনও ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আছে কি? গিরিশবাবু কি বাস্তবিক ছোট লোকের আচারব্যবহার ভিন্ন কোন ভদ্র পরিবারের আচারব্যবহার লিখিতে পারেন না?"[২৩]

সে যুগের অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা সাধারণীতে নাটক সম্বন্ধে নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে একটি মাত্র নিবন্ধ থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি।

"বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট নাটক আছে কিনা, সে এক ঘটত্ব-পটত্ব-ঘাত-প্রতিঘাত-ঘটকীভূত" ঘোরতর নৈয়ায়িক তর্কের কথা। দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল অনেক নাটক লিখিয়াছেন,—নাটক লিখিয়া দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; এবং বঙ্গের বিবিধ রঙ্গভূমিতে সেই সকল নাটকের প্রদর্শনদ্বারা শত সহস্র লোককে হাসাইয়াছেন, শত সহস্র লোককে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন, অথবা কিছুকালের জন্য স্বপ্ন সুলভ স্বর্গ-কুলের আভা দেখাইয়া আনন্দে অধীর করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে, তাঁহারা যে সকল গ্রন্থকে গুণ-দোষ-বিচার-নিপুন-জনসমাজের নিকট নাটক নামে উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক,—না কথোপকথনচ্ছলে রচিত অভিনয়যোগ্য উপন্যাস মাত্র।"[২৪] অন্যান্য নাট্যকারদের প্রসঙ্গ যে এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে, তার কারণ ঐতিহাসিক কালানুক্রমিতা দেখানো। প্রবন্ধকারের আসল লক্ষ্য ছিল গিরিশ ও অমৃতলালের নাট্যরচনার মূল্যবিচার। এই প্রবন্ধের লেখক হলেন সে-যুগের সুপরিচিত সাহিত্যসমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

গিরিশ-সমালোচনার ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, গিরিশচন্দ্রের নাটক তখনও অনন্য সম্মানের অধিকারী হয়নি। তাঁর

বিশিষ্ট অভিনয়-রীতির গুণাগুণ স্মরণে রেখেও সমালোচকেরা গিরিশচন্দ্রের নাটককে সাধারণভাবে বিশেষ স্বীকৃতি দেন নি।

গিরিশ সমালোচনার দ্বিতীয় যুগ

গিরিশ-সমালোচনার দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়েছে 'নারায়ণ'-পত্রিকা প্রকাশনার পর থেকে। তখন গিরিশচন্দ্র পরলোকগমন করেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হলেন সেই নতুন যুগের শ্রষ্টা। চিত্তরঞ্জন প্রখ্যাত ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এবং হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সাহিত্যিক খ্যাতির প্রত্যাশী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশঃত তাঁর সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষা তাঁর পারিবারিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। কবিতা পূর্বেও তিনি রচনা করেছেন, এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'মালঞ্চ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই মালঞ্চ কাব্যে তাঁর 'বারবিলাসিনী' নামক একটি কবিতা স্থান পায়। দেশবন্ধু কন্যা অপর্ণা রায় লিখেছেন যে, এই কবিতা রচনার জন্য চিত্তরঞ্জনের বিবাহ বাসরে অনেক ব্রাহ্ম অনুপস্থিত ছিলেন। (কবিচিত্ত-পাদটীকা—অপর্ণা রায়—পৃ-৫৮)। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'মালা' কাব্য প্রকাশিত হয় ; এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বহু আড়ম্বরের সঙ্গে 'সাগর সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। এতকাল রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের কাব্য সম্বন্ধে কোন মতামত দেননি। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে নতুন, বিরূপতার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলেন।[২৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির প্রশংসায় রবীন্দ্রনাথকে না দেখতে পেয়ে ক্রুদ্ধ হন, কবি চিত্তরঞ্জনও তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ না করে রবীন্দ্র-বিরোধী হবার পথ পা বাড়ান।

ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদও দ্রুত ঘটতে লাগল ; তিনি অচিরেই নব্যহিন্দুগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন ; এবং তাঁর এই জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল মতামত বক্ষে ধারণ করেই নারায়ণ পত্রিকা প্রচারিত হোল। ১৩২২ সনে অগ্রহায়ণ মাসে এই পত্রিকার ১ম সংখ্যা বের হয়। এই পত্রিকা থেকে ব্রাহ্মদের ও রবীন্দ্রনাথের মতামতের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালান হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ এর কিছুকাল পরে আমেরিকায় চলে যান, সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদের উগ্ররূপের অবাঞ্ছিত প্রভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৩২৪ সনে চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি রূপে কবির জাতীয়তাবাদ-সম্পর্কিত বক্তৃতাবলীর বিকৃত সমালোচনা করেন।

অথচ জাতির প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই সকলের আগে বৃটিশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। মিসেস অ্যানি বেসান্তের গ্রেপ্তারে তিনিই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ করেন।

এই বৎসরই (১৩২৪) ভাদ্র মাসে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রকাশিত হোল। এই প্রবন্ধে বৃটিশ চণ্ডনীতির যেমন তীব্র সমালোচনা থাকল, তেমনি থাকল দেশীয় ধর্মান্ধতা ও রক্ষণশীলতার সমালোচনা। এই প্রবন্ধে তিনি বললেন, "ধর্ম বলে, যে যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম-তন্ত্র।" রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তি যেমন বিদেশী স্বৈরশাসকদের অসন্তোষের কারণ হোল, তেমনি অসন্তোষ উৎপাদন করল তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী' গোষ্ঠীর মনে।

এই সময়েই সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টান্ত খুঁজে-পেতে বের করা হতে লাগল। ১৩২১ সনে 'কবিতার কথা' প্রবন্ধ লিখলেন চিত্তরঞ্জন; এই প্রবন্ধে তিনি বললেন, চণ্ডীদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু পর্যন্ত বাংলা কবিতার যে ধারা প্রবাহিত ছিল, সেই অক্ষুন্ন ধারা কোথায় গেল?

বর্তমান যুগের পাঠক এই জাতীয় মন্তব্য পড়ে হয়ত মনে করতে পারেন এ সব উক্তি পরিহাসছলে বলা হয়েছে। কারণ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়ে গেছে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কবি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকবির সম্মান লাভ করেছেন। না, এসব 'পরিহাস বিজল্পিতম্' নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী একজন কবি ও সাহিত্যিক ত চাই। তাই ১৩২২ সনে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ দেন-(সেই অভিভাষণটির নাম 'বাঙলার গীতিকবিতা), তাতে বললেন, "তাহার প্রাণের ভিতর যে প্রাণ ছিল, সে তখন তাহার প্রাণপুট বন্ধ করিয়া দিল। সে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল, এখন আর সে গান শুনিতে পাই না। একমাত্র গিরিশচন্দ্র সেই গানের ধারা ও ভাবের আভাষকে কবিওয়ালাদের পদানুসরণ করিয়া কতক পরিমাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর আসিয়াছিলেন নীলকণ্ঠ।"

তখনও নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রশস্তি শুরু হয় নি। তবে নাট্যশালা সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল; ১৯১৯ সালে মনোমোহন থিয়েটারে অভিনেত্রী যাদুমণির স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমস্মৃতি তর্পণকালে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তুলনা করলেন; তাঁর মতে উভয়েই বাংলার সত্যকার প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন। "ইঁহারা উভয়েই স্রষ্টা ও কবি, বাঙ্গলার এমন কি জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহারা অত্যন্ত উচ্চস্তরের কবি।"

জগৎ যাঁকে "উচ্চস্তরের কবি" বলে বরণ করেছে, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্যই এই নতুন করে "উচ্চস্তরে"র সন্ধান। গিরিশ-প্রশস্তির তুঙ্গ স্পর্শ করল ১৯২৪ সনের জুনমাসে গিরিশ-স্মৃতিসভার বক্তৃতায়। স্বরাজ্যপার্টির নেতা বললেন, "গিরিশের সৃষ্টিতে স্বরাজ্যেরই অভিব্যক্তি পাই।

গিরিশবাবুর কবিতায়—গানে আমরা জাতীয়তা পাই; প্রাণ পাই, দেশের একটা স্বরূপ মূর্তি দেখিতে পাই,—ইহাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য।

গিরিশচন্দ্র খাঁটি দেশি কবি,—তিনি দেশীয়ভাবে দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন—দেশের প্রাণের কথা ফুটাইয়াছেন—দেশের সুখদুঃখ, অভাব-আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি মহাকবি, দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এমন একদিন আসিবে, যেদিন সমস্ত জগৎ ভারতের দ্বারে আসিয়া নতজানু হইয়া ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক আলোচনা করিবে, তখন গিরিশচন্দ্র স্বরূপ মূর্তিতে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন, এবং তখন তাঁহারা জানিতে পারিবেন—গিরিশচন্দ্র কত বড় কবি, স্রষ্টা ও নাট্যকার।"

গিরিশস্মৃতিসভায় চিত্তরঞ্জনের এই বক্তৃতার পর মহেন্দ্রনাথ দত্ত, অমরেন্দ্র নাথ রায়, কুমুদবন্ধু সেন, দেবেন্দ্রনাথ বসু, হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতির কোন উক্তিই আর অতিশয়োক্তির পর্যায়ে পড়তে পারে না।

গিরিশ-রচনা-সম্ভারের সম্পাদক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এই সব সমালোচকদের বহু উক্তি উৎকলিত করে বলেছেন, "দুঃখের বিষয় এই যে গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের অনেকেরই গ্রন্থ এইরূপ অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ।…এই জাতীয় সমালোচনা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বহুলোকের মনে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে।"[২৬] প্রকৃত পক্ষে এই সব সমালোচকদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। কারণ তাঁদের সকলের গ্রন্থই গিরিশ-বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত। এই সমাদরদুর্লভ দেশে তাঁরা আহূত হয়ে কৃতজ্ঞতাশূন্য হতে না পারায় তাঁদের নিন্দিত করা যায় না।

গিরিশ-সাহিত্য বিচার করতে হলে আমাদের গিরিশের সাহিত্যই বিচার করতে হবে; তাঁর ধর্মমত বা ভক্তি-বিনম্রতা নয়। বিশ্বসাহিত্যে অধার্মিক

হয়েও কেউ কেউ শ্রেষ্ঠকবি বা নাট্যকার হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত সুপ্রচুর; স্পর্দ্ধায় পূর্ণ, ভক্তিতে শূন্য শিল্পীর সংখ্যা কম নয়।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যকারজীবন তিনটি স্তরে বিভক্ত। তিনটি স্তরই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। গিরিশচন্দ্রের নাট্যবোধ, নাট্যরচনারীতি তদানীন্তন মঞ্চব্যবস্থার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যযুক্ত, তা বিবেচনার যোগ্য। ১৮৭৬ সনের পর বাঙ্গালী দর্শক ও বাংলা মঞ্চের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ উদ্ভূত হয়েছিল, গিরিশচন্দ্র তাকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন বা পরিবর্তিত করেছেন, এ আলোচনারও দরকার আছে।

গিরিশ-নাটক

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নাট্যনিয়ন্ত্রন-আইন বিধিবদ্ধ হোল। তার পূর্বে গিরিশ চন্দ্র কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। মৃণালিনী উপন্যাসে যে পরিমাণ দেশপ্রেমের কথা আছে, নাটকে তার ষোল আনা বজায় ছিল, হয়ত দুই-এক আনা বাড়তিও ছিল।

ছিয়াত্তর সনের পর দেশপ্রেমসমৃদ্ধ নাটক আর লেখা হোল না। প্রথম যুগে দুইটি গীতিনাট্য 'আগমনী' ও 'অকাল বোধন' প্রকাশিত হয়। দুইটি 'নাটক'ই ব্যাপকঅর্থে নাটক। অর্থাৎ এগুলি প্রাচীন ঝুমুর-গানের রীতিতে লেখা; অবশ্য এই জাতীয় রচনার আদিতম দৃষ্টান্ত হোল 'সতী কি কলঙ্কিনী'।

১৮৭৭-৮১ সালে তাঁর দোললীলা (১৮৭৮), মায়াতরু (১৮৮১) ও মোহিনীপ্রতিমা (১৮৮১) প্রকাশিত হয়। নাট্যকার জানতেন এগুলি আধুনিক অর্থে নাটক নয়, এগুলি নাটকের প্রাক-নাটকীয় রূপ। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষে তাঁর 'আনন্দ রহো' (১৮৮৮) প্রকাশিত হোল। 'আনন্দ রহো' তাঁর প্রথম মৌলিক নাটক। এই নাটক দর্শকের প্রশংসা পায়নি। কিন্তু এই নাটকের বক্ষে গিরিশচন্দ্রের নাট্যচিন্তার কিছু কিছু অন্তরঙ্গ উপাদান ধরা পড়ে।

ঐতিহাসিক নাটক

'আনন্দ রহো' লেখক কর্তৃক 'ঐতিহাসিক নাটক' নামে অভিহিত। ডক্টর সুকুমার সেনের মতে "শুধু আকবর মানসিংহ ইত্যাদি নাম ছাড়া ঐতিহাসিকত্ব কিছু নাই, নাটকত্ব নাই।"

'ঐতিহাসিকত্ব নাই'—একথা ঠিক। কিন্তু নাটকত্ব নাই, এ উক্তি বিবেচনার যোগ্য। কারণ এই একই আঙ্গিক তাঁর 'বিষাদ' ও অন্যান্য নাটকে অনুসৃত হয়েছে। এই নাটকে 'বেতাল' চরিত্র পরবর্তী নাটকে আধ-পাগলা চরিত্রের ঊর্দ্ধতন পুরুষ। এই নাটক যে জনপ্রিয় হয়নি, তার কারণ তখনও হিন্দুমেলা যুগের ভাবচেতনা একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। নাটকের বক্তব্য এক কূল থেকে সরে গিয়ে আর কূলে গিয়ে তখনও নোঙ্গর ফেলে নি, যদিও সরকারী নির্দেশ নেমে এসেছে। ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র নতুন নাট্য-পরিবেশে নাটক লিখতে শুরু করে নাটকের বক্তব্যে পরিবর্তন নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যীয় কলাকৌশলও পরিবর্তিত হতে লাগল। ইতিপূর্বে নাটকে দেশপ্রেমের রুদ্রবাণী পরিবেশিত হোত; ঘটনা হিসাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতি লোমহর্ষক ব্যাপার বেশি প্রাধান্য পেত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-উপেন্দ্রনাথের সকল নাটকের আবেদন ছিল অত্যন্ত উগ্রতাধর্মী। গিরিশচন্দ্র পরিবর্তিত অবস্থার জন্যই যে-সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন।

তিনি ধর্মীয় আবহাওয়ার শরণাপন্ন হলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা-সহবতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ধর্মীয় বোধ নিতান্ত লৌকিক হোল।

তাঁর রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস ও সীতাহরণ—সবই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুসরণে লিখিত; একমাত্র অভিমন্যুবধ অন্য সূত্র থেকে এসেছে। কিন্তু অভিমন্যুবধ ব্যাসদেব অনুসরণে নয়, কাশীরাম দাসের অনুসরণে লিখিত।

'আনন্দ রহো' নাটক ইতিহাস অবলম্বনে লেখা নয়, ঐতিহাসিক চরিত্রের সহায়তায় লেখা। রাণা প্রতাপ, আকবর বাদশাহ, রাজা মানসিংহ, যুবরাজ সেলিম সকলেই যে ঐতিহাসিক চরিত্র, এবিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু নাটকের ঘটনায় কোন ঐতিহাসিক পারম্পর্য বা ঐতিহাসিক বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা হয়নি। বেতাল নামক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, সে না গুপ্তচর, না মরমী সাধক। তার যাতায়াত সর্বত্র, এমন কি বায়ু অপেক্ষাও তার গতি অবাধ। সে আকবর বাদশাহের রাজসভায়, রাণা প্রতাপের মন্ত্রণাসভায়, এমন কি আকবর বাদশাহ যখন তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে একান্তে কথাবার্তা বলছেন (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক) সেখানেও সে গিয়ে হাজির হয়েছে।

গিরিশের নাটকে এই জাতীয় বেপরোয়াভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে; সম্ভাব্যতা গিরিশনাট্যবস্তুর সঙ্গে সর্বদা সদ্ভাব রাখেনি।

এ নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মত রোম্যানটিক প্রেম-প্রসঙ্গ আছে। সেলিম-লহনা প্রেম গিরিশচন্দ্র কেন উপস্থাপিত করলেন, তার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। রাণা প্রতাপের মেয়ের সঙ্গে সেলিমের প্রণয় দেখে তিনি সঙ্গ-সঙ্গে মঞ্চ ত্যাগ করেছিলেন, এই রকম একটা গল্প বিনোদিনী দাসী আমাদের শুনিয়েছেন। এখানেও রাজপুতানীর সঙ্গে মোগল তরুণের প্রণয় বর্ণিত হোল। কিন্তু নাট্যকারের সমর্থন পেল না। মানসিংহের জবানীতে এ বিষয়ে নাট্যকারের মনোভাবই প্রতিফলিত হোল।

মানসিংহ। এই আমার বীরগর্ব, এই আমার বুদ্ধিকৌশল, ভাল, উত্তম,- আপনরি কন্যার উপপতি সংঘটন কল্যেম, রাজপুতানা! আর কি আমি রাজপুত নামের যোগ্য হব; ইতিহাসের পত্র অবশ্যই আমার নামে কলঙ্কিত হবে, রাণা প্রতাপের নামে বন্ধ্যা আবাবল্লি কুসুমময়-কুঞ্জভূষিত হবে, আমার নামে বাড়বানল প্রজ্জ্বলিত হবে। ৪।৩

ডক্টর সুকুমার সেন বলেছিলেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী বোধ হয় গিরিশচন্দ্রকে আনন্দ রহো রচনা করিতে প্রেরণা দিয়াছিল।"[২৭] আমাদের মনে হয় গিরিশচন্দ্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিবাদই করেছেন; তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে জাতিধর্মবর্ণভেদের ঊর্ধ্বে মানবধর্মকে স্থান দেওয়া হয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের নাটকে সাম্প্রদায়িকতার কাছে, পরধর্মঅসহিষ্ণুতাব কাছে মানবধর্মের লাঞ্ছনা ঘটেছে।

ঐতিহাসিক নাটক বলে পরিচয় দিলেও এ নাটকের গল্পে কোন পারম্পর্য নেই। নিছক হেঁয়ালি হলেও একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করা যেত। হেঁয়ালির সঙ্গে হিন্দু গৌরব-বোধ, যবন-বিদ্বেষ, দেব-ভক্তি (যেমন "বেতাল কালীর পদে মস্তক দেখিয়া শয়ন—" ১।১) সবই স্থান পেয়েছে। নাটকের মুখ্য কাহিনীর সঙ্গে নানান কিছু জট পাকিয়ে আছে। নাটকের কাহিনী প্লট হতে পারেনি। কুশীলবেরাও ব্যক্তি বা চরিত্র হয়নি। গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড' প্রকাশিত হয় ১২৯৭ বঙ্গাব্দে। এটি 'আনন্দ রহো' নাটকের ন্যায় কেবল নামাঙ্কিত ঐতিহাসিক নাটক নয়। রাজপুত ইতিবৃত্তের সঙ্গে এই নাটকের কাহিনীর সম্পর্ক আছে। নাট্যকার এই নাটকে বিজরী-প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন; এই প্রসঙ্গের পক্ষে কোন ইতিহাস-সম্মতি নেই। ঐতিহাসিক নাটকে যে সুদূরাশয়তা ও ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা প্রত্যাশিত, এখানে তা নেই। মধ্যযুগের বিশেষ জীবনছাঁদটি 'thought idiom of the age'

ধরতে হবে, ঐতিহাসিক নাট্যকারের এই হবে প্রতিজ্ঞা। কিন্তু গিরিশ এ বিষয়ে আদৌ সচেতন নন; তাঁর প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটকসমূহ তাঁর অন্যান্য "কল্পনামূলক" নাটকের মত। 'বিষাদ' নাটকের নাট্যরীতি 'চণ্ড'র রীতি থেকে পৃথক নয়। এবং চণ্ডনাটকে একটি সাধারণ পরিহাসকে অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়ায় কাহিনীতে জটিলতা এলো। যে কন্যা চণ্ডের বধূ হতে পারত, সে হোল তার বিমাতা। সেই কন্যারই পুত্রের সে হোল রক্ষক। এবং এই খান থেকে শুরু হোল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র। চণ্ড রাজ্য থেকে নির্বাসিত হোল। একদিন চরম বিপদের মুহূর্তে তাকে আবার আহ্বান করা হোল; সে ফিরে এল এবং ছোট ভাই মুকুলকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগল। নাটক শেষ হোল। নাটক কেন লেখা হয়েছে, তা বুঝতে পারি। অভিনয় হোল উদ্দেশ্য। কিন্তু চণ্ড কেন উপস্থাপিত হয়েছে, তা পরিষ্কার নয়। শুধু ঘটনার জটিলতার জন্যই তাকে আহ্বান করা হয়েছে, এইরূপ একটা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পাঁচ অঙ্কের এই নাটক ঘটনার সূত্র ধরে এগিয়েছে, নাটকীয় শৃঙ্খলার প্রয়োজনে নয়।

দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম—ঐতিহাসিক নাটকের এই সব অতি-সমাদৃত প্রসঙ্গ এই নাটকে স্থান পায়নি।

'চণ্ড' নাটক রচনার প্রায় বারো বৎসর পরে তিনি আবার ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন। তখন বাংলাদেশ স্বদেশী আন্দোলনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। ঐতিহাসিক নানা ঘটনা সমসাময়িক প্রয়োজনে রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

প্রথম দুটি নাটক 'ভ্রান্তি' ও 'সৎনাম' ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হলেও প্রথমোক্ত নাটকে দেশপ্রেম নয়, নারী-প্রেমই প্রধান প্রেম। দ্বিতীয়টিতে প্রাধান্য পাবে সম্প্রদায়-প্রেম। স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী যে ভাবে মহৎবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তার এখানে সাক্ষাৎ মিলবে না। হিন্দুমেলার যুগের হিন্দুজাতীয়তাবাদ তখনও জের টেনে চলেছে। স্বদেশী আন্দোলন থেকে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের আবেদনে ভিন্নতা দেখা দেবে। 'সৎনাম' ও 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের বক্তব্যের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে এই সত্য বেরিয়ে আসবে।

'ভ্রান্তি' নাটকের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে গৃহীত, তবে এটা কিম্বদন্তী ও ইতিহাসের মিশ্রণ। চণ্ড নাটকের বিজরীর ন্যায় এখানেও

অসৎ নারীর প্রসঙ্গ আছে। গঙ্গা হোল বেশ্যা। "আমাদের বেশ্যার ভালোবাসা। যতদিন দিলে থুলে. মিষ্টি কথা বললে, ভালবাসলুম, তারপর ফুরুলো" (১।৭) এই নাটকে রঙ্গলাল নামে একটি চরিত্রসৃষ্টি করা হয়েছে। তার দেববিদ্বেষপূর্ণ কথা আসলে মানবপ্রেমের কথা।

রঙ্গলাল। আমার দেবতা কথা কয়, আমার দেবতার প্রাণ আছে, আমার দেবতা এমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি সত্যি ভোগ খায়। আমার দেবতা পরম সুন্দর।

গঙ্গা। কে তোমার দেবতা শুনি?

রঙ্গলাল। মানুষ আমার দেবতা—যারে হিন্দু মুসলমান ক্রিশ্চান বলে দেবতার অংশ। শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আছে, একথার তর্ক-বিতর্ক নাই। ২।১

রঙ্গলাল বলেছিল, "মহারাজ আমার যদি শত প্রাণ থাকতো, জননী জন্মভূমির কার্যে আমি তৃণের ন্যায় ত্যাগ করতেম।'

শেষ পর্যন্ত সবাই প্রাণ ত্যাগ করল, কেউ লড়াই ক'রে, কেউ লড়াই না ক'রে। এবং প্রবল হরিধ্বনির মধ্যে নাটকের যবনিকাপাত হোল। আর নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ স্বয়ং বলছেন, "তোম লোক আপনাকো দেওতাকো নাম লেও।"

নাটক এইভাবে তার বিভ্রান্তিপূর্ণ বক্তব্যে সমাপ্তি লাভ করল।

'সৎনাম'(১৩০২) খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সৎনামীদের বিদ্রোহ হয়। সেই ইতিহাস অবলম্বনে এই নাটক রচিত। আওরঙ্গজেব ব্যতীত কেউই ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। 'আনন্দমঠ'কে কেউ যদি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেন, তবে তিনি 'সৎনাম' নাটককেও ঐতিহাসিক নাটক বলতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাটক আর ইতিহাস-আশ্রিত নাটক এক হয়ে পড়ে।

এ নাটকেও পূর্ববর্তী দুইটি নাটকের মত গিরিশচন্দ্র অনেক অবাস্তব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আর জাতীয়তাবাদের নাম করে সাম্প্রদায়িকতা এনেছেন; মুসলীম গোঁড়ামির প্রতিষেধক যে হিন্দু গোঁড়ামি নয়, এ সত্য তিনি মানেন নি। নাটকে কোন নায়ক নেই, আছে নায়িকা, গুলসানা তার নাম। তার মধ্যে প্রেম ও প্রতিহিংসার দ্বন্দ্ব নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দরিয়া বিবির চরিত্রের মধ্যে যেমন বিশ্বাসযোগ্যতা আছে, এখানে তেমন নেই। চরিত্রসমূহ ইতিহাসের কুশীলব নয়। ফকিররাম চরিত্রে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবাস্তব রোম্যানটিক আতিশয্যের অনুসরণ। পাঁচ অঙ্কের এই নাটক তৃতীয় অঙ্কেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তখন রাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ অপেক্ষা ব্যক্তিগত প্রেম-প্রতিহিংসা বড় হয়ে উঠেছে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের যুগে বাংলা নাট্যশালা নাট্যনিয়ন্ত্রণ-আইনের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হয়েছিল বা অস্বীকার করেছিল। বাংলা নাট্যশালা বহুকাল পরে আবার স্বদেশ-চিন্তায় অম্বিষ্ট হোল। ১৯০৩ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ'প্রতাপাদিত্য'রচনা করে এই ধারার মুখে খুলে দেন। ষ্টারে এই নাটক মঞ্চস্থ হ'লে (১৯০৩, ১৪ আগষ্ট), ক্লাসিক থিয়েটারে হারান চন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' উপন্যাসকে নাট্য রূপায়িত করে 'বঙ্গের প্রতাপ' নামে মঞ্চস্থ করা (২৯ আগষ্ট, ১৯০৩) হয়। তারপর গিরিশচন্দ্র আসরে নামলেন। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা, (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫),'মীরকাশিম' (২রা আষাঢ, ১৩১৩) 'ছত্রপতি শিবাজী' (৩২ শ্রাবণ, ১৩১৪) নতুন ধারার নাটক। স্বদেশী যুগের বীরনায়কদের আদর্শে ব্যক্তি-ভিত্তিক নাটক, 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' ইংরেজ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; কিন্তু 'ছত্রপতি শিবাজী' হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের নাটক।

গিরিশ রচিত ঐতিহাসিক নাটকের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়েছে 'সিরাজদ্দৌলা' থেকে। 'সিরাজদ্দৌলা' তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক নয়; যথার্থ ঐতিহাসিক নাটক (Chronicle play)। সিরাজ-জীবনের ইতিহাস-অনুমোদিত যাবতীয় ঘটনাকে তিনি নাটকের অন্তর্ভুক্ত করে বসেছেন; কতটুকু নাট্যীয় উপযোগিতা সম্পন্ন, তা তিনি বিচার করেন নি। 'মীরকাশিম' নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "নাটকাকারে ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি, সাধারণ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন আমার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। ...নাটকখানি বৃহৎ কলেবর হইয়াছে। ঘটনার পরে ঘটনা এত অধিক যে, দর্শকের রুচির উপব লক্ষ্য রাখিয়া, এক খণ্ডে নাটক সমাপ্ত করায়, নাটকখানি কোনরূপে সংক্ষিপ্ত করিতে পারি নাই।" 'মীরকাশিম' রচনাকালে যে বিপত্তির সম্মুখীন, 'সিরাজদ্দৌলা'তেও সেই একই প্রকার বিপত্তির সম্মুখীন তিনি হন। তবে সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ততা হেতু নাটকের ঘটনা এতটা বিস্তৃত হতে পারেনি।

এই যুগ বীর-পূজার যুগ। শিবাজী, রাণা প্রতাপ, প্রতাপাদিত্যের পিছনে রয়েছেন গ্যারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি। সেদিন ভারতীয়ত্ব ও বাঙ্গালীত্ব জাগ্রত করতে এই বীরপূজার প্রয়োজন ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "Upon my mind the writings of Mazzini had created a profound impression. It was Mazzini, the incarnation of the highest moral forces in the political arena—Mazzini, the apostle of Italian unity, the friend of the human race, that I presented to the youth of Bengal. We wanted Indian unity. I persuaded Babu Jogendranath Vidyabhusan and Babu Rajanikanta Gupta, both distinguished Bengalee writers, to translate into our language the life and work of Mazzini in the spirit of my addresses, so as to place within the reach of those who did not understand English. I soon popularised Mazzini among the youngmen of Bengal." যোগেন্দ্রনাথ লিখলেন— গ্যারিবল্ডী, ও ম্যাটসিনির জীবনী, আর সত্যচরণ শাস্ত্রী লিখলেন দেশীয় বীরদের জীবনী। ছত্রপতি শিবাজীর জীবন চরিত (১৮৯৫), বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দুমহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত (১৮৯৬) ঐ একই আদর্শে রচিত।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজের একমাত্র উৎকণ্ঠা কি করে বৃটিশের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা যায়! তাঁর চরিত্রের নানা দোষত্রুটির প্রসঙ্গ নাট্যকার কিম্বদন্তীর আকারে হাজির করেছেন—এ নাটকে তাঁর কোন প্রকৃত ত্রুটি স্থান পায়নি। সিরাজ প্রেমিক স্বামী, স্নেহপ্রবণ পিতা, প্রজাপালক শাসক, দেশভক্ত বাঙ্গালী—এই হোল তাঁর সমগ্র পরিচয়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-এর সাধনার নাট্যরূপায়ন আর কি!

নাট্যকারের মনে একটা Poetic Justice ছিল; তাই ইংরেজদের শত ত্রুটি সত্ত্বেও সদাশয়া ওয়াটসপত্নী আছেন। ইতিহাস এখানে অস্বীকৃত। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালী ইংরেজের ন্যায়বিচারে আস্থা রাখত। সে-বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়নি, ওয়াটস্-পত্নীই তার প্রমাণ। ওয়াটসপত্নী সিরাজকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন; পরে তাঁর কবরে পুষ্পার্ঘ্য দিলেন।

ওয়াটস্ পত্নী। তুমি সতী স্বামীসোহাগিনী, পরীক্ষা স্থানে দুঃখ পাইলে ঈশ্বরের স্থানে স্বামীর সঙ্গে একত্রে থাকিবে, একত্রে ঈশ্বর পূজা করিবে, আর বিচ্ছেদ হইবে না।

নাটক সিরাজের মৃত্যুতে শেষ হোল না। নাটক ট্রাজিক নয়, করুণরস-সমৃদ্ধ; তাই সিরাজমহিষীর শোক প্রশমিত হোল। পরাভূতের কান্নায়, বা ক্রোধে

নাটক শেষ হোল না। মনোমোহন বসুর 'সতী নাটক' বা গিরিশচন্দ্রের 'জনা'র মত স্বর্গলোক নেই, কিন্তু আবেগকে যথেষ্ট তরল করা হোল।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'ও ইতিহাসসম্মত রচনা। কিন্তু সেই নাটকের সুসংযত নাট্যনীতি এখানে অস্বীকৃত। ট্রাজেডির যে ভিত্তি মাইকেল গড়ে তুলেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাকে সমৃদ্ধ না করে তার শিথিলীকরণে সচেষ্ট হলেন।

সিরাজদ্দৌলা পাঁচ অঙ্কে ও ২৬টি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। ঘটনাস্থল মুর্শিদাবাদ, কাশীমবাজার, পলাশী-রণক্ষেত্র, ভগবানগোলা ও কলকাতা। ইতিহাসকে অনুসরণ করতে গিয়ে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। স্থানগত ঐক্য গিরিশের কাছে মূল্য পায় নি। যে দুইটি চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার নিরঙ্কুশ, তারা ইতিহাসের প্রতিধ্বনি হয়নি। কামিনীকান্ত ওরফে করিম চাচাকে পরবর্তী বহু নাটকে অনুকরণ করা হবে। জহরা হোল প্রতিহিংসাপরায়ণা কুচক্রী নারী; ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কাছে দেশ এবং জাতি হতমূল্য হয়েছে।

নাটকের পাত্রপাত্রীভেদে লেখক সংলাপে বিভিন্নতা দেখিয়েছেন; দানশা ফকিরের আবাসস্থল পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু কথা বলেছে বাঙাল ভাষায়, খোদ ঢাকাই বুলি। চট্টগ্রামের পর্তুগীজের মুখে বসান হয়েছে যশোহর-খুলনার ভাষা।

সিরাজ অবস্থাভেদে গদ্যে ও পদ্যে কথা বলেছে; সিরাজের ভাষা সর্বত্র সাধু ভাষা; তার অমিত্রাক্ষর ভাষণেও সাধু ভাষা স্থান পেয়েছে, সেখানে প্রবীরের ভাষার সঙ্গে কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

সিরাজের সংলাপ প্রধানত বক্তৃতাধর্মী; এক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরু-বিক্রম' নাটকের সঙ্গে তার মিল আছে। পুরু-বিক্রমে হিন্দুমেলার বক্তৃতার প্রতিধ্বনি আছে, এখানে আছে স্বদেশী আন্দোলনের। সিরাজ-চরিত্রের অভিনয়ে মঞ্চে দানীবাবু নামতেন। দীর্ঘ সংলাপে তাঁর পটুত্ব প্রকাশ পেত। দীর্ঘ সংলাপ অবতারণার পক্ষে সেটাও একটা কারণ।

সিরাজ। না মীরমদন, জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দুমুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে, পরস্পর পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়, উচ্চ স্বার্থে চালিত হয়ে, সাধারণের মঙ্গল যদি আপন মঙ্গলের সহিত বিজড়িত জ্ঞান করে, যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশবাসীর অপমানে আপনার অপমান জ্ঞান করে, যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়, এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন, তবে সম্ভব; নচেৎ

অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য!` মীরমদন, আক্ষেপ ত্যাগ করো! জেনো বাংলায় সকলেই মীরমদন নয়।

সিরাজের এই বক্তৃতা মৌলবী লিয়াকত হোসেন বা স্যার সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার অনুরূপ। আসলে নাট্যকার চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে চাননি, মঞ্চের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন, সে মঞ্চ বাইরের আন্দোলনের। সিরাজদ্দৌলা তাই যতটা প্রচার-উন্মুখ, ততটা শিল্পসৃষ্টিতে উন্মুখ নয়। 'মীরকাশিম' (১৩১৩) সিরাজদ্দৌলার নাট্যরীতিকে আরও প্রলম্বিত করেছে।

মীরকাশিম সিরাজদ্দৌলার প্রতিরূপ। মীরকাশিমের মুখে সিরাজদ্দৌলার ভাষণ শোনা গেছে, এবং অধিকতর ঔজস্বিতায়। 'সিরাজদ্দৌলা'র মতই এ নাটকের পরিণতিও তথাকথিত Poetic Justice-এ নিষ্পন্ন। মীরকাশিমের মৃত্যু হলে হিন্দু তারা বলেছে, "তোমার উচ্চলোকে স্থান, কলঙ্কিত ভারতে তোমার স্থ ন নয়। সে অতি উচ্চলোক, যে স্থান আমার লক্ষ্য হয় না, যেথায় তোমার রাজ্য। একাকী দুরন্ত দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করেছে,—পরাজিত ভারতে তুমি একাকী অপরাজিত, যদিচ এই সংকীর্ণ কুটীরে তুমি গৌরবে সম্রাট। তোমার প্রশংসা গান দেবদূত কচ্ছে, আমি তোমার প্রশংসাবাদে অক্ষম।"

মীরকাশিম-বেগম এই সময়ে প্রাণত্যাগ করবেন। তারা তখন আবার বলবে—

"রাজদম্পতি, মহানিদ্রায় শয়ন করো, সুস্বপ্নে নিমগ্ন থাকো, ঈশ্বরের আজ্ঞায় জাগ্রত হয়ে, স্বাধীন লোকে স্বাধীন রাজ্য করো!"

মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়; ইহলোকই সর্বস্ব নয়। গিরিশচন্দ্রের সর্বাত্মক মনোভাবের সঙ্গে নাটকের এই বক্তব্য সঙ্গতিপূর্ণ। করিমচাচা ও তারা অবাস্তব, কিন্তু লেখকের কাছে বড়ই বাস্তব। এ দুইটি চরিত্রে নাট্যকারের আত্ম-ইচ্ছার চরিতার্থতা ঘটেছে। অনেকটা যাত্রার বিবেকের ভূমিকা নিয়ে এই দুইটি চরিত্র যত্র-তত্র উপস্থিত হয়েছে। হিন্দু নারী হয়েও তারা মুসলমান দরবার, বেগমমহল, এমন গোরস্থানেও দেখা দিয়েছে। মীরকাশিমের মৃতদেহের কবরস্থ করার দায়িত্ব সেই গ্রহণ করেছে। অতি মুক্ত এবং অবাধ হোল নাট্যকারের কল্পনাশক্তি।

অবশ্য এই ধরনের আত্মবিস্মৃত আত্মপ্রচার অন্য কুশীলবদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। গৌণ চরিত্র মণিবেগম পর্যন্ত নিজের কথা বলছে না, বলছে দেশের কথা, ইতিহাসের কথা; এমন কি মীরজাফরের মধ্যেও অনুশোচনা দেখান হয়েছে—

জাতীয় ভাব-প্লাবনে এতই এ নাটকের অঙ্গন প্লাবিত। দ্বিতীয় অঙ্কের অনেকটা অংশ জুড়ে ইংরেজ বণিকের শোষণের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হয়, এই বিবৃতির মধ্যে কোথায় নাটক শুরু হয়েছে, আর কোথায় ইতিহাস শেষ হয়েছে। ঘটনা যেমন বিস্তৃত, এই নাটকের কালরেখা এবং স্থানরেখাও তেমনি অবাধ প্রশ্রয়িত। নাট্যকার এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলেই লিখেছিলেন, "ঘটনাব পব ঘটনা এত অধিক, যে দর্শকের রুচির উপরে লক্ষ্য রাখিয়া এক খণ্ডে নাটক সমাপ্ত করায় নাটকখানি কোন রূপে সংক্ষেপ করিতে পারি নাই।" উপন্যাসেব নাট্যরূপান্তর সাধনে অনেকে যেমন সমগ্র কাহিনীকে অনুসরণ করে থাকেন, উপন্যাস আর নাটকের মধ্যকার বিভিন্নতা বিস্মৃত হন, গিরিশচন্দ্র তেমনি ইতিহাসকে সর্বাংশে অনুসরণ করে নাটকের দাবী ক্ষুণ্ণ করেছেন। এক্ষেত্রে ইতিহাস আর কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য এ্যারিষ্টটল বর্ণনা করেছেন, গিরিশচন্দ্র তার কোন মূল্য দেন নি। তিনি ইতিহাসের ঘটনার মূল্য দিয়েছেন, ইতিহাসের সত্যকে নয়। গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ ঐতিহাসিক নাটক না হলেও সর্বশেষ বীরপূজাবিশিষ্ট নাটক হোল 'ছত্রপতি শিবাজী'।

বীরপূজা থেকে মহাবীরপূজা

স্বদেশী আন্দোলনের উপর সরকারী দমননীতি তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করলে নাট্যশালা থেকে জাতীয়তার জোয়াব সরে যাবে। ইতিহাস তখনও অবলম্বিত হবে, কিন্তু তখন আব বীরপুরুষ নয়, মহাপুরুষেব পূণ্য জীবনকাহিনী হবে বর্ণনীয় বিষয়। ইতিপূর্বেই ঐ পথে তিনি বিচরণ করতেন, আবার তিনি পূর্বপথে বা স্বপথে ফিবে আসবেন। চৈতন্যলীলা (১২৯১), নিমাইসন্ন্যাস (১২৯১), বুদ্ধদেবচরিত, রূপ-সনাতন (১২৯৪) ও শঙ্করাচার্য (১৩১৬)—এই সমস্ত নাটকের সকল মুখ্য চরিত্রই ইতিহাসেব নায়ক।

মহাপুরুষচরিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক সম্ভাব্যতার সীমা সর্বরকমে লঙ্ঘন করেছেন। 'চৈতন্যলীলা' সংস্কৃতে লেখা 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুসরণে লেখা। ঐ কারণে নাটকে বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে বহু রূপকধর্মী চরিত্র স্থান পেয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত নাটকের মত প্রস্তাবনা আছে। প্রথম অঙ্ক সম্পূর্ণভাবে প্রবেশকের কাজ করেছে। চার অঙ্কে নাটক শেষ হয়েছে। ১৭টি দৃশ্যের সমন্বয়ে গঠিত এই নাটকের অবসান হয়েছে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প-ঘোষণায়। ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণ ছাড়া এ নাটকে পাপ,

কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি নরদেহ ধারণ করেছে। তবে তাদের সঙ্গে লৌকিক নরনারীর দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। নাট্যকারের ঔচিত্যবোধ ঐ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

চৈতন্যলীলার পরিপূরক হোল 'নিমাইসন্ন্যাস'; একই গল্পের অনুসরণ চলছে। কাহিনীর এই ধরণের অন্ধ প্রসরণ তাঁর পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রকটতর। 'চৈতন্যলীলা' অপেক্ষাও 'নিমাইসন্ন্যাস' প্রাচীনতর রীতিঅনুগত। প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে বিষকম্ভক, প্রস্তাবনার কাজ করেছে; নট-নটীরও অবতারণা করা হয়েছে। প্রকৃত নাটক শুরু হোল প্রথম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে।

এই নাটকে অলৌকিতার অবতারণা হয়েছে অধিকতর। চৈতন্যলীলায় রূপক চরিত্র আছে; আর এ নাটকে চৈতন্যদেবের ষড়ভুজমূর্তি ধারণ আছে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিরহবেদনা উপশমের জন্য নিমাই-এর আবির্ভাব দেখান হয়েছে—দেবদেবীগণ নিমাইএর বন্দনা করছেন, গান গাইছেন। এখানে যবনিকা নেমে এল।

উল্লিখিত দুটি নাটকেই নাট্যকার পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত পালালেখক কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাট্যরচনারীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে 'নিমাই সন্ন্যাস' নাটকে বিষ্ণুপ্রিয়া সমীপে নিমাই-এর আবির্ভাব কৃষ্ণকমল গোস্বামীর 'দিব্যোন্মাদ' পালার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেবচরিত, রূপ-সনাতন ও শঙ্করাচার্য এক জাতীয় রচনা নয়; রূপ-সনাতন বিলম্বে লিখিত হলেও চৈতন্যলীলা ও নিমাইসন্ন্যাস নাটকদুটির রচনারীতি অনুসরণ করেছে। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির অবতারণা শুধু নয়, আরও নানা অলৌকিক ঘটনা দিয়ে নাটক পূর্ণ করা হয়েছে। অথচ ঐগুলি রূপক-আশ্রিত নাটকও নয়।

নাট্যকার বুদ্ধদেবচরিত নাটক উৎসর্গ করেছেন আর্ণলডকে। নাটকে লৌকিক ও অলৌকিক প্রসঙ্গ পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে রয়েছে। আর্ণলডের গ্রন্থেও এই সুযোগ ছিল; তিনি অশ্বঘোষের দ্বারা প্রভাবিত। গিরিশচন্দ্র সেই মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই এই নাটক রচনা করেছেন এবং এই অশ্বঘোষের দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে আর্ণলডের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে, দেবতারা সেখানে বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য। কিন্তু

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে গোলোকধামে বিষ্ণুর সঙ্গে দয়ার সাক্ষাত ঘটিয়েছেন। দয়ার কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন :

চিন্তাকর দূর—
ধবি পুনঃ নরের আকার,
নব সহ করিব বিহার,
যজ্ঞস্থলে প্রাণ হানি না রবে ধবায়।

প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক নালক ও শ্রীকালদেবের কথোপকথনেব মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব কোন গৃহে কাব গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবেন, তার আভাষ পাওয়া গেল। এবং বুদ্ধদেবের জন্ম সম্ভাবনায় মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের মৃত্যু-ভাবনা দেখা দিল। ১ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কেই অলৌকিকতাব স্থান দিতে হোল। রাহুলেব পিতৃধন লাভে নাটক শেষ হয়েছে।

অন্য অনেক নাটক অপেক্ষা 'বুদ্ধদেবচরিতে'ব ভাষা বিশুদ্ধ। গিরিশেব ভাষা মাঝে মাঝে যেমন হেলে পড়ে, এখানে তাব ব্যতিক্রম। নালক, শ্রীকালদেব বা মন্ত্রী বা শিষ্যগণ—সবাই ভদ্র ও শালীন ভাষায় কথা বলেছে। নাবীদের ভাষাও মার্জিত।

শঙ্করাচার্য অত্যন্ত শেষ স্তরের বচনা। কাজেই এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ নাট্যচিন্তার স্বাক্ষব আছে। "শুধু internal facts and internal struggle বাইরের dramatic events কিছুই নেই বললেই চলে। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic events, intense action in deep meditation, মহাপুরুষদেব জীবন full of internal dramatic events."

শঙ্করাচার্য নাটক পাঠ কবলে কিন্তু আমরা এই 'চমৎকার' বিশ্লেষণের কোন সফল অনুসরণ দেখতে পাইনে। তত্ত্বকথাকে কথোপকথনের অন্তর্ভুক্ত করলে তা নাটক হবে, এমন কোন স্থিবতা নেই।

ইতিহাস থেকে কিম্বদন্তী

মহাপুরুষজীবনী অবলম্বনে লিখিত নাটকে ইতিহাস আর কিম্বদন্তী মাখামাখি হয়ে গেছে। কিন্তু বিল্বমঙ্গলঠাকুর (১২৯৩), পূর্ণচন্দ্র (১২৯৪), ও করমেতিবাই (১৩০৫) কিম্বদন্তীর উপরই প্রতিষ্ঠিত। এগুলিও এক অর্থে মহাপুরুষজীবনী। কার্লাইল যে অর্থে মহম্মদ ও যীশুখৃষ্টকে বীর (hero) বলেছিলেন, সে-ই অর্থে তাঁরাও বীর। পূর্ণচন্দ্রের কাহিনী শিয়ালকোটের রাজপুত্র পূরণচাঁদের কাহিনী

অবলম্বনে লেখা। শিবমহিমা প্রচার নাট্যকারের উদ্দেশ্য। নারীর প্রলোভন জয় করল পূর্ণচন্দ্র; কিন্তু রাজার কোপ এড়াতে পারল না। পরে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পিতা শালীবাহনের কাছে সে তার ঈশ্বর-অনুরাগের গভীরতা প্রমাণিত করল। পিতা পুত্রে মিলন হোল, কিন্তু পুত্র আর সংসারে ফিরল না। এই নাটক পঞ্চমাঙ্ক নাটক ; প্রথম দুই গর্ভাঙ্ক প্রস্তাবনা বা পূর্বরঙ্গ। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক থেকে নাটক শুরু হোল। এ নাটকে নাট্যকার দামোদর ও সারী নামে এক জোড়া কুশীলব সৃষ্টি করেছেন; তারা নাটকের মধ্যে পঞ্চ রং আমদানী করেছে। দীনবন্ধু মিত্রের হোঁদলকুৎকুৎ-উপাখ্যান এখানে নব কলেবরে পরিবেশিত হোল। এই নাটকে বহুবিবাহের প্রশস্তি আছে, সুরার মহিমা বর্ণনা আছে। কাজেই কী গঠনে, কী বক্তব্যে কোন দিক থেকেই কোন উন্নতরুচির পরিচয় নেই। নাটকের উপসংহারে পটপরিবর্তন আছে—হরগৌরী-মূর্তি আর্বিভূত হয়ে পূর্ণচন্দ্রের জীবলীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে।

নাটক স্বাভাবিকতার পথ ত্যাগ করে কৃষ্ণকমল গোস্বামীদের পথের পথিক হোল।

'করমেতিবাই' ও 'বিল্বমঙ্গল' ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। ভক্তমালের চতুর্বিংশতি মালায় করমেতি বাই-এর চরিত্র বর্ণিত হয়েছে।

খাডল্যা গ্রামেতে বাস রাজপুরোহিত।
পরশুরাম নাম তাঁর কন্যা সুচরিত ॥
করমেতি তাঁর নাম অল্প বয়েস।
বড়ই আশ্চর্য কৃষ্ণে একান্ত আবেশ ॥
মহা অনুরাগ পরাকাষ্ঠা ঐকান্তিক।
দেহ-অনুরোধ নাহি কি কব অধিক ॥
প্রাক্তনিক মতি কৃষ্ণে হঠাৎ লাগিল।
কৃষ্ণ রূপ গুণরসে মন ডুবি গেল ॥
দশ দিকে কৃষ্ণময় দেখয়ে সকল।
কৃষ্ণ লাগি সদা মন বিরহে বিকল ॥
নির্জনে বসিয়া সদা অন্তরে চিন্তয়।
প্রেমাবেশে হাসে কাঁদে পাগলীর প্রায় ॥

এই কাহিনীই তাঁর হাতে নাটকের আকার পেয়েছে—কৃত্তিবাসের পালা ও কাশীরামের পালা যেভাবে নাট্যায়িত হয়েছিল।

করমেতি স্বামীর ঘর করেনি। ভক্তমালে বলা হয়েছে—

এইরূপ রসে থাকে কতোদিন পরে
লইতে আইস যাইতে হবে স্বামি ঘরে ॥
স্বামী সঙ্গ বিষ তুল্য করিয়া মানয়।
বিশেষে বিষয়ী সেই অবৈষ্ণব কয় ॥

স্বামী তাকে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলেন, রাত্রে করমেতি ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাল। গিরিশ লিখেছেন করমেতির স্বামী আলোক তার স্ত্রীকে কক্ষের মধ্যে রুদ্ধ করে রেখেছিলেন; করমেতি জানালা-পথে পলায়ন করেছিল। ভক্তমালে আছে, পালাবার পথে করমেতি একটি মৃত উটের পেটের মধ্যে আত্ম-গোপন করেছিল। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন মহিষেব পেটেব মধ্যে। তারপর বৃন্দাবনে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হোল, সেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি দর্শন ঘটল।

গিরিশচন্দ্র কাহিনীর প্রধান সূত্রটি যথাযথ রেখেছেন; গল্পের পরিণতিও বদলে দেন নি, তার অলৌকিক বিস্তৃতির পরিমাণও হ্রাস করেন নি। অর্থাৎ তিনি মধ্যযুগীয় বিষয়কে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই যাচাই করেছেন। এ নাটক রূপক নাটক নয়, অথচ বাস্তব নাটকও নয়। নাটকের মধ্যে একটা অপ্রাপ্ত-বয়স্কতার ছাপ আছে। লেখক অনবরত পটপরিবর্তন করতে চান, দুঃখের বিষয় এখানে সব পটই অলৌকিক পট। রাধা বা কৃষ্ণ বেশ বিনা সঙ্কোচে লৌকিক ভূবনে বিচরণ করছেন।

'পূর্ণচন্দ্রে' যে সঙ্কোচ ছিল, নাট্যকার এখানে তা জয় করে ফেলেছেন। এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠনাটক হোল 'বিল্বমঙ্গলঠাকুব'। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের আখ্যায়িকা কিম্বদন্তীমূলক। কিন্তু নাট্যকাব নাটকের প্রথমাংশে সেই কিম্বদন্তীর অভ্যন্তরে বিশ্বাসযোগ্যতার তুলি বুলিয়েছেন। নাটকের প্রথমাংশে আছে সেই শাশ্বত দয়িত-দয়িতার আকর্ষণের গল্প। হৃদয়ের সমগ্র ভালবাসা অর্পিত হয়েছে এক অপবিত্র পাত্রীর উপব। এই অসঙ্গত প্রেম একনিষ্ঠতায় স্নাত হয়ে পবিত্র রূপ পরিগ্রহ করেছিল, "আমরা বাবা যত্নের পায়রা; যেখানে যত্ন পাব, সেখানে যাব।"

বিল্ব। দেখ, আজ রাত্রিরে আমি আর আসতে পারব না, আমার কাপড় কখানা গুছিয়ে রেখো।

চিন্তা। শুনলি, শুনলি? আমি কি কাপড় মাঠে ফেলে আসি?

বিল্ব। তাই বলছি। [প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন] আর ঐ টিয়ে পাখীটাকে দুটো ছোলা দিও। [প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন] আর একদিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দোব না, ঘাড়টা মুচড়ে মেরে রাখব।

বিল্ব। তা তুমি পার, তাই বলচি। [প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন] আর যদি শীস দেয় ত দিতে ব'ল।

চিন্তা। বলি যাও না; কখন শ্রাদ্ধ করবে? কখন খাওয়া-দাওয়া করবে? বেলা কি আর হয় না।

বিল্ব। যাচ্চি। [প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন] আর ঐ মেড়াটাকে দুটো দানা দিও। প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন] আর শিং ঘষে ত বারণ ক'র না; আমি চল্লুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না, আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আসবে ত?

বিল্ব। দেখি। ১।১

চিন্তামণি শুধুই কি যত্নের পায়রা? খাঁচার পায়রা নয়? অবশ্য আকুলতা ও অস্থিরতা পুরুষের পক্ষ থেকেই এসেছে, কিন্তু একেবারে বিনা প্রতিধ্বনিতে নয়।

বিল্বমঙ্গলের ভালবাসা বৈষ্ণবী ভালবাসা।

চিন্তামণি সেই 'fatal woman'—ক্লিওপেট্রার আত্মীয়া। কিন্তু বিল্বমঙ্গল যে তাকেই ভালবাসে।

বিল্ব। অবশ্যই তুমি সুন্দর, নইলে এত দিন কার পূজা করিচি? তোমায় দেখচি, তুমি দেবী, কি রাক্ষসী? যদি দেবী হতে আমার মনের ব্যথা বুঝতে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর! ২।২

"So cruel, but so beautiful."

রূপ থেকে বিল্বমঙ্গলে অরূপে এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু সেই উত্তরণ-লীলা গিরিশচন্দ্র মধ্যযুগীয় পরিভাষায় বর্ণনা করেছেন। অথচ সুদর্শনার অভিজ্ঞতাও এইভাবে এক ভুবন থেকে আর এক ভুবনে এসে পৌঁছেছিল, কিন্তু 'রাজা'র 'ইডিয়ম' ছিল আধুনিক; তাই রুচিসম্মত। যা সমকালীন, তাই কি রুচিপ্রদ?

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগের সাধকের জীবন-নাটক বর্ণনা করেছেন—তিন অঙ্কের মতই তিনটি স্তর আছে—রূপ হতে অরূপে পৌঁছুতে। কিন্তু সেখানকার 'ইডিয়ম' মধ্যযুগীয় 'ইডিয়ম' নয়। 'সুরদাসের

প্রার্থনা' কবিতা থেকে গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে রচিত ; তখন নতুন পরিভাষা একটু-একটু করে গড়ে উঠছে। সেই ভাষা গড়ে-তোলার অন্যতম কারিগর হতে পারতেন গিরিশচন্দ্র ; কিন্তু তিনি মধ্যযুগের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলেছেন।

বিল্বমঙ্গলের বণিকপত্নী-পর্ব শরৎচন্দ্র কর্তৃক প্রবলভাবে ভৎ'সিত হয়েছিল ; নারীত্বের এই অপমান দরদী শরৎচন্দ্রকে ব্যথিত ও রুষ্ট করেছিল। ব্যথা ও রোষের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও বলা চলে নাটকের এই অংশ স্বাভাবিকতার পথ ছেড়ে দিয়ে অস্বাভাবিকতার পথে হেঁটেছে। বিল্বমঙ্গল যতটা পথ ছুটে কৃষ্ণদর্শন লাভ করেছেন, অনুপাতে ততটা শিল্পদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এক যুগের সাহিত্যে Mystery ও Miracle Play-অনিবার্য ছিল ; কিন্তু অন্যযুগে তা অবশ্যই নিবার্য।

কিম্বদন্তী থেকে কল্পনা

কিম্বদন্তীতে লোক ও অ-লোক পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কিম্বদন্তী নয়, কিন্তু প্রায়-কিম্বদন্তী বা রূপকথার মত এমন দুটি আখ্যায়িকা (স্বকপোল-কল্পিত) অবলম্বনে গিরিশ দুটি নাটক রচনা করেন। নসীরাম (১২৯৫) ও বিষাদ (১২৯৫) দুইখানিই গিবিশের বক্তব্যপ্রধান নাটক। 'নসীরামের' ঘটনা গৌড়ে গিয়ে পৌঁছেছে। গল্পাংশ অন্যান্য নাটকেব মত ; 'পূর্ণচন্দ্র' বা 'চণ্ড'নাটকের পিতা পুত্রের সম্পর্কের এখানে পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। পুত্র গৃহত্যাগ করল, শেষ পর্যন্ত পিতাকে রক্ষা করল নসীরাম। রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিংহাসন ত্যাগ করে বনে চলে গেলেন। যে বন্দিনী রাজকুমারীকে নিয়ে পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্ব, সেই রাজকুমারীও পিতার সন্ধানে হরিনাম কীর্তন করে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশেষে সকলের মিলন হোল—তখন আর সংসার-বাসনা কারো নেই—আছে শুধু হরিনাম। আর মহাজ্ঞানী নসীরাম জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিয়ে ইহলোক থেকে স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

হরিভক্তি প্রচারই নাটকের উদ্দেশ্য—লেখকও বলেছেন "ভগবদ্বাক্যমূলক নাটক।" এইভাবে "স্বর্গ হতে যাহা এল" তিনি তা স্বর্গেই ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। "ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎ মর্য্যাদা" দান করলেন না। 'বিষাদ' নাটকে নসীরামের মত ইতিহাসের ধার-করা সম্পদ ব্যবহার করা হয়েছে। অযোধ্যার রাজা অলর্ক রাজবয়স্য মাধবের প্রভাবে রাণীকে পরিত্যাগ করে বেশ্যা

সহবাসে দিন কাটান। মন্ত্রী রাজ্যের ভালমন্দ খবর দিতে গেলে রাজা রুষ্ট হন। রাজাকে ফেরাবার নানা চেষ্টা করে রাণী ব্যর্থ হয়ে বিষাদ নাম ধারণ করে বালকবেশে রাজার রক্ষিতা উজ্জ্বলার পরিচর্যায় রত হন। "পতির উদ্দেশ্যে সাজিয়াছি বেশ্যাদাস।"

বেশ্যা উজ্জ্বলার উদ্দেশ্য হোল সিংহাসন দখল করা; রাজাকে সে হত্যা করবে, এই উদ্দেশ্যে বন্দী করে রাখল। তারপর নানা কাণ্ডকারখানা, হত্যা-আত্মহত্যা, একদেশ কর্তৃক অন্য দেশ আক্রমন! আর অলর্ক উন্মাদ হয়ে গেল। তখন মাধব তার স্বরূপ প্রকাশ করল; সে আসলে অলর্কের এক ভাই। তার আর তিন ভাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে। অলর্ককে সন্ন্যাস গ্রহণ করাবার জন্য মাধব এইরূপ জঘন্য ভোগের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এ নাটকের ভাবজগৎ হোল কবিওয়ালাদের ভাবজগৎ; সবই পরকীয়া প্রেমের প্রসঙ্গ।

মাধব। (স্বগত) হায়! হায়! হায়! কি সর্বনাশ করলেম। ভগবান! আমি অজ্ঞান, আমি জানতেম না, কুকার্য দ্বারা সৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না।

অলর্ক বলছে—

তুমি সহোদর মম।
কেন অগ্রে দাও নাই পরিচয়?
কি হেতু কুটিল পন্থা করিলে গ্রহণ?
যদি তুমি আসিয়া সভায়,
বলিতে আমায়,
চল ভাই বনবাসে যাই—
হইতাম আনন্দে বিভোর,
আলিঙ্গন করিয়ে তোমায়
স্নিগ্ধ হত এ জীবন। ৫।১

তারপর নাটক প্রবল হরিধ্বনির মধ্যে শেষ হোল। এহোল গিরিশ রচিত নব্য 'Pilgrim's Progress'। ভক্তি প্রচার উদ্দেশ্য; অথচ সব নাটকেই বেশ্যা-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। এই কারণে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন, "থিয়েটারের অভিনেতা ছিলেন বলিয়া চিরকালই তাঁহার নটীর সহিত কারবার করিতে হইয়াছে। এখানে নটী মাত্রেই বারবনিতা, সুতরাং যেটুকু কল্পনাশক্তি আছে, সেইটুকুর বলে, তাঁহার প্রণীত বারবনিতা চরিত্র এত সুন্দর দেখায়, এত প্রকৃত বোধ হয়, এত জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলিয়া ভ্রম হয়।"

(সাহিত্য ১২৯৭, বৈশাখ)। জীবন্ত, সুন্দর, প্রকৃত হোক আর না হোক—সব নাটকে একই প্রকার আসক্তি প্রকাশে বাংলা রঙ্গমঞ্চের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পৌরাণিক নাটক

মহাপুরুষ জীবনীসমৃদ্ধ আর পৌরাণিক কাহিনীসমৃদ্ধ নাটক একই মেজাজে রচিত, একই প্রকার ভাষায় ও ঘটনাসংস্থানে বিবৃত। নাটকের বিষয়বস্তু যে নাটকের গঠন পবিকল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পাবে, এইরূপ সম্ভাবনা তিনি স্বীকাব করতেন বলে মনে হয় না।

'আনন্দ রহো' তাঁর প্রথম নাটক, ইতিহাস-আশ্রিত নাটক। পরবর্তী নাটক হোল পৌবাণিক নাটক। 'আনন্দরহো' এবং 'রাবণবধ' বিষয়বস্তু ও রচনাবীতিতে সম্পূর্ণ পৃথক , কিন্তু এই দুই নাটকেব অন্তব-জগতে কোথায় যেন একটি মিল আছে।

'বাবণবধ' রামায়ণ অবলম্বনে রচিত , কৃত্তিবাসী রামায়ণ লেখকের অবলম্বন। 'রাবণবধ' নাটকে কৃত্তিবাসের কাহিনীকে অনুসবণ কবা হয়েছে। মাইকেল-বচিত বাল্মীকি-বন্দনা ও কৃত্তিবাস-বন্দনাব অংশবিশেষ যে উদাহৃত হয়েছে, সে কেবল অলঙ্করণের জন্য। মাইকেল-মানসিকতার কোন অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি। ববং মনে হতে পারে, পুরাণ প্রসঙ্গে মাইকেল যে পরিবতন এনেছিলেন, গিবিশচন্দ্র যেন তা সামলে নিতে চেষ্টা কবেছেন।

রাবণ রামস্তুতি কবেছে, অথচ সেই রাবণ একই মুখে সীতার দেহকামনা করছে। গিরিশ-কথিত ভক্তিতত্ত্বের এ এক অনন্য বহস্য। পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই বাবণ নিহত হয়েছে, কিন্তু তারপরও নাটক চারগর্ভাঙ্কে বিস্তৃত। সীতাব অগ্নিপবীক্ষায় নাটক সমাপ্ত হয়েছে। রাবণবধেব গঠন-বিন্যাসে তাই একটা অনাবশ্যকতা আছে। এছাড়া নাটকে নাচগানের জন্য যোগিনী, অপ্সবী ও প্রমথগণেব আবির্ভাব ঘটান হয়েছে।

এই নাটকে মাইকেল-ছন্দ নয়, ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ত্রিপদীব রকমফের ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মিল দিয়ে পদ্য ব্যবহার করার দৃষ্টান্তও আছে, ত্রিজটা মিল দিয়ে কথা বলছে। পরবর্তী নাটকসমূহে এই আঙ্গিক আরও অবলম্বিত হবে।

'রাবণবধে'র মঞ্চ-সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি রামকথা অবলম্বন করে পর পর পাঁচখানি নাটক লেখেন— সীতার বনবাস (আশ্বিন, ১২৮৮), লক্ষ্মণ

বর্জন (পৌষ ১২৮৮), সীতার বিবাহ (ফাল্গুন, ১২৮৮), রামের বনবাস (বৈশাখ ১২৮৯) ও সীতাহরণ (শ্রাবণ, ১২৮৯)।

সবগুলিতে কৃত্তিবাসের কাহিনীকে দৃশ্যে-অঙ্কে বিভক্ত করা হয়েছে। লেখক কোন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন নি। এই বিষয়বস্তুসমূহ কেন নাট্যবিষয় রূপে গৃহীত হোল, তা তিনি আমাদের বলেন নি। দাশরথী রায় যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কৃত্তিবাসী গল্পকে পাঁচালীতে পরিণত করেছিলেন, গিরিশচন্দ্রও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়ে রামকথার নাট্যরূপ দিলেন। নাটকগুলি যেভাবে তিনি প্রকাশ করেছেন, পাঁচালীকারের রচনার মত সেগুলির মধ্যে কাহিনীগত পারম্পর্য নেই। তবে রচনাশৈলীগত সাদৃশ্য আছে।

'সীতার বনবাস' চার অঙ্কের নাটক; ১৮ গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। কৃত্তিবাসী গল্প থেকে নতুনত্ব হোল নিকষা রাক্ষসীর ভূমিকা। তাকে প্রতিহিংসাপরায়ণা করে আঁকা হয়েছে। 'লক্ষ্মণবর্জন' আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, মাত্র নয়টি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ। সীতার বনবাসের মতই করুণরসে পূর্ণ। কোন চরিত্রই বিশিষ্ট চরিত্র নয়, সবই সাধারণ চরিত্র।

'সীতার বিবাহ' নাটকে ভূমিকা বা প্রস্তাবনা আছে। তিন অঙ্কের নাটক— পরশুরামের দর্পহরণে নাটক শেষ হয়েছে। এখানে পরশুরাম সীতার বিবাহে কোন প্রতিবন্ধকতা বা সহায়তা করেন নি; শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রসঙ্গ আছে বলেই গিরিশনাটকে তা স্থান পেয়েছে। এই নাটকে সীতার বিবাহে বাঙ্গালী গৃহের স্ত্রী-আচার অনুসরণ করা হয়েছে। 'রামের বনবাস' হোল পঞ্চাঙ্ক নাটক; বনবাস থেকে স্বরু হয়ে চিত্রকূট পর্বতে ভরত-মিলনে শেষ হয়েছে। নাটকে দশরথের পুত্রবাৎসল্য স্বন্দব ফুটেছে; পুত্র রামের জন্য তাঁর আকুতি শেষ পর্যন্ত রামভক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। দশরথ ও ভরত চরিত্রদ্বয় কৃত্তিবাস-অনুসরণে অঙ্কিত। 'সীতাহরণে'ও কৃত্তিবাস-আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে।

রামকথাসমৃদ্ধ নাটকে কৃত্তিবাস অবিকৃতভাবে হাজির। 'রাবণবধে'র রাবণ চরিত্রে নারীমাংসলোলুপতার সঙ্গে রামভক্তি যে সহাবস্থান করেছে, তার জন্য দায়ী কৃত্তিবাস। সম্ভবত গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রকার অদ্ভুত 'অধ্যাত্মবাদ' প্রতিকূলতা করেনি।

'সীতার বনবাস' করুণরসে ভরা; এই নাটকের ঘটনার প্রধান রহস্যটি কৃত্তিবাস থেকে গৃহীত।

উর্মিলা। বারেক দেখাও সখি, চিত্রিয়া আকার।

* * *

সীতা। হের সখি, চিত্রিয়াছি দুরন্ত রাক্ষসে।

তারপর উর্মিলা প্রস্থান করলেন। সীতা তখন নিদ্রাগত হবেন।

সীতা। অলসে অবশ কলেবর,
না পারি চলিতে বিষম নিদ্রার ভার।

[রাবণের চিত্রের উপর শয়ন]

[রামের প্রবেশ]

রাম। একি!
রাবণের চিত্র হেরি!
ফলিল তারার অভিশাপ
দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার
কলঙ্কিণী জনক-নন্দিনী। (১১২)

এই কাহিনী কৃত্তিবাসে নিম্নরূপ—

সীতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ।
দশমুণ্ড কুড়ি হাতে কেমন রাবণ॥
রাবণ লিখিতে সীতা মনে কৈল সাধ।
বিধির নির্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥
হাতে খড়ি ধরে সীতা দৈবের নির্বন্ধ।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্তে লিখে দশ স্কন্ধ॥
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা॥
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী।
রামে দেখি বাহির হৈল যত নারী॥
সীতা পাশে দেখি রাম লিখন রাবণ।
সত্য অপযশ যম বলে সর্বজন॥ [উত্তরাকাণ্ড]

অতীত যুগের জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন, "বাল্মীকি-রামায়ণ অনুসরণ করিলে গিরিশচন্দ্রকে এরূপ নিন্দিত চিত্র অঙ্কিত করিতে হইত না। কৃত্তিবাসই গিরিশচন্দ্রকে এখানে যথার্থ পথ হইতে বিচলিত করিয়াছেন।"[২৯] অপরাধ কৃত্তিবাসেরও নয়, অপরাধ মধ্যযুগীয় নীতিবোধের। সমালোচক মহাশয়

এই নীতিবোধকেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র পেরেছিলেন। পৌরাণিক কথাবস্তুকে পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, তিনি মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যালোচনা করেছেন।

এই নাটকগুলিতে কৃত্তিবাসের আধিপত্য অত্যন্ত স্পষ্ট; কিন্তু মাইকেলও উপস্থিত আছেন।

'সীতার বনবাসে' শব্দ-বাক্য ও উপমা-প্রয়োগে মাইকেল-প্রভাব দেখা যায়।

১. শারদ কৌমুদী সম,

২. সমীরণ জিনি গতি

৩. অনন্ত নীলিমা ব্যাপিত কায়া

৪. পড়িলেন রাম ভূমিতলে
ভূকম্পনে শালবৃক্ষ যেন।

৫. উঠ উঠ ফুল্ল কমলিনী
রাঘব হৃদয়-মণি,
উঠ উঠ আনন্দ আমার।
গাইছে তব সঙ্গিনী তব বিহঙ্গিনীগণ।
আমোদিনী মেল ফুল্ল আঁখি।

এছাড়া সীতার একটি গান আছে, যে গানটি মাইকেলের সীতা-সরমার কথোপকথনের আদর্শে রচিত।

সীতার একটি উক্তিও মাইকেলের প্রমীলার ভাষণের আদর্শে রচিত—

রাজ-ঋষি জনক আমার,
সূর্যবংশ-কুলবধূ—
দশরথ শ্বশুর ঠাকুর,
রাম স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ। (২।২)

এমন কি রামের এই বিশেষ স্বরূপটিও মাইকেল-অনুসারী—

এ কি অপূর্ব অস্ত্রের খেলা।
অস্ত্রময় হইল জগৎ,
হরি হরি রেণু সম হইল পর্বত।
একি, নাগপাশে বদ্ধ হনুমান।
কাঁপে প্রাণ বাণের তরঙ্গ হেরি,
বহু রণে আছিনু নায়ক,
হেরি নাই দুর্জয় সংগ্রাম হেন। (৩।৮)

কিছুকাল আগেই 'মেঘনাদবধকাব্য' নাট্যরূপায়িত হয়েছে ; কলমের ডগা থেকে সেই বিশেষ কালি তখনও শুকোয়নি, এই নাটকের ভাষায় তার বহু ছিটা লেগেছে।

'সীতাহরণ নাটকে'ও সাগর-সাগরপত্নী প্রসঙ্গে লেখক মাইকেলের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি।

আধুনিক প্রভাব অপেক্ষা পুরাতনের অনুসরণই পরিমাণে বেশি দেখা যায়। এই পর্বের প্রথম নাটক 'রাবণবধে' ত্রিজটা মিল দিয়ে কথা বলেছে ; 'সীতার বনবাসে' সীতা (২।২), ১ম দূত (৩।২) মিল দিয়ে কথা বলেছে ; কিন্তু সীতা গৈরিশ ছন্দে সমিলযুক্ত সংলাপ বলেছে আর দূতের সংলাপে মিল অর্পিত লৌকিক ছন্দ। 'সীতাহরণে' শূর্পণখা, ত্রিজটা, চেড়ী মিল দিয়ে কথা বলেছে। 'সীতাহরণে'র মতই 'সীতার বিবাহে' একাধিক পাত্রপাত্রী সমিল ছন্দ ব্যবহার করেছে ; ৩।১-দুইজন ভৃত্য, ২।১-কাঠুরিয়া, ২।৩-নাবিকের স্ত্রী ও গ্রাম্য নারীগণ, ২।৬-স্বয়ম্বর সভায় রাবণ-কালনেমি, ৩।১ পুরোহিত ও তার স্ত্রী, ৩।৪-জনক রাজার স্ত্রী ও পুরনারীগণ, ৩।৫-রাজসভায় পণ্ডিত, ছাত্রদ্বয়, ভৃত্যদ্বয় মিল দিয়ে কথা বলেছে। এ ছাড়া ৩।৬, ৩।৭, ৩।৮, ৩।৯ প্রভৃতি স্থলেও মিলযুক্ত সংলাপ দেখা যায়। এই মিলযুক্ত ভাষায় কবিসঙ্গীত ও পাঁচালীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট—

১. শান্তি দে মা, শান্তি বিধায়িনি,
শান্তি নামে তপোবনে তুমি সনাতনী।
শান্ত করি ভ্রান্ত প্রাণ মম—
অশান্ত মা মাতঙ্গিনী সম—
জগৎমাতা
শিখাও গো দুহিতার জননীর প্রেম,
ছিন্ন অন্ত্র ডুরি,
প্রেমে বাঁধা রেখো মা সংসারে,
ওরে কে অভাগা এসেছে জঠরে। (সীতাহরণ ২।২)

২. হায়রে হায় কপাল পোড়া,
ঘোড়া ধল্লে দুটো ছোঁড়া,
বলতে গেলুম মাত্তে এল তেড়ে।
বল্লুম, ঘোড়া রাখে শত্রুঘন,
তলব কারে দেছে যম
ভাল চাস তো ঘোড়া দে তো ছেড়ে।

কেলে কেলে ছুটো ছেলে
তীর ধনুকে সদাই খেলে,
বলে
"মুখ নাড়িস্‌ নি, যাতো ভেড়ের ভেড়ে।

(সীতার বনবাস ৩।২)

এই অন্ত্যজ ভাষায় নায়ক-নায়িকা কখনও কথা বলেনি।

এইসব কয়খানি নাটক ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় ; ঐ মঞ্চের কলা-কুশলতা ও নটনটীদের দক্ষতার প্রতি নজর রেখেই নাটকগুলি রচিত হয়েছিল।

মহাভারত অবলম্বনে যে কয়খানি নাটক লিখিত হয়, সেগুলির আঙ্গিকও একই প্রকার। অভিমন্যুবধ এই পর্যায়ের প্রথম নাটক। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১২৮৯), নলদময়ন্তী (১২৯০), দক্ষযজ্ঞ (১২৯০), ধ্রুব চরিত্র (১২৯০), বৃষকেতু (১২৯১), প্রহ্লাদ চরিত্র (১২৯১), শ্রীবৎসচিন্তা (১২৯১), জনা (১৩৫০), পাণ্ডবগৌরব (১৩০৬), তপোবল (১৩১৮) প্রভৃতি পৌরাণিক রচনা।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' কাশীরাম দাস-অনুসরণে লেখা, বিরাটপর্বের ঘটনাগুলিকে পরপর বলে যাওয়াই তিনি কর্তব্য বলে মনে করেছেন। কীচকের অসংযত লালসার উপর জোর দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু সেই ঘটনাই নাটকের কেন্দ্রীয় ঘটনা নয়। এ নাটকেও কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচার করা হয়েছে।

চার অঙ্কে বিভক্ত 'নলদময়ন্তী' নাটকে কলির দৌরাত্ম্য নায়ক-নায়িকার ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ। তবে নাটকে রাজা নলের ভাই পুষ্করের একটি দুষ্টভূমিকা আছে। এই নাটক মিলনান্তক ; বিদূষক আছে ; বিদূষক প্রকৃত বান্ধবোচিত ব্যবহার করেছে। সর্বত্র পৌরাণিক গল্পেরই আনুগত্য।

অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মত আলোচ্য নাটকেও পাঁচালীর মত অনুপ্রাস ব্যবহার দেখা যায়।

নিয়ে নিধি, কেন বিধি, হও প্রতিকূল ?
ছি ছি ধিক নারীর জীবন !
সাধিতে কাঁদিতে দিন যায় !
যারে প্রাণ চায়—সে আমারে ঠেলে পায় ;
তবু প্রাণ কাঁদে তার তরে !

নল রাজার বক্তৃতায়ও এই প্রকার ভাষারীতির ব্যবহার দেখা যায়। এ ছাড়া উনিশ-শতকী উত্তর-কলকাতাই ভাষার ব্যবহার দেখা যায়, যেমন বেতর ঢং, পিরীত। বিশেষ করে সঙ্গীতগুলি সে-যুগের আখড়াই-হাফআখড়াই গানের 'ইডিয়মে' লেখা।

অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও নৃত্যগীতের প্রয়োজনে দেববালাদের অবতারণা করা হয়েছে, ভদ্রমহিলারা পদ্ম থেকে উদ্ভূত হবেন, আবার দুটি গান গাইবার পর জলতলে নিমগ্ন হবেন।

পৌরাণিক নাটকসমূহের মধ্যে সবাধিক উল্লেখযোগ্য হোল 'জনা' ও 'পাণ্ডবগৌরব'। অপরাপর নাটকে কোনক্রমে একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা কথোপকথন ছলে পরিবেশন করতে পারলেই দায়িত্ব সম্পন্ন হয়েছে বলে নাট্যকার মনে করেছেন। তবু স্বীকার্য যে এই দুইটি নাটকে তিনি একটি নাটীয় সংঘাত আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

'জনা' নাটকের পৌরাণিকতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান আলোচনা হয়েছে 'চিকিৎসাতত্ত্ব ও সমীরণ' নামক পত্রিকায়। (১৩০১, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) নাট্যকার পৌরাণিক উৎস সন্ধান করেননি; তিনি লৌকিক উৎসকে প্রামাণিক মনে করেছেন। জৈমিনী মহাভারতের জ্বালা তাই তাঁর নাটকে হোল জনা। কাশীরাম দাসের লিপিকর প্রমাদ শিরোধার্য হোল। মাইকেলও তাই করেছিলেন। কিন্তু কাশীরাম দাসকে অবলম্বন করে সত্যকার ট্রাজেডি রচনা সম্ভব নয়। এই নাটকে তিনি সেক্সপীয়ারের স্মরণ নিয়েছেন। সেক্সপীয়ার কোন ক্রমেই হরিভক্তিপ্রচারিণী সভার সদস্য হতে পারেন না। ফলে নাট্যকার সেক্সপীয়ার-অনুমোদিত রীতিও গ্রহণ করেননি, কাশীদাসী রীতিও অনুসরণ করেননি।

কাশীরামের গল্পটির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের প্রভেদ অনেক মুখ্য ব্যাপারে রয়েছে। কাশীরাম প্রবীরকে শাপভ্রষ্ট শিবানুচর করে হাজির করেন, সে গিরিশচন্দ্রের প্রবীরের মত অতটা গোঁড়া মাতৃভক্ত নয়। বরং কাশীরাম বলেছেন—

> প্রবীর নামে তার প্রধান তনয়।
> যৌবনে হইয়া মত্ত নাহি ধর্ম ভয়॥

তবে সে বীররূপেই চিত্রিত হয়েছে; এবং বীরোচিত কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়নি।

জনাও গঙ্গার বরপুত্রী নয়, এটাও গিরিশের রচনা। প্রবীর যাতে যুদ্ধে যাত্রা করে এবং রাজার অনুমতিলাভ করে তার জন্য কাশীরামের গ্রন্থে জনা তর্কে প্রবৃত্ত হননি। কাশীরামে রাজা যুদ্ধে একান্ত অনিচ্ছুক নন; এমন কি অগ্নি পর্যন্ত অক্ষত্রিয়সুলভ উপদেশ দিতে বদ্ধপরিকর হননি। প্রবীর নিহত হলে জনা রাজা নীলধ্বজকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু তদপরিবর্তে রাজা আত্মসমর্পণ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। জনাকে তিনি তিরস্কার করেন। প্রবীর প্রথম দিনের সংগ্রামে মৃত্যু বরণ করে, তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য কৃষ্ণকে আহ্বান করা হয় নি, তাঁর শলাপরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।

স্বামী অস্বীকৃত হলে জৈমিনীর জ্বালা তাঁর ভ্রাতা উলুকের কাছে যান; তাকে প্রতিশোধ নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু উলুক তাতে সম্মতি দিল না। তখন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন করেন নি; গঙ্গাকে দিয়ে ভীষ্ম-হন্তা অর্জুনের প্রতি শাপ বর্ষণ করালেন। গঙ্গার অভিশাপে হৃষ্টা তিনি হলেন; এবং অতঃপর অগ্নিতে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করলেন। এবং বাণরূপে বভ্রুবাহনের তূণে প্রবেশ করলেন।

কী জৈমিনী, কী কাশীরাম—কারো সঙ্গেই গিরিশনাটকের মিত্রতা নেই। তিনি তাঁর ভক্তিবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং সমসাময়িক মঞ্চবিধির প্রতি আনুগত্য জানিয়ে এই নাটক রচনা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন যে, মাইকেলের পত্রকবিতা "নীলধ্বজের প্রতি জনা' থেকে তিনি এই নাটকের ইঙ্গিত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনি মধুসূদনের পথে চলেন নি। মধুসূদন শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সংহিতা নয়; শুধু মানবধর্মই প্রকাশ করতে চেয়েছেন, ভক্তিবাদ নয়।

জনৈক সমালোচক লিখেছেন "গিরিশবাবু মাইকেলের বীরাঙ্গনা হইতে জনার ছবি লইয়াছেন বলিয়াই এতটা বিসদৃশ হইয়াছে।" আমাদের মতে এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল। গিরিশচন্দ্র আদৌ মাইকেল-পথ অনুসরণ করেন নি। মাইকেলের গল্পের খোলসটুকু গ্রহণ করার অর্থ মাইকেল-অনুসরণ নয়।

মাইকেল থেকে কাশীরাম—অনেকখানি পথ। গিরিশচন্দ্র এই পথ অতি সহজে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন। তিনি জনা চরিত্রের প্রতিশোধ-স্পৃহাকে কৃষ্ণভক্তির সর্বাতিশয় দিয়ে আবৃত করে রেখেছেন। কৃষ্ণভক্তির পাশাপাশি আছে গঙ্গাভক্তি। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন দেবদেবীর আনুগত্য নিয়ে যে রেষারেষি চলত, গিরিশ তাঁর নাটকে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু

মধ্যযুগীয় সুস্থতা নিয়ে নয়। স্বভাবতই চাঁদ-সওদাগরের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ধর্মীয় রেষারেষির যুগেও এই শক্তিমান পুরুষ তাঁর মহিমান্বিত মস্তক নিয়ে সবার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আছেন। জনা তেমন মহিমা দাবী করতে পারেন না।

মাধুর্যের চেয়ে কাঠিন্যের সমাবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায় লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে। জনা আলোচনাকালে কেউ কেউ তার প্রসঙ্গও উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু জনা লেডি ম্যাকবেথের মত ব্যক্তি-সর্বস্বতার চরম দৃষ্টান্ত নয়। জনার পিছনে ঐশী-ভক্তি রয়েছে; ম্যাকবেথ ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্য।

'জনা'র বিদূষক একটি মুখ্য চরিত্র। সকলেই একে প্রচ্ছন্ন ভক্ত চরিত্র বলে সমাদর করেছেন। অথচ এই 'প্রচ্ছন্নতা' প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক থেকেই প্রকটতা লাভ করেছে।

> শোন দেবতা, আমার রাজার প্রতি বড় মমতা, ও আমার অন্নদাতা বাপ; কৃষ্ণ-ভক্তি দিতে হয়, শেষাশেষি দিও, কিন্তু তাড়াতাড়ি যেন হরি দিয়ে বৈকুণ্ঠে পাঠিও না। ১।১

এই উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্নতা যা আছে, তা বালকেরও বোধগম্য। আর অগ্নি যখন বলেছে—

> ধন্য ধন্য তুমি দ্বিজোত্তম।
> হরি-ভক্ত তোমা সম নাহি ত্রিভুবনে।

তখন আর সেই মূল্যায়ণের অবকাশ থাকে কি? বিদূষক এই নাটকের অলঙ্করণ মাত্র।

জনা চরিত্রটিও দোষমুক্ত নয়; নাট্যকার জনা চরিত্রের কোন গূঢ় রহস্য আমাদের কাছে উপস্থিত করতে পারেন নি। কেবল প্রথমাবধি তাকে গঙ্গাভক্তিপরায়না করে এঁকেছেন। এ হোল তার সাধারণ পরিচয়; তার বিশিষ্ট পরিচয় হোল সে কারও স্ত্রী, বা কারও জননী। স্ত্রীরূপে নীলধ্বজের সঙ্গে তার আচরণ ব্যক্তিগত নয়, নৈর্ব্যক্তিক। রাজসভায় সে যা বলেছে, অগ্নি তার থেকে পৃথক কিছু বলেনি। পুত্রের সঙ্গে তার ব্যবহারও অনুরূপ। পুত্রের মৃত্যুতে সে বলছে,

> কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে, শোক কর, বালা,
> শোক নাহি জনার হৃদয়ে।
> অস্ত্রানলে দগ্ধ তনু তনয়ের মম,
> আঁখি জল কর মা শীতল।

কাঁদ কাঁদ বালা, পতি তোর ধরা তলে ;

রুধির তৃষ্ণায় জ্বলে জনার অন্তর। ৩।৪

জনার এই ভাষণ সর্বসমক্ষের ভাষণ ; তার নিভৃতের ভাষণ আমাদের শুনবার ইচ্ছা ছিল। সেই ভাষণই হোত মাতৃত্বের অকৃত্রিম ভাষণ। মঞ্চাধ্যক্ষ ও অভিনেতা-গিরিশচন্দ্র মঞ্চের প্রয়োজন সিদ্ধ করলেন ; জননী-জনা অভিনেত্রী-জনা মাত্র হলেন।

পাঁচ অঙ্কে চব্বিশটি গর্ভাঙ্কে নাটক সম্পূর্ণ। বিভিন্ন গভাঙ্ক বা দৃশ্যগুলি এক আকারের নয়, কোন কোনটি খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্ষুদ্রতা ঘটনার দ্রুততা প্রকটনের জন্য নয়। শুধু ঘটনা বিবৃত করার জন্য, নৃত্যগীতের জন্য একাধিক দৃশ্যের সন্নিবেশ করা হয়েছে। শুধু রসিকতা সৃষ্টির জন্যও দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে (২।২)। নাট্যগ্রন্থনায় পূর্বতন আদর্শকে তিনি ক্ষুন্ন করেছেন। এমন কি, নাটক যখন চরম সীমায় পৌছাচ্ছে, তখন তিনি বিদূষক ও বিদূষকপত্নী নিয়ে প্রায় একটি গর্ভাঙ্ক সম্পূর্ণ অপব্যয়িত করেছেন। নাটকের লক্ষ্য হোল জনার বেদনান্ত পরিণতি দেখান ; সেখানে সূচনায় কিছু ইতস্তত পদচারণা সমর্থনযোগ্য হলেও উপসংহারে এই প্রকার আচরণ নাট্যসংহতির পরিপন্থী। এমন কি, পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গভাঙ্কেও তিনি গঙ্গারক্ষকদ্বয়কে নিয়ে অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন। সেক্সপীয়রের কবরখননকারীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমাদের নীরব করে দেবার প্রয়োজন নেই। আপত্তি হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নয়, আমাদের আপত্তি ঘটনাব গতি ও পরিণতিকে দ্বিধান্বিত করার জন্য, শিথিল করার জন্য।

'পাণ্ডব গৌরব' নাটকেও পুরাণকথার অভ্যন্তর থেকে গিরিশচন্দ্র নাট্যীয় উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। রামকথা নাট্যায়িত করার সময় তিনি যেমন কেবল তার সংলাপসমৃদ্ধ রূপকেই নাট্যরূপ মনে করতেন, এখানে তেমন নয়। এখানে একটি সংঘাত আছে। এবং এই সংঘাতকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তিনি নাট্যীয় সংকট গড়ে তুলেছেন। বলা বাহুল্য, এই সংঘাত বাহ্য সংঘাত মাত্র।

প্রথম অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে বনমধ্যস্থ এক প্রান্তরে দণ্ডীর সঙ্গে উর্বসীর সাক্ষাত হোল। এবং পুরাণে পুরুষ ও নারীর বিজন প্রান্তরে সাক্ষাত হওয়ার অর্থ ই হোল প্রেমে পড়া (শুধু তাই বা কেন ?)। উর্বসী তখন শাপগ্রস্তা,"তাই দিবসে তুরঙ্গী, রাত্রে নারীবেশ মম।" আর "অষ্টবজ্র মিলনে ঘুচিবে অভিশাপ।"

দণ্ডী নানা স্থানে আশ্রয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পাণ্ডবদের কাছে এসে দাঁড়ালেন—শরণার্থকে আশ্রয়দান ক্ষত্রিয়োচিত কাজ। আর এই ক্ষত্রিয়োচিত কাজের ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হোল। নাটক এই দ্বন্দ্বকে সম্বল করে অগ্রসর হয়েছে। অথচ দণ্ডীর আখ্যায়িকার মধ্যেও নাট্যীয় উপাদান আবিষ্কার করা যেত। গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয় 'বিক্রমোর্বশী' রচনা করতে চান নি। ফলে এই নাটকে নায়ক শেষ পর্যন্ত দণ্ডী নন ; কেউ কেউ বলেছেন ভীম, কেউ কেউ বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আর উর্বশীও নায়িকা নন, দ্রৌপদীকে কেউ কেউ নায়িকা বলেছেন।

এ নাটক যেমন চরিত্র-ভিত্তিক নাটক নয়, ফলত তাই কোন নায়ক বা নায়িকা নেই।

পাঁচ অঙ্ক আর ত্রিশটি গর্ভাঙ্কে সম্পূর্ণ এই নাটক ; ঘটনার বিস্তৃতি আছে, তবে তার কোন বিকাশ নেই। চরিত্রসমূহ ঘটনার তুফানে বিপর্যস্ত হয়েছে, বিকশিত হতে পারেনি। বাইরের নাটকই তিনি কেবল দেখলেন, ভিতরের নাটকের প্রতি নজর দিলেন না। দণ্ডী ও উর্বশী তাই নাট্যবস্তুর মাত্র উপলক্ষ্য, লক্ষ্য নয়।

উর্বশী যখন শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেছে, তখন দণ্ডী, প্রেমিক দণ্ডী বলছে,

হে মুরারি, ধন্য আমি তোমার কৃপায়।
(কঞ্চুকীর প্রতি) হে ব্রাহ্মণ,
শুভক্ষণে রাজগৃহে তব পদার্পণ,
সফল জনম—পিতৃলোক পাইল উদ্ধার।

মুরারীর কৃপা-মাহাত্ম্য শোনাবার জন্য ত্রিশবার দৃশ্যপটের ওঠা-নামার আবশ্যকতা ছিল না। স্মরণ করা যেতে পারে প্রাচীনকালে লিখিত কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের প্রসঙ্গ, অর্বাচীন কালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী'র প্রসঙ্গ।

নাটকের দৃশ্যাবলী পরিকল্পিত হয়েছে ঘটনাকে সাজাবার জন্য, দণ্ডীর হৃদয়পট উন্মোচিত করার জন্য নয়।

গিরিশচন্দ্রের সর্বশেষ পৌরাণিক নাটক হোল 'তপোবল'। এই নাটকের কথাবস্তু নির্বাচনে একটি পরিবর্তন এসেছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হোল নাটকের বিষয়বস্তু, বাহুশক্তির সঙ্গে অন্তর-শক্তির দ্বন্দ্ব। তপস্যার বলে বিশ্বামিত্র লাভ করেছিলেন অপরিসীম শক্তি ; কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব হোল তার

অধিক। চরিত্রবলই প্রকৃত বল—বিশ্বামিত্র একদিন একথা বুঝলেন, এবং সেই দিন তিনি প্রকৃত তপোবল অর্জন করলেন। সন্দেহ নেই যে, নাটকের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু নাট্যগ্রন্থনায় দেখছি সাবেকী রীতি প্রবল। সেই সঙ্গীত-বাহুল্য, নৃতপরায়ণা দেববালাদের আবির্ভাব, এবং হাস্যরসের অহেতুক উচ্ছলতা। বোঝা যায় নাট্যকার অভ্যস্ত দর্শকের খিদমত করছেন।

গিরিশচন্দ্র এতকাল ধরে মাইকেল-প্রবর্তিত নাট্যরীতি একটি একটি করে ভেঙেছিলেন। আজ নিজের সৃষ্ট নাট্যকৌশলে নিজেই বন্দী। পুরাতন নিগড় চরণ ছাড়ল না।

সমকালের বিষয়সমৃদ্ধ নাটক

মনোমোহন বসুর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য আছে। গিরিশচন্দ্র পুরাণের মধ্যে বর্তমান যুগের কলরব হিল্লোলিত করেন নি। তিনি তাঁর যুগের কথা বলতে তাঁর বিশেষ কালের বিষয়ের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করেছেন। এবং সে নির্ভরতা অত্যন্ত সংকীর্ণ ভূখণ্ডে। তাঁর বিশেষ যুগ একান্তভাবেই তাঁর সমকাল; উত্তর-কলকাতার উনিশ শতক; এবং কুশীলবেরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সন্তান। পুরাণে তিনি ভারতীয়, ইতিহাসে তিনি বঙ্গদেশীয়, সমকালে তিনি নিতান্তই এক বিশেষ বর্ণধারী আঞ্চলিক মধ্যবিত্ত সন্তান!

চল্‌তি যুগ তাঁর নাটকে স্থান পেল ১২৯৬ বঙ্গাব্দে। 'প্রফুল্ল' ও 'হারানিধি' একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। তারপর 'মায়াবসান' (১৩০৪), 'বলিদান' (১৩১৩), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৩১৫) 'গৃহলক্ষ্মী' (১৩১৯) প্রকাশিত হয়। গৃহলক্ষ্মী তাঁর মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পরিমার্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ১২৯৬ থেকে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ তাঁর সমাজবিষয়ক নাটক রচনার কাল। এই কুড়ি-বাইশ বৎসরে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হোল দুইটি—অসবর্ণবিবাহআন্দোলন, বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন। এবং তার ফলে Civil Marriage Bill ও Age of Consent Bill পাশ হোল। রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনাও দুইটি,

১. কংগ্রেসের জন্ম

২. বঙ্গভঙ্গবিরোধী স্বদেশী আন্দোলন।

গিরিশচন্দ্রের 'সামাজিক' নাটকে (অন্যান্য নাটক যেন অসামাজিক!) এই সব ঘটনা সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই। তাঁর পৌরাণিক নাটকের মতই

তাঁর সামাজিক নাটক সমসাময়িক মৌল সমস্যা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথা, মদ্যাসক্তি তাঁর নাটকের সমস্যা। এগুলি সদ্য-উত্থাপিত প্রশ্ন নয়। এগুলি যেমন সমাজজীবনের মূল ধরে নাড়া দিচ্ছে না, তেমনি ব্যক্তি-জীবনেরও মৌল প্রশ্ন স্পর্শ করছে না। বাংলা কাব্যে মানসী-সোনাতরী-চিত্রার অন্তরলোকে যে সংকট, উপন্যাসে সীতারাম-চোখের বালি-নৌকাডুবির বুকে যে সংকট, তা মদ্যপানের জন্য উদ্ভূত হয় নি। 'মানসী'র প্রশ্ন পণপ্রথার প্রশ্ন নয়, 'বিষবৃক্ষে'র প্রশ্নও মদ্যপানের অপকারিতার প্রশ্ন নয়।

সেদিন কাব্যে বা উপন্যাসে জীবনের প্রশ্নে গভীরতার স্পর্শ লেগেছিল।

অথচ নাটকে এসে তা কেন স্থূল হবে, অগভীর এবং অসংস্কৃত হবে? নাট্য-সমালোচকদের এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

হ্যাঁ, সাহিত্যের আধার পৃথক হতে পারে, কিন্তু তার ফলে জীবনের মূল্য কোথাও হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয় না। জীবন নানা প্রবণতা নিয়ে নানা অঙ্গনে দেখা দেয়—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে, ছোটগল্পে তার নানা রূপ প্রকাশিত হয়। আবার এক এক শাখা বিশেষ যুগের হৃদয়-কলরব ধারণ করে মুখ্য সাহিত্য-শাখা রূপে পরিগণিত হয়। নাটক উনিশ শতকের জীবনের প্রধান বাণী বহন করে নি। কাব্য যে দায়িত্ব পালন করেছে, উপন্যাস কখনও কখনও, নাটক যৌথশিল্প বলেই সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। একথা ঠিক যে, দশজনের মিলিত উদ্যম ব্যতীত নাটক নাট্যায়িত হতে পারে না। গিরিশচন্দ্র দশজনের উদ্যম একত্রে মিলিত করেছিলেন, কিন্তু নাটক তিনি করতে পারেন নি।

শিক্ষার অভাব হোল উপনিবেশী শাসনের অভিশাপ, রুচির নিম্নগামিতাও মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ। "দেশীয় রঙ্গভূমিগুলিতে জাতীয়-চরিত্রের বেশ নমুনা পাওয়া যায়। সে গুলি কি জাতীয় চরিত্রের কোন গভীর আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হইতেছে? তাহা নহে।·· এখন রঙ্গভূমিতে যে সকল নাটক অভিনীত হয়, তাহার অধিকাংশই দেখি নাই, নাটকলেখকদের মধ্যে নামজাদা লোকের লিখিত যে দুই এক খানি চক্ষে পড়িয়াছিল তাহার দুই পৃষ্ঠা পড়িয়া ঘৃণাতে আর পড়িতে ইচ্ছা করে নাই। অতি হাল্‌কা, অতি পাতলা, অতি ছেপলা।"[৩০]

এই মূল্যায়ন বিদ্বেষীর মূল্যায়ন বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর নাট্যশালার অবস্থা?

"গ্যালারির দর্শকগণের মধ্যে অনেক ভদ্র সন্তান প্রকাশ্যে বসিয়া অভিনেত্রীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যেরূপ আকারেঙ্গিত ও কুৎসিৎ ইঙ্গিত

করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত লজ্জাকর সন্দেহ নাই।" (অনুশীলন, ১৩০২, জ্যৈষ্ঠ)।

এই মূল্যায়ন ত ব্রাহ্ম পত্রিকার নয়।

এই পরিবেশে গিরিশচন্দ্রের ও অমৃতলালের "সামাজিক" নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছিল।

প্রথম নাটক 'প্রফুল্ল' অত্যন্ত মঞ্চ-সফল নাটক; ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে ইংলিসম্যান পত্রিকার খবরে জানা গেল—

"The old Greek saying that the end of all dramas is to entertain and edify is well examplified in the case of the Star Theatre, where a number of pieces of a high order recently been produced. The latest dramatic sensation is the play of 'Profulla', which greatly affected some of the audience, one of them fainting with emotion. The plot of the piece is simple enough, being the history of a good natured man who being addicted to drink, is dispoiled of his property by his brother. The piece was admirably mounted."[৩১]

প্রফুল্ল নাটকের কথাবস্তু

'প্রফুল্ল' নাটক শুরু হয়েছে যোগেশের অন্তঃপুর থেকে; এবং প্রথম কথাবার্তা বলছেন দুই পুরনারী—উমাসুন্দরী ও জ্ঞানদা।

অন্তঃপুরের ঘটনা পুরনারীদের মুখে আন্তরিক ভাবে শোনা যায়। একজন শাশুড়ী, অপর জন জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু, শাশুড়ী বৃন্দাবনে চলেছেন, স্থায়ী ভাবেই সেই তীর্থে বাকী জীবন কাটাবেন এই হোল ইচ্ছা। যাত্রাব পূর্বে লক্ষ্মীর কৌটা পুত্রবধুর হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন।

যোগেশের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল না, শাশুড়ীর মতে বড় পুত্রবধূ ঘরে আসার পর থেকে "যোগেশের বাড়-বাড়ন্ত"। মেজো ছেলের বৌ প্রফুল্ল বায়না ধরল সে-ও সঙ্গে যাবে। কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিল না।

যোগেশ এসে খবর দিলেন যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। মায়ের অনুরোধে তিনি অনেকের দেনা মকুব করে দিলেন; অনেকের বন্ধকী জিনিস ফেরত দিয়ে দিলেন। বাবা মারা গেলে যোগেশ বহুকষ্টে দুটি অপোগণ্ড ভাই

নিয়ে সংসার চালিয়েছেন। যোগেশ সৎ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ; নিজের চেষ্টায় আজ ধনাঢ্য গৃহস্থ হয়েছেন। ভাইদের প্রতি কর্তব্য করেছেন। এখন সমস্ত সম্পত্তি তিন ভাইয়ে ভাগ করে নিতে চান। তাঁর মেজ ভাই রমেশ এ্যাটর্নি; সেজ ভাই সুরেশ লেখাপড়া শেখেনি, 'মানুষ' হয় নি।

যোগেশ অত্যন্ত সৎচরিত্র ব্যক্তি, একমাত্র দোষ মাঝে মাঝে একটু-আধটু মদ খান। আজও খাচ্ছিলেন।

এমন সময় যোগেশের সরকার মহাশয় কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে খবর দিলেন 'রি-ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ফেল করেছে। ঐ ব্যাঙ্কে যোগেশের যথাসর্বস্ব গচ্ছিত ছিল। তাই যোগেশ বললেন, "কাল আমি তোমাদের বাবু ছিলুম, আজ পথের ভিখারী।" যোগেশ অত্যধিক মদ্যপান করতে লাগলেন। এখন থেকে সুরু হোল রমেশের চক্রান্ত। এই সময় থেকে সে চেষ্টা করতে লাগল ভাই-এর সম্পত্তি হস্তগত করবার। আইনের ফন্দিফিকির তার জানা।

সুরেশ বকাটে ছেলে, কিন্তু সে মায়া-মমতাশূন্য নয়। দাদার অসুস্থতায় তার মন কাতর হয়েছে। প্রফুল্লর মাকড়িজোড়া বাঁধা দিয়ে যোগেশের জন্য ওষুধ আনতে চলল। রমেশ জানতে পেরে সুরেশকে চুরির দায়ে পুলিশকে দিয়ে গ্রেপ্তার করাল। তার ত কোন স্নেহমমতা নেই! আছে শুধু স্বার্থবুদ্ধি। ভাই-এর গ্রেপ্তারের খবর শুনে যোগেশ মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। আর এই সুযোগই রমেশ খুঁজছিল। এই ফাঁকে সে দাদা যোগেশকে দিয়ে বাড়ী বেনামী করবার কাগজপত্রে সই করিয়ে নিল। পরে সেই কাগজপত্র রেজিস্ট্রি করা হোল। পাওনাদারদের প্রতারিত করা হোল; যোগেশ এই চাতুরী বুঝতে পারলেন; তাঁর অনুতাপ হোল। এবং অনুতাপের ফল আরও মদ্যপান।

ইতিমধ্যে সংবাদ এল 'রি-ইউনিয়ন' ব্যাঙ্ক আবার ব্যবসাপত্র শুরু করছে। কিন্তু রমেশের চক্রান্তে এখবরও যোগেশের কাছে পৌঁছায় না।

সুরেশের জেল হয়ে গেল; রমেশ সুরেশের বিষয়ও হস্তগত করবার চক্রান্ত করল। জেলখানায় দেখা করেছিল সাদা কাগজপত্রে সই করিয়ে নিতে, কিন্তু রমেশের সঙ্গে কাঙ্গালীচরণ ছিল। তাতেই সুরেশের সন্দেহ হয়; সে কোন প্রকার সই দিতে রাজি হোল না। বরং বলল, "আজও তোমার যোগ্য জেল তয়ের হয়নি।"

রমেশের নীচতা এখানেই শেষ হল না; সে মা জ্ঞানদাকে জানিয়ে দিল যে সুরেশের চুরির অপরাধে জেল হয়েছে। শুনে উমাসুন্দরী মূর্চ্ছিতা হয়ে

পড়লেন ; আর যোগেশ বাড়ি ফিরে আরও মাতলামি সুরু করলেন ; মদ খেতে বারণ করায় নিজের সরকার মশাই পীতাম্বরকে তিনি ইট দিয়ে প্রহার করলেন।

যোগেশের স্ত্রীর নামে একখানা বাড়ি ছিল—অভাবের দায়ে ঐ বাড়ি বিক্রী হয়ে গেল। কিছু দিনের মধ্যেই আপন গৃহ ছেড়ে যাদব ও জ্ঞানদার হাত ধরে যোগেশ ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এবং বাড়ি বিক্রীর টাকায় দেদার মদ খেতে লাগলেন। এমন কি জ্ঞানদার গহনার বাক্স জোর করে হস্তগত করে মদ কিনবার অর্থ সংগ্রহ করলেন। এদিকে বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ছে। বাড়ীওয়ালী এসে যাচ্ছেতাই অপমান করল। প্রফুল্ল যাদবকে দেখতে এই বাড়িতে এল। যাদবের হাতে সে চার আনা পয়সা দিয়েছিল ; সে পয়সাও তার বাবা হাত মুচড়ে কেড়ে নিয়ে গেলেন। শুধু মদ আর মদ! বাড়ির ভাড়া বাকি পড়ায় বাড়িওয়ালা তাদের গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিল। রাজপথে জ্ঞানদার মৃত্যু হোল ; মৃত্যুর সময় যোগেশ সামনে এসে দাঁড়াল, জ্ঞানদা বলল, "তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, একটা কথা শোন ; আমায় মার্জনা কর ; আমি ঠাকুরপোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্বনাশ করেছি। আমি শিবপূজো করে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলুম, আমার সইল না, তোমার অপরাধ নেই। এখন শোধরাও তোমার সব হবে।" (৪।৫)

জ্ঞানদার মৃত্যু হোল। মৃতা স্ত্রীর সম্মুখে যোগেশ বুঝতে পারল যে, তাঁর সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে।

যোগেশের একমাত্র সন্তান যাদবকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছে রমেশ। কাঙালীচরণ ও তার স্ত্রী জগমণি তার সকল সয়তানির সহযোগী। তাদের সহায়তায় যাদবকে ধরে নিয়ে এসেছে ; বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হোক, এই হোল উদ্দেশ্য। মদন ঘোষ ছেলেটাকে ধরে এনেছে। প্রফুল্ল ব্যাপারটা কিছু পূর্ব থেকে আঁচ করতে পারে।

সুরেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে ; সে যাদবকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাচ্ছেনা। সুরেশের সঙ্গে ভজহরি যোগ দিয়েছে। জনৈক পরিচিত ব্যক্তির মুখের কথা থেকে একটু সূত্র পাওয়া গেল।

ভজহরির সন্দেহ যাদব রমেশের খপ্পরে আছে। রমেশের সঙ্গে ভজহরির দেখা হতে আরও জোরদার হলো সন্দেহটা। মদ্যপ যোগেশ শুধু মাতলামি করে ফিরছেন, আর আপশোষ করছেন।

মদন ঘোষের কাছ থেকে প্রফুল্ল আসল মতলবটা বুঝতে পারল। মদন ঘোষ তার কাছে প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে দেখিয়ে দেবে কোথায় যাদবকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। প্রফুল্ল যাদবের শয্যা পার্শ্বে গিয়ে উপস্থিত হোল। রমেশ তখন বেপরোয়া ; তার সমস্ত পরিকল্পনা যখন সার্থকতার দোরে এসে উপনীত হয়েছে, তখন সবকিছু বানচাল করার অপচেষ্টা! গলাটিপে সে তার আপন স্ত্রীকে মারল। ঠিক তখনি পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে সুরেশ, ভজহরি প্রভৃতি সেই স্থলে এসে পৌঁছাল। এবং রমেশকে নানা অপরাধে গ্রেপ্তার করল। মৃত্যুকালে প্রফুল্ল বলল,

> দেখ, তুমি স্বামী! তোমার নিন্দা করবো না,—জগদীশ্বর করুন যেন আমার মৃত্যুতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়—তুমি বড় অভাগা-সংসারে কারুকে কখন আপনার করনি। আমার মৃত্যুকালে জগদীশ্বর তোমার মার্জনা করুন। ঠাকুরপো, অভাগিনীকে কখনো মনে করো—আমি চল্লেম! (মৃত্যু) (৫।৪)

আর মদমত্ত যোগেশ শেষ মুহূর্তে সেই পুরানো উক্তির পুনরুচ্চারণ করলেন, —আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। নাটকের যবনিকা নেমে এল।

নাট্যকৌশল

প্রফুল্ল নাটকে একদিকে আছে যোগেশ, উমাসুন্দরী, জ্ঞানদা, প্রফুল্ল, পীতাম্বর, আর একদিকে আছে রমেশ, কাঙালীচরণ, জগমণি। আর তাদের মাঝখানে আছে সুরেশ-ভজহরি। প্রথম দুইদল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী। তৃতীয় দল আপাত চক্ষে মনে হয়েছিল, বুঝি বা দ্বিতীয় দলের শরিক ; পরে দেখা গেল তাদের বুকের মধ্যে মানবিক গুণ লুকানো রয়েছে।

নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ; এই চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য পরপর ঘটনা সাজিয়ে গেছেন। যোগেশের অধঃপতন ধাপে ধাপে চিত্রিত হয়েছে ; রমেশের "উন্নতি"ও ধাপে ধাপে হয়েছে। এক অর্থে রমেশ চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এক পরিবারের সন্তান হয়েও, একান্নে প্রতিপালিত হয়েও রমেশ শুধু ভাই-এর ধ্বংস ত্বরান্বিত করেনি, আপন স্ত্রীকে পর্যন্ত হত্যা করেছে। তার এই অর্থলোভ কার স্বার্থে, নাটকে তা স্পষ্ট নয়। শুধু লোভের জন্যই লোভ, এমন এক বিকৃত মনোভাব খাড়া করা যে যায় না, তা নয়। Abnormal Psychology-তে তার নজিরও আছে। কিন্তু নাট্যকার তেমন কোন রহস্য রমেশের ক্ষেত্রে রাখেন নি। উপন্যাসে 'ডোরিয়ন গ্রে'র

কাহিনীতে অস্‌কার ওয়াইল্ড অর্থহীন বিকৃতির এক ভিন্নতর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন ; ডোরিয়ান গ্রের সর্বপ্রকার অবিশ্বাস্য আচরণ এক মুহূর্তও তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়নি। পাঠক বিমূঢ় হয়, কিন্তু বিভ্রান্ত হয় না।

যোগেশ চরিত্রের মধ্যে কোন জটিলতা নেই ; উত্তর হোক আর দক্ষিণ হোক—কলকাতায় এই ধরণের মত্তপ সৎ (?) মধ্যবিত্তের সংখ্যা কোন যুগেই কম নয়। যোগেশ অত্যন্ত পরিচিত ও সাধারণ চরিত্র। ভগ্নোত্তম ক্লৈব্য ও নিশ্চেষ্টতা তাকে সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে ; এই জাতের চরিত্র থেকে ট্রাজেডির নায়ক তৈরী করা যায় না।

এই জাতীয় তরল ও সাধারণ চরিত্র নিয়ে ট্রাজেডি রচিত হতে পারে না, এ্যারিষ্টটল থেকে ব্রাডলি-ভাষিত এই সূত্রটি আজও ছিন্ন সূত্র নয়। বলা বাহুল্য, যোগেশ চরিত্রের এই সাধারণত্বই এই নাটকে এত মৃত্যু, চক্রান্ত, ধূর্তামি ও ইতরতার প্রশ্রয় দিয়েছে। যেখানে চরিত্রের মধ্যে মহিমা থাকে না, সেখানে ঘটনার মধ্যে অনাবশ্যক উত্তেজনা জুড়ে দিতে হয়। মেলোড্রামার উৎপত্তিস্থল এখানে। নাটকের পরিণতিতে দর্শক কোন প্রকার কারুণ্য ও ভীতির সম্মুখীন হয় না ; যা হয়, তা হোল অনুকম্পা মাত্র। 'প্রফুল্ল' পাঁচ অঙ্ক ছাব্বিশ দৃশ্য নিয়ে গঠিত। নাটকের প্রথম দৃশ্যটি সত্যিই প্রশংসনীয়ভাবে পরিকল্পিত ; হয়ত তার মধ্যে মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সাধারণভাবে একটি সার্থক নাটক রচনার উপক্রমণিকা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই কাঙালীচরণ ও জগমণির সংসর্গে নাটকের ভূগোলের বিকৃতি ঘটল, নাটকের প্রাথমিক সম্ভাবনা বিনষ্ট হোল। যা মধ্যবিত্ত গৃহের এক বেদনাদায়ক চিত্র হতে পারত, তা এক দুঃসহ কীটদষ্ট সমাজের চিত্র হতে চাইল। অথচ গল্পের মূল আবেদন পারিবারিক, সামাজিক নয়। যোগেশের সর্বনাশ তারই ব্যক্তিগত সর্বনাশ ও তারই পারিবারিক সর্বনাশ। উত্তর কলকাতার ঐ বিশেষ পল্লীর কোন অধিবাসীই এর জন্য বিড়ম্বিত হয় নি ; বস্তুত নাটকে তার কোন উল্লেখ নেই। রমেশ এত কাণ্ড করেছে, প্রতিবেশী কেউ, সমাজের কোন সহৃদয় ব্যক্তি একটা লাঠি উঁচিয়েও আসেন নি, দুটি কটুবাক্য বলেন নি। কাজেই সমস্যা নিছকই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক। 'সামাজিক' নাটক তবে কি সমাজকে অস্বীকার করেই গড়ে ওঠে ?

পাঁচ অঙ্কের নাটক চতুর্থ অঙ্কেই শেষ করা যেত, কারণ যোগেশের দুর্ভাগ্যের ষোলকলা সেখানেই পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু রমেশের সয়তানির কোন শাস্তিবিধান

না করে যবনিকা ত টানা যায় না। অতএব নাটক প্রলম্বিত হোল। পবিত্রতম সততার পাশে নৃশংসতম সয়তানির স্থান থাকল—কারণ নাটক এখানে অতি-নাটক হয়েছে, 'Drama' হয়েছে 'Melodrama', ট্রাজিক রস নিতান্তই ক্রন্দনরস!

প্রফুল্ল নাটকের নায়ক যোগেশ, অথচ নাটকের নামকরণে প্রাধান্য পেল একটি বালিকাবধু। এখানেও লেখক বেদনার নিরানব্বইটি শর পরিত্যাগ করেও নিশ্চিন্ত হতে পরেন নি, শেষ শরটি সতর্কভাবে নিক্ষেপ করলেন। দর্শকের দারুণতম চাটুকার হলেন সর্বদেশের অতি-নাটকের (Melodrama) লেখক।

প্রফুল্ল নাটকের ভাষা অনেকের কাছে সাধুবাদ পেয়েছে। প্রফুল্ল নাটকের ভাষা আটপৌরে ভাষা; উত্তর কলকাতার মুখের বুলি। মেলোড্রামাতে হয় অত্যন্ত কুসুমিত ভাষা, না হয় আটপৌরে ভাষা প্রভুত্ব করে। সাহিত্যের ভাষা স্বভাবের ভাষা নয়; অন্তত পুরো নয়।

গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' আর 'হারানিধি' একই বৎসরের রচনা। তাই হারানিধি প্রথমোক্ত নাটকের অনেকগুলি খোঁচ আত্মস্থ করে অগ্রসর হয়েছে। এই নাটকেও বিষয়-আশয়ের প্রসঙ্গে নীলাম, ইন্‌সল্‌ভেন্সী, পেন্সন প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। মোহিনীবাবুব কুকীর্তি দেখানই নাট্যকারের প্রথম দিকে উদ্দেশ্য ছিল; পরে 'গুণনিধি' অঘোর মুখ্য হয়ে উঠল। সুশীলা-অঘোরের কাহিনী নিতান্ত একটা উপকাহিনী, নাটকের শেষে উপকাহিনী মুখ্য-কাহিনীকে স্থানচ্যুত করল। অঘোরের পুনর্বাসনের ফলে নাটকের নাম হোল 'হারানিধি'। এই নাটকে বহুবিবাহের প্রসঙ্গ আছে; কিন্তু এই প্রশ্নটি তিনি সমর্থন করছেন, কি বিরুদ্ধতা করছেন তা পরিষ্কার নয়। বহুবিবাহ নিতান্তই কি বহুনারী সম্ভোগইচ্ছা সঞ্জাত?

প্রকৃতপক্ষে একটি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র নয়। এমন কি উত্তর কলকাতার কায়স্থজীবনের বিশ্বস্ত চিত্র নয়। এ এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের ছবি, যারা দিনে সওদাগরী অফিসে এবং রাত্রে বেশ্যালয়ে কাল হরণ করে। গিরিশচন্দ্র 'হারানিধি' নাটকে এসে 'প্রফুল্ল' নাটকের সমাজ-ভিত্তি পর্যন্ত খুইয়ে ফেলেছেন। তাই নাটকের নাটকীয়তা নির্ভর করেছে অজস্র কৃত্রিম স্থূল কৌশলের উপর।

'বলিদান' গিরিশচন্দ্রের অন্যতম একদা-খ্যাত নাটক। 'বলিদান' নাটকে সমাজসমস্যা অত্যন্ত প্রকট; নাট্যকার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে পণপ্রথার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

হারানিধি নাটকে কোন সুস্থ সুন্দর চরিত্র নেই। অথচ তাদের সর্ববিধ সয়তানি ও লাম্পট্যের অন্তরালে যেন বাস করছে এক একটি ছদ্মবেশী 'মহৎপ্রাণ'। 'বলিদান' তদনুরূপ নয়। বলিদান নাটকের কন্যাদায়গ্রস্ত সামান্য চাকুরে করুণাময়বাবু একজন গৃহস্থ শ্রেণীর ভদ্রলোক।

ট্রাজেডির নায়ক হবার কোন যোগ্যতা করুণাময়বাবুর নেই, কারণ তিনি খুবই সাদাসিধে লোক। তাঁর মত ব্যক্তি কদাচ খবরের কাগজে সংবাদ হয় না, নায়ক হয় না। তিনি পাঁচ অঙ্কের সাঁইত্রিশটি দৃশ্যের কোথাও আপনাকে অসাধারণ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। সাধারণ মানুষের মধ্যেও অসাধারণত্ব থাকে, আর পরিচিত মানুষও হঠাৎ শিল্পের ছোঁয়ায় অপরিচিত হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র দুঃখের কথা বলেছেন, বেদনার কথা বলেছেন, কিন্তু সেই মহৎ বেদনার কথা বলতে পারেন নি, যা নিয়ে ট্রাজেডি গড়ে ওঠে। নাটকের শেষ দৃশ্যে আমাদের হৃদয়ে আতঙ্ক ও বেদনা দুইই সঞ্চারিত হয়, কিন্তু সেই ভয়াবহতাকে মহৎ ভযাবহতা বলে মনে করি না।

এক হিরণের মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র নাটক শেষ করা সঙ্গত মনে করেন নি, করুণাময়ের মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর মৃত্যুও ঘটল।

নাটকে যা কথিত হয়েছে, নাট্যকার তাতে তুষ্ট হলেন না। উপরন্তু নাটকের উপসংহারে একটি ভরতবাক্য জুড়ে দিলেন। বলিদান নাটকের উদ্দেশ্য অতি-উচ্চারিত। এ ক্ষেত্রে 'প্রফুল্ল' থেকে তার ভিন্নতা দেখা যায়। প্রফুল্ল বড় ট্রাজেডি না হতে পারে, কিন্তু "মদ খাওয়া বড দায়, জাত থাকার কি উপায়" (১৮৫৯) নামক গ্রন্থের নাট্যভাষ্য নয়। 'প্রফুল্ল' যোগেশ নামক ব্যক্তি-বিশেষেরই অধঃপতনের কাহিনী, মদ্যপানের অপকাবিতা বিষয়ক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নয়। কিন্তু 'বলিদান' করুণাময়ের জীবন-বিবরণ হয়েও করুণাময়ের জীবন-আলেখ্য নয়। পণপ্রথার বিষময় পরিণতি নাট্যকার দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। এই কারণে এই নাটকের ভরতবাক্য প্রক্ষিপ্ত অংশ নয়। ঈশপের গল্পে একটি নীতিসূত্রে কে কবে আপত্তি করেছে।

'প্রফুল্ল' নাটকের আঙ্গিক 'বলিদান' অনুসরণ করেনি। এবং পববর্তী নাট্যরচনায় 'বলিদানের' কৌশলই আধিপত্য করেছে।

মায়াবসান, শাস্তি কি শান্তি ও গৃহলক্ষ্মী 'বলিদানে'র কৌশলের অনুসরণ।

'মায়াবসানে' কালীকিঙ্কর বসু নামক জনৈক বিপত্নীক ভদ্রলোক কী ভাবে নানা অবস্থা বিপর্যয়ের পর নিষ্কাম ধর্মের মাহাত্ম্য শিখলেন, তাই দেখান হয়েছে।

এই নাটকে সম্ভাব্যতা বলে কোন ধারণার লেখক অবশিষ্ট রাখেন নি। মামলা-মোকদ্দমা, ঋণ-ডিগ্রিজারী, উইল প্রভৃতি বৈষয়িক জীবনের নানা ছলাকলার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। ভবতবাক্যে নাটক শেষ।

'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের রীতিও একই প্রকার; বৈধব্য-জীবনে ব্রহ্মচর্যের স্থান কোথায়, বিধবাবিবাহ যুক্তিসঙ্গত কিনা—এই সব প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয়েছে। তিনটি বিধবা নারীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। ঘটনার বীভৎসতা নাটকের প্রয়োজন ছাড়িয়ে গেছে, যদিও কোন গভীরতা নেই।

নিষ্ঠাবতী বিধবার মহিমা আমরা উপলব্ধি করলাম, কিন্তু যারা জীবনকে জীবিত রেখে আস্বাদ করতে চেয়েছিল, তাদের প্রতি নাট্যকাব অযথা কঠিন ও রূঢ় হলেন কেন? প্রমদা বা ভুবনমোহিনী শাস্তির যোগ্য, না অনুকম্পার যোগ্য, তাই হোল বিবেচ্য। স্বামীর বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠাকন্যা ভুবনমোহিনী গর্ভবতী হন; প্রসন্নকুমার তাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন, নিজেও আত্মঘাতী হন। কনিষ্ঠা কন্যা বিধবা হলে তাকে পুনর্বার বিবাহ দেওয়া হয়। সে সুখী হোল না। কিন্তু পুনর্বিবাহিতা নারী সুখী হয়েছে, এমন উদাহরণ কি সে যুগে ছিল না? ছিল। কিন্তু নব্যহিন্দু জীবন-চেতনা নাট্যকারকে চালিত করেছে, বাস্তব মানুষ নয়। 'গৃহলক্ষ্মী'ও একই আঙ্গিকে লেখা। এই সব নাটকে ঘটনার মেজাজ তপ্ত; আর দৃশ্যের পরিবর্তন অত্যন্ত ক্ষিপ্র। সবাই কথা বলছে অত্যন্ত চড়া সুরে। কথা-কথা-কথা! আমরা জানি, নাটক সংলাপের সমষ্টি, কিন্তু সংলাপের অর্থ শুধু বাক্য-বিনিময় নয়। মাঝে মাঝে থামতে হয়। নীরবতাও সংলাপের ধর্ম মধ্যে-মধ্যে পালন করে। এই সব নাটকে কেবল চীৎকার, আর্তনাদ আর কোলাহল। শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত। নীরবতা শুধু কি মৃত্যুর পর অর্থাৎ নাটকের যবনিকা পতনের পর অনুভূত হবে?

কমেডি, প্রহসন, পঞ্চরঙ

গিরিশচন্দ্র তাঁর কালের কথা অবলম্বন করে অনেকগুলি কমেডি, প্রহসন ও পঞ্চরঙ রচনা করেছেন। কমেডি সম্বন্ধে তাঁর কোন স্থির ধারণা ছিল না, অধিকাংশই বিদেশী নাটকের অনুসরণ।

'আয়না' ও 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' তাঁর রচিত পূর্ণাঙ্গ কমেডি নয়। 'আয়না' হোল প্রহসন ও কমেডির মধ্যবর্তী রূপ। 'আয়না' বিয়ে-পাগলা বুড়োর

নাজেহাল হওয়ার গল্প; শেষ পর্যন্ত তার নিজের জন্য মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে তারই পৌত্রের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

বিধবা-বিবাহ যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই লেখকের আক্রমন। এ নাটকে প্রস্তাবনা আছে, ভরতবাক্য আছে। ভরতবাক্যে ও প্রস্তাবনায় সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে যেমন মন্তব্য, তেমনি যাঁরা ছেলের বিয়েতে পণ নিতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধেও সমালোচনা আছে। আসলে রঙ্গতামাসা সৃষ্টি করাই লেখকের লক্ষ্য; সমাজজিজ্ঞাসায় কোন স্থির নীতি নেই। তাই দৃশ্যের পর দৃশ্য শুধুই গানে ভরা (১।৭, ২।১, ২।৩); নানা দৃশ্যে বিশটি গান ছড়িয়ে আছে। নাটকে কন্যাদায়গ্রস্ত মধ্যবিত্তের দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অতিবৃদ্ধের বিবাহ-সাধের কৌতুকর দিক বর্ণিত হয়েছে। ঘটনায় যেমন দ্বিমুখীনতা আছে, নাটকের গাঁথুনিতেও তেমনি দ্বিচারীভাব আছে—গান আর সংলাপ একে অপরেব রাজ্যে হানা দিয়েছে। 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' মলিয়েরের বিখ্যাত কমেডি 'Love is the Best Doctor' (L' Amour Medicin) অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে নাট্যকার পণপ্রথার বিরুদ্ধেও বক্তৃতা দিয়েছেন। নাটকের শেষে একটি ভরতবাক্য আছে।

> "এখন আমার অবিবাহিত ছেলের বাপদের প্রতি যোড় করে নিবেদন যে, তাঁদের পাওনার দৌরাত্ম্যেই হিন্দুর ঘরে সব ধেড়ে মেয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছে। হিন্দুয়ানীর মুখ চেয়ে কামড় একটু কম করুন। তাহলে গৌরীদান প্রভৃতি প্রাচীন শুভ বিবাহ-ক্রিয়া আবার স্থাপিত হয়।"

দর্শকদের সঙ্গে এইভাবে সরাসরি কথা বলার রীতি পণ্ডিত রামনারায়ণের নাটকে বহু ব্যবহৃত। মলিয়েরের শিল্পিক নির্লিপ্ততা এখানে কোথায়?

পঞ্চরঙ

এ ছাড়া আরও অনেকগুলি পঞ্চরঙ লিখেছেন; এগুলি শুধু হাসি-মস্করার জন্য রচিত এবং পূর্ণ নাটকের অভিনয়ান্তে মঞ্চস্থ হোত। যেন পূর্ণ নাটকে দর্শক মনোরঞ্জনে উপকরণের কোন অভাব থাকত! একবার মৃণালিনীর সঙ্গে সীতাহরণ অভিনীত হয়; দর্শক জিজ্ঞাসা করে "এর মধ্যে কোনটি পালা, আর কোনটি সঙ।" (রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা —অবিনাশ গঙ্গো, ১৩৩০। পৃ—৪২) উদাহরণে হয়ত একটু অতিকথনের ঝোঁক আছে। কিন্তু একথা সত্য যে গিরিশের নাটকে নৃত্যগীতসহ রঙ্গরসের পরিমাণ বেশি থাকত। সে-যুগের সমালোচনার প্রতি নজর দিলেই তা স্পষ্ট হবে। এর পরও যদি আবার

পঞ্চরঙ পরিবেশন করতে হয়, তাহলে দর্শক-চরিত্র সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধাপ্লুত ধারণা হয় না। বহু নাটকের মধ্যেই গিরিশচন্দ্র একটা আলাদা নাটক ঢুকিয়ে দিয়েছেন—শুধু নৃত্যগীত ও রঙ্গরস সৃষ্টির জন্য। 'পূর্ণচন্দ্রে' দামোদর-সারী-সুন্দরী প্রসঙ্গ, 'আবু হোসেনে' দাই-মস্থর, 'জনা'য় মদন-রতি প্রভৃতি তার উদাহরণ। কিন্তু তবু রঙ্গরসের ক্ষুধার কোন নিবৃত্তি নেই!

নাট্যকার 'বেল্লিকবাজার'কে বলেছেন বড়দিনের 'পঞ্চরঙ'। সেকালের কানাগলির গল্প এটি; ডাক্তার, উকিল, টাউট, শ্মশানের রেজিষ্ট্রার, মুদ্দফরাস—সবাই আছে। শুধু ভব্যতা নেই। সংস্কারপন্থীদের নিন্দা আছে; সব মিলিয়ে নিছক মাতাল দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাহিত্য।

'পাঁচ কনে' চারটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার ও নারী-প্রগতির প্রতি ব্যঙ্গ আছে। হাস্যরস সৃষ্টির জন্য নানা কায়দা আছে-ওড়িয়া সংলাপ, গান আছে, বাঙালনী আছে। আসলে নাটক নয়, কেলুয়া—ভুলুয়ার সঙ। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগকে প্রস্তাবনায় হাজির করা হয়েছে।

'সভ্যতার পাণ্ডা' পণপ্রথা-বিরোধী পঞ্চরঙ। অনেকগুলি রূপক চরিত্র আছে—পুরাতন বর্ষ, নূতন বর্ষ, সভ্যতা, বিভিন্ন ঋতু, প্রভৃতি। নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হয়েছে। জন্তু-জানোয়ার মঞ্চে নেমেছে; এগুলিও কথা বলেছে। সবার উপর পরীস্থান পর্যন্ত আছে। এগারটি দৃশ্যে বাইশটি গান আছে।

এগুলি যথার্থই 'afterpieces'। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম দিকে অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী অনেক রঙ্গতামাসা করতেন। সেগুনি শুধুই ছিল আনন্দরস বিতরণ। মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাসা, বিলাতী বাবু, সাব্‌স্ক্রিপসন বুক, প্রাইভেট থিয়েটারের গ্রীন রুম, মডেল স্কুল, পরীস্থান, নববিদ্যালয়, The Goosequill Fight, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী প্রভৃতি এক সময়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখত। এগুলি Dave Carson নামক জনৈক বিদেশী হাস্যরসশিল্পীর অভিনয়ের প্রতিবাদে ও অনুকরণে রচিত। "দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা, তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ-প্রীতি জন্মাইতে পারে, দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না"।[৩২]

গিরিশচন্দ্রের 'পঞ্চরঙ'-এর উদ্দেশ্যও আনন্দ বিতরণ, কিন্তু রচনারীতি পৃথক। এখানে শুধু নট নয়, নাট্যকারও উল্লেখযোগ্য। মুস্তফী সাহেবের পঞ্চরঙ ছিল প্রস্তুতিশূন্য তাৎক্ষণিক রচনা; আর এগুলি প্রস্তুতিপূর্বক রচনা।

তাছাড়াও বক্তব্যের মধ্যেও পার্থক্য ছিল। মুস্তফী সাহেবের তামাসায় সংস্কারপন্থী বা পুরাতনপন্থীদের নিয়ে নির্বিচারে কটাক্ষ থাকতো; সকলের বাড়াবাড়ি নিয়ে পরিহাস থাকত।

গিরিশচন্দ্রের 'পঞ্চরঙ' নতুন যুগের প্রতি পুরাতনের ভৎ‍র্সনা। গিরিশচন্দ্র দলভুক্ত নাট্যকার।

গীতিনাট্য

জীবনীকারেরা বলেছেন, প্রথমে গীতিকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র দেখা দেন, পরে তিনি নাট্যকার হন।

আবার নাটকের আসরে যখন তিনি দেখা দিলেন, তখন গীতিকারের ভূমিকাটিকে কাজে লাগালেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'আগমনী' ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় (১২৮৪, ১৪ আশ্বিন)। তারপর 'অকাল বোধন' (১২৮৪, ১৮ আশ্বিন)। 'দোললীলা' (১২৮৪, ফাল্গুন), 'মায়াতরু' (১২৮৭) 'ব্রজবিহার' (১২৮৮), 'হীরার ফুল' (১২৯৩), 'মলিনা বিকাশ' (১২৯৭), 'ফনির মণি' (১৩০২), 'পারস্য প্রসূন' (১৩০৪), 'মণি হরণ' (১৩০৭) 'দেলদার' (১৩০৬), 'নন্দদুলাল' (১৩০৭) 'হরগৌরী' (১৩১১) 'বাসর' (১৩১২) প্রভৃতি রচনা করেন।

এগুলি কোনটি ফারসী রূপকথা, কোনটি ভারতীয় পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত।

এই সব গীতিনাট্যরচনায় প্রথমে কৃষ্ণযাত্রা (যার পূর্বরূপ ঝুমুর), ও পরে কলকাতায় বিদেশী-পরিচালিত ও অভিনীত ইতালীয়-ফরাসী অপেরার প্রভাব পড়েছিল। এই সব গীতিনাট্যের পাত্রপাত্রী কেউ-ই স্বাভাবিক বা বাস্তব সংসারের পাত্রপাত্রী নয়, সবাই অলৌকিক; বংশপরিচয়ে পারসীক বা ভারতীয় বা তুর্কী যাই হোক না কেন। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিচ্ছদ, বর্ণবৈচিত্র্যময় দৃশ্যবিন্যাস ও আলোকনিয়ন্ত্রণ—এই সব গীতিনাট্যের অভিনয়-সাফল্যের হেতু। সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত, তাতে নাট্য-অতিরিক্ত আকর্ষণের কথা, থাকত। হয়ত রুচির ওপর আঘাত করা হোত। এই সব গীতিনাট্যের জন্য সুগায়িকা, সুনর্তকীর খোঁজ পড়ত। কুসুমকুমারী, দেবকণ্ঠ বাগচী ও নৃপেন্দ্র বসুর গুরুত্ব এই সমস্ত নাটকের অভিনয়ে বহুগুণ বেড়ে যেত।

রঙ্গমঞ্চের দর্শকচরিত্রের অবনতি ঘটায় এই জাতীয় নাট্যরীতির প্রতিপত্তি ঘটেছিল। Saint E'vre mond এর ভাষায় "...where the mind has

little to add, there the senses must of necessity languish." এই গীতিনাট্যগুলিও একই প্রকার সমালোচনার লক্ষ্য হতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ও বাংলা নাটক

বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্য দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে গিরিশচন্দ্র সরবরাহ করেছেন। সব সময় সে সব খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর হয়েছিল, তা আমরা বলব না।

গিরিশচন্দ্র যখন নাট্যক্ষেত্রে এসে কলম হাতে করলেন, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও উপেন্দ্রনাথ দাস প্রধান নাট্যকার। উপেন্দ্রনাথ দাস ইতিহাসের অন্তরাল থেকে দেশপ্রেমের তীরন্দাজী করেন নি। তিনি সোজাসুজি বৃটিশ ও বৃটিশ পদলেহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করলেন। ফলে নাটক ও মঞ্চ শাসিত হোল।

গিরিশচন্দ্র এই পরিবর্তিত পরিবেশের নাট্যকার, পুরাণের প্রসঙ্গ মধ্যযুগীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবৃত করলেন। ইতিহাস তিনি গ্রহণ করলেন, যখন দেশ বৃটিশ চণ্ড-আক্রমনে বিক্ষুব্ধ। সামাজিক প্রসঙ্গ তিনি গ্রহণ করলেন, যে প্রসঙ্গগুলি সমাজের মৌলিক কোন স্বার্থকে আঘাত করছে না। ইতিহাসে নেই, পুরাণে নেই, বর্তমান যুগে নেই,—এমন কালের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর আলাদীন অতীতের নয়, বর্তমানের নয়; তাঁর আবু হোসেন যুগহীনতার নাটক, তাঁর পারসিয়না, দেলদার, বিষাদ, মুকুলমঞ্জুরা রূপকথার গল্প। রূপকথার কোন ভূগোল নেই, রূপকথার কোন ইতিহাসও নেই।

পৌরাণিক নাটক রচনার পক্ষে যুক্তি অবতারণা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন···"এই বিশাল ভাবাপন্ন কার্য ক্ষেত্র হইতে উদ্ধৃত নাটকের যিনি ঘৃণা করেন, তাহার বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, তিনি কি বলিতেছেন, তাহা তিনি জানেন না। যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলি Mythological—আর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার, পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জিল, খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিলটন; 'বৃত্রসংহার' পুরাণ অবলম্বনে, পৌরাণিক গীতা বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের ভিত্তি।"

পুরাণ বা 'মিথ' বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিত্তি, এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু বিভিন্ন যুগে পুরাণ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—এ অভিমতও

বিতর্কের বিষয় নয়। মিলটনের 'বাইবেল' পৃথক বাইবেল। যেমন মাইকেলের রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের নিশ্চিত বিভিন্নতা রয়েছে। এই বিভিন্নতা যুগের প্রয়োজনে এসেছে। গিরিশচন্দ্র এই সত্যটুকু অনুধাবণ করতে পারেন নি ; তাই তাঁর হাতে পুরাণ হয়েছে মৃত জগতের চিত্রপট।

ঐতিহাসিক নাটক রচনার সময়ও তিনি ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন, নাটককে নয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাটক হোল এক কালের দাবীর কাছে নতি-স্বীকৃতি।

তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধে'র নাট্যরূপান্তর দেখে কবি নবীনচন্দ্র বলেছিলেন, "দেখিতেছি তুমি ধারাপাত নাটক করিতে পার।"৩৩ গিরিশচন্দ্র এই উক্তিতে খুশী হয়েছিলেন। কিন্তু ঐ নাট্যরূপান্তর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি পরামর্শ উল্লেখযোগ্য। সিরাজের মৃত্যুর পর সিরাজের পত্নীর মুখে গিরিশচন্দ্র গান দিয়েছিলেন ; বঙ্কিমচন্দ্র ঐ গানটি বাদ দিতে বলেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বাদ ত দিলেনই না, উপরন্তু তিনি নিজে যখন 'সিরাজদ্দৌলা' লিখলেন, তখন সিরাজের কবরের পাশে সিরাজবেগমকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন। নাটক-গঠনে যে সংহতি ও গতির প্রয়োজন, তা বোধ করি তিনি ততটা স্বীকার করতেন না।

সামাজিক নাটক রচনায় তিনি খুব উৎসাহ বোধ করতেন না। তিনি বলিদান প্রভৃতি রচনার জন্য অনুতাপ বোধ করেছেন ; বলেছেন, এ হোল ময়লা ঘাঁটা।

সামাজিক নাটকে তিনি সমাজের প্রধান ও মৌলিক দ্বন্দ্বকে ধরেন নি। সমাজের সুস্থ উন্নতিকামী অংশের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল না। তিনি দ্বন্দ্বকে পাশ কাটাতেন।

"বহু শতাব্দী ধরিয়া, এতদ্দেশীয় অধঃপতিত লোকের সহিত, বহু বলিষ্ঠ ও বিশিষ্টজাতির বিত্তের ও চরিত্রের সংঘর্ষ ও সংঘাত চলিয়াছে ; এবং তাহাতে করিয়া সংযোগ, বিয়োগ, সংক্ষোভাদি ক্রিয়া প্রক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে। কার্যক্ষেত্রে, বাণিজ্য-বিপণিতে, বিষয়-ব্যাপারে, ব্যবস্থাপক আগারে, বিচারালয়ে, তথা শিক্ষামন্দিরে, সাহিত্যসংসারে, সৈনিকবাহিনীতে ও শান্তির ছায়ায়, কর্মভূমির সর্বত্রই উহাদের পরস্পরের এই সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ প্রাচ্য-রক্ষণশীলতার শ্লথ ভাবস্রোত, পাশ্চাত্ত্য উন্নতিশীলতার খরচিন্তা প্রবাহের সংঘর্ষে সংযোগে আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে,—বিচলিত বিক্ষোভিত হইতেছে। ইহাদের

ধাতুগত ও ধর্মগত, জন্মগত ও কর্মগত এবং জাতিগত পার্থক্যজনিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যে যুদ্ধ,—যে জয় পরাজয়, অথবা যে সন্ধি সম্মিলন, তাহা নাটকেই অনুকরণীয় উপাদান।"৩৪ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায় আড়ম্বর আছে, কিছু সত্যও আছে।

যুগের এই দ্বন্দ্ব, যুগের এই সংকট গিরিশ আমল দেন নি। তিনি জাতি ও যুগের সঙ্কটকে ভিন্ন চোখে দেখেছেন। তাঁর একটি নাটকে নায়ক বলেছে—

'আমার মতে ভারতের রিলিজস ইউনিটি ভিন্ন অপর কোন ইউনিটি হতে পারে না।' (মায়াবসান—১।৫)

নাটকের চরিত্রবিশেষ যা বলেছিল, স্বয়ং নাট্যকার তাই বলতেন,—"আমার বিশ্বাস দেশ স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শের আর আদেশের অনুসরণ না করলে কিছুতেই অগ্রসর হবে না। তিনি বাববার দেশকে বলে গেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূল প্রাণ ধর্মে। বারবার তিনি সাবধান করে গেছেন যে বিদেশীয় অনুকরণে রাজনীতির আন্দোলনে দেশকে চালিত করো না, করলেই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হবে।"৩৫ নব্যহিন্দুআন্দোলনের অন্যতম নেতা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "স্বদেশী আসল স্বদেশী নহে, ইহা প্রকৃত স্বদেশী নহে, ইহা বিকৃত স্বদেশী। তাহাই যদি না হইবে, তবে জয়োচ্চারণের এত বাক্য থাকিতে, আমাদের সহস্র সহস্র মন্ত্র থাকিতে, 'বন্দে মাতরং" বলিয়া গগন ফাটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে কেন? "জয় জনার্দন" "জয় জগদম্বা" "জয় ভবানী" ইত্যাদি ধর্মসূচক জয়ধ্বনি কাহারও মনে ধরে না কেন?"৩৬

আর একজন বলেছেন,

"ঐ নামটি এখন নূতন উঠেছে। ঋষিদের যে মহাভাব—জগৎ-প্রসবিনী জগৎ-রক্ষয়িত্রী এক মহাশক্তির কল্পনা পাবে কোথায়! তাই আজ-কালিকার মহাপণ্ডিতেরা সেই জগন্মাতাকে কেঁটে ছেঁটে, ভারতমাতা তৈয়ারী করেছেন।

ক্রমে গাঁয়ে গাঁয়ে অলিতে-গলিতে দেশহিতৈষিতা যে রকম ভাগাভাগি করে পৌঁছোচ্ছে, বেঁচে থাকি তো বোধ হয় কলকেতা-মাতা, ঢাকা-মাতা, বাথরগঞ্জ-মাতা, পটলডাঙ্গা-মাতা, বৌবাজার-মাতা, বেলেঘাটা-মাতাও দেখতে পাবো।"৩৭

তবে কি তিনি যে একদা সিরাজদ্দৌলা লিখেছিলেন, মীরকাশিম লিখেছিলেন, সে তাঁর অন্তরপ্রেরণায় নয়, সাময়িক প্রেরণায়? এখানে তিনি মনোমোহন বসুর সাহিত্যধর্মকেও অস্বীকার করেছেন।

শুধু ১৮৭৬ সনের সরকারী আইনের উপর দোষ চাপালে গিরিশচন্দ্রের নাট্য-চিন্তার সঠিক মূল্যায়ন হবে না। গিরিশচন্দ্র আধুনিক যুগে মধ্যযুগীয় নাট্যচেতনা সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, "মহাকবি সেক্সপীয়ার আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। তবে কেন, আমার নিজেরও একটা স্বাধীনভাব আছে।"

সেক্সপীয়ারের নাট্যচিন্তা তিনি গ্রহণ করেন নি, শুধু নাট্যরীতি কখনও কখনও তিনি গ্রহণ করেছেন। "Dramatist-কে সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্যের ভিতর through action কথাবার্তায় সমুদয় রস ও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার করতে হয়। নাটকের সর্বাপেক্ষা কঠিন অঙ্গ dialogue"[৩৮] এসব মত মোটামুটিভাবে সেক্সপীয়ারের নাট্যরীতির অনুগত। কিন্তু তাঁর যোগেশ, কিরণময়, হরিশ-কেউই সেক্সপীয়ার-অনুসারী চরিত্র নয়, কারণ তাদের বিরোধ অন্তরের বিরোধ নয়, বাহ্য বিরোধ।

"হরিনাথবাবু আমাকে সেক্সপীয়ার অপেক্ষা অনেক উঁচুতে Place দেন।... বলেন কি জান, আপনি এদেশে জন্মেছেন তাই রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য বিল্বমঙ্গল প্রভৃতির চরিত্র আঁকতে পেরেছেন—এ সব character সেক্সপীয়ার কোথায় পাবে?"[৩৯]

বলা বাহুল্য এসব মতামত পূর্ণচন্দ্র বসুর মতামতের অনুরূপ,—ভারতীয় আত্মম্ভরিতার হাস্যকর অভিব্যক্তি। সেক্সপীয়রের আদর্শ এইভাবে তাঁর নাট্যচিন্তায় নিহত হয়েছে।

বিভিন্ন নাটকে তিনি তথাকথিত ভারতীয়ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর নিজের বক্তব্য হোল এই যে, "এক এক জাতির এক একটি বিশেষ মনোবৃত্তি নাটকের রসবোধের অনুকূল এবং...হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম বিদেশীর ভীষণ তরবারি ধারে উচ্ছেদ হয় নাই।"

অনেকেই তাঁর এই ধর্মপ্রবণতার পিছনে রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেই তিনি ধর্মভাবপরিপূর্ণ নাটক লিখছেন। "মহাকবি কাশীরাম দাস কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও বিদ্যমান দেখতে পারো।"[৪০]

কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাস ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের কাব্যের কতটা অংশ নিজেরা লিখেছিলেন, তা আজ আবিষ্কার করা কঠিন। তবে এ বিষয়ে

সন্দেহ নেই যে তাঁদের গ্রন্থ যুগের ভাববৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। তাঁরা পৌরাণিক নন, তাঁরা মধ্যযুগীয়।

গিরিশচন্দ্র আধুনিক যুগে মধ্যযুগীয় নাট্যাদর্শ প্রবর্তন করতে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর মঞ্চ ছিল আধুনিক মঞ্চ। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আর একজন নাটক-লেখকের তুলনা চলে; তিনি হলেন মতিলাল রায় (১২৪৯-১৩১৫)। মতিলাল হলেন যাত্রার বিখ্যাত পালালেখক। মতিলাল রায়ের পালায় অলৌকিকতা ও ভক্তিধর্ম গিরিশচন্দ্রের নাটকের মতই স্থান পেয়েছে। পার্থক্য এই যে সেখানে বিবেক সূত্রধারের ভূমিকা পালন করেছে।

মতিলাল আধুনিক মঞ্চেব সহায়তা নেন নি, কিন্তু তাঁর যাত্রার আসবে আলো, সাজসজ্জা, নৃত্যগীত, বাদ্যবাদনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণাদি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হোত।

যাঁরা গিবিশচন্দ্রের নাটক দেখে আনন্দ পেতেন, তাঁবা মতিলালের পালা শুনেও একই প্রকার হর্ষবোধ করতেন। "একদা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশববাবুর বাড়িতে রায় মহাশয়ের যাত্রা হইতেছে, কেশব বাবুর অঙ্কে স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস উপবিষ্ট এক মনে রায়মহাশয়ের গান শুনিতেছেন। রায় মহাশয় তৎকালে তাঁহার প্রণীত নিমাই সন্ন্যাস গীতাভিনয়ে শ্রীধররূপে অবতীর্ণ। আবেগময়ী প্রাণমনমুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবল স্রোতে পরমহংস সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণ পরমহংস মতি মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থানপূর্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন।"[৪১] মতিলাল রায়ের যাত্রার দল ১২৮০ বঙ্গাব্দে গঠিত হয়; নাট্য রচনাও গিরিশচন্দ্রের রচনাকালের মধ্যেই পড়ে। গিরিশচন্দ্র ও মতিলাল হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের নাট্যকার। কিন্তু সাহিত্য ত প্রতিধ্বনির রাজ্য নয়। মহৎ বাক্যের প্রতিধ্বনি হলেও নয়।

গিরিশচন্দ্র ও নবীনতা

মাইকেল মধুসূদন শাস্ত্রসম্মত আধুনিক নাটকের আদর্শ রেখে গেছেন। নাটক শুধু দৃশ্য-অঙ্ক বিধৃত ও কথোপকথন-ভিত্তিক রচনা মাত্র নয়, এই অনুশাসন তিনি প্রস্তরে খোদাই না করলেও নাটকের মধ্যে প্রচার করেছেন। নাটক বিবর্তিত হচ্ছে; মঞ্চ বিবর্তিত হচ্ছে।

আধুনিক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ; দেবতা অপেক্ষা মানুষের মহিমা তার কাছে বড়। সঙ্গীত ও নৃত্য অপেক্ষা কথা আর কথাই তার সম্বল। দেবতার

জন্য চাই সঙ্গীত ও নৃত্য। আর মানুষের জন্য চাই কথা। সম্ভ্রমের ভাষা নয়, ভক্তির ভাষা নয়, আপন জনের ভাষা—চাই বিশ্রম্ভালাপের ভাষা। মাইকেল নাটককে সংলাপ-নির্ভর করলেন।

সংলাপ গদ্যমূলক হবে, না পদ্যমূলক হবে—এ প্রশ্ন অবান্তর। পাত্র-পাত্রীর পারস্পরিক নৈকট্যের চাপে ভাষার চরিত্র ও মেজাজ নির্নীত হয়। মাইকেল কোন কোন নাটকে ছন্দোময় বা পদ্যসংলাপ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নাট্য-প্রযোজকদের আপত্তিতে পারেন নি ; দিলে কী দাঁড়াতো, তার কিছুটা অনুমান আমরা করতে পারি 'পদ্মাবতী'র কয়েকটি সংলাপে।

মধ্যযুগীয় ভাষায় আধুনিক যুগের নাটকের পাত্রপাত্রী আলাপচারী হতে পারে না 'জনা'র ভাষা ও 'পাণ্ডবগৌরবে'র ভ্যষা মধ্যযুগীয় ভাষা—এ ভাষার বনিয়াদে আছে 'গৈরিশছন্দ'। কিন্তু এ ছন্দেব বনিয়াদে অমিত্রাক্ষর ছন্দ নেই। এ ছন্দেব ভিত্তি হোল ত্রিপদী। ত্রিপদীতে নতুন করে শিবায়ন বা চণ্ডী কাব্য লেখা যায়, কিন্তু তা নতুন হয় না।

গৈরিশছন্দধৃত ভাষা যে মধ্যযুগীয়, তা স্পষ্ট হয়, যখন সিরাজদ্দৌলা ঐ ভাষায় কথা বলেন। আমার বিশ্বাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে সিরাজ যদি কথা বলতেন, তবে তা মধ্যযুগীয় বলে প্রতিভাত হোত না। সেকসপীয়ারের ইতিহাস-নাটকে তার প্রমাণ আছে।

গিরিশচন্দ্র মাইকেলের নাট্যীয় আদর্শকেও শিথিল করেছেন। মাইকেলের নাটকে শারীরিক অর্থেই সুশৃঙ্খলা ও সংহতি থাকতো। গিরিশচন্দ্র তা দুর্বল করে দিয়েছেন—নাটকে অযথা হাস্যরস ও সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। তাঁর প্রতিটি নাটকের অংকবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ ও নাটকের উপস্থাপনা ও উপসংহার অবিরত নাট্য-রীতিকে লঙ্ঘন কবেছে। নাট্যবস্তুর সঙ্গে নাট্যলক্ষ্য সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। গিরিশচন্দ্র দর্শকের মুখ চেয়ে নাটক রচনা করতেন ; নাটকের মুখ চেয়ে নাটক রচনা করতেন না।

সীতার বিবাহ, রাবণবধ, পূর্ণচন্দ্র বা করমেতি বাই-এ আধুনিক নাট্যীয় ভাষার কোন চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। সরল বা অলংকারবহুল ভাষায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপক-শ্লেষ-শাসিত ভাষায় নাট্যকার তাঁর বক্তব্য নানা পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে পরিবেশন করেছেন। নাটকের ভাষা আর কাব্যের ভাষা একই চালে চলে না। তার মানে এই নয় উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। নাটক কাব্যের ভাষার ইসারা অনেকখানি আত্মসাত করে থাকে ; কিন্তু তবু

তার ভাষার একটা বিশিষ্টতা আছে। নাটকে যেমন সংঘাত থাকে—চরিত্রে ও ঘটনায়, নাটকের ভাষায় ও অলংকারে তেমনি থাকে বিরোধের আভাস বা ইংগিত।

ইংরেজী নাটকে উপমা উৎপ্রেক্ষা সমাসোক্তি প্রচুর ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকে anti-thesis, epigram, climax ও anti-climax। ক্রুপদী সাহিত্যে সিসিরো ও কুইণটিলিয়ানের অভিমত 'Rhetoric' ব্যবহারে প্রভাব ফেলেছিল। সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এবং 'জুলিয়াস সিজার'-এ তার প্রমাণ আছে। একদা 'Orator' ছিলেন 'Actor'-এর গুরু।

প্রথম যুগের নাটকে গিরিশচন্দ্র এই সব 'অলংকার' আদৌ ব্যবহার করেন নি।

রাবণবধ দক্ষযজ্ঞ ও অভিমন্যুবধ প্রথম যুগের বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক, এই সব নাটকের ভাষায় কোনরূপ climax বা anti-climax নেই। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি প্রভৃতি পুরাতন অলংকার নাটকের এই আরোহণ-অবরোহন ফুটিযে তোলার কাজে ব্যবহৃত হয়না। শুধু নট বা নটীর কণ্ঠস্বর ভাষার শীর্ষমুখী বা নিম্নমুখী সোপান তৈরি করে ওঠানামা করে। 'বুদ্ধদেব' গিরিশের বিখ্যাত নাটক, বিম্বিসারের সঙ্গে বুদ্ধদেবের কথোপকথন অংশটি অতিশয় বিখ্যাত। কিন্তু সেখানে ভাষার কোন ওঠানামা নেই—শুধু একটু দীপ্ত দীর্ঘ বিবৃতি দেখতে পাই।

> করি পুত্রেব কামনা,
> কর জগন্মাতা উপাসনা,
> কেন তব কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
> জগন্মাতা,
> পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি।
> দেখ নীরব ভাষায়,
> ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
> যদি, নৃপ, কৃপা নাহি কর,
> দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?
> নির্দয় যে জন,
> দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি।
> নরপতি!
> কেন প্রাণনাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?

রাজকার্য দুর্বল-পালন,
দুর্বল এ ছাগপাল ;
হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ !"
মহারাজ জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে,
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম উপার্জন ? (৩।২)

এ ভাষায় ব্যাকরণসম্মত কোন 'climax' তৈরীর সচেতন প্রয়াস নেই। এমন কি 'জনা', 'পাণ্ডবগৌরবে'র মত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনাতেও এই বিশিষ্ট রীতি তত ফুটে ওঠেনি।

প্রবীরের সংলাপে ঐ রীতি ফুটি-ফুটি করেও ফুটতে পারে নি—

ভেব না জননী,
একেশ্বর পশি রণে নাশিব পাণ্ডবে।
তব পদধূলি মাতা করিলে গ্রহণ,
মহাশক্তি জাগে হৃদি-মাঝে।
ত্রিপুরারি হন যদি অরি,
তাঁরে নাহি ডরি,
মার নাম কবচ আমার।
রহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে,
সাবধানে রাখুক নগর-দ্বার,
আশিস জননী, আসি বিনাশি পাণ্ডবে। (২।৫)

এই সংলাপের মাঝখানে একটা উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, কিন্তু 'রাহুক বাহিনী মাগো রাজার রক্ষণে' থেকে সংলাপ একেবারে বিবৃতিধর্মী হয়ে পড়েছে। 'পাণ্ডবগৌরবে' ভীমের সেই বিখ্যাত সংলাপটিতে বক্তব্যের স্পষ্ট একটা সিঁড়ি-ডিঙ্গানো চাল লক্ষ্য করা যায়। ধাপে ধাপে বক্তব্যের অগ্রগতি ঘটছে এবং বক্তারও কণ্ঠস্বর চড়ছে।

অতি ছল, অতি খল অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল ;
তুমি লজ্জাহীন, তোমাকে কি লজ্জা দিব ?

সম তব মান অপমান,
নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়-সদনে,
পরাজয় ভয়ে হও পরান্মুখ।
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার;
কি হইবে রুষ্ট কথা করে?
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায়-মন-প্রাণ, অর্পণ করেছি রাঙা পায়—
তথাপি যদ্যপি তুমি না বুঝ বেদনা,
রণস্থলে, দেবতামণ্ডলে,
উচ্চ-কণ্ঠে করিব প্রচাব
লহ তুমি লজ্জা নিবারণ।
নহ কভু ভক্তাধীন।
নহে কেন কর হতমান?
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আব না আনিব মুখে। (৩, ৫)

ভারতচন্দ্রের কাব্যে অন্নদা যে ভাবে শিবের পরিচয় দিযেছিলেন, সেই রীতির সঙ্গে এ ভাষার আন্তরিক মিল আছে। শ্লেষ-বিভূষিত এই ভাষার মধ্যে একটা অগ্রগতিব চিহ্ন আছে, সিঁডি-ডিঙ্গোবাব লক্ষণ আছে। প্রাচীন ও নবীন অলঙ্কারের মধ্যে একটা চমৎকাব সমন্বয়ও ঘটেছে এখানে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এই জাতীয় অলংকাব তাঁর ঐতিহাসিক ও 'সামাজিক' নাটকে যেমন নিশ্চিন্তভাবে ব্যবহার করেছেন, এখানে তেমন নয়।

কিন্তু সাবধান—
নাহি দিও ফিরিঙ্গীরে সূচ-অগ্রস্থান
জানিহ নিশ্চিত—
রাজ্যলিপ্সা প্রবল সবার।
দাক্ষিণাত্যে বুঝহ ব্যাভার
ছলে বলে বিস্তার করিছে অধিকার।
ইংরাজের অমাত্য ইংরেজ,
মন্ত্রনায় স্থান নাহি পায় দেশবাসী।

বঙ্গের সন্তান—হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গী ঘরে নহে আপনার,
স্বার্থপর-চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার !
হও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। (১।৫)

গদ্য-সংলাপেও একই রীতি স্পষ্ট।

'রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত। মাতামহ মৃত্যুশয্যায় আমার মস্তকে গুরুভার অর্পণ করেছেন ; প্রজার মঙ্গল সাধন ভার আমার উপরে, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ শান্তিস্থাপনের ভার আমার উপর, বিদেশী দস্যুর হস্ত হতে প্রজা রক্ষার ভার আমার উপর, এ সমস্ত ভার তাঁর মৃত্যু শয্যায় আমি গ্রহণ করেছি, এখন কিরূপে পরিত্যাগ করবো।' (৩।২)

'মীরকাশিমে'ও এই রীতি অবলম্বিত হয়েছে।

'আর আমি সে মীরকাশিম নেই—তোমার প্রহরী মীরকাশিম নাই। তোমার মুখ মলিন দেখলে আর আমার ব্যথা লাগে না, তোমার চক্ষের জল দেখে আর আমি দুঃখিত হবো না, তোমার শোণিত দর্শনে আর আমি কাতর হবো না। আমার সঙ্গ তোমার কি নিমিত্ত প্রার্থনীয়! আমি নিদারুণ ইংরেজ দানব সংঘর্ষে দানবপ্রকৃতি লাভ করেছি। দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা আর আমার কিছুই নাই। সংহার-সংহার একমাত্র ইংরাজ সংহারই আমার প্রতিজ্ঞা। যে তাদের সহায়, তাদের সংহার আমার প্রতিজ্ঞা! শত্রু দমন করবো—শত্রু দমন করবো এতে যে বাধা দেবে—সেই আমার শত্রু। আমি অপনার শত্রু।' (৪।৫)

একটি সংলাপে একাধিক স্থলে 'ক্লাইম্যাক্স' সৃষ্টির নিদর্শন এটি। সামাজিক নাটকে এই আঙ্গিক আরও সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। হারানিধি, শাস্তি কি শান্তি, বলিদান ও প্রফুল্ল নাটকে আধুনিক নাটকীয় ভাষার ব্যবহার অধিক মাত্রায় ঘটেছে। প্রফুল্ল নাটকের সর্বত্রই প্রায় নব্য রীতি অনুসৃত।

১। আমার মনে মনে স্পর্দ্ধা ছিল যে, পরিশ্রমে চেষ্টায় সকলই সিদ্ধ হয়, সে দর্প চূর্ণ হোল। চেষ্টায় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়া রোধ হয় না, ভাই চোর হওয়া

বোধ হয় না, বৃদ্ধ মাকে বৃন্দাবনে পাঠান হয় না ; চেষ্টাই কোন কাজ হয় না। আমি আজীবন চেষ্টা কল্লেম, কি ফল পেলাম? চিন্তা! চিন্তা! চিন্তায় চিরকাল গেল। (১।৪)

২। মদ লেয়াও ; দম লেখাও - বাঃ বাঃ এমন মজা কোন্ শালা খেটে মরে, বড় বৌ, কি আমোদের দিন রে কি আমোদের দিন! আমি মদ আনি গে! (১।১)

৩। মা আমার রত্নগর্ভা,—একটি মাতাল, একটি উকিল, একটি চোর।(২।৪)

৪। আমার সাজান বাগান শুঝিয়ে গেল! আহাহা!

আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল। (৪।৫)

ঠিক একই প্রকার ভাষা-রীতি ব্যবহার করেছেন হারানিধি ও বলিদান নাটকদ্বয়ে।

এগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার নয়, সাদৃশ্য বোঝাবার মাধ্যম নয়। এগুলি দাঁড়িয়ে আছে বৈসাদৃশ্য বা তুলনামূলকতার উপর, ইংরাজীতে যাকে বলে 'Rhetoric of difference.'

নাটকের ভাষার একটি নতুন আয়তন বহুকাল পূর্বেই তৈরি হয়েছিল। মাইকেল করেছিলেন, জি. সি. গুপ্ত করেছিলেন। দীনবন্ধুও করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে তা বিপর্যস্ত করেছিলেন ; এখানে নতুন করে বিন্যস্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন ; নাটকে নাট্যভাষার প্রতি তাঁর লেখনী আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু ব্যাভিচারের দ্বারা কোন রীতি গড়ে উঠতে পারে না।

গিরিশচন্দ্রের ন্যাটকের ভাষা শেষ পর্যন্ত কথকতার ভাষা ও নাট্যভাষার মধ্যে মীমাংসায় উপনীত হতে পারেনি।

গিরিশের নাটকের গান অনেকেরই প্রশংসা পেয়েছে। গিরিশ ভালো গান লিখতেন ; কিন্তু নাটকে গান অতি-সমাদৃত হলে কি কাণ্ড ঘটাতে পারে তার জন্য কৌতূহলী পাঠককে পরিষৎ-সম্পাদিত মাইকেল-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের 'ষ্টেজ-কপি'টি (৪র্থ মুদ্রণ) দেখতে অনুরোধ করি। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের পথ মঞ্চাধ্যক্ষের পথ ; গিরিশের নাটক সেই পথে নির্দ্বিধায় ও নির্বিবাদে পদচারণা করেছে।

অথচ তিনিই বলেছিলেন, 'বাইরের dramatic events কিছুই নেই। কিন্তু এঁদের ভিতরের জীবন full of dramatic events, intense action of deep meditation. মহাপুরুষদের জীবন full of intense dramatic

events." অন্যত্র বলছেন, "একটা সংকীর্ণ ভাবের গণ্ডীর ভিতরে এরা মনে করে আর্টের সীমা এই পর্যন্ত and no further. কিন্তু সকল কলাবিদ্যার—সকল সাধনার—সকল রসের শ্রেষ্ঠ দান—চরম লক্ষ্য সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করার প্রয়াস।"৪৩

সারা জীবন প্রথা-তাড়িত নাট্যশালার জন্য নাটক লিখে-লিখে নিঃসন্দেহে তিনি ক্লান্ত। গিরিশচন্দ্র নতুন পথে যাত্রার কথা ভেবেছেন। তাঁর 'বিষাদে', 'দেলদারে', 'মলিনাবিকাশে' এবং 'শঙ্করাচার্যে', 'তপোবলে' ভিন্নরীতির নাট্য-রচনার প্রবণতা দেখা যায়। হয়ত নাট্যকার বাহ্য ঘটনাকে এখানেও বড় করে দেখেছেন, কিন্তু সে ঘটনাগুলির অন্তর-আকৃতি চাপা পড়ে নি। বিশেষ করে 'দেলদারে' একটা স্পষ্ট পথ-খোঁজার ইঙ্গিত আছে,

"কোমলে কঠিনে মিলিবে কেমনে
তবে কেন মন ছোটে।"

এই নাটকে চরিত্র বা ঘটনা—কোন কিছুই প্রধান হয় নি, প্রধান হয়েছে নাট্যকারের বক্তব্য। তত্ত্বকে সম্বল করে তিনি একটি রূপক নাটক লিখেছেন; এবং মজার ব্যাপার এই যে, তিনি পূর্বাপর সে-নাটকের 'সেকুলার' রূপটি রক্ষা করে গেছেন। 'বিষাদ' নাটকের মত 'সেকুলার' রূপটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষ মুহূর্তে হরিসংকীর্তনে মাতোয়ারা হন নি। অথচ 'দেলদারে'র নাট্যরীতি তিনি স্ফুটতর করলেন না। করলে তাঁর হাতেই বাংলা নাটকের রূপান্তর সাধিত হোত। মনে রাখা উচিত তখনও 'শারদোৎসবের' আনন্দ-কলরব উচ্চারিত হয় নি; 'ডাকঘরে'র দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি।

ভাবপ্রধান নাটক আর ভক্তিনাটক এক নয়। একটি ধর্ম-ভিত্তিক আর একটি ধর্মনিরপেক্ষ; তবে নীতি বা তত্ত্ব নিরপেক্ষ নয়।

গিরিশচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আশ্রয় করেছিলেন, এই কারণে তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন, একথা আমরা বলব না। তিনি নতুন যুগের মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না; মানবধর্ম যে ঈশ্বর-অনুরাগের বিরোধী নয়,—একথা তাঁর সাহিত্যে ফুটে ওঠে নি।

এ যুগের অন্যান্য নাট্যকার

গিরিশযুগে যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। নাটকেও তাঁর আগে এসেছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁর নাট্যরচনা-রীতির আওতায় এসে গেছেন। রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪) তাঁর

বয়োকনিষ্ঠ; কিন্তু তাঁর নাটকরচনা শুরু হয়েছিল গিরিশের নাট্যকার-জীবনের সূচনার পূর্বে।

রাজকৃষ্ণ রায়

রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন দাশু রায়ের দেশের লোক; রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলির সঙ্গে তিনি ছিলেন আবাল্য পরিচিত। এবং এই কাহিনীর ভক্তি রসের কোন কোন বিন্দু তিনি শৈশব থেকেই আস্বাদন করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম নাটক 'অনলে বিজলী' (১৮৭৪) রচনার মধ্যে 'অবসর সরোজিনী'র রোম্যানটিক কবির কল্পনাকুশলতার খানিকটা ছাপ অবশিষ্ট আছে। পরবর্ত্তী কালে এই রোম্যানটিকতা তাঁর নাটকে প্রধান হয় নি, হয়েছে ভক্তিরস।

সম্ভবত তখন বাংলা নাট্যশালার সাধারণ মেজাজ যে প্রকার ছিল, রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর রসবোধকে সেখানে নামিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। নইলে তাঁর কবিতায় নারীপ্রেমের ও দেশপ্রেমের যে সব রোম্যানটিক প্রকাশ দেখতে পাই, নাটকে তার অনুমাত্র চিহ্ন নেই কেন?

তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল প্রহ্লাদচরিত্র (১৮৮৪), চন্দ্রহাস (১৮৮৮), নরমেধ যজ্ঞ (১৮৯১), লক্ষহীরা, (১৮৯১); সে-যুগের দর্শকদের আনন্দদান করেছিল। সে-যুগের দর্শকদের রসতৃপ্তির জন্য এই সব ভক্তিরস-আপ্লুত নাটকে ভাঁড়ামির যথেষ্ট প্রশ্রয় থাকত। তবে তাঁর নাটকে বেশ্যা বা দুশ্চরিত্রা রমণীর আনাগোনা থাকত না, যেহেতু তাঁর নাটকে পরকীয়া প্রেম একমাত্র প্রেম নয়: মীরাবাই ও হরিদাস ঠাকুর শুধুই ভক্তিরসে সমৃদ্ধ। তিনি তাঁর যুগের পটভূমিকায় যথেষ্ট নীতিবাগীশ ছিলেন; বীণা থিয়েটার খুলেছিলেন এই কারণে যে এখানে পণ্যা নারীর মঞ্চাবতরণ বন্ধ করা হবে। তিনি স্ত্রী-ভূমিকা পুরুষের দ্বারা অভিনয় করাতেন। পরে অবশ্য ঋণগ্রস্ত হয়ে তিনি মত পালটান।

রাজকৃষ্ণ রায় ইতিহাস-অবলম্বনে নাটক লিখেছেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য নয়। তাঁর লৌহকারাগার (১৮৮০), বনবীর (১৮৯২) সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একটু অভিনব রচনা। এখানে নীতিশিক্ষার পাঠদানের জন্য ইতিহাস মনোনীত হয় নি।

এই নাটকগুলি গঠনে তিনি কোন নূতনত্বের পরিচয় দেন নি। তবে সংলাপ রচনায় তিনি বারবার নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন; কখনও

অমিত্রাক্ষর, কখনও ভাঙ্গা-অমিত্রাক্ষর, কখনও গদ্যকে পদ্যের কত করে সাজিয়ে, কখনও গদ্যের বাক্যকে খর্ব করে পদ্যের চরণের মত খাড়া করে তিনি সংলাপ রচনা করেছেন। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি নাটকের নাটকীয়তা কতটা বৃদ্ধি করল, তাই হোল জিজ্ঞাস্য। রাজকৃষ্ণ কতকগুলি প্রহসন লিখেছিলেন ; প্রহসন আর পঞ্চরঙ একই ব্যাপার। তবে রাজকৃষ্ণ এক্ষেত্রেও সমসাময়িক অন্যান্য নাট্যকারদের তুলনায় উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটকে অযথা ব্রাহ্মবিদ্বেষ ছিল না, বা সংস্কার-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ছিল না। তিনি দ্বাদশ গোপাল, বেলুনে বাঙ্গালী নারী প্রভৃতি প্রহসনে সে যুগের নানা আতিশয্য ও সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধেই ব্যঙ্গের কষাঘাত হেনেছেন।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০—.৯০১) গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ; সে যুগের অন্যতম শিক্ষিত ব্যক্তি ; ছিলেন ক্যাপটেন রিচার্ডসনের ছাত্র। কাজেই নাটক ও নাট্যশালা প্রীতি তাঁর আশৈশব।

তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণের পূর্বেই নাট্য-অভিনয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে 'বিধবাবিবাহ নাটক' অভিনীত হলে তিনি সুলোচনার ভূমিকায় অভিনয় করেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকে নায়ক ভীম সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি কীর্তিমান নটরূপে বিদিত হন , পরে তিনি সরকারী চাকরী ত্যাগ করে বেঙ্গল থিয়েটারের নাট্যাধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন। আমৃত্যু তিনি এই মঞ্চের সঙ্গে নট, নাট্যাধ্যক্ষ, নাট্যকাররূপে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু মঞ্চের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেও তিনি সুনাট্যকাররূপে খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি ; বরং অভিনেতা হিসাবে তাঁর যশের প্রসঙ্গ গিরিশচন্দ্রও উল্লেখ করেছেন। তাঁর নাটক নিতান্ত সে-যুগের প্রচলিত পালার মতই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। রাবণ বধ (১৮৮২), দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর (১২৯১), প্রভাস মিলন (১২৯৪), পাণ্ডব নির্বাসন, নরোত্তম ঠাকুর (১৩০৩) প্রভৃতি নাটক নিতান্তই মঞ্চের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রচিত। তাঁর কয়েকটি পঞ্চরঙ বা প্রহসনও ছিল, এগুলি আরও নিম্নশ্রেণীর রচনা।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র

এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে কুঞ্জবিহারী বসু, বৈকুণ্ঠনাথ বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বহু নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে অতুলকৃষ্ণ সম্ভবত এঁদের সকলকে

ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'নন্দবিদায়' গীতিনাট্যের মঞ্চসাফল্যে অতুলকৃষ্ণের (১৮৫৭—১৯২২) নাট্যকারখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন নাট্যশালায় তাঁর বহু নাটক অভিনীত হয়। এই যুগে গীতিনাট্য আর প্রহসন ছিল রঙ্গমঞ্চের প্রধান উপজীব্য। এবং এই দুইটি শাখাতেই অতুলকৃষ্ণের যা কিছু রচনা স্থান পেতে পারে।

মা বা ফুল্লরা, ভীষ্মের শরশয্যা, তুলসীলীলা, বালিবধ, নন্দকুমারের ফাঁসী, বাপ্পা রাও, হিরণ্ময়ী (যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ) তাঁর গম্ভীরভাবসমৃদ্ধ নাটক। কিন্তু এ নাটকগুলি তাঁর খ্যাতির কারণ নয়। মধ্য প্রাচ্য পরিবেশ নিয়ে লেখা শিরীফরহাদ, লুলিয়া, শাহজাদী এবং পৌরাণিক পরিবেশ নিয়ে লেখা নন্দোৎসব, গোপীগোষ্ঠ প্রভৃতি গীতিনাট্য তাঁর জনপ্রিয়তার হেতু।

অতুলকৃষ্ণ কয়েকখানি প্রহসন লিখেছিলেন। তাঁর গাধা ও তুমি, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বঙ্কেশ্বর প্রভৃতি রচনার সারাংশ পরিবেশনের দুঃসাহস আমাদের নেই। এতই জঘন্য এই সমস্ত রচনা! ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে শুধু নয়, যা কিছু সুন্দর, মহৎ, ও উন্নতিশীল তাঁর বিরুদ্ধেই তিনি কুৎসিততম আক্রমণ চালিয়েছেন।

বেশ্যার বিবাহ দানের তিনি নিন্দা করেছেন, সে-যুগে এই প্রকার নিন্দা আরও অনেকে করেছেন। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা, পছন্দ-অনুযায়ী বিবাহ, সিভিল ম্যারেজ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি জঘন্য আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর বঙ্কেশ্বর প্রহসনের নিন্দিত খাস্তগীরপরিবারের কাহিনী সম্ভবত সত্য ঘটনামূলক ও ব্যক্তিগত আক্রমণসূচক।

অতুলকৃষ্ণের রচনায় শৃঙ্খলা ও সংযমের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। নাট্য-গ্রন্থনায় কোনরূপ সংহতি নেই। রামনারায়ণের প্রহসনের দুর্বলতম অনুকরণ দেখা যায়। নাটক যে সংলাপ-নির্ভর, এইকথা তাঁর নাটক পাঠে উপলব্ধি করা যায় না। তাঁর নাটকের সংলাপ অত্যন্ত দুর্বল।

অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নাট্যরচনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে সে-যুগের বাংলা নাট্যশালার প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যায়। সম্ভবত একেই কবি অজিত দত্ত 'অশ্লীলতা' না বলে বলেছেন 'অপরিচ্ছন্নতা'।[৪৩ক]

অমৃতলাল বসু

(এ যুগের মঞ্চের ও নাটকের অন্যতম প্রধান কারিগর হলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯); গিরিশচন্দ্রের পরই তাঁর খ্যাতি। সাধারণভাবে তিনি 'রসরাজ' নামে পরিচিত।

অমৃতলালের নাট্যরচনা শুরু হয়েছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ; নিতান্ত সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তিনি 'হীরকচুর্ণ নাটক' রচনা করেছিলেন। প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নামের স্থলে 'By an Actor' মুদ্রিত ছিল। বরোদার গাইকোয়াড় মল্‌হার রাও সিংহাসনচ্যুত হলে দেশীয় সাময়িক পত্রিকায় তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। গাইকোয়াড সৎ কি অসৎ, এ প্রশ্ন অবান্তর। ইংরেজ সমালোচনা তখন বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের একটি সাধারণ ব্যসন ছিল। অমৃতলাল এই ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বনে একাধিক নাটক রচিত হয়েছিল।

'গম্ভীর নাটক'

'হীরকচুর্ণ নাটকে' হিন্দু মেলা যুগের ভাবধারার ছাপ আছে। হিন্দু মেলার সেই বিখ্যাত গানটিও নাটকে স্থান পেয়েছে ; চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে জনৈকা উদাসিনী এই গানটি গেয়েছেন। তাছাড়া রাজকন্যা কুমার বাই-এর উক্তি—"এখন আমি বরদা নগরে দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন কর্বো, তাদের উৎসাহিত কর্বো, দেখবো, তারা উৎসাহিত হয় কিনা, আমার দুঃখে দুঃখিত হয় কিনা। স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরীর সমক্ষে ক্রন্দন কর্বো।" (৫।১) এই উক্তি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু মেলার প্রভাবজাত। গম্ভীর ভাবসমৃদ্ধ নাটক তিনি আরও কয়েকখানি লিখেছেন, বিমাতা বা বিজয়বসন্ত (১৮৯৩), আদর্শ বন্ধু (১৯০০), যাজ্ঞসেনী (১৯২৮) ও হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯) তাঁর এই পর্যায়ের নাটক। এই নাটকগুলির মধ্যে কোন নীতিবাগীশতা নেই। বিজয়বসন্ত নাটকে কাঙাল হরিনাথের জনপ্রিয় গ্রন্থের নাট্য-অনুসরণ দেখা যায়। আদর্শবন্ধুর গল্প তাঁর স্বকপোলকল্পিত নয়, গ্রীক পুরাণের Daemon ও Pythias গল্প অবলম্বনে রচিত। তবে অমৃতলাল সম্ভবত গ্রীক পুরাণ থেকে গল্পটি নেননি, তিনি রিচার্ড টেম্পল নামক বৃটিশ নাট্যকারের 'Daemon and Pythias' অবলম্বনে এই নাটক লিখেছেন। এই নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। "The composition of Adarsha Bandhu affords a striking illustration of the fact that the author is as much at home with poetical thought and nobler sentiments as he is so well known to be with wit and caustic humour."[88]

যাজ্ঞসেনী মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। পঞ্চাংক বিশিষ্ট এই নাটকে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা থেকে কুরুসভায় তাঁর অপমান ও প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ বর্ণিত হয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র অনেক পূর্বের রচনা ; কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে, এ নাটক অমৃতলাল রচিত নয়, এ নাটকের লেখক হলেন নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন।[৪৫] সম্প্রতি জনৈক লেখক বহু তথ্য সংগ্রহ করে নিশ্চিতভাবে দেখিয়েছেন, হরিশ্চন্দ্র অমৃতলালেরই রচনা।

হরিশ্চন্দ্র পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিশ্বামিত্রের হাতে রাজ্যভার দান করে এবং স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করে রাজা হরিশ্চন্দ্র চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিলেন, সেই কাহিনীই নাট্যকার বলেছেন। দাতার মাহাত্ম্য ঘোষণাই তাঁর লক্ষ্য।

হরিশ্চন্দ্র ও যজ্ঞসেনী পৌরাণিক নাটক, কিন্তু অমৃতলাল এই নাটকদ্বয় রচনার সময় আদৌ কোন ভক্তিভাব আমদানী করেন নি। এক্ষেত্রে মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

একমাত্র আদর্শবন্ধু নাটকে তাঁর কিছু উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আছে। আর সব নাটকই নিতান্ত মামুলী ঘটনায় ভরা। গানের সংখ্যা বিজয়বসন্ত ও হরিশ্চন্দ্রতে বেশি, সম্ভবত করুণ রস পরিস্ফুটনে গানের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দৃশ্যের সূচনা ও দৃশ্যের উপসংহার ঘটেছে গানের মধ্য দিয়ে। যেমন হরিশ্চন্দ্র নাটকের ১ম অঙ্কের শেষে গান, দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে গান, চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় গান ও চতুর্থ অঙ্কের শেষও গান দিয়ে। মোট কুড়িটি গান নাটকের কথাবস্তুকে যতটা ফুটিয়েছে, তার থেকে ঢের বেশি মঞ্চের প্রয়োজন সাধিত করেছে। দৃশ্য বা পট-পরিবর্তনে গানের ব্যবহার সে-যুগের একটা সাধারণ ব্যাপার।

নাটকের সংলাপ অত্যন্ত দীর্ঘ, হীরকচূর্ণ নাটকে ও হরিশ্চন্দ্র নাটকে কোন কোন সংলাপ একেবারে সন্দর্ভের আকার ধারণ করেছে। ধর্ম ও বিশ্বামিত্রের সংলাপে আলাপচারিতা অপেক্ষা বক্তৃতাধর্মিতাই অধিকতর ফুটেছে। রাজা, শৈব্যা এই দোষে আক্রান্ত, এমন কি নাগরিকও এই ব্যাধির হাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি। হীরকচূর্ণ নাটকে মল্হার রাও, স্কোব, ম্যালকাম, কুমারবাই, লক্ষ্মীবাঈ, দামোদর—সকলেই একে অপরের সঙ্গে বাক্যালাপে সম্মত হয় নি, দর্শকদের উদ্দেশেই প্রত্যেকে বক্তৃতা বর্ষণ করেছে। এ যেন হিন্দু মেলায় মনোমোহন বসুর বা শ্যামাচরণ সরকারের বক্তৃতা!

আদর্শবন্ধুর অনেকটা অংশ পদ্যে লেখা। গিরিশচন্দ্রের অনুসরণ একেবারে নেই। লাইনগুলি যেভাবেই সাজানো হোক, প্রকৃতপক্ষে এগুলি হোল মিলহীন পয়ার। মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কোন কোন কথোপকথন-

অংশে এই ধরণের পয়ার (যার মধ্যে ঘন-ঘন বিরতি বা ছেদ আছে) ব্যবহৃত হোত। ঐগুলিকে কাটা-কাটা অবস্থায় পংক্তিভেদে সাজান হয়েছে শুধু।

এই গম্ভীর নাটকগুলির মধ্যে তাঁর কোন স্বতন্ত্র নাট্যবোধ ফুটে ওঠেনি। এগুলির গঠনবিন্যাসে তিনি কোন বিশিষ্ট রীতির পত্তন করেন নি। এক অর্থে এগুলি আখ্যায়িকাধর্মী (narrative) সাহিত্য, কথোপকথন ছলে বিবৃত মাত্র। বিষয়বস্তুর মধ্যে নাট্যীয় উপাদান থাকলেই সকল রচনা নাটকরূপে পরিগণিত হয় না।

'গম্ভীর' নাটকসমূহের মধ্যে যে কয়খানি পুবাণ-ভিত্তিক, সেগুলির নাট্য গ্রন্থনায় নাট্যকার গানের আশ্রয় বেশি করে নিয়েছেন। পুরাণের গল্প-অবলম্বন করায় এবং কথাবস্তুর কেন্দ্রনির্ভরতা নির্ণীত না হওয়ায় নাটকের নাট্যিক অভাব পুষিয়ে নেবার জন্য গানের অধিকতর উপস্থিতি আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে।

এই জাতীয় নাটকে অমৃতলাল তাঁর কোন নিজস্বতার ছাপ রাখতে পারেন নি।

প্রহসন ও কমেডি

বস্তুতঃ অমৃতলালের উদ্দেশ্যে এ যাবত যত স্তুতি ও প্রশংসার বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে তাঁর প্রহসন ও কমেডিগুলি।

তাঁর প্রহসন ও কমেডিগুলি সমসাময়িক জীবনের উপর অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে পল্লবিত। সেই জীবনের গভীরে কতটা তার শিকড় প্রবেশ করেছে, সেটা অনুসন্ধানের বিষয়।

১৮৭৫ সনে তাঁর প্রথম প্রহসন 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রকাশিত হয়। বেশ কিছুকাল তিনি নানা অসঙ্গতির উপর মজাদার কৌতুকপ্রবল নাটক লিখেছেন; তখনও শিক্ষিতা নারী, সমাজসংস্কারক, দেশনেতা, বা ব্রাহ্মপ্রচারক তাঁর কৌতুকের লক্ষ্য হন নি। ১৮৭৫ সালের মধ্যে তাঁর 'চোরের উপর বাটপাড়ি' সহ তিনখানি কৌতুকপ্রবল নাটক প্রকাশিত হয়, এগুলি সত্যই প্রহসন, উদ্দেশ্যহীন রঙ্গরস।

এই যুগে অমৃতলালের উপর নব্যহিন্দুবাদ তত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় নি। 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রকাশনার পর থেকে তাঁর নাটকে কৌতুকরস নয়, ব্যঙ্গরস প্রধান হয়ে উঠল। আর ব্যঙ্গের লক্ষ্য হোল সমাজ সংস্কারকগণ,

শিক্ষিতা নারী, দেশনেতা ও ব্রাহ্মপ্রচারকগণ। এঁদের সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে সম্ভবত কোন প্রকার সহানুভূতি ছিল না, তাই এঁদের প্রতি তিনি কৌতুক নয়, ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তির আক্রমণাত্মক পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে।

'বিবাহ বিভ্রাট' থেকে তাঁর নাটক রচনার দ্বিতীয় পর্য্যায় শুরু। তারপর তরুবালা (১৮৯১), রাজা বাহাদুর (১৮৯২), কালাপানি (১৮৯৩), বাবু (১৮৯৪), একাকার (১৮৯৫), গ্রাম্য বিভ্রাট (১৮৯৮), সাবাস্ আটাশ (১৯০০) কৃপণের ধন (১৯০০), অবতার (১৯০১), সাবাস্ বাঙালী (১৯০৬), খাস দখল (১৯১২) প্রকাশিত হয়। এগুলির অধিকাংশেরই রচনার পিছনে সমসাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা বা সামাজিক আন্দোলন বিশেষের প্রভাব আছে। তবে নিছক প্রমোদের জন্যও এযুগে কিছু নাটক তিনি লিখেছেন, যেমন রাজাবাহাদুর, গ্রাম্য-বিভ্রাট। শহরের বিষয় নিয়ে লিখিত সমস্ত প্রহসনেই সমসাময়িক ঘটনাবলী দারুণ প্রভাব ফেলেছে। কালাপাণি (১৮৯৩), একাকার (১৮৯৫), সম্মতি সঙ্কট (১৮৯১), সাবাশ আটাশ (১৯০০) সাবাশ বাঙালী (১৯০৬) সম্পূর্ণতই সমসাময়িক কালের প্রতিধ্বনি।

বলা বাহুল্য অধিকাংশ নাটকেই তাঁর উৎকট সাম্প্রদায়িক, রক্ষণশীল, প্রাদেশিক ও জাত্যভিমানী মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি হিন্দুয়ানীর একজন বড় রক্ষক হিসাবে দেখা দিয়েছেন।

১৮৮০—১৮৯০—এই কালখণ্ডে নব্যহিন্দুবাদ খুব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, একথা অনেকেই বলেছেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন যে, এই নব্য হিন্দুবাদ প্রচারের বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে মঞ্চ। মঞ্চে হাজার হাজার দর্শক ঐ সব বক্তব্য রঙ্গে রসে দেখতে ও শুনতে পেত। নব্য হিন্দুবাদ প্রচারে রঙ্গমঞ্চ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

এই যুগে বিবাহবিভ্রাট, তরুবালা, কৃপণের ধন ও খাসদখল ব্যতীত অন্য কোন নাটকে তিনি সুসংবদ্ধ প্লট সৃষ্টি করতে পারেন নি। ঘটনার পর ঘটনা জমা করেছেন, চরিত্রের পর চরিত্র আমদানী করেছেন, সংলাপের পর সংলাপ বর্ষণ করেছেন, কিন্তু না ঘটনাগুলিকে, না চরিত্রগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গতভাবে সম্পর্কযুক্ত করতে পেরেছেন।

তাঁর বিখ্যাত প্রহসনের মধ্যে 'বিবাহ বিভ্রাট' একটি। 'বিবাহ বিভ্রাট'-এর কাহিনী সম্ভাব্যতার সকল সীমানা ডিঙ্গিয়ে গেছে। এই নাটকের নায়িকা হলেন বিলাসিনী কারফরমা, তাঁর স্বামীর নাম গৌরীকান্ত কারফরমা।

"আগে টিচারি কত্তেন, আমি তা ছাড়িয়ে একটা প্রেস করে দিয়েছি। কামিনী ভট্টাচার্যের স্বামীতে আর এতে মিলে একখানা বাঙ্গালা কাগজ বার করেন, আর এ দিকে আমার সংসারের সকল কাজকর্ম দেখেন।" (১।২)

অথচ বিলাসিনী এবার এম. এ. পরীক্ষা দেবেন। আর একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি—নন্দলাল সরকার ; সে এবার L. A. দেবে, সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। সে বাবার নির্বাচিত মেয়েকেই বিয়ে কর্বে—সেই বিয়ের উদ্দেশ্য হোল তিনটি—

"সমাজকে শাসিত করবো, বাবাকে শিক্ষা দেবো, আর আমার শ্বশুর হবার যে বেয়াদবি রাখে তাকেও শাস্তি দেব।" (১।২)

বিবাহের যৌতুক বাবদ টাকা নিয়ে সে বিলেত যাবে ; "এতে যদি কোন পাপ থাকে, তবে বিলেত যাওয়ায় তা কেটে যাবে।"

নন্দলাল সত্য সত্যই বিয়ে করল ; এবং বাসর থেকে এক ফাঁকে পালিয়ে গেল, এবং পালিয়ে একেবারে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমে হাজির। সে ব্যারিষ্টার হতে বিলেত চলছে। মিঃ সিংহের সঙ্গে মিসেস বিলাসিনী কারকরমা এসেছেন নন্দলালকে ট্রেনে তুলে দিতে ; কিন্তু তার বাবা, তার শ্বশুর এসে তাকে পাকড়াও করল। কিন্তু ছেলে তাদের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল। তখন বুড়ো বাবা বুঝলেন—"ছেলের বিয়ে দিয়ে যে বরকর্তা পণ নেয়, সে ইতর, অতি ইতর।"

এ নাটকে ইংরাজী-শিক্ষা, নারী-শিক্ষা, বিলাত-যাত্রা, সমাজ-সংস্কার, ব্রাহ্ম-মত—সবকিছুর উপরেই আক্রমণ করা হয়েছে। মাঝেমাঝে যে সরস উক্তি নেই, তা নয়। যেমন—

১. বিলা। অনুমান ঠিকই করেছিলেন, উমাচরণ বাবুকে আমি এক প্রকার বিবাহ কত্তে স্বীকারও করেছিলেম বটে, কিন্তু তাঁর মার মৃত্যু হওয়াতে কাচা গলায় দিয়ে জুতো খুলে বেড়াতে লাগলেন, সুতরাং অমন অসভ্যকে আমি আর স্বামী বলে কি করে নিই ?

২. সিং। নেংটো গা ? নেংটো পা ? লেডির সামনে ? horrible ! (১।২) প্রায় এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙ্গলা এক প্রকার ভুলে গেছি, এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, সে অনেক কষ্টে মনে মনে ইংরাজিতে তর্জমা করে, আর বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরাজী কথা কইবই বা কি, এই জন্য। কিন্তু লেখা আমার ক্ষমতার বাইরে। (১।২)

কিন্তু শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যে কোন বিশেষণ তিনি প্রয়োগ করতে ইতস্তত করেন না।

১. "আময় ফাঁকি দে, বাসি-বেব কনে ফেলে টাকাগুলো নিয়ে এই এক মাগী বেশ্যাকে নিয়ে পালাচ্ছে!" (২।১)

২. "তা জুতো পায়ে দিয়ে ওড়না উড়িয়ে এখানে যে খড়দার মা-গোঁসাই এসেছেন, তা বুড়ো মানুষ কেমন করে জানবে।"

এই দুইটি উক্তি যে এক ব্যক্তির নয়, তা বোঝা মুশকিল, এদের একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক আর একজন দাসী মাত্র বলে এ অনুমান কবা আরও কঠিন। বিলেত গমন-অভিলাষী বহু শিক্ষিত যুবকের ক্ষ্যাপামি নিশ্চয়ই নাটকে পরিহাসের বিষয় হতে পারে, কিন্তু নাটক সেই ইচ্ছা-অনুযায়ী-গডে ওঠেনি! মিসেস কারফরমা বিলেত-ফেরতা নন, মিঃ সিং বিলেত-ফেরতা। কাজেই দুই জনে একত্রে একই ভাষায় আক্রমনের লক্ষ্য হতে পারেন না। তা ছাডা গৌরীকান্ত কারফরমাকে এই নাটকে আক্রমনের কোনই কারণ থাকতে পারে না। আসলে এই নাটকে লেখকের কোন স্থির লক্ষ্য ছিল না। এই কারণে উপসংহারে গোপীনাথ বাবু বলেন,

"ভিক্ষার ঝুলি আছে, গলায় দেবার দড়ী আছে, সেও ভাল, কিন্তু কেউ যেন ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা না করে— অতি ইতর! অতি চামার। অতি কসায়ের কাজ।" (২।৪)

এই খেদোক্তির জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। নাটকে যে প্রকার বেআব্রু রঙ্গরসের ভিয়ান চডানো হয়েছিল, হঠাৎ উপসংহারে গম্ভীব হয়ে পডে নাটকের উদ্দেশ্যকে লেখক দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলেছেন।

'বিবাহ বিভ্রাট' যে জাতের রচনা, 'বাবু' ও 'অবতার', 'বোমা' সেই একই জাতের রচনা। একেবারে সমসাময়িক কোন ব্যক্তি বা ঘটনা এগুলির পিছনে সক্রিয়। সমসাময়িকতা এ গুলির মূল নির্ভরতা।

'বাবু' নাটকে প্রতি দৃশ্যেই নতুন নতুন ব্যঙ্গভাজন ব্যক্তিকে আমদানী করা হয়েছে; সকলের একত্রে হাজিরা দেবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না, অন্তত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে তেমন কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এখানে নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু কোন কাহিনীর উপস্থাপনা নেই। দুই অঙ্ক সাতটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকে প্রতিটি দৃশ্যে নতুন নতুন ঘটনার উপস্থাপনা দেখতে পাই। দেশভক্ত, ব্রাহ্ম-প্রচারক, শিক্ষিতা নারী—এঁরা সবাই প্রহসনের লক্ষ্য। অথচ

এঁরা কেউ কারো সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নন। মগু পানের অপকারিতা বলতে গিয়ে হাকিমের পক্ষে ওকালতি, পৌত্তলিকতার জয়গান গাইতে গিয়ে ব্রাহ্ম ও বৈজ্ঞানিক উভয়কে গালাগাল করা হয়েছে ; নব বিধান সমাজের আতিশয্যকে আক্রমন করতে গিয়ে তাদের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করা হয়েছে। স্বেচ্ছা-বিবাহের ও বিধবা বিবাহের বিরোধিতা শুধু নয়, অসবর্ণ বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্রতম আক্রমণ চালান হয়েছে , এ ছাড়া বাঙ্গালবিদ্বেষও আছে।

অথচ নাটকে সত্যিকারের 'হিউমার' যে নেই, তা নয়—

১. দেখছি, তোমরা অতি অসভ্য জায়গায় থাক , দেশহিতৈষিতার কি কি দরকার কিছুই জান না , তোমাদের গ্রামের দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করতে যাব, আমি ইণ্টারমিডিয়েটে গেলে আমায় চিনবে কে? ফার্স্ট ক্লাসে যাবার, আসবার টিকিটের দাম ঠিক কব, আব আমি কেলনারেব হোটেলে খাব, লেকচার দেব, তার জন্য এক ফিরিঙ্গী রিপোর্টার এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। (১।১)

২. প্রেমের কি অপার মহিমা, কিছুই বুঝা যায় না, অথচ দুর্ভিক্ষ বন্যা প্রভৃতি দেশের কোন অমঙ্গল হলেই আমার অন্নকষ্ট থাকে না, বরং কিছু সঞ্চয় হয়। (১।৩)

৩. তা অত্যাচার বিনা অনুতাপ নাই, অনুতাপ বিনা আমার উপায় নাই ; আসুক অত্যাচার, সাঁড়াসাড়িব বানের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আশ্বিনের ঝড়ের ন্যায় অত্যাচার আসুক, আসুক অত্যাচার ত্রিশ শালের বন্যার ন্যায়,পাহারাওয়ালাব হল্লার ন্যায় অত্যাচার আসুক, বস্তাফাটা সর্ষের ন্যায় বর্ষণ হউক। (১।৩)

৪. ভারত-ভারত কচ্ছো বাছা, আমি বুঝেছি, সে ভাবত কে, তোমার শাশুড়ি ত—বৌমার মা? আমি বেটা পেটে ধবে যা না পেলুম, সে মেয়ে বিইয়ে তা পেলে, ভাল হোক ভাল হোক। (২।১)

অথচ এই ধরনের 'সর্বজনীন' হাসির পাশেই আছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপুষ্ট ব্যঙ্গরস।

সাম্প্রদায়িকতার কথা আছে, এমন অনেক স্থলেও তিনি উৎকৃষ্ট হাস্যরস সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

৫. আর হাসবেন না, ক্রন্দন করুন, উচ্চরবে ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন ভিন্ন আর উপায় নাই। দেখুন ক্রন্দন আদেশ কি না,—ভূমিষ্ট হইয়া

শিশু ক্রন্দন করে,—ক্রন্দন করুন, ক্রন্দন করুন, আহা! কতদিনে এই পৃথিবী ক্রন্দনপূর্ণ আনন্দধাম হবে? (১।৩)

কিন্তু সে সীমা তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেনে চলেন নি;

১. তিন। সূর্যবংশাবতংস ভাই মনসা রায়, কলু মশাই, থাকা হয় কোথা।

বাঞ্ছা। সেওড়া কুটীরে।

তিন। সে আবার কি?

বাঞ্ছা। একটা ভ্রাতা-ভগিনীর মধুচক্র, ভ্রাতা-ভগিনীর পবিত্র পারিবারিক সংসর্গে সেখানে সতত স্বর্গের সোপান দেখতে পাওয়া যায়। (১।৩)

২. তবে রে ছোটলোক কলু, বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তুলতে চাও? তোর সঙ্গে একেত্তরে ঘর করছি তোর বাবার ভাগ্যি, তোমার চৌদ্দ পুরুষ আমার পাদকজল পেলে উদ্ধার হয়ে যায়। (১।৩)

এইসব উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বলা চলে এই প্রকার মনোভাব সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল নয়।

'অবতার' অমৃতলালের আর একটি এই জাতের নাটক। 'অবতারে'র নাটকত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি নিজে লিখেছেন 'প্র-পরা-অপ-সং-হসন'। এটা যে প্রহসনের অধিক, তা বোঝা গেল। ভণ্ড সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে তিনি রঙ্গরস করেছেন, এবং সেই রঙ্গরসের মধ্যে হিল্লোল-প্রমথ'র কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। এই নাটকেও কেন্দ্রীয় কথাবস্তু সংহতি পায় নি। তবে 'অবতার'ও নিছক হাসির তুবড়ি নয়, বিদ্বেষের বিষ-বর্জিত নয়। গয়ারাম, হলহলানন্দ স্বামী, দর্পনারায়ণ—প্রত্যেকের আচরণে কিছুটা সম্ভাব্যতার সীমা মেনে চলা হয়েছে। দুই অঙ্কে নাটকটি সম্পূর্ণ। অমৃতলাল স্বয়ং গিরিশচন্দ্রকে 'অবতার' রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছিলেন,

"প্রকৃত ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণের চরণে আমার কিরূপ আন্তরিক ভক্তি তাহা আপনি জানেন, সুতরাং এই রহস্য চরিত্রে উপহাসের পাত্র যে কাহারা তাহাও আপনি চিনিতে পারিবেন।" এই সময়ে অমৃতবাজার পত্রিকার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ও মনান্তর ঘটে।

অন্য প্রহসন সম্বন্ধে তিনি কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন করেন নি, এটা লক্ষণীয়।

নাট্যচরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে এইযুগে অমৃতলালের হাতে কমেডি সৃষ্টি হয়েছে মোট তিনখানি—তরুবালা (১৮৯১), কৃপণের ধন (১৯০০) ও খাস দখল (১৯১২)।

তরুবালা থেকে খাসদখল প্রায় কুড়ি বৎসরের ব্যবধান ; কিন্তু রচনাবিষয়ে ও রচনারীতিতে খুব বেশি পার্থক্য নেই।

তরুবালা নাটকের কাহিনীতে স্বেচ্ছাবিবাহের ইচ্ছাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অখিল বিবাহিত স্ত্রীকে পছন্দ করছে না, যেহেতু সে নিজে পাত্রী নির্বাচিত করে নি, অপরের মনোনীত মেয়েকে বিয়ে করেছে। স্ত্রী তরুবালাকে সে অবহেলা করল ; তার মধ্যে সে প্রকৃত প্রণয় খুঁজে পেল না। বেণীর যোগসাজসে পারুলের খপ্‌পরে পড়ল। ব্যাপারটি যখন বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় সহজেই একদিন অখিল দেখল পারুলের কাছে নতুন খদ্দের। তখন জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হোল, সে ঘরে ফিরল। তখন উন্মাদিনীর অভিনয় করছে তরুবালা, পরে অবশ্য উভয়ের মিলন হোল। এই নাটকে ভারতীয় নারীর আদর্শের প্রতীক হোল শান্তা। তার মুখ দিয়ে সহমরণপ্রথার স্তুতি পর্যন্ত আছে। তরুবালা পঞ্চমাঙ্কের নাটক। সমস্ত নাটকে একটা গল্প আছে ; কিন্তু সে গল্প নীতিকথা প্রচারের জন্য এতই উন্মুখ যে সত্যিকারের রঙ্গরস বড় বেশি নেই। আর তা ছাড়া এই প্রকার 'ভদ্র' নাটকে লেখকের ভাষা তত উজ্জল নয়। কমেডির ভাষা তরবারির ফলার মত, সব সময় যে বুকে বিঁধবে, তা নয়। তার দীপ্তি হবে চক্ষুবিমোহণকারী।

> বাবাজী! আমিত বিস্তর দেখেছি, তোমার মত ধর্মজ্ঞান কারু দেখলেম না! স্ত্রী সংসর্গের মত ব্যাভিচার আর নেই—যা বল্লে! সকালে বাড়ি গিয়েই সে ছুঁড়ীর একটা ঘর ভাড়া করে দিও, পরস্ত্রী বাড়িতে রাখতে আছে? পারুলকে ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মার হবিষ্যি রেঁধে দেবে। (৩।৪)

নাটকটি কমেডির রূপ ধারণ করলেও কমেডির চরিত্র অর্জন করতে পারে নি। তাঁর 'ব্যাপিকা বিদায়' বা 'ডিসমিসের' সঙ্গে তুলনা করলে এ পার্থক্য ধরা যায়। 'কৃপণের ধন' (১৯০০ অমৃতলালের মধ্যবয়সের রচনা। নাট্য-পরিকল্পনায় অভিনবত্ব কিছু নেই। বিষয়-নির্বাচনে দীনবন্ধুর সহযোগিতা আছে। কুন্তলা তার মামার কাছে থাকে, মামার কাছে তার বিয়ের টাকা গচ্ছিত আছে। মামা ভীষণ কৃপণ ; তাঁর নিজের ভাষাতেই জানা গেল—

"খরচের ভয়েতে কাচা দিয়ে কাপড় করিনে।" মন্মথ কুন্তলার প্রাইভেট টিউটার ; "ছিলে মাষ্টার, হয়েছো বর, এসব জোচ্চুরি না।" শেষ পর্যন্ত কুন্তলাকে নিয়ে মন্মথ পালাবে, এবং তাদের বিয়ে হবে।

কুন্তলার টাকাও উদ্ধার হবে কৃপণ মামার হাত থেকে। কৃপণের ধনে যেটুকু বাড়াবাড়ি আছে, তা কমেডির পক্ষে শোভন নয়। কৃপণের ধন বস্তুত প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে।

কমেডি হিসাবে সব থেকে খ্যাতি অর্জন করেছিল 'খাসদখল' (১৯১২)। খাসদখল অমৃতলালের পরিণত বয়সের রচনা। তিনি অঙ্কে তেরটি দৃশ্যে এই নাটক শেষ।

খাসদখলে একটি প্রস্তাবনা আছে তার নাম পূর্বরঙ্গ। পূর্বরঙ্গে কলি-কামিনীগণ গেয়েছে—

বেড়েছে বটে অনেক বর্মা,
চর্মকার তো হয়নি শর্মা,
এখনো নেয় না ঘোষাল জুতোর মাপ
কর্মকারের পায়।

এই পূর্বরঙ্গে কলি বলেছে—

আমায় অবতার হতে হবে—নানা অংশে; কোন দেহে ধর্মসংস্কার, কোন দেহে সমাজসংস্কার, কোন দেহে দেশোদ্ধার. বিদ্যাবিস্তার, গ্রন্থপ্রচার, ঔষধ আবিষ্কার, এই রকম দেহে এক এক লীলা কর্বো।

'খাসদখল' সম্পূর্ণভাবে বিধবাবিবাহবিরোধী প্রচার-পুস্তিকা, নাটকের গল্পে দৈব ঘটনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। লোকেনবাবু আলিপুরের নাম-করা উকিল; তাঁর স্ত্রী হলেন মোক্ষদা, ভদ্রমহিলা কবিযশঃপ্রার্থিনী।
মোক্ষদার হঠাৎ জর হোল, লোকেনবাবু মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে সময় মত আসতে পারেন নি। মোক্ষদা যথেষ্ট অভিমান ও অনুযোগ প্রকাশ করলেন। লোকেনবাবুর অর্থের কোন অপ্রতুলতা নেই; তিনি বিলেত-ফেরতা ডাক্তার মিত্রকে ডেকে আনলেন। লোকেনবাবু খুবই ব্যস্ত উকিল, কাজের চাপে একদিন তিনি হঠাৎ কোর্টের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁকে গৃহে নিয়ে এসে চিকিৎসা শুরু হোল, নানান জাতের ডাক্তার-কবিরাজের অতি-চিকিৎসায় তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয় আর কি। পরে জনৈক ডাক্তার পরামর্শ দিলেন যে হাওয়া পরিবর্তন করলে উপকার দর্শাবে, কোন পাহাড়ী স্বাস্থ্য নিবাসে যাওয়া বিধেয়।

লোকেনবাবু স্বাস্থ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে বাঘের পেটে গিয়েছেন বলে বাড়ীর পরিচারিকা আহ্লাদী এসে মোক্ষদাকে খবর দিল।

প্রকৃত নাটক এখান থেকেই শুরু।

মোক্ষদা আধুনিকা ; তাতে কবিযশঃপ্রার্থিনী ও স্বাধীনতার উপাসিকা। তাঁর বহু স্তাবকের মধ্যে মোহিতবাবু একজন। তিনি মোক্ষদার কবিতার সমজদার, আর তিনি নিজেও একজন কবি। যোগ্যার সঙ্গে যোগ্যের যোগাযোগ ঘটেছে। লোকেনবাবু মারা গেছেন ; অতএব মোক্ষদাকে বিবাহ করা যায় ; আর লোকেনবাবু নিজেই বিধবাবিবাহের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। মোক্ষদা লোকেনবাবুর মৃত্যুজনিত শোকে বেশি দিন মুহ্যমান থাকলেন না ; আর তা ছাড়া তিনি যদি দীর্ঘকাল বিধবা থাকেন, তাহলে লোকেনবাবুর আত্মা কষ্ট পাবে। অতএব মোক্ষদা এই বিবাহে সম্মতি দিলেন। খবরটি গোপনও থাকল না ; প্রগতিকামী অনেকেই উল্লসিত হলেন ; উল্লসিত হলেন না কেবল দুইজন ব্যক্তি—নিতাই ও সুরেশ। তাঁরা দুইজনই লোকেনবাবুর অন্নে প্রতিপালিত। সুরেশ কী করে সংবাদ সংগ্রহ করেছেন যে, মোহিত পূর্ব-বিবাহিত; প্রথমা পত্নীকে ত্যাগ করে এবং সে-খবর গোপন করে তিনি মোক্ষদাকে বিবাহ করতে চান। সুরেশ এই বিবাহ বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হলেন। তাঁর উদ্যোগে আর একজন সহযোগী হলেন ; তিনি হলেন গিরিবালা। গিরিবালা যদিও মোক্ষদার সঙ্গিনীরূপে পরিগণিতা, আসলে তিনিই হলেন মোহিতের প্রথমা পত্নী।

বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ ; বরবেশী মোহিত বিবাহবাসরে সমুপস্থিত, অভ্যাগতরাও এসেছেন। আর সেই আসরে সন্ন্যাসীবেশে স্বয়ং লোকেনবাবু এসে খাড়া হলেন। তাঁকে এইভাবে দেখে সবাই স্তম্ভিত! তিনি কি ভূত?

লোকেনবাবু জানালেন যে, তিনি ভূত নন ; তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি পা-পিছ্‌লে পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েছিলেন মাত্র। বাঘের পেটে তাঁকে যেতে হয়নি। সব শুনে মোক্ষদা লোকেনবাবুর কাছে এসে ক্ষমা চাইলেন ; লোকেনবাবু ক্ষমা করলেন। মোক্ষদার সঙ্গিনী গিরিবালা হোল মোহিতের স্ত্রী। মোহিত আপন স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন।

লোকেনবাবু স্ত্রীকে ফিরে পেলেন, আর ফিরে পেলেন একটি দিব্যজ্ঞান ; 'অতি-স্ত্রীস্বাধীনতার' ফল ভালো হয় না। সুরেশ ঠাকুরদা ও নিতাই গল্পের মীমাংসায় সহায়তা করেছেন।

তিন অঙ্ক ও তেরটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকে স্ত্রীশিক্ষা, সংস্কার-আন্দোলন, যুবা বিবাহ, বিধবাবিবাহ ও ব্রাহ্মআন্দোলন···সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে।

মোক্ষদা চরিত্রটি 'অলীকবাবু'র হেমাঙ্গিনীর আদর্শে কল্পিত; তবে তার পিছনেও রয়েছেন শেরিডান। ডাক্তারদের নিয়ে যে রঙ্গরস তৈরি করেছেন, সেখানে আছে মলিয়েরের—Love is the Best Doctor. ঐ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাই।

Lyscinda : What will you do sir, with your physicians? Is not one enough to kill anyone body?

Sqanarel : Hold your tongue. Four advices are better than one.

Lyscinda : 'Tis very lucky for her that there are no cat-doctors. They will tell you in Latin that your daughter is sick. (II) ৪৬

অমৃতলাল তাঁর নাটকে এই সমালোচনার মর্মার্থ অনুধাবন করেছিলেন, অনুসরণও করেছেন।

সমগ্র নাটকে সব চেয়ে মজাদার উক্তি করেছেন—মোক্ষদা।

> ঝি পরিচারিকা, যে আমার চুল বেঁধে দেয়, ষ্টকিং পরিয়ে দেয়, তারও—তারও সামান্য জ্বর হলে এক শো দুই হয়। আর আমার কিনা নাইটি নাইন। ১।১

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চাপে লেখকের নাটকের এই প্রকার সরসতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজর্ষি মনোমোহন মাইতি যখন বললেন—"ভোঃ ভোঃ অগ্নি! তোমার প্রজ্জলিত উৎসাহ-অগ্নিতে মোহাগ্নি কাষ্ঠের ইন্ধন নিক্ষেপ করতে এই মহাপাতকী পাপাত্মাই আদেশ লাভ করেছেন।" তখন সেই রঙ্গরসে সুস্থ ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন না।

প্রহসন

পূর্বেই বলেছি সম্মতিসঙ্কট (১৮৯১), কালাপানি (১৮৯৩), একাকার (১৮৯৫), সাবাস আটাশ (১৯০০), সাবাস বাঙ্গালী (১৯০৬) একান্তই সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। প্রথম তিনখানিকে বিরোধী ব্যক্তির প্রচারপুস্তিকা বলা যায়। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি সমর্থক ও উৎসাহদাতার প্রতি বাহবাধ্বনি। সম্মতিসঙ্কটে সূচনায় কৈলাসপর্বত আছে, আর উপসংহারে কালী মন্দির আছে। ধর্মসংস্কারকের প্রতি নয়, সমাজসংস্কারকদের প্রতি শিবের

ক্রোধ বর্ষণের সংবাদ আছে। এবং কালীর কাছে প্রথমে শুধু শরণাগত হয়েছে। পরে "পাষণ্ডের পণ্ড কাণ্ড লণ্ডভণ্ড কর মা দানবদলনী" বলে আবেদন জানান হয়েছে। 'Age of Consent Bill' নিয়ে যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তার উপর এই নাটিকা। লেখকের সহানুভূতি কোন্ দিকে, তা বলার প্রয়োজন করে না। কিন্তু যাঁরা এই বিলের সমর্থক তাঁদের সম্বন্ধে লেখকের মূল্যায়ন শিল্পীসুলভ নয়।

> ব্যাটা বামুন কথাগুলো যা বল্লে, ঠিক, কিন্তু এ গোড়ে গোড় না দিলে আমাদের নাম বেরুবে না, ও মেলাই দল জুটেছে, ওঁর সঙ্গে আমি পালে মিশিয়ে যাবো, আমি ছোট দলেই থাকব। প্রোফেসাব বলেছেন তাহলে রোজ রোজ মিটিঙয়েব কাগজে আমার নাম বেরুবে। ২।৩

এ কোন নাটক নয়, এটি একটি প্রচারপুস্তিকা, কথোপকথন ছলে বিবৃত।

'সাবাস বাঙ্গালী' অন্য মতলবের নাটক ; এখানে উৎসাহ-দেওয়া তারিফ-করাই লেখকের উদ্দেশ্য। স্বদেশী আন্দোলনের সেই স্বর্ণযুগ থেকে দুই-এক মুঠো সোনা লেখক এখানে আমাদেব জন্য চালান করে দেবার চেষ্টা করেছেন। যাঁরা বিদেশী শাসকদের অনুগত এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আস্থাহীন, তাঁদের তিনি শ্রীচরণ বাবু চিনিবাসের মধ্য দিয়ে আমাদের চিনিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এই সময়ে দেশী কাপড, দেশী জিনিসের প্রতি লোকেব মমতা দেখা দেয়, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি নজর পড়ে।

> আমরা সবাই বাঙ্গালী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জৈন, কি বৌদ্ধ—কি খৃষ্টান—বাঙ্গালায় যাদের বাস, আমরা সেই সবাই বাঙ্গালী রবো। হিন্দু আমাদের দাদা, আমরা ছোট ভাই, বাঙ্গলায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ কখন হবে না। বন্দে মাতরম। ২।২

এ নাটক নয়, এ হোল স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ্যে সভাপতির ভাষণ। তবে আধুনিক যুগের 'Poster-Drama' নামক তথাকথিত নাটকের পূর্বরূপ এগুলিকে বলা যায়। কোন কাহিনী নেই, কোন চরিত্র নেই, শুধু সমস্যার এক বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত করা হয়েছে ; কতিপয় বক্তৃতাগুচ্ছ লেখক এই জাতীয় 'নাটকে' পরিবেশন করেছেন। যা তিনি পছন্দ করেন, এবং যা তিনি পছন্দ করেন না—দুই-ই তাঁর সাহচর্যে সম-বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। দৃশ্য-অঙ্ক-সংলাপের কড়াইএ চাপিয়ে বিদ্বেষ বা ভালোবাসার উনুনে চড়ালে

সব কিছু নাট্য-ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত হয় না। এখানে নাটকের বিশিষ্ট ধর্মটিই তিনি বিস্মৃত হয়েছেন।

অমৃতলালের অ-স্বভাবজ রচনা

অমৃতলাল বসু বাংলা রস-সাহিত্যে বহুকাল ধরে লেখনী চালনা করে গেছেন; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক বা সংকীর্ণ জগতের সেবা করে গেছেন। ডিসমিসে বা তিলতর্পণে তাঁর হাস্যরস সৃষ্টির যে বিশেষ রীতি ফুটে উঠছিল, তিনি তা অনুসরণ করলেন না। একেবারে শেষ নাটকে, 'ব্যাপিকা বিদায়ে' তিনি পুরানো পথে ফিরে এসেছেন। ব্যাপিকা বিদায়ে পুষ্পবরণ রায় এবং মিনি তাঁর সহানুভূতির স্পর্শ পেয়েছে, অথচ তারা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের নবনারী। এই সমাজের যিনি হৃদয়হীনা, অনাচারিণী, তিনিই কেবল ভৎর্সিতা হয়েছেন এবং স্থানান্তরিতা হয়েছেন। নাট্যকার সাদা-কালোর পার্থক্য যে জানেন, এটা কম আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এমন কি এই নাটকে লীলা ও মিঃ ভাদুড়ীর যে উপকাহিনীটি আছে, সে ত অমৃতলালে কেন, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। এখানে বিধবা-বিবাহের পোষকতা করা হয়েছে।

শুধু বিষয়ের অভিনবত্ব নয়, নাটকের গঠন-প্রণালীও অভিনব। অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ করে নাট্যকার নাটক লেখেন নি। প্রবেশক, পূর্ব-চিত্র, উত্তর-চিত্র-এই তিনটি মাত্র দৃশ্যে নাটক সম্পূর্ণ। প্রবেশক ব্যবহার করেছেন; কিন্তু প্রাচীনতার প্রশ্রয় দেন নি। তিনটি দৃশ্যে নাটকের চরিত্রগুলির উপস্থাপনা ও ক্রমবিকাশ সুন্দর দেখান হয়েছে। তাঁর ভাষা মসৃণ, যথাযথ এবং তির্যক অর্থাৎ নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। অন্য নাটকে যেমন তিনি অযথা প্লটের জটিলতা আনতেন, 'পান' বা অনুপ্রাসের সমারোহ ঘটাতেন, অপর সাহিত্যিকের ভাষার ব্যঙ্গানুকৃতির (Parody) উপর অতিশয় নির্ভর করতেন, এখানে তা নয়। এ নাটকের ঘটনা প্রয়োজনানুরূপ, ভাষা মৌলিক এবং চরিত্র কৃত্রিমতা-মুক্ত, অথচ লক্ষ্যমুখী। তিনি যে এখানে কত সংযত তা একটি সংলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই প্রণিধান হবে। মিনি সান্ধ্য-ভোজের ব্যবস্থাদি তদারক করছে, ঠাকুর বাবুর্চি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেছে; কিন্তু কেউই কি ওড়িয়া ভাষা কি বাঙাল ভাষার প্রদর্শনী খোলে নি। ঘটনায় তাদের যতটুকু কথা বলতে বাধ্য করেছে ততটুকুই তারা বলেছে। অন্য নাটকে রসরাজ লেখক

হাস্যরস সৃষ্টির জন্য এই সব উপভাষা ব্যবহার করেছেন, এখানে নাটক সৃষ্টির জন্য ব্যবহার। তবে কি 'রসরাজ' নটরাজ হতে চেয়েছেন?

নাটকে অমৃতলাল সব চরিত্রকে নিয়েই হাসতেন; অথচ হাসির নাটকে সবই আর হাসির হয় না। মলিয়েরের প্রসঙ্গ স্মরণীয়। যাদের অঙ্গবিকৃতি বা দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অভাব আছে, অমৃতলাল তাদের বিষয় নিয়েও রঙ্গরস করেছেন। এর মধ্যে একটা বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতা আছে। কিন্তু এই নাটকে অমৃতলাল ঘনশ্যামকে উপস্থিত করে তার এতদিনের নাট্যরুচির সংশোধন করলেন। ঘনশ্যাম তাই চমৎকাবের শুধু স্নেহ পায় নি, হাল আমলের দর্শক সমাজেরও পেয়েছে। অমৃতলালের জীবদ্দশায় কি দর্শকচরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। খাসদখল (১৯১২) প্রকাশের পর ব্যাপিকাবিদায় (১৯২৬) দেখা দিয়েছে। এই সময়ে তাঁর অপর রচনা হোল যাজ্ঞসেণী। যাজ্ঞসেণী প্রকাশিত না হলে আমরা 'ব্যাপিকা বিদায়' অমৃতলালের রচনা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতাম! কারণ এই নাটকে তাঁর নিজস্ব 'ইডিয়ম' নেই। ১৯১২ থেকে :৯২৬—দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের ব্যবধানে নব্য হিন্দুয়ানী ভাবনার ঐতিহাসিক মৃত্যু ঘটেছে। নতুন করে সুস্থ ও সহজ চোখে বাংলার সমাজ যুদ্ধোত্তর জীবনকে দেখছে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী দুই দিক থেকে এসে জীবনকে এইভাবে বদলে দিয়েছেন।

অমৃতলালের নাটকের বিষয়বস্তু ও তার যুগৌচিত্য

অমৃতলাল তাঁর নাটকে স্ত্রীশিক্ষা, স্বেচ্ছাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, জাতিভেদ প্রথার বিলুপ্তি, বিদেশগমন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়েছেন। এছাড়া তিনি বাল্যবিবাহের পক্ষে, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন, এবং বিভিন্ন জাতির পেশাগত স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী ছিলেন।

যে কোন প্রথা বা সংস্কার নতুন বা পুরাতন যাই হোক, তার আতিশয্য অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু নাট্যকার ত সাংবাদিক নন, বা সভামঞ্চের বক্তৃতাবীর নন; তাঁকে সাহিত্যিকেব মতই সমালোচনা করতে হবে, শিল্পীর মতই শিল্প সম্পাদন করতে হবে। অমৃতলালকে কি অমৃতময় হতে হবে?

অমৃতলাল 'সেওড়া কুটির' বলতে যে আশ্রমটির কথা বলেছেন, বুঝতে কারো কষ্ট-ই হয় না যে, তা হোল কমলকুটীর অর্থাৎ ভারত-আশ্রম। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ভারত-আশ্রমের যে-চিত্র দিয়েছেন, তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই; আমাদের মধ্যবিত্ত পারিবারিক অংশের যে সীমিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ

রূপের সঙ্গে আমরা এতকাল পরিচিত ছিলাম; এখানে তার শুধু পরিবর্তন ঘটল। "স্বীয়-স্বীয় ব্যয়ের অংশ দিয়া সকলে একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় থাকিতাম। এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে বসা, এক সঙ্গে বেড়ানো—সুখেই কাল কাটিত। শহরে যাহাদের কাজ থাকিত, তাঁহারা দিনের বেলায় শহরে গিয়া কাজ করিয়া আসিতেন। প্রাতে ও সন্ধ্যাতে এক সঙ্গে উপাসনা ও একসঙ্গে ধর্মালাপ চলিত। আমরা সকল বিষয়েই কেশববাবুর পরামর্শ ও সদুপদেশ পাইতাম। ‥ আমি কেশববাবুর আশ্রমোৎসাহের মধ্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। সে সময়ে কেশববাবুর ও তাঁহার পত্নীর যে সাধুতা ও ধর্মনিষ্ঠা দেখিযাছিলাম, তাহা জীবনে ভুলিবাব নয়।"[৪৭]

সেকালের শিক্ষিতা নারী সম্বন্ধে অমৃতলাল খড়্গহস্ত ছিলেন, একটি শিক্ষিত পবিবাবের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করা গেল। "আমি আসিয়া পটলডাঙ্গা মীরজাফরস লেনে শ্রীযুক্ত বাবু হরগোপাল সরকারেব সহিত একত্রে বাসা করিলাম। তিনি বামতনু লাহিড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী অন্নদাদায়িনীকে বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়া বসিলেন। অন্নদাদায়িনীর ভগিনী কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী তখন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইঁহাদের সংশ্রবে থাকিযা আমি বড়ই উপকৃত হইতে লাগিলাম। ইঁহাদিগকে দেখিয়া আমার নারীজাতিব প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গেল।"[৪৮]

শিল্পী আর দলীয় প্রচারক এক হতে গেলে যে অনাসৃষ্টি ঘটে, অমৃতলালে তাই ঘটেছে।

বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের পক্ষে তাঁর ওকালতি বক্ষণশীল সমাজের ওকালতি। এ বিষয়ে তাঁর মতামত তাঁর নিজস্ব মতামত নয়। আর মতামত ত জীবন নয়, জীবন মতামতকে নিয়ে এবং মতামতকে এড়িয়ে। 'সম্মতি সঙ্কট, বা 'একাকারে' তাঁর মতামত তাই শিল্পীর মতামত নয়।

তাঁর নাটকে বিবাহ-পূর্ব বা বিবাহ-অতীত কোন প্রেম নেই, যা আছে তা বেশ্যা-অনুরাগ। এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র-অমর দত্ত প্রভৃতি নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিতা আছে। তাঁর 'কৃপণের ধন' এবং 'ব্যাপিকা বিদায়' শুধু ব্যতিক্রম। সে-যুগে নব্যশিক্ষিত সমাজের তরুণ-তরুণীদের একাংশের মধ্যে মেলামেশার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় সমাজপরিবেশ বদলে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি, বা গোরা উপন্যাস দুইটির কথাবস্তু স্বকপোলকল্পিত নয়।

অমৃতলাল এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করতে পারেন নি; তাঁর রক্ষণশীলতাই তাঁর দৃষ্টি-বন্ধ্যাত্বের হেতু।

তাঁর নাটক এক অর্থে তাই বাস্তবের অস্বীকার। যে-বাস্তব ভেঙ্গে পড়ছে, অপস্রিয়মান, তার থেকে যে বাস্তব গড়ে উঠছে, উদ্ভিন্নমান, তার মূল্য কম নয়। অমৃতলাল বিপন্ন বাস্তবতাবোধের নাট্যকার।

অমৃতলাল যে-যুগে জন্মেছিলেন, সে-যুগ ছিল সংস্কারবিরোধীদের দাপটের যুগ, নব্য হিন্দুবাদের যুগ। একদা খ্যাত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামনি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু ও বঙ্গবাসী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী ছিল এ যুগের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী লেখক ও লেখকগোষ্ঠী। বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁদের মতামতই মুখ্য স্থান পেত। এঁদের বিরুদ্ধে ছিলেন সঞ্জীবনী পত্রিকা। কিন্তু নাট্যশালার সঙ্গে এঁরা কোন সম্পর্ক রাখতেন না। তাই বলে বাংলা নাটক এঁদের সম্বন্ধে কৌতূহলশূন্য ছিল না। বরং প্রহসনজাতীয় রচনায় ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে অতি-সচেতনতা দেখা যেত।

১. অখিল। বিহারীবাবু, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, আমার কোন কুভাব নাই; পারুলকে আমি পবিত্রভাবে ভগ্নীভাবে দেখি। (তরুবালা ২।৩)

২. তিনকড়ি। সূর্যবংশাবতংশ ভাই মনসারাম, কলুষশাই, থাকা হয় কোথা?
বাঞ্ছা। সেওড়া কুটীরে।
তিনকড়ি। সে আবার কি?
বাঞ্ছা। একটা ভ্রাতা-ভগ্নীর মধুচক্র, ভ্রাতাভগ্নীর পবিত্র পারিবারিক সংসর্গে সেখানে সতত স্বর্গের সোপান দেখতে পাই। (বাবু ১।৩)

৩. ফেণিলা। তার মধ্যে দুই—একজন খালি ধীবর, আর আমার একজন আছেন তিনি নটবর।
উর্মিলা। অশ্লীল! অশ্লীল!
নটবর। ঐটি হলো না, এখন আমার নামই নটবর।
উর্মিলা। পুলিশ—পুলিশ—ঐ লোকটার নাম নটবর—অশ্লীল নাম—কগনিজেবল কেস।
নটবর। নটবর নাম কেন জানেন? আমি এই সংসার কিনা পৃথিবী রূপ—
রমা। পৃথিবী! কোন পৃথিবী? যাহা কমলালেবুর ন্যায় গোল?
ফেণিলা। কিন্তু উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা?
রমা। হাঁ ভূগোল সূত্রে আছে সুস্পষ্ট ছাপা।

নট। সেই পৃথিবী স্নশ নাট্যশালায় আমি অভিনয় করি।

ঊর্মিলা। আপনি তা হলে নারীহন্তা, স্বাধীনভর্তা, পুরুষকর্তা।

ফেণিলা। সখি. ঘোর উন্মত্তা।

ঊর্মিলা। অপেক্ষাও বিভীষণ পাপ কার্য করে থাকেন। নাট্যশালা—শালা তো ইতর কথাই, নাট্য আবার ততোধিক।

সকলে। সুতরাং নাট্যশালায় শতাধিক। (বাহবা বাতিক—:।১)

৪. কালিন্দী। ওরা সব যোড়ে যোড়ে গেল, কত শীকার ধরবে, কত টাকা পাবে, আর তুমি কিছু কচ্ছো না ; চল আমরাও দুজনে শীকার খুঁজতে যাই।

কালাচাঁদ। চাঁদবদনি ভগিনি! ঐটে মাফ করতে হবে, তোমায় নিয়ে আমার শীকারে যাবার ভরসা হয় না।

কালিন্দী। কেন. আমি তোমার ঘাড়ে পড়বো ?

কালাচাঁদ। আমার ঘাড়ে তো পড়েই আছ, সে ভয় করিনি, যদি আর কারুর ঘাড়ে পড়ো—

কালিন্দী। ছি ভ্রাতঃ প্রাণনাথ তোমার এখনও কুসংস্কার!

কালা। কি জান ভগ্নি, সংস্কারবিশেষ অবগত আছি, তাই প্রিয়ে, স্ত্রীকে বাজারে বার করা সম্বন্ধে একটু কুসংস্কার এখনও আছে। (রাজা বাহাদুর ১।১)

৫. বামাদাসবাবু বলেন, 'ও পুঁটী,
তোকে করবই সভ্য,—
ভগ্নী-ভগ্নী তোর চোক দুটি।' (বৌমা ২।২)

সে-যুগের সাময়িক পত্রিকায় এই সব পরমতঅসহিষ্ণু এবং সমালোচনামূলক নাটকগুলি অত্যন্ত সত্যনিষ্ট নাটক বলে সমাদৃত হোত।
একদিন 'কল্পতরু' গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একটু বেশি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। আর একদিন 'বিবাহ বিভ্রাট' নাটকের সমালোচনায় 'কল্পতরু'র লেখক তদপেক্ষা বেশি উৎসাহ দেখালেন।

"যদি প্রকৃত শিক্ষায় কাহারও আন্তরিক শ্রাদ্ধা থাকে, তবে আমাদের ব্যবহার শুধরাইতে হইবে, আমাদের চরিত্রে নিষ্ঠাগুণের সঞ্চার করিতে হইবে 'চাদর নিবারণী' অথবা 'ভাত কাপড় নিবারণী' সভা ছাড়িয়া, ভ্রান্ত অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং কঠোর কশাঘাতকারী গ্রন্থকারের গুণাগুণ

করিতে করিতে কিছুকালের জন্য ঝীকেও আমাদের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের মতিগতি ফিরাইয়া লইতে হইবে। আমি স্বীকার করি, যে এই নাটক আমাদের কলঙ্কে এবং কুৎসায় নির্মিত। কিন্তু সে দোষ গ্রন্থকারের, না আমাদের ? এত যে জাতীয়তার ভাণ, এত যে দেশভক্তির ছলনা এমন করিয়া না আঁকিলে ইহার প্রতিশোধ হয়।"[৫০] ইন্দ্রনাথের মন্ত্রশিষ্য 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু গুরুকেও ছাড়িয়ে গেলেন, "বিবাহ বিভ্রাটের তুলনা নাই, ইহার দাম হওয়া উচিত এক আনা, আর ধারাপাত বর্ণপরিচয়ের মত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহার অবাধ প্রবেশ থাকা একান্ত আবশ্যক।"[৫১] বাবু নাটকের সমালোচনায় বলা হোল, "বসুজ মহাশয়ের ওস্তাদী হাত 'বাবু' চিত্রে প্রস্ফুটিত। কি বাবুই আঁকিয়াছেন তিনি! সজীব জীবন্ত রঙ বেরঙের বাবু বড় সুন্দরই আঁকা হইয়াছে। মেলতায় ফটোগ্রাফ—উপরে যেন তারই রঙ ফলান। দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়, ছবি নয় যেন জীবন্ত সত্য দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়। হইতে পারে, দুই একস্থলে রঙের চটক বেশিমাত্রায় পড়িয়াছে, এক আদ স্থলে অতিরঞ্জিতও হইতে পারে ; স্থানে স্থানে ব্যক্তিগত ভাবেরও ছায়া পড়িতে পারে ; কিন্তু তবুও তবুও 'বাবু' সহস্রগুণে দেখিবার মত হইয়াছে।"[৫২]

ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) পত্রিকায় 'বাবু' নাট্যাভিনয় দেখে বলা হোল "কখনই বিশ্বাস হয় না যে কেবলমাত্র অর্থলোভে তাঁহার স্বদেশীয় স্বজাতীয় গুটিকত সমদুর্বল ভ্রাতাদের কোন কোন বিষয়ে আচরণের ভুলভ্রান্তিকে তিনি পণ্যদ্রব্য হিসাবে দেখিতেছেন, তাহাদের সঙ সাজাইয়া রঙ্গভূমিতে নামাইয়া কাঁদাইয়া কেবল মুদ্রাদাতা দর্শকের পরম প্রীতি উৎপাদন করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পরের দুর্বলতায় আমোদ অনুভব করিবার একটি হীন প্রবৃত্তি যে মনুষ্যপ্রকৃতিতে বিদ্যমান তাহাই উত্তেজিত করিয়া তোলা তাঁহাব চরম উদ্দেশ্য বোধ হয় না।" ব্রাহ্ম-সমালোচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ কবেও সমালোচক বিষয়টি অ-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন।

"বাঙ্গালী ভদ্র সমাজের একস্তরে ইতর ভাষার প্রচার ও আদর আছে সত্য, কিন্তু তিনি তাহার দাসত্ব কেন করেন ?" ভারতীর এই সমালোচনায় সঞ্জীবনী সুখী হন নি। তখন ভারতীর শ্রাবণ সংখ্যায় বলা হোল, "নীতির কার্য ও Art-এর কার্য বিভিন্ন। Art ও নীতির বিভিন্ন রাজ্য।"[৫৩]

'বৌমা' নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য অনুরূপ, "এ চিত্র সর্বত্র অতিরঞ্জিত নহে, ইহা ভাঁড়ের তামাসা নহে। ইহাতে শিক্ষা দীক্ষা ও তিতিক্ষায় অনেক জিনিস

আছে। ইহা নব্যবঙ্গের হৃদয়ের ইতিহাস, সাহেব পুচ্ছধারী, বিকৃতমস্তিষ্ক বাঙ্গালী নরনারীর মানসিক তত্ত্ব, আর ভণ্ড সমাজ সংস্কারক "অবলাবান্ধবরূপী" একটা অদ্ভুত জীবের নিখুঁত ফটো।"[৫৪]

'খাসদখল' অমৃতলালের প্রবীণ বয়সের রচনা, এই নাটকেও এই পরধর্মবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি তীব্র আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গুণগ্রাহী ব্যক্তিরা তাঁদের কণ্ঠস্বর একটুও খাদে নামান নি। "বাঙ্গালী যদি খাসদখলের সমাদর না করে, তাহা হইলে বলিব বাঙ্গালাদেশে রসিকতা ও রসের কথার কাল গিয়াছে।"[৫৫] এই যুগের সমালোচকেরা সাহিত্য অপেক্ষা সমাজ সম্বন্ধে বেশি কৌতুহলী ছিলেন।

তুলনা করা যাক মাইকেলের সঙ্গে। পুরাতন ও নব্য—উভয় সমাজই তাঁর কাছে ভৎর্সিত হয়েছে, তার কারণ তারা ভৎর্সনার যোগ্য। মাইকেলের নাটকে তাই উপহসিত ও উপহাসকদের একত্রে বসে রস উপভোগ করার অবকাশ আছে, আর এই কারণে তা সাহিত্য, শুধু পরচর্চা নয়, সাংবাদিকতাও নয়।

মঞ্চকুশলতা ও নাটকের শিল্প

কমেডি বা প্রহসন আস্বাদন করার জন্য চাই পরিশীলিত দর্শকগোষ্ঠী। এক অর্থে ট্রাজেডির দর্শক অপেক্ষা কমেডির দর্শকের উপর নাট্যশালার দাবীর বহর বেশি। কমেডির দর্শকের রসজ্ঞতার পরিচয় কেবল দন্ত বিকাশ-নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। দর্শক তৈরি নয় বলেই মাইকেলের প্রহসন মঞ্চস্থ হোল না।

কমেডিতে মেয়েদের থাকে প্রাধান্য, এই কারণে দর্শকদের দায়িত্ব আরও বেশি। বাঙ্গালা দেশে উনিশ শতকের শেষ পাদে নারী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা বিকৃতির হাওয়া জোরদার হয়েছিল। যে সমাজে নারীদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, সম-অধিকার নেই, সে সমাজে কমেডি রচিত হতে পারে না। এই সময়ে বাংলাদেশে সর্বতোভাবে নারী-প্রগতির বিরোধিতা করা হয়েছিল। এবং বাংলা নাটকের তাই ছিল উপজীব্য।

দ্বিতীয় কথা। কমেডি হোল শহুরে সাহিত্য; শিক্ষিত রুচিবান দর্শক ব্যতীত কমেডি মঞ্চস্থ হতে পারে না। নাগরিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে কমেডি ও প্রহসনের যোগ নিবিড়। কমেডিতে বাগবৈদগ্ধ্য আবশ্যিক সর্ত। শুধুমাত্র ঘটনাসংস্থানে (situation) কমেডির কুঁড়ি ফোটে না। তাই 'হিউমারের' পাশাপাশি চাই

'উইট' ((wit)। ভারতচন্দ্র বড় কমেডি লেখক হতে পারতেন। কিন্তু তখন এই রীতির প্রচলন ছিল না। বাস্তব জীবন কমেডির উপকরণ হয় না, কমেডির উপকরণ হোল সামাজিক আচরণ। এই সামাজিক আচরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কমেডি লেখক তুলে ধরেন। কমেডিতে জীবন সম্বন্ধে কোন অ-সভ্য, অখ্যাতিকর প্রসঙ্গ স্থান পায় না। কমেডিতে পাই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ।

'উইটে'র উদ্ভব হয় যুক্তিবাদিতার মৃত্তিকা থেকে। কমেডিতে যে বিদ্রূপ বা হাস্যপরিহাস থাকে, তা নৈর্ব্যক্তিক। এই কারণে এই হাস্যরসকে সমালোচকেরা বলেন, 'humour of the mind'.

কমেডিতে বিতর্ক থাকে; ফরাসীদের হাতে যে বিতর্কপরায়ণ ব্যক্তিটি হন দক্ষ তলোয়ারচালক, জার্মানীতে তিনিই এক কুঁতুলে জনসমষ্টি, আর আমাদের দেশে এতকাল তিনি ছিলেন চণ্ডীমণ্ডপের শতরঞ্চী খেলার সঙ্গী। একটা জাত কতটা সভ্য, তার বিচার হয় সে কতটা পবমতসহিষ্ণু; কমেডির আদর কতটা তার দেশে। "Sensitiveness to the comic laugh is a step in civilisation." এ ব্যাপারে জাতিগত বর্ণগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে তা হোল ঐতিহ্যের, মেজাজের, রুচির এবং শিক্ষার।

সাহিত্যের সেই সর্বস্পর্শী আবেদনেব কথা অমৃতলাল ভুলে গিয়েছিলেন। অমৃতলাল অমৃতময় হতে পারেন নি।

কেউ-কেউ তাঁর প্রসঙ্গে এ্যারিষ্টফেনিসেব নাম উল্লেখ করেছেন। এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত অমৃতলাল ব্যঙ্গসাহিত্যের মূল প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়েছেন বা অনবহিত ছিলেন। ব্যঙ্গ যখন সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়, তখন ব্যঙ্গের বিষয়কে অনেক দূরে সরিয়ে নিতে হয়, শুধু কাল থেকে নয়, স্থান থেকেও। সুইফটের ক্রোধ সমসাময়িক ইংলণ্ডীয় সমাজের প্রতি, কিন্তু গল্প বলেছেন অজানা দেশের। অনুরূপ হোল আনাতোল ফ্রান্সের 'পেংগুইন আইল্যাণ্ড', বা আলবেয়া কামুর 'প্লেগ', রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' বা 'তাসের দেশ'।

প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষকে মোকাবিলা করলে সাংবাদিকতা হয়। এ্যারিষ্টফেনিস একথা জানতেন—তাই ঐদেশের গণতন্ত্রের সমালোচনা করতে নেমে তিনি চলে গেলেন রূপকথার জগতে, অলৌকিক জগতে। অথচ 'দি বার্ডস' নাটকের 'ক্লাউড কাকুল্যাণ্ড' চিনতে আমাদের কষ্ট হয় না। 'ফ্রগস্' নাটকে ইউরিপিদিশ ও সোফোক্লিস তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য। এখানেও সেই ব্যাঙের ভুবনে মানুষের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত।

'ক্লাউডস্' নাটকে সক্রেটিসের শিক্ষাপদ্ধতিকে তিনি সমালোচনা করেছেন। কিন্তু পা রেখেছেন পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের উপর। এইভাবে এ্যারিষ্টফেনিস দূরে গিয়েই কাছে এসেছেন। কারণ তিনি জানতেন সমসাময়িক যুগের প্রতি সরাসরি তাকালে চার চক্ষুর মিলনেও বাস্তবের সঙ্গে পরিণয় হবে না; একটু আড চোখে তাকাতেই হবে ছাঁদনাতলায়।

অমৃতলাল তা জানতেন না, এবং সে না-জানার পিছনে তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বের পরিমাণ সবটুকু নয়। তিনি তাঁর যুগের প্রধান সমাজশক্তিকে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। এবং তিনি ছিলেন পেশাদার মঞ্চের অধ্যক্ষ, তাঁর নাটক মাইকেল-রীতির প্রতিবাদ। তাই তাঁর নাটকে নাটক না থাকলেও চলত; কিন্তু হাসি আর গান যত্রতত্র উদ্‌গীর্ণ হোত।

তাঁর নাটকে সবাই যেমন হাস্যরস সৃষ্টি করে, সবাই তেমনি প্রায় গান করে। এবং গান শোনাবার জন্য তিনি নানা দলকে বায়না করেছেন। রাজা বাহাদুরে ভণ্ডবেশধারী নরনারী, জেলে-জেলেনী, ফুলওয়ালী-ফলওয়ালা, ধোপানী, কাপুলে মেওয়ালাল, ভিস্তি মেথরাণী, দোকানদার, এমন কি সাহেব মহিলারা পর্যন্ত গান করেছে।

গ্রাম্যবিভ্রাটে গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষ, কৃষক, খেংড়াওয়ালাগণ, বালকগণ, কলসী-বিক্রেতাগণ, মেয়েরা গান গেয়েছে।

খাসদখলে কলিকামিনীগণ, রতিসঙ্গিনীগণ, গোয়ালিনীগণ, মহিলাগণ সমবেতভাবে গেয়েছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে অনেকে গান গেয়েছে।

তাজ্জবব্যাপারে বঙ্গনারীগণ, গোয়ালা, এয়োগণ, পাতখোয়াওয়ালা ও পাতখোয়াওয়ালীগণ, আফিস-মেয়েগণ, নারীবেশধারী পুরুষগণ, কর্ণেল নিতম্বী ও ভলনটিয়ার রমনীদের গান ছাড়া ব্যক্তিগত গানও আছে তিনটি।

সাবাস আটাশে বধূমাতাগণ, গোয়ালিনীগণ, মুদ্দফরাসিনীগণ, ঝাড়ুদারনী নাপিতানীগণ, মহিলাগণ; গান গেয়েছে।

এই গানগুলি বসেছে অধিকাংশই হয় দৃশ্যের সূচনায়, না হয় দৃশ্যের শেষে। হয়ত মঞ্চের পটপরিবর্তনের প্রয়োজনে এই কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। তবে কোন কোন দৃশ্যে শুধুই একটি গান তিনি পরিবেশন করেছেন। এর ফলে নাটকের বাঁধুনি আল্‌গা হয়ে গেছে।

তাঁর হাতে পড়ে হাসির মত গানও নাট্যপ্রয়োজন ভুলে গিয়েছিল। অন্য প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিল।

অমৃতলাল কমেডি লিখতে গিয়ে পরচর্চার ক্লেদকর্দমে সারা দেহ বিভূষিত করেছেন। কর্দমে আর চন্দনে পার্থক্য কোথায়, তা তিনি জানতেন না, তা নয়। কারণ তিনি ডিসমিস লিখেছেন, তিলতর্পণ লিখেছেন, লিখেছেন অবতার এবং ব্যাপিকাবিদায়।

'অবতার' ও ব্যাপিকাবিদায়' অজ্ঞাতসারেই 'বিরিঞ্চিবাবা' এবং 'শেষরক্ষা'র সমগোত্রীয় হয়েছে। তিনি কনগ্রীব পড়েছিলেন, মলিয়েরকে জানতেন, শেরিডান তাঁর প্রিয়তম লেখক। অথচ তিনি সহযোগী হলেন যোগেন্দ্র বসুর, প্রশংসাভাগী হলেন পঞ্চানন্দের।

Lydia Why is it not provoking when I thought we were coming to the prettiest distress imaginable, to find myself made a more smithfield bargain of at last—There had I projected one of the most sentimental elopements!—So becoming a disguise!—So amiable a ladder of ropes!—conscious moon—four horses Scotch parson with such surprise to Mrs Malaprop—and such paragraphs in the newspapers!—oh I shall die with disappointment?

(The Rivals—V/I)

এই উদ্ধৃতির ব্যবহার তাঁর নাটকে একাধিকবার হয়েছে। তিনি শেরিডানের পথ ধরে হেটেছেন ; কনগ্রীবের হাতছানিও তিনি অগ্রাহ্য করেন নি।

But there is nothing more unbecoming for a man of quality than to laugh ; this such a vulgar expression of the passion! Everybody can laugh. Then especially to laugh at the just of an inferior person, or, when anybody else of the same quality does not laugh with one ; ridiculous! To be pleased with what pleases the crowd! Now when I laugh, I always laugh alone!

(The Old Bachelor)

সে-যুগে ব্রাহ্ম উন্নাসিকতার বিরুদ্ধে কনগ্রীব যদি তাঁর পথপ্রদর্শক হন, তাতে লজ্জার কিছু নেই। কনগ্রীব বৃটিশ উন্নাসিকতার উপর ন্যায়সঙ্গত আঘাত হেনেছিলেন। অমৃতলাল সম্বন্ধে যদি বলতে পারতাম যে তিনি ন্যায়সঙ্গত বিদ্রূপ বর্ষণকারী! কিন্তু তাঁর মধ্যে শিল্পীর নিরপেক্ষতা ছিল না। সাম্প্রদায়িক হলে কোন সম্প্রদায়ের সমালোচনার অধিকার থাকে না। বক্তৃতা-মঞ্চের কথা

বলছি না; বলছি, রঙ্গমঞ্চের কথা। আমরা হলফ করে বলতে পারি, আরিষ্টফেনিসের নাটক সুযোগ হলে নাট্যকারের পাশে বসেই সোফোক্লিস, সক্রেটিস, ইউরিপিদিস তা উপভোগ করতেন।

অমৃতলালের মঞ্চে দর্শকেরা আসতেন তাঁদের বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে আরও শাণিয়ে নিতে। অর্থাৎ তিনি দর্শকদেরই নমস্কার জানিয়েছেন, শিল্পকে নয়। তাই তাঁর কাছে হিন্দুবিবাহ মাত্রই আদর্শস্থানীয়, ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণভাবে ঘৃণ্য, ব্রাহ্ম পারিবারিক জীবন দুর্নীতির স্তূপ।

কার্যত নাটকে তিনি কবলেন হিন্দুধর্মসংরক্ষণী সভার কার্যসূচীর রূপায়ন। "In short his idea is to dramatise penal laws and make the stage a court of ease to the old Bailey."

'গম্ভীর' নাটকে গিরিশচন্দ্র যেমনভাবে মাইকেল-রীতিকে শিথিল করে দিয়েছেন, অনুরূপ শৈথিল্য এনেছিলেন অমৃতলাল কমেডি-ও প্রহসনের ক্ষেত্রে।

দীনবন্ধুও সর্বদা মাইকেলের সংহতি মানেন নি, কিন্তু তিনি জানতেন হাসির ক্ষেত্রে জাতিদ্বেষ চলে না। হাসতে যাঁদের মানা, তাঁদেরও হাসতে বলতে হবে। অমৃতলাল ভিন্ন পথগামী। কমেডির কাঠামো পাল্‌টে নয়, বিপর্যস্ত করে তিনি দিলেন। অনাবশ্যক ঘটনা, অনাবশ্যক চরিত্র, অনাবশ্যক কথা তাঁর কমেডি ও প্রহসনে এক নিয়মহীন অনাচারের উৎপত্তি ঘটাল। অথচ সংলাপে তিনি কোন-কোন ক্ষেত্রে প্রায় দীনবন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী, যথা বিবাহবিভ্রাট ও অবতারের অংশবিশেষ, বা কথাবস্তুর নাট্যগ্রন্থনায় প্রায় মাইকেলসুলভ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—যেমন 'কৃপণের ধন', এবং বিশেষ করে 'ব্যাপিকা-বিদায়'-এ।

তরী নিয়ে বসে থাকেন সকল জাতের দর্শকের জন্য কমেডি বা প্রহসনের লেখক, খেয়াঘাটে ত জাত বিচার নেই। অমৃতলালও জানতেন, "Come, come, leave business to idlers, and wisdom to fools; they have need of them. Wit, be my faculty, and pleasure my occupation." (The Old Bachelor)

জানা-কথাও মাঝে-মাঝে কিভাবে যেন হারিয়ে যায়! শিল্পের ধর্ম আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি একাসনে বসে না! বিদ্বেষের গরল তাই আর প্রীতির অমৃতে রূপান্তরিত হোল না। অমৃতলাল নীলকণ্ঠ হতে পারলেন না। তিনি 'রসরাজ'ই থেকেছেন, নটরাজ হন নি।

১. Memoirs of My Life and Times—Bipinchandra Pal P. 429.

২. ঐ P. 427.

৩. ঐ P. 423.

৪. ঐ P. 429.

৫. Bengalee—12 may—16 may, 1803.

৬. অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পরিশিষ্ট। পৃ. ২১৭।

৭. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যায় পৃ. ১৫১.

৮. ভারতী, ১২৮৮ মাঘ।

৯. ঐ।

১০. ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—প্রবোধচন্দ্র সেন। পৃ. ১৪০।

১১. ভারতী, ফাল্গুন, ১২৮৮।

১২. ঐ।

১৩. ভারতী-নীতি ও সাহিত্য—শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩০২।

১৪. আর্যদর্শন, অগ্রহায়ণ, ৭ম খণ্ড, ১২৮৮।

১৫. নব্য ভারত—চৈত্র, ১২৯১।

১৬. অনুসন্ধান—১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৭।

১৭. সাহিত্য—বৈশাখ ১২৯৭।

১৮. ঐ —১৩০১ জ্যৈষ্ঠ।

১৯ ঐ —১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ।

২০. ঐ —১৩১১ আষাঢ—ভাদ্র।

২১. ঐ —ঐ, কার্তিক।

২২. চিকিৎসাতত্ত্ব ও সমীরণ—১৩০১, ১ম খণ্ড. তৃতীয় সংখ্যা।

২৩. অনুসন্ধান—১৩০৩।

২৪. সাধারণী—১৩১০ আশ্বিন—কার্তিক।

২৫. চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ, ৫খণ্ড, পত্র ২৯, ১৭ শ্রাবণ ১৩২১।

২৬. গিরিশ রচনাসম্ভার—প্রথমনাথ বিশী সম্পাদিত। মিত্র ও ঘোষ। ভূমিকা—পৃ—।৹

২৭. বা. সা ই ২য় খণ্ড—সু. সে. পৃ—৩৩৪।

২৮. A Nation In Making—Surendranath Banerjee. Oxford University Press. 1963. P. 40.

২৯. অর্চনা, ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। পৃ—৫১২.

৩০. প্রবাসী—অগ্রহায়ণ,—জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিত্তে লঘুতা—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৩১ The Englishman, 1883, 8 May,

৩২. নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ। পৃ—৭.

৩৩. সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৫—স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

৩৪ ·সাহিত্য—১৩২১, ফাল্গুন। নাটক—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। পৃ—৪৮০-৫৮১,

৩৫. গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন পৃ ৭-৮।

৩৬. বঙ্গবাসী, ৫রা আষাঢ়, ৩১৩

৩৭. সাবাস আটাশ—অমৃতলাল বসু।

৩৮ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু। পৃ - ৩৮।

৩৯. ঐ, পৃ—৫৯।

৪০. ঐ, পৃ—৩৯।

৪১. বঙ্গের লেখক—হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। পৃ-৮৯৬.

৪২. ঐ, পৃ—৬০।

৪৩. ঐ পৃ—৯৬।

৪৩ ক. বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত। ১ম সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃ—১৫৫,

৪৪. Indian Mirror, 3 May, 1900

৪৫. সাহিত্য সাধক চরিতমালা ষষ্ঠ খণ্ড—অমৃতলাল বসু—পৃ—৫৭

৪৬. Love Is the Best Doctor—Moliere (1622—1673)

৪৭. আত্মচরিত—শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ সংস্করণ। পৃ—১০৯।

৪৮. ঐ, পৃ—৯৮।

৪৯. বঙ্গদর্শন—(কল্পতরু)

৫০. নবজীবন, বৈশাখ, ১২৯২।

৫১. বসুমতী, ১৩৩৬ শ্রাবণ সংখ্যা। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর এই মন্তব্য উদ্ধৃত।

৫২. অনুসন্ধান, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০।

৫৩. ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২।

৫৪. রহস্যসন্দর্ভ, বৈশাখ, ১৩০৫।

৫৫. নাট্যমন্দির, ১৩৩৮ চৈত্র সংখ্যায় বসুমতীর এই মন্তব্য উদ্ধৃত।

রবীন্দ্রনাথের নাটক : রূপ হতে রূপে

ঠাকুর পরিবারের নাট্য-উৎসাহ সুবিদিত। জোড়সাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা-উভয় গৃহের ঠাকুরপরিবার নাট্যানুষ্ঠানে প্রবল অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। তবে দুই পরিবারের নাট্য-চিন্তা দ্বিবিধ ছিল। জোড়াসাঁকো গৃহে নাট্য-উৎসবও অবশ্য 'উৎসব' অর্থেই প্রযোজিত হোত; কিন্তু তার সঙ্গে থাকত একটি পরিচ্ছন্ন রুচি ও উন্নত আদর্শবাদ। কোন একটি নাটক মঞ্চস্থ হবার পূর্বে মহর্ষির সাবধান বাণী উল্লেখযোগ্য: "এ প্রকাব আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়।"[১] তাছাড়া সেক্সপীয়ার স্মরণার্থে কলকাতায় সেক্সপীয়ার কমিটি গঠিত হলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই "মহৎ কার্যে"র অনুমোদন করা হয়। কালিদাস ও ভবভূতির স্মরণার্থ "এতাদৃশ সভা গঠনের জন্য" আবেদন করা হয়।[২] পরবর্তীকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নাট্যানুষ্ঠান ও নাটক সম্বন্ধে অধিকতর কৌতূহল দেখা দিতে থাকে। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার লিখিত 'সাবিত্রী ন্যটক' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হোল, "নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহাতে নাটকের পুস্তক খুলিতেই ঘৃণা করে।" ডাক্তারবাবু নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে একই প্রকার মন্তব্য কবা হোল। এছাড়া দক্ষিণা-চরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত সে-যুগের অতি-বিখ্যাত 'জেলদর্পণ নাটক' ও 'চাকর-দর্পণ নাটক" ঐ পত্রিকায় উল্লিখিত হয়। সম্ভবত আইনের কথা ভেবেই কোন মন্তব্য করা হয় না।[৩] শুধু নাটক নয়, রঙ্গমঞ্চও তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

"রঙ্গভূমি জনসমাজের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; ঘনিষ্ট সাদৃশ্য এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে. এবং আমরা উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভূমির নিকট আমরা কত আদর্শ-চরিত্র সাধুর জন্য ঋণী! * * রঙ্গভূমির আমোদ এতদ্দেশে নতুন প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত হইবেন। এক্ষণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রই নট। এখনকার অধিকাংশ নাটকই কুরুচিকৃত, সেই সমস্ত নাটক পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্যস্ত হইতেছে। নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার; ইহা

একটি বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য, তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য হইতেছে। এক্ষণে অনেক স্ত্রী-স্বাধীনতাপ্রিয় যুবক রঙ্গভূমিতে আপনাদিগের স্ত্রী পাঠাইয়া দেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই আমোদ-প্রিয়; কিন্তু এই আমোদের যত বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, ততই মঙ্গল।"[৫] কিন্তু এই সব সমালোচনা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শন থেকে ব্রাহ্মরা বিরত থাকতেন না। অন্যত্র এ-উদাহরণ আমরা দিয়েছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হয়েছে; এসব নাটকের অভিনয় ঠাকুরপরিবারের নরনারী দেখেন নি, তা নয়। পুরো 'বেঙ্গল থিয়েটার' এক রাতের জন্য ভাড়া করে নেওয়া হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে সেই অভিনয়ের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন।[৬] এছাড়া অপর এক থিয়েটারে অত্যন্ত বালিকা বয়সে 'নল-দময়ন্তী' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন ইন্দিরা দেবী—একথা তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন। এই প্রথা-সিদ্ধ রঙ্গমঞ্চের রীতিনীতি রবীন্দ্রনাটকের উপর বহুকাল প্রভাব বিস্তার করে।

এলিজাবেথীয় রঙ্গমঞ্চ নয়, অষ্টাদশ শতকে গ্যারিক-কেম্বল সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চই বাংলাদেশে আদর্শ হিসাবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে এলে ঠাকুর বাড়িতে প্রথম অভিনয় হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মানময়ী' গীতিনাট্য। এই গীতিনাট্যে রবীন্দ্র-নাথের রচিত একটি গান স্থান পেয়েছে, "মানময়ী যে কার লেখা তা মনে নেই. কিন্তু গানের সুর জ্যোতিকাকার দেওয়া, ইংরেজি রকমের।"[৭] শুধু 'মানময়ী'তে নয়, অশ্রুমতীর গানেও বিদেশী সুর ছিল। অশ্রুমতীর একটি গানের সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু 'ইটালিয়ান ঝিঁঝিটে'। গীতিনাট্য মানময়ী ছিল ইটালীয় অপেরার আদর্শে রচিত, মঞ্চও ছিল বিদেশী অনুকরণজাত।

এরপর ঠাকুর বাড়িতে অভিনীত হয় 'বাল্মীকিপ্রতিভা'—এবার নাট্যকার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, প্রধান ভূমিকাটিও তাঁর। বাড়ির ছাদে পাল টাঙিয়ে মঞ্চ করা হয়েছিল। সাজসজ্জা কেমন হয়েছিল, সে সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখেছেন, "ঠাকুর বাড়িতে মঞ্চসজ্জায় প্রথম দিকে বিলিতী অনুকরণই চলত। রবিকাকার বাল্মীকি সাজে পিঠের দিকে লম্বা জোব্বার মত ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে বিলিতী রাজরাজড়ার mantle-এর আভাস পাওয়া যায়।"[৮]

সত্যেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বাল্মীকিপ্রতিভার পুনরভিনয়ে হ. চ. হ. (রবীন্দ্র-সহপাঠী হরিশচন্দ্র হালদার) ষ্টেজ সাজাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। "কোত্থেকে

দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌঞ্চমিথুন হল। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সিন আঁকলেন কচু বনে বন্য বরাহ লুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা বরাহ কি ছাগল ঠিক বোঝা যায় না। আর বাগান থেকে বটের ডাল-পালা এনে লাগিয়ে দিলেন।"[৯] অর্থাৎ মঞ্চ বাস্তবের প্রতিরূপা হবে, এই ছিল লক্ষ্য।

অলীকবাবুর অভিনয়কালে মঞ্চসজ্জার ইতিহাসও একই রূপ। "রয়েল থিয়েটারের সাহেবপেণ্টারকে বলে বলে পছন্দ-মাফিক সিন আঁকালুম।"[১০]

রাজা ও রাণী অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট এঁকেছিলেন হ. চ. হ.। সেগুলি ছিল অতি নিকৃষ্ট বিলিতী অনুকরণে আঁকা। "বাস্তবের যথাসাধ্য অনুকরণ করাই ছিল তখনকার আদর্শ।"[১১] বাস্তবের অনুকবণের জন্য 'কালমৃগয়া' অভিনয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর পোষা হরিণকে মঞ্চে ছেড়ে দিয়েছিলেন। একবার 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হচ্ছে, দীনু বাবু ঘোড়া নিয়ে স্টেজে ঢুকলেন। "যতদূর রিয়ালিষ্টিক করা যায় তার চূড়ান্ত হয়েছিল।"[১২] বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনয়েও সেই বাস্তবতার অনুকরণ। "ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ি সোজা এসে ঢুকল স্টেজে। টং টং করে আফিশ ফেরত অবিনাশবাবু নামলেন এসে। ব্যাপার দেখে অডিয়েন্স একেবারে অবাক!"[১৩]

এই অভিনয়রীতি, এই মঞ্চসজ্জা বহুদিন যাবত চলল। সঙ্গীত-সমাজের যুগেও একই মঞ্চসজ্জা অনুসৃত হয়। সঙ্গীত-সমাজ কর্তৃক গোড়ায় গলদ, বিসর্জন, অলীকবাবু ও বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। সঙ্গীত-সমাজের অভিনয়াদির সঙ্গে ১২৯৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে "অভিনয়াদির নতুন একটা আদর্শ রবীন্দ্রনাথ বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রবর্তিত করিলেন।"[১৪] রঘুপতির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসিত হয়। 'অলীকবাবু' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন। প্রিয়নাথ সেন লিখেছেন, "এমন সুন্দর অভিনয় কখনও দেখি নাই। নিজে রবিবাবু অলীকপ্রকাশ সাজিয়া ছিলেন। যাঁহারা রবিবাবুর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে কবিবর শুধু আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের শিরোমণি নহেন, নটচূড়ামণিও বটে।"[১৫]

অভিনয়-রীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করলেন, তা এই যুগের নাট্য-চর্চার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। "তাঁহার মত যে অভিনয়ে কিছু তেজস্বিতা বরং

ওভার-একটিং ভালো, তাহাতে অভিনেতার আত্মাভিমানজনিত সংকোচ যে অভ্যাস দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং দর্শকের প্রাণস্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সামাজিক জীবন যাত্রার ফলে স্বাভাবিক প্রবণতা আণ্ডার-একটিং-এর দিকে।"[১৫ক] প্রথমবার বিলাত-প্রবাসে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের নানা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেছেন। Savoy Theatre-এ গেছেন, Drury Lane-এ গেছেন, Lyceum Theatre-এও গেছেন। লাইসিয়াম থিয়েটারে তখন দুই বিখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী অভিনয় করতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "Lyceum Theatre-এ যাওয়া গেল। Bride of Lammermoor অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। কী সুন্দর Scene! অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্রভাবের Concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terry খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving-এর অভিনয়ও খুব ভালো—কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গী! কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়—সেই আশ্চর্য!"[১৬] ১২৯৮ সালে রচিত এই ডায়ারীর অভিমত পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছিল। কুড়ি বৎসর পরে তিনি লিখেছেন, "রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যা সাক্ষীর সেই গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এসম্বন্ধে চূড়ান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অফ ল্যামারমুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি কখনো দেখি নাই।"[১৭] তবে কি রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে খগেন্দ্রনাথ যে মন্তব্য উৎকলিত করেছেন, তা প্রক্ষিপ্ত? আদৌ তা নয়। দুটি মন্তব্যই একই রবীন্দ্রনাথের, তবে দুই যুগের রবীন্দ্রনাথের।

"আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।"[১৮]

পথের সঞ্চয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন কলকাতা মহানগরী থেকে কবিজীবনের কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তখন শান্তিনিকেতনের আশ্রমপর্ব শুরু হয়েছে। পরিবেশ পৃথক্, নাটক পৃথক্, অভিনেতৃগোষ্ঠী পৃথক্, অতএব অভিনয়রীতিও পৃথক্ হয়ে উঠল।

১৮৮০ সাল থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নাট্যমঞ্চ ছিল প্রথানুগত নাট্যমঞ্চ; রবীন্দ্রনাথের নাটকও তখন তার নিজস্ব বিশিষ্ট পথ খুঁজে নিতে পারে নি।

কাব্যের ক্ষেত্রে বিহারীলালের প্রভাব বা বাংলা কাব্যের এযাবৎ-প্রচলিত রচনারীতি পরিহার করতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি; কিন্তু নাটকে সময় বেশ লেগেছে। তার কারণ নাটক শুধু ফলিত শিল্পকলা নয়, মিশ্র ও যৌথ কলা। নানা বিদ্যার সমন্বিত কলগুঞ্জনে এবং বহু গুণীর সমবেত করাঘাতে তার হৃদয়-কবাট উন্মোচিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যুগন্ধর প্রতিভা; কিন্তু যুগের ধারককেও অনুকূল পবনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়।

সৃষ্টির আদি মুহূর্ত: ১৮৭৮—১৮৮৮

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কবি দেশে ফিরে এলেন, ইতিপূর্বে কবি-কাহিনী প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিলাতে বসবাসকালে 'ভগ্নহৃদয়' রচনা শুরু করেছেন। এমন কি জাহাজে থাকাকালেও কয়েকটি পর্ব রচনা করেছেন।

'হিন্দুমেলায় উপহার' বা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতাদ্বয়ে তাঁর নিজস্ব পথ ফুটে ওঠে নি। কিন্তু 'কবিকাহিনী' কাব্য একটু পৃথক্।

'ভগ্নহৃদয়' যদিও নাটকের আকারে লেখা, কিন্তু কবি এই রচনাটিকে গীতি-কাব্য বলেই অভিহিত করেছেন। "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই। বর্তমান কাব্যটি ফুলের মালা ইহাতে কেবল ফুলগুলি মাত্র সংগ্রহ করা হইয়াছে।" ভগ্নহৃদয় আখ্যানকাব্য; প্রকৃতির প্রতিশোধের সঙ্গে ভগ্নহৃদয়ের মিল আছে। আঙ্গিকগত সাদৃশ্য বেশি আছে—সেই স্থান ও কালের উল্লেখ সর্গের সূচনায়, সেই সংলাপ ও গানের সমমূল্য দান। এমন কি সংলাপের দুইটি ভাগও আছে—স্বগত ও প্রকাশ্য।

গীতিধর্মিতাই এই কাব্যের প্রাণ। অবশ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'ও তার থেকে বঞ্চিত নয়। তবে এই গীতিকাব্যের সংলাপের চরিত্র একটু পৃথক্; ভবিষ্যতে নাট্য-বনিয়াদ রচনার কাজে ততটা সহযোগিতা করবে না। শুধু 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় তার কিছু কিছু প্রতিধ্বনি থাকবে। ভগ্নহৃদয়ের সংলাপ 'পলাশীর যুদ্ধে'র সংলাপের মত; অর্থাৎ তা হোল আখ্যানকাব্যের সংলাপ।

চারু। তোর সাজ ফুরাইবে কবে?
লীলা। সখি, আবার কিসের সাজ!
সুরুচি। দেখ, এসেছে হইয়া সাঁজ।
নলিনী। দেখলো সুরুচি, লীলা ভাল কোরে
বাঁধিতে পারেনি চুল—
এই দেখ্ দেখা পরায়ে দিয়াছে
অলকে শুকনো ফুল।
বেণী খুলে চুল বেঁধে দে আবার,
কানে দে পরায়ে দুল।
সুরুচি। না লো সখি, দেখ্, আঁধার হতেছে,
দেরি হয়ে যায় ঢের—
চল ত্বরা করে যাই দেখিবারে,
ফুল শয্যা অনিলের।
যামিনী। [হাসিয়া] এসেছে বিনোদ।
লীলা। [হাসিয়া] এসেছে প্রমোদ।
বিলো। [হাসিয়া] এসেছে সেথা অশোক!
মাধবী। [হাসিয়া] এসেছে বিজয়!
ছারু। [চিবুক ধরিয়া]
সুরেশ রয়েছে
পথ চেয়ে তোর তরে।
অলকা। আয় তবে ত্বরা করে।
নলিনী। ভাল সখি, ভাল, চল্ ওরে চল্—
জ্বালাস নে আর মোরে। (২য় সর্গ)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধে' সূর্পণখা এই প্রকার মিল দিয়ে ত্রিপদীতে কথা বলেছিল। রবীন্দ্রনাথ এখনও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করছেন না।

অচিরকালের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারবেন যে, এ ভাষা যতই সহজ ও লৌকিক হোক না কেন, শুধু অপ্রবহমানতার জন্যই নাটকের উপযুক্ত হবে না। কারণ প্রবহমানতা ব্যতীত নাট্যীয় গতি রক্ষা করা কষ্টকর। তার জন্য আর একটি পরীক্ষার সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে হবে। রুদ্রচণ্ড ভগ্নহৃদয়ের সমসাময়িক রচনা।

রুদ্রচণ্ড সম্পূর্ণভাবেই নাট্যরূপ পেয়েছে, এতে অঙ্কবিভাগ নেই; শুধু দৃশ্যবিভাগ আছে; এবং চৌদ্দটি দৃশ্যে গ্রন্থ শেষ। এই নাটকে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত। সে অমিত্রাক্ষর ছন্দ আকারে মাইকেলী, কিন্তু স্বভাবে নাটকের বিষয়বস্তুর মতই বিহারীলালধর্মী। অর্থাৎ এ ছন্দ কোমল ও করুণ, যদিও সেই ছন্দের উপর পুরো নির্ভরতা তখনও দেখা যাচ্ছে না। কারণ দ্বিতীয় দৃশ্যে রুদ্রচণ্ড ও অমিয়ার প্রথম দুইটি সংলাপ ত্রিপদীতে রচিত। নাটকে মাত্র তিনটি গান আছে, এক অর্থে সংলাপগুলিও কোন কোনটি ছদ্মবেশী গান। এ নাটক আদৌ মঞ্চস্থ হয়নি। রুদ্রচণ্ডের কাহিনী কবির শৈশবের লেখা কাব্য 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়'-এর আখ্যানঅংশ থেকে গৃহীত। লেখক এই নাটকে ভবিষ্যত নাট্যভাষা সৃষ্টির পথ কিছুটা মসৃণ করেছেন। চোদ্দ মাত্রার অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙ্গে-ভেঙ্গে নানা জনের মুখে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

দূত। প্রণাম!
রুদ্র। কে তুই?
দূত। আগে কুটীরেতে চল।
একে একে সব কথা করি নিবেদন। (৭ম দৃশ্য)

দূত। শোন, শোন, পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়েছেন।
সকলে। বন্দী?
প্রথম। রাজরাজ মহারাজ বন্দী আজি?
দ্বিতীয়। লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে!
তৃতীয়। ভেঙ্গে ফেল অট্টালিকা।
চতুর্থ। ভস্ম কর গ্রাম।
সকলে। সমভূমি করে ফেল হস্তিনা নগরী। (১১শ দৃশ্য)

এ ভাষা-রীতি সম্পূর্ণভাবে মাইকেল-অনুগত। 'পদ্মাবতী' থেকে সমজাতীয় দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া গেল:

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল ?

কলি। পালিনু, তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে ?

কলি। ॥ এই ঘোর বনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি। (সহাস্য বদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে। (৪/২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাবণবধ নাটক' ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। এই নাটকের একটি সমালোচনা ভারতীতে প্রকাশিত হয়।' কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে, ঐ সমালোচনার লেখক হলেন রবীন্দ্রনাথ। "ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-পরীক্ষাকে গিরিশচন্দ্র সার্থক করে তুলেছেন, এই প্রকার স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে আশা করা স্বাভাবিক নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের কোন রচনায় গিরিশচন্দ্রের কোন অনুবর্তন নেই। তিনি তাঁর বিশিষ্ট অনুভবের দ্বারাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভবিষ্যতের নাটকের ভাষা মাইকেলী ছন্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ; তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যোগ্যতা থাকবে শুধু প্রতিভাবান শিল্পীর।

রুদ্রচণ্ড ও ভগ্নহৃদয় একই বক্তব্যের দ্বৈপায়নী বৃত্তি। "আমার পনেরো-ষোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল। * * অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা পরিণামবহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।" সেই "অপরিণত মনের প্রদোষলোকের আবেগগুলার" প্রকাশ ঘটেছে রুদ্রচণ্ড ও ভগ্নহৃদয়ে। রুদ্রচণ্ড পুরোপুরি নাট্যাকারে লেখা হলেও অভিনীত হয়নি, পূর্বেই বলেছি কবির রচিত প্রথম নাটক হোল 'বাল্মীকি প্রতিভা'। ইতিপূর্বে 'মানময়ী'

অভিনীত হয়েছে। তার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র পক্ষে রঙ্গমঞ্চের আনুকূল্য অর্জন সহজ হয়।

"আইরিশ মেলডীজ্ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিখিলাম, কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না।" না থাকুক ইচ্ছা, সেই অসম্পূর্ণ সাধনা থেকেই আমবা পেলাম 'বাল্মীকিপ্রতিভা'। "দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভাব জন্ম হইল।"

সঙ্গীতকে এখানে নাট্যকার্যে ব্যবহার করা হয়েছে; নাটককে সঙ্গীতের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়নি, যেমন হয়েছিল রুদ্রচণ্ডে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "বাল্মীকি প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতেব একটা নূতন পবীক্ষা; অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহাব স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকিপ্রতিভা তাহা নহে, ইহা সুবে নাটিকা, অর্থাৎ সংগীতই ইহাব মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সংগীতেব মাধুর্য ইহাব অতি অল্পস্থলেই আছে।" এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণসহ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, প্রবন্ধটি হোল 'সঙ্গীত ও ভাব'। ১৯শে এপ্রিল ১৮৮১ সালে কবি হার্বট স্পেন্‌সারের মতের প্রতিধ্বনি করে বল্লেন যে, "বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথা বলার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে।"

বাল্মীকি প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন না হলেও ভাবের অনুগমন করতে গিয়ে তালটাকে খাটো করতে হয়েছে। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কালমৃগয়া নামে আরও একটি গীতিনাট্য এ সময়ে লিখিত হয়। কালমৃগয়ায় দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ বর্ণিত হয়েছে। পবে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাল্মীকিপ্রতিভার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বাল্মীকিপ্রতিভার কাহিনীগ্রন্থনায় বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের ইঙ্গিত ছিল। সবস্বতী যে করুণারূপিণী, এই কল্পনার পিছনে সারদা-মঙ্গলের হাতছানি আছে।

ঠিক বিপরীত রীতিতে আর একখানি গীতিনাট্য রচিত হোল—মায়ার খেলা। "নাট্যের সূত্রে গানের মেলা।" এখানে ঘটনার স্রোতের উপর লেখক নির্ভর করেন নি, নির্ভর করেছেন হৃদয়াবেগের উপর। অর্থাৎ নাটকের মত

দেখতে হলেও আসলে এ হোল গীতিকাব্য। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর প্রয়োজনায় নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এই পর্যায়ে পড়ে।

এই গীতিনাট্য রচনার ফাঁকে রবীন্দ্রনাথ একটি উপন্যাস রচনা করেন, যার মধ্যে তাঁর মানবজীবন সম্পর্কিত মৌল ধারণার একটা সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। ঐ সময়ে বাংলা নাটকে ও উপন্যাসে জাতীয়তার জয়গান চলছিল; তখনই রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে এক ভিন্নমূর্তিতে হাজির করলেন। এবং এই দেশপ্রেমিকের প্রতিপক্ষ হলেন মানবপ্রেমিক বসন্ত রায়। বসন্ত রায় চরিত্রটি ঠাকুরদা ও ধনঞ্জয় বৈরাগীতে এসে পূর্ণতা পেয়েছে।

'রুদ্রচণ্ড' নাটকের ৮ম দৃশ্য থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল—

দ্বিতীয় সেনাপতি। শুনিনু যবনগণ যুঝে প্রাণপণে—
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু সৈন্য যত।
এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে,
নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে।

[গমনোদ্যোগ। অমিয়ার প্রবেশ]

অমিয়া। চাঁদ, চাঁদ,—ভাই মোর—
সৈন্যগণ। কে তুই! দূর হ!
সেনাপতি। সরে দাঁড়া, পথ ছাড়্, চল সৈন্যগণ!
চাঁদকবি। [স্তম্ভিত হইয়া] অমিয়া রে—
সেনাপতি। চাঁদকবি, এই কি সময়!
আমাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত,
ছেলেখেলা পেনু একি পথের ধারেতে?
চল, চল, বাজাও, বাজাও রণভেরী!
চাঁদ। [যাইতে যাইতে] অমিয়া রে, ফিরে এসো—
সেনাপতি। বাজাও দুন্দুভি!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতেই নাটকের কথাবস্তু ক্রমশ দেশপ্রেম থেকে মানবপ্রেমে এসে উপনীত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিকাব্যের কথাবস্তুতে সেই পরিণতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটেছিল। বলা বাহুল্য যে, সেনাপতির বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য নয়। 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' এই বক্তব্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। অন্যত্র একটি সমালোচনায় তিনি বলেছেন—"সকলেই বলিতেছে উঠ

জাগ, বাঙ্গলায়, ইংরাজীতে, গদ্যে-পদ্যে, মিত্রাক্ষরে-অমিত্রাক্ষরে, হাটে-বাটে, নাট্যশালায়-সভায়, ছেলে-মেয়ে, বুড়ো সকলেই বলিতেছে উঠ, জাগ। সকলেই যে অকপট হৃদয়ে বলিতেছে বা কেহই যে বুঝিয়া বলিতেছে তাহা নহে।"[১৯]

মায়ার খেলার আকৃতিটা যাই হোক, তার প্রকৃতিটা নাট্য-সম্ভাবনাযুক্ত। হৃদয়াবেগ তার প্রধান উপকরণ শুধু নয়, দ্বন্দ্বমুখর হৃদয়াবেগ এখানে তাকে চালিত করেছে। মায়ার খেলার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "পূর্ব-বর্ণিত একটি অকিঞ্চিতকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে।" এই অকিঞ্চিতকর গদ্য নাটিকাটি হোল নলিনী। সেই একই প্রকাব হৃদয়-বিনিময়ের উৎকণ্ঠায় ভরা কাহিনী। সেই প্রেম-তৃষ্ণা, প্রেম-নিবেদন, প্রেম-প্রত্যাখ্যান, বা ভুল-বোঝাবুঝি, এবং পরিশেষে মিলন ও হতাশ্বাসে নাটক শেষ। এসব ভঙ্গিই সমসাময়িক সাহিত্যের সাধারণ ব্যাপার। অভিনবত্ব হোল এর সংলাপ। গদ্যের উপর নির্ভরতা এই নাটিকাকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এক কমেডি ছাড়া অন্যবিধ নাটকে এই প্রকার সাদা গদ্য কোনদিন ব্যবহার করেন নি। 'রাজা ও রাণী' বা 'বিসর্জনে' গ্রামবাসী ও জনতার মুখেই কেবল গদ্য বসেছে। 'মুকুট' গদ্যে লেখা, কিন্তু মুকুট খুবই গৌণ রচনা।

পরবর্তী যুগে গদ্যই হবে নাটকের ভাষা, কিন্তু সে গদ্য ভিন্ন চরিত্রের গদ্য। সে যা বলে, তা ত বলতে চায় না। তার বাইরে এক রূপ, অন্তরে আর এক রূপ। কিন্তু 'নলিনী' নাটকে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা নেই।

'নলিনী' নাটকে ঘটনা দৃশ্যভেদে বর্ণিত হয়েছে, উপস্থাপিত হয় নি। অর্থাৎ রুদ্রচণ্ডের মত নাটকের আকারে লেখা হলেও সেখানে কাহিনীকাব্যের প্রকৃতিই প্রকট। নাটকে গানের সংখ্যা বেশি নয়, মাত্র চারিটি।

নীরোদ-নীরজা-নলিনী—এই ত্রিকোণ প্রেমের প্রকাশ রবীন্দ্র উপন্যাসের অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ। নষ্টনীড়, চোখের বালি, নৌকাডুবি, শেষের কবিতা বা ঘরে বাইরে—সর্বত্রই এই ত্রিকোণ প্রেম। কখনও নারীর সংখ্যা দুই, আর পুরুষ এক; আর কখনও নারীর সংখ্যা এক, পুরুষ দুই। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের দেহ ক্ষিপ্রগতিতে চলে। উপন্যাস যাই হোক, রবীন্দ্র-নাটকের পক্ষে এই বিষয়বস্তু তত উপযোগী নয়। তাই কোনদিন এ বিষয়বস্তু আর ফিরে আসবে না।

মায়ার খেলায় রবীন্দ্রপ্রতিভার একটা শক্তিময় রূপ ফুটে উঠেছে, যদিও প্রচলিত অর্থে একে নাটক বলা চলে না। প্রথমত আধুনিক যুগে নাটক

সংলাপ-নির্ভর, দ্বিতীয়ত নাটকের সংঘাত যেমন আন্তরিক তেমনি বাহ্যিক, অর্থাৎ দৃশ্যমান।

আত্মসুখ ও প্রেম যে পরস্পরবিরোধী, তাই কবি বলতে চেয়েছেন,—"এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।" মাইকেলের পদ্মাবতী নাটকের মত এখানেও অলৌকিক জগতের বাসিন্দাদের ভূমিকা আছে। মায়া-কুমারীগণ এক নব বসন্তের রাত্রে ঠিক করল যে, প্রমোদপুরের যুবকযুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করে তারা খেলবে মায়ার খেলা।

নায়কের নাম অমর, সে শান্তাকে ভালবাসে। নামেই শান্তার স্বভাব স্বপ্রকাশ, তার প্রেম শান্ত-সমাহিত, উচ্ছ্বাস-আতিশয্য বর্জিত। তাই অমর শান্তার মনের ভাব বুঝতে অক্ষম হোল; একদিন সে চলে গেল। অমর চলে গেলে মায়াকুমারীগণ গাইল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

শান্তা প্রেমাস্পদকে ধরে রাখল না; তার কথা হোল—

তুমি, সুখ যদি না পাও—যাও, সুখের সন্ধানে যাও,

অমরের সঙ্গে পবে প্রমদার সাক্ষাৎ হবে, সেখানেও ভালবাসা মিলবে না। আবার শান্তার কাছে ফিরে আসবে। শান্তা ও অমরের মিলন-মুহূর্তে প্রমদা এসে হাজির হবে। বিষাদপ্রতিমা প্রমদাকে দেখে অমরের হাত থেকে পুষ্পমালা স্খলিত হয়ে পড়বে। শান্তার ও অন্যান্য সকলের মনে এই ধারণা হবে যে প্রমদাকে অমর ভালবাসে! শান্তা ও তার সঙ্গীগণ প্রমদা ও অমরের মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হোল। কিন্তু প্রমদা তাতে স্বীকৃত হোল না।

আর কেন, আর কেন!
দলিত কুসুমে বহি বসন্ত সমীরণ!
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জলে অকারণ।

প্রমদা সেই মালা ওদের কণ্ঠেই পরিয়ে দিল। শান্তার কাছে অমর স্বীকার করল যে, মায়ার চক্রে প'ড়ে সে শান্তার সুখ শান্তি নষ্ট করেছে। এখন শান্তার কাছে প্রস্তাব করবার তার কোন সাহস নেই। শান্তা তখন বলল, তোমার দুঃখ আমি সহ্য করব, তোমার হৃদয়ভার বইবার জন্য আমি আমার হৃদয়মন সব বিসর্জন দেব।

অমর ও শান্তার মিলন সুসম্পন্ন হোল; ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হোল প্রমদা। শূন্য হৃদয় নিয়ে সে কেঁদে চলে গেল। তখন মায়াকুমারীগণ গাইল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না।
শুধু সুখ চলে যায়—এমনি মায়ার ছলনা।

'মায়ার খেলায়' আবেগের যে তীব্রতা আছে, 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', এবং 'মানসী' কাব্যের অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে কেবল তার তুলনা চলে। এই গীতি-নাট্যখানি যেন প্রমদার মতই বলছে, "তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।" এর মধ্যে নাটকের সঞ্চরণশীলতা আছে, বিস্ময় এবং চমকও আছে; কিন্তু নেই নাট্যশাস্ত্রের কোন বিধানের প্রতি আনুগত্য। ভাববিশেষকে অবলম্বন করে 'মানসী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতা সাজালে হয়ত একটা 'পালা' হতে পারে, কিন্তু নাটক হয় না। বৈষ্ণবদের লীলাকীর্তনে এই প্রকার ভাবভিত্তিক পদের সমাহারে এক একটি পালা তৈরী করা হয়। কিন্তু তা কীর্তন, নাটক নয়। এখানে অবশ্য কুশীলবগণ প্রত্যক্ষ দেহধারণ করে মর্তে অবতীর্ণ হচ্ছে; নাটকের অনেকখানি বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করেই হাজির হচ্ছে। তবে সংলাপনির্ভর নয় বলেই মায়ার খেলা কি নাটক হতে পারে নি?

বাল্মীকিপ্রতিভা ছিল পাঁচটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ; এই গীতি-নাট্য সাতটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। রচনারীতির দিক থেকে 'মায়ার খেলা'র সঙ্গে 'ভগ্নহৃদয়ে'র সাদৃশ্য বেশি। 'রাজা ও রাণী'র সঙ্গে নয়, নাটকের সঙ্গে নয়। 'রাজা ও রানী' বক্তব্যের দিক থেকে 'মায়ার খেলা'রই পূর্ণতর রূপ। 'রাজা ও রাণী' নাটক 'মানসী'র মেজাজে লেখা।

এই যুগের নাট্যরচনায় বিশিষ্ট রীতির সর্বশেষ প্রকাশ ঘটে 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' (১৮৮৯)। বোম্বাই ও কারোয়ারে বসে কবি এই নাটক রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই নাটকটির বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে—এই মূল্যবিচারে নাটকের বক্তব্য মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে কিনা। নাটকের শেষ বিচার হচ্ছে তার নাটকত্বে। প্রকৃতির প্রতিশোধের মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। এবিষয়ে 'জীবনস্মৃতি'র ব্যাখ্যা উৎকলিত করা গেল।

"এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো

যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমাকে মধ্যেও সীমা নাই।

আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।"

এখানে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'কে নাটক বলে পরিচয় দেন নি। অথচ বহু বৎসর পরে রচনাবলীর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়! এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত। সন্ন্যাসীর যা অন্তরের কথা তা প্রকাশ হয়েছে কবিতায়। সে তার একলার কথা। এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা। এই বৈপরীত্যকে নাট্যিক বলা যেতে পারে।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' মায়ার খেলা বা নলিনী অপেক্ষা দীর্ঘতর রচনা, ষোলটি দৃশ্য আছে। রুদ্রচণ্ডে ছিল চোদ্দটি দৃশ্য, আর কাব্যের আকারে লেখা 'ভগ্নহৃদয়ে' ছিল চৌত্রিশটি সর্গ।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে সন্ন্যাসীকে একাকী দেখতে পাই—

আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।

সন্ন্যাসীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে—

যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ
পেয়েছি পেয়েছি সেই আনন্দ-আভাস।

একদা বাসনার বহ্নিময় কশাঘাতে আহত হয়ে তিনি পথে পথে পাগলের মত ছুটেছিলেন। আজ তিনি তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর বড় গর্ব যে, তাঁর হৃদয় আজ মরুভূমি।

তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কংকাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই সন্ন্যাসী রাজপথে চলেছেন, পর্বতের গুহা ত্যাগ করে লোকালয়ে এসেছেন। নাটকের সংঘাত এখান থেকেই শুরু হবে। শহর, রাজধানী, রাজধানীর অধিবাসীদের দেখে তাঁর মনে ঘৃণা জন্মাল।

চারিদিকে ছোটো ছোটো গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নবপিপীলিকা।

এ যেন সিদ্ধার্থের জ্ঞানচক্ষু ফোটাবার নানা আয়োজন। প্রথম দৃশ্যে ছিল ব্যক্তিবিশেষের আত্মমুখীনতা, আত্মভাববিভোরতা। এখানে এল বহির্বিশ্বের সতত সঞ্চরমান কলকোলাহল। এই দুই বিপরীত ভাববস্তুর পারস্পরিক সংঘাত নিশ্চয়ই যে কোন নাট্য-বিষয়ের অন্তর্গত হতে পারে। প্রথম দৃশ্যে দীর্ঘ স্বগত-উক্তিতে গীতি-কবিতার মূর্ছনা আছে, কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই রচনার চরিত্র বদলাতে শুরু করল।

রুদ্রচণ্ড, ভগ্নহৃদয, মায়ার খেলা—কোনটিতেই ব্যক্তিভাবনার বাইরে যে বৃহত্তর জগতের অস্তিত্ব আছে, সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা নেই। কবি নিজেই এই যুগকে 'হৃদয়ারণ্যের যুগ' বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথই হতে হবে।

নাটকের পাত্রপাত্রীর পরিচয় থেকে নাটকের চরিত্র অনুমান করা যায়। ভগ্নহৃদযে কযেকটি প্রণয়েচ্ছু যুবকযুবতী ও তাদের সঙ্গীগণ ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। রুদ্রচণ্ডের অবস্থা তার থেকে আদৌ উন্নত নয, দুই-একবার দূত. সৌনক ও নাগরিকদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতকার হয়েছে। কিন্তু তারা সবাই রাজকার্যে সহায়তা করতে ব্যস্ত, বৃহত্তর দুনিযার কোন খবর সঙ্গে করে আনতে সাহস পায নি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' বৃহত্তর জনসমাজকে আমন্ত্রন জানান হোল। তাই মুক্তির লগ্ন আসন্ন।

সবাই যে দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্ন্যাসীর উক্তিকে বা তাঁর নঞর্থক জীবনবোধকে পদেপদে অস্বীকার করার জন্য উদ্‌গ্রীব, তা নয়। অথচ সবাই অস্বীকার করে বসেছে। পথ দিয়ে চলেছে কৃষকেরা। তারা মনের আনন্দে গেয়ে চলেছে,

হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।

শ্যামকে নিয়ে গোঠে যেতে দিতে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু তারা স্নেহ-শ্যাম-স্নিগ্ধ যে চিত্রটি পরিবেশন করল, তা তো সন্ন্যাসীর সমস্ত সাধনাকে অস্বীকার করে।

তারপর বালকপুত্র সমেত একটি স্ত্রীলোক এল, পথে দেখা হোল এক যজমান-গৃহ-অভিমুখী ব্রাহ্মণের সঙ্গে, এবং আরও দুই-একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। তারা অনেক রঙ্গরসের কথা বলল। সেই কথাগুলি ওজন করলে আদৌ ভারী হবে না। কিন্তু জীবনের কথা হবে।

এল তারপর আরো কতকগুলি পথিক। কত রাগারাগি, হাসি-তামাসা এবং বিনা কারণে শিশুপুত্রকে ধরে প্রহার পর্যন্ত হোল। এতই তুচ্ছ দৃশ্য !

তারপর এলেন দুজন ব্রাহ্মণবটু; তাঁরা শাস্ত্র নিয়ে নয়, শাস্ত্র মেনে তর্ক করে চলে গেলেন। কিন্তু সত্যের কাছেও পৌঁছালেন না।

একদল মালিনী প্রবেশ করল, তারা গান গাইল এবং হাসিমস্করাও করল। সবার শেষে এল ভিখারী। সে ভিক্ষার গান করল। সেই সময়ে মন্ত্রীর পুত্র বাদ্য বাজিয়ে চতুর্দোলায় চড়ে সেই পথ দিয়ে চলে গেল। এসব দৃশ্য দেখে কবির মনে কি কোন জিজ্ঞাসার উদয় হোল না ?

সকাল হইতে আছি, কী দেখিনু দেখা ?
এ দীর্ঘ পরাণ মোর সংকুচিত করে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার ?

তৃতীয় দৃশ্যে নাটক তার প্রতিদ্বন্দ্বী জীবনধর্ম পেল ; চলমান জগৎ-সংসার আমরা দেখেছি। নির্বিশেষকে নয়, চাই বিশেষকে। তৃতীয় দৃশ্যে এই বিশেষ একটি বালিকার রূপ ধরে এল। এই রকম অনাথা বালিকা রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় তার সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাতকার, বিসর্জন পর্যন্ত তাকে সঙ্গে করে তিনি নিয়ে যাবেন। এ বালিকা অনাচারী রঘুর কন্যা। জনৈকা বৃদ্ধা তাকে দেখে আদর করতে গেলে পথের মানুষ ওকে স্পর্শ করতে বারণ করল। বৃদ্ধার কন্যা এসে বৃদ্ধাকে ডেকে নিয়ে গেল। বালিকা সন্ন্যাসীর কাছে গেল ; তাকে বলল, 'আমি তব কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে।' সন্ন্যাসী বলল, 'তুমি না ত্যেজিলে মোরে, আমি ত্যেজিব না।'

তারপর চতুর্থ দৃশ্য থেকে শুরু করে দশম দৃশ্য পর্যন্ত সেই বালিকাকে কেন্দ্র করে সন্ন্যাসীর অন্তরলোকে কত তরঙ্গবিক্ষোভ। একদিন বিদায় জানাতে এসে জনৈক পথিকের আচরণে সন্ন্যাসীর পুরাতন বিশ্বাসে ধাক্কা পড়ল।

যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
এই দেখো দূরে ওই গৃহটি তোমার--
চারিদিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জ্যোছনাতে কথা কহিয়াছি।

সন্ন্যাসী বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাইলেন। তিনি পালালেন, অনাথা বালিকাকে পরিত্যাগ করে পালালেন। কিন্তু একদিন সেই বালিকা তাঁর খোঁজ পেল। তাঁর পায়ে পড়ে বলল, 'আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়।' সন্ন্যাসী বালিকাটিকে সঙ্গে নিয়ে গুহায় ফিরলেন; কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব গেল না। একদিন আবার তিনি গুহা থেকে পলাতক হলেন।

সে রাত্রে দারুণ ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ন্যাসী বালিকার কথা ভাবছেন, মাঝে মাঝে, আর আত্মজিজ্ঞাসায় জর্জরিত হচ্ছেন, "এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে।" কিন্তু ভোর হতেও আর দেবি নেই!

পরদিন প্রভাতে তিনি অরণ্যের গর্ভ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন, যেমনি বেগে একদিন তিনি বালিকার কাছ থেকে ছুটে পালিয়েছিলেন। সম্ভবত তার থেকেও বেগে।

যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত।

[ছুঁড়িয়া ফেলিয়া]

দূর করো, ভেঙে ফেলো দণ্ড কমণ্ডলু।

আজ হতে আমি আব নহি রে সন্ন্যাসী!

কিন্তু বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। ববীন্দ্র-নাটকের অধিকাংশ নায়কেরই জীবনে এই প্রকার ভুল হয়—বিক্রমদেবের হয়েছিল, রঘুপতিরও হয়েছিল। তবে রঘুপতির ভুলের অর্থ আলাদা।

সেদিনটি ছিল উৎসবের দিন। রাজপুত্রের বিয়ে। বাজার বাড়ি নহবৎ বাজছে, কিন্তু লোক তাতেও খুশি নয়। "ভাই আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজালে আমোদ হয় না।" পথে লোকারণ্য!

সন্ন্যাসী কন্যার খোঁজে বলেছেন—

জগতের মুখে আজি এ কী হাস্য হেরি!

আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য ঘেবি।

আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,

আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখির গলায়,

আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

সন্ন্যাসী ধুলায় পতিত বালিকাকে দেখে তাকে কোলে তুলে নিতে ছুটলেন, কিন্তু তাঁর নয়নের আনন্দ, হৃদয়ের ধন, স্নেহের প্রতিমা অনাদরে ইতিপূর্বেই মরজগৎ ত্যাগ কবেছে।

কী করিলি রে—

হায়, হায়! এ কী নিদারুণ প্রতিশোধ!

ঠিক এই প্রকার মর্মন্তুদ আর্তনাদ আর একটি চরিত্র একদিন করেছিল,

হায় ধর্ম, একী সুকঠোর দণ্ড তব!

(কর্ণকুন্তী সংবাদ)।

"শূন্যতার মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে হয়েছে রূপ নিয়ে সার্থক; সেইখানেই যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

সন্ন্যাসী পরম বেদনার মধ্য দিয়ে সত্যবোধ অর্জন করলেন। বেদনার পথই কি তবে মুক্তির একমাত্র পথ? অস্পষ্ট হলেও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র রচনারীতিতে নাট্যীয় প্রকৃতি ধরা পড়েছিল। 'রুদ্রচণ্ড' ও 'নলিনী' গ্রন্থ দুখানি নাটক হবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু ঐ গুলির উপর কাহিনীকাব্যের চাপ শেষ পর্যন্তও প্রবল থেকে গেছে।

কেবল সন্ন্যাসীর আত্মবিড়ম্বনাকে সম্বল করলে এ নাটক কিছুতেই রুদ্রচণ্ডের থেকে উন্নততর রচনা হোত না। "এই আত্মকেন্দ্রিত বৈরাগীকে ঘিরে প্রাত্যহিক সংসার নানা রূপে নানা কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে।" নাটক এইখানেই জন্ম দিয়েছে—আত্মভুবনের সঙ্গে বিশ্বভুবনের লড়াই-এ।

নাটকে বহির্জগৎ এমন প্রত্যক্ষবৎ এসেছে যে এতাবৎ-লিখিত রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার কোন নজির নেই। লোক এসেছে নানা ধরণের—চাষী, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, যজন-যাজনরত ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক দল, ব্রাহ্মণ-বটু, নাগরিক, মালিনী, ভিখারী। নাগরিকরাই বা কত জাতের, আর স্ত্রীলোকের স্বভাববৈচিত্র্যও কম নয়!

গানগুলিতে লৌকিক ভাবঅনুষঙ্গ স্থান পেয়েছে। দুইটি ব্যতীত বৃন্দাবন-লীলার প্রতিধ্বনি সব কয়টি গানে আছে।

সংলাপে ব্যক্তি-উচিত বাক্যবিন্যাস লক্ষ্য করবার মত। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির সংলাপে সাধু ভাষার আশ্রয় রয়েছে; তার জন্য হয়ত বঙ্কিম-আদর্শ দায়ী। নাটকে সাধুভাষার স্থান নেই। কিন্তু কেবল ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ সম্বল করার জন্য কোন ভাষা কথ্যভাষার মর্যাদা পেতে পারে না। এখানকার গদ্যসংলাপে মুখের বুলির প্রাণশক্তি সম্পূর্ণভাবে চুইয়ে আনা হয়েছে।

স্ত্রীলোক। (ব্রাহ্মণ পথিকের প্রতি) হাঁ-গা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কমনে চলেছ?

ব্রাহ্মণ। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাতনি। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আসতে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্ছ গা ?

স্ত্রীলোক। আমি ঠাকুরের পূজো দিতে যাব। ঘর কন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিনসে আবার রাগ করবে। পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেশপড়া করব তার জো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে একবার পায়ের ধুলো পড়ে না।

ব্রাহ্মণ। আর ভাই, বুড়োসুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস কী জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চালকডাই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রীলোক। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আর এক স্ত্রীলোক। এই-যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড়ো মাগ্‌গি হয়েছ।

ব্রাহ্মণ। মাগ্‌গি আর হলেম কই। সকালবেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচজনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া করেছিস। তবু তো আমার সেকাল নেই।

প্রথমা। আমি যাই ভাই, ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। তা এস।

প্রথমা। (পুনর্বার ফিরিয়া) হাঁালো, অনঙ্গ তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা শুনেছিলাম, সে কি সত্যি !

দ্বিতীয়া। সে ভাই বেস্তর কথা। [সকলের চুপি চুপি কথোপকথন]

সংলাপ-ব্যবহারের এই বিশিষ্ট রীতি এখান থেকে সোজা 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জনে'র একাংশে গিয়ে আস্তানা গাড়বে। পরে 'শারদোৎসব' থেকে তার মধ্যে অন্ত ইসারা ছলছলিয়ে উঠবে।

'রাজা ও রাণী'-পরবর্তী নাটকসমূহের সংলাপের অপরাংশও এই নাটকে অধিকতর পুষ্টিলাভ করেছে। রুদ্রচণ্ডে সর্বপ্রথম সমিল প্রবহমান পয়ার ব্যবহৃত হয়। তবে তখনও সেখানে তার নাট্যোপযোগিতা তত ফুটে ওঠে নি ; গীতিকাব্যের ধাঁচই সেখানে রক্ষা পেয়েছে। তার কারণ ঐ নাটকের সংলাপ স্বগতউক্তিপ্রধান এবং দীর্ঘদেহী। নাটকের ভাষা হবে তির্যক এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক। স্বগত-উক্তিতে, এমনকি দীর্ঘ উক্তিতে অপরের জবাবের প্রত্যাশা বড় থাকে না, আত্মভাবের বিলসনই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। প্রকৃতির

প্রতিশোধ প্রথম দুইটি দৃশ্যে এবং শেষ দৃশ্যে সন্ন্যাসীর উক্তি সম্পূর্ণই আত্মকথন-মূলক ; কিন্তু অন্যত্র তার মধ্যে নাট্যসংলাপের স্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই।

বালিকা। আমি, প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—
সন্ন্যাসী। আমারো তো কেহ নাই।
দেব নর সকলেরি দিয়েছি তাড়ায়ে।
বালিকা। তোমার কি মাতা নাই?
সন্ন্যাসী। নাই।
বালিকা। পিতা নাই?
সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।
বালিকা। সখা কেহ নাই?
সন্ন্যাসী। কেহ নাই।
বালিকা। আমি তব কাছে রব, ত্যেজিবে না মোরে?
সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যেজিলে মোরে আমি ত্যেজিব না। (তৃতীয় দৃশ্য)

নাটকের সংলাপ কোন পথে যাবে, অন্তত যাওয়া শ্রেয়, তা রবীন্দ্রনাথ এখানে নির্ধারিত করে দিলেন। চৌদ্দমাত্রিক পয়ারকে কেটে-ছেঁটে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিলে সে যে মানুষের মনের ভাব মুখের ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারে, এই তার দৃষ্টান্ত। নিছক পয়ারের ব্যবহারও অনেক আছে—সেটা হোল কাহিনীকাব্যের জের।

প্রকৃতির প্রতিশোধের কথাবস্তু নিঃসন্দেহে নাটকের উপযুক্ত ; সম্ভবত নাটক কোন্ রীতিতে লেখা হবে, রবীন্দ্রনাথ তখনও এবিষয়ে মনস্থির করতে পারেন নি। পূর্বে যা লিখেছেন, তার মধ্যে কিছু হোল নাটক নামধেয় কাহিনীকাব্য, আর কিছু ছিল গীতিকাব্য। এই দুইটি খাত রবীন্দ্রনাথ সযত্নে পরিহার করেছেন, এবং নতুন খাত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু চাইলেই ত সব কাজ সম্পন্ন হয় না। ভগ্নহৃদয়-রুদ্রচণ্ড নাটক দুটির মত বহু দৃশ্য (সর্গ নয়) এখানে অবতারিত হওয়ায় নাট্য গ্রন্থনা শিথিল হয়েছে। বহু বৎসর পরে এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি দৃশ্যসংখ্যা হ্রাস করেছিলেন। প্রথম দৃশ্য অপরিবর্তিত রয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে ষষ্ঠ দৃশ্যের ঘটনাগুলি একটি দৃশ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। অষ্টম নবম ও দশম দৃশ্য সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। এই কারণে সপ্তম, একাদশ ও ত্রয়োদশ দৃশ্য সম্মিলিত হয়ে তৃতীয় দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। ১৪, ১৫ ও ১৬শ দৃশ্য

মিলে চতুর্থ দৃশ্য তৈরী হয়েছে। ষোলটি দৃশ্যের নাটক এইভাবে চারটি দৃশ্যে শেষ হয়েছে। সংহতির এই অভাব বাংলা সংস্করণেও সংশোধন করা যেত—কবি সেদিকে দৃষ্টি দেন নি।

রবীন্দ্রনাথের হাতে ট্রাজেডিও একটু ভিন্নভাবনায় ভাবিত—গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় কোনটির সঙ্গেই তাঁর সহমর্মিতা নেই। প্রকৃতির প্রতিশোধে নাটকের উপসংহার হয়েছে বিচ্ছেদে ; মৃত্যু এবং তজ্জনিত মূঢ় আর্তনাদে নাটকের যবনিকা পাত হয়েচে। রাজা ও রাণীতেও একই প্রকার হাহাকার। এই দুই নাটকেই আঘাত দিয়ে নায়ককে জাগানো হয়েছে। অবশেষে বিসর্জনে এসে তার ক্ষতিপূরণ হবে, সংশোধন হবে—

> পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল—জননী আমার
> এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
> জননী অমৃতময়ী!

প্রকৃতির প্রতিশোধ তার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডিচিন্তার একটি স্তরের সন্ধান দিচ্ছে। এর পর থাকল আর একটি মাত্র ধাপ বাকি।

যে বৈচিত্র্য এবং সরসতা জনতার দৃশ্যে ফুটেছে, রীতি হিসাবে ভবিষ্যতের নাটকেও তা হবে প্রধান অবলম্বন। সর্বশেষে এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনা পথে ঘটেছে এবং জনতার মধ্যে ঘটেছে। গুহান্বিত জীবন শুধু সন্ন্যাসীর পক্ষে বিড়ম্বনাজনক নয়। রবীন্দ্রনাটকের পক্ষেও কি কম বিড়ম্বনাপূর্ণ?

রবীন্দ্রনাথের নাটকের অধিকাংশ ঘটনা ঘটবে পথে, এবং জনতার মধ্যে। তাই একদিন রবীন্দ্রনাটক হবে জনতার নাটক। কিন্তু বাংলার নাট্যবোধ (ঠাকুরবাড়িরও অংশত) তখন পর্যন্ত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় মঞ্চ-আদর্শ অনুগত। সাজান মঞ্চের নাটক পথকে একমাত্র বিচরণক্ষেত্র বলে গ্রহণ করতে পারে না। 'রাজা ও রাণী'তে, 'বিসর্জনে' পথ ও জনতার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নির্দিষ্ট থাকলেও তারা সর্বেসর্বা হয় নি। পথ এখানে গৌণ, জনতার ভূমিকাও গৌণ। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধে' রবীন্দ্রনাটকের বিশিষ্ট ভাববস্তু ও রচনারীতি ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রথার প্রভাব তখনও প্রবল। তাই পরবর্তী নাট্যরচনায় নির্দেশিত পথও অবলম্বিত হয় নি। ১৮৮৮ থেকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রনাটকে রয়েছে প্রথা-আনুগত্য। শারদোৎসবে এসে পুরানো বা হারান পথ আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং তখন থেকে রবীন্দ্র-নাটক রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট নাটক হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় পর্ব

১৮৮৯ থেকে ১৯০৭—এই আঠার বৎসর হোল রবীন্দ্রনাটকের একটা ঐশ্বর্যময় যুগ। এই পর্বে লিখিত নাটকগুলি ঠাকুরবাড়ির মঞ্চে যেমন সমাদৃত, তেমনি সে-যুগের কলকাতার শ্রেষ্ঠ সৌখীন নাট্যকে দল সঙ্গীতসমাজে এবং পেশাদারী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হয়েছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে নটপরিচালক কেদারনাথ চৌধুরী অভিনয় করান। ১৯০১ সালে ৬ই এপ্রিল মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ঐ নাটক পুনরভিনীত হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে রাজা ও রাণী প্রকাশিত হয়; এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বির্জিতলার গৃহে তা মঞ্চস্থ হয়। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থে এই অভিনয়ের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। ১৮৮৯ সালে ৩০শে নভেম্বর এই নাটক এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়।

পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হয়; কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই নাটক সে-কালে অভিনীত হয়নি। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্য ১৮৯২ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়।

সঙ্গীতসমাজে রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটক অভিনীত হয়েছে; রবীন্দ্র জীবনীকারের মতে "এই সঙ্গীতসমাজের যুবক বন্ধুদের উৎসাহে অভিনয়ের জন্য তিনি 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন লিখিলেন।"

ছত্রিশ বৎসর পরে ১৩০৫ রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের একটি নতুন সংস্করণ তৈরী করেন; নতুন সংস্করণের নামও হোল নতুন—'শেষ রক্ষা'।

'রাজা ও রাণী' মানসী-পর্বের রচনা; এবং 'মায়ার খেলা'র অব্যবহিত পরবর্তী রচনা। এই নাটকের বুকের মধ্যে তাই ঐ দুটি রচনার নানাপ্রকার অস্বস্তি বেজেছে।

'রাজা ও রাণী'তে দেখা দিল সেই বহির্গমনের আর একটি ধাপ। "জীবন এখন আর ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে।" 'রাজা ও রাণী' পাঁচ অঙ্ক ও একত্রিশটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। কাহিনীর সূত্র ইতিহাস নয়, তবে ঐতিহাসিক যুগে কাহিনীকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব বিবাহ করেছেন কাশ্মীরের রাজকন্যা সুমিত্রা দেবীকে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর প্রেম আতিশয্যে ভারাক্রান্ত; ফলে রাজকার্যে তাঁর প্রবল অমনোযোগিতা। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেও কর্ণপাত করেন না; হিতৈষী

বন্ধুদের উপদেশ হেসে উড়িয়ে দেন। এদিকে কাশ্মীরের বহু অধিবাসী জালন্ধরে এসে রাজ সরকারে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে; তাদের শোষনে প্রজাকুল অনাহারে দিন যাপন করছে। স্বয়ং রাণী প্রজাদের পক্ষ হয়ে রাজার কাছে অনুযোগ উত্থাপন করলেন। তার জবাবে বিক্রমদেব জানালেন—

—রাজা রাণী! কে রাজা? কে রাণী?
নহি আমি রাজা। শূন্য সিংহাসন কাঁদে।
জীর্ণ রাজকার্য রাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে।

রাণী তার উত্তরে জানালেন—

শুনিয়া লজ্জায় মরি। ছি ছি মহারাজ,
একি ভালবাসা? এযে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব। শোনো প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজ,
তুমি স্বামী, আমি শুধু অনুগত ছায়া,
তার বেশি নই। আমারে দিয়ো না লাজ
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে। (১।৩)

"সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি যোগাতে পারে না; তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।" আদর্শ স্বামীর একটি চিত্র সুমিত্রা উপহার দিয়েছেন—

তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন, কিছু মুক্ত কিছু বা জড়িত
সহস্র পাখির গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

রাজপ্রাসাদে এই উক্তিটি বর্ষিত হলেও স্বামীস্ত্রীর মঙ্গলময় আদর্শ হিসাবে এই চিত্রটির রোম্যানটিকতা অবিস্মরণীয়।

রাণীর আবেদন রাজার কাছে কোন প্রত্যুত্তর পেল না। রাজসুহৃদ দেবদত্তের কাছ থেকে রাণী সুমিত্রা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানলেন; আরও জানলেন যে তাঁরই আত্মীয়বর্গ প্রজাশোষণে অগ্রণী।

তখন রাণী মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঐসব অমাত্যবর্গকে কালভৈরবের পূজোৎসবে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। সেদিন তাদের বিচার হবে। ত্রিবেদী ঠাকুর গেলেন দূত হয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে। নাটকের প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। এবং শোনা গেল তাঁরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এসব শুনে বিক্রমদেব দেবদত্তের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেন ; তাঁর বক্তব্য

যোগাসনে লীন যোগীবর,
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয় ?
স্বপ্ন এ সংসার। অর্ধশত বর্ষ পরে
আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে রবে ? (২।৩)

রাণী পুরুষের ছদ্মবেশে জালন্ধর ত্যাগ করলেন।

এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে নাকি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ়তলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয় ? (২।৪)

এ উক্তি কি শুধু বিক্রমদেবের, না সমগ্র পুরুষজাতির ?

ছদ্মবেশিণী রাণী এসে পিতৃগৃহে আশ্রয় নিলেন, সেখানে পিতৃব্য চন্দ্রসেন রাজ্যশাসন করছেন। তবে ভ্রাতা কুমার সেনের রাজ্যাভিষেক আসন্নপ্রায়। বিক্রমদেবের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত হোল দুর্দান্ত প্রতিহিংসায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠল বিশ্বঘাতী।

সুমিত্রা কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেছেন ; বন্দী করেছেন যুধাজিৎ আর জয়সেনকে, বন্দীদের নিয়ে চললেন বিক্রমদেবের কাছে। কিন্তু রাজা রাণীর সঙ্গে দেখা করলেন না। বরং বিদ্রোহীদের কুপরামর্শে কাশ্মীর অভিমুখে রাজা দ্রুত ধাবিত হলেন। পাছে দেবদত্ত সৎ পরামর্শ দেন, তাই তাঁর সঙ্গেও দেখা করলেন না। যুধাজিৎ দেবদত্তকে বন্দী করে রাখলেন।

কাশ্মীরেও একটি চক্রান্ত গড়ে উঠছে। চন্দ্রসেন তাঁর পত্নী কর্তৃক বারবার প্ররোচিত হচ্ছেন কুমারসেনকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য। শুধু তাই নয়। জালন্ধরের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতেও তিনি অস্বীকার করছেন।

কুমারসেনকে অমরুরাজ আজ প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁর কন্যা ইলা ছিল রাজকুমারের বাগদত্তা ; আজ তাঁর দুর্গতির দিনে তিনি পরিষ্কার জানালেন,

তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহিনে হইতে
অপরাধী জালন্ধররাজ কাছে।

এমন কি ইলার সঙ্গে সাক্ষাতকারেরও অনুমতি জুটল না। ওদিকে ইলার পক্ষে আর কী করণীয় থাকতে পারে, একান্তে অশ্রুবিসর্জন ব্যতীত!

বিক্রমদেব তাঁর বিপুল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন—একে একে সামন্ত রাজগণ তাঁকে নানা উপঢৌকন দিচ্ছে। অমরুরাজ তাঁর যা কিছু আছে, তা জালন্ধরপতির হাতে সমর্পণ করলেন। এমন কি ইলাকে পর্যন্ত। বিক্রমদেবের আজ ক্ষুধার শেষ নেই ; ইলা তাঁর কাছে মার্জনা চাইল। কিন্তু রাজা তাকে কামনা করলেন। ইলা কাতর কণ্ঠে তখন বলল,

লহো তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও বুকে তার তীক্ষ্ণতীর বিঁধে।

রাজা তাকে কুমারের আশা ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন।

কিন্তু সেই ক্ষীণশরীরা বালিকা বলল,

জেনো এই অতিক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।

বরং অভিযোগ, স্পষ্ট অভিযোগ করল :

তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা? বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে? তবে পথ বলে দাও
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী।

এ শুধু অভিযোগ নয়, এ হোল ভর্ৎসনা, প্রবল ভর্ৎসনা সর্বযুগের প্রতাপশালী স্বৈরশাসকের প্রতি।

যা শক্তিমান্ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দিতে পারেন নি, যে-বেদনা জাগাতে পারেন নি, তাই দিল ইলা, তাই জাগিয়ে দিল ভীরু অমরুরাজের দুঃসাহসিকা দুর্বল বালিকা।

শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?

ভুলের সংশোধনে রাজা দ্রুত অগ্রসর হলেন।

প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই।

এবং স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "দেবী, চাহি নে তোমার প্রেম।" তার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করে বললেন যে, তাঁর প্রয়াস হবে কুমারসেন ও ইলার মধ্যকার বাঞ্ছিত মিলন দ্রুত সম্পন্ন করা। কারণ, "এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।" এদিকে দেবদত্ত সেই সময়ে রাজার সঙ্গে এসে মিলিত হলেন, তিনি কোনক্রমে বন্দী দশা থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছেন। রাজা তাঁর কাছে ভবিষ্যত কর্মসূচী ব্যক্ত করলেন ; এবং স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন—

বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণপবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর। নিয়ে তার সব সুখভার।

সম্ভবত আশা এত উঁচুতে উঠেছিল বলেই প্রতিঘাতটা তীব্র আকারে আসবে। কুমারসেন আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ; এবং সুমিত্রা তার দূতী হবেন। কুমারসেন আজ আত্মসমর্পণ করছেন। তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য সমগ্র রাজধানী সুসজ্জিত ; সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে। এমন সময় এল শিবিকা ; সেই শিবিকা থেকে বেরিয়ে এলেন সুমিত্রা, হাতে তাঁর এক স্বর্ণ থালি আর সেই থালিতে কুমারের ছিন্নমুণ্ড।

আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ।

সুমিত্রা ইলা ও শংকর সেই সভাকক্ষে মূর্ছিত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। বেঁচে থাকলেন একা বিক্রমদেব। বিক্রমদেব রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে প্রথম শক্তিমান পুরুষ ; বিসর্জনের রঘুপতি, 'রক্তকরবী'র রাজার পূর্বপুরুষ। এঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত।

দেবী যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জনাও করিলে না? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে? ইহজন্মে

নিত্য অশ্রুজলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারও দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মতো তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

'রাজা ও রাণী' সেক্সপীয়রীয় রীতির নাটক ; সেক্সপীয়রীয় রীতির নাটকে মুখ্য কাহিনীর পাশাপাশি হাঁটে একটি স্পষ্ট গৌণ কাহিনী। এই নাটকেও হেঁটেছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন যে, এই নাটকে গৌণ কাহিনী একটু বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে। "লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে, ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসংগত।"

সে-যুগের কোন সমালোচকই কুমার সেন-ইলার প্রসঙ্গ নাটকের পক্ষে অসংগত বলে মনে করেন নি। সাহিত্য পত্রিকায় 'রাজা ও রাণী' নাটকের একাধিক সমালোচনা প্রকাশিত হয় ; সেগুলির কোথাও প্লটের বাঁধুনি সম্বন্ধে কোন বিরূপতা প্রকাশ পায় নি। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ১২৯৮ সালে বৈশাখ সংখ্যায় 'মানসী ও রাজা ও রাণী' শীর্ষক প্রবন্ধে সুমিত্রার অশ্বারোহণ ও ছিন্নমুণ্ড নিয়ে রাজসভায় প্রবেশের সমর্থনে যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। তিনি এ বিষয়ে ধাত্রীপান্নার দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বল্লেন যে, "সুমিত্রা শাঁখাশাড়ী পরিহিতা বাঙ্গালিনী নহেন।"

১৩১০ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যা ইলার প্রতি বিক্রমদেবের প্রণয়নিবেদন নিন্দিত হয় ; নিত্যকৃষ্ণ বসু বললেন যে, এই আচরণ 'ইতর জনোচিত'। ১৩১১ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় নিত্যকৃষ্ণ বসু তাঁর 'সাহিত্য সেবকের ডায়ারি'তে 'রাজা ও রাণী'র দ্বিতীয় সংস্করণের সংশোধন সমর্থন করতে অক্ষম হন। তাঁর মতে "উন্নতির স্থলে অধোগতিই লক্ষ্য করিলাম।"

১৮৯৯ সালে প্রয়াস পত্রিকার জুলাই আগষ্ট সংখ্যায় শৈলেন্দ্রনাথ সরকার 'রাজা ও রাণী' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন ; তিনিও উপকাহিনীর যৌক্তিকতা খারিজ করে দেন নি। সমসাময়িক যুগ আপত্তি তোলেনি, আপত্তি তুলল পরবর্তী যুগ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধ পরবর্তীযুগে বদলে গিয়েছিল ; নাট্যবস্তু, নাট্যগঠনরীতি ও নাট্যমঞ্চায়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর একান্ত নিজস্ব ধারণা এই সময়ে স্পষ্ট আকার ধারণ করে।

১৩৩৬ সালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে 'রাজা ও রাণী' নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গেলে যা ঘটা উচিত, তাই ঘটেছে। "বিষয়টা ছিল আমার নূতন নাটক

রচনা। রাজা ও রাণী রূপান্তরীকরণ। সেই নাম রইল ; সেই রূপ রইল না।"[২০] রূপান্তরিত নাটকের ভূমিকায় তিনি কুমার-ইলার বৃত্তান্তের অপ্রাসঙ্গিকতা আবার উল্লেখ করেছেন। অথচ সেক্সপীয়রের নাটকে এই প্রকার দুটো কাহিনীর যুগপৎ অবতারণায় নাট্যচরিত্রের বিকাশে কোন বিপত্তি ঘটায় না।

নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নতুন বোধের উপকূলে এসে গেছেন। তাঁর আপত্তিটা যদি শুধু গৌণ কাহিনী সম্বন্ধে হোত, তাহলে বোঝা যেত। কিন্তু পদ্য-সংলাপের বিরুদ্ধেও তিনি কথা বলেছেন। "প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়াছন্দে ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তা যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের। কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য, পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি।"[২১]

শুধু কি গদ্য সম্বন্ধেই আপত্তি? নাটকের অভিনয়রীতি নিয়ে কি প্রশ্ন ওঠে নি?

"পুরানো নাটককে নতুন করে যখন লেখা গেল তখন পুরাতনের মোহ কাটিয়ে তার নতুন পরিচয়কে পাকা করতে গেলে অভিনয় করে দেখানো দরকার। সেই চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এই উপলক্ষে নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলা আবশ্যক।

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ওই কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা, রেখাচিত্রকর তুলি হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাংক-ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন তাহলে কবির প্রতিও যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্বই কবির পক্ষে যথেষ্ট ; বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত, এবং অনেক স্থলে স্পর্দ্ধা।" (ভূমিকা—তপতী)

অথচ 'রাজা ও রাণী'র প্রায়-সমসাময়িক রচনা 'পঞ্চভূত' (১৮৯৩ সালে ঐ গ্রন্থের সূচনা) ; ঐ গ্রন্থে লিখছেন, "নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্তমান থাকে। সঙ্গীত, আলোক, দৃশ্যপট,

সুন্দর সাজসজ্জা, সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাব মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্তি ধারণ করিয়া নানা কার্য-রূপে প্রবাহিত হইয়া চলে – আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয় স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সংগীত সাহিত্য চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সম্মিলিত হয়—বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।"[২২]

হাঁ, দুইটি রচনা একই ব্যক্তির। সমর্থন ও প্রতিবাদ একই ব্যক্তি করেছেন। পরভূমি থেকে আত্মভূমিতে তিনি চলে আসছেন।

নাটক রচনার উপযোগী ভাষা 'রাজা ও বাণী' নাটকে প্রথম ফুটে উঠল। নাটকের শব্দবৈচিত্র্য অভিনব, ছন্দের দোলায় শব্দ নানান্ আলো করেছে বিকীরণ। অনুপ্রাস, শ্লেষ, ঠিক শ্লেষ নয়, ইংরাজী 'pun'-এর ছড়াছড়ি।

১. অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টংকারমাত্র। (১।১)

২ রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলাসবোবরে
বসন্তপবনে। (১।১)

৩. তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব। (১।২)

৪. অরাজক কে বলিবে ? সহস্ররাজক। (৩।৪)

৫. ব্যস্ত তিনি প্রজা-সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে, আছে শুধু অস্থি আর চর্ম। (১।৪)

৬. তাঁব দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন। (৪।৪)

শুধু শব্দ নয়, অলঙ্কারের সমারোহ চোখে পড়বার মত—

১. ঐশ্বর্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা। (২।২)

২. মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্য-পানে
কে পারে তাকাতে ? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে মর্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দিনের দিনপতি-পানে,
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো। (২।৪)

৩. দক্ষিণে চাহিয়া দেখো—অস্ত রবিকরে
স্বর্ণসমুদ্রসম সমতল ভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে।
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণচিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণসমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটেনি। যেন আকাঙ্ক্ষা আমারই
শৈল-অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি। (৩।২)

এ যেন মানসী-সোনার তরী কাব্যদ্বয়ের স্ফুটতর ভাষার 'ছায়াস্ফুট ছবি'! এবং এ যে 'স্বর্ণলেখা', তাও তর্কাতীত। কাব্য ও নাটক একে অপরের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার করেছে।

এই শব্দের খেলা, অলঙ্কারের ঝকমকির অন্তরালে কোন একটি স্থির বাকপ্রতিমার স্থান নেই। রাজা ও রাণী তাই হঠাৎ জেগে-ওঠা ক্ষমতাবান ব্যক্তির লেখনী-বিস্ময়।

গানগুলি এ-নাটকের সম্পদ। ইলাকে বিক্রমদেব বলেছিলেন—

ধুয়ে দাও প্রেমময়ী, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্ত কলুষিত।

রক্তকলুষিত হস্তদ্বয় ধুয়ে ফেলবার পক্ষে এই গানগুলিই যথেষ্ট। সবগুলি গানই ইলা গেয়েছেন. তা নয়। কিছু কিছু কাশ্মীরবাসীরাও গেয়েছে। জালন্ধর হোল আক্রমণকারী। আক্রমণকারীর মুখে গান মানায় না। ইলাদের হাতের রক্ত ধুতে হলে আক্রান্তদের ডাক পড়ে। 'রাজা ও রাণী'র গান সেই রক্ত-ধোয়ার গান। নাটকের সংলাপের সে বিকল্প নয়। সংলাপের সে সহচরী।

তবে রাজা ও রাণী'র গান ব্যবহারে থিয়েটারী ভাবও আছে। বিসর্জনে এসে তার সংশোধন। রাজা ও রাণীর গান কখনও কখনও সংলাপের অলংকরণ।

রাজা ও রাণীর প্লটে যে-আকস্মিকতা ও যে-চমৎকারিত্ব আছে, তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা থাকতে পারে, কিন্তু তার অনিবার্যতা অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ প্রথা-সিদ্ধ নাটক এটি। তুলনা করুন বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্বাধিক খ্যাত 'পাণ্ডবগৌরব' বা 'জনা' নাটকের সঙ্গে। এই দুইটি নাটক পদে পদে তাদের নাট্য-প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করে দর্শক-রুচিকে প্রণতি জানিয়েছে। আদর্শবাদের বা ভক্তিবাদের উপর ভর করে আলোচ্য নাটক লতিয়ে ওঠে নি। এ নাটক স্বয়ংভর। তাকে বিষয়ই তার দাঁড়াবার ভূমি দিয়েছে। বাংলা নাটক এই প্রথম সাবালক হোল, একথা বলছি না। কিন্তু আমরা বলব মাইকেলের মৃত্যুর এক যুগ পরে বাংলা নাটক আত্মস্থ হোল। "রাজা ও রাণী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক" -ঐতিহাসিকের এবংবিধ মূল্যায়নে আমাদের সায় নেই, ইতিহাসও সঙ্কোচ বোধ করতে পারে।

এ-নাটক অতীত যুগের কুশীলব নিয়ে লেখা, তখন রাজা-রাণী, পাত্র-মিত্র সেনাপতি ও মন্ত্রীর উপস্থিতি একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। এই প্রকার কাল্পনিক অতীত-আশ্রয়ী নাটকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালের কথা ভুলে যান নি, বিশেষ করে সমসাময়িক প্রসঙ্গও তিনি নাটকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ভারতবর্ষের শাসনভার যাদের উপর ন্যস্ত, সেই আমলাতন্ত্র ছিল পুরোপুরি বিদেশী। গদ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে এই রাজনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। এই নাটকে তারই শিল্পরূপের প্রকাশ। "একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়ত অত্যন্ত প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায় তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক-না কেন, তলে তলে ব্যাপার খানা বড়ো কম হয় না।

যদি সপ্তম এডওয়ার্ড যথার্থই আমাদের দিল্লীর সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কী করিয়া।

আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে 'আমার রাজ্য' বলিয়া জানে। এরাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্বতা ঘটিতে গেলেই এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোন আইনকর্তা এ সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।"[২৩]

সুমিত্রা। কী বলিলে
রাজা কি নির্দয় তবে? দেশ অরাজক?
দেবদত্ত। অরাজক কে বলিবে? সহস্ররাজক।
সুমিত্রা। রাজকার্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি?
দেবদত্ত। দৃষ্টি নাই? সে কী কথা! বিলক্ষণ আছে।
গৃহপতি নিদ্রাগত, তা বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই? সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কী দোষ? এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?
সুমিত্রা। বিদেশী! কে তারা? তবে আমার আত্মীয়?
দেবদত্ত। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস, মামা কালনেমি। (১।৪)

সমগ্র অংশটিই উৎকলিত করা যেত, কিন্তু প্রয়োজন নেই। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যে সমসাময়িকতা কতখানি আছে, তা এতেই অনুমান করা যাবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে সুমিত্রার কাহিনী রূপকধর্মী রচনা নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রসঙ্গটি নাটকে তুলে ধরেছেন, অতীত যুগের খ্যাতনামা নাট্যকার মনোমোহন বসুও তাঁর হরিশ্চন্দ্র নাটকে সেই প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু ঐ নাটকে তা মিশ্ খায় নি; আর এখানে নাটকের দেহের সঙ্গে তা অভিন্ন হয়ে গেছে।

ঠিক এক বৎসর পরেই 'বিসর্জন' প্রকাশিত হোল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাবস্তু এবং ভিন্ন রসপ্রেরণা নিয়ে। 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক উত্যক্ত নাটক, উত্যক্ত করেছেন কবি স্বয়ং।

বারবার কবি এ নাটকের দেহ পরিমার্জনা করেছেন। তবু কি শেষ পর্যন্ত তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন? রাজর্ষি উপন্যাস থেকে এই নাটকের আখ্যান-অংশ গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে জানতেন নাটক আর উপন্যাস এক জাতের

সাহিত্য নয়। উপন্যাসে থাকে বিস্তার, নাটকে সংহতি; উপন্যাসে চাই বিচিত্রতা, নাটকে একমুখীনতা; উপন্যাস মন্থর, নাটক ত্বরিতচরণা। উপমা দিয়ে বলা যায়, উপন্যাস প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীব, (তাই তাকে এ যুগের মহাকাব্য বলা হয়), আর নাটক ঐতিহাসিক যুগের উচ্চৈঃশ্রবা, যদিও নাটক প্রাচীনতর। উপন্যাসকে নাটকের কাঠামোতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্র অনেকের উপন্যাসই নাট্য রূপান্তরিত করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'ও নাট্যরূপান্তরিত করেছিলেন। ১৩১১ সালে কার্ত্তিক মাসে সাহিত্য পত্রিকায় বলা হোল, "চোখের বালিতে নাটকত্ব কোথায় তাহা আমরা বলিতে পারি না।" সাহিত্য পত্রিকার রবীন্দ্র-বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত ঘটনা; কিন্তু বাস্তবিকই 'চোখের বালি'র সমগ্র কাহিনী নিয়ে যে নাটক গড়ে উঠতে পারে না, একথাও সত্য। পরবর্তীকালে নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় 'গোরা'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। দর্শক সেদিন নাটক দেখেনি, উপন্যাসকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন নি। ঐ উপন্যাসের মধ্যে যতটুকু নাট্য-উপযোগী কথাবস্তু আছে, তার তিনি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। উপন্যাসের প্রথম ১৮টি পরিচ্ছেদ তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করেছেন; নক্ষত্র রায়ের বিদ্রোহ-কাহিনীর জন্য উপন্যাসের ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭শ পরিচ্ছেদের অংশ বিশেষ গ্রহণ করেছেন। রঘুপতি কর্তৃক কালীপ্রতিমা বিসর্জন ঘটনাটির জন্য নাট্যকারকে ৪০শ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল। এ ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য অংশের সঙ্গে নাটকের কোন যোগ নেই। উপন্যাসের সুজা-প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছে।

রাজর্ষি উপন্যাসের গল্পবিন্যাস নিয়েই কবির আপত্তি প্রকাশ পেয়েছে, "আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ। কিন্তু মাসিক পত্রের পেটুক দাবী সাহিত্যের শেষ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না। ব্যঞ্জনের পদ সংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হোল।" এ হোল পরবর্তী যুগের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিশ্লেষণ। সে-যুগে তিনি অন্য প্রকার ভাবতেন। কারণ বৌঠাকুরাণী হাটের গল্প-বিন্যাসরীতির সঙ্গে 'রাজর্ষি'র গল্প-বিন্যাসরীতির কোন গরমিল নেই।

নাটকে সংহতি আবশ্যক; তাই তিনি গল্পের যে অংশগুলিকে একই সূত্রে গাঁথা যায়, সেইটুকুই কেবল ছিনিয়ে এনেছেন। প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র

শক্তিপূজার বিরোধ নাটকের একমাত্র বর্ণনীয় বিষয় হয়েছে। এবং এই একটি ভাব-বস্তুকে ফুটিয়ে তোলার জন্য ঘটনা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, বহু চরিত্র পরিত্যক্ত হয়েছে; বিল্বন নেই, হাসি নেই, কেদারেশ্বর নেই, তাদের পরিবর্তে এসেছে চাঁদ পাল, নয়ন রায়, গুণবতী ও অপর্ণা।

চরিত্রগত পরিবর্তন ছাড়া ঘটনাগত পরিবর্তন কম নয়। নাটকের সংহতি অনেক সময় স্থানগত ও কালগত কারণে প্রযোজিত হয়। উপন্যাসে ঘটনা ঘটেছে নানা স্থানে, কারণ এক সময়ে ঘটনা নির্বাসিত রঘুপতিকে অনুসরণ করেছিল। নাটকে এসে সেই ঘটনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। কালগত সঙ্কীর্ণতাও লক্ষ্য করবার। নাটকের প্রয়োজনেই রঘুপতিকে দীর্ঘকালের জন্য নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়নি। নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেও রঘুপতি স্থান ত্যাগ করেননি; শ্রাবণের শেষ দুইদিন স্ব স্থানে থাকবার জন্য তিনি সময় চেয়ে নিয়েছেন। এই দুদিন খুবই সংক্ষিপ্ত সময়, কিন্তু নাটকের গুরুতর ঘটনাগুলি তখনই ঘটে গেছে। নাটকে সময়ের মাপ দীর্ঘতায় নয়, তার গভীরতায়।

রাজর্ষি উপন্যাসের কিছু কিছু সংলাপও নাট্যকার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে নাট্যায়িত করেছেন, অর্থাৎ সেগুলির মধ্যে এনেছেন চমক এবং ঘনত্ব। একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

রাজর্ষি

রাজা বলিলেন, "এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়ের মাথার চুল পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল।

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি একি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, 'না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।'

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্ত পান করিয়া আসিতেছেন কী করিয়া?"

রাজা কহিলেন, 'না পান করেন নাই। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।' (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

বিসর্জন

গোবিন্দ মাণিক্য। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নক্ষত্র রায়। বলি নিষেধ ?

মন্ত্রী। নিষেধ ?

নক্ষত্র রায়। তাই তো! বলি নিষেধ!

রঘুপতি। একি স্বপ্নে শুনি ?

গোবিন্দ মাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্তি ধরে
স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন
সহিল কী করে ? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি!

গোবিন্দ মাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন। (১।২)

ছন্দের উপর ভর করেছে বলে শেষোক্ত ভাষা নাট্যগুণান্বিত হয়েছে, এমন কথা বলব না ; এ ভাষার চরিত্রই পৃথক্ ; যেহেতু ভাষা স্পষ্টতর ও লক্ষ্যমুখী হয়েছে। এবং পেয়েছে গতি। রাজর্ষির ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য ছিল না। এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য নাটকের পক্ষে অপরিহার্য। এখানেও ক্রিয়া পদের সাধুত্ব ঘুচিয়ে দেওয়া হয় নি ; তবু এই ভাষা যে কথ্যভাষা, এ বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। বিসর্জন যে 'রাজর্ষি'র পরিবর্তিত সংস্করণ, একথা নাট্যকারও ভোলেন নি, আমরাও ভুলিনি। অথচ নাটক বুঝবার পক্ষে এ সংবাদ অত্যাবশ্যক নয়, বরং অসুবিধারই সৃষ্টি করেছে—পাঠকের পক্ষে যেমন, নাট্যকারের পক্ষেও তেমনি। তাই নাট্যকারকে এই নাটকের বহু পরিমার্জনা করতে হয়েছে, বহু চরিত্র এক সংস্করণে বাতিল করতে হয়েছে, অন্য সংস্করণে তাদের পুনর্জীবিত করতে হয়েছে ; নতুন চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। ভাষার পুনর্মার্জনা নয়, শুধু ঘটনার ভারসাম্য রক্ষার জন্যই লেখককে ব্যাকুলিত থাকতে হয়েছে। এর জন্য আর কিছু দায়ী নয়, দায়ী উপন্যাসের সঙ্গে তার যোগ।

রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য, ও জয়সিংহ—তিনটি চরিত্রই প্রথম থেকে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে এসেছে। কাজেই তাদের তৈরি করার প্রশ্ন লেখককে চিন্তিত করেনি ; গুণবতীও প্রথম সংস্করণেই দেখা দিয়েছেন, অপর্ণাও দেখা দিয়েছেন প্রথম সংস্করণে। তাঁরাও কোন সমস্যা নন।

সমস্যা হোল চরিত্রসকলকে যে প্লট ধরে রাখবে, সেই আধারের গঠন সম্পূর্ণতা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে 'রাজা ও রাণী'র শিথিলতা (তার কতটা কল্পিত, তা প্রশ্নসাপেক্ষ) অপেক্ষাও অধিকতর শৈথিল্যের সম্মুখীন হয়েছেন।

গোবিন্দমাণিক্য উপন্যাসের নায়ক ছিলেন ; কিন্তু নাটকের নায়ক নন। নাটকের নায়ক রঘুপতি। সেই কঠোর শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এক পাশে জয়সিংহ আর এক পাশে আছেন দেবী ত্রিপুরেশ্বরী। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরীর পরাজয়, হোল। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের এমন শক্তি ছিল না, যাতে এই ব্রাহ্মণের দর্পকে শাসন করতে পারেন ; নির্বাসনদণ্ডে তার দর্পের নির্বাসন হবে না। তাকে সত্যকার নির্বাসিত করেছে জয়সিংহ, রঘুপতিকে রঘুপতির কাছ থেকে। তার শাস্ত্রাচার, তার দম্ভ, তার নিষ্ঠুরতা ও তার বিবেকশূন্যতা থেকে! দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর জন্য তিনি গোবিন্দমাণিক্যকে অস্বীকার করেছেন ; জয়সিংহের জন্যই তিনি অপর্ণাকে স্বীকার করেছেন। ত্রিপুরেশ্বরী নন, জীবন্ত অপর্ণা তাঁর অবলম্বনীয় হোল।

> পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল—জননী আমার
> এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
> জননী অমৃতময়ী।

এই জননী পূর্বেও 'অমৃতময়ী' ছিলেন ; কিন্তু রঘুপতির চোখে তিনি ছিলেন 'মায়াবিনী', 'উপদেবী'। কি করে এই পরিবর্তন এল ? জয়সিংহ তাঁর জীবন বলি দিয়ে এই পরিবর্তন এনেছেন। রঘুপতি নিষ্ঠুর, রঘুপতি কুচক্রী ; কিন্তু রঘুপতি এক জায়গায় দুর্বল ছিলেন—বালিকাকে তিনি দূর করে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু জয়সিংহের সামান্য অভিমানে-অসন্তোষে কাতর হন তিনি।

> প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
> অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই। (২।৪)

জয়সিংহের প্রীতিলাভের জন্য তাঁর মধ্যে একটি কাঙাল বেঁচে ছিল।

> জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন
> এত যে সাধনা করি নানা ছলে-বলে। (২।৪)

খুবই সংকীর্ণ স্থান ; তবু সেই বুকের মধ্যে এই প্রীতিরস ছিল।

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

বিক্রমদেবের সঙ্গে রঘুপতির কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু আত্মবিবর্তনের জন্ম রঘুপতি একটি সুযোগ পেয়েছিলেন, বিক্রমদেব সে সুযোগ পান নি। বিবর্তনের শেষ ধাপে তিনি পদার্পণ করতে পারেন নি। সুমিত্রার মৃত্যুতেও নয়।

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের রাবণচরিত্রকে শ্রদ্ধা করতে পারেন নি ; তখন তাঁর কাছে শক্তির মূর্তিমান প্রকাশ ছিল প্রতাপাদিত্য মাত্র। পরিণত বয়সে সেই রাবণ তাঁর শ্রদ্ধা পেল, কারণ তখন তিনি বুঝতে পারলেন 'শক্তিমান মানুষ মানবমাহাত্ম্যের আর এক প্রকাশ'। সর্ব খর্বতারে যিনি দগ্ধ করেন, তিনিই যে ভৈরব!

রাবণচরিত্রের দিগন্তপ্রসারী বিকাশ রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু মাইকেলের ব্যাখ্যাকেই তিনি চূড়ান্ত বলে মেনে নেননি। বিক্রমদেবের মত পরিণতিহীন হাহাকারে এই জাতের চরিত্রের শেষ অংক ঘোষিত হতে পারে না। এই মহাচরিত্রের বিকার বা অসম্পূর্ণতার মধ্যে আত্মার ক্রন্দন ধ্বনিত হচ্ছে। এই কান্না থেকেই রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' চরিত্রের ধ্যান শুরু। যেখানে শুধু ছিল আর্তনাদ, রবীন্দ্রনাথ সেখানে এনেছেন বিশ্বাসের স্থিতি। খণ্ডিতকে করেছেন অনন্তের সঙ্গে যুক্ত।

রাজা ও রাণীর সুমিত্রাই ত এখানে অপর্ণা, কিন্তু বিক্রমদেবের কাছে সে অপ্রাপণীয়া। অথচ তাকে পাবার জন্যই মানুষের কত না সাধনা! জয়সিংহ পেল না, অথচ পেয়েছে। বিক্রমদেব পায় নি, পেল রঘুপতি।

বিসর্জনের যে এত পাঠভেদ, তার কারণ এই বিশেষ কথাটিই রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলতে চান। 'রাজা ও রাণী'তে অংশ বিশেষ বাতিল করা হচ্ছে, সে-ও ঐ একই কারণে। কিন্তু প্রবীণ অবয়বে নবীন ধর্ম প্রতিবিম্বিত হয় না।

পাঁচ অঙ্ক ও তেইশটি দৃশ্যে এই নাটক শেষ। ছোট ছোট বহু দৃশ্য, ঘটনার মুহুর্মুহু পট-পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজিত। নাটকের প্লটের জটিলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিসর্জন লেখা শেষ করে তিনি নাটক লেখাকে 'চৌঘুড়ি চালান' বলে মন্তব্য করেছিলেন—অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুড়ে এক রাস্তা দিয়ে এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া (ছিন্ন-পত্রাবলী-৫৯ পত্র সংখ্যা)। গান আছে বহু ; তবে 'রাজা ও রাণী'র গান-

ব্যবহাররীতি থেকে এখানে পার্থক্য আছে। ইলা সেখানে মুখ্য গায়িকা; সে শুধু আনমনে গেয়েছে। কিন্তু অপর্ণার গান একার গান নয়, অপরকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করার গান। তাই সে গান প্রায় সংলাপের মতন; কোথাও এঁকে-বেঁকে কোথাও ভেঙ্গে-ভেঙ্গে এগিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে, গান নাটকের গতিকে বিঘ্নিত করে; এখানে গান গতিকে গতিশীল করেছে আরও। অর্থাৎ এখানে সংলাপের বিরোধী নয়, শুধু সহযোগীও নয়, একেবারে সোদর। অপর্ণা ১ম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে এবং ২য় অঙ্ক ২য় দৃশ্যে যে দুইটি গান গেয়েছে, দুইটি গানই পৃথক্ জাতীয়, নিঃসন্দেহে অধিকতর নাট্যলক্ষণাক্রান্ত। মনে পড়ে, একই আঙ্গিকে ব্রাউনিং তাঁর 'Pippa Passes'-এ গান ব্যবহার করেছিলেন। সংলাপে দীর্ঘ উক্তি আছে, স্বগত-উক্তিও আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত তির্যক উক্তিরও অভাব নেই।

গুণবতী। গুরুদেব বধিয়ো না
মোরে। সত্য করে বলো আরবার। দেবী
নাই।

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই?

রঘুপতি। নাই।

গুণবতী। দেবী নাই তবে কি রয়েছে?

রঘুপতি। কেহ নাই। কিছু নাই।

এ সংলাপ নাটকীয়তায় অধিক। আদালতের সওয়াল এর থেকে অধিক তির্যক হয় না।

দীর্ঘ দীর্ঘ উক্তিও এই জাতীয় নাটকে থাকা স্বাভাবিক। কারণ রঘুপতি ও জয়সিংহ উভয়েই আত্মজিজ্ঞাসায় কাতর। সেই আত্মজিজ্ঞাসা স্বগত-উক্তি ব্যতীত পরিস্ফুট হতে পারে না। উপন্যাস হলে সে দায়িত্ব ঔপন্যাসিকের উপর ন্যস্ত করা যেত। নাটকে নাট্যকার সর্বদা অনুপস্থিত। নাটকের ঘটনাস্রোত এই স্বগত-উক্তির উপলখণ্ডে বাধাগ্রস্ত হয়নি। বরং তাতে ধাক্কা খেয়ে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

পূর্ব-উদ্ধৃত অংশটির মাথায় আছে রঘুপতির একাকী ভাষণ; তার সেই দীর্ঘ বয়ানের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটাকাটা প্রশ্নোত্তরসঙ্কুল সংলাপের তরঙ্গগুলি। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গেই এই বিচিত্র সংলাপ-বয়নরীতি প্রবর্তন করেছেন।

এ নাটকে গদ্য ও পদ্য-সংলাপ প্রায় সমান সমান, কিন্তু দুই গোষ্ঠীর মুখে দুই জাতের ভাষা এসেছে। অভিজাত দল পদ্যে কথা বলেছেন, অনভিজাত গদ্যে। পরে একদিন গদ্য তাব বর্ণগৌরব অর্জন করবে। কিন্তু সে দিনও রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের পদ্য-অংশকে বিপর্যস্ত করবেন না, কারণ তিনি জানতেন গদ্য-পদ্যের সহাবস্থানে বিসর্জন নাটকের দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষবৎ হচ্ছে।

'রাজা ও বাণী' অপেক্ষাও এ নাটকের সংলাপে অলংকার-প্রয়োগরীতি ভিন্ন প্রকার। উন্নততর হয়েছে শুধু নয়. ভিন্ন ব্যঞ্জনাধর্মী হয়েছে। এখানে অলংকার অলংকার নয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রতীক।

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি। কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবমন্দিবের।

সোপান অতিক্রম কবেই আমরা 'দেবতা'কে দেখতে পেলাম। পুরোহিত রঘুপতিব অবসানে পিতা রঘুপতিকে। তাই রঘুপতি প্রসঙ্গে এই উৎপ্রেক্ষা রঘুপতির যথার্থ প্রতীক।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের লেখনী থেকে আরও দুইটি নাটক নির্গত হয়েছে। দুইটিই আনন্দের বাঁশিতে ধ্বনি তুলেছে। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'গোড়ায় গলদ' যৌবনের জয়গাথা। একটি সর্বনাশের ভাষায় লেখা, আর একটি সামাজিক ভাষায় লেখা।

চিত্রাঙ্গদা যে আখ্যান-কাব্যের চত্বর ত্যাগ কবে নাটকের মন্দিরে প্রবেশ কবেছে, সেটা তার হঠকারিতা। তার মধ্যে নাটকীয়তা নেই, তা নয়, কিন্তু কবি নাট্যকারকে উৎখাত কবেছেন। যে দ্বন্দ্ব রূপ ও অরূপের মধ্যে নিয়ত ঘটছে, ষড়ঋতু যে বিচিত্র উপাচাব নিত্য আমাদের ইন্দ্রিয়েব গম্যতায় ধরে দেয়, তাই ত চিত্রাঙ্গদার উপজীব্য। তবে সে একটি মাত্র ঋতুকে বেছে নিয়েছে। সে হল বসন্ত। বসন্ত যৌবনের ঋতু, কিন্তু যুবকের পীড়ার কাল। চিত্রাঙ্গদার ভাষায়ও সেই মধুকর-গুঞ্জরণ আছে। বা তার পিচ্ছিলতা দেখে মনে হয়, ফাগুনের বিন্দু-বিন্দু মধু ক্ষরিত হয়েছে তার উপর। এই ভাষায় পদস্খলন অনিবার্য।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই কবি আমাদেব এখানে নিয়ে আসেন নি, চিত্রাঙ্গদা প্রথম সাক্ষাৎকারের পর তার অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছাকে এই ভাবে ব্যক্ত করেছে।

যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,

শৌর্যবীর্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে।(১)

এ হোল ভীরু সশঙ্কিত ভাষার তীর্থ-যাত্রা ; কিন্তু চরিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতার তালেতালে এই ভাষা বদলে যাচ্ছে। একটু-একটু করে ভিন্ন আমেজ, ভিন্ন আস্বাদ দেখা যাচ্ছে—

ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিণী
সামান্য ললনা, সব ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।

এখনও এ ভাষা সামাজিক ভাষা, সাধারণের ভাষা। কিন্তু অর্জুনের এই স্বীকৃতি লক্ষ্য করবার মত।

উষার কনকমেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকাশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

নিসর্গের শিরে বাসনাকে স্থাপন করে নাট্যকার কামনার লেলিহান শিখার তাপ ও ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি সহনীয় করে তুলেছেন। কিন্তু যখন লেখেন,

চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

তখন নিশ্চিতভাবে আমরা ভিন্ন তলে পৌঁছে যাই। উপসংহারে এই বর্ণনার তাৎপর্য কি আর ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষমান থাকে—

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।

ভাষা অতি-সন্তর্পণে চলেও এই মরণসম কুণ্ডে ঝাঁপ না দিয়ে পারেনি। 'রজনী' শব্দটি বড়ই মানবিক দায়ে ঠেকেছে। এ ভাষা দশজনের কাছে বলবার মত ভাষা নয়। এভাষা জনান্তিকের ভাষা, অন্তরঙ্গের ভাষা। অতএব গীতিকাব্যের ভাষা। পাঠক ভুল করেননি; শেলির Cenci হোল নাটক; কীটসের Hyperion-ও মহাকাব্য নয়। শিল্পের আধার শিল্পকে শত আপ্যায়নেও ধরে রাখতে পারেনি, ছাপিয়ে গেছে। অতীত যুগের নব্যকাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' এই নাটকটিকে সাদরে গ্রহণ করার জন্য বাহু বিস্তার করে আছে। 'রাজা ও রাণী'ও 'বিসর্জনে'র ব্যবহৃত রূপ তিনি স্বীকার করতে পারেননি; তাই কি 'চিত্রাঙ্গদা'য় তিনি পূর্ববর্তী-আধারে ফিরে গেছেন? কিন্তু তখন ত আর দ্বিতীয় 'রুদ্রচণ্ড' বা 'ভগ্নহৃদয়' লেখা যায় না; কারণ বিক্রমদেবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, প্রেমের তীব্রতা ও তজ্জনিত বেদনা তিনি অনুভব করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে কুমার সেন-ইলার শান্তশুভ্র প্রেমলীলাও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিকন্তু বিশ্ব চরাচরের সৌন্দর্য চুইয়ে মানব-অন্তরের আবেগকে পুষ্ট করার কৌশল ত রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করে ফেলেছেন। সেই সব সফলতাময় শিল্পকৌশল এখানে এসে তাঁর লেখনীকে ঐশ্বর্যে-ঐশ্বর্যে মাতাল করে তুলেছে।

রাজা ও রাণীর সফলতা তিনি হারান নি, বরং তার ব্যবহারে অধিকতর সফল হয়েছেন চিত্রাঙ্গদায়। উদাহরণ দেওয়া গেল—

ইলা। তারপরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে। গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূমে, তুমি চলে যাবে
গুন্‌গুন্ গাহি অন্যমনে। না না সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলনপাশ
কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মনে মনে, জীবনে জীবনে। (৩।২)

চিত্রাঙ্গদায় তাই পাচ্ছি—

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন।
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।

যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।
দিন গেল।
এই মালা প'রো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু 'পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক অধরের সুখসম্মিলনে
ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে। (৪)

রবীন্দ্রনাথও এই নাটকে আপাতত 'সুধাময় পরাজয়ে'র ভাগী হয়েছেন। নাটকের আধারে কাব্য রচনা করেছেন। তবে এ পরাজয় 'চিরপরাজয়' নয়।

পয়ারের পায়ের বেড়ি মাইকেল খুলে ফেলেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ তার পায়ে নূপুর বেঁধে দিলেন। তাঁর কাব্যে নাটকে প্রবহমান সমিল পয়ার অনুপম সঙ্গীত তরঙ্গ সৃষ্টি করেছে।

এ নাটকে অঙ্ক বিভাগ নেই, শুধু এগারটি (সূর্যোদয় দৃশ্যান্তরসহ) দৃশ্য আছে এগারটি দৃশ্যের স্থলে এগারটি সর্গ হলেই বা ক্ষতি কি?

নাটকের ঘটনা-সংস্থানে নাটকীয়তা নেই; তবে নাটকের বক্তব্যে নাটকীয়তা আছে। নাট্যবিষয়কে তিনি কাব্যের স্বভাবে পরিবেশন করেছেন। চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য আলংকারিক ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল।

অথচ এ নাটক শেষ হয়েছে ফল প্রকাশের অনেক পূর্বে। আমাদের বভ্রুবাহনের জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। রবীন্দ্রনাথও দ্বিতীয় কুমারসম্ভব রচনা করেন নি। কারণ মাতৃত্বের গর্ব থেকে নারীত্বের গর্বেই চিত্রাঙ্গদা অধিকতর মুখরা।

কিংবা নারীত্বের পূর্ণতা মাতৃত্বে। ফুলের পরিণতি ফলের মধ্যে।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে সেও আমি নহি।

তবে কী সে ?

যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমারে পাইবে তবে পরিচয়।

চিত্রাঙ্গদা আত্মসচেতনা নারী; একেবারে যেন মিসেস গডউইনের আত্মজা। চিত্রাঙ্গদা একাধারে তিলোত্তমা আর প্রমীলা। কারণ সে মোহের সঙ্গীত থেকে আত্ম-সচেতনতার নবীন মন্ত্র উচ্চারণ করেছে বেশি। মাইকেলে যা ছিল কেবল বিস্ময়, এখানে তার সঙ্গে এসেছে সসম্ভ্রম আত্ম-উদ্ঘাটন। নাটকে ঘটনার চঞ্চলতা ও তরঙ্গবিক্ষোভ কবির চোখে বর্ণিত; কিন্তু ঘটনা যে পরিবর্তনমুখর তা ধরা পড়ে।

কিন্তু সেই নাট্যউপযোগী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কাব্যের ভাষায়। ওবিদ, কীটস আর কালিদাসের ইন্দ্রিয়রম্যতা এই ভাষার পরতে-পরতে লেপটে আছে। নাটকীয় ভাষার বহুবর্ণময়তা নেই। এ ভাষা একরঙা ভাষা।

এ যুগের অন্যতম নাটক হোল 'গোড়ায় গলদ'। গোড়ায় গলদ সঙ্গীত-সমাজের প্রয়োজনে রচিত। সঙ্গীত-সমাজে সৌখীনতার পশর কতটা জমা হোত, তা জানি না। কিন্তু এ নাটকে সৌখীনতা সুপ্রচুর, কারণ নায়ক ভালোবাসার জন্য 'ভৃত্য' সম্বোধন শ্রবণেও শ্লাঘা বোধ করেছে। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধ বিন্দুমাত্র আহত হয় নি। গিলবার্ট মারে একটা কথা তাঁর এক গ্রন্থে বলেছিলেন, **"The comedian is the most social of all artists."**[২৪]

কথাটি আর কারও সম্বন্ধে কীভাবে কতটা প্রয়োগ করা যায়, তা জানি না। কিন্তু গোড়ায় গলদে যে রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক সামাজিক, এ বিষয়ে মতবিরোধ কোথায় ? 'চিত্রাঙ্গদা'য় শুধু অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা, বা চিত্রাঙ্গদা আর মদনের মধ্যে কথোপকথন হয়েছে; বনচরগণের মাত্র পদপাতেই নাটক শেষ হয়ে গেল। এ নাটক একান্তই ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নাটক, অ-সামাজিক নাটক।

গোড়ায় গলদে রবীন্দ্রনাথ তার বিপরীত আচরণে আত্মপ্রকাশ করলেন। ক্ষান্তমণি ও চন্দ্রকান্ত একান্তে কথা বলেছে, সে কথা ঐকান্তিক কথা নয়। কমলমুখী-ইন্দুমতী স্ব-ভাবে কখনও দাঁড়াতে পায় নি। সবাই সাধারণভাবে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কমেডি যেন গেরস্ত-বাড়ির কাব্য। একান্নবর্তী

পরিবারে মেয়ে-পুরুষে মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা কম। তারই মধ্যেও পঞ্চশরের আনাগোনা বন্ধ থাকে না। সেই দ্বিধাগ্রস্ত আত্মগোপনপরায়ণ পঞ্চশরের জয়গান গেয়েছেন গোড়ায় গলদে রবীন্দ্রনাথ ; তার ঘটনা-সংস্থানে, সংলাপে। কোথাও কোন ব্যক্তিনিষ্ঠা নেই, সবই সর্বজনীন।

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভালো।' এটি সে যুগের পিতৃ-তান্ত্রিক সমাজের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক স্বীকারোক্তি নয়। কমেডির আড়ালে ট্রাজেডির আত্মগোপন ত সবারই জানা।

'গোড়ায় গলদ' হোল আমাদের রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্দেশ্যে তিক্ত নয়. মিষ্ট হাসির সমালোচনা। নতুন যুগ তার নবীন ইচ্ছা নিয়ে এসেছে ; অথচ পুরাতন ত স্বেচ্ছায় গদি ত্যাগ করবে না। তার উপর আক্রমণেব নানা কৌশল আছে, নানা অস্ত্র আছে। এ হোল হাসির অস্ত্রাঘাত।

গোড়ায় গলদ সংস্করণান্তরেও আত্মবিস্মৃত হবে না। শুধু অধিকতর আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। কমেডিকে অধিকতর শক্তিশালী করার অভিপ্রায়ে বিনোদের বিবাহদৃশ্য পরিত্যক্ত তদস্থলে এসেছে গদাইএর বিবাহদৃশ্য। নায়কের নাম নিমাই থেকে গদাই হয়েছে, গদাই হওয়ার ফলে আরও কিছু কৌতুককর কাজ করেছে। 'শেষরক্ষা' পৃথক নাটক নয় , 'গোড়ায় গলদ'এর গলদকে পুষ্ট করেছে এ নাটক। শেষ রক্ষায় পৌঁছে নাটক হয়েছে অধিকতরভাবে "Comedy of Errors".

আপাত চোখে মনে হয় 'চিত্রাঙ্গদা' ও গোড়ায় গলদ' একেবারে পরস্পর-বিরোধী রচনা ; যেন একটি স্বপ্নাভিভূত ব্যক্তির রচনা, অপরটি বৈঠকী মজলিশী ব্যক্তির রহস্যালাপ। ঠিক একই প্রকার বিস্ময় লাগে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'কাহিনী' গ্রন্থদ্বয় পাঠ করলে। রবীন্দ্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্য আমরা জানি, কিন্তু সে বৈচিত্র্য যে কত বিচিত্রতর হতে পারে, তা এই ভিন্নজাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির সম-সাময়িকতা দেখে অনুমান হয়। বৈকুণ্ঠের খাতায় সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির নমুনা কতটা আছে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির আভাস কার মধ্যে কতটা ফুটেছে, বড়দা, সরলা দেবী, অবন, ঠাকুরপরিবারের আরও অনেক সুধীজন এর মধ্যে নানা আকারে কতখানি লুকিয়ে আছেন, আমরা তার খোঁজ করব না।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক নাটক ছিল না, তা নয় ; একটু বেশিই ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই ভিড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে আসেন নি। তিনি এক অর্থে একেবারে নিঃসঙ্গ। কারণ শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নব্যবাঙালীর গার্হস্থ্য

জীবনকেই তিনি সম্বল করেছেন,- তাদের সামাজিক জীবন নয়। এতদিন পর্যন্ত বাঙ্গালী কমেডিয়ান্ এর উল্টো পথে চলতেন ; তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর, নবীন-পুরাতন সম্প্রদায়বিশেষের ভুল-ত্রুটি নিয়ে হাস্য-পরিহাস করতেন। আমাদের সাধারণ ঘরের মধ্যে যে এতটা নাটকত্ব ও হাস্যরস ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখিয়ে দিলেন।

তাঁর সামাজিক নাটক এক অর্থে তাই সমাজছুট্। রবীন্দ্রনাথ জানতেন, আমাদের নারীসমাজের পক্ষে পরিবারবহির্ভূত পুরুষের সম্মুখে বের হওয় সম্ভব নয়। বৈকুণ্ঠের খাতায় নারীপ্রসঙ্গ আছে, কিন্তু আছে নেপথ্যে। "দেবী পদ তলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার"—এ হোল উনিশ শতকের বাঙালী যুবকের প্রেমের দেবতার উদ্দেশ্যে বকলমে নৈবেদ্য।

চরিত্রগুলিতে একটু বাডাবাড়ি আছে এবং এই বাড়াবাড়ি বাস্তবেও দেখা যায়। তা না হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের ঠিকানা খুঁজে পেতাম কি আমরা ?

"বরাবর দেখে আসছি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই"-- তিনকড়ি কেদারকে চিনেছিল ঠিকই। তবু সে-ই ত তার সহচর।

এ-ন'টকের সব পরিহাস শহরের পরিহাস। ঘটনা অপেক্ষা কথার উপর নির্ভরতা বেশি , চরিত্র অপেক্ষা 'টাইপ'। এই পরিহাসপটুত্বের আরও ছাপ আছে 'হাস্যকৌতুকে'ব নানা নাটিকায়। চিন্তাশীল, খ্যাতির বিড়ম্বনা, সূক্ষ্ম বিচার মলিয়ের-ধর্মী রচনা . 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র বিনি পয়সার ভোজ. নূতন অবতার প্রভৃতি নাটিকার পিছনেও মলিয়েবের আদর্শ কাজ করেছে। কিন্তু এগুলি আমাদের সমসাময়িক সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারবুদ্ধির উপর পরিহাস। রবীন্দ্রনাথ বড আকারের হাস্যরসাত্মক রচনায় পারিবারিক জীবনকে সম্বল করেছেন পুরোপুরি, আর ছোট নাটিকায় সমাজজীবন। এগুলি নাটকাকারে সাময়িক পত্রের টিপ্পনী।

'কাহিনী'কাব্যের নাটিকাগুলি 'রাজা ও রাণী' বা'বিসর্জনে'র আঙ্গিকে লেখা নয়। নাটকের পঞ্চসন্ধির একটি মাত্র সন্ধি এখানে স্বীকৃত হয়েছে। বিশী মহাশয় খাঁটি কথাই বলেছেন যে, এ যেন পঞ্চমাঙ্ক নাটকের শেষাঙ্ক। ঘটনা যা ঘটবার, তা আগেই ঘটে গেছে। এখন শুধু পরিতাপ আর পরিতাপ।

গান্ধারীর আবেদন নিয়েই আলোচনা করা যাক। ধৃতরাষ্ট্র অন্তরের ও বাইরের অন্ধত্ব উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু কীভাবে জীবনে এই অনুভব তিনি পেলেন তা আমাদের শোনান নি। দুর্যোধন তার ক্ষুদে 'হিটলারী' মনোভাব

যে কীভাবে অর্জন করল, তাও আমাদের অজ্ঞাত।[২৫] আমরা আজ শেষ সোপানে দাঁড়িয়ে তাদের নিশ্চিত পতন প্রত্যক্ষ করছি।

'নরকবাস' ও 'সতী' একই আঙ্গিকে লেখা। নাট্যকার নরকবাস, সতী ও গান্ধারীর আবেদন-নাটকত্রয় লিখেছেন ঘটনার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে। কর্ণকুন্তীসংবাদ-এর নাট্যরীতিও একই প্রকার। কিন্তু কলাকৌশলের ক্ষেত্রে এই নাটকের একটা অতিরিক্ত অবদান আছে। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিষয়টি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক গ্রন্থে।[২৬] এই নাটিকায় একটা সাংকেতিকতা আছে।

কর্ণ প্রথম যে উক্তিটি করলেন, তা শুধু তথ্যের বিবৃতি।

পুণ্য জাহ্নবীর তীরে সন্ধ্যাসবিতার
বন্দনায় আছি রত।

কিন্তু সেই সন্ধ্যা ক্রমশ তথ্যের প্রাচীর ছাপিয়ে সঙ্কেতের আকাশে বিস্তার লাভ করবে।

কুন্তী বললেন— ধৈর্য ধর
ওরে বৎস ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।

তারপর সেই অন্ধকার এই দুই নরনারীকে ঘিরে দাঁড়াল—একজন আত্মজ, আর একজন জননী।

হেরো, অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্‌বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—
শব্দহীনা ভাগীরথী।

আর তখন ধীরে ধীরে অন্তরের সত্য উদ্ঘাটিত হতে থাকে।

গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যুষে।

এবং তখন

যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।

মাতা কর্তৃক সে পরিত্যক্ত হয়েছিল ; সেখানেও ত কোন আলো ছিল না। কারণ তা ছিল "মাতৃনেত্রহীন অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্ব।"

জননীকে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোন উত্তর নেই।

মাতঃ নিরুত্তর ?

লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে—
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।

কুন্তী বলেছেন— ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,

কর্ণের জীবনের এই অন্ধকার শেষ পর্যন্ত শূন্য পরিণামে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই সে জননীর কাছে প্রার্থনা জানাল তিনি যেন তাকে এক দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব 'পরে নির্মম চিত্তে ত্যাগ করেন।

আর সেই শূন্য পরিণামের মধ্যেও দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকার-পালিত বীর মানবসন্তান বলছে—

জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

এই ত মানুষের অপরাজেয় অহংকার। এই দর্পের জন্যই অন্ধকার পার হয়ে আলোর শিশু তখন সে। অলংকার তৎক্ষণে অলংকৃতি ত্যাগ করে সত্যের প্রদীপ জ্বালাল। 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' তাই 'বিসর্জন' থেকেও পরিকল্পনাসম্মত। এখানে প্রতীক স্থানবিশেষে নেই, সমগ্র নাটকের মধ্যে আছে। মূল বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলতে হাজির। ধীরে ধীরে, অথচ স্থিরভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের পানেই চলেছেন। তবে এ পর্যন্ত প্রতীকের সাংকেতিকতায় কোন 'মরমিয়া' বাণীর ব্যঞ্জনা নেই।

পরবর্তী কালের সাংকেতিকতার সঙ্গে এখানেই তার মৌলিক পার্থক্য। দুই যুগের সাংকেতিকতা দুই অর্থ আহরণ করেছে।

১৯০১- ৯০৬ সালের মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনে ও কাব্যে এক বিপুল এবং গভীর পরিবর্তন দেখা দেয়।

নৈবেদ্য থেকে খেয়া—এই পর্বে রচিত। নাটকও এই কাব্য-নৈবেদ্যের বা ধূপের গন্ধে আকুলিত হয়ে উঠবে। এই যুগের সাংকেতিকতা আদৌ রূপ বা অপরূপের মজুরিগিরি করেনি, অরূপের করেছে। এই পর্বকে শান্তিনিকেতন-পর্ব বলে অভিহিত করব।

রবীন্দ্রমঞ্চের উদ্ভব

নৈবেদ্য কাব্য ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; নৈবেদ্য কাব্যে কবির ঈশ্বর-প্রাণতা নিসংশয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তখনও কবি 'বিসর্জন' ও 'গোড়ায় গলদ-এর মত পুরানো রীতির নাটকই অভিনয় করছেন।

"আমার জীবনের সমস্ত কৃতকর্মের সমস্ত চিন্তিত সংকল্পের সমস্ত দুঃখসুখের কেন্দ্রস্থলে যিনি ধ্রুব নিশ্চলভাবে বিরাজ করচেন……তাঁর কাছে নির্জনে গোপনে প্রত্যহ জীবনের এক একটি দিন সমর্পণ করে যাচ্ছি।"[২৭]

তখনও উপকরণবহুল নাট্যমঞ্চকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। অথচ এক বৎসর পরে ১৭০৯ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে লিখিত 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কথা বললেন, এবং এটি তাঁর বিশিষ্ট কথা। "অভিনয়কে কাব্যের গোলামি স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কী-কথা আছে।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত অত্যাবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটা যোগান তাহাকে লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন। তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে, অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকা মাত্র; আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া তোলে তাহা চিত্রকরের কাছ থেকে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি নিজের সম্বল কানা কড়াও নাই। সে কি শিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়ে নির্ভর করিবার জো নাই। যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট বেচিতে নাই।"[২৮]

বাংলা নাটক ও বাংলা মঞ্চ বহুকাল জাতীয় ঐতিহ্যের খোঁজখবর নিত না। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় নাট্যইতিহাসের গুরুত্ব স্বীকার করে লিখেছেন, "আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত

সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।"২৯

শুধু এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; কারণ দর্শকের রসজ্ঞান ও কল্পনা-শক্তির উপর তাঁর আস্থা অনেক বেশি, অনেক 'বিপ্লবী' ও 'গণতন্ত্রী' নাট্য-প্রযোজক অপেক্ষাও।

"ভাবুকের চিত্তের মধ্যে যে রঙ্গমঞ্চ আছে সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ সেই পটই নাট্যকারেব লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"৩০

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের প্রচলিত মঞ্চরীতির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ জানালেন।

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারেব কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য, তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিযা আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেযে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই।"৩১

"বিলাতের ষ্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।"৩২

এক সময়ে ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আর্ভিঙের অভিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, আজ সে অভিনয় সমর্থনযোগ্য বলে বিবেচিত হোল না। "এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আর আমি কখনো দেখি নাই।"৩৩

ঐ পত্রেই তিনি বললেন,

"আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও যাঁহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংযমকে আশ্রয় করেন। এই জন্য আত্মার সাধনায় এমন একটা অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে: ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগের দ্বারা ভোগ

করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদিগকে ছেলে ভুলাইবে না।"৩৩ক

মোদ্দাকথা, এ যুগের নাট্যরচনায় তিনি আনলেন স্বতন্ত্র রীতি।

১. অঙ্কবিভাগ উঠে গেল। শুধু থাকল দৃশ্য। একমাত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে অঙ্কবিভাগ আছে।

২. নাটকের ভাষা দাঁড়াল কেবলই গদ্যের উপর ; বিসর্জনের মত গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ নয়। এ বিষয়ে তিনি স্পষ্ট মত উচ্চারণ করলেন নানা প্রবন্ধে এবং কবিতায়। গদ্য বিষয়ে কবি দাবী করলেন "এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।"৩৪

৩. গান ও কথা এই জাতীয় নাটকে সমান মর্য্যাদা পেল। এমন কি গানের সঙ্গে নাচও বাদ গেল না।

৪. নাট্যীয় সংঘাত বাহ্য আড়ম্বর ত্যাগ করল। নাটকের সংঘাত বহির্মুখীনতা ত্যাগ করে, অন্তর্মুখীন হোল।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা রবীন্দ্র-জীবনচেতনার অংশীভূত হোল এতক্ষণে। অষ্টাদশ শতকীয় বৃটিশ মঞ্চ ও নাট্যরীতি পরিত্যক্ত হোল।

অভিনয়রীতি, মঞ্চসজ্জা - সব ব্যাপারেই তিনি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট কথা এই পর্বে বলতে শুরু করলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের কথা ভাবতে শুরু করেন। এবং "১৯০১ সালে পূজাবকাশের পর বিশ্বভারতীর অঙ্কুর বীজ উপ্ত হইল।"৩৫

"১৩০৮ সালের পৌষ-উৎসবের সময় যথাবিধি অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।"

কবির স্ত্রী বিয়োগ ঘটল। আরও নানা শোকতাপে কবির মন অন্তরমুখী হোল। কাব্যরচনায় খেয়া-গীতাঞ্জলি পর্বের সূচনা হোল।

কাব্যজীবনের এই পর্বের বিশেষ প্রবণতাগুলি নাটকের ক্ষেত্রে নানা আকারে প্রভাব ফেলতে লাগল।

এই নতুন পর্বের প্রথম নাটক হোল প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৫); তারপর শারদোৎসব প্রভৃতি রচিত হয়। নাটকের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চব্যবস্থাও পরিবর্তিত হতে লাগল।

"প্রত্যক্ষভাবে নাটক অভিনয়ের ব্যাপারে আমার স্মৃতি আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রথম পর্ব থেকে। বাবা সে সময় শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হবার যোগ্য নাটক রচনা করছেন। এগুলিকে শান্তিনিকেতন পর্বের নাটক বলা যেতে পারে। এর আগে লেখা নাটকগুলির মূল রস ছিল রোম্যানটিক ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত। শান্তিনিকেতন পর্বের তিনটি নাটক—শারদোৎসব, অচলায়তন ও ফাল্গুনীর রস ছিল পূর্ব-রচিত নাটক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাজা ও রাণী ও বিসর্জন লেখা পরিচিত প্রচলিত আঙ্গিকে। পরবর্তী যুগের ডাকঘর, রাজা প্রভৃতি নাটককে বলা চলে রূপকনাট্য অথবা তত্ত্বধর্মী নাটক। মাঝখানের এই তিনটি নাটক যেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র —এগুলিতে নাটকের বিষয়বস্তু সংহত ও সহজ হয়ে এসেছে, কিন্তু রূপক নাট্যের কিছু কিছু লক্ষণ এদের মধ্যে স্পষ্ট। শান্তিনিকেতন পর্বের নাটক-গুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। আশ্রম-বিদ্যালয়ে এখন কেবল ছাত্রদের বিদ্যালয়, ছাত্রীরা যোগ দেয় পরে; সুতরাং স্ত্রী-ভূমিকা না থাকার কারণ সহজেই অনুমেয়।"৩৬

মেয়েরা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দিলেও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়ে সে-যুগের আশ্রমবাসিনী হেমবালা সেন একটি চমৎকার গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় ছাত্রীরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' মহড়া দিলেন। তারপর যখন অভিনয় হবে, তখন তাঁরা দর্শক হিসাবে কবিকেও উপস্থিত থাকতে দিতে রাজি হলেন না; শেষ পর্যন্ত নানা বাক্‌বিতণ্ডার পর সর্তসাপেক্ষ অনুমতি দেওয়া হোল; "গুরুদেব প্রভৃতি কয়েকজন চিকের আড়ালে বসে, মেয়েদের অভিনীত প্রথম নাটক দেখে ছিলেন।"৩৭

বলা বাহুল্য তখন স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। গুণবতী ও সুদর্শনার ভূমিকায় যেমন শ্রদ্ধেয় সুধীরঞ্জন দাস মঞ্চাবতরণ করেছিলেন।

রাজা নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন শান্তাদেবী। তাঁর স্মৃতিচারণা থেকে সেদিনকার মঞ্চের একটু নিশানা পাওয়া যাচ্ছে। "মাটির নাট্যঘরে খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্যতোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও

অভিনয় যেন আতশবাজির ফুলের মতো ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।"[৩৮]

রাজার দ্বিতীয়বারের অভিনয় দেখেছিলেন সীতা দেবী ; তাঁর অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করা হোল।

"তখন নাট্যঘর নামে একটি মাটির ঘরে অভিনয় হইত! ব্রাহ্মসমাজে লালিত পালিত হওয়াতে অভিনয় ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই। রাজা অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম।"[৩৯]

গুরুদেব এই অভিনয়ে ঠাকুরদাদার ভূমিকায় নেমেছিলেন ; তাঁর সাজসজ্জা কেমন ছিল, তার একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন।

"সদা সর্বদা যে গেরুয়া রঙের পোশাক পরিতেন, তাহার উপর ফুলের মালা পরিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুরদা যেখানে রাজসেনাপতির বেশে আবির্ভূত হইলেন, সেখানে অবশ্য বেশের পরিবর্তন ঘটিল। সাদা রেশমের পোশাকের উপর চওড়া লাল কোমরবন্ধ পরিয়া তিনি বাহির হইলেন।" "দিনেন্দ্রনাথ কালিঝুলি মাখিয়া আলখাল্লার উপর নানা রঙের ন্যাকড়ার ফালি ঝুলাইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাগল সাজিয়াছিলেন।"[৩৯ক]

অচলায়তনে রবীন্দ্রনাথের সাজসজ্জা সম্বন্ধে সীতা দেবী লিখছেন, "সাজটা একটু নতুন ধরণের হইয়াছিল। একটা সাদা রেশমের চাদর বুকের উপর দিয়া ঘুরাইয়া পিছনে গ্রন্থি বাঁধিয়া তিনি আসিয়াছিলেন।"[৩৯খ] ফাল্গুনী নাটকের মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "রঙ্গমঞ্চ তো ফুলে পাতায় একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল, দুই ধারে ছিল দুইটি দোলনা। 'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া", গানটি যখন হইল, তখন দুইটি ছোট ছেলে এই দুইটি দোলনায় বসিয়া মহানন্দে দোল খাইতে আরম্ভ করিল। সঙ্গী তাহাদের অনেকগুলি ছিল, তাহারা ষ্টেজে দাঁড়াইয়াই গান করিতেছিল।...পাখির কাকলিতে যেমন বনস্থল প্রতিধ্বনিত হয়, বালকদের গানেও নাট্যঘর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।"[৩৯গ]

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্যতম প্রাচীন আশ্রমিক ও বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্ররসবেত্তা প্রমথনাথ বিশীর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষদর্শীর অধিক। তিনি ছিলেন এই সব অভিনয়ের অন্যতম অভিনেতা।

"সকাল হইতে নাট্যঘরে ষ্টেজ সাজানো আরম্ভ হইল। আয়োজন যৎ-সামান্য। দেবদারুর ডালপালা দিয়া চারখানা উইংস রচনা করা হইল, পিছনে একখানা কালো পর্দা, সম্মুখের যবনিকায় মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য আঁকা।"[৪০]

সাজসজ্জা সম্বন্ধে তিনি বলছেন, "প্রথম আমলে দেখিয়াছি নাটকে কেনা পোশাক ব্যবহৃত হইত। ক্রমে কেনা পোশাকের যুগ গিয়া এখানকার শিল্পীগণ কর্তৃক পরিকল্পিত পোশাক ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পটভূমিকা ও যবনিকায় সত্যকার শিল্পীদের তুলির দাগ পড়িল। সাজ পোশাকের আড়ম্বরের চেয়ে আলোর নিপুন প্রয়োগের দিকে চোখ গেল।"[৪১]

শান্তিনিকেতনের আশ্রম-অভিনয়ের মঞ্চসজ্জার পিছনে ঋতু-উৎসবের একটি বড় অবদান আছে। রবীন্দ্র-জীবনীকারের মতে 'ঋতু-উৎসবের' প্রবর্ত্তক হচ্ছেন কবির কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথ। ১৩১৩ সালের শ্রীপঞ্চমীর দিন তাঁর উদ্যোগে এই উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। পরে কবি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপর এই ঋতুউৎসবটিকে সুসংস্কৃত করার ভার দেন। ক্ষিতিমোহন ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য। এঁদের উভয়ের মিলিত প্রয়াসে প্রাচীন ভারতীয় বা বৈদিক ভাবপরিমণ্ডল রচিত হোল সেই ঋতুউৎসব উপলক্ষে। পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ে যোগদান করলে এই উৎসবের শিল্পের দিক সমৃদ্ধ হোল। শান্তিনিকেতনের নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঋতুউৎসবের গভীর যোগ আছে।

শান্তিনিকেতনে নাট্যানুষ্ঠান ছিল সারা আশ্রমের অভিনয়। "নাটকের মহড়া যতদিন চলে ততদিন ক্লাস প্রায় হয়ই না, কারণ সারা স্কুলের ছেলেরা সারাক্ষণ মহড়াতে উপস্থিত থাকে।"[৪২]

বস্তুত এই নাট্যাভিনয় শান্তিনিকেতনের শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পিয়রসন বলছেন যে, এই অভিনয়ের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের প্রভাব ছাত্রদের উপর অনুভূত হয়।

শহরে যখন কবির এই যুগের লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে, তখন কিন্তু সে মঞ্চ হয়েছে একটু পৃথক্।

বিচিত্রাভবনে ফাল্গুনীর অভিনয়ে মঞ্চসজ্জা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী লিখছেন, "আগেকার সেই বিসদৃশ বিদেশী নকল তুলে দিয়ে, তার জায়গায় পিছনে একটা নীল পশ্চাদপট দিয়েছিলেন; সেটি এখনও দেওয়া হয়। তার ওপর কেবল মাত্র একটি গাছের ডাল, তার ডগায় একটি মাত্র লাল ফুল, এবং তার ওপরে একটি ক্ষীণ চন্দ্ররেখা।"[৪৩]

সম্ভবত এই বর্ণনা শারদোৎসবের মঞ্চের বর্ণনা। ফাল্গুনীর মঞ্চ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, "ব্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হোল সেই বাল্মীকি-প্রতিভার নীল

রঙের মখমলের বনাত, দেখতে হল যেন গাঢ় নীল রঙের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাচ্ছে। বটগাছ তো আগেই সাবাড় হয়ে গিয়েছিল। বাদাম গাছের ডালপালা এনে কিছুকিছু এখানে ওখানে দিয়ে ষ্টেজ সাজানো হল। বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম।”[৪৪]

শারদোৎসবের মঞ্চসজ্জার সময় অবনীন্দ্রনাথ রূপোলী কাগজ কেটে চাঁদ দুই-তিনটি তারা বানিয়ে নীল পর্দার উপর অর্থাৎ আকাশের গায়ে এঁটে দিয়ে চমৎকার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিলেন, “তারপর ষ্টেজেতে নীল পর্দার উপরে যখন লাইট পড়ল, যেন সত্যিকারের আকাশ। সবাই একেবারে মুগ্ধ।”[৪৫]

ডাকঘরের মঞ্চসজ্জা সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক।

“ডাকঘর অভিনয় হবে, ষ্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হল। তক্তায় লাল রং, ঘরে কুলুঙ্গি, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। সব তো হল। আমি দেখছি, নন্দলালই সব করলে। সেই নীল পর্দার চাঁদ ডাকঘরেও এল। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি বলি বেশ হয়েছে। নন্দলালের সাধ্যমতো তো ষ্টেজকে পাড়াগেঁয়ে ঘর বানালে। তারপর হল আমার ফিনিশিং টাচ। আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও একপাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম। নন্দলাল বললে, পাখি? আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে শুধু দাঁড়টি থাক। দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল। সব শেষে বললুম, এবারে এক কাজ করো তো নন্দলাল। যাও দোকান থেকে একটি খুব রঙচঙে পট নিয়ে এসো তো দেখি। নন্দলাল পট নিয়ে এল। বললুম, একটি উইঙের গায়ে আটা দিয়ে পট্টি মেরে দাও। যেমন ওটা দেওয়া, একেবারে ঘরের রূপ খুলে গেল। সত্যিকারের পাড়াগেঁয়ে ঘর হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যে সাজানো গোছানো।”[৪৬]

বিচিত্রাভবনে ডাকঘর অভিনয়ের স্মৃতিকথা বলেছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবং সীতাদেবী তাঁদের দুই গ্রন্থে সুন্দরভাবে।

মঞ্চসজ্জার এই দিক্-পরিবর্তনের পিছনে কাজ করেছিল তখনকার স্বদেশী আন্দোলন। প্রথমে কাঙড়া ও মোগল চিত্রাবলী, তার কিছু পরে জাপানী চিত্রশিল্প, সর্বশেষে অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত শিল্পসম্ভার এই পরিবর্তনে সহায়তা করে। “এই সময় শিল্পীদের মনের সমস্ত আদর্শ বদলে গিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন

স্বদেশী আঙ্গিকের উপরেই দেশের নূতন আর্টকে গড়ে তুলতে হবে। বিদেশের কাছে ধার-করা জিনিসে চলবে না।"[৪৭]

অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, শান্তিনিকেতনের আশ্রমে যে ধরণের মঞ্চ গড়ে উঠেছিল, কলকাতার মঞ্চ তদনুরূপ নয়। শান্তিনিকেতনের মঞ্চ ছিল যাত্রার মঞ্চের কাছাকাছি। কলকাতার রবীন্দ্রমঞ্চে বাস্তবতা থাকলেও সেখানে প্রতীকী ঝোঁকই প্রবল।

পরবর্তীকালে অবশ্য শান্তিনিকেতনের মঞ্চসজ্জায় বিচিত্রাভবনের শিল্পকলা প্রভাব বিস্তার করবে। কারণ তখন অবনীন্দ্র-শিষ্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কর্মসূত্রে বদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

আশ্রমের মঞ্চ তখন থেকে যাত্রার সারল্যের সঙ্গে প্রতীকী তাৎপর্যের সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হোল।

নাটক থেকে পালা

"আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা।"[৪৮] কাব্যের এই 'পালা' নাটকের ক্ষেত্রে অন্য অর্থে দেখা দিল।

যাত্রার আঙ্গিক তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; তার মূল্য তিনি স্বীকার করছেন। এমন সময় এল ঋতু-উৎসব। এই ঋতু-উৎসবের মর্মবাণীকে তুলে ধরবার জন্যই 'শারদোৎসব' রচিত হয়। "শারদোৎসব নাটক লিখিবার সময় কবির মনে ছিল আশ্রমের ছেলেদের উপযোগী নাটক রচনা; কিন্তু রচনার মধ্যে কোথাও ছেলেমানুষি নাই—বিরাট আদর্শবাদ ও গভীর সৌন্দর্যতত্ত্ব গ্রন্থ মধ্যে ফল্গুর ন্যায় প্রবাহিত।"[৪৯]

কিন্তু সেযুগে বাংলা সাহিত্যের বুদ্ধিমান সমালোচকেরা একে অন্য তাৎপর্যে গ্রহণ করেছেন। তৃষিতকুমার তলাপাত্র (ছদ্মনাম ?) লিখছেন যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র হলেন প্রধান নাট্যকার। "এই পঞ্চরথীই এখন নাট্যক্ষেত্র অতুল বিক্রমে রাজত্ব করিতেছেন। মনোমোহন লেখা ছাড়িয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাই। রবীন্দ্রনাথ বোলপুর আশ্রমবালকদের জন্য লিখিতেছেন।"[৫০]

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার

ধুয়োটা ঐ একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তাঁর সাথি। * * * আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ওতো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।"[৫১]

শারদোৎসব নাটকটি আকারে দীর্ঘ নয়। নাটকটি দুইটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ; একটি দৃশ্য ঘটেছে পথে, অপরটি বেতসিনদীর তীরে। অর্থাৎ কৃত্রিম মঞ্চ থেকে নাটক প্রথমেই বেরিয়ে এল। দ্বিতীয় কাজ হোল—টমসন যাকে বলেছেন 'পথের নাটক, মেলার নাটক'—রবীন্দ্রনাটকের সেই চরিত্রায়নের সিদ্ধি। এই নাটকে কুশীলবের সংখ্যা বেশ বেশি। সম্ভবত বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র যাতে যোগ দিতে পারে. নাট্যকার তাই চেয়েছিলেন।

নাটকের একটি প্রস্তাবনা আছে। ১ম দৃশ্য শুরু হোল একটি গান দিয়ে; সে গানের বুকে শরতের প্রকৃতির সহাস্যমূর্তি ঝলমল করছে। আর এমন মনোহর প্রেক্ষাপটে লক্ষেশ্বর জ্বালাতন বোধ করছে। সাধে কি আর ছেলেরা তার নাম দিয়েছে লক্ষ্মীপেঁচা!

একদিকে লক্ষেশ্বর আর একদিকে ঠাকুরদা। লক্ষেশ্বর গান পছন্দ করছে না, হর্ষ-আনন্দ সে পছন্দ করছে না; সে হিসাব রাখে, টাকার নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত; আর ঠাকুরদাদাকে ঘিরে ছেলেরা করে নৃত্য আর গান। "আজ যে শরতে ওদের ছুটি।"

লক্ষেশ্বরের চোখে শরতের দিন—"ভারী বিশ্রী দিন।" আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে অবশ্য কার না মাথা খারাপ হয়? তারও হয়েছে; কিছুতে সে কাজে মন দিতে পারছে না। তবু সে বে-হিসাবী হবে না। এমন দিনে উপনন্দ শুধু হিসাব লিখতে বাধ্য হয়। প্রথম দৃশ্যে কথার পরিমাণ বেশি।

দ্বিতীয় দৃশ্যে গান আর সংলাপ হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলে—নদীর তরঙ্গের মত কলকল ছলছল শব্দে। আর সেই গানের তরঙ্গে-তরঙ্গে ভেসে আসে সন্ন্যাসী রাজদূত, রাজা এবং বিজয়াদিত্য, যিনি সম্রাট্ এবং সন্ন্যাসী।

"বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ, সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেন।"

রাজা তখন কবুল করলেন, "মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না।" সন্ন্যাসীর মুখ থেকে এই নাটকের অন্তরে প্রবেশের চাবিকাঠি পেলাম—"রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।"

এইভাবে 'নয়ন-ভোলানো'-র আবির্ভাব হোল।

গানের মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হোল। শুধু কি গান? নাচও আছে।

এই পর্বের প্রথম নাটকেই রবীন্দ্রনাথ পালার মর্মবস্তুটি বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়েছেন। পালায় গান আর কথা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাটে, এবং সেখানে হাটতে গেলে নাচতে হয়।

বিবেক ও বালক দলের উপস্থিতি যাত্রার আসরে একটা সাধারণ ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধারণ কানুনগুলো রূপান্তরিত করে নিয়ে আধুনিক পালা সৃজন করলেন। এই নাটক তবু কিন্তু সাংকেতিকতার পুরো নিশানা কবুল করেনি। এখানে সম্রাট্ স্বদেহে হাজির হয়েছেন, অন্য নাটকে তিনি আভাসে আছেন, নেপথ্যে আছেন, প্রকাশ্যে নন। ডাকঘর নাটকে তিনি আদৌ নেই, তাই আরও বেশি করে আছেন।

এই পর্বের, তথা এই মর্মের শারদোৎসব প্রথম নাটক, তাই পথের উত্তরণে একটা কাঁটা পড়ে থাকল।

সর্ববিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও শারদোৎসব নাটকের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। এই গ্রন্থ বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটা নতুন পর্য্যায় সৃষ্টি করল—প্রবীন নাট্যরীতিকে নবীনভাবে উপস্থাপিত করে। জয়দেব থেকে গোবিন্দ অধিকারী ও গোপাল উড়িয়া পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে ইতিহাস, শারদোৎসব তাকে স্বীকার করেছে, অস্বীকারও করেছে। তার যা ক্লেদ, যা গ্লানি, তাকে ধিক্কৃত করেছে, যা শ্লাঘনীয়, যা বরণীয়, তাকে বরণ এবং আত্মসাত করেছে।

নাটক যে সঙ্গীত ও নৃত্যের পরিপন্থী নয়, একথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। সংলাপ-নির্ভর নাটক একমাত্র নাটক, এই হোল আমাদের আধুনিক নাট্যবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই চেতনার মূল্য অস্বীকার করেন নি, তবে তাকে নিছক সংস্কারে পর্যবসিত করেন নি। তাঁর নাটকে সংলাপ, নৃত্য ও গীত তুল্যমূল্য পেয়েছে, ফলে তাঁর শারদোৎসব এতদিনের হারানো বা বিস্মৃত সূত্রটি পুনরুদ্ধার করেছে। বাংলা নাটকের উন্মার্গগামিতার অবসান হোল।

চলতি বাংলানাটকে নৃত্য ছিল না, তা নয়; ছিল। কিন্তু সে নৃত্য ছিল দূষিত রসনিষিক্ত। পশ্চিমা বাইজী-প্রভাবিত এই নৃত্যভঙ্গিমায় আদৌ সর্বজনের নিমন্ত্রণ থাকত না। ঐ নৃত্য ছিল ভোগবিলাসীর প্রমোদকলা; বাগানবাড়ির উপকরণ। কিন্তু শিল্প ত প্রমোদ মাত্র নয়।

সংগীতও হয়েছিল বৈঠকী সঙ্গীত, মাঝে মাঝে তাব ব্যতিক্রম থাকত। তাই অধিকাংশ নাটকে গান নাট্যীয় প্রয়োজন অপেক্ষা দর্শকজনের মনোরঞ্জনে হোত অধিকতর ব্যস্ত। গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, তপোবনের মত নাটকেও নর্তকীদলকে হাজিরা দিতে হয়েছে। রুচির ও শিল্পের এই অধোগতি রবীন্দ্রনাথ নিবারিত করলেন।

সাধারণ মঞ্চের সঙ্গে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সম্পর্কহীনতা মঞ্চের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। কারণ ব্রাহ্মরা সে যুগের উন্নতিশীল অংশ। আজ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের খোলা আকাশের তলায় স্বাভাবিক পরিবেশে সেই সম্পর্কহীনতা থেকে বাংলা নাটকের মুক্তি ঘটল, নতুন একটি অধ্যায় সূচিত হোল।

শারদোৎসবে নৃত্য ও গীত এত সুরুচিপূর্ণ এবং নাট্যগুণান্বিত, যে তাকে অনায়াসেই জয়দেবপত্নী পদ্মাবতী তাঁর বিগ্রহের সম্মুখে পরিবেশন করতে পারতেন। অবশ্য তার জন্য তাঁকে শারদোৎসবের বালকদলের অন্তর্ভুক্ত হতে হোত। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরখাই তাঁর গুরুর লুপ্ত সম্বিত ফিরিয়ে আনতে মাদলে ঘা মেরে এর থেকে অধিকতব শোভনসুন্দর রুচিসম্মত নৃত্যগীত পরিবেশন করেন নি। শারদোৎসব নাটক হিসাবে রাজা, অচলায়তন বা ডাকঘরের মত শিল্পসফল নাটক নয়, কিন্তু তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত।

প্রাচীন যাত্রার সারল্য এবং রুচিস্নিগ্ধতা শারদোৎসবে রক্ষা করা হয়েছে। অথচ তখনকার যাত্রাই থিয়েটারী প্রভাবে কত জর্জরিত হয়ে পড়েছিল!

"সাধারণতঃ পটপরিবর্তনেব সময়েই সখীদের নাচ-গান হোত। নৃত্যেও মতিলাল এনেছিলেন বিবিধ বৈচিত্র্য। প্রথম দিকে মতিলালের যাত্রায় পালার শুরুতে একবার মাত্রই নাচের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে নাচের বৈচিত্র্য তাঁর যাত্রাকে আরও রমণীয় করে তুললো। সখীনাচের ব্যবস্থা হোল। লাস্য ও তাণ্ডব নৃত্যের বিচিত্র কৌশল দৃশ্যাদি পরিবর্তনের সময়ে অথবা প্রয়োজনমত পালার মধ্যেও প্রদর্শিত হয়ে থাকে। নৃত্যের মধ্য দিয়েই শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীভৎস, ভক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন রসকে জীবন্ত করে তোলা হোত। আরও বৈচিত্র্য আনার জন্য আসরে 'টেবিল নাচে'র প্রবর্তন করেছিলেন মতিলাল। একটি বড়

টেবিল এনে হাজির করা হোত যাত্রার আসরে। সেই টেবিলের চারকোণে দাঁড়িয়ে চারজন নর্তক, নারী অথবা পুরুষবেশে দেখাতেন নৃত্য-কৌশল। শুধু নাচ গান নয়, বাদ্যেরও ছিল বিচিত্রতা, বাদকগণও তাঁদের বাদ্য-কৌশল দেখাতে ছাড়তেন না। কখনও কখনও—সাধারণতঃ চার পাঁচ জন বেহালাবাদক উঠে দাঁড়িয়ে সুরের মূর্চ্ছ'নায় আসর ভরিয়ে তুলতেন। কখনও বা মৃদঙ্গবাদক উঠে দাঁড়িয়ে মৃদঙ্গের কসরত দেখাতেন।" (যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ; পৃ-২০২)

'বঙ্গীয় নাট্যশালা' গ্রন্থে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় থিয়েটারে নৃত্যপ্রাচুর্যের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে এখনকার থিয়েটারের নাচগুলি "পারসী থিয়েটারের নাচ ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লওয়া হইয়াছে।" (পৃ—৬৫) আর থিয়েটারে নর্ত্তকীরা নাচের তালে তালে নানারকম কসরত দেখাত। জলন্ত মশাল হাতে, রুমাল হাতে, কাঠের গোলা হাতে, ফুলের মালা হাতে, লাঠি হাতে, মদের গ্লাস এবং ডিকান্টার হাতেও নাচ দেখান হোত। সেই সব নাচ সরাসরি গিয়ে মতিলাল রায় মহাশয়ের খাতায় স্থানলাভ করত। কারণ অধিকারী মহাশয় চান জনপ্রিয়তা, যে জনপ্রিয়তায় অর্থমূল্য বড়ই প্রত্যক্ষ। ভক্তিবাদের সঙ্গে বিষয়বাদের বেশ আত্মীয়তা। রবীন্দ্রনাথ যাত্রার অন্তরধমকে অঙ্গীকার করলেন, তার বিকৃতিকে নয়। দেশীয় আঙ্গিক এল, দেশীয় অধোগতি এড়িয়ে।

প্রায়শ্চিত্ত আর শারদোৎসব সমসাময়িক রচনা, প্রায়শ্চিত্ত নতুন নাট্যকৌশল আর পুরাতন নাট্যকৌশলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায়শ্চিত্তে নতুনত্ব তিন দিক থেকে এল। প্রথমত এই নাটক গদ্যে লেখা ; দ্বিতীয়ত এই নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী সদলে আবির্ভূত হয়েছেন ; তৃতীয়ত বসন্ত রায় ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর সংলাপে কথা ও গান সমান-সমান মর্যাদার অধিকারী।

অথচ এ নাটক অনেকটাই পুরানা রীতির নাটক ; এখানে বহু চরিত্রের ভিড় ; প্রধান আখ্যায়িকার সঙ্গে আছে একাধিক উপ-আখ্যায়িকা। এমন কি রঙ্গরসের জন্য ভাঁড় পর্যন্ত বহাল। শারদোৎসবের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে।

প্রায়শ্চিত্ত নাটকে সমসাময়িক যুগের তথাকথিত বীরপূজার প্রতিবাদ আছে। ১৯০৪ সালে কবি 'শিবাজী-উৎসব' লিখেছেন। কিন্তু তিনি মানতেন এই বীরপূজারও একটি সীমা আছে।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ষ্টার থিয়েটারে প্রতাপাদিত্য অভিনীত হয় ; ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই নাটকের লেখক। ক্লাসিকে একই বীরপুরুষের

জীবনী অবলম্বনে রচিত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষ বীর' নাট্যরূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হোল। শিবাজী, কেদার রায়, নন্দকুমার-সকলেই মঞ্চের কারুণ্য লাভ করলেন। একদিকে এই বীরপূজার আতিশয্য আর একদিকে সরকারী সন্ত্রাসনীতি।

মুকুন্দ দাসের 'মাতৃপূজা' যাত্রা নিষিদ্ধ হোল;[৫২] শুম্ভ-নিশুম্ভবধ' যাত্রা নিষিদ্ধ হোল;[৫৩] বন্দেমাতরম্ গান রঙ্গমঞ্চে নিষিদ্ধ হোল; 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের দেশপ্রেমমূলক সংলাপ নিষিদ্ধ হোল।[৫৪]

এই সময়ে আশু বিশ্বাস নামক জনৈক সরকারী উকিল বিপ্লবীদের হাতে নিহত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদের সমর্থক ছিলেন না; তিনি নীতিগতভাবে তার বিরোধিতা করে ১৯০৯ সালে ৮ই জানুয়ারী টাউনহলে সভায় এক বক্তৃতা দিলেন। অথচ সন্ত্রাসবাদীদের মুখে তাঁরই গান। আলিপুর বোমার মামলায় বন্দীযুবকেরা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে "সার্থক জনম আমার জন্মেছি⋯ ." এই গান গাইতে লাগলেন।[৫৫]

রবীন্দ্রনাথের মত ছিল ভিন্ন; কিন্তু যত উচ্চ আদর্শ সম্পন্নই তা হোক না, সেদিন তাঁর দেশবাসী সবাই সেই মত গ্রহণের যোগ্য মনে করে নি।

সরলা দেবীর নেত্রীত্বে প্রতাপাদিত্য-উৎসব ও উদয়াদিত্য-উৎসব শুরু হয়।

"তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে-সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন "আপনার মামা ভীষণ চটে গিয়েছেন আপনার উপর।"

"কেন?"

"আপনি তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে প্রতাপাদিত্য কখনো কোনো জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।"

আমি দীনেশবাবুকে বললুম "আপনি তাঁকে বলবেন, আমিও প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ ব'লে খাড়া করতে যাইনি। তাঁর পিতৃব্যহনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাঙলার শিবাজী ছিলেন, মোগল বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার হয়ে বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামে সিক্কা চালিয়েছিলেন সেই পৌরুষ,

সেই সাহসিকতার হিসেবে যে তিনি গৌরবার্হ তাই প্রতিপন্ন করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।"[৫৫]

এই রকম একটা পরিবেশে প্রায়শ্চিত্ত রচনা। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এ প্রায়শ্চিত্ত কার? প্রতাপাদিত্যের, না তাঁর পুত্রের? না বিভার? সম্ভবত কারো নয়। এ প্রায়শ্চিত্ত স্বৈরশক্তির প্রায়শ্চিত্ত; তাই নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে ভয়হীনতার মধ্যে। অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তটাই স্থায়ী ব্যাপার নয়।

জীবনীকার যথার্থ ই বলেছেন, "শারদোৎসবের রাজা বিজয়াদিত্য হইতেছেন প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্যের antithesis বা বিপরীত ধর্মা; প্রতাপ নিজ অহংকারকে সংযত করিতে না পারায় প্রজাপীড়ক, বিজয়াদিত্য নিজ অহংকারকে বিসর্জন দিবার জন্য সন্ন্যাসী।"[৫৬] প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপাদিত্য মুক্তধারায় গিয়ে হয়েছেন রণজিৎ, আর রক্তকরবীর রাজাতে গিয়ে তার পূর্ণতা। যখন পূর্ণতা, তখন সেই প্রতীকেরও পূর্ণতা।

রাবণের গৃহেই রয়েছে রাম আর সীতা। প্রতাপাদিত্যের গৃহে বসবাস করছে পুত্র উদয়াদিত্য আর পুত্রবধূ সুরমা। এরা প্রতাপাদিত্যের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—"রাজার ঘরে উত্তরাধিকারী জন্মায়, পুত্র জন্মায় না।"

"রামচন্দ্র যেমন ভুলেছিলেন তিনি অবতার, তোমারও সেই দশা হয়েছে। কিন্তু ভক্তকে ভোলাতে পারবে না।" —সুরমা।

এ কাহিনীর বাইরে বিরাজ করছে ইতিহাস, অন্তরে রাম-কথা। আর ঘুরতে ঘুরতে এই কাহিনী যথার্থ প্রতীক হয়ে দাঁড়াল রক্তকরবীতে।

অত্যাচারী বুকের মধ্যে তারই মৃত্যুবাণ চিরকাল গচ্ছিত থাকে।

প্রায়শ্চিত্তের বক্তব্য পরিত্রাণে গিয়ে সংশোধিত হয়নি, শুধু সূচীমুখ হয়েছে। বক্তব্যের ফলায় ধার পড়ার অর্থ নাটকত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি। পরিত্রাণ সংক্ষেপিত, তাতে সে বৈচিত্র্য হারিয়েছে; তবে দৃশ্যসংখ্যা কমবার ফলে গতিবেগ বেড়েছে। পরিত্রাণে যে আঙ্গিকের অনুসরণ হয়েছে, তা হোল নব্য নাটকের আঙ্গিক। কিন্তু পরিত্রাণে কোন দ্বিতীয় অর্থ আবিষ্কারের সুযোগ প্রত্যাখ্যাত।

সম্ভবত এই কারণেই নাট্যকার আবার ঐ নাটকের কথাবস্তুর নবতর এক রূপ দিলেন মুক্তধারাতে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর আখ্যায়িকায় আর একটি নতুন গল্প সংযোজিত হোল। রণজিৎ, অভিজিৎ—এরা নাম-বদলানো পুরানা নাটকের কুশীলব। এই কারণেই 'মুক্তধারা' খেয়া কাব্যের অনুচর নয়।

মুক্তধারায় প্লটের গাঁথুনি দৃঢ়সংবদ্ধ, চরিত্রগুলি রেখায়িত এবং বক্তব্যের মধ্যে একটা অতিশয়তা আছে ; এবং আছে সীমান্ত-উত্তরণ প্রয়াস।

মুক্তধারা নিঃসন্দেহে উন্নততর রচনা , কিন্তু মুক্তধারা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সংশোধিত বা নবতর সংস্করণ নয়, সম্পূর্ণ নতুন নাটক। তবে 'মুক্তধারা'য় ব্যক্তি-অনুভবের নিগূঢ় প্রকাশ নেই। তার মধ্যে সমাজ-কৌতূহল আছে , তীব্রভাবেই আছে।

প্রায়শ্চিত্তের নানা পরিবর্তন নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। তবে প্রায়শ্চিত্ত নাটকেব মধ্যে এমন অনেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে,যা ভবিষ্যতমুখী। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগী পরবর্তী নাটকে ঠাকুরদাদায় রূপান্তরিত হবে। মতিলাল রায়ের যাত্রার বিবেকের সঙ্গে তার অমিল আছে ; ধনঞ্জয় বৈরাগী ঘটনার মধ্যে অংশগ্রহণ করে। তাই 'বিবেক' হলেও সে সক্রিয় বিবেক। পুরানা নাট্য-কৌশলের উপর এইভাবে রবীন্দ্রনাথ একটি মোচড দিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই নাটকে গানের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু এ গানগুলির অনিবার্যতা কি অস্বীকার করা যায় ? দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ ও ষষ্ঠ দৃশ্যে তিনটি ফবমায়েজী গান আছে। প্রমোদসভায় সাধারণত ফরমায়েজী গানই নটনটীরা গেয়ে থাকে। কিন্তু সেই ফরমায়েজী গান ফরমায়েজদাতাকে প্রতারিত করে কোন এক মন্দভাগিনী নারীর আন্তরিক আকুতি প্রকাশ করেছে।

বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।

এই নাটকের পরিণতি কি হবে, তা বুঝতে দর্শকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। একেই বলে 'dramatic irony'. প্রায়শ্চিত্ত নাটকের গান যে মুখেই বসুক, কখনও মুখরা হয় নি।

এই নাটকের বুকের মধ্যে সমসাময়িক যুগের নিগূঢ় ব্যথা গুমরে গুমরে কাঁদছে। তখন বাংলা দেশের সকল যুব-সংগঠন বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। শত শত তরুণ গ্রেপ্তার হচ্ছে।[৫৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে ধনঞ্জয় বৈরাগী গাইল—

ওরে আগুন, আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।

বাংলার ইতিহাসের এ যুগই 'অগ্নিযুগ' নামে পরিচিত। প্রবন্ধে-বক্তৃতায় কবি যাই বলুন, নাটকে সেই অগ্নিশিশুদের কণ্ঠে তাঁর প্রীতির মাল্য অর্পিত হোল।

নইলে এ নাটক মতিলাল রায়ের নাটক হয়ে পড়ত। সেই দুরন্ত দুঃসময়ে মতিলাল ভক্তিমূলক নাটক পল্লীতে-পল্লীতে অভিনয় করার জন্যই রাজকীয় সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন।

প্রতাপাদিত্যের মধ্যে একটা প্রতীকতা আছে, কিন্তু কোন সাংকেতিকতা নেই। সাংকেতিকতা যেমন বলে, তেমনি গোপন করে। সাংকেতিকতার মধ্যে একটা যুক্তিহীন আদিমতা আছে। সাংকেতিকতার প্রকাশে প্রতীকের ব্যবহার অবশ্য দরকার।

রঘুপতি এক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি, প্রতাপাদিত্য আর এক শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি; তবে উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় মিল আছে। সে হোল উভয়ের দর্প। দর্প যখন মনুষ্যত্বকে ছাপিয়ে যায়, তখন সেটা শক্তির গৌরব নয়, শক্তির কলঙ্ক।

প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চেয়ে ধনঞ্জয় বলেছিল,

"আহা, রাজা আমার, অমন নিষ্ঠুর সেজে
একী লীলা হচ্ছে।"

অপর্ণাও রঘুপতিকে দেখে বলেছিল—

কী কঠিন তীব্র দৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবমন্দিরের।

জয়সিংহ বলেছিল—

এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো।

একদিন এই সব দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার অবসান হয়ে গেল; রঘুপতির মুক্তি সম্ভাবিত হোল। প্রতাপাদিত্য মাঝপথে থেমে থাকল।

উদয়াদিত্যও যেন জয়সিংহের দ্বিতীয় জন্ম। একই প্রকারে সেও আশ্রিতের শিবিরে বাস করে তার মৃত্যু বা মুক্তি কামনা করছে। তাই মাধবপুরের প্রজারা উদয়াদিত্যকে নিয়ে যেতে চায়—কারণ তারা দুবছর খাজনা দেয় না।

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি করে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ, মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝেনা—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে, আরে এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিসনে।

জয়সিংহের ভূমিকা উদয়াদিত্য আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে—দেবমন্দিরের চত্বর থেকে মাতৃভূমির বিপুল অংগনে। তখন জাতির জীবনে—বাংলায়-মহারাষ্ট্রে যা ঘটেছিল, সে সব কথা এখানে স্থান পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষাবস্থা চলছিল ; প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রের নেতা লোকমান্য টিলক খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেছেন। আর শাসিতের উপর অমানুষিক অত্যাচার তখন সারা বাংলা জুড়ে চলছিল। ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-সত্যেন বসুর আত্মাহুতির যুগ এটা। এসব অভিজ্ঞতা, বাস্তব ঘটনাসমূহ 'বৌঠাকুরাণির হাট'-উপন্যাসের পুরানা গল্পের সীমানা অলক্ষ্যে ভেঙ্গে ফেলল। নাটক তাই উপন্যাসের নাট্য-রূপান্তর মাত্র নয়। তখনকার টগবগ-করা রাজনীতি এখানে রীতিমত উপস্থিত হয়েছে।

আবার 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে 'রাজা' একটা বিরাট ব্যবধান। কারণ রাজা সমসাময়িকতাকে কোনরূপ প্রশ্রয় দেয়নি। খেয়া থেকে গীতাঞ্জলি কাব্যে যে নিগূঢ় ভক্তিবিনম্র অথচ রহস্যময় ভাবসমষ্টির প্রকাশ ঘটেছে, এখানে তার নাট্যরূপ দেখা দিল। রূপ থেকে অরূপের পাড়ে তিনি এসে দাঁড়াচ্ছেন।

প্রাণের মানুষ প্রাণেই আছেন। তাঁকে সকলখানেই দেখছেন, তবু—তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা যাচ্ছে কি ? "চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে ; তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটাতো দিনরাত্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে ; কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী যে, সে-সমস্ত কিছু চায় না বলেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো—এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার গুহারই রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্যরূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না। সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্চে তিনি, সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না ; তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং—কি সাহিত্যে, কি ইতিহাসে, কি শিল্পে, কি ধর্মে, কি কর্মে!"[৫৭ক] শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় বা 'আমার ধর্মে' যা তিনি বলেছেন, তা তাঁর দার্শনিক প্রত্যয় নয়, তা হোল তাঁর অনুভূত সত্য। রাজা' নাটকে খেয়া কাব্যের প্রভাব সর্বাধিক।

১৩২৪ সনে একটি প্রবন্ধে 'রাজা' নাটকের মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

" 'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই—তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে, তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা, যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে-পদে বাধা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না। সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, ব্যথাতেই আনন্দ।"৫৮

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা একাধারে ব্যাখ্যা, ও কথাবস্তুর সারসংকলন। রাজা নাটকের কথাবস্তু মোটামুটি এক কাল্পনিক রাজ্যের রাজধানীতে ঘটেছে।

এ নাটকে কোন অঙ্কবিভাগ নেই, শুধু দৃশ্যবিভাগ আছে—কুড়িটি দৃশ্যে নাটক সম্পূর্ণ।

প্রথম দুইটি দৃশ্যকে প্রস্তাবনা বলা যায়। ১ম দৃশ্যে প্রথম গানটি কে গেয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই; গানটি এসেছে নেপথ্য থেকে। সংস্কৃত নাটকের মত বন্দীদের বা ভাটদের গান? হংসপদিকার গান? না, তাও নয়। এ স্বয়ং রাজার গান। নাটকের মূল বক্তব্য ধরিয়ে দেওয়া হোল; আর তার সঙ্গে চলল সমান তালে সুরঙ্গমার টীকা। সুরঙ্গমার পরিচয় হোল, সে রাণীর দাসী। বৈষ্ণব সাধনায় দাসী বা দূতীর বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেই মরমিয়া সাধনার ইঙ্গিতে হয়ত সুরঙ্গমার অবতারণা। ১ম দৃশ্যে নেপথ্যে রাজা, প্রকাশ্যে সুদর্শনা আর সুরঙ্গমা। ২য় দৃশ্যে নাগরিকেরা এসেছে, আর এসেছেন ঠাকুরদাদা। তিনি এসেই—দক্ষিণ-দুয়ার খুলে দিলেন—অর্থাৎ এ নাটক যে মধুমাসের নাটক, বাসন্তী রঙে রাঙানো, এবং মিলনের ঋতুর পালা, তা বলে দিলেন। তৃতীয় দৃশ্যে উৎসব উপলক্ষে এসেছেন নানান দেশের রাজা। আর সেখানে এক ভণ্ড রাজা এসেছে, সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাটকের নাটকীয়তা তখন শুরু হয়। রাণী ভুল করলেন। তৃতীয় দৃশ্যটি একেবারে মেলার দৃশ্য; সাত প্রকার লোকের সমাবেশে বাংলা নাটকের পোশাকী হাওয়া ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। তারপর নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে রাণী রাজার কাছে এসে উপনীত হলেন।

রাণী সেদিন বললেন,

"তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও। তুমি অনুপম।"

রাজা তখন সেই অন্ধকারের দ্বার একেবারে খুলে দিলেন—কারণ এখানকার লীলা শেষ হয়ে গেছে।

"এসো, এবার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।"

সুদর্শনা বললেন—

"যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।„

অজিত চক্রবর্তী বলেছিলেন, "এ নাটকে কতকগুলি নিতান্ত স্থূল মানুষের রাগদ্বেষ প্রণয়াদি হাসিকান্নার ব্যাপারের কৃত্রিম উত্তেজনাপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে না।"[৫৯] সম্ভবত এই বিশ্লেষণ উদারতর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। স্থূল মানুষ না থাকলে সাহিত্য হয় না ; নাটক ত কিছুতেই হয় না। তাদের স্থূলতর আচরণও থাকবে, নাটকও থাকবে। এ নাটকের জাত আলাদা। তাই স্থূল মানুষের স্থূল আচরণ সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বহন করবে।

রাজনৈতিক কলহ, প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষ—সবই এ নাটকে স্থান পেয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এই ঘটনাগুলি নাটকের বক্তব্য উৎসারণে প্রতিবন্ধকতা করেছে।

সাহিত্যে বাস্তব সংসার হয় একটু ঊর্ধ্বে উঠবে, না হয় একটু নীচে নামবে। সম্ভবত এই নাটকে বাস্তব তার উপস্থিতির যথার্থ মাত্রা নির্ণয় করতে পারেনি।

তাই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলহ-সংঘাত সাজানো ব্যাপার বলে ভ্রম হয়। প্রজাপুঞ্জের কথোপকথনে তাদের বাস্তব জীবনের কোন প্রসঙ্গ নেই, রবীন্দ্র-নাটকে জনতার প্রসঙ্গে যা অভাবিত। রাজা ও রাণী নাটকের জনতা, বিসর্জনের জনতা, প্রায়শ্চিত্তের জনতা—সর্বত্রই তারা তাদের বাস্তব জীবনের তীক্ষ্ণতম প্রকাশ নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু 'রাজা' নাটকে তারা কেবল নিতান্তই নাগরিক, সাধারণ মানুষ নয়।

এ ছাড়া রাজ-রাজড়ার যে সব উপাখ্যান আছে, সেগুলিও কোন সময় সজীব হয়ে ওঠেনি, বানানো গল্প বলে মনে হয়েছে। অথচ রূপকথার সারল্যও তাদের মধ্যে নেই। রাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্বাসযোগ্য হয়নি ; বড় চরিত্র ভুল করে বড় ব্যাপারে।

রাজা নাটকে সুদর্শনার বেদনার অভিজ্ঞতা তাই ততটা ব্যক্তিগত ও সাংসারিক বলে মনে হয় না, যতটা মনে হয় কাব্যিক। এই কারণেই এই নাটক

'রূপকধর্মী' বলে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। রাণী যাকে দেখে ভুলেছিলেন, সে কি ভোলাবার যোগ্য? তাই রাণীর পতন ও উত্থান মহিমাব্যঞ্জক নয়। তার বাস্তবতা বাস্তবসম্মত হতে পারে, কিন্তু চরিত্রসম্মত নয়।

কবি অবশ্য তাঁর কালের রসজ্ঞ ব্যক্তিদের সমালোচনায় স্তম্ভিত হয়েছিলেন।

"Brajendra Babu's criticism astounted me, রাজা not human! Allegorical! What next! Why? The character of the Queen so absorbed me that I could think of nothing else for days. It was a living soul, going through an agony of conflict and entering at least into a peace, a soul living that I knew her intimately and could almost speak with her."৬০

কবি এই নাটক সম্বন্ধে অন্যত্র বলেন, "আমার রাজা নাটকের সমালোচনার বিষয়ে আপনি উল্লেখ করেছেন। মানুষের আত্মায় যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোনো ভেদ নেই। মানবপ্রকৃতির পাপলিপ্সার প্রতীক লেডি ম্যাকবেথ। সুদর্শনাও কিন্তু নিছক একটি কাল্পনিক চরিত্র নয়। যাই হোক, এর তাৎপর্য সম্বন্ধে সমালোচকদের অভিমত কি—তাতে এসে যায় না। তারা যা আছে তাই—সেই জন্য কোনো নিয়মের কোঠায় তাদের বন্দী করা কঠিন।"৬১

লেডি ম্যাকবেথ প্রতীক হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি ত অন্য কোন ভুবনের নিশানা দিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য তাঁর মধ্যেই শেষ; তাঁর সব ধনই আছে সংসারে, কোন কিছুই স্বপ্নের, নিভৃত স্বপ্নের জন্য নেই।

সুদর্শনা এসে অর্থের সেই বেড়া ভেঙ্গে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্তও তাঁর এই পর্বে লিখিত নাটকসমূহের বিশেষ চরিত্রটি মানতে চাইতেন না। রক্তকরবীর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের পরে তার প্রমাণ সংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এতটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞান বিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

......এ নাটকটি পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না।"

"আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ

করে। তাকে বের করে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।"৬২

কবি যাই বলুন, এই জাতের নাটকে যতটুকু বলা, তার সমপরিমাণ না-বলা কথা থাকে। মরমী দর্শক তা অনুভব করেন, আর বাকী সবাই তুলকালাম কাণ্ড করেন প্রেক্ষাগৃহে। বাংলা নাটক একটা নতুন জগতে প্রবেশ করল। গিরিশচন্দ্র কোন কোন নাটকে এই ধরণের চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সেগুলি ছিল মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গিজাত।

অধ্যাত্মচেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক ধর্মবোধ-নিরপেক্ষ করলেন। ফলে এই নাটকের রস গ্রহণে সর্বসাধারণের পক্ষে কোন বাধা থাকল না। প্রতীকী নাটকের ক্ষেত্রে এ এক নবদিগন্তের-উন্মোচন।

'রাজা' রূপক নাটক নয়, প্রতীকী নাটক। রূপক হলে তার অর্থের জন্য কোন অনুমানের আশ্রয় নিতে হোত না। প্রবোধচন্দ্রোদয়ের মর্মব্যাখ্যার জন্য কোন টীকাকার ক্লেশ বোধ করেন নি। আর দুই জন টীকাকার দুইটি মত পোষণ করেন নি। প্রতীকের ব্যাখ্যায় বিকল্পের সুযোগ থাকে।

কালীমোহন ঘোষ মহাশয় নাটকটির অনন্যতা যথার্থ অনুধাবন করেছিলেন। ভারত-মহিলা পত্রিকায় লিখেছিলেন, "এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ নাটক বঙ্গালয়ে আর নাই!"৬৩

সাহিত্য পত্রিকায় এই মন্তব্যকে দৈববাণী বলে ব্যঙ্গ করা হয় এবং গ্রহণযোগ্য নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়।

একথা ঠিক, রাজা নাটকের প্রতীকত্ব পুরো ফুটেছে; কিন্তু জীবনের সঙ্গে তার যোগ অপেক্ষাকৃত দুর্বল। প্রতীকের প্রথম আবির্ভাবের জন্যই হয়ত বক্তব্যকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করার জন্য নাট্যকারকে বেশি আড়ম্বর করতে হয়েছে। গানের সংখ্যা খুবই বেশি; এক বসন্তের গানই আছে ছয়টি। এত রঙের প্রলেপে চিত্রের রেখাগুলি সূক্ষ্মতা হারায়।

রাজা নাটকের পরিবর্তিত রূপ হোল অরূপরতন। অরূপরতনে রাজা একেবারে অনুপস্থিত, তার মুখের কথা ও গান অন্য পাত্র-পাত্রীদের মুখে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া একটি প্রস্তাবনাসূচক গান আছে; আর দুই-একটি নতুন গান আছে। বসন্ত সম্বন্ধে তিনটি গান বাতিল করা হয়েছে। স্বয়ম্বর-সভার সম্পূর্ণ দৃশ্যটি ছেঁটে দিয়েছেন নাট্যকার। দৃশ্য সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। আর একটি সাংঘাতিক পরিবর্তন করেছেন,—রাজা ও সুদর্শনা এখানে পূর্ব থেকে

পরিণীত নয়। বলা বাহুল্য এসব পরিবর্তনে গল্পের সঙ্গতি ও সংহতি বহুগুণ বেড়েছে।

এত প্রকার অদলবদল সত্ত্বেও নাটকটিকে পৃথক নাটকের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ এই পরিবর্তনের অনেকখানিই নাট্যপ্রযোজকের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

রাজা নাটকে যা ছিল সাংকেতিকতাপূর্ণ, অচলায়তনে তা হোল সুঠাম রূপক। অচলায়তনে এমন কিছু নেই, যা বুদ্ধির অগম্য, এবং অনুভববেদ্য।

রাজা নাটকের ঘটনাস্থল কখন প্রকোষ্ঠ, কখন পথ বা মেলার প্রাঙ্গন. অচলায়তনের ঘটনাস্থল তেমন নয়।

অচলায়তন নাটকে একান্ত অন্তরঙ্গ বলে কোন দৃশ্য নেই। অচলায়তনের সকল দৃশ্যেই সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার, সব দৃশ্যই সাধারণ দৃশ্য। রূপক নাটক বলেই তার অঙ্গনে সাধারণতার হাওয়া এমনভাবে খেলা করছে।

অচলায়তনের আখ্যায়িকা কবির সম্পূর্ণ স্বপরিকল্পিত; রাজা ও মালিনীর আখ্যায়িকার মত অপরের সম্পদের ছায়া অঙ্গীকার করেননি।

কাহিনী-গ্রন্থনায় অভিনবত্ব আছে। তাসের দেশ, রথের রশি আর অচলায়তন প্রায় একই আঙ্গিকের রচনা। তবে নিঃসন্দেহে তাসের দেশ অপেক্ষা এখানে নাট্যকার অনেক নিরঙ্কুশ।

নাটক শুরু হয়েছে গান দিয়ে—সেই গান ঘুম-ভাঙানিয়া গান—অথচ এসেছে সবার অলক্ষ্যে।

মহাপঞ্চক আর পঞ্চকের মধ্যে কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল যে, এখানকার বিদ্যা কিছুই পঞ্চক আহরণ করতে পারেন নি, অথচ পঞ্চক আর মহাপঞ্চক দুই ভাই। একজন অচলায়তনে মহাপণ্ডিত আব একজন কোন মন্ত্র মুখস্থ করতে পারেন না, উল্টে আরও জিজ্ঞাসা করেন মন্ত্রটার অর্থ কি, ফল কি ইত্যাদি। পিতার মৃত্যুর পরে ওঁরা দরিদ্র ছিলেন বলে অবজ্ঞাত হয়েছেন, আজ মহাপঞ্চক 'সাধনা'র জোরে সে অবজ্ঞা অপনোদনে সক্ষম হয়েছেন। মহাপঞ্চক প্রস্থান করলে একদল ছাত্র এসে উপনীত হোল, তাদের কাছ থেকে জানা গেল যে, চতুর্মাস্যের সময় গুরু আসছেন। মহাপঞ্চক এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল, গুরু কবে আসবেন। তিনি বললেন, সময় হলেই আসবেন।

এমন সময় একজন ছাত্র এল, তার নাম সুভদ্র। সে এক মহাপাপ করে ফেলেছে, উত্তর দিকে জানালা খুলে ফেলেছে, এবং দেখেও ফেলেছে। ঐ

উত্তর দিকের জানালা নাকি তিনশত পঁয়তাল্লিশ বছর কেউ খোলে নি। উপাধ্যায় বললেন, জানিনে কী সর্বনাশ হবে, উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী।

এই সময় সেখানে আচার্য ও উপাচার্য এসে হাজির হলেন; উভয়েই জেনেছেন গুরু আসছেন। গুরু আসবেন জেনে আচার্য আত্মজিজ্ঞাসায় রত হলেন। তাঁর মনে এই প্রশ্ন এলো, সব শাস্ত্র পড়ার পর, সব ব্রত পালন করার পর কী তিনি পেয়েছেন। মনে হোল তাঁর এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে, কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

অবশ্য এই আত্মজিজ্ঞাসা উপাচার্যের মনে উদয় হয় নি। সুভদ্রের অপরাধের বিচার হোল; শাস্ত্রমতে তার শাস্তি বিধান হোল; কিন্তু আচার্যদেব বললেন—

না হতে দেব না, যদি কোন অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাচার্য খুশি হলেন না; বরং আচার্যকে সরিয়ে দেবার কথাই ভাবলেন। মহাপঞ্চক জানাল আচার্যদেবের অভাবে উপাচার্যকেই আচার্য হতে হবে। অবশ্য উপাচার্য এই প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা গেল পঞ্চক শোনপাংশুদের মধ্যে রয়েছে, তাদের সঙ্গে গান করে, হাসে, মেলামেশি করে। শোনপাংশুরা শ্রমজীবী, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে বলে অন্ত্যজ আখ্যা পায়। শোনপাংশুদের মুক্ত জীবন আর মুক্ত প্রকৃতি পঞ্চকের মনে গান ধরিয়ে দিল। তার গানের মধ্যে দাদাঠাকুর শোনপাংশুদের নিয়ে প্রবেশ করলেন। দাদাঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথা হোল—অচলায়তনের কথা, আচার্যদেবের কথা। একদল শোনপাংশু এসে জানাল স্থবিরপত্তনের রাজা চণ্ডক নামে একজন শোনপাংশুকে মেরে ফেলেছেন। চণ্ডক স্থবির হবার জন্য তপস্যা করেছিল; খবরটি জানতে পেরে স্থবিরপত্তনের রাজা মন্থরগুপ্ত তাকে কেটে ফেলেছেন; দশজন শোনপাংশুকেও ধরে নিয়ে গেছেন; সম্ভবত দেবী কালঝণ্টির কাছে বলি দেবেন। দাদাঠাকুর অচলায়তনের প্রাচীর ধূলোয় লুটিয়ে দেবার জন্য বললেন।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই আচার্য অদীনপুণ্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলেছে। সুভদ্র প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য উদগ্রীব; আচার্য তাতে সম্মত নন। রাজা মন্থরগুপ্ত এসে হুকুম দিলেন আচার্য অদীনপুণ্যকে নির্বাসিত করা হোক। এবং

তিনি উপাচার্যকে আচার্য পদে বৃত করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। আচার্যকে অচলায়তনের ভিতরেই দর্ভকপল্লীতে নির্বাসিত করা হোল। পঞ্চককেও সেখানে নির্বাসিত করা হোল।

চতুর্থ দৃশ্যে দর্ভকপল্লী দেখা গেল। এই পল্লীতে এসে আচার্য তাঁর নির্বাসন সার্থক বলে মনে করলেন। প্রথম দিনে তাঁর মনে গ্লানি এসেছিল। কিন্তু ওদের সহজ সরল জীবন ও ঈশ্বরানুরাগ দেখে তাঁর মনের গ্লানি দূর হয়ে গেছে। সুভদ্রের কথা ভেবে আচার্য দুঃখ করলেন।

"ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে।" তাঁদের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন এই দর্ভকপল্লীতে উপাচার্য। ডালিতে কেয়াফুল কদম্ব ফুল নিয়ে দর্ভকদল প্রবেশ করল; মাদল বাজিয়ে গান করল। তাদের গানের মধ্যে বজ্রসহ বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হোল। এমনি ভাবে সেই রাত অতিবাহিত হোল। অচলায়তনে গুরুর আগমন নিয়ে যখন সকলে জটলা করছে, তখন ভাঙ্গা প্রাচীরের উপর দিয়ে যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুর প্রবেশ করলেন। সঙ্গে শোনপাংশু দল।

যিনি দাদাঠাকুর, তিনিই গুরু। মহাপঞ্চক তাঁকে স্বীকার করতে চাইলেন না।

"না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।"

দাদাঠাকুর বললেন—আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

—তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

—আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি। অচলায়তনের বালক দল এসে দাদাঠাকুরকে প্রশ্ন করল—ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।

এবং খেলবেন খোলা মাঠে, এবং জানালেন যে, খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না।

ষষ্ঠ দৃশ্য দর্ভক পল্লীতে; সেখানে আমরা দেখব আচার্যদেবকে পঞ্চক ও দর্ভক দলকে। অচলায়তনে যিনি গুরু, এখানে তিনি গোঁসাই ঠাকুর। তাই পঞ্চক প্রশ্ন করল—

এখন আমি ভাবছি, তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু? তার উত্তরে দাদাঠাকুর বলবেন—

যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

আচার্য দাদাঠাকুরের কাছে এসে অপরাধ কবুল করল; তার জন্য কী বিধান, তা জানতে চাইল। তখন বাইরে বর্ষা নেমেছে। এ বর্ষা দুর্যোগের কাল নয়, মিলনের কাল। সুভদ্র এসে জানাল যে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হয় নি। দাদাঠাকুর বললেন তার আর কোন প্রয়োজন নেই। একজটা দেবীর সমস্ত জটা আষাঢের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গেছে। তৃণ অন্বেষণ করতে করতে উপাচার্য প্রবেশ করলেন। গুরুকে দর্ভকদের পাড়ায় দেখে বিচলিত হলেন। কিন্তু বিচলিত হলে কি হবে, গুরু দর্ভকদের নিয়ে, বালক ও শোনপাংশুদের নিয়ে গডার কাজে হাত দিলেন। কাল রাত্রে যুদ্ধের সময় স্থবিরকদের রক্তের সঙ্গে শোনপাংশুদের রক্ত মিশে গেছে।

শারদোৎসব বা প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে এখানে 'মনের মানুষ' খোঁজার রীতির সাদৃশ্য আছে। 'রাজা' নাটকে ছিল ব্যতিক্রম। রাজা নাটক 'খেয়া' কাব্যের একান্ত সন্তান, তাই সেখানে দুর্জ্ঞেয়তার প্রতি সম্মান দেখান হয়েছিল।

শরতের নীল আকাশের মতই শারদোৎসবে বক্তব্য পরিষ্কার, প্রায়শ্চিত্ত ত কোন দ্বিতীয় বক্তব্য দাখিল করার ভাণ করেনি। অচলায়তনে দ্বিতীয় বক্তব্য আছে—এ বিদ্যালয় উপরে একটি বিদ্যায়তন মাত্র, ভিতরে এ হোল আমাদের রক্ষণশীল সমাজ। এই সমাজকে ভাঙবে অন্ত্যজ শ্রেণী, গড়বেও তারা। কারণ তারা সহজকে জটিল করে নি। এই ভাঙার কাজে সহয়তা করবে ভিতরের মানুষ, স্বয়ং অদীনপুণ্য। এই পুথির ধর্মকে তিনি স্বীকার করতে পারছিলেন না। অন্তরের শাশ্বত পিপাসা শুকিয়ে রেখে শাস্ত্রের শুষ্ক নির্দেশ মেনে চলার বিরুদ্ধে তলায়-তলায় একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চক ত সকলের ঘুম-ভাঙার অনেক-অনেক আগে কার যেন ডাক শুনতে পেয়েছিল, সে ডাক নিয়ম-মানার ডাক নয়, নিয়ম-ভাঙার ডাক।

দর্ভকসমাজ, শোনপাংশু সমাজ—এরা কেউ বিদেশী, কেউ অন্ত্যজ, সমাজে এরা অবহেলিত, অনগৃহীত, অনাদৃত, এবং অন্তেবাসী। কিন্তু মুক্তির সেনানী তারা; স্থবিরপত্তনের স্থবিরকদের সঙ্গে তাদের লড়াই হবে।

মনে রাখা উচিত রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী সংঘর্ষে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষের অস্তিত্ব কারো ইচ্ছা-অনিচ্ছার, সমর্থন-অসমর্থনের উপর নির্ভর করে না।

যারা অধিকার করে বসে আছে, আর যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর যাঁকে সবাই গুরু বলে মানবেন, যে মন্ত্র সেই মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় মন্ত্র, তা আসবে এই অন্তেবাসীদের সংস্পর্শে। কারো কাছে তিনি গুরু, কারো কাছে দাদাঠাকুর, কারো কাছে শুধু গোঁসাইঠাকুর। নবীন মন্ত্র বিশেষ শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়ে এইভাবে ব্যাপকতর ঔচিত্য লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষার পুথিসর্বস্বতা, আমাদের সমাজের অর্থহীন স্মৃতি-আনুগত্য কোনকালেই পছন্দ করেন নি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'বিদেশী পণ্য বর্জন'—আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানকে আদর্শস্থানীয় এবং অপরিবর্তনীয় বলে প্রচার করা হোল।

"আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপর নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেই জন্যেই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত জড় সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে—তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোন নিদর্শন না পাই—আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে আমাদের মধ্যে পূর্বপুরুষেরা আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল—গ্রাম্য ভাষায় ও কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্ব পুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।"[৬৪]

অচলায়তনের বক্তব্য নতুন বক্তব্য নয়, কিন্তু তবু প্রকাশ-মুহূর্তে প্রতিবাদের তুফান উঠেছিল। বিপিনচন্দ্র পাল, সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিতর্কে নেমেছিলেন।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে কিছু যুক্তি ছিল, শুধু হিঁদুয়ানীর দোহাই নয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনার জবাবে কবি বলেছিলেন, "অচলায়-

তনের লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছিল বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।"৬৫

এসব কথাতেও প্রতিপক্ষ নীরব হোল না; সাহিত্য লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ক হউন আমরা আনন্দলাভ করিব। কিন্তু না বুঝিয়া হিন্দুধর্মকে আঘাত করিবেন না।"৬৬

আসলে নাটকের আলোচনা সেদিন হয় নি। অধ্যাপক বিশী বলেছিলেন, অচলায়তন হোল নাটকের মুখ্য প্রতীক। অচলায়তনের শুষ্কতা পূর্ণ করে রেখেছে গ্রীষ্মের খরদাহ। শোনপাংশু ও দর্ভকদের অভিযান যেন বর্ষার অভিযান! গ্রীষ্মের খরতাকে শাসন করেছে শ্যামল বর্ষা। বঞ্চিত বন্ধ্যা ভূমিতে জীবনের পদপাত!

অচলায়তন এতদসত্ত্বেও প্রতীকতা অর্জন করতে পারে নি, যেহেতু তার সবটুকুই ব্যক্ত হয়েছে, অনুমানের জন্য কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী' গল্পটিকে কেউ প্রতীক বলে নি। বিষ্ণু শর্মা ভালো শিক্ষক, কিন্তু প্রতীক-লেখক নন।

প্রায় দুই যুগ পরে অচলায়তন-এর একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হোল; কবি ভূমিকায় বললেন, "সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায় অচলায়তন নাটকটি 'গুরু' নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।"

অচলায়তন নয়, গুরু—এই নামকরণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে নবীন রূপান্তরের রহস্য।

শুধু স্থূল দৃশ্যবিন্যাস থেকে নয়, সহজ অভিনয়যোগ্যতা থেকে নয়, মূল নাটকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসপ্রধান চরিত্রটি থেকে 'গুরু' নাটক সরে এসেছে। এখানে আধ্যাত্মিক সত্য রূপায়নের ঝোঁক বেশি। মূল নাটকে শাস্ত্র-শাসিত পরিবেশের চিত্রটি আমরা পেয়েছিলাম; কিন্তু রূপান্তরিত নাটকে সে-চিত্র পরিত্যক্ত হয়েছে। অচলায়তনের ধ্বংসসাধন অপেক্ষা, গুরুর আগমনের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের ফলা অনেক ভোতা হয়ে পড়েছে।

নাটকের লক্ষ্য আজ পৃথক্‌ হয়ে গেছে। এই লক্ষ্য পরিবর্তনের কারণ কি?

অচলায়তনের মধ্যে সাময়িকতা প্রবল ছিল। তখন নব্য হিন্দুবাদের (Neo-Hinduism) প্রবল প্রতিপত্তির যুগ। কিন্তু ঐ নাটক যখন রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে নব্য হিন্দুয়ানীর মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। এই পরিবর্তিত পরিবেশে 'অচলায়তনে'র পক্ষেও পরিবর্তন পরিহার্য ছিল না।

অচলায়তন রূপক ; তার জন্মগত সংকীর্ণতার জন্য প্রতীকের তুল্য প্রতিপত্তি অর্জন সম্ভব নয়। অচলায়তনের ইসারা তাই রাজা বা ডাকঘরের ইসারার মত দূরপ্রসারী হতে পারে না।

রাজা নাটকের বাস্তব-অপহ্নতির হেতু সংশোধিত হয়েছে পরবর্তী নাটক অচলায়তনে। অচলায়তনের গল্প প্রাপ্ত গল্প নয়, রচিত গল্প ; কিন্তু তার আসন পাতা হয়েছে সম-সাময়িক কালের জাগ্রত বেদীর মূলে। রাজা নাটকের প্রতীক-অঙ্গীকার আর অচলায়তনের বাস্তব-স্বীকৃতি যুক্তভাবে পরবর্তী নাট্যরচনায় সহযোগিতা করবে।)

ডাকঘর : কাব্যের প্রতিমা

রবীন্দ্র-সাহিত্যসাধনায় কোন পরীক্ষা বা প্রয়াস পরবর্তী প্রয়াসের সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকে না। প্রতি পদক্ষেপেই অগ্রগতির পরিচয় ফুটে ওঠে। এমন কি পিছনের চরণখানি সদা সম্মুখের চরণের সহযোগী।

'ডাকঘর' নাটকটি (১৯১২) 'শারদোৎসব' ও 'অচলায়তনে'র সমস্ত সাধনার, সর্ব অন্বেষার সার্থকতা। এমন পরিপূর্ণ সার্থকতার দৃষ্টান্ত বিশ্বসাহিত্যে বিরল। তবে 'ডাকঘর' নাটকে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, তাঁর কাব্যে তার আভাস পূর্বেই ফুটেছিল। নাটকে শুধু হোল পুনরাবৃত্তি। খেয়া (১৯০৬) কাব্যের রহস্যময়তা এবং গীতাঞ্জলির (১৯১০) আত্মনিবেদন আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছিল। এই দুই কাব্যের দুইটি সুর 'ডাকঘরে' এসে নির্দিষ্ট এক ঠিকানা খুঁজে পেল। তখন রাত্রি ছিল, প্রাত্যহিক কাজও সাঙ্গ, ভাবা গিয়েছিল যে, আজ আর কেউ আসবে না। দুই-একজন তবু বলেছিল-আসবে মহারাজ। আমরা অবিশ্বাসী, আমরা বলেছিলাম, না কেউ আসবে না। তারপর দোরে আঘাত পড়ল, চাকার ঝনঝনি শোনা গেল, রাজার রথের ধ্বজাও কেউকেউ দেখেছিল। তখন আলোর জন্য, বাদ্যের জন্য কত ব্যস্ততা! ঝড়ের রাতের, দুঃখরাতের রাজার আগমন ঘটল সত্যি সত্যি। সমগ্র 'ডাকঘর' নাটক যেন তাঁরই চরণধ্বনির জন্য উৎকর্ণ হয়েছিল।

আবার শূন্য নদীর তীরে কাশের বনে যে বালিকা গোধূলিতে দুইটি কালো নয়ন তুলে প্রদীপখানি জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তার সেই ভেসে-যাওয়া প্রদীপ ডাকঘরে পৌঁছে অমলের শত আকুতির মধ্যে লক্ষ দীপ হয়ে জ্বলছে। রটে গেছে, রাজার দুলাল ঘরের সমুখপথ দিয়ে যাবেন, তখন কি গৃহকাজ নিয়ে মগ্ন থাকার সময়? কন্যাটী তাই বক্ষের মণি রাজপথে না ফেলে দিয়ে থাকতে পারেনি। আর অমল? সে তার সমগ্র জীবন ঐ পথের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে।

ডাকঘর 'খেয়া'র পুনরাবৃত্তি নয়, কিন্তু খেয়ার উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত। শুধু খেয়ার জীবন-বিমুখতা নেই।

শুধু সেইটুকু কেন? অমল সব ভুলে কোন এক অনির্দেশ্য প্রেরণায় আকুল হয়ে রয়েছে। সুন্দরের অভ্যর্থনার জন্য সে সমগ্র সত্তা দিয়ে প্রতীক্ষা করে আছে, তার কোন অলসতা নেই।

ডাকঘর 'গীতাঞ্জলি'রও প্রাণরসে সঞ্জীবিত। অথচ সন্দেহ কি যে, এ এক স্বতন্ত্র শিল্প-মাধ্যম।

ডাকঘরের এই হোল বৈশিষ্ট্য যে, সে সর্বতোভাবে নাটক। অথচ আছে গীতিকবিতার চাতুরী। নানা শাখা অথচ একটি বৃক্ষ।

"কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয়ে মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাবাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় [ডাকঘর] লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা।"[৬৭]

কবি বলেছেন, মনের একটা উত্তেজিত অবস্থায় ডাকঘরের সৃষ্টি; অথচ ডাকঘরের ভাষায় উত্তেজনার স্পর্শ মাত্র নেই। একটা প্রেরণা আছে, উত্তেজনা নেই।

ডাকঘরের কথাবস্তু ও ডাকঘরের বাহ্যরূপ

ডাকঘরের অবয়ব অত্যাশ্চর্য অবয়ব। সব বস্তুকেই আমরা স্থান ও কালের চৌহদ্দির মধ্য দিয়ে দেখি। সতত পরিবর্তনশীল বস্তুর ও কর্মের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্যটুকু এই অবয়বের (form) মধ্যে কেবল ধরে রাখা যায়। স্থান আর কাল—Space and Time—হোল সেই চশমা, যা আমরা চোখ থেকে কদাচ সরাতে পারি না, যা আমরা আদৌ হারাতে চাই না। অবশ্য কাণ্ট বলবেন বস্তুর

সগুণ সত্তায় বস্তুকে আমরা দেখাতে পারি না। বস্তুর সব পরিচয়ই সাপেক্ষ। আমরা এ তর্কে না প্রবেশ করেও বলব, বস্তু ও কর্মের রূপ-নির্মিতিতে বিশেষ কাল ও বিশেষ স্থান সহায়তা করে।

বাংলা নাটক শারদোৎসব থেকে ডাকঘর পর্যন্ত যে বিশিষ্ট অবয়বে দৃশ্যমান, তার জন্য দায়ী তার জন্ম-মুহূর্ত ও জন্ম-স্থান। ১৯০৫-১৯১০ সালে বাঙ্গালীজীবনের বহু ব্যথা সহস্র অক্ষরে বলা যেত না, তার জন্য চাই মিতাক্ষর। অগণিত দেশবাসীর আনন্দ ও বেদনার বেদীমূলে অর্ঘ্য নিবেদিত হবে, তাকে সাদাসিধে হতে হবে; নাটকের গঠন হবে নির্ভার ও অনলংকৃত, দৃশ্যসজ্জাবিরহিত, এবং ইঙ্গিতপ্রবণ। স্পষ্টতা তখন রাজদ্রোহসূচক। প্রায়শ্চিত্তে, অচলায়তনে যেটুকু ইসারা-ইঙ্গিত আছে, তাই ত দারুন সমালোচিত। শুধু রাজাই ব্যতিক্রম। আর সর্বত্রই জীবনের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ ভিন্ন রাগে স্ফুরিত হয়েছে।

ডাকঘর মাত্র তিনটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ। আবার সেই তিনটি দৃশ্যের ঘটনাস্থল এক। মানুষগুলোও দৃশ্যভেদে খুব নতুন নয়। প্রথম দৃশ্যে মাধব দত্ত ঠাকুরদা আর অমল গুপ্ত। প্রথম দৃশ্যে নাটকের মূল সুরটি আমারা ধ্রুবভাবে শুনতে পেলাম। মাধব দত্ত তাঁর দত্তকপুত্রের ব্যাধির কথা ভেবে-ভেবে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; কবিরাজ ব্যবস্থা দিলেন—কোন রকমে শরতের রোদ আর বাতাস থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তারপর ঠাকুরদা এলেন। তিনি কেমন? শরতের রোদ আর হাওয়ারই মতন অবাধ, স্বচ্ছন্দ এবং হাস্যময়। তারপর আমাদের ছোট্ট নায়কটিকে আমরা দেখব। পিসেমশাই এর সঙ্গে তার কথা হবে, শুধু কথা। কিন্তু কথার হাওয়ায় ভেসে ঐ ছোট্ট মঞ্চটির কথা দর্শকেরা ভুলে যাবে। অমলের সুদূরের পিপাসা কালো অক্ষরের মধ্যে আলোর বন্যা বইয়ে দিল।

দ্বিতীয় দৃশ্যটি থেকে অন্য কুশীলবের আনাগোনা। প্রথমে দইওয়ালা, তার কণ্ঠের স্বরে সুদূরের বীণা বাজে। অমল তা দু'কান ভরে তুলে নিল। এল প্রহরী—প্রথমে তার মধ্যে সরকারী কর্মচারীর মর্য্যাদাবোধ ছিল, কিন্তু শিশুর সাহচর্যে তার প্রাবীণত্বের পোকা মরে গেল—শিশুর সঙ্গে সে নানান বেহিসাবী গল্প করল। যাবার সময় ডাকঘরের খবর দিয়ে গেল। রাজার কাছ থেকে অমলের নামে চিঠি আসবে, এ খবর সে-ই ত জানাল।

মোড়ল এলেন; আপন পদ মর্য্যাদা সম্বন্ধে বড়ই সচেতন। একটু ঠাট্টা একটু ব্যঙ্গ দিয়ে তিনি অমলকে আঘাত করলেন। মাধব দত্তের প্রতিও তাঁর

রাগ হোল, কারণ রাজার চিঠি ওরা প্রত্যাশা করে! "দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই।"

মোড়লের মোড়লিভাব থিতিয়ে দেবার জন্য মলের ঝমঝম শব্দের প্রয়োজন হোল। তার সঙ্গে মলধারিনীর। এক সময়ে সে-ও চলে যাবে। জানালার ধারে শূন্য রাস্তার উপর ছেলের দল আসবে। ওরা কিছুক্ষণ খেলবে নানারকম, তারপর এক সময় ডাকহরকরাকে খবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নেবে। অমল এখন রাজার চিঠি পাবার জন্য দারুণভাবে অপেক্ষা করে আছে।

তৃতীয় দৃশ্যে অমল শয্যাগত। কবিরাজ ওকে জানালার কাছে যেতেও বারণ করেছেন। ফকিরবেশে ঠাকুরদা এসে নানা অজানা এবং অপরিচিত দেশের গল্প বলেন। পিসেমশাই চলে গেলে অমল ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করে, ডাকঘরে তার নামে কি রাজার কাছ থেকে চিঠি এসেছে! ঠাকুরদা জানালেন যে চিঠি রওনা হয়ে গিয়েছে এ খবর তিনি শুনেছেন। দুজনে মিলে কত সম্ভব-অসম্ভব দেশের গল্প বলেন। মাধব দত্ত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে প্রবেশ করলেন; রাজা অমলকে চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন, এমন একটা খবর নাকি তারা ছড়িয়ে দিয়েছে। মোড়ল তাতে চটে গিয়ে রাজাকে বেনামিতে চিঠি লিখে এই খবরটা জানিয়ে দিয়েছে। কবিরাজ এলেন, তাঁর মনে হোল রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটেছে; অমলের মুখের হাসি দেখে তিনি বিষন্ন বদনে বললেন, "ওই হাসিটিতো ভালো ঠেকছে না।" তাঁর সন্দেহ হোল যে, বাইরের হাওয়া লেগেছে। জানালা দরোজা ভালো করে বন্ধ করে দেবার পরামর্শ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। মোড়ল এসে সবাইকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করল, একটা অক্ষরশূন্য কাগজ অমলের হাতে দিয়ে বলল, এই যে রাজার চিঠি। তার ঠাট্টায় অমল ব্যথিত হোল। ঠাকুরদা ওই সাদা কাগজের ওপরই রাজার বার্তা দেখতে পেলেন। এমন সময় দ্বারে বাজল করাঘাত। রাজদূত এসে জানাল যে, আজ রাতে মহারাজ আসবেন। এলেন রাজকবিরাজ; তিনি সমস্ত দরোজা জানালা খুলে দিতে বললেন। রাজার আগমনের জন্য ঘরটি পরিষ্কার করে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখতে বললেন।

মাধব দত্ত অমলকে কানে কানে বলল রাজা যেহেতু তাকে ভালবাসেন রাজা এলে সে যেন তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করে।

অমল বলল, সে চাইবে তিনি যেন তাকে ডাকহরকরা করে দেন। ঠাকুরদা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অপেক্ষায়। ঘর অন্ধকার, তারপর

ক্ষীণ আলোয় সব অস্পষ্ট। সুধা এল। অমলকে ডাকল। রাজকবিরাজ জানালেন, ও ঘুমিয়ে পড়েছে। রাজা এলে ও জাগবে। সুধা বলল, "ওর ঘুম ভাঙ্গলে ওর কানে কানে বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলে নি।"

তারার আলোর অস্পষ্টতার মধ্যেই নাটক শেষ।

সত্যের উপলব্ধি শিশুদের পক্ষে সহজ। একথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন।

"একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি তখন সেই সমস্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এই জন্মে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলো-বালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধ রস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ—এটা পুরানো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের বলি পড়ে নি; আমাদের শিশু কালের সেই চির সুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমায় পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভবে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিং খসে নি, আজও প্রতি রাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলছে, বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি। ‥ …সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে, ফলে, সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একেবারে সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো—সত্য হোক তোমার জীবন, তোমার জগৎ জ্যোতির্ময় হোক, অমৃতময় হোক।"[৬৮]

একইভাবে শিশুদের তাঁর কাছে আসতে দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন পৌনে-দু-হাজার বৎসর পূর্বে এক দেবশিশু; এবং এই প্রাচ্য ভূখণ্ডেই তাঁর জন্ম। প্রবীণ প্রাচ্যের নবীনের জন্য চিরকালের উৎকণ্ঠা।

ডাকঘরের স্থান ও কাল

ডাকঘর নাটকের ঘটনাস্থান ও ঘটনাকাল অনির্দিষ্ট; 'রাজা ও রাণী'নাটকের অনির্দিষ্টতা থেকে তা পৃথক্। ঐ নাটকের গল্পকে স্থান-কালের বেড়ি পরিয়ে নির্দিষ্ট করা যেত; কিন্তু লেখক তা করেন নি। কিন্তু ডাকঘরকে নির্দিষ্ট করলে এ

নাটকের কথাবস্তুর মেজাজ বদলে যেত। কারণ এ নাটক জুড়ে আছে অতিশয়-অভিজ্ঞতা। নানা প্রসঙ্গ নানা মুখে বিবৃত হয়েছে। তাই ডাকঘর যত বাস্তব, ততই সে দুনিয়া-ছাড়; যত লৌকিক, তত অলৌকিক। হয়ত রূপকথার সঙ্গে তার একটা মিল আছে। রূপকথা স্থান-কালকে স্বীকার করে না; রূপকথা তাই গরঠিকানিয়া। কে কখন কোথায় কি প্রসঙ্গে বলেছে, এসব প্রশ্নের সদুত্তর ইতিহাসে মিলবে, রূপকথায় নয়।

"যখন আমি নাটকটি লিখেছিলুম, তখন কোন ভাবের প্রেরণা পেয়েছি, তাই এখন মনে পড়ছে। অমল হল সেই মানুষ যার আত্মা মুক্ত পথের আহ্বান শুনেছে। মানী লোকের কড়া মতামতের খাড়া দেয়াল আর অভিজ্ঞ লোকের বিধিবদ্ধ অভ্যাসের বেড়া—এ সবের হাত থেকে সে ছাড়া পেতে চায়। কিন্তু বিষয়টী লোক মাধব দত্ত তার চঞ্চলতাকে মারাত্মক রোগের লক্ষণ বলে ধরে নিলে। তার পরামর্শদাতা কবিরাজও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে শ্লোক আওড়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে ছাড়া পাওয়াটা ওর পক্ষে নিরাপদ নয়, রোগীকে যথাসম্ভব ঘরের বন্ধনীর মধ্যে ধরে রাখা চাই। তাই এত সতর্কতা। এ দিকে জানালার সামনে ডাকঘর বসেছে। অমল রাজার চিঠির প্রতীক্ষায় থাকে। সে চিঠির রাজার কাছ থেকে তার মুক্তির বাণী নিয়ে আসবে। শেষ পর্যন্ত রাজবৈদ্য এসে দ্বার খুলে ফেললেন। প্রচলিত ধর্ম-বিধিও বিষয়বস্তুর জগতে যা মৃত্যু বলে পরিচিত তাই অমলকে আত্মার মুক্তালোকে স্বচ্ছন্দ জন্মের অধিকার এনে দিল। তাই সেই নব জন্মান্তরে একমাত্র জিনিস যা সঙ্গে গেল, তা হোল সুধার দেওয়া প্রেমের ফুলটি।"[৬৯]

ডাকঘর কল্পলোকের নাটক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বরং ডাকঘরে ঐ যুগের ছটফটানি গভীরভাবে ছায়া ফেলেছে। সি. এফ. এনড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে বলছেন, "আমাদের দেশের এই অবস্থায় ডাকঘর নাটকের অন্য কোনো অর্থ কি আপনার মনে আসে? ভারতবর্ষের মুক্তির বাণীও রাজার দূতের হাতেই আসা চাই—ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছ থেকে নয়। এ দেশ যেদিন জাগবে, কোনো দেয়ালই তাকে আর রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না। রাজার চিঠি কি এখনো সে পায়নি?"[৭০] ডাকঘরে স্বদেশ ও স্বকাল একান্তভাবে হাজির। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে লোকমান্য টিলক, এবং মহাত্মা গান্ধী যে এই নাটক প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে প্রমোদ-আসক্তির জন্য নয়। গান্ধীজী যে অশ্রু বিসর্জন-করেছিলেন, সে-ও ভক্তিরসের আস্বাদন

হেতু নয়। প্যারিসের উপর নাৎসীরা যেদিন প্রথম বোমা ফেলল, সেদিন প্যারিসের বেতারে ডাকঘর অভিনীত হচ্ছিল। সে কি কলাকৈবল্যবাদের মহিমা প্রচারকল্পে ?

একই বক্তব্য অচলায়তনে সমালোচনার ভাষায় বলা হয়েছে, আর ডাকঘরে নিবেদনের ভাষায়। অচলায়তনে আছে উষ্মা, ডাকঘরে আছে প্রসন্নতা। শারদোৎসবের সঙ্গে এখানেই তার মেজাজের মিল। শরতের প্রসন্ন রোদ্দুর আর স্মিতবাতাস শেষোক্ত নাটকের প্রেক্ষাপটের সমস্ত গ্লানি—বাইরের এবং মনের—ধুয়ে-মুছে ঝকঝকে, তকতকে করে দিয়েছিল। ডাকঘরেও সেই সস্মিত প্রফুল্লবদনা পৃথিবী সোৎসাহে হাজির। শারদোৎসব থেকেও ডাকঘর এক জায়গায় জিতেছে—তার রাজা সশরীরে হাজিরা দিয়েই আত্মস্বরূপটি তুলে ধরেছেন; এখানে তিনি অনুপস্থিত, তবু বেশি ক'রে স্পষ্ট। এই নাটকের চরিত্র-নির্ণয়ে এই অনুপস্থিতি খুব জরুরী। ডাকঘর রূপক আর প্রতীকের মাঝখানে পদচারণা করেনি। নাটকটির ভাষার মতই তার নাট্যরূপ খুবই স্পষ্ট—রাজদূতের দ্বারে করাঘাতের মত। বিনা কালক্ষেপে ডাকঘর তার যথার্থ আসনটি চিনে নিয়েছে।

ডাকঘরের ভাষা

ডাকঘর সম্পূর্ণ সংলাপনির্ভর। রাজা ও অচলায়তন নাটকদ্বয়ে গান এবং কথা ভাগাভাগি করে আছে। এ নাটকে সংলাপের একচ্ছত্র অধিকার। ডাকঘর নাটকে একত্রে বহুলোক কথা বলেনি, কিন্তু সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রসঙ্গই উত্থাপন করা যাক। কারণ সেখানে অধিকতর চরিত্রের আনাগোনা। প্রথমে দইওয়ালা-অমলের কথাবার্তা। দইওয়ালার কথাবার্তায় প্রথমে ছিল ব্যস্ততা, পরে কাজ-ভুলে যাওয়ার মেজাজের স্পর্শ লেগেছিল তার সংলাপে। অমলের সংসর্গে তার কণ্ঠ থেকে দীর্ঘ-দীর্ঘ সংলাপ চলে এল। প্রহরীর ভাষাও প্রথমে ছিল আভিজাত্যের মোড়কে মোড়া। পরে হোল খেলুড়ির ভাষা। মোড়লের ভাষার উগ্র মোড়লিভাব শেষ অবধি বজায় থেকেছে। তার ভাষায় ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং চাপা রোষ প্রকাশ পেয়েছে। সেই গ্লানিটুকু ধুয়ে দেবার জন্য বালিকা সুধার আবির্ভাব; তার কথাগুলি তার পায়ের এক জোড়া মলের মতই ঝম ঝম আওয়াজ তুলেছে। ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে তার সংলাপ সম্পূর্ণ; সেগুলিকে বাক্যই মনে হয় না।

অমল। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে ?

সুধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব। দাম দিতে হবে যে।

অমল। আমি যখন বড়ো হবো, তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরণা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে দেব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তাহলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সুধা। আসব!

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা। না ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে।

ডাকঘরের ব্যক্তিভেদে সংলাপের চরিত্র বদলেছে। এবং তাদের পাশাপাশি অবস্থানে সুরের ওঠানামা ঘটেছে। মোড়লের মোড়লি ভাষার উঁচু গ্রাম থেকে সুধার কোমল শান্ত ভাষার খাদে আমাদের অবতরণ করতে হয়।

ভাষার এই নানা চড়াই-উতরাই আরোহন-অবরোহণে বিস্ময় রসের সৃষ্টি হয়। ডাকঘরের ভাষার সব থেকে বড় লক্ষণীয়, এতে কোন অলংকরণ নেই। শুধু ঠাকুর্দার সংলাপে একটি অলংকৃত বাক্য—

"মিছে বলনি—একেবারে ভযানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো।"

এই অলঙ্কার-বিরলতা এই নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তুলনা করুন রাজা ও রাণী এবং বিসর্জনের ভাষার সঙ্গে। সেখানে ঘটনার আড়ম্বরপ্রিয়তার সঙ্গে ভাষার অলংকৃত দীপ্তি শ্রবণশোভন হয়েছে।

এখানে কোন অলংকার নেই; এখানে শুধু আছে জীবনের নানা ছবি—যে ছবি তিনি স্থূল চোখে দেখেন নি, কল্পনায় দেখেছেন। তাই তিনি সে-ছবি বর্ণনা করেন নি, রচনা করেছেন।

মনে হয় এ শুধু চোখে-দেখারও ছবি নয়, কানে-শোনার ছবি। তাই নাটকে ছবির জন্য রং গুলেছেন সুর দিয়ে।

দইওয়ালা কি ছাই জানত তার গাঁয়ের ছবি এত সুন্দর! আমরা দেখছি অমলের চোখে। অথচ আসলে দেখেছিল দইওয়ালা; যখন বলছে, তখন অমল তার উপর ভর করেছে। তাই দেখছি কল্পনায়।

—সেখানে পাহাড়ের গাঁয়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে; মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে কলসী করে নিয়ে যায়, লাল শাড়ি তাদের পরণে।

অমল তাদের প্রতিদিনের বাস্তব জগতকে যে কল্পনার কোন্ অলকাপুরীতে নিয়ে এসে ফেলে, তারা জানতেও পারে না।

শুধু কি দইওয়ালার জগতটাকে সে অলৌকিক করে দেয়? প্রহরীর তুচ্ছ পাহারাদারির ঘণ্টা-পিটানো তার কাছে কত হৃদয়গ্রাহী!

—বেশ্ লাগে তোমার ঘণ্টা—আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়—পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ওই কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে—তখন তোমার ওই ঘণ্টা বাজে—ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।

সব ছবিই কল্পিত; বর্ণিত নয়।

বিসর্জন প্রভৃতি নাটকে পঞ্চসন্ধি পুরো মানা হয়েছে, এখানে শুধু একটি সন্ধি। রাজা নাটকে ঘটনার প্রচণ্ড কলরবে নাটীয় সংঘাত বা action আছে, এখানে তেমন নেই। শারদোৎসব নাটকে যিনি সন্ন্যাসী, তিনিই যে বিজয়াদিত্য—এই খবরের মত কোন চমকপ্রদ খবরও নেই এই নাটকে। তবু কথাবস্তুর, ভাষার এবং নাট্যরীতির এত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপন ডাকঘরের মত আর তো কোথাও দেখিনা। সব নাটকেরই পাঠভেদ আছে, পরিবর্তন আছে; ডাকঘরের নেই। যখন তার অভ্যুদয়, তখনই সে পূর্ণপ্রস্ফুটিত।

নাটক থেকে কবি 'পালা'য় এসেছিলেন। এসেছিলেন, কারণ বাংলা নাটককে স্বাভাবিক ও আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর সে উদ্দেশ্য এখানে সম্পূর্ণ সার্থক। এছাড়া আরও একটি লক্ষ্য ছিল—মঞ্চজগৎ আর বিশ্বজগতের মধ্যে যে আড়াআড়ি চলছিল, তার অবসান ঘটানো। ডাকঘরে তাই বিশ্বচরাচর আর প্রেক্ষাপট মাত্র নয়, একটি চরিত্র। ছোটমঞ্চকে বড় মঞ্চ আত্মস্থ করেছে।

বাংলা মঞ্চের কৃত্রিমতা পরিত্যক্ত হোল, দৃশ্যপট বিদায় নিল। শুধু পট বা দৃশ্য-পরিবর্তনের জন্য গান বা স্বগত-উক্তির অবতারণা করার প্রয়োজনীয়তারও তাই অবসান হয়ে গেল। "সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে, সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ।" শুধু ভাববস্তু সম্বন্ধে এই কথা প্রযোজ্য নয়, শারদোৎসবের বাহ্যরূপ সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। নাটক জীবন নয়, জীবনের প্রতিভাস; কিন্তু জীবন আর শিল্পের আড়াআড়ি সংশোধিত হোল।

নাটকের অ-নাটকীয়তা

আমরা পূর্বেই দেখেছি রবীন্দ্রনাটকের 'সমৃদ্ধ' যুগে সাবেকী নাটকের ঔচিত্যবোধ স্বীকৃতি পেয়েছিল। তারপর একদিন অন্তরের তাগিদেই তিনি নাট্যশাস্ত্র ও নাট্যরীতির এই দীপ্ত দরবার-কক্ষ থেকে অন্তর্ধান করলেন।

প্রায়শ্চিত্তের অস্পষ্ট পথ-রেখা শারদোৎসবে স্পষ্টতর হোল; সেখানে গোপনতা থাকল না, অনিশ্চয়তা থাকল না। নবীন দ্যোতনা সদম্ভে নয়, কিন্তু নিঃসংশয়িতভাবে ঘোষিত হোল। ডাকঘরে এসে সেই নবীন নাট্যবোধের পূর্ণতম প্রকাশ।

একদা মাইকেলের রচনাতে দেখেছিলাম; নাট্যভাবনা কাহিনী-কাব্যের আলুলায়িত বিস্তৃতি পরিত্যাগ করে বেণীবদ্ধ হয়েছে। তেমনি কুশীলবের চরিত্রে সারল্যের স্থানে জটিলতা দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের রাণা ভীমসিংহের মতই পরবর্তী যুগের বিক্রমদেব ও রঘুপতিও অতীতের অতি-মানুষের মহিমান্বিত নিদর্শন হয়ে থাকল।

কিন্তু অতি-মানুষ বা বড়ো-মানুষের কল্পনা রেঁনেসাঁসের কল্পনা। অচিরেই মানুষ তার বহিঃঐশ্বর্যের সীমা উপলব্ধি করল; অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণে-পীড়নে মানুষ কখনও হয় বিদ্রোহী হোল, না হয় অন্তর্মুখী হোল। সেই অন্তরমুখী মানুষ মনে করল হৃদয়বৃত্তিকে কেবল আলোড়িত করে নয়, সর্ব বিঘ্নকে অন্তরজগতে জয় করে এগুতে হবে। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্যায়ের নাটকে এই বিশেষ বোধ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বুঝলেন "সংসারের নকল" ছেড়ে নাটকে "সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তি"কে[১২] ফুটিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে নাটক সেদিন থেকে অ-নাটকীয় হোল।

এই বিশেষ জাতীয় নাটক চরিত্র-ভিত্তিক নয়; ব্যক্তির মহিমা অপেক্ষা জীবনের গূঢ় জিজ্ঞাসা সেখানে বড়। তাই বলে চলিত জীবন অস্বীকৃত হবে না। এ নাটকে গল্প আছে; কিন্তু সে গল্প এতদিন যে নিয়মে প্লট হয়ে উঠেছে, আজ সে নিয়ম পালন করা হোল না। এই জাতীয় নাটকে গল্প আঘাতে-সংঘাতে জটিল হয় নি, অর্থাৎ অন্তরদ্বন্দ্ব তার সর্বস্ব নয়। গল্পের নানা অংশ একসূক্ষ্ম ভাবরসে গ্রথিত। সর্বত্রই একটা নিয়মহীন নিয়মানুগত্য দেখা যায়। আপাত চক্ষে মনে হবে—এ নাটক কতিপয় চিত্রের সমষ্টি; শারদোৎসবে, ডাকঘরে এই রীতিই প্রধান। চিত্রগুলি নায়ক বা নায়িকার অঙ্গুলিহেলনে হাজির হয় নি। এই 'নায়কহীন' নাটকে ঘটনা ঘটেছে সত্যের তাগিদে। বা

বক্তব্যের ইসারায়। অথচ এমন প্রাণবন্ত, কৌতুকউচ্ছল, কারুণ্যভরা নাটক আর চোখে পড়ে না। কী প্রবল জীবনী শক্তি!

নাটকের গড়নে-চলনে যে অভিনবত্ব, তার সমর্থন মিলবে সংলাপে। এ নাটক প্রচলিত নাট্যভাষাকে অস্বীকার করেছে। প্রচলিত নাট্যভাষার যত শক্তিই থাকুক, তার সব শক্তি আত্মার আলোড়ন, বিক্ষোভ ও প্রচণ্ড ক্ষুধাকে প্রকাশ করতে শুধু ব্যয়িত।

বাংলানাটকের সংলাপ যোজনার প্রথম স্তরে শব্দসমূহ হোত অবিন্যস্ত, বাক্য-সমূহ শিথিল; হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচরণ শীকদার, শিশিরকুমার ঘোষের রচনায় তার প্রমাণ। দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পাই শব্দ ও বাক্য শাসনের মধ্যে পড়ে সুশৃঙ্খল, অর্থবহ ও উদ্দেশ্যমুখী হোল। প্রাক-শারদোৎসব নাট্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ এই স্তরের উপরে সৌন্দর্য ও সৌরভের নবীন পশরা যোগ করেছেন।

ভাষার বা সংলাপ-যোজনার তৃতীয় স্তরও তৈরি করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই স্তরে ভাষা তার প্রচলিত শব্দশাস্ত্র ও ব্যাকরণকে অস্বীকার করল।

সংলাপ বিভিন্ন শব্দের যোগফল নয়; বা শুধু পরস্পরসংবদ্ধ বাক্যসমষ্টি নয়। শব্দ ও বাক্যের উপরে আছে বক্তার মেজাজ। এই বক্তার মেজাজকে প্রকাশ করার জন্য তৃতীয় স্তরের নাটকে সংলাপের চারিত্র্যধর্ম পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই পরিবর্তন কিন্তু শুধু নাটকেই হোল, এমন কি রবীন্দ্র-উপন্যাসেও নয়। শেষের কবিতার ভাষার ঔদ্ধত্য গথিক গির্জের চূড়োর মত হোক, আপত্তি নেই, চতুরঙ্গের ভাষায় গুহায়িত মানবজীবনের রহস্যময়তা আছে, তা-ও অস্বীকার করি না; কিন্তু রাজা-ডাকঘরের মত ব্যাকরণহীন শব্দশাস্ত্র লেখক কোথাও তৈরি করেননি।

আবার ডাকঘরের মত অলংকারহীন অলংকারশাস্ত্রও লেখক আর তৈরি করেননি। বক্তব্যের জন্য উচাটিত নাটকে ভাষা হয়েছে নিরলংকারা, তাপসী। তাকিয়ে আছে অনির্দেশ্যের পানে।

নাটকের ভাষায় যে প্রতীকতা আছে, তার চরিত্র 'চতুরঙ্গ' থেকে পৃথক। এই প্রতীকতায় আছে সাংকেতিকতা। বাক্যবিশেষে প্রতীকতা নেই।

উপরন্তু চতুরঙ্গের প্রতীক কোন অনির্বচনীয়কে দ্যোতিত করেনি; ডাকঘরের সঙ্গে এই খানেই তার পার্থক্য। তবে 'রাজা'র ও 'ডাকঘরে'র সাংকেতিকতা এক জাতের নয়। 'ডাকঘর' জীবন-বিরোধী নয়; 'রাজা' জীবন-বিমুখ; আত্ম-পরায়ন।

'রাজা'-রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বল্পকালের জন্য রবীন্দ্রপথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন। খেয়া কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ভাষার এই নবীন মূর্তি রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ মহড়া হয়ে গেছে পূর্বেই।

রাজা নাটকের আরম্ভ থেকে উৎকলিত করা গেল—

সুদর্শনা। আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।

সুরঙ্গমা। রাণীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না।

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।

সুরঙ্গমা। তাহলে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিনবে না।

পাঠক চলিত ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্যে এর মর্ম-অনুধাবন করতে গেলে প্রত্যাখ্যাত হবেন। সুদর্শনা যে সুরঙ্গমার ভাষাকে "অন্ধকারের মতো" বলেছিলেন, তাই তার সত্যকার পরিচয়।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে।

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী। তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়। সেই জন্যেই দেখছ না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে। ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। [চমকিয়া উঠিয়া] সত্যি ?

মোড়ল। এ কি সত্যি না হয়ে যায়। তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব। (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি।

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে—আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে। মোড়ল মশায়, বলে দাও-না এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো—রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা।

মাধব দত্ত। (হাত জোড় করিয়া) মোড়ল মশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না।

ঠাকুরদা। পরিহাস? কিসের পরিহাস। পরিহাস করবেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর?

এ ভাষা তার শিল্পশাস্ত্রের ব্যাকরণ ভুলে গেছে, অভিধান ভুলে গেছে। এ-ভাষা অলংকার-আশ্রয়ী নয়। এ ভাষা সাদা ভাষা, সহজ ভাষা। তাই এর আবেদন অনুভবের কাছে, কল্পনাকুশলতার কাছে। মনে পড়ে প্লেটোর সেই অসাধারণ উক্তি—"Not-being is itself a form of being." অস্বীকৃতির হাত ধরে স্বীকৃতি, পরিহাসের পিছনে প্রশস্তি।

কী সংলাপ-রচনায়, কী গঠন-সৌকর্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্যজগতে নতুন একটি স্বর আনলেন। এখানে ঘটনা অপেক্ষা আবহাওয়া, স্পষ্ট নির্দেশনা অপেক্ষা আভাস-ইঙ্গিত প্রাধান্য পেয়েছে। কার্লাইলের ভাষায় যেখানে 'সিম্বল', সেখানে অনন্তের আসন পাতা[৭৩]। কিন্তু অনন্ত সান্তের ঘরে ধূলোখেলায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। ডাকঘরের 'রাজা' তাই অমলের উৎকণ্ঠায় অনুভবগম্য।

তবু নাট্য-সমালোচক বলবেন, এ কি নাটক হোল!

এর জবাব তিনিই দিয়েছেন—

"চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।"

পাদটীকা

১. নবনাটক অভিনয় উপলক্ষে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লিখিত মহর্ষির পত্র। বাল্যকথা—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈতানিক সংস্করণ। পৃ—৩৪।

২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; অগ্রহায়ণ, ১৭৭৮ সাল।

৩. ঐ, আষাঢ়, কার্তিক, ১৭৯৭ শাক।

৪. ঐ, পৌষ, রঙ্গভূমি প্রবন্ধ—১৭৯৭ শাক।

৫. রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, বিশ্বভারতী। পৃ—৩৪।

৬. ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ—১৩৫৮। পৃ—৮০-৮৩।
৭. ঐ, পৃ—৮৪।
৮. রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী। পৃ—৩৪-৩৫।
৯. রবীন্দ্রস্মৃতি—পৃ—৩৪।
১০. ঘরোয়া—পৃ—৮৪।
১১. ঘরোয়া—পৃ—৮৪।
১২. জোড়াসাঁকোর ধারে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ। পৃ—৪৯।
১৩. ঐ।
১৪. রবীন্দ্রজীবনী—১ম খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। পৃ—৪৪২।
১৫. প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি—প্রিয়নাথ সেন। পৃ—১২৮।
১৫ক. রবীন্দ্রজীবনকথা—খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৬. য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি—পরিশিষ্ট—।
১৭. পথের সঞ্চয় পৃ—৮৯৬।
১৮. ঐ পৃ—৮৯৭।
১৯. জিহ্বা আস্ফালন—ভারতী, ১২৯০।
২০. পথে ও পথের প্রান্তে -রবীন্দ্রনাথ—২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৬। পৃ—৮৪০।
২১. ঐ।
২২. পঞ্চভূত, পৃ—৬৭৪-৬৭৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—১৪ খণ্ড।
২৩. বহুরাজকতা, রাজাপ্রজা—রবীন্দ্রনাথ।
২৪. The Problem of Style—F. Middleton Murry. P—56. (Oxford Paper backs). 1960.
২৫. চিঠিপত্র—রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেন। ১০ম খণ্ড।
২৬. রবীন্দ্রনাথ – সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। নবতর সংস্করণ। এ. মুখার্জি এণ্ড কোং। পৃ—২০০।
২৭. চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ—১৬-১৭।
২৮. অন্তর বাহির—পথের সঞ্চয় রবীন্দ্রনাথ। পৃ ৮৯৩-৮৯৭।
২৯. ঐ।
৩০. ঐ।
৩১. ঐ।

৩২. অন্তর বাহির—পথের সঞ্চয়—রবীন্দ্রনাথ।
৩৩. ঐ।
৩৩ক. ঐ।
৩৪. নাটক, পুনশ্চ—রবীন্দ্রনাথ।
৩৫. রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, পৃ—৪৩।
৩৬. পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃ—১৩০-১৩১।
৩৭. মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ—১৬।
৩৮. রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা—শান্তা দেবী। পৃ—১৬০।
৩৯. পুণ্যস্মৃতি—সীতা দেবী। পৃ—৭৩।
৩৯ক. ঐ।
৩৯খ. ঐ।
৩৯গ. ঐ।
৪০. রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী। পৃ—২৮।
৪১. ঐ।
৪২. শান্তিনিকেতনের স্মৃতি—উইলিয়ম পিয়রসন। অমিয়কুমার সেন অনূদিত। পৃ—২৫।
৪৩. রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। পৃ—৩৭।
৪৪. ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ। পৃ—১১৫।
৪৫. ঐ— পৃ—১১৬।
৪৬. ঐ— পৃ—১১৮-১১৯।
৪৭. স্মৃতিচিত্র—প্রতিমা দেবী। পৃ—৯০।
৪৮. জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ।
৪৯. রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড, পৃ—১৯৭।
৫০. মানসী পত্রিকা—বৈশাখ, ১৩১৭।
৫১. আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ, পৃ—১৯৯।
৫২. Bengalee—29 January, 1907.
৫৩. ঐ, 19 November, 1907.
৫৪. ঐ, 10 December, 1907.
৫৪ক. ঐ
৫৫. জীবনের ঝরাপাতা—সরলাদেবী চৌধুরাণী। পৃ ১২৯।

৫৬. রবীন্দ্রজীবনী—২য় খণ্ড ; পৃ—১৯১।

৫৭. Bangalee, 1907 Nov.-Dec.

৫৭ক. শান্তিনিকেতন, ২৩ চৈত্র, ১৩১৬।

৫৮. আত্মপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ; ১৩২৪।

৫৯. কাব্যপরিক্রমা—অজিতকুমার চক্রবর্তী। পৃ—৩০।

৬০. রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ পত্রাবলী—মলিনা রায় অনূদিত। পরিশিষ্ট। ১৩ নভেম্বর, ১৯১৪।

৬১. ঐ, পৃ—৩৪। ১৫ নবেম্বর, ১৯১৪।

৬২. রক্তকরবী নাট্যপরিচয়—১৫শ খণ্ড ; রবীন্দ্র রচনাবলী। বিশ্বভারতী। পৃ—৩৩৪।

৬৩. ঐ—গ্রন্থপরিচয়—অভিভাষণ। পৃ—৫৪৫-৫৪৬।

৬৪. সাহিত্য—২৫ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ২য় সংখ্যা।

৬৫. আত্মশক্তি ও সমূহ—রবীন্দ্রনাথ। ১৩২৫ বৈশাখ।

৬৬. রচনাবলী, ১১ খণ্ড। পুস্তক পরিচয়।

৬৭. সাহিত্য—২৩ বর্ষ, বৈশাখ, ১ম সংখ্যা।

৬৮. রবীন্দ্রসংগীত—শান্তিদেব ঘোষ। পৃ—২০৮।

৬৯. শান্তিনিকেতন—চিরনবীনতা—রবীন্দ্রনাথ।

৭০. রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী—৪ জুন, ১৯২১। পৃ—১২৪।

৭১. ঐ, পৃ—১২৫।

৭২. শকুন্তলা-প্রাচীন সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ।

৭৩. Sartor Resartus—Book III, Chapter III. Thomas Carlyle. "In the Symbol proper, what we call a Symbol there is ever, more or less, distinctly and directly, some embodiment and revelation of the Infinite ; the Infinite is made to blend itself with the Finite, to stand visible and, as it were, attainable there".

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	পঠিতব্য
৪০	১৬	মুখ্যভূমিকা[১০]
৬২	১৮	আটটি নিদর্শন
৬২	২৭	শ্রীকৃষ্ণ[২২ক]
১২১	১৪	Rās Purnimā"[১]
১২২	৪	really is".[৪]
১২৩	২১	of nature"[৭ক]
১২৪	১	licensed places."[৭খ]
১২৪	১০	wisdom".[৭গ]
১২৬	২০	উৎসারিত হইল।"[৭ঘ]
১৯৭	৭	২৮শে মার্চ।
৩১৪	৩	রতা।
৩৬৪	৪	শেলীর Cenci নাটক হোল না,
৩৬৬	২০	মিডলটন মারে একটা কথা তাঁর গ্রন্থে
৩৭১	৮	১৩০৯ বঙ্গাব্দে
৪২০	১৬	ট্রাজেডিকে অবাস্তব।
৪৬৬	১২	চিত্তের প্রসাদের উপর।
৬২৫	৪	ততই মঙ্গল।"[৪]
৬২৫	৯	ভাড়া করে নেওয়া হয়।[৫]

নির্ঘণ্ট